বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব



যেই সমাজে বিয়ে কঠিন হয়, সেই সমাজে ব্যভিচার সস্তা হয়ে যায়

21 March 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

একটি উচ্ছল তরুণী যখন অনেক সাজুগুজু করে একটা ছেলের হাত ধরে রাস্তায় উড়ে উড়ে চলে -- তখন তাকে দেখলে কে কী মনে করেন জানিনা, আমার মনে হত অন্যকিছু। এই মেয়েটা অনেক প্রস্তুতি নিয়েই রাস্তায় বের হয়েছে, সাজুগুজু মেয়েরা অনেক সময় নিয়ে চিন্তা করে। কালার ম্যাচিং, ফিটিং এটা ওটা। এরপর রাতের বেলা একটা ছেলের হাত ধরে পার্কে হাঁটা। হয়ত বাবা-মা তখন ভাবছেন -- মেয়েটা ঢাকায় পড়াশোনা করছে। অন্তত তারা অনেক বড়ো কিছু স্বপ্ন নিয়েই তাদের পাঠান শহরে। ঢাকার মধ্যবিত্ত মেয়েরা রাত ঘরে পথে ঘুরেনা সচরাচর। পরিবারগুলো একদমই বিকিয়ে যায়নি।

বিকিয়েছে সংস্কৃতি। প্রতিটি ঘরেই স্যাটেলাইন কানেকশন। হিন্দি নায়িকারা বিকিনি, টপস পড়ে নিজেদের শরীরের বিভঙ্গকে পুরোপুরি তুলে দেয় ক্যামেরার কাছে। সারাদিন সিরিয়ালে দেখা যায় সুন্দরী প্রদর্শনক্ষম মেয়েদের মূল্য, আকর্ষন। 'সিক্সপ্যাক' শব্দটা আগে শোনা যেতনা -- এখন ছেলেরা প্যাক অর্জনের যন্ত্রণায় অস্থির থাকে। যতই জ্ঞানীগুণী আর হুজুরের পরিবার হোক, এখনকার কিশোর-কিশোরীরা এগুলো অবশ্যই অবশ্যই জানে --এগুলোই তাদের চারপাশ। তাদের এফএম রেডিও সারাদিনই প্রেমের গানে, প্রেমের আলাপে, লাভগুরুতে ভরপুর থাকে। ফ্রেন্ডসদের আড্ডাবাজির এসএমএস পড়ে শোনায়। যাদের কোন মেয়ে/ছেলে নাই "আড্ডা" মারার, "গল্প" করার, "পিকনিক" করার, "ফোনে কথা" বলার -- তারা নিজেদের অসহায় ভাবতে বাধ্য হয়। পারিবারিক জ্ঞান বাবা-মা দিয়ে রাখলে সেক্ষেত্রেও তাদের যুদ্ধ হয় কঠিন যুদ্ধ। প্রতিদিন, অনেকবার। বয়স্করা এসব জানেনা, বুঝতেও পারবে না ভিতরে এসব কালচার কীভাবে কাজ করে, আমরাই পারিনা ঠিকমতন! মাত্র ১০বছর আগে অমন ছিলাম তাই অনেক ব্যাকডেটেড আছি!!

একটা ছেলে তার বন্ধুদের মাঝে গিয়ে শুধু গার্লফ্রেন্ডের আলাপ শুনে -- তার কাছে মনে হতে থাকে, আমারো হয়ত থাকা উচিত ছিল। তার সামনে অকূল পাথার, নৈতিকতার সাথে যুদ্ধ। ক'দিন? শরীর আর মনের এই অমোঘ চাওয়ার সাথে ক'দিন যুদ্ধ? ১৬-১৭ তে পরিপূর্ণ বড় হয়ে যাওয়া ছেলেটি সামনে ১০ বছরের বেশি সময়ের নিরাশার দেখা খুজে পায়। বিয়ে হয় এখন ৩০ বছরে। আগে তাদেরই কেবল বিয়ে হয় -- যাদের সম্পদ বেশি। এবং তারা প্রেম করে ধনী মা-বাবার ঘাড়ে উঠেই খরচা করে বিয়ে করে। তাহলে? ১৫ বছর এই ছেলেটা প্রতিটি দিন, প্রতিবেলা যুদ্ধ করে যাবে? আর বাবা-মা কখনই তাদের হয়ে ভাবেন না। আর সম্ভাবনার সীমানা দেখতে না পাওয়ায় তাদের "স্বাভাবিকভাবেই" হতাশা আগলে ধরে।

অনেক সুশীল ইতর লোক আছে -- এমন আলোচনায় এসে টাকা ইনকামের প্রয়োজনীয়তার গল্প ফাঁদবেন। টাকা দিয়ে বিয়ে হয়না, চলার পথেও টাকার ব্যাপার যা -- তার চাইতে অনেক বেশি স্বভাব আর চরিত্র। চরিত্রহীন সন্তান বা স্বামীর টাকা দিয়ে কারো কিছুই আসে যায় না। অথচ, এই টাকার দেখা, উপার্জনক্ষমতা তখন আপনার কাছে মূল্যহীন হবে, যখন আপনার সন্তান অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে বাসায় ফিরবে। হয়ত তাকে এই শহরের চিপায় চাপায় দেখা যাবে আর ক'দিন পরেই। তখন উপার্জন ধুয়ে পানি খেতে হবে এইসব বেকুব অভিভাবকদের।

পূর্বের প্রজন্মের পাপ, অলসতা, বুদ্ধিবৃত্তিক অসারতার খেসারত আমাদের নোংরা সংস্কৃতি। সেই অভিভাবকরা আবার সংস্কৃতির উত্তাপের কড়াইতে পরের প্রজন্মকে ভেজে ভেজে লবণ ছিটিয়ে দেন তাদের কথার বুলিতে। অভিভাবকরা তো তাদের উপযুক্ত শিক্ষা পাবেই -- তারা কোনদিনই শান্তি পাবেন না অন্তরে -- এইটা আমি হলফ করে বলতে পারি। বেকুবদের শান্তি পাবার অধিকার নেই।

একটা ছেলে ভার্সিটি লাইফে ক্লাস করে ফিরে পরের দিন ল্যাব/কুইজ না থাকলে কি করে বাসায়/হলে? তার আশেপাশের সবই তার পশুত্বকে জাগিয়ে তোলার তিনিসপত্র। টিভি চ্যানেল, মুভি, নাটক, গান, পত্রিকা, টেলিভিশনের অ্যাড -- সে যদি শুধুই যুদ্ধ করে। ঘরে শিক্ষা না থাকলে ফোনে মেয়েদের কাছে পৌছাতে চায়। রোমান্স আজকাল পথে ঘাটেই থাকে। ভ্যাসলিনের কোমলতা বুঝাইতে টপস পরা মেয়েদের বিলবোর্ডে দেখা যায়। নারীর উন্মুক্ত বগল প্রদর্শনী থাকে ডিওডোরেন্টের অ্যাডে -- ধানমন্ডীর মূল রাস্তায়। বছরের পর বছর 'ভালোবাসার টানে, পাশে আনে' -- বিলবোর্ডে ছেলের বুকে একটা মেয়ে মাথা রেখে হেলান দিয়ে থাকে বিশাল মাঠের ঘাসে। আর এসব থেকে বছরের পর পছর একটা ছেলে যুদ্ধ করতে থাকবে -- তাকে অভিভাবকরা সন্নাসী মনে করে, নাকি নপুংসক মনে করে -- কে জানে? নীতিকথায় শরীর ভিজে? ক'দিন থিওরি বুঝিয়ে সামলাবেন এইসব?

যেই সমাজে বিয়ে কঠিন হয়, সেই সমাজে ব্যভিচার সস্তা হয়ে যায়।

আমার এই লেখা কেউ পড়ুক না পড়ুক। আমি জানি এই ভয়াবহতা কত বেশি। একটা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের হাল। যারা সংকীর্ণমনা নির্বোধ ইতর, তারাই কেবল এই কথার প্রতিবাদ করবে -- চিন্তিত না হয়ে। কেননা, আপনি/আপনার সন্তান হয়ত সাময়িকভাবে মুক্ত (আমি বিশ্বাস করিনা, কেননা পদস্খলনে কয়েক মূহুর্ত লাগে), কিন্তু তারা যাদের সাথে চলে -- অথবা এই সমাজেরই আরো অনেক ছেলেমেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে চলেছে। নীতির কথা তাদের কাছে হাস্যকর। তারা আপনাদের ভেজে খাবে। আপনাদের চিন্তার অসারতার কারণেই তা হবে, হবেই। আমি হলফ করে বলতে পারি।

একটা ছেলে পাশ করে চাকরি করলেও হয়না। তাকে অনেএএক টাকা ইনকাম করতে হবে। এই ছেলের সম্ভাব্য বউ ততদিনে কলেজ ভার্সিটিতে ডজনখানেক রোমিওর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বসে থাকে। এরপর ৩০বছর, ৩২ বছরে সবাই ছেলেটিকে বিয়ে দিতে অস্থির হবে -- তখন তার চরিত্র কেমন আছে কে জানে, মেয়েটারটাও কে জানে। বিয়ের পবিত্র আবেগ বহু আগেই তাদের হারিয়ে ক্ষয়ে যায় -- তা যে কেউ বুঝে। শারীরিক-মানসিক এই চাওয়া পূরণে তারা যে আগেই কোথাও সাময়িক ঢুঁ মারেনি তাইবা কে জানে?

মুর্খ অভিভাবকদের চোখে পড়েনা এখনকার ডিভোর্স রেট? চোখে পড়েনা সবখানে অশ্লীলতা দেখে? তার সন্তানটি কী ভাবছে মনে করেন তারা? বিয়ের বয়সটা ছাত্র জীবনে রাখলে কী সমস্যা হবে? দায়িত্ববোধ যার কখনই ছিলনা, তার কখনই হবেনা। ছেলের ও মেয়ের বাবা মা আরো কিছুদিন (বিয়ের পরেও) ভরণপোষনের দায়িত্ব নিলে কি সমস্যা?

তাদের কি সন্তানের চরিত্রের চাইতে লোকে কি বলবে --সেটাই বড় বিষয়? এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনেক অল্পতেই শারীরিক ব্যাপারগুলো ভালো করে বুঝে ফেলে। দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিয়ে সপাত্রে/সপাত্রীতে হস্তান্তর করে দিতে না পারলে ভুক্তভোগী পরিবারের হর্তাকর্তারাই হবে -- হচ্ছে হরদম।

অথচ এসব ভাবার কেউ যেন নাই। একদিন পারিবারিক বন্ধনগুলো সব ধ্বংস হবে -- তখন হয়ত টের পাবে। প্রতিটি পরিবারের অবস্থা সঙ্গীন। প্রতিটি ছেলেমেয়েরই নৈতিক অবস্থা ভয়াবহ। এখানে এগিয়ে আসার কেউ নাই। আফসোস। সজ্ঞানে বিগত ৫-৭ বছর ধরে এসব দেখতে দেখতে আজকে প্রথম লেখলাম। না লিখে পারলামনা। এই চিন্তাগুলা প্রতিদিনই আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে।

যারা সবকিছুকে এড়িয়ে চলতে পারে -- তারা এই লেখাকেও এড়াবে। আমি এই চিন্তাগুলোর বাস্তবতা খুব ভালো করে দেখছি। শত শত সমসাময়িক ছেলেমেয়েকে উদাহরণ হিসেবে জানি। হাজারখানেক ছেলেমেয়ের সার্কেলের ও কালচারাল ট্রেও জানি। অভিভাবকরা পদক্ষেপ না নিলে একটা ধ্বংস অবধারিত। যেহেতু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে ঠেকানোর উপায় নেই -- পরিবারকে ঠেক দেয়াই এখনকার প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত। তাই বলছি, বিপদে যাবার আগে, সমাজকে ধ্বংস হতে দেবার আগে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে, নৈতিক শিক্ষা বলীয়ান করে সন্তানদের বিয়েকে এগিয়ে নিয়ে আসুন। ৩০-৩২ বয়েসে ছেলেদের, ২৫-৩০ বয়সে মেয়েদের বিয়ে না নিয়ে তাকে যথাক্রমে ২২-২৫ এবং ১৮-২২ বছরে নামিয়ে আনলে সামগ্রিক ক্ষতি নেই। অন্যথা? সাধু সাবধান!!

(বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আমরা ইসলামি নিয়মানুযায়ী বিয়ের বয়সকে লেখকের উল্লেখিত সীমানায় মনে করি না, বরং তা আরো কম। কেবলমাত্র সচেতনতার জন্যই লেখাটি আমরা প্রকাশ করছি। আল্লাহ আমাদেরকে রহম করুন।)

ভাই/আপু এই লেখাটা তোমার জন্যে.....

26 May 2015

লেখকঃ তানভির আহমাদ আরজেল

আশা করি এই লেখাটি তোমার চোখ খুলে দিবে। সবকিছু নতুন করে ভাবতে সহায়তা করবে। লেখাটি খুব মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত পড়ার আন্তরিক অনুরোধ রইল। জাযাকাল্লাহ খাইরান।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

তোমাকে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি, আমি খুব বিষণ্ন মন নিয়ে এই লেখাটা লিখতে বসেছি। তবে এই বিষণ্নতা তথাকথিত গার্লফ্রেন্ড চলে যাওয়ার বিষন্নতা নয় বা এই পৃথিবীতে কোনোকিছু হারানোর বিষণ্নতা নয়। এই বিষণ্নতা তোমাকে এই কথাগুলো আগে বলতে না পারার অযোগ্যতার বিষণ্নতা, আমাদের চারিপাশে যা কিছু হচ্ছে তা সইতে না পারার বিষণ্নতা। সবাই যখন পরীক্ষার পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত আমি তখন তোমাকে লিখতে বসেছি কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে আমার এই পরীক্ষার চেয়ে তোমাকে এই কথাগুলো বলা বেশী প্রয়োজন, বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হয়ত আমার এই কথাগুলো তোমার ভালো নাও লাগতে পারে তারপরেও লিখলাম শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে।

প্রারম্ভিক কিছু কথাঃ-

কি সুন্দর এই পৃথিবী! চোখ জুড়ানো বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্য ক্ষেত। গাছের ডালে ডালে রঙ-বেরঙের ফুল ও ফল, তারই মাঝে রঙ-বেরঙের পাখ-পাখালি ও প্রজাপতির মনভুলানো খেলা। মন জুড়িয়ে যায়। মন জুড়িয়ে যায় বিরাট খোলা আকাশটার দিকে তাকিয়ে। মেঘের কোলে ভেসে বেড়াচ্ছে স্বাধীন ডানা মেলা পাখিরা, রোদ হাসছে ঝিকমিক। কি সুন্দর! কি সুন্দর এই সৃষ্টি! কি বিরাট বিস্ময়কর এই সৃষ্টি! সৃষ্টির এই সৌন্দর্য উপভোগ করে শেষ করা যায় না। এর সীমা-সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। বিশ্বের প্রতিটি অনু পরমাণু মেনে চলেছে আল্লাহর আইন। এই শৃংখলার কোন ব্যতিক্রম নেই। আর এ জন্যেই এই বিশ্বজগত এতো সুন্দর। বিরাট এ বিশ্বজগতে বিরাজ করছে অনাবিল শান্তি, ঐক্য আর শৃংখলা। কে না চায় এই এতো সুন্দর বিশ্বজগতে বেঁচে থাকতে!!

মানুষ এই দুনিয়ার সুন্দরতম সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয় তাকে। অন্যান্য সৃষ্টি থেকে আলাদা তার মর্যাদা। বিশেষ তার স্থান। মানুষ এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি, আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান-বিবেক, দিয়েছেন ভালো মন্দ বুঝার ক্ষমতা। সে যেমন এই জ্ঞানের আলোকে ভালো কাজ করতে পারে তেমনি রয়েছে খারাপ কাজ করার তার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। কিন্তু কেন আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে এই বিশেষ মর্যাদা দিলেন? কেন দিলেন এমন স্বাধীনতা? এর পিছনে রয়েছে আল্লাহর এক মহান উদ্দেশ্য। তা হলো, বিশ্ব প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টি যেমন আল্লাহর নিয়ম মেনে তৈরি করেছে অনাবিল শান্তির জগত তেমনি মানুষ তার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও যেন আল্লাহ্র পথকে বেঁচে নিতে পারে। খারাপ কাজ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও যাতে করে সে নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর আইনের গোলামীকে বরন করে নিতে পারে। আর তারই ফলে তাদের জীবনে নেমে আসবে অনাবিল শান্তি। পৃথিবীতে গড়ে উঠবে এক সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা। আর আখেরাতের অশেষ পুরষ্কার তো রয়েই গেছে। এবার আসি মূল কথায়ঃ-

১) তোমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

পড়াশুনা করেছি কিন্তু স্কুল জীবনে "Aim in life বা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য" নিয়ে রচনা লিখিনি বা পড়িনি এমন একজনও খুজে পাওয়া যাবেনা। আমরা প্রত্যকেই মুখস্ত কিছু কথা লিখেছি যে, আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই। ডাক্তার হয়ে বিনামূল্যে মানুষের চিকিৎসা করে মানুষের সেবা করতে চাই। কেউবা আবার লিখেছি শিক্ষক হয়ে সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চাই। আবার কেউবা লিখেছি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখতো যে ছেলেটা ডাক্তার হতে চেয়েছিল সে আজ হয়ত পড়ছে ইতিহাস বা বাংলা বা ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে। যে ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছিল সে হয়ত আজ পড়ছে প্রানীবিজ্ঞান বা উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে বা অন্য যেকোনো বিষয়ে। আর যে ছেলেটা শিক্ষক হতে চেয়েছিল তার হয়তোবা স্কুলের গণ্ডি পেরোনই হয় নাই। আসলে বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর। একজনকে যদি দান করে শতজনকে করে বঞ্চিত। আজ তোমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এখন আর ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করা বা শিক্ষক হয়ে সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তোমার দরকার কাড়ি কাড়ি টাকা-পয়সা, অর্থ-বিত্ত-প্রাচুর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। তোমার দরকার সমাজের বাহবা। সমাজ তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, তোমাকে দেখে চেয়ারটা ছেড়ে দিবে, সমাজ তোমাকে স্বীকৃতি দিবে তুমি জীবনে সফল(?), সমাজ বলবে তুমি তোমার বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করেছো, এগুলোই হচ্ছে এখন তোমার একমাত্র চাওয়া। আর একটা সুন্দরী রমণীর সাথে প্রেম করা বা বিয়ে করার বাসনা সেটা তো তোমার মনের ভিতরে সবসময়ই কাজ করে। তোমার দরকার বড় বড় সার্টিফিকেট, পি এইচ ডি ডিগ্রী যাতে বিয়ের বাজারে তোমার কদর একটু বেশীই থাকে। তুমি স্বীকার না করলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগুলোই যে তোমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা তুমি অস্বীকার করতে পারবেনা। হয়ত বলবে এগুলো কে না চায়? হ্যা আমিও জানি এগুলো প্রায় সবাই চায়। তাই তুমিও চাও, মনেপ্রাণে চাও, যেকোনো মূল্যে চাও**। আর তুমি তোমার এই চাওয়াগুলোকে পূরন করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করে চলেছ। যে তুমি তোমার আরামের ঘুমটুকু ভেঙ্গে ফজরের নামাজটুকু পড়তে পারোনা সেই তুমি পরীক্ষার টেনশনে সারারাত ঘুমাতে পারোনা। কখন কিভাবে ভোর হয়ে যায় তুমি বলতেই পারোনা কিন্তু তোমার পড়া শেষ হয় না আর ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়ারও সময়তো এমনেই হয়না। বই নিয়ে, গ্রুপস্টাডি নিয়ে বন্ধুদের সাথে এতোটাই ব্যস্ত থাক যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিরিশ মিনিট সময় তোমার হয়না। কারণ তুমি জান যে এবং তোমাকে জানানো হয়েছে যে এই পরীক্ষায় তুমি ভালো করতেই হবে, না করতে পারলে তোমার স্বপ্নগুলো পূরন হবে না। এই পরীক্ষায় ভালো না করতে পারলে তোমার একটা আরাম আয়েশি জীবন, একটা সুন্দর বাড়ি, একটা সুন্দরী নারী এবং একটা সুন্দর গাড়ী পাওয়া হবে না। আর এগুলো না ফেলে তোমার জীবন একেবারে ব্যর্থ। সমাজ তোমাকে ব্যর্থদের কাতারে ফেলে দিবে, সমাজ তোমার কুৎসা করবে, সমাজ বলবে তুমি শেষ, তুমি কোন কাজের না, তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তাই তুমি পাগলের মত ছুটে চলেছ এসবের পেছনে। কিন্তু তুমি একবার ভাবনি তুমি কিসের পেছনে ছুটছো, কিসের জন্যে ছুটছো।** অবশ্য তা ভাবার মত তোমার সময় কোথায়?

ক) মনে করো তুমি পরীক্ষা দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ এবং দুই দিন পরে ডিপার্টমেন্টের টিচার হবে কিন্তু কিছু দিন পরেই তুমি মারা গেলে। এখন বল কি হবে তোমার ওইসব ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সার্টিফিকেট দিয়ে। কেজির দরে বিক্রি করা ছাড়া আর কোন কাজে আসবেনা। আর কেজির দরে বিক্রি করলেও তো দুই টাকার বেশী হবে না। এখন চিন্তা করো তোমার সারা জীবনের অর্জন তোমার মৃত্যুর সাথে সাথেই দুই টাকা হয়ে গেল বা তারও কম।

খ) মনে করো গুলশানে তোমার একটা বিশাল বাড়ী হল এবং বাড়ীটিতে উঠার একদিন পরেই তুমি মারা গেলে কি হবে তোমার এই বাড়িটার? মনে করো তোমার একটা লাখ টাকা বেতনের একটা চাকরি হল এবং একটা গাড়ী হল এবং তুমি ওই গাড়ীতে করে প্রথম দিন অফিসে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনায় মারা গেলে তখন কি হবে তোমার ওই লাখ টাকার চাকরি আর বিলাসবহুল গাড়ীর? আচ্ছা মনে করো খুব সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে হল এবং

বাসর রাতের পরের দিনই তুমি মারা গেলে তখন কি হবে তোমার ওই সুন্দরী স্ত্রীর? এগুলো কি তোমার সাথে কবরে নিয়ে যাবে নাকি? নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা তুমি মারা যাওয়ার পর তোমার ওই ভালোবসার মানুষটিই ভয়ে তোমার সাথে একরাত থাকতেও চাইবেনা। তোমার যে স্ত্রী কখনো তোমাকে ছাড়া একরাত থাকতে পারতোনা তোমার সেই স্ত্রীই বলবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে যেন দাফন করা হয়। এটাই চরম বাস্তবতা এবং এটাই চরম সত্য। একবার ভেবে দেখ তোমার মৃত্যুর সাথে সাথেই তোমার সব বৈষয়িক অর্জন, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছু এক মুহূর্তের মধ্যে শূন্য হয়ে যাবে। তোমার অতি কাছের মানুষগুলো চিরদিনের জন্যে তোমার পর হয়ে যাবে। যাদের জন্যে তুমি পৃথিবীতে এতো কিছু করেছো কেউ তোমার সামান্য উপকারে আসবেনা। কেউ তোমাকে বিন্দু পরিমাণ সাহায্য করতে পারবেনা এমনকি তোমার গর্ভধারিণী মাও পর্যন্ত তোমার জন্যে কিছু করতে পারবেনা এক দোয়া করা ছাড়া। **আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ-**

"আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতম উপকারে আসবেনা, কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গৃহীত হবেনা এবং বিনিময় নিয়েও সেদিন কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবেনা।"-সুরা আল বাকারাঃ ৪৮

তাহলে এখন ভাবো কি নিয়ে যাবে তোমার সাথে যেটা তোমাকে সেদিন সাহায্য করবে যেদিন কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবেনা। শুধুমাত্র একটা জিনিসই তোমাকে সাহায্য করতে পারবে সেটা হচ্ছে তোমার আমল অর্থাৎ তোমার কৃতকর্ম। আর সেটাকে গুরুত্ব না দিয়েইতো তুমি এসবের পিছনে পাগলের মত ছুটে চলেছ। তাহলে তখন্ তোমার কি অবস্থা হবে একবার ভাব। অবশ্য তোমাকে ভাবতে হবে না কারণ সেটা আল্লাহ্ তায়ালাই তোমাকে সতর্ক করার জন্যে পবিত্র কোরআনে বার বার বলে দিয়েছেন। কিন্তু তুমি এতোটাই দুর্ভাগা যে সেই সতর্ক বানীগুলো তোমার কানে পৌঁছায়না বা নিজে জানারও প্রয়োজনবোধটুকু করোনা। **আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ-**

"আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়াই না হতো এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম তাহলে কতই না ভাল হত । হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। আজ আমার অর্থ-সম্পদও কোন কাজেই আসলো না । আমার সকল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বরবাদ হয়ে গেল।-সুরা আল হাক্কাহঃ ২৫-২৯

এখন ভাবো কি হওয়া উচিত তোমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আবারো ভাবো!!!। এই দুনিয়ার প্রতিপত্তি নাকি আখিরাতে মুক্তি।

২) আচ্ছা বলতো কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

তুমিতো এই পৃথিবীর সামান্য কিছু বৈষয়িক সুখের জন্যে হাজার হাজার পৃষ্টা পড়ে চিন্তা করতে পারো, লিখতে পারো, বলতে পারো কিন্তু কখনো কি একবার ভেবে দেখেছো যে কেন তোমাকে তোমার প্রভু সৃষ্টি করেছেন?। শুধুমাত্র কি এই জন্যে যে তুমি তুমি জন্ম নিয়ে ছোট থেকে বড় হবে, পড়াশুনা করবে, তারপর একটা ভালো চাকরি করবে, তারপর

বিয়ে করে সুখে শান্তিতে সংসার করবে, তারপর বৃদ্ধ হবে এবং তারপর একদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে? অনেকটা পশু পাখির মতই। তাহলে তুমি যে আশরাফুল মাখলুখাত এই কথার সত্যতা থাকল কোথায়? আচ্ছা একবার গভীরভাবে চিন্তা করতো যিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, অসীম জ্ঞানী, যার সৃষ্টিতে কোন ভুল বা ত্রুটি নেই সেই তিনি কীভাবে তোমাকে এতো বুদ্ধি, বিবেক, প্রজ্ঞা দিয়ে সুন্দরতর আকৃতিতে সৃষ্টি করে কোন কারণ বা উদ্দেশ্য ছাড়াই এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন? তুমি হয়ত জানো না বা জানবার প্রয়োজনীয়তাটুকুও বোধ করোনা কেন আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেটা আল্লাহ্ আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। **আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ-**

"আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করিনি।"-সুরা আয যারিয়াতঃ ৫৬

উপরের আয়াতটা বার বার পড় এবং দেখতো বুঝতে কোন অসুবিধা হয় কিনা, কি কারণে আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি জানি একটা ছোট শিশুরও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে এতো বুদ্ধি, বিবেক, প্রজ্ঞা দিয়ে সুন্দরতর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তার অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের জন্যে। এখন তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি কি তাহলে এই পৃথিবীর কিছুই পাবো না বা কিছুই ভোগ করতে পারবোনা বা অন্য কোনকিছুই করতে পারবোনা? অবশ্যই পারবে, সব কিছুই করতে পারবে। তবে সেটা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের দেখানো পথে হতে হবে। আল্লাহ্ ও তার রাসুলের দেখানো পথে তুমি যা করবে বা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের নিষেধে যা পরিত্যাগ করবে তার সবটাই ইবাদত। যদি তুমি আল্লাহ্ ও তার রাসুলের নির্দেশমত রাস্তা দিয়ে হাট এবং আল্লাহ্ তার রাসুলের আদেশমত রাস্তা দিয়ে হাটার সময় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে রাস্তা দিয়ে হাঁটাটাও তোমার জন্যে ইবাদত বলে গন্য হবে যেমনিভাবে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের দেখানো পদ্ধতিতে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা ইবাদত হিসেবে গন্য হয়। তুমি যদি সৎ পথে তোমার পরিবারের জন্যে জীবিকা নির্বাহ করো তাহলে সেটাও তোমার জন্যে ইবাদত হিসেবে গন্য বা কবুল হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রী বা স্বামীর সাথে যে সময়টুকু কাটাবে সেটাও ইবাদত বলে গন্য হবে যদি সেটা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের দেখানো পথ অনুসারে হয়। এমনকি তোমার ঘুমটাও ইবাদত হবে যদি সেটা আল্লাহ্ ও তার রাসুলের নির্দেশিত পন্থায় হয়। **রাসুল(সাঃ) বলেনঃ-**

"যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে পড়ল যে যেন অর্ধরাত অবধি নামাজ আদায় করল। আর এর পর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করল সে যেন সারা রাত নামাজ আদায় করল। অর্থাৎ মাঝখানে তার ঘুমটাও নামজের মত ইবাদত হিসেবে গন্য হবে। "- সহীহ মুসলিম

৩) কেন তুমি আশরাফুল মাখলুখাত?

তুমি ইসলাম সম্পর্কে খুব ভালো না জানলেও অন্তত এইতুকু জানো যে মহান আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে আশরাফুল মাখলুখাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কখনি কি একবার ভেবে দেখেছো কেন তুমি সৃষ্টির সেরা। নাকি তুমি এমনি এমনিই তুমি সৃষ্টির সেরা!!এইটা বলা কি চরম নিরবুদ্ধিতা না বল? তুমি নিজেও কি অন্য কাউকে শুধু শুধু সেরা বলে বলে মেনে নিবে? তুমি জানো যে তোমার বাবা তোমার পরিবারের শ্রেষ্ঠ কারণ তোমার বাবা তোমার পরিবাবের সকল দায়িত্ব বহন করেন। তেমনিভাবে তোমাকে কিছু দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যেটা অন্য কোন প্রানীকে দেয়া হয় নাই আর সে জন্যেই তুমি আঁশরাফুল মাখলুখাত বা সৃষ্টির সেরা। **আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ**

" তোমরা হলে উত্তম জাতি। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যান সাধনের জন্যে। তোমাদের কাজ হল, তোমরা মানুষকে সত্যের পথে চলার আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।"-সুরা আল ইমরানঃ ১১০

দেখ আল্লাহ্ কত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন কেন তোমাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এখন বল এই দায়িত্ব পালন না করলে কি তুমি আর শ্রেষ্ঠ থাকবে বা থাকতে পারবে? থাকতে পারবেনা। তাহলে কি হবে তোমার অবস্থান? সেটাও কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেনঃ

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম আকৃতিতে। অতঃপর থাকে নামিয়ে দিয়েছি নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর অবস্থানে।"- সুরা আত ত্বীনঃ ৪-৫

অর্থাৎ তুমি যদি তোমার এই দায়িত্ব মানে "সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ" পালন না করো বা পালনে অবহেলা করো তাহলে তোমাকে এক নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ পশু পাখিরও নীচের স্তরে। এখন একটু চিন্তা করতো তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে কতটুকুই বা জানো কতটুকুই বা পালন করছো। যদি না করে থাক তাহলে তোমার অবস্থানটা কি পশুর চেয়েও নীচে নেমে গেলনা?

৪) আচ্ছা বলতো কেন আমরা বেঁচে আছি?

আচ্ছা ভাইয়া বা আপু কখনো কি একবার চিন্তা করেছো কেন আমরা বেঁচে আছি? কিসের জন্যে বেঁচে আছি? খাবো-দাবো, সেক্স করবো, আমোদ-ফুর্তি করবো শুধু কি এই জন্যেই বেঁচে আছি? যদি শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়া, সেক্স, আমোদ-ফুর্তি বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো আমাদের আর পশু পাখির মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকলোনা। বরং তখন পশু পাখির জীবনটা আমাদের চেয়ে অনেক সুন্দর হবে কারণ ওদের খাওয়া-দাওয়া, সেক্সের জন্যে অতটা পরিশ্রম করতে হয় না যতটা করতে হয় মানুষের। যদি বল খাওয়া- দাওয়া, সেক্স, আমোদ- ফুর্তিই বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য না তাহলে কেন আমরা বেঁচে আছি সেই কারণটা অবশ্যই তোমাকে বের করতে হবে। আর এই জন্যে তোমাকে ফিরে

যেতে হবে আল কোরআনের ছায়াতলে। না হলে হাজার হাজার পৃষ্টা পড়েও অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরবে কিন্তু বেঁচে থাকার সঠিক উদ্দেশ্যটাই আবিষ্কার করতে পারবেনা। **আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ**

“এই সেই রমজান মাস, যে মাসে কোরআন নাযিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্যে হেদায়াত স্বরুপ, যা এমন স্পষ্ট উপদেশে পরিপূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য পরিস্কারভাবে তুলে ধরে।”- সুরা আল বাকারাঃ ১৮৫

৫) এই দুনিয়ার সাফল্যই কি প্রকৃত সাফল্য?

আচ্ছা এই দুনিয়ার সাফল্যই কি প্রকৃত সাফল্য? এই দুনিয়াতে অঢেল টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ী, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সুন্দরী রমণী পাওয়াটাই কি প্রকৃত সাফল্যের মূল নিদর্শন? দেখা যাক এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তায়ালা এই দুনিয়ার তথাকথিত সাফল্য নিয়ে কি বলেনঃ

“তারা তাদের এই দুনিয়ার জীবনে যা কিছু ব্যয় করছে তার উপমা হচ্ছে এমন বাতাস যার মধ্যে আছে তূষার কণা। যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে এই বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তাদের ওপর জুলুম করেননি। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। পার্থিব জীবন ছলনাময় সম্পদ ছাড়া কিছুই নয়।”- সুরা আল ইমরানঃ ১১৭

“পার্থিব জীবন ছলনাময় সম্পদ ছাড়া কিছুই নয়।”-সূরা আলে ইমরানঃ ১৮৫

“পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়, যারা সংযত হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি তা বোঝ না?”-সূরা আল-আন'আমঃ ৩২

“এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন।”-সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬৪

“এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।”-সূরা আল-মু'মিনঃ ৩৯

“তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ববোধ ও ধন-জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়।”-সূরা আল-হাদীদঃ ২০

উপরের আয়াতগুলো বার বার পড় আর চিন্তা করো কিসের পেছনে পাগলের মত ছুটছু।

৬) আখিরাতের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য।

এই দুনিয়ার সাফল্য সে প্রকৃত সাফল্য নয় এই কথাতি বুঝতে বা উপলব্ধি করতে কোন বিবেকবান মানুষেরই অসুবিধা হওয়ার কথা না। কেননা এই দুনিয়ার সাফল্য নশ্বর, অস্থায়ী। এই দুনিয়ার সাফল্য আজ আছে তো কাল নেই। যেকোনো মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের সাফল্যই যে প্রকৃত সাফল্য যে কেউ সামান্য একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। কেননা আখিরাতের সাফল্য অবিনশ্বর, চিরন্তন। তা কখনো হারিয়ে যাবার নয় বা ধ্বংস হবার নয়। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ

“অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে এবং তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন নিজেদের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। একমাত্র সেই ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে সেখানে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে । আর এ দুনিয়াটা তো নিছক একটা বাহ্যিক প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।”- সুরা আল ইমরানঃ ১৮৫

“সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখো, আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে। তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে সুউচ্চ মর্যাদার জান্নাতে। যার ফলের গুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে । এসব লোকদের কে বলা হবেঃ অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো।”- সুরা আল হাক্কাহঃ ১৯-২৪

৭) এবার তোমাকে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলি।

এবার তোমাকে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলি। হয়ত তোমার কাছে কথাগুলো কটু মনে হতে পারে। তাতে কি? আমি যদি তোমাকে এতো ভালোবাসতে পারি, তোমার জন্যে লিখতে পারি তাহলে কি তোমার বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে তোমাকে কয়েকটা কটু কথা বলার অধিকার রাখিনা বল? আর একটা প্রবাদই তো আছে যে, “শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে”।

ক) একটু চিন্তা করে দেখতো তোমাকে অনার্স পাস করতে হলে ছোটবেলা থেকে অনার্স পর্যন্ত কমপক্ষে ১৩৫ টি বই পরতে হয় (প্রতি বিষয়ের জন্যে কমপক্ষে একটি করে বই ধরে কিন্তু অনেক সময় আমদেরকে একটা বিষয়ের জন্যে তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত বই পরতে হয়)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই কমপক্ষে ১৩৫ তার মধ্যেও তোমার জীবনের জন্যে সবচেয়ে অত্যাবশ্যকীয় একটা **বই(আল কোরআন)** থাকেনা। তোমার এই পৃথিবীতে একটা চাকরীর জন্যে শত শত আজেবাজে বই পড়ার সময় হয় কিন্তু **আল কোরআন** পড়ার সময় হয়না। তার পরেও তুমি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দাও!!,আল্লাহর কাছে মুক্তির আশা করো!!। আমার মনে হয় আমাদের নিজেদের একটু লজ্জিত হওয়া উচিত।

খ) একবার চিন্তা করতো সাময়িক কিছু বিনোদনের জন্যে তুমি হাজার হাজার টাকা খরচ করে হুমায়ূন আহমেদের বই, জাফর ইকবালের বই, বিভিন্ন মুভি ডিস্ক এবং আরও কত কি কিনতে পারো কিন্তু মাত্র হাজার বারোশ টাকা খরচ করে ইসলাম বুঝার জন্যে একটা কোরআনের তাফসীর বা কয়েকটা ইসলামিক বই কিনতে পারোনা। তা পারবে কেন? তুমি তো আধুনিক ছেলে বা মেয়ে!!তোমার কি কোরআনের তাফসীর আর ইসলামিক বই পড়ার সময় আছে? তোমার সময় আছে একরাতে দুই তিনটা মুভি দেখে শেষ করার!!তোমার সময় আছে টিএসসিতে বন্ধু বান্ধবীদের সাথে জমিয়ে আড্ডা দেয়ার!!তোমার সময় আছে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে পার্কে বসে নিভৃতে আড্ডা দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করার!! তোমার সময় আছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে সারারাত জেগে ফোনালাপ করার!!। তোমার কি ইসলাম নিয়ে, কোরআন- হাদিস নিয়ে আলোচনা করার সময় আছে? তা থাকবে কেন ? তোমার সময়গুলো হচ্ছে এক্তা টাইগার, ডার্টি পিকচার আর বলিউডের কোন মুভিটা কত হিট হয়েছে তা নিয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনায় হারিয়ে যাওয়ার। কোন মুভি প্রথম দিনেই কত মিলিয়ন ডলার আয় করছে তা একেবারে তোমার নখদর্পণে। স্প্যানিশ লীগে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে কে কয়টা গোল করছে সব তোমার মুখস্ত। আগামী বছর কে ব্যালন ডি জিতবে তাও বলে দিতে পারবে। পৃথিবীর সব বিষয়ের জ্ঞান তুমি রাখো। তুমি সবই বলে দিতে পারবে। বলতে পারবেনা শুধু পবিত্র কোরআনে কয়টা সূরা আছে, সিহাহ সিত্তাহ মানে কি। সত্যি তোমার জন্যে আমার করুনা হয়, তোমার জন্যে আমার লজ্জা হয়, তোমার জন্যে আমি বিব্রত!!!তারপরেও তোমাকে আমি অনেক অনেক ভালোবাসি, অনেক অনেক পছন্দ করি আর তাই তোমাকে এই কথাগুলো বললাম যেন তোমার চেতনা ফিরে আসে, যেন তোমার ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা সত্যিকারের মানুষটা জেগে ওঠে।

গ) হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুতে, সস্তা প্রেমের সিনেমা দেখে, সস্তা প্রেমের উপন্যাস পড়ে তোমার চোখে জল এসে যায় কিন্তু নিজের শত শত ভুল আর পাপের জন্যে আল্লাহর সামনে দাড়িয়ে একফোঁটা চোখের জল ফেলার সময় তোমার হয়না। আর দাঁড়ালেও সে সময় চোখের সমস্ত জল যেন কর্পূরের মত বাষ্প হয়ে উড়ে যায়!! এভাবে আর কতদিন বল? এখনি কি তোমার চেতনা হবে না নাকি আল কোরআনের ওই আয়াতের মত হবে তোমার অবস্থাঃ

" দুনিয়ায় বেশী বেশী এবং একে অপরের থেকে বেশী পাওয়ার মোহ তোমাদেরকে গাফলতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এমনকি তোমরা (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাও।"- সুরা আত তাকাসুরঃ ১-২

বল, আর কবে তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে? শেষ বয়সে? কিন্তু তুমি যে আর এক মুহূর্ত পরে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে এই নিশ্চায়তা তোমাকে কে দিল?

৮) শুরু হোক নতুন জীবন, নতুন অধ্যায়।

অতীতের ভুল ভ্রান্তির জন্যে পরম করুনাময় আল্লাহর কাছে তওবা করে,ক্ষমা চেয়ে আজ থেকে শুরু হোক নতুন জীবন। শুরু হোক নতুন করে চলার পথ, যে পথ শুধুই আলোয় ভরা, যে পথ শুধুই সাফল্যের, যে পথে ব্যর্থতার কোন হিসেব নেই, আল কোরআনই হবে যে পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ

“হে ঈমানদারগণ তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা করো, তাহলেই তোমরা কল্যান লাভ করতে পারবে।”- সুরা আন নূরঃ ৩১

“হে ঈমানদগন তোমারা আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা করো।”- সুরা আত তাহরীমঃ ৮

রাসুল(সাঃ) বলেনঃ

“আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি খুশি হন যার খাবার ও পানীয় সামগ্রী নিয়ে সাওয়ারী উটটি হঠাৎ গভীর মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুজির পর হতাশ হয়ে লোকটি একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এরূপ অবস্থায় হঠাৎ সে উটটিকে নিজের কাছে দাঁড়ানো দেখতে পেল। সে উটের লাগাম ধরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগলঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু!! সে অতিশয় আনন্দেই এই ভুল করে বসল।”- সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

“আবু হুরাইরা(রাঃ) বর্ণনা করেন আমি রাসুল(সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহর কসম! আমি একদিনে সত্তর বারের চেয়েও বেশি তওবা করি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।” -সহীহ আল বুখারী।

৯) শেষ কথাঃ

এই সুন্দর পৃথিবীতে কে একটু সুন্দরভাবে বাঁচতে না চায়। আমরা সবাই চাই কারো কাছে হাত না পেতে একটু স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচতে। আমরা সবাই চাই পৃথিবীতে আমাদের ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান থাকুক। তবে মনে রাখতে হবে তা যেন আখিরাতের সাফল্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে, আখিরাতকে বিনষ্ট করে নয়। আর প্রাণপণ চেষ্টা করলেই কি অঢেল ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান অর্জন করা যায়? আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ

" বলোঃ হে আল্লাহ! তুমিই বিশ্বজাহানের মালিক! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও । যাকে ইচ্ছা মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করো । সমস্ত কল্যাণ তোমরা হাতেই নিহিত । নিসন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান।"- সুরা আল ইমরানঃ ২৬

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ইসলাম, কোরআন-হাদিস বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পাত্র /পাত্রী চাই

13 September 2014

লেখকঃ বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব পেইজ

(এক)

“ভাই, আমার শালার জন্য একটা পাত্রী দরকার , আপনার জানা শোনা কেউ থাকলে বলবেন।” ।

“খালাম্মা , আপনার জানা শোনা কোন পাত্রী আছে, বিয়ে শাদী করবো ”

কোন বিবাহ করতে ইচ্ছুক যুবক বা বিবাহ দিতে ইচ্ছুক যুবক বা যুবতীর অভিভাভবকের কাছ এই টাইপের কথার সম্মুখীন মোটামুটি তরুণ থেকে শুরু করে মুরুব্বি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই হয়।

বিয়ে এবং বিয়ের ক্ষেত্র তৈরি সমাজ জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ।

আর উভয় পক্ষের আশা ভরসার প্রতীক ঘটক কিংবা মুখরা প্রাণচঞ্চল কোন আত্মীয়।

আবার কেউ কেউ একটু আগ বাড়িয়ে মিডিয়া বা দৈনিক পত্রিকার শরণাপন্ন হন।

একজন বিবাহযোগ্য পাত্রীর মধ্যে কি কি গুন তার ভালো পাত্রী হওয়ার মাপকাঠি?

এই একটি প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারলেই বের হয়ে যায় সমাজে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির আসল স্বরূপ।

যেহেতু আমাদের সমাজে একটি মেয়ে জন্মের পর থেকেই তাকে পাত্রস্থ করার জন্য তৈরি করা হয় সুতরাং সমাজের কাছে উপযুক্ত বিয়ের পাত্রীর আদর্শ মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় সমাজে নারীর অবস্থান , এই নারী স্বাধীনতার যুগে কোন পর্যায়ে আছে!

দৈনিক পত্রিকা সমূহে বিবাহ বিজ্ঞাপন পাত্র/ পাত্রী চাই এর উপর গবেষণা করেছেন ডক্টর কাবেরি গায়েন।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত ৪৪৬ টি বিবাহ বিজ্ঞাপনের উপর এই গবেষণা করেন তিনি। তার এই অসাধারণ গবেষণায় উঠে এসেছে সমাজে নারীর মূল্যায়নের এক বাস্তবিক উপাখ্যান।

গবেষণায় দেখা গেছে- সবচেয়ে কাঙ্খিত পাত্রী সে যার গায়ের রং ফর্সা। ৪৪৬ টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে ২২০ টি বিজ্ঞাপনে অর্থাৎ ৪৯.৩২ ভাগ বিজ্ঞাপনে সরাসরি ত্বকের রং ফর্সা উল্লেখ করা হয়েছে।

মাত্র ১৩ টি বিজ্ঞাপনে পাত্রী পক্ষ পাত্রীর শ্যামলা রঙ্গের কথা উল্লেখ করেছে।

সুন্দরী , প্রকৃত সুন্দরী, অসামান্য রূপসী, রূপসী, অপূর্ব সুন্দরী এইধরনের বিশেষণ ব্যবহার করে সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে ২২২ টি বিজ্ঞাপন, অর্থাৎ ফর্সার চেয়েও বেশী, ৪৯.৭৬% ভাগ বিজ্ঞাপনে।

অপরদিকে পাত্রী পক্ষ একটি মাত্র বিজ্ঞাপনে সুদর্শন পাত্র চেয়েছেন।

অর্থাৎ- পাত্রী এবং পাত্র পক্ষ নির্বিশেষে সকলেই মনে করে বিয়ের পাত্রীকে অবশ্যই সুন্দরী হতেই হবে, কিন্তু পুরুষের সৌন্দর্য নিয়ে অন্তত পাত্রী পক্ষের মাথা ব্যাথা নেই। মোট ৮৬ টি বিজ্ঞাপনে সরাসরি লম্বা স্লিম বিশিষ্টক ব্যবহার করা হয়েছে। যা দৈহিক সৌন্দর্যের একটি সূচক। শুধু তাই নয়, পাত্রীর কাঙ্খিত উচ্চতা ও বলে দেওয়া হয় ইঞ্চি ফুট সমেত।

আরেকটি সূচক স্বাস্থ্যবতী। অর্থাৎ কোনভাবেই মেয়েটির দৈহিক সৌন্দর্যের কোন দিকই যেন ভুলক্রমে বাদ না পড়ে তাই ৪৯.৭৬% বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যবতী মেয়ে চাওয়া হয়েছে।

৪৪৬ টি বিজ্ঞাপনের মাত্র ৪৪ টিতে ভদ্র নম্র মার্জিত পাত্রী চাওয়া হয়েছে, অবশ্যই সুন্দরীও হতে হবে সেই পাত্রীকে।

মোট ৪৮ টি বিজ্ঞাপনে ধার্মিক মেয়ে চাওয়া হয়েছে, যা শতকরার হিসেবে মাত্র ১০% !

১০০ বছর আগে এমা গোল্ডম্যানের একটি বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে-

পুরুষের আয় আর নারী সম্পর্কে সে দেখতে সুন্দর কিনা এর চেয়ে বেশী কি জানবার আছে?

গবেষণার সুবিধার জন্য যদিও সুন্দরী, ফর্সা, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী এসব ভাগে ভাগ করা হয়, কিন্তু মূলকথা একটাই দাড়ায়- সেটা হোল দৈহিক সৌন্দর্য

এগুলো ভাষার অলংকার, এই অলংকারকে তুলে নিলে যা থাকে তা হোল নারীর দেহ।

বিয়ের বাজারে নারী একধরণের পণ্য। এই পণ্যের দাম নির্ভর করে অন্য পণ্যের সাথে তুলনায় কতো সুন্দর সেই হিসেবে। আর যে ছেলের পকেট যতো ভারি, সে বাজার থেকে ততো বেশী টান দিতে পারবে সুন্দর পণ্যটি তুলে নিতে।

সবাই ফর্সা মেয়ে চায় কারন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকোপে ফর্সা মানেই সুন্দর এই ধারনা দেশে দেশে গেঁড়ে বসেছে।

সব সমাজেই দেখা যায় কালো মেয়েরা সামাজিক, পারিবারিক , রাজনৈতিক দিক থেকে অদৃশ্য, অথচ নির্যাতনের একদম কেন্দ্র বিন্দু। কাবেরি গায়েনের মতে- তারা সমাজের তলানি।

মলয় রায় চৌধুরীর মতে-" একটি পরিবার যতো ধনী হতে থাকে, তেমন তেমন ফর্সা নারীর সংখ্যা ও বাড়তে থাকে। কালো মেয়ের সংখ্যাধিক্য হয় দরিদ্র পরিবারে। ফর্সা মানে অভিজাত, কালো মানে অনভিজাত। ফর্সা মানে দেবী, আর কালো মানে অসুরকন্যা। সিনেমা থিয়েটারে কেনই বা কালো নায়িকা দরকার হলে ফর্সা সুন্দরী নায়িকাকে কালো রং মাখিয়ে নামানো হয়! কালোর কাছে ফর্সা হোল পিতৃতান্ত্রিক। "

(দুই)

এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো যে হয়ত ড্যাশিং সুন্দরী নন !

ভাই, আপনি মনজুড়ানো সুন্দরী বউ খুঁজছেন? এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো যে হয়ত ড্যাশিং সুন্দরী নন, অনেক বড় ঘরের নন, কিন্তু তিনি আল্লাহকে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সুরক্ষিত রাখেন, যিনি যেকোন মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন ও ভয় করেন, হয়ত জান্নাতে তার আদিগন্ত বিস্তৃত রাজত্ব থাকবে। আপনি কি দ্বীনদারী ভুলে কি রূপকেই হিসেব করছেন? এই ভুল করে জীবনভর আফসোস করতে রাজি তো?

বোন, আপনি খুব আরাম-আয়েশে থাকার জন্য বেশ ভালো সম্পদওয়ালা ছেলে খুঁজছেন? অনেক ঠকমকে-চকমকে প্রোফাইলের কাউকে খুঁজতে গিয়ে এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো যে হয়ত সাধারণ একটা জীবনযাপন করছেন, কিন্তু তিনি চরিত্রবান, তিনি ব্যবহারে কোমল এবং ইসলামকে ভালোবাসেন ও সেই মোতাবেক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত করতে চান। আখিরাতে তিনি জান্নাতে আল্লাহর কাছে পুরষ্কৃত হবেন, জান্নাতে তার বিশাল রাজত্ব থাকবে, হয়ত দুনিয়াতে নয়। চরিত্র আর সততা ফেলে কি সম্পদকেই মূল্য দিচ্ছেন? এই ভুল করে জীবনভর আফসোস করতে রাজি তো?

বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীই হোক আমাদের মুসলিমদের অন্তরের গভীর থেকে চাওয়া। মুখের মিষ্টি কথা হিসেবে নয়, প্রকৃত আর্জি হোক এটাই। আল্লাহ উত্তম সঙ্গী মিলিয়ে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

(তিন)

মনের মতন মানুষ খুঁজছেন বিয়ের জন্য?

আল্লাহ হয়ত আপনাকে এমন কাউকে দিবেন না যে নিপুণ, কেননা এমন মানুষ নেই পৃথিবীতে। আপনি যা চান, ঠিক তেমন মানুষ আপনি পাবেন এটাও অবাস্তব কেননা মানুষকে অর্ডার দিয়ে বানানো যায় না। কিন্তু আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে এবং আল্লাহ ও রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ অনুযায়ী একজন জীবনসঙ্গী খুঁজতে চেষ্টা করলে, হৃদয়টাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে রাখলে তিনি আপনাকে এমন কাউকে এনে দিবেন যে আপনার জন্য সবচেয়ে অসাধারণ।

ভেবে দেখুন, আপনি নিজেই কি নিখুঁত? আপনার দোষগুলো ভেবে দেখেছেন? সেগুলো আপনার *সবদিক দিয়ে পছন্দ* হওয়া মানুষটি কি সহ্য করতে পারবে? বরং, যিনি আপনাকে মেনে নিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সময়টুকু আপনার সঙ্গী হয়ে আখিরাতের অনন্তকালে আপনার সঙ্গী রয়ে যেতে চান -- তাকেই সবচেয়ে সুন্দর, আকর্ষণীয়, মনের মতন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করুন।

পৃথিবীতে জান্নাতের প্রয়োজনীয়তা দিয়ে ভরে ফেলবেন না। নিখুঁত, ঝামেলাহীন, যন্ত্রণাহীন, শান্তিই শান্তি -- এই বিষয়গুলো কেবল জান্নাতেই সম্ভব। বরং, আল্লাহকে ভালোবাসে, ইসলামকে জানা মাত্রই মানতে চায় এমন একজন জীবনসঙ্গী খুঁজে নিন এবং তার সাথে ক্ষণস্থায়ী এই অনিপুণতায় ভরপুর পৃথিবীর সময়টা কাটিয়ে নিপুণ জান্নাতে পা রাখতে চেষ্টা করুন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত দোয়া শোনেন। আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে চাইতে থাকুন, তিনি আপনাকে আপনার জন্যও শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার দিবেন। আল্লাহ আমাদের ভাই ও বোনদের উত্তম ও পবিত্র জীবন দান করুন।

(চার)

চরিত্রবান নেককার স্ত্রী হলো আপনার জীবনের কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ

সম্পদ কি তা কি সবাই বুঝি? পুরুষেরা অনেক সময় সম্পদ অর্জনের জন্য এখানে-ওখানে খুঁজে অস্থির হয়ে যায়, নিজ ঘরের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। টাকা-কড়িই কি কেবল সম্পদ? সেই সাথে বাড়ি-ঘর আর জমি-জমা-গাড়ি? শুধু

অর্থসম্পদ কি আপনাদের সন্তানদের সুসন্তান করে গড়ে তুলতে পারবে? সন্তানেরা কার তত্বাবধানে আর যত্নে বড় হয়, তা ভেবেছেন?

হে ভাই, জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপারে ভেবে দেখেছেন? একটা পরিবারে একজন নারী হলেন সংসারের স্থপতি, তার হাতের নিবিড় পরিচর্যায় বড় হয় আপনাদের সন্তানেরা, যখন আপনি জীবিকার কাজে বাইরে ব্যস্ত থাকেন তিনি আগলে রাখেন সংসারটিকে। তিনি আপনার চিন্তাগুলোর প্রভাবক -- ভালো চিন্তা হোক, ভুল চিন্তা হোক, দুনিয়াবী চিন্তা হোক, আখিরাতের চিন্তা হোক।

অল্প সম্পদকেও অনেক বেশি সম্পদ মনে হতে পারে যখন একজন ভাইয়ের জীবনসঙ্গিনী তার যা আছে সেগুলোতেই সন্তুষ্ট থেকে তাকে আল্লাহর উপরে ভরসা করে অর্থ উপার্জনের জন্য সাধ্যমতন চেষ্টাটুকু করতে উৎসাহ দিবেন। তখনই আপনার সবকিছু সুন্দর হবে, ছোট্ট ঘরটিকেও বড় মনে হবে, কষ্টের জীবনটিকেও আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা হিসেবে সহনীয় আর কল্যাণকর হিসেবে খুঁজে পাবেন যখন দ্বীনদার স্ত্রী আপনার সঙ্গী হবেন এবং আপনিও যখন দ্বীনদার স্বামী হিসেবে তার যোগ্য জীবনসঙ্গী হবেন।

প্রকৃত সম্পদ কী তা বুঝে নিতে তাই ভুল করবেন না যেন কখনো!! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

♥"সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ হল চরিত্রবান নেককার স্ত্রী।"♥

[মুসলিম]

পাঁচ.

***ওমর (রাঃ) -এর পুত্রের জন্য পাত্রী নির্বাচন !**

ওমর (রাঃ) জনসাধারণের সঠিক অবস্থা জানার জন্য রাত্রিতে ঘুরে বেড়াতেন। এক রাতে একটি ছোট্ট কুটিরের সামনে এলে তিনি বাড়ীর ভিতরের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। মা মেয়েকে আদেশ করছেন, 'দুধের সাথে পানি মিশাও। ভোর হয়ে এল'। মেয়েটি উত্তর দিল, 'না মা, ওমর (রাঃ) দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানতে পারলে শাস্তি দিবেন'।

মা বললেন, 'ওমর দেখতে পেলে তো'? মেয়ে বলল, 'আমি প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য করব, আর গোপনে তাঁর অবাধ্যতা করব? আল্লাহর কসম! এটা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে বলল, ওমর (রাঃ) হয়ত আমাদেরকে দেখছেন না, কিন্তু তাঁর প্রভু তো আমাদেরকে দেখছেন! গোপনে সব শুনে ওমর (রাঃ) বাড়ীটি চিহ্নিত করে ফিরে এলেন। পরে তার ছেলে আছেমের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ দিলেন। তার গর্ভে দু'টি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করল, যাদের একজনের গর্ভে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর জন্ম হয়েছিল (তারীখু মাদীনাতি দিমাশক ৭০/২৫৩)।

শিক্ষা : পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল গুণের উপর দ্বীনদারী ও আল্লাহভীরুতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ছয়. বিয়ের পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেছেনঃ দরিদ্র পাত্র ধনী পাত্র অপেক্ষা উত্তম যদি সে সৎ এবং নামাজী হয়। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে সে আপনাকে ভালোবেসে না হোক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও আপনাকে ঠকাতে পারবেনা। ভেবে দেখুন যদি আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ী গাড়ী সম্পদে ভাসিয়ে রেখে অন্যত্র প্রেম করে বেড়ায়, আপনি কি সুখী হবেন? অথচ অনেক দরিদ্র পরিবারেও দেখবেন বাজার থেকে বড় মাছ এনে স্বামী স্ত্রী মিলে যখন গল্প করতে করতে কাটেন সেখানে প্রেমের উৎসব বয়ে যায়।

–রেহনুমা বিনত আনিস

সাত.

পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ঃ

বিবাহঃ

শারীরিক, আর্থিক ও মানসিকভাবে সামর্থ্যবান হলে একজন মানুষকে বিবাহের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়। একজন মেয়ের জন্য আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়াটা প্রয়োজনীয় নয়। আর তখন পাত্রের জন্য প্রয়োজন হয় পাত্রী খুজে বের করার। পাত্রীর জন্যও খুঁজতে হয় পাত্র। এক্ষেত্রে অনেকেই অনেক জিনিস খেয়াল করেন। তবে মুস্‌লিম হিসেবে আমাদের বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে। নিচে একজন পাত্র বা পাত্রী দেখতে যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হবে তা তোলে ধরা হলঃ

পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ঃ

প্রথমেই যে জিনিসটি লক্ষ রাখবেন তা হল পাত্র/পাত্রী আল্লাহভীরু কিনা। কারণ যে মানুষ আল্লাহ্‌কে ভয় করেনা সে যেকোন খারাপ কাজ করতে পারে। যে তার সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করেনা, সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ মেনে চলেনা সে পৃথিবীর মানুষ আর তাদের বানানো আইন কানুন কি ভয় করবে? এজন্য অনেক সময়ই দেখা যায় লোকেরা স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, অন্য মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখে বিবাহের পর, স্ত্রীর প্রতি অমনোযোগী হয়, স্ত্রীর অধিকার প্রদান করে না। অনেক স্ত্রী আছে যারা বিবাহের পর স্বামীর অনুগত হয় না, স্বামীর সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে না, অন্য ছেলের সাথে সম্পর্ক গড়ে, স্বামীর অগোচরে অন্যায়ে লিপ্ত হয়। এসবের মুল কারণ তাদেরর মাঝে আল্লাহভীতি নেই। এজন্য তাকে তার স্ত্রী/স্বামী বা অন্য কেউ কোন খারাপ কাজ করতে দেখতে পাবে না বা কোন অন্যায় করলে পৃথিবীর আইন তাকে ধরতে পারবে না এই সুযোগ পেলেই সে যেকোন খারাপ কাজ করতে পারে। কিন্তু একজন আল্লাহভীরু মানুষের ক্ষেত্রে এরকম হওয়া অসম্ভব। (আল্লাহভীরু মানেই মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রী না। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখুন ইসলামের সকল বিধিবিধান পাত্র/পাত্রী মেনে চলছে কিনা।

অবশ্যই এমন একজন জীবনসঙ্গী খোঁজ করুন যে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কারণ আমাদের জীবন শুধু এই দুনিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। দুনিয়ার এই জীবনের পর আখেরাতের জীবনেও আপনার সঙ্গী হবে এমন সাথীর সন্ধান করুন।

একজন লোক হাসান বাস্‌রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন “আমি আমার মেয়েকে কার কাছে বিয়ে দেব?” আল-হাসান বলেন, “তার কাছে যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। যদি সে তাকে (স্ত্রী) ভালোবাসে তাহলে সে তাকে সম্মান করবে, আর যদি তাকে অপছন্দ করে তবে তার উপর জুল্‌ম করবে না।

পাত্র বা পাত্রীর যদি কোন খারাপ গুণ থাকে বা এমন যদি হয় আপনি বিশেষ কোন গুন চাইছেন পাত্র/পাত্রীর মাঝে কিন্তু আপনাকে বলা হল যে বিয়ের পর এটা ঠিক হয়ে যাবে। এমন কথায় ভরসা করে বিয়ে করলে ভুল হবে। মনে করুন আপনি চান পাত্র/পাত্রী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। কিন্তু সে এখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে না। আপনাকে জানানো হল বিয়ের পর সে নিয়মিত সালাত আদায় করবে। এমন কথায় কান দেবেন না। যে নিজেকে পরিবর্তন করেনি সে নিজেকে সহজে পরিবর্তন করতে পারে না। এক্ষেত্রে এমন পাত্র/পাত্রী খুঁজুন যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। হিজাবের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে একই নিয়ম। পরে সব টিক হয়ে যাবে এমন কথায় ভরসা করা বোকামি।

পাত্র/পাত্রীকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখুন। মেইক আপ করা অবস্থায় দেখলে প্রতারিত হতে পারেন। কারণ আজকাল এমনভাবেও মেইক আপ করা হয় যে মানুষের আসল চেহারাই পরিবর্তন হয়ে যায়।

নিজের আত্মীয়তা রক্ষা বা অন্য কোন কারণে চাপ প্রয়োগ করে বিবাহ করানো হতে বিরত থাকতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহের পর এসব কারণে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়,পাত্র/পাত্রীর পরিবার সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেয়া প্রয়জন। তাদের পরিবারের আদব কায়দার ব্যাপারে জেনে নিন। এক্ষেত্রে পরিবারের ছোট শিশুদের আচরণ লক্ষ করলে পরিবারের অন্যান্যদের আদব কায়দার ব্যাপারে ভালো ধারণা পাবেন।

একটি শিশুর একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজন একজন আদর্শ মা ও একজন আদর্শ বাবার। শিশুরা তাদের কাছ থেকেই বেশী শিখে। এক্ষেত্রে খেয়াল করুন পাত্র/পাত্রীর মাঝে পান/বিড়ি/সিগারেট/তামাক এসব সেবন করার বদ অভ্যাস আছে কিনা।

পাত্র কতটা মোটা আর শক্তিশালী সেদিকে খেয়াল না করে খেয়াল করুন পাত্র কতটা নম্র ও ভদ্র। অনেক মেয়েই বিবাহের পূর্বে পছন্দ করেন জিম করা বডি বিল্ডার টাইপ এর পাত্র। বিবাহের পর সে পাত্রের মাঝে নম্রতা না থাকার কারণে কথা বলতেও ভয় পান।

শারীরিক সৌন্দর্য্য কোন ব্যাপার না এমনটি নয়। তবে শারীরিক সৌন্দর্য্যই একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় নয়। পাত্রের মানসিকতা কেমন, ব্যবহার, চাল-চলন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী কেমন সেদিকে লক্ষ করুন। বিবাহের পর খারাপ ব্যবহার, কথাবার্তা যত সুন্দর মুখ থেকেই বেরিয়ে আসুক তা খারাপই লাগবে। তখন ভুল সংশোধনের পথ থাকবে না।

শুধু বিদেশী হলেই বিয়ে দিয়ে দিবেন না। আজকাল অনেক মেয়েদের বিদেশের মাটিতে নানান ধরণের নির্যাতনের শিকার হতে দেখা যায়। সেখানে অসহায়ের মত সবকিছু সহ্য করতে হয় তাদের।

বিদেশী পাত্র হলে ভালোভাবে খবর নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাদের স্ত্রী থাকা সত্তেও দেশে এসে দ্বিতীয় বিবাহ করে বা মধ্যপানের অভ্যাস সহ নানান ধরণের খারাপ কাজে নিমজ্জিত থাকে। আবার বিদেশী এমন অনেক পাত্রও আছেন যারা দেশী পাত্রদের তুলনায় শতগুণ ভালো।

অনেক ধনী পরিবার দেখে বিয়ে দিলেন মেয়েকে। এখন সে পরিবারের সাথে তাল মিলিয়ে আপনাকে চলতে হবে। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্টানে তাদের সাথে তাল মিলাতে গেলে আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আবার ধনী পাত্রিকে বিয়ে করলেও সমস্যা থেকে যায়। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে তো চলতে হবে। আর তাদের সাথে তাল মিলানো মানে

নিজের এক মাসের আয়ের টাকা দিয়ে তাদের একদিনের এক বেলার খাবারের আয়োজন করা। এজন্য সম্পর্ক করার আগে বুঝে নিন। আবার অনেক ধনী পরিবার আছে যাদের টাকা আছে অনেক কিন্তু তাদের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি একদম সাধারণ মানুষদের মত। এরকম হলে আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌ সম্পর্ক করতে পারেন।

আট .

পাত্র/পাত্রী দেখার বিধান -

সৎ ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করে বিবাহের পূর্বে পয়গাম পাঠানো। কোন বাহানা বা সুযোগে পাত্রী দেখা সম্ভব হলে, দেখে নেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটা করে* পাত্রী দেখানোর যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত তা সুন্নতের পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য। *[পাত্রি দেখতে গেলে পাত্র সহ বা পাত্র ছাড়া ছেলের বাবা, দুলাভাই, বড় ভাই, বন্ধু - সবাই মিলে পাত্রিকে দেখার প্রথাকে হারাম বলা হয়েছে।] (বুখারী হাদিস নং-৫০৯০, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪: ২০০)

বর্তমানে বিয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ সুন্নাত থেকে শত হাত দুরে থাকে! আচ্ছা মেয়ের বাবার বিবেকটা কি একটু কাজ করে না? পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে আপনি ইসলামের বিধান মানতে বাধ্য! দুলাভাই কেন আপনার হবু বউ কে দেখতে যাবে, আপনার বাবা যিনি তিনিও আপনার বিবাহের পাত্রী দেখার অধিকার রাখেনা! স্ত্রী এটাই ইসলামের বিধান। পাত্রী আপনাকেই দেখতে হবে, বিয়ে আপনি করবেন আপনার দুলাভাই করবে না বা আপনার বাবাও করবে না! বিয়ের উদ্দেশ্যে পাত্রী দেখতে পাত্র আসবে সে দেখার অধিকার রাখে কারণ বিয়েটা সে করবে, কিন্তু তার কাজিন, বন্ধু, মামা, খালু, চাচা কেন দেখবে? বিয়েতো পাত্র করবে, তার বাপ মা মামা/চাচাতো ভাই তারা তো করবে না?

অবশ্য পাত্রী দেখার খেত্রে উক্ত পাত্রের বোন/মা,খালা তারা দেখবে এটাই আমার ইসলাম অনুমোদন করে। সারা বছর আপনি মা হয়ে বাপ হয়ে মেয়েকে নন মাহরাম পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল রেখে পাত্রী দেখানোর নামে সবাইকে কেন আপনি অনুমোদন দিলেন?

ইসলাম এভাবেই নারীর সম্মান/ইজ্জতকে রক্ষা করেছে, মর্যাদা দান করেছে!

courtesy : (১) *সাফওয়ানা জেরিন,

(২,৩,)* সাফওয়ান

(৬) *রেহনুমা বিনত আনিস

(৭) ∗Chy Mohammad

(৮) ∗ রাশেদুর রহমান রিয়াদ

যদি সৎ চরিত্রের কোন নারী বা পুরুষকে জীবনে চান, নিজেকে শুধরে ফেলুন।

29 October 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

(এক)

কখনো ভেবে দেখেছেন আপনার স্ত্রীকে/স্বামীকে আপনি যেদিন বলবেন, "তুমি আমার জীবনের অনেক অপেক্ষার ফসল। তোমার সাথে মনের কথাগুলো বলব বলে সাজিয়ে রেখেছি অনেকগুলো বছর ধরে..."

আপনি কি জানেন বিবাহিত জীবনের কত বড় আত্মবিশ্বাস আপনাদের এই অন্তর ও শরীরের পবিত্রতাটুকু? যারা সৎ, তাদের আত্মবিশ্বাস দেখেছেন? তারা জানেন তাদের অর্জনটুকু কষ্টসাধ্য। তখন প্রিয়জনেরা তাদের প্রতি এমনিতেই অনেক বেশি আকর্ষণ অনুভব করেন। তারা জানেন, এই মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায়, এই মানুষটার প্রতি নির্ভর করা যায়।

যাদেরকে টেলিভিশনে দেখেন, পত্রিকায় দেখেন পণ্যের পাশের রূপ বেচতে, যারা ফেসবুকে ছবি আপলোড করে লোকের সস্তা কমেন্ট পেতে আনন্দবোধ করে -- তারা নিজেরাও নিজেদেরকে সস্তা করে ফেলে। নিজেকে তাদের তলে নিয়েন না, দূরে থাকুন।

আপনি আল্লাহর এক অমূল্য সম্পদ। ভুল করলে তাওবা করুন, আল্লাহকে বলুন তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন শরীর ও মনের পবিত্রতার জন্য। যদি সৎ চরিত্রের কোন নারী বা পুরুষকে জীবনে চান, নিজেকে শুধরে ফেলুন।

আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে কিন্তু অপবিত্র হৃদয়ের মানুষের হাতে তুলে দেন না। আপনি চরিত্র উত্তম না হলে আপনি কখনই এমন মানুষকে জীবনে পাবেন না যে আপনার চক্ষুশীতলতাকারী জীবনসঙ্গী হবেন। জীবন কিন্তু অনেক বড়। বিয়ে আপনার জীবনের অনেক বড় একটা ঘটনা। সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও আল্লাহকে পারবেন না কিন্তু...

চারিত্রিক স্বচ্ছতা দিয়ে আপনার স্বামী/স্ত্রীর কাছে আপনি যতটা প্রিয়/বিশ্বাসভাজন/অমূল্য হতে পারবেন-- লাখ লাখ টাকার বাড়ি-গাড়ি-গহনা দিয়েও তাকে মুগ্ধ করতে পারবেন না চরিত্রে আর নিয়াতে সমস্যা থাকলে। মনে রাখবেন, খারাপ লোকেরাও সৎ লোকের মূল্য বুঝে।

(দুই)

বিয়ের পরে দেখা গেলো মেয়ে পুরাই অন্যরকম তাহলে !

ভাই, বিয়ে করবেন শুনতেছি...

- হুমম।

- ভাই, আপনার ভয় লাগে না? আপনি যেমন চাইসেন, মেয়ে যদি তার পুরা উলটা হয়...

- ভয় দেখাইতে চাচ্ছ?

- না। বলতেসি আরকি। অনেক মানুষই নাকি যা দেখে বিয়ে করে, পরে নাকি দেখে অন্যরকম।

- আমি কি নিজের উপরে ভরসা করে স্ত্রী খুঁজবো?

- ভরসা আল্লাহর উপরে কে না করে?

- হয়ত সবাই করে। কিন্তু তোমার অন্তরের খবর তুমিই জানবা।

- ঠিকাছে ভাই, বুঝায় বলেন কেমনে আত্মবিশ্বাস পাইতেসেন।

- দেখো ভাই, সূরা ফুরকানে শেখা সেই দোয়াটা (রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিইয়্যাতিনা কুররাতা আ'ইয়ুনিন ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাকি'না ইমামা) আমি নিয়মিত পড়ি আর অন্তরেও অনুভব করি। অর্থাৎ,আমি একটা "কুররাতুল আ'ইন" আমার জীবনসঙ্গী চাই। এর মানে কিন্তু এমন না সুন্দরী, রূপসী, বংশীয়া, ডিগ্রিধারী... এর মানে এমন কিছু যে মানুষটার উপস্থিতি আমার চোখ শীতল করবে, অন্তরকে শান্তিতে ভরিয়ে দিবে। আর আমিও তার যোগ্য হতে নিজেকে "'মুত্তাকিনদের ইমামদের অন্তর্ভুক্ত" করে নিতে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি একই দোয়ায়। ছোটখাটো কীসের মাঝে আল্লাহ শান্তি মিলিয়ে দিবেন, সেইসবের মালিক তো আমি না। অন্তরের মালিক তিনি। দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিকও তিনি।

- ভাই, আপনার চেনাজানা তো কেউ নাই, এমন মেয়ে তাহলে কোথা থেকে পাবেন?

- আল্লাহর কাছে দোয়া করতেসি। দোয়া কেন বিফলে যাবে? এটা কোনদিন হতে পারে না। আমি কী করেছি, কী ভাবছি সবই আল্লাহ জানেন। আমার দায়িত্ব আমি তার হাতেই তুলে দিয়েছি, তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক। আমি আমার কাজটুকু করবো। দেখার সময় দ্বীনদার মেয়ে খুঁজবো। ইনশা আল্লাহ এটা ব্যাপার হবে না। আল্লাহর উপরে ভরসা করে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করলে কখনো কেউ বিফল হয় না।

- জাযাকাল্লাহ খাইর ভাই। অনেক কিছু শিখলাম। সাহস পেলাম।

যে মেয়েটিকে আশা করছেন তার জন্য নিজেকে পিউর করেছেন কি??

23 October 2014

লেখকঃ সাজিদ ইসলাম। সাফওয়ান।

এক।

প্লেট থেকে চানাচুর খেতে গেলে দেখবেন সবাই বেঁছে বেঁছে বাদাম খাওয়া শুরু করে। এটা একটা সহজাত প্রবৃত্তি। আপনি আমি সবাই একই___ বেঁছেবেঁছে বাদাম খাওয়া শুরু করি!

আমার এক বন্ধু একবার ঢাকায় আসলো। আমার হলে এসে আমার সাথে দেখা করল। জানালো তার এক আত্মীয় ঢাকা ভার্সিটির টিচার। আমাদের হলের পাশে টিচার্স কোয়ার্টারে থাকে। এই সেই কথা বলতে বলতে বলল, তার ঐ আত্মীয়ের নাকি একটা মেয়ে আছে খুব ভালো। বেশ ইসলামী মাইন্ডের, পর্দা করে। তার নাকি ওকে বিয়ে করার ইচ্ছে। মেয়ে পর্দা করে, ইসলামী মাইন্ডের, মেয়ে এই, মেয়ে সেই..... জিজ্ঞেস করলাম, what about you??আজ নামাজ পরেছিস?

না! তুই তো জীবনটাই কাটিয়ে দিলি মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে! এখন ফোন চেক করলে গোটা পঞ্চাশেক মেয়ের ফোন নাম্বার পাওয়াযাবে। ইসলাম তো প্র্যাকটিস করিস না! আমি তো জানি তুই কেমন। আর সেই তুই বিয়ের জন্য খুঁজছিস একটি সতী, ভালো, পর্দাশীল, ইসলামী মাইন্ডের মেয়ে.....

রাস্তার ফকির থেকে কোট টাই এর সাহেব সবারই চানাচুরের প্লেট থেকে বাদাম খাওয়ার স্বভাব। সবাই নিজের জন্য ভালো, উত্তম বিষয়টা চায়। কিন্তু একটিবারও চিন্তা করেনা সে ওটা deserve করে কিনা! সারাজীবন মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে, গার্লফ্রেন্ডের পর গার্লফ্রেন্ড মেইনটেইন করে, অন্ধকার ঝোপ ঝাড়ের যাবতীয় সুযোগ কাজে লাগিয়ে, নিজের ক্যারেক্টার ঠিক না রেখে বিয়ে করার সময় ঠিকই খুজবে ভদ্র, নম্র, পর্দাশীল, নামাজ দোয়া পড়া, কোনদিন ছেলেদের সাথে মিশেইনি এমন সৎ মেয়ে!!

যোগ্যটা বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এজন্যই যে এটা অর্জন করতে হয়! প্রেম প্রেম খেলা করে বেড়ানোর জন্য হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেটাই কাজে লাগাতে পারে কিন্তু বিয়ে করতে গেলে পিউর জিনিস লাগবে?? যে মেয়েটিকে আশা করছেন তার জন্য নিজেকে পিউর করেছেন কি?? ভালো মানুষসাজতে ১২ টাকা লাগে। ৭ টাকার আতর, পাঁচ টাকার টুপি। কিন্তু সত্যিকারের ভালো মানুষ হতে এক টাকাও লাগেনা। মনের পরিশিদ্ধি, চিন্তার পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র প্রতি সততা, তাকওয়া, ইখলাস এসবের পেছনে কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করা লাগেনা। বিয়ের মত একটি বিষয়ে সততার পরিচয় দেওয়া উচিত। পাশের মানুষটিকে পিউর হিসেবে পেতে গেলে আগে মানুষটির পাশে নিজেকে পিউর হিসেবে উপস্থাপন জরুরী! সরবত মিষ্টি হয় চিনির গুণে। কিন্তু চিনির সাথে বালি মিশিয়ে দিলে সেই সরবতটাই খাওয়া যায়না। নিজের মনে ধূলা বালির আবর্জনা রেখে যত চিনিই ঢালেন না কেন কোনদিন সরবত বানাতে পারবেন না। বিষয়টা মাথায় রাখা জরুরী, খুবই জরুরী!

দুই।

*** তাকওয়া-ওয়ালী বউ চাইলে কি পাওয়া যায়?**

আনম্যারিড ভাইয়া ও আপু, আপনাদেরকে বিশেষভাবে বলছি!

বিয়ের উপর বিভিন্ন লেখাগুলো মুসলিম নামের ভাইবোনেরা শেয়ার করেন তা দেখতে ভালো লাগে। শেয়ার করার সময় অনেকে দোয়া করেন "হে আল্লাহ আমাদের তাকওয়া-ওয়ালী বউ/তাকওয়া-ওয়ালা জামাই দাও" তা বেশ চমৎকার। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা উচিত, তাকওয়ার প্রকাশ আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। তাকওয়া দরকার আমাদের প্রোফাইল পিকচারে/কাভার ফটোতেও।

কেট-উইন্সলেট-লিওনার্দো ডি-ক্যাপ্রিও, শাহরুখ-ঐশ্বরিয়া, টুইলাইট সিনেমার নায়ক-নায়িকার ছবি লাগিয়ে আমরা আসলে আমাদের পাপের ভাগ বাড়িয়ে চলেছি নিয়মিত। ফেসবুকে মেয়ে হয়ে ছেলেদের সাথে এবং ছেলে হয়ে মেয়েদের সাথে পর্দা করার বিষয়টাও তাকওয়ার অন্তর্গত। অযথা কারো সাথে এমন কোন কমেন্টিং করতে যাওয়া ঠিক নয় যা আপনি রিয়েল-লাইফে করাটা অপছন্দ/ভয় করতেন। আপনার পোস্ট/কমেন্ট/লাইক কিন্তু সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে অজস্র মানুষ দেখছে, তারাও অনুপ্রাণিত হচ্ছে, পাপে উৎসাহী না হলেও পাপকে দেখে তাদের পাপ হচ্ছে -- যার দায়ভার আপনি এড়াতে পারবেন না। বেগানা নারীর ছবিতে লাইক ও ছবি আপলোডেও সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন। আপনার শেয়ার করা ছবি যতজন দেখবে, ততজনের পাপের ভাগীদার আপনাকে হতেই হবে। ফেসবুকে আপনার শেয়ার থেকে এমন কেউ শেয়ার করে ফেলতে পারে যা হয়ত সেলেব্রেটিরা শেয়ার করবে কিংবা ওয়েবসাইটে কেউ আপলোড করবে। আপনি তখন আপনার একাউন্টে পাবেন বছরের পর বছর পাপের একটানা সার্ভিস।

উত্তম জীবনসঙ্গী কেবল মুখের কথা নয়। বরং তাহাজ্জুদে ও দোয়াতে প্রচুর পরিমাণ কান্না এবং জীবনের প্রতিটি মূহুর্ততে আল্লাহকে ভয় করে চরিত্রকে সঠিক থাকার চেষ্টা করার পরেই তা আশা করা উচিত। আল্লাহ সমস্ত দু'আ শোনেন, তবে যারা তার উপরে বিশ্বাস রাখে ও তার সন্তুষ্টি পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন। আল্লাহকে ভয় করে আমাদের প্রতিটি মূহুর্ত কাটুক, তার ভালোবাসার আশা হোক আমাদের উদ্দীপনা।

তিন - বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীই হোক আমাদের মুসলিমদের অন্তরের গভীর থেকে চাওয়া

ভাই, আপনি মনজুড়ানো সুন্দরী বউ খুঁজছেন? এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো যে হয়ত ড্যাশিং সুন্দরী নন, অনেক বড় ঘরের নন, কিন্তু তিনি আল্লাহকে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সুরক্ষিত রাখেন, যিনি যেকোন মানুষের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন ও ভয় করেন, হয়ত জান্নাতে তার আদিগন্ত বিস্তৃত রাজত্ব থাকবে। আপনি কি দ্বীনদারী ভুলে কি রূপকেই হিসেব করছেন? এই ভুল করে জীবনভর আফসোস করতে রাজি তো?

বোন, আপনি খুব আরাম-আয়েশে থাকার জন্য বেশ ভালো সম্পদওয়ালা ছেলে খুঁজছেন? অনেক ঠকমকে-চকমকে প্রোফাইলের কাউকে খুঁজতে গিয়ে এমন কাউকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো যে হয়ত সাধারণ একটা জীবনযাপন করছেন, কিন্তু তিনি চরিত্রবান, তিনি ব্যবহারে কোমল এবং ইসলামকে ভালোবাসেন ও সেই মোতাবেক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালিত করতে চান। আখিরাতে তিনি জান্নাতে আল্লাহর কাছে পুরষ্কৃত হবেন, জান্নাতে তার বিশাল রাজত্ব থাকবে, হয়ত দুনিয়াতে নয়। চরিত্র আর সততা ফেলে কি সম্পদকেই মূল্য দিচ্ছেন? এই ভুল করে জীবনভর আফসোস করতে রাজি তো?

বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীই হোক আমাদের মুসলিমদের অন্তরের গভীর থেকে চাওয়া। মুখের মিষ্টি কথা হিসেবে নয়, প্রকৃত আর্জি হোক এটাই। আল্লাহ উত্তম সঙ্গী মিলিয়ে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

চরিত্রবান নেককার স্ত্রী হলো আপনার জীবনের কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ

4 November 2014

সংকলনে - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক।

এক.

***একজন দ্বীনদার স্ত্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত**

সাইফুল্লাহ সাহেবকে তার স্ত্রী ডাকছেন , এই উঠো ! ফজরের আযান হচ্ছে ।

চোখ কচলাতে কচলাতে সাইফুল্লাহ সাহেব ঘুম থেকে উঠে বসে প্রথমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেই চোখ চলে যায় ক্লোরে । জায়নামায বিছানো দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠেন । স্ত্রীকে বলেন , তুমি তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে আর ঘুমাও নি? স্ত্রী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ না ।

সাইফুল্লাহ সাহেব আর কিছু না বলে খাট থেকে নামতেই স্ত্রী বলে উঠেন , বাথরুমে তোমার জন্য গরম পানি রাখা আছে । উযু করে নাও এবং সুন্নাত বাসায় পড়ে ফরজটা মসজিদে । সাইফুল্লাহ সাহেব মুচকি হেঁসে জাযাকাল্লাহু খাইরান বলে দ্রুত বাথরুমে চলে গেলেন । মসজিদ থেকে এসে দেখেন স্ত্রী কুরান পড়ছে ।

সাইফুল্লাহ সাহেব ১০ টার দিকে অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন । স্ত্রী অফিসের ব্যাগটা গুছিয়ে দিলেন । যথারীতি আজকেও বিদায় নেয়ার সময় দুজন একসাথে সালাম দিতে গিয়ে মুচকি হেসে দিলেন ।

অফিস পথে সাইফুল্লাহ সাহেব জ্যামে পড়লেন । ভাবছেন , একজন দ্বীনদার স্ত্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত । বিয়ে করার পর থেকে প্রতিদিন স্ত্রী আমাকে তাহাজ্জুদ পড়তে ডেকে দেয় । বিয়ের পর থেকে স্ত্রীর জন্য জামায়াতেও নিয়মিত নামায পড়া হয় । এগুলো ভাবতে ভাবতে হটাত স্ত্রীর কথা খুব বেশি মনে পড়লে স্ত্রীকে একটা কল দেয় । এবারো যথারীতি দুজন একসাথে সালাম বিনিময় করে । বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর সালাম বিনিময় করে কল কেটে দেয় । কথা বলা শেষে সাইফুল্লাহ সাহেব আবার ভাবনায় পড়লেন । আলহামদুলিল্লাহ বলে মনে করলেন নিজের সে দুয়ার কথা যা তিনি নিয়মিত করতেন । দুয়াটি বিড় বিড় করে আবার পড়লেন-

" হে আল্লাহ ! আমাকে উত্তম চরিত্র দান কর । আমার তাকওয়া বৃদ্ধি করে দাও । হারাম থেকে বাঁচিয়ে হালাল রোজগার দিয়ে আমার রিযিক প্রশস্ত করে দাও । হে আল্লাহ ! আমাকে একজন উত্তম স্ত্রী দান কর । আমার জন্য তুমি যাকে রেখেছো তাকে তুমি উত্তম চরিত্র দান কর । তাকে বিপদ-দুশ্চিন্তা থেকে তুমি মুক্তি দাও । তার জীবনকে তুমি সুন্দর করে দাও । তাকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। হে আল্লাহ ! আমাকে হিদায়াহ'র উপর মৃত্যু দান কর। আমি একমাত্র তোমার উপরেই ভরসা রাখি"

নিজের নিয়মিত করা দুয়া মনে মনে পড়ে সাইফুল্লাহ সাহেব খুশি মনে আলহামদুলিল্লাহ বলেন উঠলেন এবং প্রমাণ পেলেন পূর্ণ ভয় করে আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে আল্লাহ বান্দাকে নিরাশ করেন না ।

অফিসের কাজকর্ম সব শেষ । এখন বাসায় ফিরবেন । তার আগে প্রতিদিনের মত ফুলের দোকানে যাবেন স্ত্রীর জন্য ফুল আনতে । যথারীতি ফুল কিনলেন । আজ কেন জানি সাইফুল্লাহ সাহেব অনেকগুলো ফুল কিনেলন । বাসার সামনে এসে দরজা নক করলেন । স্ত্রীর দরজা খুলতেই যথারীতি দুজন আবার একসাথে সালাম বিনিময় করলেন । সাইফুল্লাহ সাহেব স্ত্রীকে বললেন , তুমি কি আমাকে কখনো আগে সালাম দিতে দিবে না ? স্ত্রীও একই প্রশ্ন করলেন । তারপর সাইফুল্লাহ সাহেব পেছন থেকে অনেকগুলো ফুল স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলেন , আই লাভ ইউ ফর দ্য সেইক অফ আল্লাহ । স্ত্রীও বললেন , লাভ ইউ টু ফর দ্য সেইক অফ আল্লাহ ।

এই হচ্ছে প্রেম । হালাল প্রেম এবং কাছে আসার গল্প । যেখানে নাই কোন নোংরামি, নাই কোন অশান্তি , নাই কোন আল্লাহর অবাধ্যতা । যেখানে আছে শুধু , সুখ আর শান্তি যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত । আলহামদুলিল্লাহ ।

- আব্দুল্লাহ

দুই.

***চরিত্রবান নেককার স্ত্রী হলো আপনার জীবনের কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ**

সম্পদ কি তা কি সবাই বুঝি? পুরুষেরা অনেক সময় সম্পদ অর্জনের জন্য এখানে-ওখানে খুঁজে অস্থির হয়ে যায়, নিজ ঘরের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। টাকা-কড়িই কি কেবল সম্পদ? সেই সাথে বাড়ি-ঘর আর জমি-জমা-গাড়ি? শুধু অর্থসম্পদ কি আপনাদের সন্তানদের সুসন্তান করে গড়ে তুলতে পারবে? সন্তানেরা কার তত্বাবধানে আর যত্নে বড় হয়, তা ভেবেছেন?

হে ভাই, জীবনসঙ্গিনীর ব্যাপারে ভেবে দেখেছেন? একটা পরিবারে একজন নারী হলেন সংসারের স্থপতি, তার হাতের নিবিড় পরিচর্যায় বড় হয় আপনাদের সন্তানেরা, যখন আপনি জীবিকার কাজে বাইরে ব্যস্ত থাকেন তিনি আগলে রাখেন সংসারটিকে। তিনি আপনার চিন্তাগুলোর প্রভাবক -- ভালো চিন্তা হোক, ভুল চিন্তা হোক, দুনিয়াবী চিন্তা হোক, আখিরাতের চিন্তা হোক।

অল্প সম্পদকেও অনেক বেশি সম্পদ মনে হতে পারে যখন একজন ভাইয়ের জীবনসঙ্গিনী তার যা আছে সেগুলোতেই সন্তুষ্ট থেকে তাকে আল্লাহর উপরে ভরসা করে অর্থ উপার্জনের জন্য সাধ্যমতন চেষ্টাটুকু করতে উৎসাহ দিবেন। তখনই আপনার সবকিছু সুন্দর হবে, ছোট্ট ঘরটিকেও বড় মনে হবে, কষ্টের জীবনটিকেও আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা হিসেবে সহনীয় আর কল্যাণকর হিসেবে খুঁজে পাবেন যখন দ্বীনদার স্ত্রী আপনার সঙ্গী হবেন এবং আপনিও যখন দ্বীনদার স্বামী হিসেবে তার যোগ্য জীবনসঙ্গী হবেন।

প্রকৃত সম্পদ কী তা বুঝে নিতে তাই ভুল করবেন না যেন কখনো!! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

♥"সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ হল চরিত্রবান নেককার স্ত্রী।"♥

[মুসলিম]

তিন .

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

“চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ তার ধন সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়নতা। এক্ষেত্রে ধর্মপরায়ন স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও, তোমার হাত কল্যাণে ভরে যাবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

* রিয়াদুস সালেহীন – ৩৬৫

নেককার নারীর কিছু গুণ

4 November 2014

লেখকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আনসারুল্লাহ হাসান - মাসিক আল কাউসার।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) পুরুষ নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এ কারণে যে, পুরুষগণ নিজেদের অর্থসম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে। পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর হিফাজতে (তার অধিকারসমূহ) হেফাযত করে।-সূরা নিসা : ৩৪

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে নেককার স্ত্রীর কিছু গুণাবলি পেশ করছি।

প্রথম গুণ : উক্ত আয়াতে নেককার নারীর প্রথম গুণ বলা হয়েছে, সতী-সাধ্বী ও দ্বীনদার হওয়া। সালিহাত শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেছেন, দ্বীনের সঠিক অনুসারিনী, সৎকর্মশীল নারীগণ।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পার্থিব জগতটাই হল ক্ষণিক উপভোগের বস্ত। আর পার্থিব জগতের সর্বোত্তম সম্পদ (উপভোগের বস্ত) সাধ্বী নারী। -সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৬৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৫৬৭; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৪০৩১

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুমিনের জন্য আল্লাহর তাকওয়া অর্জনের পর নেককার স্ত্রীর চেয়ে কল্যাণকর কিছু নেই। কারণ স্বামী তাকে আদেশ করলে সে

আনুগত্য করে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে (স্বামী) মুগ্ধ হয়। তাকে নিয়ে শপথ করলে সে তা (শপথকৃত কর্ম) পূরণ করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে (অন্যায়-অপকর্ম থেকে) এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করে। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৫৭

হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সোনা-রুপা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন ধরনের মাল সঞ্চয় করব? তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন সঞ্চয় করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী মুখ এবং পরকালীন কর্মকান্ডে সহায়তাকারিনী মুমিনা নারী। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩১০১; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০৯৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৫৬

দ্বিতীয় গুণ : স্বামীর অনুগত ও বিশ্বস্ত হওয়াকে উক্ত আয়াতে নেককার নারীর দ্বিতীয় গুণ বলা হয়েছে।

কানিতাত শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা ও স্বামীর অনুগত নারীগণ। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে তখন তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬৬১; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৪১৬৩

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, নারীদের মধ্যে কোন নারী উত্তম। তিনি বললেন, স্বামী যাকে দেখলে আনন্দবোধ করে, যাকে আদেশ করলে আনুগত্য করে, স্ত্রীর বিষয়ে এবং সম্পদের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তা থেকে বিরত থাকে। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭৪২১; সুনানে নাসায়ী, কুবরা, হাদীস : ৮৯৬১

তৃতীয় গুণ : উক্ত আয়াতে নেককার নারীর তৃতীয় গুণ বলা হয়েছে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ধন-সম্পদ হেফাযত করবে এবং নিজের সতীত্বের হেফাযত করবে।

আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, নারীগণ তাদের স্বামীর অবর্তমানে নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের খেয়ানত করবে না। স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করবে। তাদের উপর এ দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকেই আরোপিত।

এ সম্পর্কিত হাদীস শরীফের বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসসমূহে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উত্তম স্ত্রী সে, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তোমাকে আনন্দিত করে, আদেশ করলে আনুগত্য করে, তুমি দূরে থাকলে তার নিজের ব্যাপারে এবং

তোমার সম্পদের ব্যাপারে তোমার অধিকার রক্ষা করে। তারপর তিনি কুরআনের উক্ত আয়াত (পুরুষ নারীদের অভিভাবক) তেলাওয়াত করেন। -তাফসীরে তবারী, হাদীস : ৯৩২৯; মুসনাদে ত্বয়ালিসী, হাদীস : ২৩২৫

চতুর্থ গুণ : পবিত্র ও চরিত্রবান হওয়া।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) পবিত্র নারীগন পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের উপযুক্ত। এখানে মুমিন নর-নারীর জন্য মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের মাঝে যোগসূত্র রেখেছেন। পবিত্র ও চরিত্রবান নারীদের আগ্রহ পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষদের প্রতি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষদের আগ্রহ পবিত্র ও চরিত্রবান নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী সেটাই বাস্তবরূপ লাভ করে। এ জন্য জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিতে জোর তাকিদ দিয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন গুণের যেকোনো একটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয় : ধন-সম্পদের কারণে, রূপ-সৌন্দর্যের কারণে ও দ্বীনদারির কারণে। তুমি দ্বীনদার ও চরিত্রবানকেই গ্রহণ কর। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ১৭৪৩৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১১৭৬৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৪০৩৪

পঞ্চম গুণ : বিবাহের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পন্ন হওয়া, গোপনে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে লিপ্ত না হওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চারিত্রিক পবিত্রতাসম্পন্ন হবে, ব্যভিচারিনী হবে না এবং গোপনে কোনো অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারিনী হবে না। -সূরা নিসা : ২৫

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আববাস রা. বলেন, চারিত্রিক নিষ্কলুষতার অধিকারিনী নারীগণ, যারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ব্যভিচারিনী হবে না এবং সঙ্গোপনে অবৈধ বন্ধু গ্রহণকারিনী হবে না। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে হারাম মনে করত, কিন্তু গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে হালাল মনে করত। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন, তোমরা প্রকাশ্যে হোক, অপ্রকাশ্যে হোক কোনো রকম অশ্লীল কাজের নিকটেও যেও না। -সূরা আনআম : ১৫১; তাফসীরে তবারী, হাদীস : ৯০৯৫, ৯০৭৬, ৪/২২

বর্তমান সমাজে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাধি মহামারিতে পরিণত হয়েছে। পর্দাহীনতা, সহশিক্ষা এবং অশ্লীল ফিল্ম ও ছবির বদৌলতে একদিকে অবিবাহিত উঠতি নর-নারী তথাকথিত প্রেমের নামে ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ্য অশ্লীলতায় মেতে উঠছে,

অন্যদিকে পরকীয়া প্রেমের কারণে ঘর ভাঙছে অসংখ্য নারীর। তাই মুসলমান নর-নারীরা যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলবে ততক্ষণ পারিবারিক শান্তি ও দাম্পত্য জীবনের সুখ খুঁজে পাবে না।

ষষ্ঠ গুণ : দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়ার সাথে সাথে সরলমতী ও সাদাদিলের অধিকারিনী হওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) চরিত্রবান, সরলমতী ঈমানদার নারীগণ। -সূরা নূর : ২৩

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, যারা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন (বহু দূরত্বে অবস্থানকারী)।

আল্লামা আলুসী রাহ. বলেন, পবিত্রতার সার্বিক উপাদান নিয়ে বেড়ে উঠা এবং উত্তম চরিত্রের উপর লালিত-পালিত হওয়ার কারণে অন্য কোনো চিন্তা ও মানসিকতা যাদের কল্পনায় আসে না। এই গুণ পূর্ণ নিষ্কলুষতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার প্রমাণ বহন করে, যা শুধু মুহাসানাত (সতী নারী) শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় না। -রুহুল মাআনী ৬/১২৬

অন্য কিতাবে বলা হয়েছে, আত্মার ব্যাধিমুক্ত, স্বচ্ছ অন্তরের নারীগণ, যাদের মধ্যে প্রবঞ্চনামূলক চাতুর্য নেই। যাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে অসৎ কোনো মনোবাসনা নেই। শৈশবকাল থেকেই এই স্বভাব-সুচরিত্র গড়ে উঠতে সহায়ক হয়। -গারায়েবুল কুরআন ৫/১৭৩

আল্লাহ তাআলা এ ধরনের গুণের অধিকারিনী নারীকে ঈমানদার পরিচয়ে ভূষিত করেছেন।

এই বৈশিষ্ট্যের নারীদের বাইরের জগত সম্পর্কে ধারণা থাকে না, অবৈধ সম্পর্কের কল্পনাও তাদের অন্তরে থাকে না। তারা প্রবঞ্চনা কি জিনিস বুঝেই না। ছল-ছাতুরি জানে না। প্রতারণা ও মিথ্যা বলে না। পর্দাহীনতা ও ফ্যাশন সম্পর্কে চিন্তাও করে না। ফলে তাদের চরিত্র কলুষিত হওয়া ও দ্বীনদারী বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না।

সপ্তম গুণ : গৃহে অবস্থান করা। অপ্রয়োজনে বাইরে না যাওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো। (পর পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না। যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত। -সূরা আহযাব : ৩৩

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর রাহ. বলেন, তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থানকে অবধারিত করে নাও। প্রয়োজন ব্যতীত ঘর হতে বের হয়ো না।

এ আয়াতে স্পষ্ট করে মূলনীতি বলা হয়েছে যে, নারীর আসল কাজ তার গৃহে অবস্থান। ঘরোয়া কর্তব্য পালন করা এবং খান্দানকে গড়ে তোলাই তার মূল দায়িত্ব। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায় তা নারীজীবনের মৌল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এবং তা দ্বারা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়; বরং প্রয়োজনে সে পর্দার সাথে বাইরে যেতে পারবে। তবে বাইরে গমন ও অবস্থান শুধু প্রয়োজনবশত ও প্রয়োজন পরিমাণ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট আগমন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও অন্যান্য মর্যাদায় অগ্রগামী হয়েছেন। আমাদের জন্য কি এমন কোনো আমল রয়েছে যার মাধ্যমে মুজাহিদীনের সমপর্যায়ের মর্যাদা ও সওয়াবের অধিকারী হতে পারব?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের থেকে যারা নিজ গৃহে অবস্থান করবে সেটাই তাদেরকে মুজাহিদদের ফযীলত ও সওয়াবে উপনীত করবে। –মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৬৯৬১; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৭৬৮

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নারী হল আবরণীয়। যখন সে বের হয় শয়তান তার অনুসরণ করে। যখন সে ঘরে আবদ্ধ থাকে তখন আল্লাহর রহমত লাভের অতি নিকটবর্তী থাকে। –মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২০৬১

প্যাকেট না প্রোডাক্ট?

16 September 2014

লেখকঃ **রেহনুমা বিনতে আনিস**

আপনি কি প্যাকেট দেখে জিনিস কেনেন না প্রোডাক্ট দেখে?

মানে? ধরুন, আপনি নারকেল তেল কিনবেন। আপনি কি তেলের গুণগত মান দেখে- অর্থাৎ এই তেলে আপনার মাথা ঠান্ডা এবং চুল লম্বা ও ঝরঝরে হবে কি'না সেটা বিবেচনা করে তেল কিনবেন, নাকি তেলের বোতলটি কতখানি সুন্দর ও আকর্ষণীয় তা দেখে তেল নির্বাচন করবেন? হাস্যকর মনে হচ্ছে? অথচ এই হাস্যকর কাজটিই আমরা করে থাকি অহরহ।

আমাদের যুগের একটি গুরুতর সমস্যা হল বাহ্যিক সৌন্দর্যপ্রীতি। সুন্দর জিনিস সবার ভালো লাগে, লাগাটাই স্বাভাবিক, এতে দোষের কিছু নেই। এটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তখনই যখন কোন বস্তুর মূল্যায়নে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রাইটেরিয়া হয়ে দাঁড়ায়, যখন এর তুলনায় আর সকল বিচার বিবেচনা সচেতনতা ব্যাকসিটে স্থান পায়। এই অতিরিক্ত সৌন্দর্যপ্রীতির কারণে আমরা অনেক দাম দিয়ে ভেজাল পটেটো চিপ্স কিনে বাচ্চাদের কচি মুখে তুলে দেই অথচ বাসায় ক'টা তাজা আলু কেটে তেলে ভেজে দেইনা, অনেক দাম দিয়ে লাল টুকটুকে আপেল কিনে আনি যদিও তার ভেতরটা হয় পঁচা পোকায় খাওয়া অথচ এর চেয়ে তিনগুণ পুষ্টিমানসম্পন্ন তাজা পেয়ারা অনাদরে পড়ে থাকে বাজারের ঝাঁকায়। খাঁটি জিনিসের মূল্যায়নের এই যোগ্যতা এবং মানসিকতার বিলোপ এখন আর কেবল বস্তুগত নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সীমিত নেই বরং আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা শুধু বাহ্যিক দিক দেখে বিবেচনার ফলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

যেমন ধরুন, যখনই কোন ছেলে বা মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র বা পাত্রী দেখা হয়- কোন কিছু জানার আগেই প্রশ্ন আসে,

মেয়েটি দেখতে কেমন এবং ছেলে কি করে?

একটু ভেবে দেখুন তো, জীবনের বন্ধুর পথে পরস্পরের হাত ধরে চড়াই উৎরাই পেরোবার জন্য এর কোনটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক জরীপসমূহের ফলাফলে দেখা যায় বৈবাহিক জীবনে সুখের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের ভূমিকার আয়ু বড়জোর ছ'মাস থেকে একবছর।

তারপরে সম্পর্ক টিকে থাকে স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং গুণাবলীকে কেন্দ্র করে নতুবা স্বামীর সহনশীলতা এবং মানবিক গুণাবলীকে অবলম্বন করে ।

আপনারা কি কখনো দেখেননি পরীর মত সুন্দরী বৌটাকে একবছর দু'বছরের মাথায় মুটিয়ে, মেদবহুল চামড়া ঝুলে পড়ে অন্যরকম হয়ে যেতে?

অথবা কালো বৌটিকে ফর্সা সুন্দরী হয়ে যেতে? চাকরী, ব্যাবসা, পয়সা? হতেও দেরী নেই, যেতেও দেরী নেই। অনেক বড়লোক মানুষকে মূহূর্তে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবার ঘটনা নিজ চোখে না দেখলেও শোনেননি বা জানেননা এমন মানুষ কমই আছে।

জীবনে চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু শুধু পয়সা দিয়ে যদি ভালোবাসা কেনা যেত তাহলে পৃথিবীর সব বড়লোকরাই সুখী বিবাহিত জীবন যাপন করতেন- এটি যে বস্তুত ঘটেনা তার ভুরি ভুরি উদাহরণ তো আপনারা সবাই জানেন।

তাহলে ভাবুন আমরা কত ঠুনকো কতগুলো বিবেচনার ওপর আমাদের সুখ, শান্তি, স্বস্তি, সাফল্য, ব্যর্থতা, বাবামা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সন্তানদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখি!

আল্লাহ বলেছেন, "**And among His Signs is this, that He created for you mates from among yourselves, that you may dwell in tranquillity with them, and He has put love and mercy between your (hearts): verily in that are Signs for those who reflect.**" (সূরা রুমঃ আয়াত ২১)। তিনি আমাদের জন্য এমন সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যার মাধ্যমে আমরা শান্তি স্বস্তি ভালোবাসা পেতে পারি যা আমাদের পার্থিব জীবনকে অর্থবহ করবে এবং পারলৌকিক জীবনকে করে তুলবে সম্ভাবনাময়। এখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে দু'টি হৃদয়ের মাঝে সৃষ্ট বন্ধনের সাহায্যে শান্তি পাবার কথা বলা হয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে কিছু পেতে হলে তাঁর নির্দেশিত পথ অনসরণ করতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামের একটি মূখ্য নীতি হোল পর্দাঃ "**Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them: And Allah is well acquainted with all that they do. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or the slaves whom their right hands possess, or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of the shame of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornaments. And O you Believers! turn you all together towards Allah, that you may attain Bliss.**" (সূরা নূরঃ আয়াত ৩০-৩১)। এখানে আগে পুরুষদের

পর্দার কথা বলা হয়েছে, অতঃপর মহিলাদের। ইসলাম চায় যেন একটি মেয়ে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে বিবেচিত না হয়ে তার স্বীয় গুণাবলীতে উদ্ভাসিত হবার সুযোগ পায়। স্বাভাবিক অবস্থাতেই যদি একটি মেয়েকে তার গুণ দেখে বিচার করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে ভেবে দেখুন এটি বিয়ের ক্ষেত্রে আরো কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ! পুরুষদের দৃষ্টি সংযত করার ব্যাপারে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলঃ পুরুষরা রঙ দেখে আকৃষ্ট হয় আর মেয়েরা আকৃতি দেখে। যেসব মেয়েদের গুণ আছে তারা নিজেদের সৌন্দর্য অ্যাডভার্টাইজ করে বেড়ায় না। সুতরাং পুরুষরা দৃষ্টি সংযত না করলে সেসব মেয়েদের দেখেই মুগ্ধ হবার সম্ভাবনা বেশী যাদের বাইরের সৌন্দর্যটাই সার। আর মহিলাদের নিজেদের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে বলার মূল উদ্দেশ্য তাদের এই সমস্ত চিন্তা এবং বিবেকবর্জিত পুরুষদের থেকে রক্ষা করা।

আবু হুরাইরা (রা) হতে জানা যায়, রাসূল (সা) বলেছেনঃ **"A woman is married for four things, i.e., her wealth, her family status, her beauty and her religion. So you should marry the religious woman (otherwise) you will be a losers.** (Volume 007, Book 062, Hadith Number 027). কেননা একটি মেয়ে তখনই তার স্বামীকে সুখী করতে পারে যখন সে তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়, তার সম্পদ এবং সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে- বছরের পর বছর এই কাজটি কেবল তখনই করা সম্ভব যখন মানুষ আল্লাহকে ভয় করে। ভালোবাসা ওঠানামা করে- তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া হলেও পরস্পরকে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণে ঐ সময়েও একজন মহিলা তাঁর সংসারের ক্ষতির কথা ভাবতে পারেন না। একজন ধার্মিক মহিলা নিজগুণে না হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়স্বজন, স্বামীর যাদের পছন্দ- সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকেন। আল্লাহর ভয়েই তিনি কেবল নিজেই যে ভালো থাকেন তাই নয় বরং স্বামীকেও অন্যায় হতে বিরত থাকার পরামর্শ এবং সহযোগিতা দেন। আমার এক ভাই বলেছিল, "আপা, আমি এমন মেয়ে চাই যে কেবল নিজে নামাজ পড়বেনা বরং আমাকে নামাজ পড়ার জন্য তাগাদা দেবে"। আপনারা এমন সুন্দরী বৌ কি দেখেননি যার চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বামী ঘুষ খান আর তিনি স্বামীর কাঁধের ওপর পা রেখে বেহেস্তে যাবার স্বপ্ন দেখেন? এমন পুরুষও বিরল নন যারা নিজেরা দাড়িটুপি পরে সুন্দরী স্ত্রীকে প্রদর্শনীর সামগ্রীতে পরিণত করে রাখেন। এটিকে কি ভালোবাসা বা ন্যূনপক্ষে পারিবারিক সম্প্রীতি বলা যায়? সেই সুন্দর দিয়ে কি লাভ যা অন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়?

পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেছেনঃ দরিদ্র পাত্র ধনী পাত্র অপেক্ষা উত্তম যদি সে সৎ এবং নামাজী হয়। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে সে আপনাকে ভালোবেসে না হোক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও আপনাকে ঠকাতে পারবেনা।

ভেবে দেখুন যদি আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ী গাড়ী সম্পদে ভাসিয়ে রেখে অন্যত্র প্রেম করে বেড়ায়, আপনি কি সুখী হবেন? অথচ অনেক দরিদ্র পরিবারেও দেখবেন বাজার থেকে বড় মাছ এনে স্বামী স্ত্রী মিলে যখন গল্প করতে করতে কাটেন সেখানে প্রেমের উৎসব বয়ে যায়। টাকাপয়সা দিয়ে সুখ কেনা যায়না। কারণ চাকরী পরিবর্তন করা যায় কিন্তু চরিত্র পরিবর্তন করা যায়না। একজন ভালো স্বামী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে সে সকল সুযোগ সুবিধা দেবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে- শ্বশুরবাড়ীর সাথে, স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে যাতে স্ত্রী খুশী থাকে। সে কখনোই স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যাবহার করবেনা যেহেতু সে জানে এর জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আজকাল দেখা যায় পাত্র পেঁচার মত হলেও পাত্রী চাই ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, নব্যরুচিশীলা, বড়লোকের কন্যা। কোথাও চরিত্রের বা স্বভাবের ব্যাপারটি গুরুত্ব পায়না।

অসংখ্যবার দেখেছি রীতিমত চারিত্রিক সমস্যাগ্রস্ত মেয়েদের হটকেকের মত বিকিয়ে যেতে অথচ বুদ্ধিমতি, সচ্চরিত্র, সুন্দর স্বভাবসম্পন্না মেয়েদের বিয়ে হয়না। অনেক শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ভাইকে জিজ্ঞেস করেছি, "আচ্ছা, আপনারা শুধু চেহারা দেখে এমন মেয়ে কি করে বিয়ে করেন যাদের এতটুকু বুদ্ধি বা ম্যাচুরিটি নেই যে আপনি দু'ছত্র কবিতা বললে সে তা উপলব্ধি করতে পারে?" অনেকে এড়িয়ে গিয়েছেন, আবার অনেকে সততার সাথে উত্তর দিয়েছেন, "এদের সহজে ডমিনেট করা যায় যা বুদ্ধিমতি মেয়েদের করা যায়না"। একটি বিয়ের উদ্দেশ্য কি বন্ধুত্ব হওয়া উচিত না স্বৈরাচার, তা আপনাদের বিবেচনায় ছেড়ে দিলাম। তবে যার সাথে মনের কথা শেয়ার করা যায়না, যে আপনার সুবিধা অসুবিধা বোঝার মত বিবেকবুদ্ধি রাখেনা তার চেহারা দেখে সব কষ্ট ভুলে থাকা যায় কি'না এটা গবেষণা করার মত বিষয়।

একইভাবে অনেক মেয়েকে দেখেছি শুধু ভালো চাকরী করে দেখে এমন পাত্রকে বিয়ে করতে যার সাথে কক্ষনো তার মানসিক কোন বন্ধন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। এমনই এক মহিলা বলেছিলেন, "জানো, আমি আমার ডাক্তার স্বামীর সাথে পঞ্চাশ বছর সংসার করেছি কিন্তু একটি দিনের জন্যও সুখী হইনি"। এভাবে একমাত্র জীবনটি কাটিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনার বিষয় বটে!

যারা বিয়ে করে ফেলেছেন তারা সঙ্গীদের আভ্যন্তরীণ বিকাশে সহযোগিতা করে সুন্দর সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলুন আর যারা এখনো বিয়ে করেননি তারা বিয়ে করার সময় শুধু দৃষ্টি দিয়ে নয় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। এই জীবনকে স্বর্গ বা নরকে পরিণত করা সিদ্ধান্ত আপনার হাতে- ভুল করবেন না।

সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া বলতে আপনি কি ফর্সা-স্লিম বাঙালি নারীদেরকেই বুঝেন?

29 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

আজকাল বিয়ে প্রসঙ্গে অনেক মুসলিমকেও বলতে শোনা যায়, ইসলামে নাকি আছে পাত্রীর চেহারা দেখে পছন্দ হলে বিয়ে করা উচিত, তাই তারা সুন্দরী খুঁজেন অস্থির হয়ে, মন ভরিয়ে, অতঃপর তাদের মাঝে দ্বীনদারী খোঁজেন। দ্বীন বিষয়টা ভাতের সাথে আচারের মতন স্বাদবর্ধক হয়ে যায়। তবে বাঙালি পুরুষ সমাজের ক্ষেত্রে বড়ই বিচিত্র এই সুন্দরের সংজ্ঞা। আপনি কি ভেবে দেখেছেন আপনার মনে সুন্দর ভাবলে কী মাথায় আসে? আপনি কিন্তু সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সাদা চামড়া খোঁজেন। আপনি খোঁজেন স্লিম মেয়ে।

আপনার এই মনকে বদলেছে আপনার শত-শত ঘন্টা ধরে দেখা হিন্দি মুভিগুলোর নায়িকারা, আপনার রাস্তার ওইপারে ঝুলতে থাকা বিলবোর্ডে নগ্নবাহু কিংবা উন্মুক্ত ধবল পিঠের নারীগুলো... খেলা দেখতে বসে নারিকেল তেলের কমার্শিয়ালের নামেও আপনি সাদা কমনীয় চামড়ার প্রদর্শনী দেখেন। আপনি সজ্ঞানে আর অজ্ঞানে স্লিম আর সাদা চামড়ার মেয়েদেরকেই সুন্দর মনে করেন, অন্য কিছু আপনার মাথাতেও আসে না।

আপনার কামকে জাগিয়ে তুলতে আপনি বছরের পর বছর দেখেছেন সাদা চামড়া। কাম প্রচার করে পণ্য বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীরা সফল হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগের মুটে-মজুর, কৃষক-জেলে, স্কুলমাস্টারদের নাতি-নাতনীরা এখন আধুনিক-আধুনিকা হয়েছে, তাদের পছন্দ বদলেছে এখন, তারা 'ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি' মাখেন ফর্সা হতে। নিজের পরিচয় হারানো নারীরূপ পুরুষেরা 'ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম' মাখে। বিউটি পার্লারের ব্যবসার বাজিমাত হয়েছে, নারীরা রূপসৌন্দর্য বৃদ্ধির নেশাতে নিয়মিত ঢুঁ মারে বিউটি পার্লারগুলোতে। বহু নারীর মোটা পরতের আবরণমাখা মুখটি সবাইকে প্রদর্শনী করাতে করাতে চরিত্রতে বিকট কালো রঙ লেগে যেতে থাকে। আত্মা যখন পাপমাখা হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, তখনো মুখের সেই রঙ না এখনই কোন শাস্তি দেয়, না পরকালে দিবে। অনুশোচনা করে তাওবা করে ফিরে আসা উচিত এইসব ভুলে ডুবে থাকা নারীদের।

আপনি কি ভেবে দেখেছেন এই সৃষ্টিজগতের রহমত রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের ক'জনা আদৌ সাদা চামড়া ছিলেন? মহিলা সাহাবীদের মধ্যে ক'জনা সাদা চামড়া নারী ছিলেন? কোথাও কি ফর্সা নয় এমন নারী বা পুরুষের স্থান কি মর্যাদায় কম হয়েছে ইতিহাসে? কালো সাহাবীদের মর্যাদা কম ছিলো একটুও? কেন সাদা চামড়ার প্রতি এই উন্মত্ত নেশা তৈরি হয়েছে বাঙালি মুসলিম পুরুষদের মধ্যে? কেন কোমল নারীরা স্বামীদের খুশি রাখতে কুরআন এবং হাদিসের পড়াশোনা ফেলে পার্লারে গিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টায় যেতে বাধ্য হচ্ছেন? অথবা হয়ত বিয়ের করতে চেয়েও পাত্রপক্ষের একটানা সুন্দরী খোঁজার নামে সাদা চামড়া হান্টের নির্মম শিকার হয়ে নিরুপায় অবিবাহিতা অনেক নারীরা এই কাজ করছেন।

মনে রাখা দরকার, পছন্দ সবার ব্যক্তিগত বিষয়। আপনার পছন্দ আপনার মতই, কারো সাথে মিলবে সেটা আবশ্যক নয়। তবে আপনার সেই সৌন্দর্যবোধটাকে কে ডিফাইন করে দিচ্ছে ভেবে দেখুন। যারা হাজার বছর ধরে বাংলাদেশের মাটির ইতিহাস জানেন, তারা বুঝবেন এখানে মূলত কেমন রঙের মানুষ থাকা স্বাভাবিক। সাদা (যাকে ফর্সা বলা হয়) রঙের কন্যা খোঁজার এই অসুস্থ রোগ থেকে পুরুষ মানুষগুলো মুক্তি পাক। সৌন্দর্য ধারণাটা কেবলই সাদা চামড়ার উপরে নির্ভর করে না। আফ্রিকায় অনেক এলাকায় মোটা ঠোঁটের মেয়েরা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। আফ্রিকাতেই আছে মোটা মেয়েরা বেশি আকাঙ্খিত। অথচ পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ করে এই মাটিতে ((স্লিম)) এবং ((ফর্সা)) হলো সকল কুদর্শন পুরুষেরও মাথানষ্ট আগ্রহ।

তাই, হে ভাই! আপনার মনের মাঝে থাকা সুন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে আরেকবার ভাবুন।

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে

7 April 2015

লেখকঃ সাফওয়ানা জেরিন

ইশ! আমি যদি আরেকটু সুন্দর হতাম!

এমন আকাঙ্ক্ষা হয়না এমন মানুষ বিশেষত মেয়ে মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে। সুন্দর হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমরা স্নো পাউডার সহ রাজ্যের সব প্রসাধন কিনি। আপুরা হয়তো তাহলে বলবেন– তাহলে কি আমরা সাজবো না? আমি নিজেও সাঁজতে ভালোবাসি, কিন্তু সেটা নিজের ভালোলাগার জন্যই। অন্য মানুষ আমাকে দেখে অনেক সুন্দরী মনে করবে এটা ভেবে সাঁজাটাই আমার কাছে একধরণের মানসিক দাসত্ব মনে হয়। আসলে, মানুষের বাহ্যিক রূপটা একটা মোড়কের মতোই।

প্যাকেট যতো সুন্দরই হোক না কেন, আমরা কিন্তু কোন পণ্যের প্যাকেটই খাইনা। বেশী হলে ভবিষ্যতে মাছ মাংস রাখার মতো কোন তুচ্ছ কাগজে লাগতেও পারে, এই ভেবে হয়তো রাখি। কিন্তু বেশীরভাগ প্যাকেট এরই এই ভাগ্য ও হয়না। আমরা কিন্তু দাম দেই সেই জিনিষটারই যেটা প্যাকেটের ভেতরে থাকে। মানুষের অন্তরাত্মা হোল প্যাকেটের ভেতরের আসল বস্তুটির মতোই। দূর থেকে দেখে বোঝা যায় না ওতে কি আছে, কিন্তু কাজের সময় পরিচয় মেলে। মনে করুন, কোন বস্তুর ডেট ওভার হয়ে গেছে। কিন্তু প্যাকেট দেখে কিন্তু আপনার বোঝার কোন উপায় নেই।

ধরুন, বিক্রেতা ডেট অভারের সিলটা ও তুলে ফেলেছেন। আপনি মনের আনন্দে উপরের চাকচিক্য দেখেই মেয়াদহীন জিনিষ বাসায় নিয়ে আসলেন। মানুষের বাহ্যিকতা ও তাই। বাহ্যিকতা দেখে আপনি যখনই মানুষকে যাচাই করবেন, আপনি ঠকে যাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে কথায় কথায় একটা কুরআনের আয়াতকে নিজেদের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করে থাকেন। আল্লাহ সুন্দর তাই তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। এই সুন্দর মানে কি চামড়ার সুন্দর?

যদি তাই হতো তাহলে তো আল্লাহর হাবীব বিদায় হজের দিন এ কথা বলতেন না- হে মানব জাতি! মনে রেখ তোমাদের আল্লাহ এক, তার কোনো শরিক নেই, তোমাদের আদি পিতা এক, কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি কোনো সাদার উপর কোনো কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেবলমাত্র আল্লাহভীতিই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। কিছুদিন আগের কথা। এক কালো মেয়ের বাসায় প্রস্তাব এসেছে একটা ছেলের জন্য। মেয়ের মা বললেন- আমার মেয়ে কিন্তু কালো! ছেলে পক্ষ বলল- সমস্যা নেই!

তাও একবার দেখি। এরপর যথারীতি আয়োজন, পোলাও কোর্মা রন্ধন এবং সেই চিরচারিত নিয়মে মেয়ে পক্ষকে ফতুর করে দেওয়া। মেয়েটি ভালো বললে ভুল হয়, আসলে অসাধারণ। কিন্তু ঐ যে ৯৯% ভাগ ঠিক হলেও মেয়ে তো কালো! এরপর দেখাদেখির পর্ব শেষ হলে ছেলে পক্ষ জানালো- আরেকটু গায়ের রং পরিষ্কার হলেই আপনাদের মেয়েকে নিতাম! আরে মূর্খের দল! গায়ের রং পরিষ্কার করার ক্ষমতা কি মেয়ের বাবা মায়ের আছে? সেই ছেলেটি নিজে বিয়ে করার পর যেই কন্যা সন্তানটি হবে তার গায়ের রং ফর্সা/ তার কথায় আরেকটু পরিষ্কার করতে পারবে?

এভাবে আমরা নিত্য আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব গায়ের রঙে মেপে নিচ্ছি, যা স্পষ্টত আল্লাহর বিধান তার রাসুল (সা.) এর শেষ হজের ভাষণের চরম লঙ্ঘন। একমাত্র তাকওয়া আর তাকওয়াই মানুষের মর্যাদা, ভালো মন্দের মাপকাঠি। এটা কোন ঠাট্টা নয়। যিনি আমাদের বানিয়েছেন তার সুস্পষ্ট বিধান। আল্লাহর কাছে সুন্দরের মানে কি? আল্লাহর কাছে সুন্দর সেই যে আল্লাহকে ভয় পায়, হাজির নাজির মানে। যাই হোক, মজার একটা গল্প দিয়ে শেষ করছি। এক রুপবান যুবক বিয়ে করবে। দেখতে দেখতে ৫০এর উপরে মেয়ে দেখে ফেললো, কিন্তু নিজের গায়ের রঙ্গের পাওয়াই যাচ্ছে না। শেষে খুব সুন্দরীকে বিয়ে করলো। কিন্তু সব ভালো মেয়েটির একটাই দোষ।

সে মাঝে মাঝে একটু সিগারেট খায় আর ড্রিঙ্ক করে ঘরে ফেরে। মাকাল ফলের কোন স্বাদ নেই, বরং বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধময়। কিন্তু দেখতে হিঙুল বরণ। সুন্দর খুঁজতে যেয়ে রবি ঠাকুরের গানের মতো অবস্থা যেন আমাদের না হয়- চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে'

রূপসী-যুবতী বউটা যদি জানতো !

25 October 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

(১)

একটু ভ্যাতলা ভ্যাতলা মিষ্টি কথা, জন্মতারিখ জানা, আকাইম্মা বিষয় নিয়া আজাইরা প্যাচাল পাড়তে পারা আর ফাস্টফুডের দোকানের বিলটা দিতে পারলেই প্রেমিক হওয়া যায়। পটায়া পটায়া বহুত আকাম করা যায়। চুলগুলা না আঁচড়ালে, একটু 'ক্যাজুয়াল লুক' নিতে পারলে তো পোয়াবারো।

আধযুগ ধরে প্রেম করা পোলারে তাদের বিয়া কবে হবে তা জিজ্ঞাসা করলে কয়, 'মামা অনেক দায়িত্ব মামা। এখন আমি রেডি না, বাসাতেও রেডি না। বিয়ে করলে তো লাইফ পুরা বদলায়া যাবে।'.....

বিয়ের প্ল্যান নাই কিন্তু তারা ঠিকই বছর ধইরা রেগুলার ফেসবুকের কমেন্টে কোলন স্টার মেরে কমেন্টিং করে। এই রোমান্সে রোমাঞ্চিত বন্ধুরা তাতে লাইকায়। ঢাকায় রেস্টুরেন্টে বসে, রিকসার হুড তুলে প্রেম করে। ওয়াহ ওয়াহ!! এসব ড্যুড আর চিক্সদের কাছ থেকে নতুন নতুন ঐশী সিরিজের কাহিনী সৃষ্টির অপেক্ষা কেবল... মুক্তি কই?

(২)

"ছেলের বয়স মাত্র ২৭। এখনই কীসের বিয়ে?" -- আহাহা! মাত্র সাতাশ বছর। ছেলে তো শিশুই। আজকাল তো ছেলেরা বড় থাকে যখন তার বয়স ১৭। ক্লাস ইলেভেন-টুয়েলভে পড়ে, তখন তারা বড় থাকে, ফুটপাতে, রিকসায়, পার্কে কলেজ ড্রেসপরা মেয়েদের সাথে শরীরের উত্তাপ ভাগাভাগি করে। যে ছেলে এইসব দেখে টেখে আরো ১০ বছর

পার করে ফেলসে, সে শিশু না তো কী? সে তো বড়ই হয় নাই। হইলে কি আর এই দশা হইত? এই সমাজ অনেক অনেক শিশুতে ভরে থাকুক।

এখনকার সময়ের প্রবাদ তাই বদলে গেছে :

If money is lost, everything is lost,

If health is lost, something is lost.

IF CHARACTER IS LOST, NOTHING IS LOST.

(৩)

বোন, সেজেগুজে একটা ছেলের চোখের দৃষ্টি পাওয়া কিন্তু নিজেকে অপমান করা। একটা ছেলে চোখ দিয়ে শরীরটাকে স্ক্যান করতে থাকে, টের তো পাও, তাইনা? অসভ্য সমাজে তোমার আপন ভাইও হয়ত কারো শরীরের দিকে এভাবেই তাকায়। তাই বলে পুরুষরা খারাপ বলে গালি দেবে? ভালো ছেলেও কিন্তু অনেক।

কিছু মেয়ে যেমন শরীরটাকে অন্যের কাছে তুলে ধরে কারো কারো ফ্লার্টিং পাওয়ার আশায়, অমন ছেলেরাও ওটাকেই ভালোবাসে। তাই সেই অভ্যাসের বশেই ভালো মেয়েদেরকেও চোখের শিকার বানায়। এখন তারা যেমন নোংরা, আখিরাতেও এই নোংরাদের আল্লাহ আলাদা করেই পাকড়াও করবেন।

বোন, তুমি সংযত হও। আল্লাহকে ভয় করো। এই শরীরটাকে জাহান্নামের আগুণের কারণ করিয়ো না বোন। আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করি, আল্লাহকে স্মরণ করো, শরীরকে আবৃত রাখো। তোমার ওই কমনীয় চামড়া এখন হয়ত পুরুষের চোখ ঝলসে দিচ্ছে, একসময় আগুণ এসে তা ঝলসে দিবে এমন যেন না হয়।

(৪)

এই নব্য টাকাওয়ালা ছেলেটার রূপসী-যুবতী বউটা যদি জানতো ঐ ছেলেটা ভার্সিটি লাইফে মেয়েদের নিয়ে কেমন কথা বলত, ছেলেটা ক্যাম্পাসের মেয়েদেরকে কী সব 'সম্মানসূচক' 'শব্দ দিয়ে সম্বোধন করতো যা দেহজীবীদেরকে করা হয়, মোড়ের চায়ের দোকানে বসে সামনে দিয়ে মেয়েদের নিয়ে কোন রিকসা গেলে আরোহীদের শরীরের অঙ্গপরিমাপক শব্দগুলো মুখ দিয়ে বের করে চারপাশের সবাইকে ঝলসে দিতো, রাতের বেলা রতিকলার মেয়েদের চলচ্চিত্র দেখে দিনের বেলা আলাপ করত বন্ধুদের সামনে...

তখনো ছেলেটাকে 'তত্ত্বকথা' শুনিয়েছিলো কিছু মানুষ, কিন্তু তার কাছে সেসব কথার দাম ছিলো না। পরেও কখনো ভালো করে জানা যায়নি রিকসায় চড়ে যাওয়া মেয়েদেরকে তাদের শরীর নিয়ে 'প্রশংসা বাণী' শোনানোর কারণে কখনো ক্ষমা চেয়েছিলো কিনা। বরং, চাকুরিতে এসে মেয়ে কলিগদের পাশে তার দন্ত-বিকশিত হাসিমাখা ছবি অনলাইনে দেখা যেত। গল্পের আড্ডায় কোন মেয়ে 'সেইরকম মাল' সেই বিষয়টা সবাইকে জানিয়ে দিতো।

কয়েক বছর পেরিয়ে গেলো। এখন, নতুন যুবতী বউয়ের স্বামী ছেলেটি এখন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে। টাকার প্রবাহ বেশ ভালোই। তারা দু'জনে মিলে দাঁত কেলিয়ে ছবি তুলে, এখানে ওখানে ঘুরে নতুন অ্যালবাম করে ছবি ফেবুতে আপলোড করে। মধুচন্দ্রিমার বিশেষ অ্যালবামে স্বল্প পোশাকে সমুদ্রতীরে তোলা ছবিগুলো ফেসবুকে দিয়ে বন্ধুদের 'কিউট কাপল', 'খুব নাইস লাগছে', 'সেইরকম জোস লাগতেছে', 'নাইস কাপল, 'মেড ফর ইচ আদার' টাইপের কমেন্টের ফুলঝুরি পেয়ে 'দাম্পত্য' জীবনকে সফলতায় ভরে দিয়েছে।

অথচ, ছেলেটার মন তো মনে হয় বদলায় নাই, তাইনা? চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি অন্তরের ভিতরেই আছে, আগের মতই... এই মেয়েতে ক'দিন মজে থাকবে ও? মেয়েদের নিয়ে এত এত আপত্তিকর বাক্যগুলো তো এই অন্তর থেকেই বের হয়েছিল, যা এখনো আছে। ক'দিন পর যখন যুবতী বৌয়ের সাথে ঝগড়া লাগবে, তাদের এই প্রেম কেমন থাকবে তখন? ছেলেটি ক্ষেপে গেলে যদি আগের সেই শব্দগুলো ব্যবহার করে, নবপরিণীতা স্ত্রীর সম্ভ্রম আর সম্মান কিছু থাকবে? এই রুচিকেও কি মেয়েটা মেনে নিবে?

ভয়াবহ: রূপে-বিত্তের প্রতি লোভ ও রূপবতী-বিত্তশালীর দেমাগ

29 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

পাত্রীর রূপের সৌন্দর্য দেখে, পাত্রের ভালো বেতনের চাকুরি অথবা অঢেল সম্পদ দেখে যারা বিয়ে করে, তারা অনেকেই হয়ত খুব বেশি হলে প্রথম কিছুদিন একটা আনন্দের ঘোরে থাকে। এরপরে একসময় বুঝতে পারে জীবনের নানান যন্ত্রণা। একটা মানুষ বিয়ের পর প্রতিটা দিনে, সংসারের প্রায় সকল ঘটনারই সঙ্গী হয়। স্বামী-স্ত্রী যখন একসাথে হয়, যদি একজন আরেকজনকে পাত্তা না দেয় যেকোন কিছুতে, কিংবা মনের ইচ্ছামতন কিছু করার চেষ্টা করে অপরজনকে গোণায় না ধরে -- তখন স্বামী বুঝে অবাধ্য স্ত্রী কেমন তিতা হয়। যদি রগচটা হয়, কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করে অল্পতেই তখন জীবন অন্যরকম হয়ে যায়। অথবা যদি সেই পুরুষটি স্বামী হয়েও আবার অন্য কারো রূপে মুগ্ধ হয় , তখন সেই পূর্ববর্তী রূপসী স্ত্রী বুঝে রূপ দেখে যারা মানুষ খোঁজে তারা কত অশান্তির স্বামী হতে পারে...

যাদের জীবনে আল্লাহর ভয় নাই, তারা এইসব ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু ভাবনা দাঁড় করিয়ে সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে চলতে থাকে। বিবাহিত হয়েও তাই অন্য নারীর সাথে ইটিশ-পিটিশ করার মাঝে তার অপরাধবোধ হয় না। বরং সেই পাপকাজের মাঝে সে 'নতুন ফ্লেভার' খুঁজে পায়। রূপের পেছনে ছোটা পুরুষেরা তাই পুরাতন রূপওয়ালীর প্রতি বোরড হয়ে যায়, নতুন পাপাচারের সূচনা হয়। তেমনি সম্পদের প্রতি অতি-আগ্রহী নারীরা এমন এক সত্বা যার ক্ষুধা পূরণ করতে পারে না তার অনেক সম্পদশালী স্বামীও। যতই থাকুক, তার আরো বেশি প্রয়োজন মনে হতে থাকে, অন্য নারীদের সাথে তার প্রতিযোগিতা হতে থাকে অলংকারের, বিলাশব্যসনের, শপিং আর বেড়াতে যাওয়ার...

একটা বিষয় খুব সূক্ষ্ম। যার রূপ থাকে কিংবা যার সম্পদ থাকে, বড় পরিবারের বলে একটা সূক্ষ্ম গর্ব বা অহং থাকে -- তারা অপরকে তেমন একটা শ্রদ্ধা করেন না। নিজের রূপে, নিজের গুণে, নিজের সম্পদের প্রাচুর্যে মুগ্ধ মানুষগুলো অপরকে সহজে সম্মান করতে চায় না -- তারা খুব কমই অনুভব করে যে এই দুনিয়ার সব সুবিধা ও ভোগের বিষয়গুলো আল্লাহর দান, তিনি চাইলেই সব উঠিয়ে নিতে পারেন এবং তার কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবেই।

জীবনের সঙ্গী খুঁজতে এসে তাই দ্বীন ছেড়ে বা দ্বীনদারীর বুঝকে একটু *মডিফাই* করে যারাই এগিয়েছেন, তারাই পরে আফসোস করেছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। জীবনে যারা শান্তি চান, তারা রাসূলের (সা) নির্দেশিত পথেই এগিয়ে চলেন। তারা মূলতই দ্বীনদার মানুষ খুঁজেন। এই দ্বীনদার মানে কোনরকম দ্বীন মানা লোক না কিন্তু! নামাজ পড়ি, আরো বাকিগুলা ঠিক করে ফেলবো কিছুদিন পরে -- এইরকম ভাবের লোক/মহিলা না। খুঁজবেন তাদেরই যারা ইসলামের কিছু জানার পরেই মেনে নিতে চেষ্টা করেন।

আপনি যখন বিয়েতে আগ্রহী হবেন। খুব সাবধানী ও সতর্ক হউন। আপনার নিয়াতের উপরে ভিত্তি করে আপনি কর্মফল পাবেন। আপনার অন্তরের চাওয়ার উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ আপনাকে দান করবেন জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনী। আপনি এমন কিছুই চান, যা আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) শিখিয়েছেন। তাহলে দুনিয়ার সকল ক্ষমতা কেবল যার, সকল কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা যার, তিনি আপনাকে বেহিসাব দান করবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন।

ভাল জামাই পাবার বুদ্ধি

16 September 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস। যুবায়ের হোসেইন।

এক.

শ্রদ্ধেয় বড়ভাই ‘আবুল কালাম আজাদ’ যখন এই বিষয়টি নিয়ে লিখতে বললেন তখন মনে মনে হাসলাম। প্রত্যেক মানুষের দুর্বলতা তার জীবনের কোন এক পর্যায়ে তার কাছে ফিরে আসে। আমার কাছে ভাল জামাই মানে হোল যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। দাম্পত্য সম্পর্কে অনেক কিছুই মানুষ মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই দু’টির যেকোন একটিতেও ঘাটতি থাকলে সে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন। একসময় আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে কোন ছেলে ভাল হয়না, তারা বিয়ে হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরতে চায়না এবং অল্পমূল্যে নিজের সততা বিকিয়ে দেয়। আমি মন থেকে এমন কাউকে গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারতাম না যে আমার জন্য অপেক্ষা না করে অন্য কারো দ্বারা নিজের মনকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। আমার মনে হত ব্যাপারটা নতুন বাড়ী আর পরের বাড়ীর মত। এই বদ্ধমূল ধারনা থেকে এক সময় বাবামাকে রাজী করিয়ে ফেললাম, বিয়ে করবনা।

শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছি অবশ্য। বিয়ের পর আমার সঙ্গীকে বললাম আমার বিবাহপূর্ব সংকল্পের কথা। উনি হেসে বললেন, ‘একটা ছেলে খারাপ হয় কার সাথে? একটা মেয়ের সাথেই তো! তাহলে মেয়েটা ভাল থাকে কি করে? ছেলেমেয়ে ব্যাপার না, উভয়েরই সৎ থাকার মানসিকতা থাকলে উভয়পক্ষই একজন সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ সঙ্গী পেয়ে লাভবান হতে পারে’। আসলেই তাই।

জীবনে সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায়না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য এত সীমিত যে তা দিয়ে জীবনের জটিলতাগুলো অনুধাবন পর্যন্ত করা যায়না, সমাধান তো বহু দূরের ব্যাপার।

তাই বলি, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বুদ্ধি দিয়ে তর্কে জেতা যায়, কিন্তু জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য বিশ্বাস ও সততার বিকল্প নেই। ছলচাতুরী করে হয়ত একজন বোকাসোকা ভাল মানুষের সাথে বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়, কিন্তু বিয়ের লক্ষ্য কেবল একজন ভাল সঙ্গী সংগ্রহ করাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার সাথে সুখে শান্তিতে সংসার করাই উদ্দেশ্য।

বিয়ে এমন একটি সম্পর্ক যেখানে সঙ্গীর কাছ থেকে নিজের স্বরূপ লুকানোর কোন উপায় নেই। বুদ্ধি দিয়ে একজন উত্তম সঙ্গী খুঁজে পেলেও তাঁকে ধরে রাখার একমাত্র উপায় সততা এবং বিশ্বাস।

সুতরাং, আমার কাছে ভাল জামাই পাবার একটি বুদ্ধিই কার্যকর মনে হয়- নিজে সৎ থাকা এবং আল্লাহ্ এর প্রতিদানে একজন সৎ সঙ্গী মিলিয়ে দেবেন এই বিশ্বাস রাখা।

আমাদের নির্বাচনে ভুল থাকতে পারে, মুরুব্বীরাও ভুল করতে পারেন, কিন্তু যিনি এই বিশ্বের প্রতিপালক তিনিই কেবল এমন একজন উত্তম ও বিশ্বস্ত সঙ্গী মিলিয়ে দিতে পারেন যার সাথে জীবন যাপন করা সহজ। সুতরাং, আমরা এই বিশ্বাস রাখতে পারি যে আমরা যদি সৎ থাকি, তাহলে তিনি আমাদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচন করে দেবেন। ব্যাস, পেয়ে গেলেন আপনার ভাল জামাই!

দুই .

বিবাহের নিমিত্ত লিখিত বায়োডাটায় সাধারণত এমন সব তথ্য থাকে, যার প্রায় কোনটাই বৈবাহিক জীবনে কাজে আসে না। তবু এই তথ্যগুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে কার্যসমাধার আয়োজন করা হয়। অথচ আজ পর্যন্ত কোন দম্পতি পাওয়া যাবে না যাদের দাম্পত্য সমস্যাগুলো স্ত্রীর সুন্দর মুখ কিংবা স্বামীর উচ্চতার দিকে তাকিয়ে সমাধান হয়ে গেছে।

মাঝে মধ্যে আমার আব্বা-আম্মার সাংসারিক জীবনে যেসব সমস্যা দেখেছি বা বুঝেছি, সেগুলোর ব্যাপারে ভাবতে চেষ্টা করি যে আব্বা অমুক ভার্সিটিতে না পড়ে যদি ঢাকা ভার্সিটি বা বুয়েটে পড়তেন, তবে কি সমস্যা সমাধান হয়ে যেত কি না।

কিংবা আম্মার গায়ের রঙ আরেকটু পরিষ্কার হলে কি সমস্যা মিটে যেত কি না। উত্তর পাই- না। অথচ পাত্র-পাত্রীর সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,

ডিগ্রি, এগুলোকে বিয়ের সময় কত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। কেন উঁচু উঁচু ডিগ্রিধারির সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ঘর থেকে সুখটাও উড়ে গেছে? কেন আগেরদিনের 'পরাধীন' গৃহিণী মায়েদের ঘরের মমতা আর শান্তি আজকের 'স্বাধীন' চাকরিজীবী মায়েদের ঘরে নেই?

কেন আজ একটার পর একটা ডিভোর্সের সংবাদ আসে? কেন এত এত 'উচ্চশিক্ষা'র বহর আর 'নারীর ক্ষমতায়ন' এর পরও ঘর ভাংগছে? কেন মেয়েরা পুরুষের সাথে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং সব শেখার পরও আত্মহত্যা করে? কেন গৃহিণী মায়েদের 'ব্যাকডেটেড' বলা 'আধুনিকা কর্মজীবী নারী'কে সুখের খোঁজে সাইকোলজিস্টের কাছে ধরনা দিতে হয়?

কারণ একটাই। সেক্যুলার শিক্ষার বহরকে মাথায় জায়গা দিতে গিয়ে যে ইসলামিক জ্ঞান,মূল্যবোধ,নৈতিকতা সব হারাতে বসেছে মানুষ। পাত্র-পাত্রী বাছাইয়ের সময় দ্বীনদারিতাকে স্রেফ ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দুনিয়াবি 'যোগ্যতা'কে সব ভেবে ঝাঁপাচ্ছে মানুষ। আরে যেই ছেলে প্রস্রাব করে কীভাবে পবিত্র হতে হয় সেটা জানেনা, সে স্ত্রীর

কী হক্ব আদায় করবে? যে সুদী ব্যাঙ্কে চাকরি করে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সে স্ত্রীর কী নিরাপত্তা দেবে? সমাজের মা-বাবারা কি বোঝে না?

সুতরাং দুনিয়ার স্ট্যাটাসকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষ শয়তানের প্রথম ফাঁদে পা দেয়। এরপর দ্বিতীয় ফাঁদ হল বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান না, এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কিন্তুএটাকে মুশরিকি কালচারাল ফাংশন বানিয়ে ফেলে যতরকম নষ্টামি আছে সবের যোগান দিয়ে মানুষ দিনশেষে দুয়া করে আল্লাহ্ যেন দাম্পত্য জীবন সুখী করেন। কী কপটতা, কী মূর্খতা! পুরো বিয়ের অনুষ্ঠানে খুশি করা হয় শয়তানকে, আর শান্তি চাওয়া হয় আল্লাহর কাছে!

এরপর সাংসারিক জীবন। প্রথম দুটো ক্ষেত্রে শয়তানকে খুশি করা মানুষেরা এই জীবনে সুখী হয় না। তবু আল্লাহর কাছে ফিরে আসার তো কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তাই যখন মানুষ সাংসারিক জীবনে সমস্যায় পড়ে তখন কর্তব্য হল আগেকার ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে ইসলামের মধ্যে সমাধান খোঁজা। কিন্তু মানুষ এক্ষেত্রেও আল্লাহর দিকে ফেরে না। তারা সমাধানও চায় শয়তানের কাছে। এটা হল শয়তানের তৃতীয় ফাঁদ। কেউ ভারতীয় সিরিয়ালে মুশরিকদের কাছে,কেউ মেহতাব খানম-সারা যাকেরদের মত বাতিল আদর্শের অনুসারীদের কাছে। তাদের দেখানো পথে হেঁটে শান্তি আসা তো দূরে কথা, যেটুকু ছিল তাও চলে যায়। ফলাফল, সংসারে বিপর্যয়,কখনো ছাড়াছাড়ি আবার কখনো বা আত্মহনন। আর বেঁচে থেকে হিসাব মেলানো জীবনে কী কী পেলাম না,আর'মেয়েরা এত খারাপ' কিংবা 'ছেলেরা সবই এমন' টাইপের

বস্তাপচা বুলি। কী তুচ্ছ এদের জীবন, কী অপমানজনক এদের অস্তিত্ব!

আর যারা ইসলামকে একমাত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে নিয়েছে, তারা যেমন দ্বীনদারিতাকে সবার ওপরে রাখে, বিয়ের ক্ষেত্রেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, বৈবাহিক জীবনের পরীক্ষাগুলো আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেই মোকাবেলা করে, সব সমস্যার সমাধান ইসলামের মধ্যেই খোঁজে। এরা কাঙ্ক্ষিত সেই শান্তির দেখা ঠিকই পায়; সেজন্য লক্ষ টাকা কামানো লাগে না, অভিজাত এলাকায় ফ্ল্যাট বুকিং দেওয়া লাগে না, স্ত্রী-সন্তানেরমুখের একটু হাসি আর রাতের আঁধারে

স্রষ্টার দরবারে দাঁড়িয়ে ঝরিয়ে ফেলা দু-ফোঁটা চোখের পানিই এদের জীবনকে শান্তিময় করে তুলতে যথেষ্ট। আল্লাহ্ আমাদের ঘরগুলোকে দ্বীনের চর্চার দ্বারা আলোকিত করার তৌফিক দিন। আমাদের প্রাপ্তির মধ্যে সন্তুষ্ট থাকার সামর্থ্য দিন।

চিরস্থায়ী ঠিকানাকে স্মরণ করে মুসাফিরের জীবনযাপনের মানসিকতা দান করুন। বিয়ে এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে দ্বীন ইসলামের সাথে আপোষহীনতা গড়ে তোলার তৌফিক দিন। আমীন।"

হবু স্বামীর সাক্ষাৎকার।।..!

26 September 2014

লেখক অজ্ঞাত

২১ জানুইয়ারি, ২০০১ সালে যখন প্যারিসে বিমান বন্দর থেকে শহরের দিকে যাত্রা করছিলাম, তখন ভাবছিলাম এখানে এই অমুসলিম অধুষ্যিত দেশে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বিষয়ে। বন্ধু আমের আক্কাদকে জিজ্ঞাসা করলাম,এই অনৈসলামিক পরিবেশে মুসলিমদের সন্তানদের ইসলামের সাথে কেমন সম্পর্ক?

আমের ২০ বছর ধরে এখানের অধিবাসী। কিতাবের ব্যবসা করেন। প্যারিসে সবচেয়ে বড় ইসলামিক library তার। আমার কথার জবাবে বললেন, ভাল খারাপ সব জায়গায় আছে। কিন্তু কিছুদিন আগে আমার এক অভিজ্ঞতা হয়েছে যা আপনাকে বললে বুঝবেন, এখানকার মেয়েরাও দ্বীন-ইসলামের ব্যাপারে কত আগ্রহী।

তিনি বলতে লাগলেনঃ আমার এখানকার এক বিত্তশালী বন্ধু আমাকে তার জন্য পাত্রী খুঁজে দেবার জন্য অনুরোধ করল। পাত্রীকে হতে হবে 'সৎ লোকের কন্যা।'

আমি এক জায়গায় কথা বলা শুরু করলাম। মেয়ের বাবা মরক্কোর অধিবাসী। দীর্ঘদিন যাবত প্যারিসে বসবাস করছেন। মেয়ের বাবা-মার পাত্র সম্পর্কে কোন আপত্তি নেই। তারা বললেনঃ মেয়ের সাথে পরামর্শ করে জানাবেন।

এরপর উভয়পক্ষ ছেলে-মেয়ের উভয়ের সাক্ষাতের দিনক্ষণ ঠিক করল। নির্দিষ্ট দিনে আমরা একসাথে মিলিত হলাম। ছেলে-মেয়েকে একটু দূরে রেখে মেয়ের বাবা-মা ,আমার স্ত্রী ও আমি কথা বলতে লাগলাম। দূর থেকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম মেয়েটি একটি কাগজ বের করছে। আশ্চর্য হয়ে মেয়ের মাকে বললামঃ ওটা কি?

তিনি জানালেনঃ মেয়ে পাত্রের সার্বিক জীবন সম্পর্কে জানার জন্য কিছু প্রশ্নপত্র তৈরী করেছে। এর উত্তরের আলোকেই সে তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করবে। প্রশ্নের অধিকাংশই ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমার বন্ধু এই ভাষা বেশি জানত না। তাই সাহায্য করার জন্য আমাকে কাছে ডাকলো।

তিন পৃষ্ঠার প্রশ্নপত্র। প্রথম পৃষ্ঠায় তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে-নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, উচ্চতা, ওজন, শিক্ষা, ব্যবসা, মাসিক উপার্জন, সম্পত্তি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মূল প্রশ্ন।সেখানে ছিলঃ-

- ইসলাম ও ধর্মের সাথে আপনার কেমন সম্পর্ক রয়েছে?
- ৫ ওয়াক্ত নামায পড়েন?
- ইসলামের জন্য কত সময় ব্যয় করেন?
- কুরআন কতটুকু মুখস্ত?প্রতিদিন কতটুকু তেলাওয়াত করেন?
- কত হাদিস মুখস্ত?হাদিসের কোন কিতাব পড়েন?
- স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে এক পৃষ্ঠা লিখুন।
- ছেলে সন্তানের প্রতি বেশি আগ্রহ নাকি মেয়ে সন্তান?
- বিয়ের পর যে সন্তান জন্ম নেবে তার কি নাম রাখতে আগ্রহী?
- জীবন-সঙ্গিনীর কি গুণ দেখতে আপনি আগ্রহী?

প্রশ্নগুলি পড়ছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম,এমন অনৈসলামিক পরিবেশেও ইসলামের প্রতি কি সীমাহীন ভালোবাসা! এ প্রশ্নপত্র মূলত একজন ব্যক্তির পূর্ণাংগ জীবন ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ 'শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়েছিল?'

আমের ভাই বললেনঃ 'না। যদিও আমার বন্ধু সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মেয়ে সন্তুষ্ট হয়নি। সে বলেছে, আমার স্বামীকে হতে হবে প্রভুর প্রতি নিষ্ঠাবান। যে নিজ স্রষ্টার প্রতি শোকরগুজার না, কাল সে আমার সাথে কি ব্যবহার করবে?'

আমি ভাবছিলাম আমাদের সন্তানরা যদি ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্বামীর দ্বীনদারী সম্পর্কে জেনে নেয় তবে ভবিষ্যত জীবন নিঃসন্দেহে সুখময় কাটবে।

আবার বিপরীত চিত্রও আছে। আমার এক চাচার মেয়ে খুব ফ্যাশান সচেতন। নিজের জামাকাপড় থেকে শুরু করে ঘরের সবকিছুই match হওয়া লাগবে। সব market ঘুরে জিনিস-পত্র কেনায় কেউ তার সাথে পেরে উঠে না। একবার তার এক জুতা কেনার প্রয়োজন ছিল। ৪ ঘন্টা market ঘুরেও জুতার color match হচ্ছিল না। অবশেষে এক বিখ্যাত company-র দোকানে color এবং model পছন্দ হল। কিন্তু জুতার size হল ছোট।

জুতার চামড়া original কিনা, company ভাল কিনা, color আসল কিনা, জুতা টেকসই কিনা, জুতা পড়লে পায়ের মোলায়েমতা ঠিক থাকবে কিনা, model টা uncommon কিনা--এতসব বিচার করতে গিয়ে কোনভাবেই সে তার মনমতো জুতা পেল না। এরপর সে তার এক ভাইকে জুতার সব বর্ণনা list করে দিলো যাতে সে যেন Europe -এ গেলে ওই রকম জুতা কিনে আনে। তার ভাই ভেবেছিল ব্যাপারটা সহজ। কিন্তু অনেক খুজেও সে ওই বিশাল list এর বর্ণনানুযায়ী জুতা পেল না।

আমি ভাবছিলাম এসব নারীরা পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য যত শ্রম ও সময় ব্যয় করে,আমাদের নারীরা ও তাদের পিতা-মাতা স্বামী নির্বাচনে কখনও কি এত চেষ্টা ও গুরুত্ব দেন? জুতা নির্বাচনের এত বড় list, স্বামী নির্বাচনেও কি যথাযথ প্রশ্নপত্র তৈরী করা আছে? জুতায় সমস্যা থাকলে কি আর হবে?কিন্তু উপযুক্ত স্বামী জান্নাতে যাবার বাহন হয়ে যায়।

এক মহিলা আমার স্ত্রীকে বললঃ 'আমার স্বামী আমাকে মারপিট ও গালি-গালাজ করে ।'

আমার স্ত্রী বললঃ 'বিয়ের সময় তোমার স্বামী নামায পড়তো?

-না

-সিগারেট খেত?

-হ্যাঁ

-তার বন্ধুরা কেমন ছিল?

-ভাল চরিত্রের না।

যে নিজের প্রভুর অধিকারে অবহেলা করবে, সে স্ত্রীর অধিকার কিভাবে রক্ষা করবে?

কিন্তু প্রথম প্রথম তো অনেক ভাল ছিল! আমার জন্য দিওয়ানা! আমাকে খুশি রাখার চেষ্টা করতো।

তখন তো তুমি নববধূ ছিলে। একটা আকর্ষণ ছিল। এখন সেই অনুভূতি আর নেই। বোন! বিয়ের পূর্বেই যদি তার চরিত্র ও দ্বীনদারী যাচাই করে নিতে তবে আজ এই অবস্থা হত না। আল্লাহ তোমাকে ধৈর্য ও তাকে হেদায়েত দান করুন। আমিন।

বায়োডাটা দেখে যায় না চেনা...

14 September 2015

লেখকঃ ফাতেমা মাহফুয

আমরা সবাই উত্তম জীবনসঙ্গী কামনা করি, কিন্তু এই কামনার পিছনে চেষ্টা-সাধনা করি না। আমাদের প্রথম ব্যর্থতা ও অজ্ঞতা ধরা দেয় বায়োডাটা লেখার ক্ষেত্রে। হাস্যকর নয় বরং অবাক ব্যাপার হচ্ছে- বিবাহে ইচ্ছুক পাত্র/পাত্রী নিজের বায়োডাটা পর্যন্ত লিখতে জানে না। যেকারণে বায়োডাটা দেখে বুঝা যায় না- মানুষটি কেমন!

এদিকে বায়োডাটার মধ্যে সবচেয়ে গতানুগতিক বিষয় হলো নিজের ও বাপদাদার নাম ঠিকানা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা। যদিও এসব সাধারণ বিষয়ের বাইরে অসাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে আসা দরকার। যেমন-

আমি মানুষটা কেমন?

আমার শখ কি?

আমি কেমন জীবনসঙ্গী কামনা করি?

নিজের জীবন নিয়ে আমার পরিকল্পনা কি?

উপরের প্রশ্নগুলো নিজেকে নিজে করে উত্তরগুলো তৈরি করতে হবে।

এবার উপরের প্রশ্নগুলোর যদি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করি তাহলে বলবো। হতে পারে আপনি পড়ুয়া টাইপ কিংবা লেখক গোছের/ গল্প-সাহিত্য/উপন্যাস পড়তে পছন্দ করেন। হতে পারে আপনি ধার্মিক, ধর্মতত্ত্বে বিশ্লেষক। কিংবা আপনি ভালো সংগঠক, আড্ডা দিতে ভালো লাগে। দেশ-বিদেশের সমাজ/রাজনীতি/ অর্থনীতি/ কূটনীতি নিয়ে ভাবেন। হতে পারে আপনি ভাবুক টাইপ কিংবা নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে পছন্দ করেন। আবার হতে পারে আপনি নির্দিষ্ট কোনো খেলা পছন্দ করেন বা খেলাধুলা করেন- ইত্যাদি বিভিন্ন টাইপের লাইফ স্ট্যাইল আপনার হতে পারে। তাই আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন- আপনি কি? আপনি কেমন? নিশ্চয়ই আপনি সবার মতো না, আপনার একটা আলাদা পরিচয় আছে। অতঃপর 'About myself' পয়েন্ট উল্লেখ করে নিজের ব্যাপারে সংক্ষেপে লিখুন। যাতে অপরব্যক্তি আপনার ব্যাপারে একটা ধারণা পায়। তেমনি 'My hobby' কিংবা জীবনসঙ্গীর দিক থেকে আপনার 'Expectation'- এসব পয়েন্ট উল্লেখ করে লিখুন- যাতে অপরপক্ষের জন্য আপনাকে বাছাই করা সহজ হয়।

অনেকে হয়ত ভাবছেন- 'দূর! এতো কিছু লেখার দরকার কি'? 'এসব আবার মানুষ লেখে নাকি'? এমনকি পরিবারের কর্তারাও হয়ত আপনাকে এরূপ বায়োডাটা লেখার ক্ষেত্রে বাঁধ সাধতে পারে। বলতে পারে- "আজাইরা প্যাচাল বাদ দে"! যদিও এগুলোই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পাত্র/পাত্রী দেখতে কেমন, তাদের বংশ কিংবা সম্পত্তি- এসব ওপর থেকে বুঝা যায় তবে ব্যক্তির মানসিকতা কেমন তা কিন্তু ব্যক্তিকে নিজের ভালোর জন্যই অন্যকে জানিয়ে দিতে হবে, বিশেষ করে বিয়ে করার ক্ষেত্রে। কারণ- একটা মানুষের সাথে হয়ত আপনার শতভাগ মিলবে না, কিন্তু তারপরও নিজ থেকে জানানো কিংবা জেনে-বুঝে কবুল করা ভালো।

এবার অনেকেই হয়ত বলবেন- "এসব বিষয় না লিখে, সামনা-সামনি কথা বললেই তো হয়"! হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। তবে আফসোসের বিষয় হলো- অনেক ছেলে-মেয়েরা বিয়ের আগে কিভাবে আরেকজনের সাক্ষাৎকার নিতে হয় তাও জানেন না! কিছু পাত্র/পাত্রী তো নিজে সাক্ষাৎকার না নিয়ে নিজের মা/বাবা/ভাই/বোন/ভাবীকে ঠেলা দেয়। বলে- 'আমার ভয় লাগে, তোরা নে'। মনে রাখা উচিত- কিছু কিছু জায়গায় ভয় নয় সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া উচিত। কারন বিয়েটা আপনি করছেন, আপনার মা-বাবা নয়। জীবনসঙ্গীকে নিয়ে চলতে হবে আপনাকে। তাছাড়া যেকোনো বৈধ পন্থায় যেখানে সুযোগ আছে, সেখানে পিছপা হওয়া উচিত নয়।

আরেকটা বিষয় না বললেই নয়। কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বৈধ পথ থাকলেও, সেই পথে ভয় পান/গরিমসি করেন, কিন্তু অবৈধ পথে এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেন না। যেমন- অনেক পরিবারে দেখা যায়-

মুরুব্বিদের পছন্দ হয়ে গেলে তারা যখন মেয়েকে আংটি পরিয়ে আসে, তারপর থেকেই ছেলে-মেয়ে মোবাইলে চুটিয়ে কথা বলা শুরু করে দেয়। যদিও তাদের মধ্যে আদৌ কোনো বৈধ সম্পর্ক নেই। অনেকে যুক্তি দেখায়- এবার আমরা একে অপরকে বুঝে নিই। সেক্ষেত্রে বলবো- বুঝে নেয়ার পর্বটা যেখানে সরাসরি পরিবারের সামনে দেখা করে প্রাথমিক পর্যায়েই করা যেতো, সেখানে গোপনে মোবাইলে পরপুরুষ কিংবা পরমহিলার সাথে কথা বলার লাভ কোথায়? একটা সামান্য আংটি সম্পর্কের কোনো ভিত্তি/ দলিল নয়। তাই পাত্র/পাত্রীর পরীক্ষাটা প্রথম সাক্ষাতেই করা জরুরি আর পরবর্তীতে কথা বলা কাবিনের পরেই করা উচিত।

এদিকে অনেক পরিবার আছেন যারা নিজের সন্তানকে বলেন-" তোর এতো পরীক্ষা করার কি আছে? যা বলার, যা জিজ্ঞাস করার আমরাই করবো"। আর এমন কর্তারাই নিজের সন্তানদের না সাক্ষাৎকার নিতে দেন আর না ছেলে-মেয়ে একান্তে কথা বলে নিক- এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কি পরিমাণে অজ্ঞতা ও বোকামি!

যাই হোক- যেহেতু বায়োডাটা লিখনের ব্যাপারে কথা হচ্ছে তাই আরেকটা বিষয় বলা জরুরি। এমনও হতে পারে, আপনার কোনো অভ্যাস যেটা বায়োডাটায় উল্লেখ থাকুক আপনি সেটা চান না। কেউ জানুক তাতে আপনি নিজেই লজ্জিত হন। এর অর্থ- আপনি নিজেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন, আপনার সেই অভ্যাসটা 'বদভ্যাস'। আর এ সংক্রান্ত একটা হাদিস আছে, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন- "যেটা অন্যের সামনে প্রকাশিত হোক, লোকে জানুন- সেটা যখন তুমি চাও না, তখন সেটাই পাপ" (মুসলিম, হাদিস নং- ৬৪১০)। তাই এমন যদি কোন পাপ বা বদ-অভ্যাস থেকে থাকে যেটা উল্লেখ করার মতো নয়, তবে সেটা বিয়ের আগেই নিজ থেকে পরিহার করা উচিত। যেমন ধরুন- আপনি ধুমপান করেন বা মাদকসেবী (উল্লেখ্য, মেয়েরাও অভিজাত রেস্টুরেন্টে সিসা কর্ণারে নেশা করে) - তাহলে নিজের ভালোর জন্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য এগুলো ত্যাগ করুন।

সবশেষে, যারা বিয়েটাকে শ্রেফ একটা সামাজিক রীতি মনে করে- তাদের কাছে জীবনের তাৎপর্য ফিকে। তবে যারা একটা সুন্দর ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত করতে চায়; যারা জানে, বিয়ে- হয় জীবনকে শান্তি দিবে, সুন্দর লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে দিবে নয়তো লক্ষ্য বিচ্যুত করবে- তারাই বিয়ের আগে সচেতন হয় এবং তাদের বায়োডাটাগুলোই হয় তাদের প্রতিচ্ছবি...

গিফট

4 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

উফ! ওর ভাইয়াটা যে কি! বড় ভাইটার সব দায়িত্ব নিতে নিতে মুমতাহিনা ক্লান্ত হয়ে গেল। কিচ্ছু হয়না ওকে দিয়ে। বন্ধুর জন্য একটা গিফট কিনবে সেটাও বলে কিনা, 'মুমি আমার লক্ষ্মী বোন, আমার বন্ধুটার বিয়ে। যা না, একটা গিফট কিনে এনে দে!' তাই এই সাতসকালে মোমেনা আন্টির তীক্ষ্ণ নজরদারীর সামনে 'আপন উপহার বিতান'এর বিশাল সম্ভার থেকে কি নেয়া যায় ভাবতে ভাবতে হয়রান হচ্ছে মুমি। মোমেনা আন্টি অবশ্য আসলে অনেক নরম মনের একজন মানুষ, কিন্তু তাঁর চেহারাটাই সৃষ্টিকর্তা এমনভাবে গড়ে দিয়েছেন যে দেখলে মনে হয় তিনি সামনের ব্যাক্তির চেহারাচরিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। অথচ এই মূহূর্তে তিনি দোকানের পিচ্চিটাকে বসিয়ে ট্রান্সলেশন শেখাচ্ছেন। তিনি চান না সে সারাজীবন পিচ্চিগিরি করে যাক, তাই কাজ দেয়ার পর থেকেই ওকে লেখাপড়া করাচ্ছেন।

কার্ডের সেকশনের সামনে এসেই মুমির মাথা খারাপ হয়ে গেল। কি যে সুন্দর সুন্দর কার্ড! আচ্ছা, মানুষ এত দামী দামী গিফট না দিয়ে সুন্দর সুন্দর কার্ড দিতে পারেনা? এই জিনিসটা নষ্টও হয়না, এর আবেদনও সময়ের সাথে কমে যায়না, প্রতিবার কার্ডটা দেখলেই মনের ভেতর জেগে ওঠে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব স্মৃতি।

পাশেই কে যেন ডাক দিল, 'শুনুন!' নির্ঘাত ওকে দোকানের স্টাফ ভেবে বসে আছে! ভাবতেই পারে। মুমি প্রায়ই এসে মোমেনা আন্টিকে দোকান সামলাতে সাহায্য করে।

সে বলল, 'স্বী, আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

লোকটা অল্পবয়সী, সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা, চেহারায় বয়সের ছাপ না থাকায় কেমন যেন স্কুলড্রেস স্কুলড্রেস মনে হচ্ছে, বলল, 'আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আমি কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। আমার হবু স্ত্রীর জন্য কিছু একটা উপহার কিনতে চাই। কিন্তু আমি কখনো মেয়েদের গিফট দেইনি, মানে মা খালা ফুপুদের যেসব গিফট দিয়েছি সেটা তো আর ওনাকে দেয়া যাবেনা, আপনি কি কিছু পরামর্শ দিতে পারেন কি কিনতে পারি?'

‘আপনি কি জানেন তিনি কি পছন্দ করেন?’

‘তেমন একটা ধারণা নেই, শুনেছি পড়তে ভালবাসেন, কিছু কিছু লেখালেখিও করেন’।

‘তাহলে আপনি তাঁকে কোন ভাল বই, অথবা ডায়রী বা কলম দিতে পারেন … সাথে সুন্দর একটা কার্ড (উফ, এইটা যে কেন বলল!) … আচ্ছা, আপনার বাজেট কেমন?’

‘সে যা চাইতে পারে তার সবটুকু এবং যা না চায় তার একশগুন, যদি আল্লাহ আমাকে সামর্থ্য দেন’, স্মিত হাসল লোকটা।

উত্তর শুনে মুমির চোখ কপালে, বুঝল বিয়ের আগেই প্রেমে পড়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বসে আছে এই লোক, কিন্তু এই অদ্ভুত বাজেটে কি কেনা যায়?

লোকটাকে নিয়ে বইখাতা কলমের সেকশনে যাবার পথে জুয়েলারী সেকশনের সামনে এক সেকেন্ডের জন্য থমকে দাঁড়ায় মুমি। মোমেনা আন্টি ভারী সুন্দর একটা লকেট এনেছে, চারদিকে লতাপাতা ফুল আর মাঝখানে ‘আল্লাহ’ লেখা। ছোট্ট একটা জিনিস, কিন্তু লকেটটা গোল্ডের, ওর সামর্থ্যের অনেক বাইরে, তাই প্রতিদিন তাকিয়ে দেখেই মনের সাধ মেটায় মুমি আর ভাবে কেউ যেন এটা না কেনে, একদিন পয়সা জমিয়ে ঠিক লকেটটা কিনে নেবে সে।

লোকটা একটা মোটা ব্রেসলেট দেখিয়ে বলে, ‘আচ্ছা, এটা কেমন?’

কল্পনার জগত থেকে বাস্তবতায় ফিরে আসে মুমি, ‘উনি যদি খুব ধনলিপ্সু না হন তাহলে এটা তাঁর ভাল লাগবেনা – এটা অনেক বেশি ভারী কিন্তু এর কোন ছিরিছাঁদ নেই। সরি, কথাটা কেমন যেন চাঁছাছোলা টাইপের হয়ে গেল’। নিজের ব্যাবহারে নিজেই লজ্জা পায় মুমি।

‘নাহ, আমি এমনটা পছন্দ করি। সরাসরি কথা বলাই ভাল, কাজের সুবিধা হয়, কনফিউশন হয়না’।

বেচারা ওর লজ্জা ঢাকার জন্য কত যে অনেস্টির বয়ান দিচ্ছে!

লোকটা আরো কয়েকটা জিনিস দেখল। ওর চোখ বারবার চলে যাচ্ছে ছোট্ট লকেটটার দিকে, ওটা আবার না নিয়ে যায়! অবশেষে লোকটা হাত বাড়ালো ওর প্রিয় লকেটটার দিকে, ‘হুমম, আমি এটাই নেব ঠিক করেছি’। মনটা খুব

খারাপ হয়ে গেল মুমির, তবে একটা মূহূর্তের জন্য, তারপর মনে হোল, লোকটির স্ত্রী লকেটটা পেয়ে কত খুশি হবে, ছোট্ট একটা জিনিস কিন্তু এটা ধারণ করে আছে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান নামটি!

লোকটি বলল, 'আমি এর সাথে একটি কলম আর একটি কার্ড দিতে চাই, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?'

দেখেশুনে একটু পুরোনো ধাঁচের একটি কলম পছন্দ হোল মুমির। এসব কলম আজকাল হয়ত কেউ তাকিয়েও দেখেনা, কিন্তু বহুকাল আগে রাজরাজড়ারা এ'ধরনের কলম ব্যাবহার করতেন। লোকটারও মনে হোল কলমটা খুব পছন্দ হোল। কার্ড কিনতে গিয়ে লোকটা ওর পছন্দ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি দেখছি দোকানের কোথায় কি আছে বেশ ভালোভাবেই জানেন, আপনি কি এই দোকানে অনেকদিন ধরে কাজ করেন?'

ঠোঁট কামড়ে ধরে মুমি, 'আমি এই দোকানে কাজ করিনা ভাই, মাঝে মাঝে এসে মোমেনা আন্টিকে সাহায্য করি যখন কাজ খুব বেশি থাকে। কিন্তু আজ এসেছি গিফট কিনতে'।

'সরি সরি সরি', ভীষণ লজ্জা পেল লোকটা, 'আমি তো আরো আপনাকে দোকানের স্টাফ ভেবে ...', শীঘ্রই সামলে নিলো সে, 'আচ্ছা, শোধবোধ করে দেই। আপনি কি কিনবেন বলুন, এবার আমার আপনাকে সাহায্য করার পালা'।

মুমি কিছুক্ষণ 'না, দরকার নেই, কি দরকার' টাইপের ভদ্রতা করে পরে ভাবল আসলেই তো সে আগে কখনো ছেলেদের জন্য গিফট কেনেনি, বাবা চাচা ভাইদের জন্য যা কেনে তা তো আর একটা লোকের বিয়ের গিফট হতে পারেনা! এক্ষেত্রে একজন পুরুষ হয়ত তাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারবে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে সে। লোকটা ঝটপট বলে, 'আপনার ভাইয়ের বন্ধু কি ধরনের মানুষ? তাঁর রুচিপছন্দ কেমন?'

'ভাইয়ার বন্ধুদের আমি কেবল নামেই চিনি, তাদের ব্যাপারে তেমন কিছু জানিনা। এই ভদ্রলোক সম্ভবত পড়তে খুব পছন্দ করেন'।

'তাহলে বই দিন'।

'কিন্তু কি ধরনের বই দেব? একেকজনের রুচি পছন্দ তো একেক রকম। তাছাড়া ভাইয়া এত্তগুলো টাকা দিয়েছে, একটাকাও ফেরত নেয়া যাবেনা। বইয়ের দাম তো কম। কিভাবে এতগুলো টাকা খরচ করব?'

'চলুন, আমি দেখাচ্ছি'।

খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল দু'জনে মিলে অল্পকিছুক্ষণের ভেতরেই অনেকগুলো বই একত্রিত করে ফেলেছে। বইয়ের ব্যাপারে লোকটার রুচি বেশ ভাল। কিন্তু এতগুলো বই সে আল্লাতেও পারবেনা, এখানেই রেখে যেতে হবে, পরে ভাইয়া এসে নিয়ে গেলে ভাল, নইলেও ওর দায়িত্ব শেষ। সব হিসবটিশেব করে দেখা গেল সাতটাকা বাকী। ঐ টাকা দিয়ে ভারী সুন্দর একটা কার্ড কিনে নিলো মুমি।

কেনাকাটা শেষে লোকটা ওর শখের লকেটটা, ওর পছন্দের কলমটা আর ওর প্রিয় কার্ডটা নিয়ে চলে গেল। মুমি পছন্দ করা বইগুলো মোমেনা আন্টির কাছে জমা রেখে কার্ডটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, বুকে সামান্য একটু চাপা কষ্ট, কিন্তু মোমেনা আন্টিকে আজ কেন যেন অনেক বেশি উচ্ছল দেখাচ্ছে, এতেই ওর দিনটা সুখময় হয়ে উঠল!

পরের কথাঃ

মুমতাহিনাদের বাসায় আজ অনেক মেহমান আসার কথা। একজনকেও সে চেনেনা। কিন্তু সারাদিন কাজ করে করে হয়রান হয়ে গেল। আম্মু বারবার বলছে, 'তোকে এত কাজ করতে কে বলেছে? যা, তুই তোর রুম গোছগাছ কর'। কিন্তু মা কি আর একা একা এত কাজ সামলাতে পারবে? সে বলে, 'আম্মু, আমার রুম কি ভাইয়ার রুম পেয়েছ? আমার রুম সবসময় গুছানো থাকে। তোমার ডিম ছিলতে হবেনা। তুমি শুধু ইন্সট্রাকশন দাও, বাকীটা আমি আর রহিমা খালা মিলে করতে পারব'।

বিকালে মেহমান এলো। মহিলারা অন্দরমহলে আর পুরুষরা ড্রয়িংরুমে। মোমেনা আন্টি, যিনি কিনা দোকান ছেড়ে এক মূহূর্তের জন্যও নড়েন না, উনিও এলেন! একজন খালাম্মা মুমিকে খুব আদর করে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। সন্ধ্যায় মা মুমিকে একদিকে টেনে নিয়ে জানালেন, 'এরা তোকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু ওদের তোকে এত পছন্দ হয়েছে যে ওরা আজই আকদ পরিয়ে রাখতে চান। তুই কি বলিস?'

মুমি একটু অবাক হোল, কিন্তু খুশিও হোল। ওর বান্ধবীদের অনেককেই হবু শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের সামনে প্যারেড করে নিজের সৌন্দর্য এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বিয়ে করতে হয়েছে। এরা তো ওকে বুঝতেই দেননি যে ওরা ওকে দেখতে এসেছেন। ওদের বাড়ীর পুরুষরা তো ওকে দেখেইনি! ছেলেটাও না দেখে রাজী হয়ে গেল! ভাল লাগল ওদের আচরন। তাই বলল, 'তোমরা নিশ্চয়ই আগেই খোঁজখবর সেরে রেখেছ। তোমাদের বিবেচনার ওপর আমার কোন কথা নেই। তবে ছেলে আমাকে না দেখেই রাজী হয়ে গেল?'

মা বললেন, 'সে তোকে দেখেছে। দেখে অত্যন্ত পছন্দ করেছে। আমি তাহলে যাই, তোর আব্বাকে জানাই'।

মুমি ভাবলো, ‘চেহারা দেখেই পছন্দ করে বসে আছ বাপু! তোমার মাকে ভাল লাগল দেখেই রাজী হলাম, তুমি কি চিজ তা আল্লাহই জানেন!’

কিছুক্ষণ পর ওর মা আর হবু শ্বাশুড়ি রুমে ঢুকলেন, ‘এই যে দেখ উনি তোর জন্য কত্ত সুন্দর একটা ড্রেস এনেছেন! চল, পরে নে’।

শ্বাশুড়ি বললেন, ‘মাগো, আমার ছেলেটাকে বলেছিলাম আমার হবু মেয়েটার জন্য একটা আংটি কিনতে, কিন্তু আমার গাধা ছেলেটা এগুলো নিয়ে এসেছে। প্যাকেটটা খুলে দেখ তোমার পছন্দ হয় কিনা। ওকে কিন্তু তোমারই মানুষ করতে হবে মা’।

ওকে পোশাক পরিবর্তনের জন্য তাগাদা দিয়ে দু’জনেই চলে গেলেন। ও জামাটা বদলে ভাবল, বিনা নোটিসেই নতুন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে সে, শেষবারের মত নিজের করে দম নেয়ার জন্য কয়েকটা মূহূর্ত নিলে নিশ্চয়ই ঘোরতর কোন অন্যায় হবেনা! বিছানায় বসতেই হাতে প্যাকেটটা লাগল। আনমনেই র‍্যাপিং পেপারটা খুলতে শুরু করল সে, ‘দেখি বাছাধন তুমি কি বস্তু!’

প্যাকেট থেকে বেরোল একটা পুরোনো ধাঁচের কলম, যেমনটা আগেকার দিনে রাজরাজড়ারা ব্যাবহার করতেন, লতাপাতায় ঘেরা একটা লকেট যার মধ্যখানে ‘আল্লাহ’ লেখা, আর একটা কার্ড যেটা আগেও ওর হাতের ছোঁয়া পেয়েছে, তাতে লেখা, ‘আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, ‘কি বোকা ছেলে রে বাবা! না দেখেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল? কিন্তু আমি চাইনি যাকে আমি সবচেয়ে বেশি সম্মানের পাত্রী মনে করি তাকে এমন অযাচিত পরিস্থিতিতে ফেলতে যেখানে সে কষ্ট পেতে পারে, অসম্মানিত বোধ করতে পারে। তাই সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী আপনার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটালাম, আপনাকে জানার চেষ্টা করলাম, নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। ভাবছেন, কয়েক মিনিট একটা মানুষের সাথে কথা বললেই বুঝি তার ব্যাপারে কোন সম্মক ধারণা করা যায়? আসলে কিন্তু যায়। ঐ অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বুঝেছি আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন; জীবনের পংকিল দিক আপনাকে কখনো স্পর্শ করেনি তাই আপনি সরলমনে সবাইকে বিশ্বাস করেন এবং সাহায্যের হাত নিয়ে এগিয়ে আসেন; আমার মতই আপনি বই পড়তে ভালোবাসেন এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আপনি নিরাসক্ত; নিজের চাইতে আপনি অপরের সুখকে প্রাধান্য দিতে পারেন এবং আপনার রুচি বেশ উন্নতমানের। কি ঠিক বলিনি? বাকীটাও কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। আমি আসলেই চাই আমার সামর্থ্যের মধ্যে সবচেয়ে ভালোটুকু আপনাকে দিতে যেহেতু আপনিই মায়া দিয়ে মমতা দিয়ে আমাদের সংসারটাকে বেঁধে রাখবেন; যেহেতু আপনিই ভোরবেলা আমাকে নামাজের জন্য ডেকে তুলবেন; যেহেতু আপনিই আমাকে অন্যায়ের দিকে অগ্রসর হতে দেখলে বাঁধা দেবেন; যেহেতু আপনিই আমার সামর্থ্যের অভাব দেখলে নিজের প্রয়োজনের কথা চেপে যাবেন – তাই আপনাকে আমি তাও দিতে চাই যা আপনি চান, আবার সেটাও দিতে চাই যা আপনি কোনদিন মুখ ফুটে বলবেন না। আপনি কবুল করলে আমি নিজেকেই গিফট করে দিতে চাই! কি, এবার বিয়ে করতে রাজী? না আরো বয়ান দেব?’

বাহ, এই অল্পবয়সী ছেলেটা এত বুদ্ধিমত্তার সাথে ওকে দেখে নিলো যে সে টেরই পেলোনা, এত সুন্দর একটা চিঠি লিখল যে ওর কলমটা তাকে গিফট করে দিতে ইচ্ছে করছে, এত সম্মান করল ওকে যে ওর নিজেকেই গিফট করে দিতে ইচ্ছে করছে! সে মনে মনে লাজুক হাসি হেসে একা একাই বলল, ‘কবুল!’

বাতিঘর

26 September 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

কোণাচোখে তারিককে পাশের টেবিলে আরাম করে বসতে দেখে জামিল দ্রুত গলা নামিয়ে বলে, 'শুনুন, আপনি কিন্তু কিছুতেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবেননা'। ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে যায় ফারজানা। সে লোকটাকে চেনেনা, জানেনা, কোন সালাম নেই, সম্ভাষন নেই, হুট করে এই আচমকা অনুরোধ! তারিকের দিকে জামিলের চোরা চাহনি, ফিসফিস কথা বলার ভঙ্গি আর এই অদ্ভুত প্রস্তাব- সব মিলিয়ে কিম্ভুত এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ হাসি পেয়ে যায় ওর। হাসি চাপার চেষ্টা করতে করতে সে স্মিত হেসে বলে, 'আসসালামু আলাইকুম'। এবার নিজের অভদ্র আচরন স্মরন করে জামিল নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, লজ্জা লজ্জা চেহারায় টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। 'আমার নাম ফারজানা'। 'জ্বি, তারিক ভাই এইমাত্র বললেন। আমি জামিল'। 'আপনার মত আমিও আসলে এখন বিয়ে করতে উৎসাহী নই। কিন্তু আমি যদি এই মূহূর্তে উঠে চলে যাই তাহলে বিয়ে করবনা বললে ভাইয়া কিছুতেই কনভিন্সড হবেনা।

সুতরাং, আমাদের মনে হয় কিছুক্ষণ অন্তত কথা বলার অভিনয় করা উচিত'। জামিল বুঝতে পারল কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু সে কি বলবে? ওর তো এটুকুই শুধু বলার ছিল! ফারজানাই এগিয়ে এলো, 'আচ্ছা, আপনি বিয়ে করতে না চাইলে দেখা করতে চাইলেন কেন? আপনি তো মেয়ে না যে কেউ আপনাকে জোর করে বাধ্য করতে পারবে!' জামিল ওর দিকে তাকালে দেখতে পেত ওর চোখের তারায় কৌতুক, কিন্তু টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকায় সে ফারজানার কথায় দুষ্টুমির ভাবটা ধরতে পারলনা। খুব অপরাধী, মাটির সাথে মিশে যেতে পারলে বাঁচে এমন চেহারা করে আমতা আমতা করে বলতে লাগল, 'আসলে আমার বাবামা ভাইবোন কেউ নেই। চাচা চাচীর কাছে মানুষ। এখন শহরে থাকি বলে তাঁদের সাথেও তেমন যোগাযোগ হয়না। একা থাকি বলে তাঁদের চিন্তার অন্ত নেই। চাচা তাঁর এক বন্ধুকে বললেন আমার জন্য মেয়ে দেখতে। আমার নিজের কোন কুলকিনারা নেই, সাধারন একটা পেটেভাতে চাকরী করি, ছোট্ট একটা দু'কামরার ঘরে ভাড়া থাকি- এই জীবনে কাউকে জড়িয়ে কষ্টে ফেলে লাভ আছে? কিন্তু চাচা চাচী কিছুতেই বুঝতে চান না। চাচার এক বন্ধু আপনার ভাইকে চেনেন। ওঁরা আমাকে এমনভাবে ধরলেন যে মেয়ে না দেখে কোন সিদ্ধান্তই তারা শুনবেন না। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে হোল। আপনাকে এখানে আসতে বাধ্য করা হয়ে থাকলে সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্লীজ আমাকে মাফ করে দেবেন'। জামিলের হাবভাবে এবার ফারজানা কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারলনা, খিক করে একটু হাসি দিয়েই মুখে হাত চেপে ধরল। এবার জামিল থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি এমন কিছু বলেছি যা আপনার অস্বাভাবিক মনে হয়েছে?' ফারজানা হাসি সংযত করার চেষ্টা করে বলে, 'নাহ, তবে আপনার চেহারায় কেমন যেন একটা চোর চোর মার্কা দুঃখী দুঃখী ভাব আছে, হি হি...' 'চোর চোর?', কনফিউজড হয়ে যায় জামিল। 'জ্বি, আদিব, আমার ভাইয়ের ছেলেটা বিস্কিট চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে যেমন চেহারা বানায় আপনার চেহারাটা ঠিক তেমন লাগছে, হি হি হি...' এবার জামিলও হেসে ফেলে। 'আচ্ছা, আপনি কি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন?' অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ পরিবর্তনে আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় জামিল, শুধু উত্তর দিতে পারে, 'জ্বি'। 'আপনি কি লেখাপড়া করতে পছন্দ করেন? যেমন কুর'আন হাদিস পড়া, গল্পের বই পড়া, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা ইত্যাদি?' 'জ্বি, নিয়মিত পড়ি'। 'আপনি কি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন?' 'জ্বি', কথাবার্তা যে কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই ঠাহর করতে পারেনা জামিল।

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আপনাকে সেই উদ্দেশ্যের কাছে পৌঁছে দেবেন?' 'জ্বি'। 'তাহলে আপনার কি মনে হয় আপনার কথায় এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়? নাকি আপনার মন বিশ্বাসের কথা বললেও মুখ অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়?' বাক্যালাপ এখানে এসে ঠেকবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি জামিল। কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটি তাকে এমন এক রূঢ় সত্যের সম্মুখীন করে দিয়েছে যা সে কখনো ভেবেও দেখেনি। সময় তাকে এমন এক ব্যাক্তিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে যে বিশ্বাসের কথা বলে অথচ নিরাশায় ভোগে, যে আত্মীয়তার জন্য হাহাকার করে অথচ আত্মীয়তার বন্ধনের মূল্যায়ন করতে পারেনা, যে আল্লাহর

ওপর নির্ভরতার কথা বলে অথচ কারো দায়িত্ব নেয়ার জন্য নিজেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেনা। হা করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন জবাব দিতে পারেনা সে। ওদিকে তারিক উঠে দাঁড়ায়, ফারজানাও সালাম দিয়ে ভাইকে অনুসরন করে। তারিক আর ফারজানাকে বিদায় দিয়ে আবার রেস্টুরেন্টের বে-আরাম চেয়ারটাতে বসে ভাবতে থাকে জামিল, মেয়েটা তাকে কি বলে গেল?

দু'ঘন্টা পর, ফারজানার বাসায়ঃ

'অ্যাই বলনা ছেলেটা দেখতে কেমন ছিল?' 'সত্যি ভাবী, আমি খেয়াল করিনি। খুব বেশি খারাপ হলে হয়ত খেয়াল করতাম'। 'তাহলে আমার যে ননদিনি এতদিন বিয়ে করতে রাজী হয়নি সে কি দেখে একঘন্টায় বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল?' 'ওহ, তুমি এটা জানতে চাও? বললেই তো হত!', চোখ টিপে হেসে ফেলে ফারজানা। 'স্বি ফারজু বিবি, এটাই জানতে চাই', গালে হাত দিয়ে কৌতুহল প্রকাশ করেন ভাবী। 'শোন তাহলে- লোকটাকে দেখে মনে হোল আমি এই লোকটার জীবনে কিছু একটা অবদান রাখতে পারব, তার বিশ্বাসকে পূর্ণতা দান করতে সাহায্য করতে পারব, তার সাথী হতে পারব। অধিকাংশ পুরুষ বিয়ে করার সময় কাজের মেয়ে খোঁজে। ভাবী, আমার ঘরের কাজ আমি করব, তাতে আপত্তির কি আছে? কিন্তু সেটাই যদি বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় সেটা আমি মেনে নিতে পারিনা'। 'তা তো ঠিক আছে ফারজু বিবি। কিন্তু তোমার ভাইয়া বলল ছেলেটাকে দেখে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী মনে হয়নি, আমি ভাবছি তুমি তার জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে তা সে মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কিনা', চিন্তিত মনে হয় ভাবীকে। 'ভাবী, লোকটাকে দেখে মনে হোল খুব সরল আর লাজুক প্রকৃতির কিন্তু বোকা না। উনি নানা কারণে জীবনের প্রতি আশাহত কিন্তু এই আশা জাগিয়ে তোলার মত বিশ্বাস ওনার মনের কোণে কোথাও অবশিষ্ট আছে'। 'তাহলে আশা করি তুমি তার সেই ভঙ্গুর আশালতায় কোথাও দোলা দিতে পেরেছ', ফারজানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকান ভাবী। বাপমা মরা এই মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মত করেই বড় করেছে তিনি। কোনদিন ওর বিশ্বাসে এতটুকু চির ধরতে দেননি। এই আশার উজ্জ্বল প্রদীপ, এই বাতিঘর যদি সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া কোন নাবিককে পথ দেখাতে পারে, পারে আরেকটি ঘরকে আলোকিত করতে, তবে এর চেয়ে বেশি আর কি সাফল্য আশা করতে পারেন তিনি?

তিনদিন পর, নদীর ধারেঃ

'মেয়েটা যে তোর জন্য perfect তা কি এখন তোর মাথায় ঢুকেছে না আরো সময় লাগবে?', রোদের জন্য ভ্রু কুঁচকে জামিলের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে কামাল। জামিলের মুখটা ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, ওটা কি রোদের আলো না আশার? 'হিসেব করছি রে দোস্ত। কথায় কথায় ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদবে, বাচ্চাদের মত আবদার করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এমন বৌয়ের ভীতি থেকেই বিয়ে করতে অনীহা বোধ করতাম। কিন্তু এই মেয়েটা প্র্যাক্টিকাল, সেন্সিবল, স্মার্ট, বুদ্ধিমতি এবং ঠিক আমার মত পরিস্থিতিতে বড় হয়েও ওর বিশ্বাসটা অত্যন্ত মজবুত। আমার জীবনের এক বিরাট সত্য সে আমাকে কি অবলীলায় বুঝিয়ে দিল মনে একটুও কষ্ট না দিয়ে! এই সাহচর্য আমার প্রয়োজন, ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস দিয়ে দুঃখগুলোকে দেখা বন্ধ করার জন্য ওর হাসির জোয়ার আমার জীবনে দরকার, সবচেয়ে বড় কথা ওর বিশ্বাসের শক্ত খুঁটিটা হতে পারে আমার জীবনের সে অবলম্বন যা আমি এতদিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি'। 'তাহলে তুই দেরি করছিস কিসের জন্য?' 'মেয়েটা যে বলল সে বিয়ে করতে আগ্রহী না!' 'তুই জিজ্ঞেস

করেছিলি, কেন?' 'নাহ'। 'গাধা কোথাকার! জিজ্ঞেস করবিনা?', ঈষৎ বিরক্ত হয় কামাল, পরক্ষণেই আবার আশাবাদী হয়ে ওঠে, 'যাক, সে বুদ্ধিমতি মেয়ে, ঠিকই বুঝতে পারবে তোর জীবনে সে ফ্রেন্ড, গাইড অ্যান্ড ফিলোসফার হয়ে বিরাজ করতে পারবে। একজন বুদ্ধিমতি মেয়ের জন্য এটাই বড় প্রাপ্তি'। 'কিন্তু ওর আমাকে পছন্দ হোল কি'না কিভাবে জানব?' 'ওরে দোস্ত, ওর পরিবারের সাথে কথা বল, নাহলে জানবি কি করে?' 'ওঁরা যদি না করে দেয়?' 'হ্যাঁও তো বলতে পারে। তুই আগেই নিরাশ হলে মেয়েটা তোকে শেখালটা কি?' মাথা নাড়ে জামিল, আজই কথা বলতে হবে। 'তা মেয়েটা দেখতে কেমন রে?' 'খেয়াল করিনি তো!', নিজেই অবাক হয় জামিল, 'কিন্তু খুব বেশি খারাপ না মনে হয়, তাহলে হয়ত খেয়াল করতাম'। খুশি হয় কামাল, 'যারা মানুষের অন্তর দেখে পছন্দ করে তারাই মেয়ে দেখে এসে বলতে পারে চেহারা খেয়াল করেনি। এই বিয়ে হলে তুই ঠকবি না দোস্ত'। উঠে দাঁড়ায় দু'জনে, আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ স্লোগান ছাড়ে কামাল, 'জামিল তুই এগিয়ে চল, আমরা আছি তোর সাথে'। হো হো করে হেসে ফেলে দু'জনে।

ছয়মাস পরঃ

'আজকে তোমার নতুন চাকরী, এত সুন্দর জামাকাপড় পরেছ অথচ চুলটা আঁচড়াওনি। একটু গেলাম রান্নাঘরে আর ব্যাস, তোমার ফাঁকিঝুঁকি শুরু! তোমাকে নিয়ে আমি কি করি বলত?', ব্যাস্তসমস্ত হয়ে পাশের রুম থেকে চিরুনী হাতে দৌড়ে আসে ফারজানা। টেবিলে ঠান্ডা হতে দিয়ে যাওয়া খাবারগুলো টিফিন ক্যারিয়ারে ভরতে ভরতে জামিল বলে, 'আমি চুল আঁচড়ালে সকাবেলা আমার মাথায় তোমার হাতের স্পর্শ নিয়ে বেরোব কি করে বলত? তুমি সকালে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে আমার সারাদিন মাথা ঠান্ডা থাকে, একদম যেন তিব্বত কদুর তেলের বিজ্ঞাপনের মত!' 'হি হি হি', ওকে হাসতে দেখে জামিলের হাসিটাও ঠোঁটের একপাশ থেকে পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে। জামিলকে শেষপর্যন্ত হাসতে শেখাতে পেরেছে ফারজানা, ওর দুষ্টুমিগুলো এখন সে কিছু কিছু বোঝে, নিজেও দুষ্টুমি করতে শুরু করেছে দেখে বেশ উৎফুল্ল হয় সে। 'যাবার পথে চাচা চাচীকে ফোন করে জানিয়ো নতুন চাকরিতে যাচ্ছ'। 'ওঁরা জানেন তো'। 'তাতে কি হয়েছে? ফোন করে জানাও, খুশি হবেন। আর বিকালে ফিরলে চাচীর জন্য শাড়ি কিনব যেন আগামী বৃহস্পতিবার নিয়ে যেতে পারি। আগামী মাসে বেতন পেলে চাচাকে পাঞ্জাবী কিনে দেব'। 'আর তুমি কি কিনবে?' 'বাহ, তোমার মতন এমন একটা চমৎকার গিফট থাকতে আমার আর কি লাগবে?' মনে মনে একই কথা ভাবে জামিল, কিন্তু ওর মত সাবলীলভাবে বলতে পারেনা। বেহেস্তের টুকরোর মত বৌটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। 'তুমি কি চাও তোমার নতুন অফিসে প্রথমদিন লেট হোক?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জুতো পায়ে দিতে দিতে আবার ফারজানার দিকে তাকায় জামিল। 'যাআআআও', বলে হাতে টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে গুঁজে দিয়ে দরজা খুলে ওকে প্রায় ঠেলে বের করে দেয় ফারজানা। শেষ একবার পেছন ফিরে তাকালে ফারজানা মিষ্টি হেসে বলে, 'আসসালামু আলাইকুম'। এই স্বর্গীয় সম্ভাষন কানে নিয়েই প্রতিদিন পৃথিবীর বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু হয় জামিলের, সে স্মিত হেসে জবাব দেয়, 'ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।

এখনো রিক্সা পেতে দেরী হয়, বাসে ভিড় ঠেলে উঠতে কষ্ট হয়, অফিসে ঝামেলা হয়, দোকানে দরদাম নিয়ে মন কষাকষি হয়, দু'কামরার ঘরটাতে চাপাচাপি হয়, কোন কোনদিন ভাল তরকারীও থাকেনা। তবু কেন যেন পৃথিবীটাকে আর আগের মত জটিল মনে হয়না। দিনের শেষে ওর জীবনে আছে এমন এক সাথী যে ওর সুখদুঃখ সব সমানভাবে ভাগাভাগি করে নেয়, যে ওর কষ্টগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে, যে ওর বিশ্বাসকে এক আলোর তৈরী মিনারের মত উচ্চকিত করে তোলে। হাসি পায় এই ভেবে যে এই দুই শ্রেষ্ঠ বন্ধুর প্রথম বাক্যালাপ ছিল, 'আপনি কিন্তু কিছুতেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবেননা'!

বাতিঘর

26 September 2014 at 01:21

কোণাচোখে তারিককে পাশের টেবিলে আরাম করে বসতে দেখে জামিল দ্রুত গলা নামিয়ে বলে, ‘শুনুন, আপনি কিন্তু কিছুতেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবেননা’। ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে যায় ফারজানা। সে লোকটাকে চেনেনা, জানেনা, কোন সালাম নেই, সম্ভাষন নেই, হুট করে এই আচমকা অনুরোধ! তারিকের দিকে জামিলের চোরা চাহনি, ফিসফিস কথা বলার ভঙ্গি আর এই অদ্ভুত প্রস্তাব- সব মিলিয়ে কিম্ভুত এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ হাসি পেয়ে যায় ওর। হাসি চাপার চেষ্টা করতে করতে সে স্মিত হেসে বলে, ‘আসসালামু আলাইকুম’। এবার নিজের অভদ্র আচরন স্মরন করে জামিল নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, লজ্জা লজ্জা চেহারায় টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’। ‘আমার নাম ফারজানা’। ‘স্বি, তারিক ভাই এইমাত্র বললেন। আমি জামিল’। ‘আপনার মত আমিও আসলে এখন বিয়ে করতে উৎসাহী নই। কিন্তু আমি যদি এই মূহূর্তে উঠে চলে যাই তাহলে বিয়ে করবনা বললে ভাইয়া কিছুতেই কনভিন্সড হবেনা।

সুতরাং, আমাদের মনে হয় কিছুক্ষণ অন্তত কথা বলার অভিনয় করা উচিত'। জামিল বুঝতে পারল কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু সে কি বলবে? ওর তো এটুকুই শুধু বলার ছিল! ফারজানাই এগিয়ে এলো, 'আচ্ছা, আপনি বিয়ে করতে না চাইলে দেখা করতে চাইলেন কেন? আপনি তো মেয়ে না যে কেউ আপনাকে জোর করে বাধ্য করতে পারবে!' জামিল ওর দিকে তাকালে দেখতে পেত ওর চোখের তারায় কৌতুক, কিন্তু টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকায় সে ফারজানার কথায় দুষ্টুমির ভাবটা ধরতে পারলনা। খুব অপরাধী, মাটির সাথে মিশে যেতে পারলে বাঁচে এমন চেহারা করে আমতা আমতা করে বলতে লাগল, 'আসলে আমার বাবামা ভাইবোন কেউ নেই। চাচা চাচীর কাছে মানুষ। এখন শহরে থাকি বলে তাঁদের সাথেও তেমন যোগাযোগ হয়না। একা থাকি বলে তাঁদের চিন্তার অন্ত নেই। চাচা তাঁর এক বন্ধুকে বললেন আমার জন্য মেয়ে দেখতে। আমার নিজের কোন কুলকিনারা নেই, সাধারন একটা পেটেভাতে চাকরী করি, ছোট্ট একটা দু'কামরার ঘরে ভাড়া থাকি– এই জীবনে কাউকে জড়িয়ে কষ্টে ফেলে লাভ আছে? কিন্তু চাচা চাচী কিছুতেই বুঝতে চান না। চাচার এক বন্ধু আপনার ভাইকে চেনেন। ওঁরা আমাকে এমনভাবে ধরলেন যে মেয়ে না দেখে কোন সিদ্ধান্তই তারা শুনবেন না। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে হোল। আপনাকে এখানে আসতে বাধ্য করা হয়ে থাকলে সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্লীজ আমাকে মাফ করে দেবেন'। জামিলের হাবভাবে এবার ফারজানা কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারলনা, খিক করে একটু হাসি দিয়েই মুখে হাত চেপে ধরল। এবার জামিল থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি এমন কিছু বলেছি যা আপনার অস্বাভাবিক মনে হয়েছে?' ফারজানা হাসি সংযত করার চেষ্টা করে বলে, 'নাহ, তবে আপনার চেহারায় কেমন যেন একটা চোর চোর মার্কা দুঃখী দুঃখী ভাব আছে, হি হি...' 'চোর চোর?', কনফিউজড হয়ে যায় জামিল। 'জ্বি, আদিব, আমার ভাইয়ের ছেলেটা বিস্কিট চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে যেমন চেহারা বানায় আপনার চেহারাটা ঠিক তেমন লাগছে, হি হি হি...' এবার জামিলও হেসে ফেলে। 'আচ্ছা, আপনি কি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন?' অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ পরিবর্তনে আবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় জামিল, শুধু উত্তর দিতে পারে, 'জ্বি'। 'আপনি কি লেখাপড়া করতে পছন্দ করেন? যেমন কুর'আন হাদিস পড়া, গল্পের বই পড়া, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা ইত্যাদি?' 'জ্বি, নিয়মিত পড়ি'। 'আপনি কি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন?' 'জ্বি', কথাবার্তা যে কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই ঠাহর করতে পারেনা জামিল।

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সৃষ্টিকর্তা আপনাকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আপনাকে সেই উদ্দেশ্যের কাছে পৌঁছে দেবেন?' 'জ্বি'। 'তাহলে আপনার কি মনে হয় আপনার কথায় এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়? নাকি আপনার মন বিশ্বাসের কথা বললেও মুখ অবিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়?' বাক্যালাপ এখানে এসে ঠেকবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি জামিল। কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটি তাকে এমন এক রূঢ় সত্যের সম্মুখীন করে দিয়েছে যা সে কখনো ভেবেও দেখেনি। সময় তাকে এমন এক ব্যাক্তিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে যে বিশ্বাসের কথা বলে অথচ নিরাশায় ভোগে, যে আত্মীয়তার জন্য হাহাকার করে অথচ আত্মীয়তার বন্ধনের মূল্যায়ন করতে পারেনা, যে আল্লাহর ওপর নির্ভরতার কথা বলে অথচ কারো দায়িত্ব নেয়ার জন্য নিজেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেনা। হা করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন জবাব দিতে পারেনা সে। ওদিকে তারিক উঠে দাঁড়ায়, ফারজানাও সালাম দিয়ে ভাইকে অনুসরন করে। তারিক আর ফারজানাকে বিদায় দিয়ে আবার রেস্টুরেন্টের বে-আরাম চেয়ারটাতে বসে ভাবতে থাকে জামিল, মেয়েটা তাকে কি বলে গেল?

দু'ঘন্টা পর, ফারজানার বাসায়ঃ

'অ্যাই বলনা ছেলেটা দেখতে কেমন ছিল?' 'সত্যি ভাবী, আমি খেয়াল করিনি। খুব বেশি খারাপ হলে হয়ত খেয়াল করতাম'। 'তাহলে আমার যে ননদিনি এতদিন বিয়ে করতে রাজী হয়নি সে কি দেখে একঘন্টায় বিয়ে করতে রাজী

হয়ে গেল?' 'ওহ, তুমি এটা জানতে চাও? বললেই তো হত!', চোখ টিপে হেসে ফেলে ফারজানা। 'স্বি ফারজু বিবি, এটাই জানতে চাই', গালে হাত দিয়ে কৌতুহল প্রকাশ করেন ভাবী। 'শোন তাহলে- লোকটাকে দেখে মনে হোল আমি এই লোকটার জীবনে কিছু একটা অবদান রাখতে পারব, তার বিশ্বাসকে পূর্ণতা দান করতে সাহায্য করতে পারব, তার সাথী হতে পারব। অধিকাংশ পুরুষ বিয়ে করার সময় কাজের মেয়ে খোঁজে। ভাবী, আমার ঘরের কাজ আমি করব, তাতে আপত্তির কি আছে? কিন্তু সেটাই যদি বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় সেটা আমি মেনে নিতে পারিনা'। 'তা তো ঠিক আছে ফারজু বিবি। কিন্তু তোমার ভাইয়া বলল ছেলেটাকে দেখে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী মনে হয়নি, আমি ভাবছি তুমি তার জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে তা সে মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কিনা', চিন্তিত মনে হয় ভাবীকে। 'ভাবী, লোকটাকে দেখে মনে হোল খুব সরল আর লাজুক প্রকৃতির কিন্তু বোকা না। উনি নানা কারণে জীবনের প্রতি আশাহত কিন্তু এই আশা জাগিয়ে তোলার মত বিশ্বাস ওনার মনের কোণে কোথাও অবশিষ্ট আছে'। 'তাহলে আশা করি তুমি তার সেই ভঙ্গুর আশালতায় কোথাও দোলা দিতে পেরেছ', ফারজানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকান ভাবী। বাপমা মরা এই মেয়েটাকে নিজের মেয়ের মত করেই বড় করেছে তিনি। কোনদিন ওর বিশ্বাসে এতটুকু চির ধরতে দেননি। এই আশার উজ্জ্বল প্রদীপ, এই বাতিঘর যদি সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া কোন নাবিককে পথ দেখাতে পারে, পারে আরেকটি ঘরকে আলোকিত করতে, তবে এর চেয়ে বেশি আর কি সাফল্য আশা করতে পারেন তিনি?

তিনদিন পর, নদীর ধারেঃ

'মেয়েটা যে তোর জন্য perfect তা কি এখন তোর মাথায় ঢুকেছে না আরো সময় লাগবে?', রোদের জন্য ভ্রু কুঁচকে জামিলের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে কামাল। জামিলের মুখটা ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, ওটা কি রোদের আলো না আশার? 'হিসেব করছি রে দোস্ত। কথায় কথায় ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদবে, বাচ্চাদের মত আবদার করে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে এমন বৌয়ের ভীতি থেকেই বিয়ে করতে অনীহা বোধ করতাম। কিন্তু এই মেয়েটা প্র্যাক্টিকাল, সেন্সিবল, স্মার্ট, বুদ্ধিমতি এবং ঠিক আমার মত পরিস্থিতিতে বড় হয়েও ওর বিশ্বাসটা অত্যন্ত মজবুত। আমার জীবনের এক বিরাট সত্য সে আমাকে কি অবলীলায় বুঝিয়ে দিল মনে একটুও কষ্ট না দিয়ে! এই সাহচর্য আমার প্রয়োজন, ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস দিয়ে দুঃখগুলোকে দেখা বন্ধ করার জন্য ওর হাসির জোয়ার আমার জীবনে দরকার, সবচেয়ে বড় কথা ওর বিশ্বাসের শক্ত খুঁটিটা হতে পারে আমার জীবনের সে অবলম্বন যা আমি এতদিন খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি'। 'তাহলে তুই দেরি করছিস কিসের জন্য?' 'মেয়েটা যে বলল সে বিয়ে করতে আগ্রহী না!' 'তুই জিজ্ঞেস করেছিলি, কেন?' 'নাহ'। 'গাধা কোথাকার! জিজ্ঞেস করবিনা?', ঈষৎ বিরক্ত হয় কামাল, পরক্ষণেই আবার আশাবাদী হয়ে ওঠে, 'যাক, সে বুদ্ধিমতি মেয়ে, ঠিকই বুঝতে পারবে তোর জীবনে সে ফ্রেন্ড, গাইড অ্যান্ড ফিলোসফার হয়ে বিরাজ করতে পারবে। একজন বুদ্ধিমতি মেয়ের জন্য এটাই বড় প্রাপ্তি'। 'কিন্তু ওর আমাকে পছন্দ হোল কি'না কিভাবে জানব?' 'ওরে দোস্ত, ওর পরিবারের সাথে কথা বল, নাহলে জানবি কি করে?' 'ওঁরা যদি না করে দেয়?' 'হ্যাঁও তো বলতে পারে। তুই আগেই নিরাশ হলে মেয়েটা তোকে শেখালটা কি?' মাথা নাড়ে জামিল, আজই কথা বলতে হবে। 'তা মেয়েটা দেখতে কেমন রে?' 'খেয়াল করিনি তো!', নিজেই অবাক হয় জামিল, 'কিন্তু খুব বেশি খারাপ না মনে হয়, তাহলে হয়ত খেয়াল করতাম'। খুশি হয় কামাল, 'যারা মানুষের অন্তর দেখে পছন্দ করে তারাই মেয়ে দেখে এসে বলতে পারে চেহারা খেয়াল করেনি। এই বিয়ে হলে তুই ঠকবি না দোস্ত'। উঠে দাঁড়ায় দু'জনে, আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ স্লোগান ছাড়ে কামাল, 'জামিল তুই এগিয়ে চল, আমরা আছি তোর সাথে'। হো হো করে হেসে ফেলে দু'জনে।

ছয়মাস পরঃ

‘আজকে তোমার নতুন চাকরী, এত সুন্দর জামাকাপড় পরেছ অথচ চুলটা আঁচড়াওনি। একটু গেলাম রান্নাঘরে আর ব্যাস, তোমার ফাঁকিঝুঁকি শুরু! তোমাকে নিয়ে আমি কি করি বলত?’, ব্যাস্তসমস্ত হয়ে পাশের রুম থেকে চিরুনী হাতে দৌড়ে আসে ফারজানা। টেবিলে ঠান্ডা হতে দিয়ে যাওয়া খাবারগুলো টিফিন ক্যারিয়ারে ভরতে ভরতে জামিল বলে, ‘আমি চুল আঁচড়ালে সকাবেলা আমার মাথায় তোমার হাতের স্পর্শ নিয়ে বেরোব কি করে বলত? তুমি সকালে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে আমার সারাদিন মাথা ঠান্ডা থাকে, একদম যেন তিব্বত কদুর তেলের বিজ্ঞাপনের মত!’ ‘হি হি হি’, ওকে হাসতে দেখে জামিলের হাসিটাও ঠোঁটের একপাশ থেকে পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে। জামিলকে শেষপর্যন্ত হাসতে শেখাতে পেরেছে ফারজানা, ওর দুষ্টুমিগুলো এখন সে কিছু কিছু বোঝে, নিজেও দুষ্টুমি করতে শুরু করেছে দেখে বেশ উৎফুল্ল হয় সে। ‘যাবার পথে চাচা চাচীকে ফোন করে জানিয়ো নতুন চাকরিতে যাচ্ছ’। ‘ওঁরা জানেন তো’। ‘তাতে কি হয়েছে? ফোন করে জানাও, খুশি হবেন। আর বিকালে ফিরলে চাচীর জন্য শাড়ি কিনব যেন আগামী বৃহস্পতিবার নিয়ে যেতে পারি। আগামী মাসে বেতন পেলে চাচাকে পাঞ্জাবী কিনে দেব’। ‘আর তুমি কি কিনবে?’ ‘বাহ, তোমার মতন এমন একটা চমৎকার গিফট থাকতে আমার আর কি লাগবে?’ মনে মনে একই কথা ভাবে জামিল, কিন্তু ওর মত সাবলীলভাবে বলতে পারেনা। বেহেস্তের টুকরোর মত বৌটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ‘তুমি কি চাও তোমার নতুন অফিসে প্রথমদিন লেট হোক?’ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জুতো পায়ে দিতে দিতে আবার ফারজানার দিকে তাকায় জামিল। ‘যাআআআও’, বলে হাতে টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে গুঁজে দিয়ে দরজা খুলে ওকে প্রায় ঠেলে বের করে দেয় ফারজানা। শেষ একবার পেছন ফিরে তাকালে ফারজানা মিষ্টি হেসে বলে, ‘আসসালামু আলাইকুম’। এই স্বর্গীয় সম্ভাষন কানে নিয়েই প্রতিদিন পৃথিবীর বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু হয় জামিলের, সে স্মিত হেসে জবাব দেয়, ‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’।

এখনো রিক্সা পেতে দেরী হয়, বাসে ভিড় ঠেলে উঠতে কষ্ট হয়, অফিসে ঝামেলা হয়, দোকানে দরদাম নিয়ে মন কষাকষি হয়, দু’কামরার ঘরটাতে চাপাচাপি হয়, কোন কোনদিন ভাল তরকারীও থাকেনা। তবু কেন যেন পৃথিবীটাকে আর আগের মত জটিল মনে হয়না। দিনের শেষে ওর জীবনে আছে এমন এক সাথী যে ওর সুখদুঃখ সব সমানভাবে ভাগাভাগি করে নেয়, যে ওর কষ্টগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে, যে ওর বিশ্বাসকে এক আলোর তৈরী মিনারের মত উচ্চকিত করে তোলে। হাসি পায় এই ভেবে যে এই দুই শ্রেষ্ঠ বন্ধুর প্রথম বাক্যালাপ ছিল, ‘আপনি কিন্তু কিছুতেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবেননা’!

বিয়ে ভাবনা

23 October 2014

লেখকঃ সন্ধ্যাবাতি (ছদ্মনাম) । নাইলাহ আমাতুল্লাহ ।

এক.

প্রেমিক প্রেমিকা একজন আরেকজনের সাথে মিল খুঁজে জানি, কিন্তু কয়েক বছর আগে তব্ধা খেয়েছিলাম দেখে, প্রেমিকার লাল শাড়ির সাথে মিল রেখে প্রেমিক পরেছে লাল টকটকে ফতুয়া। সবাই বলছে, বাহ, ভালো ম্যাচিং করে পরেছেন তো! ওনারাও লজ্জা লজ্জা হেসে বলছেন, জি, দুইজনেরটা ম্যাচিং করে কে ক্রাফট থেকে কেনা! তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম, আমার এত তব্ধা খাওয়ার কিছু নেই। এরকম মিলিয়ে মিলিয়ে প্রেমিক প্রেমিকারা নাকি আজকাল অহরহই পোশাক আশাক পরে।

জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর মধ্যে মিল খুঁজতে খুঁজতে জামার রং, কাপড়ের ধরণ পর্যন্ত গড়ায়। শুরু হয় হয়তো কাছাকাছি বয়স, একই দেশ, একই গ্রাম/পৈত্রিক/মাতৃক এলাকা, একই লাইনের চাকরি, একই ধর্ম, একই শহরে বড় হওয়া, একই গান ভালোবাসা, একই ধরণের বই ভালোবাসা, একই আদর্শ, এরকম অনেক 'একই', যাতে 'কমন প্লাটফর্ম' পাওয়া যায়, যাতে পুরা পৃথিবী ভেসে গেলেও দুই জন মানুষ একই তরীতে উঠে দিব্যি বেঁচে থাকে একজন আরেকজনকে নিয়ে। এখন কিছু কিছু মিল আছে যেগুলো বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করে। যেমন এক ভাষা বলতে, একই খাবার ভালোবাসা, এগুলো সমাজের বেশির ভাগ মানুষের দৈনন্দিন সুখের জন্য ভীষণ রকমের গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবার কাছে না। সমাজের মানুষ জন হই চই করে যখন নিজেরা এক ধরণের 'একই প্লাটফর্মে' অভ্যস্ত থাকে কিন্তু কেউ সাহস দেখিয়ে ফেলে তার চেয়েও ভিন্ন কিছু করে ফেলার, যেমন–বয়সে বড় কোন মেয়েকে বিয়ে করা, সিলেটের ছেলে হয়ে ময়মনসিংহের মেয়ে বিয়ে করা, হিন্দু হয়ে মুসলিম কাউকে বিয়ে করা।

সমস্যা হচ্ছে, মানুষ বুঝতে পারে না, যেই দুইজন স্রোতের বিপরীতে গিয়ে বিয়ে করতে চাচ্ছে, তারা নিজেদের একটা ছোট্ট নৌকা খুঁজে নিয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে একই সাবজেক্টে পড়া, একই গান শোনা, একই খাবার খাওয়া, দিনের ৯৫% কাজ এক ভাবে করা দুইজন মানুষ যখন ১০০% সময় এক সাথে কাটাতে গিয়ে বিয়ে করতে চায়, তখন বাবা মায়ের টনক নড়ে, আরে হিন্দু মুসলমানের বিয়ে ক্যামনে হয়!

ভুল বুঝাবুঝি না হওয়ার জন্য আগেই ডিসক্লেইমার দিচ্ছি–আমার ধর্ম আমার কাছে সব কিছু। কুরআনে যেখানে বলা হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, সেখানে আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নিজের ইচ্ছা থাকাকে

আমার কাছে ঔদ্ধত্য আর বোকামি মনে হয়। এক দিনে পাঁচবার নামাজ, অন্তত: একবার কুরআন পড়া, বাইরে যাওয়ার সময় পোশাক আশাকে সীল ছাপ্পড় আর খাওয়ার সময় সাবধানতা–এগুলো আমাকে খুব আলাদা করে দেয় অন্য ধর্মের যে কোন মানুষের থেকে, এমনকি নিজ ধর্মের এমন মানুষদের থেকে যারা ধর্মের অনুশাসনের চেয়ে নিজের বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা বেশি রাখেন। আমি টাকা জমাতে পারলে ইউরোপে বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে মক্কায় ঢু মারতে ভালোবাসব অনেক বেশি। তাই আমার বা আমার মত মানুষেরা, যারা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে চান, তারা অন্য ধর্মের মানুষদের খুব ভালো বন্ধু বা সহকর্মী হিসেবে পেতে পারে, কিন্তু জীবন সঙ্গী কিছুতেই না। যেখানে আমি মন প্রান দিয়ে বিশ্বাস করছি আল্লাহর কথা জেনে বুঝে অমান্য করা ভীষণ অপরাধ, আল্লাহর কথা না মানলে মারা যাওয়ার পর ভয়াবহ সব পরিণতি হবে, সেখানে আমি যেই মানুষটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, তার কাজ কর্মে এর বিপরীত কিছু দেখলে কষ্ট তো পাবই, কখনও মুখে নিষেধ করব, কখনও অভিমান করব, কখনও রাগও করব। জীবন সঙ্গীর সাথে চিন্তা ভাবনায় এত বড় বৈপরিত্য থাকলে এক সাথে সুখে থাকা যায় না।

কিন্তু, বাবা মায়েরা যখন নিজেরা শুধু ঈদ/পূজা ছাড়া ধর্মের কাছ ধার ঘেষেন না, তখন ছেলেমেয়েরা অন্য ধর্মের কারও হাত ধরলে সেখানে 'সমাজ গেল, জাত গেল, মান সম্মান ধূলোয় লুটিয়ে গেল' করে। ব্যাপারটা যে কি চরম রকমের যুক্তিহীন, সেটা মানুষ কেন বুঝে না, আমি জানি না।

শুধু মিল থাকলেই সব সময় সুখ আসে না, সেরকম উদাহরণও প্রচুর। তা না হলে একই জাতি বা একই ধর্মের মানুষদের মধ্যে বিয়ে হলে তালাক ব্যাপারটা থাকতো না। একই সাথে স্কুল কলেজ পড়া বন্ধু বান্ধবেরা বিয়ে করার পরে টের পায়, সারা জীবন এক ছাদের নিচে কাটানো সম্ভব না। দিনের পর দিন গান, প্রিয় খাবার আর চিন্তা ভাবনায় অসাধারন মিল পেয়ে এক সাথে থাকা শুরু করার পরে হাঁপিয়ে উঠে। ভাবছিলাম, এমন কেন হয়?

দেখলাম, মিল আর ভালোবাসার পাশাপাশি ভীষণ রকমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, মানুষটাকে শ্রদ্ধা করতে পারা।

অনেক আগে একটা মুভ্যি দেখেছিলাম, বাবা মা সবার মতের বিপরীতে গিয়ে ডাক্তার রাণী মুখার্জী বিয়ে করেছিল পাড়ার কারিজমেটিক একটা ফাও ফাও ঘুরে বেড়ানো বেকার ছেলেকে। বিয়ের কয়েক মাস পরে প্রাথমিক মুগ্ধতা কেটে যাওয়ার পর শুধু ঝগড়া হতো। যেদিন যেদিন ঝগড়া হতো, রাণী সেই দিনগুলোতে ক্যালেন্ডারে লাল দাগ দিয়ে রাখত। মাস শেষে দেখা যেত শুধুই লাল।

স্কুল জীবনে দেখা মুভ্যিটা কিন্তু আমাকে খুব ভাবিয়েছিল। কি মিষ্টি রোমান্টিকতা আর দুষ্টুমিতে ভরা একটা সম্পর্ক এরকম হয়ে গেল কেন? ভেবে দেখলাম, মেয়েটা ছেলেটাকে শ্রদ্ধা করতে পারছে না। সে নিজে প্রতিদিন হাসপাতালে খেটে এসে বাসায় এসে দেখে স্বামী দিব্যি ঘুমাচ্ছে, ও প্রতিদিন নতুন দায়িত্ব নিচ্ছে ঘাড়ে, কিন্তু স্বামী সেই আগের ক্যারিজমেটিক বেকার ছেলেই, আর কিছু না। শ্রদ্ধা আসবে কোথা থেকে?

আমার পরিচিত একজন হিজাবী মেয়ে প্রায়ে পনের বছর আগে বিয়ে করেছিল গড়পরতা প্র্যাকটিসের একজন ছেলেকে। সব দিক দিয়ে দারুণ সুন্দর জুটি। কিন্তু ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় মটর সাইকেলে করে অর্ধেক পথ নিয়ে গিয়ে বলত, তুমি বোরখা খুলো, না হলে নিয়ে যাব না বন্ধুদের সামনে। কখনও অনুনয়, কখনও স্বামী–

অধিকার খাটিয়ে নির্দেশ, কখনও ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিং, কখনও নি:শব্দ ধর্মঘট। মেয়েটা বিচ্ছিরি রকমের মানসিক কষ্টে পড়ে গেল। এক দিক দিয়ে স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসে, অন্য দিক দিয়ে আল্লাহকেও। কাকে ছেড়ে কাকে ধরে?

শেষ মেষ অনেকগুলো বছর পরে ছেলেটা মেয়েটা ধর্মপরায়নতা মেনে নিয়েছিল। খুব পছন্দ না করলেও, অন্তত: হিজাব নিয়ে এখন আর কিছু বলে না বউকে। কিন্তু, এই পর্যায়ে আসতে অনেকগুলো বছর লেগে গিয়েছিল, এবং মেয়েটাকে অন্তত: খুব বুঝদার হতে হয়েছে। কখনও কখনও চোখের পানি নাকের পানি মিশিয়ে হিজাব খুলেই ফেলতো!

আবার এরকমও দেখেছি, স্বামী গান পছন্দ করে, কিন্তু বউ কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখে, গান শোনা পাপ তাই। স্বামী বেচারা খুব প্রিয় প্রিয় গানগুলো জীবন সঙ্গিনীর সাথে ভাগাভাগি করতে পারে না। আস্তে আস্তে দূরে সরতে সরতে কয়েক বছর পরে দেখা গেল স্বামী সারা রাত টিভি দেখতে দেখতে সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়ে, বউ বেডরুমে। দিনের পর দিন শুধু প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই।

এই উদাহরনগুলো ছোটবেলা থেকে সামনে ছিল বলে খুব ভাবিয়েছে। বুঝেছি, একজনের কাছে একটা জিনিসের গুরুত্ব এক নম্বরে থাকলে, অন্য জনের কাছে সেটা যদি একেবারেই অর্থবহ না হয়, তাহলে এক সাথে থাকা খুব কঠিন। এক নম্বরের জায়গায় দুই তিন নম্বরে থাকলেও হয়, শ্রদ্ধা ভাগ বাটোয়ারা করে থাকা যায় এক সাথে, ভালোবাসা দিয়ে। কিন্তু যেখানে স্বামী ভীষণ বিব্রতবোধ করছে বউয়ের ধর্মপরায়নতা নিয়ে, ধর্মপরায়ন বউ নিয়ে গর্ব দূরে থাক, হীনমন্য বোধ করছে, সেখানে, অন্য দিক দিয়ে এক সাথে ধরে রাখার অনেক কিছু না থাকলে, তৃপ্তিতে আর সুখে থাকা অসম্ভবের কাছাকাছি।

আমার খুব কাছের একজন আত্মীয়ের স্ত্রী আইরিশ এবং ক্যাথলিক। ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছু দুইজনের পুরাপুরি আলাদা। বিয়ের পঁচিশ বছর পরেও ওনার স্ত্রী প্রতি রবিবারে চার্চে যান। অথচ উনি নিজে উমরাহ করেছেন, হজ্ব করেছেন, রোজা রাখেন, দৈনিক নামাযের অন্তত: চেষ্টাটুকু করেন। এত এত অমিল, অথচ এই মানুষটাই পুরাপুরি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি বাংলাদেশের গ্রামে বড় হওয়া ছেলে আর ও আয়ারল্যান্ডের কোন কোণার মেয়ে, কিন্তু পঁচিশ বছর ধরে আমি ওঁর সাথে আছি, এবং আমি তোমাকে বলছি, আমি ওঁকে নিয়ে ভীষণ রকমের সুখী। ওকে নিয়ে আমার এক বিন্দু আক্ষেপও নেই'।

পয়ষট্টি বছর বয়সেও ভীষণ হাসি খুশি মানুষটার উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস–বয়সের সাথে সাথে আসা স্বাভাবিক রোগগুলোও নেই। ওনার কথাটা পুরাপুরি বিশ্বাস করতে আমার একটুও কষ্ট হলো না।

ভেবে দেখলাম, এই দুইজন মানুষ এক সাথে সুখী, কারণ ওঁরা দুইজনই একজন আরেকজনের জীবন যাপনের ধরণকে শ্রদ্ধা করতে পারছে।

এতটুকু পড়ে কেউ যদি এই সিদ্ধান্ত টানেন যে শুধু নিজের মত করে ধর্ম পালন করলেই সুখের সংসার হবে, ধর্মের পুরাটুকু মেনে সেটাতে অন্যজনকে টানার চেষ্টা করা ভুল, তাহলে সিদ্ধান্তটা ভুল হবে। আমার পর্যবেক্ষন সেটা বলে না।

বরং, নিজের লিমিটেশন নিজের জানতে হবে। নিজেকে বুঝতে হবে, কোন জিনিসগুলো ভালোবাসতে পারবে, কোনগুলো শ্রদ্ধা করতে পারবে, কোনগুলো পারবে না। একটা ছেলের কাছে যদি ফর্সা=সৌন্দর্য্য হয়, কিন্তু মহৎ সাজতে গিয়ে কালো মেয়েকে বিয়ে করে, তাহলে সে নিজের এবং বউয়ের প্রতি চরম অবিচার করবে। যেই মেয়েটার কাছে পোশাক আশাক আর কথা বার্তার রুচিশীলতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করবে যদি ধনী, পড়াশোনায় ভীষণ ভালো, চেহারা ছবিও ভালো কিন্তু 'খ্যাত' কাউকে বিয়ে করে বিয়ের পরে সব সাইজ করে ফেলার আশায়। প্রথম থেকেই শ্রদ্ধা বস্তুটা সম্পর্ক থেকে পুরাপুরি উহ্য থেকে যাবে। প্রাথমিক মুগ্ধতা কেটে যাওয়ার পরে আশাহত বুকের ক্ষত লুকিয়ে রেখে হুল ফুটানো কথা আর ক্রমাগত আক্ষেপে দুইজন নির্দোষ মানুষ শুধু কষ্টই পাবে, তৃপ্তি পাবে না। হ্যা, দুইজনই নির্দোষ, শুধু জীবনের দর্শনে আকাশ পাতাল তফাৎ!

ভালোবাসা অনুপস্থিতিতে শুধু শ্রদ্ধা নিয়ে থাকলে একটা শীতল দুরত্বে সম্পর্ক আটকে যাওয়ার সম্ভবনা প্রচুর। আর শ্রদ্ধা ছাড়া ভালোবাসা থাকলে, সেই ভালোবাসা উড়ে যাওয়ার সম্ভবনাও অনেক। তাই সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে, ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা–এই দুইটার সুষম সমন্বয়!

দুই .

বিয়ে নিয়ে প্রতিটি মেয়েরই অনেক স্বপ্ন থাকে। জামাই কেমন হবে, বিয়ের অনুষ্ঠানে কিভাবে সাজবে, বিয়ের পর একসাথে তাহাজ্জুদ পড়বে, ফজরের সালাতের জন্য ডেকে তুলবে, আরও কতো কি! ছেলেদের ও নিশ্চয়ই এমন অনেক স্বপ্ন থাকে যা আমি ছেলেনা বলে জানিনা। তবে বিয়ে নিয়ে সবারই স্বপ্ন থাকে।

বিয়ে নিয়ে যখন মেয়েরা স্বপ্ন দেখে তখন তারা সুখের স্বপ্নই দেখে । বিয়ের পরবর্তীতে যে পরীক্ষা আসবে তার কথা কেও ভাবেনা। ভালো খারাপ মিলিয়েই মানুষ, কিন্তু সে যখন সব সুখের স্বপ্ন নিয়ে শশুড় বাড়িতে যায় তখন আল্লাহর পরীক্ষা আসলে সেটাকে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি তার থাকেনা ও একটা ধাক্কা খায়।

ছেলেদের ক্ষেত্রেও দেখেছি বিয়ে করে সে যে শুধু ঘরে একটা বউ এনেছে তা না, কত বড় দ্বায়িত্ব এনেছে তা বুঝেনা। ভাবে খাওয়া আর পোশাক আশাক দিলেই হয়ে গেলো। এটাই দ্বায়িত্ব পালন করা। বউ যদি কাজের জন্য বা অন্য কিছুর জন্য কমপ্লেইন করে তাহলে বউ কে বলা হয় এটা তো মেয়েদেরই কাজ!

বিয়ে মানে রেসপন্সসিবিলিটি! আল্লাহ ছেলে মেয়ে উভয়েরই দ্বায়িত্ব, অধিকার, কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন ও রাসূল (সা) olএর মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছে। তাই সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো বিয়ের আগে প্রত্যেকে নিজেদের দ্বায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জেনে নিবেন বিভিন্ন স্কলারদের থেকে।

জামাই এর কি কি করা দরকার কিন্তু সে কি কি করেনা বা বউ কি কি করেনা না দেখে আগে দেখেন নিজে কতোটুকু করছেন। আমরা আগে সব সময় অন্যেরটা দেখি যে তোমার তো এটা করার কথা কিন্তু তুমি করোনা। কিন্তু নিজেও যে আরও কত দ্বায়িত্ব পালন করিনা না ভুলে যাই বা দেখিনা।

হাসবেন্ড, শশুড় শ্বাশুড়ী, দেবর ননদ, বাচ্চা কাচ্চা বা অন্য যে কোনো দিক থেকেই হোক পরীক্ষা আসবেই ইন শা আল্লাহ। দুনিয়া তো জান্নাত না বা রূপকথার গল্প না যে বিয়ের পর সবাই শুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে সব সময়। বিয়ে যেমন খুব সুন্দর একটা ব্যাপার তেমনি ঠিক মতো হ্যান্ডেল করতে না পারলে এরচেয়ে কঠিন কিছু নাই। সবাই যদি ইসলামের আলোকে বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি ইন শা আল্লাহ সংসারের পরীক্ষায় সবাই পাশ করে যাবো। আর কষ্টের পর তো স্বস্তি দিবেন আল্লাহই বলেছেন!

কচ্ছপ, রাজপুত্র এবং বিয়ের গল্প

6 April 2015

লেখকঃ শারিন শাফি (অদ্রিতা)

-বুঝলি রে আফিয়া! সবার রাজকুমার আসে ঘোড়ায় চড়ে, আমারটা নির্ঘাত আসতেছে কচ্ছপে চড়ে! নাইলে এত দেরি লাগে নাকি কারো আসতে??

.কথাটা বলেই হুসনা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো।

আড়চোখে তাকালো আফিয়া- *'মেয়ের মাথা কি পুরাই গেল নাকি'!* হাসিমুখে সেও বললো,

-আহারে! এত অধৈর্য্য হলে কিভাবে হবে বন্ধু!! ইন শা আল্লাহ্ চলে আসবে সময়মতন ! আল্লাহ্ যখন লিখে রেখেছেন মিলন না হয়ে যাবে কোথায়?

-হুম্! এই একটা জিনিস মনে হলেই তো আশার এই নিভু নিভু প্রদীপ আবার দপ্ করে জ্বলে উঠে!

-ইয়েস! তাওয়াক্কুল + দুয়া + সবর = সব ঠিক হয়ে যাবে!

- ইন শা আল্লাহ্! ইশ্! তোর মতন আমার আব্বু-আম্মু কেন যে বুঝে না! পড়াশোনা শেষ করো, ডিগ্রি নাও, এই করো- সেই করো, তারপর গিয়ে বিয়ে! এতদিনে আমি যে ফিতনার অথই সাগরে হাবু-ডুবু খেয়ে খেয়ে নিজের নফ্সকে আদৌ বাঁচিয়ে চলতে পারবো কি না আছে কোন গ্যারান্টি? বিয়ে টা দিয়ে দিত! অর্ধেক দ্বীন টা পূর্ণ হয়ে যেত! সব ঝামেলা চুকে যেত! তাই না বল আফিয়া?

এবারে আফিয়া বই থেকে মুখ তুললো, মোটা চশমা টা নাড়িয়ে হুসনার দিকে তাকালো,

-হুসনা! বিয়ে বিয়ে করে যে মুখে ফেনা তুলে ফেলছিস, তুই কি আসলেই বিয়ের জন্যে রেডী?

- দেখতেই আছিস আমি দুই পায়ে খাঁড়া- আবার জিজ্ঞেস করে বিয়ের জন্যে রেডী কি না!!

-আরে আমার বান্ধবী! সেই রেডি না!! আমি বলছি, মানসিক প্রস্তুতির কথা! তাছাড়া, ইসলামের আলোকে একটা আদর্শ দাম্পত্য জীবন কিভাবে মেইনটেইন করবি তুই? স্ত্রী হিসেবে তোর দায়িত্ব কি? তোর স্বামীর হক কি? বাচ্চা-কাচ্চার প্রতি দায়িত্ব কেমন হবে? –এগুলা নিয়ে ভেবে দেখেছিস কখনো?

বেচারী হুসনা এবার মাথা চুলকানো শুরু করলো,

- " ... ইয়ে মানে! এত বেশি তো কিছু ভাবি নাই! আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে একটা দ্বীন-দার জীবন-সঙ্গী যদি পাই তাহলে আমরা একসাথে কুরআন পড়বো, আমি তার মুখে পানি ছিটায়ে ফজর সালাতের জন্যে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিব, সে আমাকে আল্লাহ্-র জন্যে ভালোবাসবে, আমিও তাকে আল্লাহ্র জন্যে ভালোবাসবো ... এই তো ... আর... আর... "

- হয়সে ম্যাডাম থামেন! বুঝছি! সবার আগে এখন আমাকেই আপনার মুখে পানি ছিটায়া এই রূপকথা ছুটাইতে হবে!

- আফিয়া!! আমার স্বপ্ন নিয়ে কিছু বলবি না বলে দিলাম !

- নো ম্যাডাম! স্বপ্ন দেখাতে তো কোন দোষ নেই! কিন্তু স্বপ্নের পাশাপাশি কিছু বাস্তবতাকেও জায়গা দিতে হবে তো!! হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ্ তুই যা যা বলেছিস সব ঠিক আছে! আল্লাহ্-র রহমতে একজন দ্বীনদার জীবন-সঙ্গী পেলে এর সবই পাওয়াও সম্ভব! কিন্তু, তোর মাথায় শুধু এগুলি রাখলেই হবে না ... সাথে সাথে আরো কিছু মনে রাখতে হবে ...

- যেমন ... ... ?

- যেমন ধর, সবার আগে বুঝার চেষ্টা কর, বিয়ে টা কি ?? বিয়ে মানে কি ? বিয়ে মানে যে বললি অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ! – এর মর্মটা বুঝিস তো? দেখ না আমি বুঝি, বিয়ে মানেই আমাদের চোখে ভাসে শুধু মুভিতে দেখে আসা, বহু বাধা-বিপত্তির পরে 'নায়ক-নায়িকার মহা-মিলন' ... অতঃপর 'সুখে-শান্তিতে বসবাস' ... কিন্তু কেউ আমাদের চোখে আঙ্গুল তুলে দেখায় না যে, বিয়ে একটা **দায়িত্ব!** একটা কমিটমেন্ট! সারাজীবনের ওয়াদা! আল্লাহ্ কে সাক্ষী রেখে দুইটি মানুষের একটি হালাল সম্পর্কের যাত্রা শুরু করা! **এটা একটা সিরিয়াস কমিটমেন্ট** বন্ধু! এখানে পিঙ্কি-পঙ্কি করার কোন অবকাশ নেই! তোর সারাটাজীবন একটা মানুষের সাথে শেয়ার করার কথা এখানে! হুট করে সিদ্ধান্ত নিলে চলবেনা! হ্যাঁ, অবশ্যই ভালোবাসা থাকবে! সেই সাথে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছুও থাকবে। প্রতিকূলতার সাথে মানিয়ে নিতে হবে এবং হিক্মাহ্ অবলম্বন করা তোকে জানতে হবে !

- ভেঙ্গে বল তো দেখি! – ভ্রু কুঁচকে হুসনার প্রশ্ন !

- ধর কতগুলা বিষয় বলি আমি তোকে... তুই মনে মনে নিজেকে যাচাই কর যে, এই বিষয়গুলোতে তুই কেমন দক্ষ?

তোর বাচনভঙ্গী, শব্দচয়ন = মোটকথা কমিউনিকেশন স্কিল!

বাজেট করা এবং টাকাপয়সার হিসেব করা

রাগকে সংযত করতে পারা

আর্থিক ,পারিবারিক সমস্যা হলে কীভাবে তা সামলানো, বিশেষ করে অর্থ-কষ্ট হলে!

বাচ্চা-কাচ্চা লালন-পালন

সম্পর্কের টানাপোড়েন হলে সমাধান ও কম্প্রোমাইজ করার ব্যাপারে তোর প্রস্তুতি

- ও আল্লাহ্! থাম থাম!! ব্রেইন হ্যাং হয়ে গেল আমার! !!

- ইয়েস ম্যাম! আদর্শ দাম্পত্য জীবনের কথা সামনে রেখে নিজেকে ইসলামের আলোকে 'এতকিছুর' জন্যেই যে প্রস্তুত করতে হবে!!

- আমার বিয়ের ভূতকে তুই দেখি ঝেঁটিয়ে বিদায় করেই ছাড়বি !

- আরেহ বোকা! আমি তোকে বিয়ে নিয়ে ভয় দেখাতেও চাইনি, নিরুৎসাহিত করতেও চাইনি! আমি তো তোকে জাস্ট সচেতন করতে চেয়েছি, কারণ আজ হোক, কাল হোক, বাস্তবতা তো তোকে ফেইস করতেই হবে!

আচ্ছা দাঁড়া! আমি তোকে সূরা রুমের ২১ নং আয়াতটি নিয়ে কিছু কথা বলি, ইন শা আল্লাহ্ দেখবি মন ভালো হয়ে গেছে!

- "আচ্ছা বল ..." মুখ গোমড়া করেই মাথা নাড়ে হুসনা !

-হুসনা! তুই কি জানিস যে, বিয়ের অপর নাম হচ্ছে **প্রশান্তি, উচ্ছ্বাস** আর **দয়া**? শব্দ ৩ টা খুব ভালোমতন মনে রাখ... আমি ভেঙ্গে বুঝাচ্ছি তোকে, ...

প্রথমে আয়াতটা বলি, আল্লাহ বলছেনঃ

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে"।

[সূরা আর-রুমঃ ২১]

এই একটা আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যখ্যা করে দিয়েছেন! খেয়াল কর, আল্লাহ্ বলছেন,

*"..যাতে তোমরা তাদের কাছে **শান্তিতে** থাক..."*

এখানে, আরবি শব্দটি হচ্ছে – তাসকুনু। এই 'তাসকুনু' শব্দটির মূল হচ্ছে সুকুন । সুকুন মানে, প্রশান্তি।

এই সুকুন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রথম ধাপ! নববিবাহিত দম্পতিকে দেখবি, ভালবাসার মানুষের সাথে থাকার সময় প্রশান্তির এই অনুভূতি তীব্রভাবে অনুভব করে!

এই অনুভূতি স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাকে পরবর্তীতে আরো তীব্র ও গাঢ় করে তোলে। আর এই সুকুন এগিয়ে নিয়ে যায় সম্পর্কের দ্বিতীয় ধাপের দিকে।

আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কের সুকুনের পর দ্বিতীয় পর্যায়টি বর্ণনা করেন এইভাবে:

*"... তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন পারস্পরিক **সম্প্রীতি***

আরবি শব্দ **মাওয়াদ্দাহ** মানে, 'গভীর আবেগের উচ্ছ্বাস মিশ্রিত ভালবাসা' ,কারো জন্য বা কোন কিছুর প্রতি তীব্র আকর্ষণ।

অর্থাৎ, স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের সান্নিধ্যে অপরজনের সাথে থাকার সময় **প্রশান্তি**অনুভব করে এবং সেই প্রশান্তি থেকে তার প্রতি **আবেগের উচ্ছ্বাস** অনুভব করে ...

কিন্তু, খেয়াল কর যে, এভাবে স্বামী স্ত্রীর এই যাত্রা যতই এগিয়ে যেতে থাকে আবেগের উচ্ছ্বাস ক্রমশ কমতে থাকে। আস্তে আস্তে *'টাওয়াল এখানে কেন? তরকারিতে লবণ কম কেন??'* ইত্যাসি ছোট-খাট বিষয়গুলিও দুজনের কাছেই অসহ্য লাগে এবং তাদের কল্পনার স্বপ্নগুলো ফিকে হতে শুরু করে। এই পথচলায় অনিবার্যভাবেই কিছু বাধা-বিপত্তি আসে। প্রথম দিকে উভয়েই আবেগে অন্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে একে অপরের দোষ-ত্রুটিগুলো খুঁজে পেতে শুরু করে ... ব্যস! এই থেকে আমরা চলে যাই আয়াতে বর্ণিত তিন নম্বর ধাপে,

*"... এবং তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন **দয়া (রাহমা)**..."*

আরবি শব্দ **'রাহমা'** মানে, দয়া/ মমতা/ কোমল স্নেহময় ভালবাসা।

এখন সময়ের সাথে সাথে আবেগের উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়তে শুরু করেছে এটা-সেটা নিয়ে খুনসুটি আর ঝগড়ার কারণে আগের সেই অখন্ড প্রশান্তি টা ফিকে পরে গেছে। তাই আল্লাহ্ বললেন যে তিনি এবারে গিয়ে উভয়ের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছেন একে অপরের জন্য 'রাহমা', **দয়া!** যাতে করে মান-অভিমানে জড়িয়ে পড়লেও তারা যেন একে অপরকে গভীর মমতায় ক্ষমা করে দিতে পারে। এখন সেই প্রথম বিয়ে আবেগও নেই, উচ্ছ্বাসের জোয়ার-ও নেই! কিন্তু আছে রাহমা-**দয়া!** আর এই 'রাহমা'-ই এবার সম্পর্কে এগিয়ে নিয়ে যায়!! কারণ যত কিছুই হোক না কেন বুকের গভীরে ঈমানদার বান্দা কখনোই চাবেন না যে, তার হালাল ভালবাসার মানুষটা হারিয়ে যাক! সুবহানআল্লাহ্!

এখন শুন আয়াতটির শেষে আল্লাহতা'আলা কি বলেছেন,

"... নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে"

সুবহানাল্লাহ !! চিন্তা করতে পারিস?? এই যে, একটা স্বামী-স্ত্রীর হালাল সম্পর্কের ৩ টা ধাপ- প্রশান্তি, উচ্ছ্বাস ও দয়া- এগুলি চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শন-স্বরূপ! যারা বিশ্বাসী, আল্লাহ্-র নিদর্শন নিয়ে তারা চিন্তা করতে থাকলে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের চাবিকাঠি তাদের হাতের মুঠোয়! এভাবে, যখন প্রশ্ন উঠে, আচ্ছা বিয়ে হালাল সম্পর্ক, প্রেম হারাম! তাহলে, কেন এত ডিভোর্স? উত্তরঃ আপনি আপনার মহান রবের নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করেননি! ! চিন্তা করলে বুঝতেন, যেখানে আবেগে ভাটা পড়ে, উচ্ছ্বাস কমে, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরে 'দয়া' পয়দা করে দেন, যারা চিন্তাশীল না, তারা তার সঙ্গীর প্রতি দয়া-পরবশ হতে পারে না !!! তাই তখন সম্পর্কে নেমে আসে কালো ছায়া!

- সুবহান আল্লাহ্! দোস্তি! মন টা ভালো করে দিলি!

- যাক আলহামদুলিল্লাহ্! মন আরো ভালো করতে আমার "ইসলাম ও বিয়ে" বিষয়ের উপর কিছু নোট্স নিয়ে যা। ভালোমতন স্টাডী করিস।

- ইন শা আল্লাহ্ বন্ধু করবো! আল্লাহ্ তোকে এত্ত এত্ত পুরস্কার দিক, উত্তম প্রতিদান দিক! আমীন ...

... বিদায় নিয়ে চলে আসলো হুসনা। বাসায় এসে আফিয়ার নোট খাতা টা উল্টালো -

গোটা গোটা অক্ষরে সবার উপরে একটা দুয়া লিখা-

"-রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ক্কুররাতা আ'ইয়ুনিন ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাক্কিনা ইমামা"

অর্থঃ "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।"

[সূরা ফুরক্কানঃ ৭৪]

কি সুন্দর দুয়া রে আল্লাহ্! আল্লাহ্-র কাছে এমন জীবন-সঙ্গী চাওয়া, এমন নেক সন্তান চাওয়া যাদের দেখা মাত্র প্রশান্তিতে চোখ দুটা শীতল হয়ে যাবে! সুবহান আল্লাহ্! এত সুন্দর করেও আল্লাহ্-র কাছে চাওয়া যায়!!

সুবহান আল্লাহ্! হুসনা পড়ছে তো পড়েই যাচ্ছে ! আর মনে মনে ভাবছে, *"রাজপুত্র!!! তুমি কচ্ছপে চড়ে ধীরে-সুস্থে আসো! আমি দুয়াটা মুখস্থ করে বেশি বেশি মুনাজাতে পড়ে নেই আগে!"*

পাতা উল্টাতে উল্টাতে কিছু কুরআনের আয়াত লিখা পেল-

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (সূরা বাকারাহ্)

অর্থাৎ স্ত্রী-স্বামী একে অপরের পরিচ্ছদের মতন হয়ে থাকবে। কাপড় যেমন আমাদের লজ্জা সংরক্ষণ করে, আমাদের শরীরের লুকানো দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনের লজ্জা/হায়া সংরক্ষণ করবে, একজন আরেকজনের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে... পরস্পরের প্রতি সহনীয় হবে! স্ত্রী সাহায্য করবে তার স্বামীর দৃষ্টিকে নত রাখতে, স্বামীও তার স্ত্রীর চাহিদা এমনভাবে পূরণ করে দিবে যেন তার স্ত্রী-ও একমাত্র তার জন্যেই তাবত সৌন্দর্য্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারে, তার হিজাবকে মেইন-টেইন করতে পারে! সুবহান আল্লাহ্!

সে মুগ্ধ হয়ে পাতা উল্টাতে লাগলো –

কিছু হাদীস লিখা ছিল-

*** মু'আবিয়াহ্ আল কুশাইরী(রো সূত্রে বর্ণিত।**

তিনি বলেন, একদা আমি রসূল(সাঃ) এর নিকট এসে বললাম, "আমাদের স্ত্রীদের(হক) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন,

"তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তাই পরাবে। তাদেরকে প্রহার করবে না এবং গাল-মন্দ করবে না।

(আবু দাউদ ২১৪৪)

ক্বায়িস ইবনু সায়িদ(রাঃ) সূত্রে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আমি কুফার (আল-হীরা) শহরে গিয়ে দেখি যে, সেখানের লোকেরা তাদের নেতাদের সাজদাহ্ করছে। আমি ভাবলাম, তাহলে তো নবী(সাঃ) ই অধিক সাজদাহ্-র হকদার। অতঃপর আমি রসূল(সাঃ) এর খেদমতে এসে বলি যে, আমি আল-হীরা শহরে গিয়ে দেকেহ এসছি যে, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সাজদাহ্ করে। অতএব, হে আল্লাহ্-র রসূল(সাঃ) আপনি তো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সাজদাহ্ করি। উত্তরে রসূল(সাঃ) বললেন যে, যদি (মৃত্যুর পর) তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও, তবে তুমি কি আমাকে সাজদাহ্ করবে ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সাবধান! তোমরা এরূপ করবে না! আমি যদি কোন মানুষকে সাজদাহ্ করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদের সাজদাহ্ করতে। কারণ, আল্লাহ্ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার দিয়েছে।

সহীহ, তবে কবর সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে।

*দারিমী, বায়হাকী, হাকিম। ইমাম হাকিম ও যাহাবী বলেন, সনদ সহীহ।

আবু হুরায়রা(রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নবী(সাঃ) বলেছেন, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় শোয়ার জন্যে আহবান করে আর ঐ স্ত্রী যদি তাতে সাড়া না দেয়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিস্তারা ঐ স্ত্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকে।

সহীহ। (বুখারী, মুসলিম)

আমাদের হুসনা কিন্তু ইসলামের মাঝে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের রূপরেখা পেয়ে গেছে! আর আপনি ???

বিয়ে আর ডেটিং কি একই???

5 March 2015

লেখকঃ নোমান আলি খান

আসুন আমরা একটু চিন্তা করি, বিয়ের মাধ্যমে নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে। বর্তমান সময়ে একজন যুবক বিয়ে করার পূর্বে কি করছে? ধরুন সে এদিক সেদিক কিছু মুভি দেখেছে, মানে তাওবা করে ধার্মিক হওয়ার আগে আরকি। আর এসব মুভির মাধ্যমে তার মধ্যে ভালোবাসা আর বিয়ে নিয়ে কিছু ধারণা গড়ে উঠছে। প্রায়ই ভাইয়েরা আমার কাছে এসে বলে, "ভাই, আমার বিয়ে করা খুবই জরুরি"। তাদের ভিতর এমন একটা ধারণা হয়েছে যে, একবার বিয়ে হয়ে গেলেই যাবতীয় লালসা নিমিষেই উধাও হয়ে যাবে, জীবন শান্তিতে পূর্ণ হবে, "আমরা একসাথে কুরআন পড়ব" ইত্যাদি ইত্যাদি...। এটা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়ে উঠবে, আর এভাবে তাদের মনে বিয়ে নিয়ে অতিরঞ্জিত একটি ধারণা গড়ে উঠে।

আপনারা যারা বিবাহিত তারা খুব সম্ভবত হাসতেও ভুলে গিয়েছেন, আপনারা ভাবছেন "এইসব কি বলছে?" কারন আপনারা ভুলেই গিয়েছেন এসব অনুভুতির কথা। অবশ্যই আপনারা কখনও কখনও কঠিন বাঁধার সম্মুখীন হন, কারন আমাদের বিয়ে সম্পর্কে যা দেখানো হয়, যে ধারণা দেয়া হয়, বিশেষ করে আধুনিক সময়ে, সে মুসলিমই হোক আর অমুসলিম, আধুনিক সময়ে নারী আর পুরুষের মাঝে ভালোবাসা, নির্ভরশীলতা বা বোঝাপড়ার যে ধারণা দেয়া হয় তার সাথে ডেটিং এর ধারনার কোন পার্থক্য নেই। আর ডেটিং মানে হল, যতদিন সম্ভব আনন্দ করা, তারপর যখন কোন কঠিন সময় আসে আপনি সব ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যান। এটাই ডেটিং, ঠিক কিনা? তাই আমরা যখন বিয়ে নিয়ে চিন্তা করি, ভাইয়েরা এমনকি বোনেরাও যখন বিয়ে নিয়ে চিন্তা করেন, তারা বিয়েকে ডেটিং এর মতই ভাবেন।

কিন্তু আপনারা নিশ্চয় জানেন বিয়ে আসলে ডেটিং এর চেয়েও অনেক বড় কিছু, তাইনা? টাকা পয়সা খরচ, ঘরের কাজকর্ম, আরেকজন মানুষের সাথে থাকতে শেখা, মাঝে মাঝে এটা খুবই কঠিন মনে হয়, আপনি আপনার মত করতে চান, সে তার মত করতে চায়, কখনও তোয়ালে বাঁকা ভাবে রাখা নিয়ে, অথবা ব্রাশ ভুল জায়গায় রাখা নিয়ে অথবা হয়ত কফিতে চিনি একটু বেশি হয়েছে এভাবে আস্তে আস্তে ক্ষোভ জমা হয়। প্রথম প্রথম ভালোবাসার কারনে হয়ত আপনি কিছু বলেন না, ভাবেন নিজেই সামলাতে পারবেন, কিন্তু কয়েক বছর পর এতকিছু জমা হয়ে যায় যে আপনি বলে বসেন "আবার চিনি বেশি?"

কিন্তু ডেটিং এ এমন কিছু হয়না। কারন আপনার যখন একজন মেয়েকে আর ভাল লাগেনা আপনি আরেকজনকে জোগাড় করে নেন। অথবা সেই মেয়ের যখন মন উঠে যায় সে বলে "আমি তোমার গন্ধও পেতে চাইনা, আমি গেলাম"। মানে কিছু হলেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া। মানে সব ছেড়ে দূরে সরে যাওয়া।

কিন্তু বিয়ে একটি শক্ত প্রতিজ্ঞা। এবং কুরআনেও এই ব্যাপারে খুব গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। "আল্মুহসানাত", "আল্মুহসিনিন"। আরবিতে "ইহসান" মানে হল কাউকে নিরাপদ দুর্গের মধ্যে রাখা। অনেকটা মিলিটারি ক্যাম্পের মত। উদাহরনটা এমন যে, বাইরে শত্রু আছে আর তাই যে মিলিটারি ক্যাম্পের ভিতরে আছে সে নিরাপদ। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে নারীরা যেন নিরাপদ প্রাচীরের মধ্যে আছে, আর কে তাদের সুরক্ষা দিচ্ছে? তাদের নিজ নিজ স্বামীরা। সবকিছু থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে, দুঃখ কষ্ট, লজ্জাহীনতা, এমনকি অজ্ঞানতা থেকেও, কারন তাকে সঠিক শিক্ষা দেয়াও তার স্বামির দায়িত্ব। সে তাকে সব দিক থেকে নিরাপদ রাখছে।

আর যারা বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "মুহসিনিন গাইরা মুসাফিহিন"। তারা হল সেসব মানুষ যারা নারীদের এরূপ নিরাপত্তায় আনতে আগ্রহী, তাদের নিজেদের পরিচর্যায়, পরিবার গঠনের উদ্দেশ্যে, শুধুমাত্র তাদের নিজেদের কামনা পূরণ করার জন্য নয়। "মুসাফিহ" বলতে এমন কাউকে বুঝায় যে নিজের হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর একারনেই সে বিয়ে করতে চায়, এটাই একমাত্র কারন। তাই আল্লাহ বিয়ের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব পরিবর্তন করেছেন, যদি আপনি সঠিক কারনে বিয়েতে আবদ্ধ হন, তাহলে আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার একটি সুস্থ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আর যদি আপনি ভুল কারনে বিয়ে করেন, ভুল কারন কি কি হতে পারে? আমার হরমোনের সমস্যা আছে তাই আমি বিয়ে করতে চাই, ব্যাস। তাহলে অবশ্যই আপনার সংসার অশান্তির হবে, আর আপনি কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। আর খুব সম্ভবত আপনাদের অনেকেই এটা অনুধাবন করেছেন কঠিন উপায়ে। কারন আপনার নিয়্যতে ভুল ছিল। আপনার নিয়্যত থাকতে হবে একটি পরিবার শুরু করার, আল্লাহকে খুশি করা, সমাজে ভাল কিছু বৃদ্ধি করা।

তাই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের অন্যান্য সব কিছুর মত বিয়ের মূলনীতিও হলঃ আপনি নিজের দায়িত্ব নিয়ে চিন্তিত থাকুন, আর আপনার অধিকার আদায়ের কথা ভুলে যান। আমি জানি যে এটা খুবই রুক্ষ শুনাচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি এটা করতে পারেন, ছয় মাস চেষ্টা করে দেখুন, নিজের অধিকার নিয়ে ভুলে যান, শুধু নিজের দায়িত্বটুকু ভাল ভাবে করুন। এটা ভাবুন, আমি আমার স্ত্রীর জন্য কি করতে পারি? তার জন্য আমি আরও কি করতে পারি? আমি কি তাকে কোন উপহার কিনে দিব? কারন আমি অনেকদিন তাকে কিছু কিনে দেইনি, তারপর সে যদি কোন ভুল করে থাকে তাহলে এমন ভান করুন যেন আপনি তা লক্ষ্য করেননি। "ওয়া ইন তা'ফু ওয়া তাস্ফাহ ওয়া তাগফিরু"। তাস্ফাহ মানে হল পৃষ্ঠা দিয়ে ঢেকে রাখা। আপনি যখন একটি পৃষ্ঠা ঢেকে ফেলেন তখন নিচের পৃষ্ঠায় কি আছে দেখা যায়না, তাইনা? সেইভাবে আপনার স্ত্রী যদি কোন ভুল করে তাহলে আপনি এমন ভান করুন যে আপনি তা দেখেননি। এটাকে সরাসরি বলার দরকার নেই যে "তুমি আবার এমন কেন করেছ?" এভাবে আপনি তার ভুলগুলো ঢেকে রাখেন, আর আরও বেশি বেশি নিজের দায়িত্বগুলোর প্রতি যত্নবান হউন। আরও বেশি বেশি ধৈর্যশীল এবং সহনশীল হউন। আর সে যখন আপনাকে আঘাত দিয়ে কথা বলবে তখন আপনি হাসিমুখে তা গ্রহন করুন এবং জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকুন। নিজের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যান।

আপনারা জানেন যে, যখন আপনি চাওয়া শুরু করবেন, স্ত্রীর কাছ থেকে সবাই কিছু নির্দিষ্ট জিনিষ চায়, সে আমার যত্ন নিবে, আমার চাহিদার ব্যাপারে খেয়াল রাখবে, আমার কিছু চাহিদা আছে, মানসিক প্রয়োজন আছে, সে আমাকে সঙ্গ দিবে আরও বেশি ভাল ব্যবহার করবে, আমি যখন বাসায় ফিরি তখন তার হাসিমুখে থাকা উচিৎ, সবসময় আমার ভুল ধরা উচিৎ না। সবসময় আমাকে বাজারের লিস্ট আর লন্ড্রির ব্যাপারে কথা বলবে না, ভালভাবে কথা বলবে। আপনার মাথায় সব সময় এসব চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু জানেন কি, একজন মুমিন কার কাছে তার চাহিদার কথা বলে? একজন মুমিন সর্বদা তার মালিকের কাছে নিজের জন্য আশা করে। কারন আল্লাহ ছাড়া আপনি অন্য যার কাছেই কিছু আশা করবেন আপনি হতাশ হবেন। "দাউফা আত্তালিবু ওয়াল্মাতলুব"। এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটি সর্বব্যাপী পন্থা। "যে আশা করে, যে চাহিদার প্রকাশ করে সে দুর্বল, তাকে দুর্বল করা হয়েছে, এবং সে যা আশা করে তাও দুর্বল, প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল।" যতক্ষণ আপনি কোন সৃষ্ট কিছুর প্রতি আশা পোষণ করবেন, আপনি অবশ্যই হতাশ হবেন। আপনি চান যে আপনার বস আপনাকে প্রমোশন দিক, এটা ঘটবে না। আপনি বন্ধুর উপর আশা করেন, ভাবছেন যে সে তার দেয়া সময় মত আসবে, সে দেরি করবে। অথবা সে আসতেই পারবেনা। আপনি সৃষ্টির প্রতি আশা করবেন, কোন জিনিসের উপর আশা করবেন, আপনাকে হতাশ হতে হবে।

আল্লাহ চান যে আমরা এটা শিখি যে শুধুমাত্র তার কাছেই আশা করা উচিৎ। আর যখন আপনি মন থেকে এটা গ্রহন করবেন, তখন কি ঘটবে জানেন? আপনার স্ত্রী যখন আপনার জন্য খুব অল্প কিছুও করবে আপনি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হবেন, কারন আপনি তার কাছ থেকে কিছু আশা করেননি। অনেক সময় এমন ঘটে যে, আমরা কিছু ইসলামী বইয়ে বা কিছু হাদিসে পড়ি স্বামীর অধিকার বা স্ত্রীর অধিকার নিয়ে। আর তারপর যা ঘটে তা হল, স্বামীরা শুধু স্বামীদের অধিকার আর স্ত্রীরা শুধু স্ত্রীর অধিকার নিয়ে পড়া শুরু করে। সত্য আসলে উল্টোটা। স্বামীদের কি নিয়ে পড়া উচিৎ? স্ত্রীর অধিকার নিয়ে। কিন্তু সবাই নিজেকে নিয়ে মত্ত। সবাই স্বার্থপর। এমনকি ইসলামের ব্যাপারেও তারা শুধু তাই জানে যেটা তাদের কাজে লাগবে। উদাহরন হল, পিতামাতা কুরআনের ব্যাপারে কিছু না জানলেও এতটুকু ঠিকই জানে যে, "ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা"। তারা শুধু এতটুকুই জানে, এমনকি এটাও জানেনা যে এটা কুরআনের কোথায় আছে। তারা কেন শুধু এতটুকুই মনে রাখে? কারন এতটুকুই তাদের কাজে লাগে। তারপর যেমন পুরুষেরা হয়ত কুরআন নিয়ে খুব বেশি জানেনা, কিন্তু যখনি স্ত্রী কিছু বলে, সাথে সাথে স্বামী বলে উঠে "আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান্নিসা" কারন এটাই তাদের কাজে লাগে। তারমানে আপনি আল্লাহ্‌র কথা মত চলছেন না, বরং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে নিজের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন, ঠিক কিনা? আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের দ্বীনে সর্বপ্রথম হল নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করা। তাই আমরা পড়ব আর এটা শিখব যে কিভাবে আমরা নিজেদের স্ত্রীদের জন্য আরও ভাল স্বামী হব, আর স্ত্রীরা কিভাবে আরও ভাল স্ত্রী হবে।

কয়েকদিন আগে আমি একটা খুৎবা দিয়েছিলাম স্বামী আর স্ত্রীর অধিকার নিয়ে। আমি দুই ধরণের নোট বানিয়েছিলাম, একটাতে ছিল স্বামীদের প্রতি উপদেশ আরেকটাতে ছিল স্ত্রীদের প্রতি উপদেশ। আর আমি খুৎবাতে বার বার বলেছি যে, স্বামীদের অধিকার নিয়ে পরবেন না, শুধু স্ত্রীদের অধিকার নিয়ে পড়ুন। আমি আপনার জন্য নোট বানিয়েছি, আপনার স্ত্রীরটা আপনি পড়বেন না, শুধু নিজেরটা পড়ুন। কিন্তু খুৎবা শেষে প্রায় ২০ জন আমার কাছে ছুটে আসলো, "ভাই, আপনি স্ত্রীদের জন্য যে নোট বানিয়েছেন, আমাদের একটা কপি দিন"। "না আমি আপনাদের কপি দিবনা, কারন আপনারা বাসায় যেয়েই স্ত্রীদেরকে দেখাবেন,এই যে পয়েন্ট ৪ দেখ, দেখেছ, তুমি গত ৬ মাস এটা করনি।" এটা সত্যি সত্যি একটি সমস্যা। এটা সংসারে অনেক অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই যদি আপনি বিয়ের মাধ্যমে একটি সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, আপনাকে নিজ দায়িত্বের প্রতি আরও যত্নবান হতে হবে।

এমন কাওকে বিয়ে করুন যে আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবে

4 November 2014

লেখকঃ আব্দুল্লাহ

এক.

বর্তমান সমাজে অহরহ পরকিয়া , ডিভোর্স , দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল কারণ পরিবারের মধ্যে ইসলাম না থাকা । আর যে পরিবারে ইসলাম থাকবে না সে পরিবারে থাকবেনা আল্লাহ ভীতি এবং নিজ কর্মের জবাবদিহিতা । এতে করে শয়তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাচ্ছেতাই করে যাওয়া যায় । যার দরুন ঘরে বৌ থাকা সত্তেও পর-নারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কিছু অনৈসলামিক পুরুষের জন্য মামুলি ব্যাপার। এভাবে একটা পর্যায়ে ঐ পুরুষরা নিজ বৌয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং পরকিয়ায় জড়িয়ে যায় , এরপর পারিবারিক অশান্তি , এমনকি ডিভোর্সের মত ঘটনাও ঘটে । আর এটা ঘটে ঐ পুরুষ গুলোর মধ্যে আল্লাহ ভীতি না থাকার কারণে । আল্লাহ ভীতি তো সেটাই যা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর আল্লাহর জন্য নিজেদের চোখ ও অন্তরকে হেফাজত করে এবং আল্লাহর জন্য একে অপরকে গভীর ভাবে ভালবাসে । যে ভালবাসা বিয়ের দিন যেমন থাকে , বিয়ের ৩০ বছর পরেও একই রকম থাকে । আর এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রাহমাত । তারা আল্লাহর জন্য নিজেদের চরিত্র হেফাজত করেছেন বলে আল্লাহ তাদের দু'জনের মধ্যে এমন গভীর ভালবাসা স্থাপন করে দিয়েছেন ।

ইসলামের বিপরীত স্রোতের মানুষগুলোর জন্য যা শুধু কল্পনা !

আমাদের সমাজে তথাকথিত মা-বাবারা তাদের সন্তানদের বিয়ে দেয়ার সময় তাকওয়া দেখে বিয়ে দিতে চাই না । তারা দেখে ছেলে কত টাকার মালিক , কত উচ্চে তার বংশ , কত গুলো ডিগ্রী আছে ছেলের বাস্কেটে । অথচ , একবারের জন্য ভাবতে চাই না , যে ছেলের কাছে সারা জীবনের জন্য তার মেয়েকে দিচ্ছে , সে ছেলের চরিত্র ঠিক কিনা বা ছেলেটির পরিচালিত জীবনে আল্লাহ ভীরুতা আছে কিনা !

একইভাবে দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে , সুন্দরী বৌয়ের খুঁজে তারা তাকওয়াবান স্ত্রীর কথা ভুলে যায় । একসময় দেখা যায় , সেই সুন্দরী বৌ তাকে ফেলে চলে যায় বা পরকিয়ায় পতিত হয় বা তার নিজের রুপের অহংকারে সংসারে সবসময় অশান্তি লেগেই থাকে । অথচ , রাসুল (সাঃ) বলেছেন , দুনিয়ার যত সম্পদ আছে , তার মধ্যে উত্তম সম্পদ হচ্ছে একজন নেককার স্ত্রী ।

আমাদের মা-বাবাদের উচিত তাদের কন্যাদের সু-পাত্রস্থ করতে চাইলে দ্বীনদার, পরহেজগার , তাকওয়াবান যুবকদের সাথে বিয়ে দেয়া । এতে করে কন্যাও সুখী হোল এবং সমাজেও পরকিয়া , ডিভোর্সের মত ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে । এই ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা হল :-

"যার দ্বীনদারী ও আখলাক-চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, এমন কেউ প্রস্তাব দিলে তার সাথে তোমরা বিবাহ সম্পন্ন কর । তা না করলে পৃথিবীতে ফিৎনা দেখা দেবে ও ব্যাপক ফ্যাসাদ ছড়িয়ে পড়বে ।" [তিরমিযী, হাদীস : ১০৮৪]

দুই.

আমরা সবাই চাই আমাদের স্পাউস যেন খুব ভাল হয় , চরিত্রবান হয় , স্যাক্রিফাইস মাইন্ডের হয় । আপনি যদি আসলেই আপনার দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও সুখী দেখতে চান তাহলে আপনার থেকে অবশ্যই ইসলামের হুকুম-আহকামের দিকে আসতে হবে । মনে রাখবেন , একজন তাকওয়াবানের পক্ষেই সম্ভব নিজেকে সৎ , চরিত্রবান করে গড়ে তোলা । কারণ , আল্লাহ ভীরুতার কারণে সে সৎ হয় , চোখ ও অন্তরের হেফাজতকারী হয় , সর্বোপরি দাম্পত্য জীবনের জন্য একজন উত্তম স্পাউস হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সমর্থ হয় । সে জানে সে যদি তার স্পাউসের হক ঠিক মত আদায় না করে তাহলে কাল হাশরের ময়দানে সে আল্লাহর দরবারে কঠিন ভাবে জবাবদিহি দিবে ।

ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নাই এমন কাওকে যদি আপনি বিয়ে করেন তাহলে আপনি অবশ্যই ঐ স্পাউসকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন , কারণ সে যেকোন সময় শয়তানের ধোঁকায় পরতে পারে । আর এমন পরকিয়া , দাম্পত্য জীবনে কলহের নজির আমদের সমাজে অনেক আছে ।

তাই বিয়ে করলে এমন একজনকে বিয়ে করুন যে ,

* আপনাকে চিন্তা মুক্ত রাখবে ।

* আপনার সাথে সদাচারণ করবে ।

* আপনার হক ঠিক মত আদায় করবে ।

* আপনাকে আল্লাহর জন্য অন্তর থেকে ভালবাসবে ।

* আপনার বিপদ-আপদে আপনাকে সাহায্য করবে , সবর ধারণ করার শক্তি যোগাবে এবং সঠিক পরামর্শ দিবে ।

* যার স্পর্শে আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাবে ।

* যে আপনাকে তাহাজ্জুদ ও ফজরের সময় জাগ্রত করবে ।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হোন, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, আর স্ত্রী যদি উঠতে দ্বিধা করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি সদয় হোন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়, আর স্বামী উঠতে দ্বিধা করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।"

রিয়াদুস সলিহীন : ১১৮৩

[ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন]

** এক কথায় আখেরাতেও আপনারা দু'জন এক সাথে থাকার জন্য দুনিয়াতে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যে থাকবে পূর্ণ বিশ্বস্ত । ইন শা আল্লাহ ...

তাই বিয়ে করার ক্ষেত্রে এমন কাওকে বিয়ে করুন যে আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবে এবং আপনিও তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসবেন । কারণ হাদীসে আছে ,

"যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালবাসবে , আল্লাহও তাদের পরস্পরকে আল্লাহর অনুগ্রহ দিয়ে ভালবাসবেন ।"

তিন.

একজন দ্বীনহিন মানুষকে বিয়ে করার আগে আপনি যদি ভাবেন বিয়ের পর বুঝিয়ে মানিয়ে ঠিক করে নিব তবে এটা ভাবা ভুল। আপনি যদি ভাবেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কতো মাটির মত, ইচ্ছে হলেই দাওয়াত দিয়েই সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারব। এটা ভাবাও ভুল।আপনি যাকে চাইবেন তাকেই সঠিক পথে আনতে পারবেন না যদি আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথ না দেখান।

অনেকে বলে কৌশল খাটিয়েই তো স্বামী স্ত্রীকে, অথবা স্ত্রী স্বামীকে পথে নিয়ে আসতে পারে। হয়না যত কৌশল অবলম্বন করুক, অনেক কিছুই এত সহজে হয়না। ঐ মানুষটিকে কিভাবে এত সহজে ঐ লেভেল থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা যায়,যাকে তার বাবা ইসলামের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়নি? যারা নামকা ওয়াস্তে মুসলিম, আল্লাহর হুকুম পালনের ধারে কাছেও যায়না,তাদেরকে কিভাবে এত সহজে ঠিক করা যায়?সূরা নূরের এই আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যাটা জানতে মন চায় যেখানে বলা হয়েছে ভালোর জন্য ভালো,আর খারাপের জন্য খারাপ।

যে বিন্দু পরিমাণ ইসলাম মেনে চলতে চান তাদের প্রতি অনুরোধ নেককার পুরুষ অথবা নারীকে বিয়ে করুন। যাকে বিয়ে করে আপনার আমল অনেক ভালো হবে। অনেক বেশি ইসলামের উপর চলা সহজ হবে। এমন যেন না হয় কাউকে হেদায়াতের সঠিক পথ দেখাতে বিয়ে করে নিজেই অন্ধকারে হারিয়ে যান।

চার.

''দাম্পত্য জীবনে রোমান্টিক টিপস "

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে সলাহ আদায়ের ব্যাপারে সিরিয়াসলি তাগিদ দিন । স্বামী ঘরের বাইরে থাকলে ফোন করে স্ত্রীর খবর নিন , তদ্রুপ স্ত্রীও স্বামীকে ফোন করে খোঁজ-খবর নিন । এতে সম্পর্ক মজভুত হয় , পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায় ।

প্রিয় ভাই ,

আপনি যখন শেষ রাতে সলাহ (তাহাজ্জুদ) আদায় করতে আপনার সঙ্গিনীকে জাগিয়ে দিবেন এবং পরস্পর সলাহ আদায় করবেন , তখন সলাহ শেষে তসবিহ পাঠে আপনার সঙ্গিনীর হাতের আঙ্গুল (গিরা) গুলো ব্যাবহার করুন । এই জন্য যে , সওয়াবের ভাগিদার যেন আপনার স্ত্রীও হয় । আর দুয়া করুন , আল্লাহ যেন জান্নাতেও আপনাদের দু'জনকে এভাবে একত্রিত থাকার তাওফিক দান করেন । ইন শা আল্লাহ ।

তাই স্বপ্ন দেখবো বলে আমি দু'চোখ পেতেছি

30 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

আমরা একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের একটা সময় অতিক্রম করছি এখন। সময়টা কঠিন যাচ্ছে। এমন কঠিন সময় হয়ত যুগে যুগেই নির্দিষ্ট বিরতি পর পর আসে। যুগের বিচার করলে আমাদের চলে না। আজ থেকে মাত্র ১০০ বছর আগে এই পৃথিবীতেই ঘটে গিয়েছিলো নারকীয় বিশ্বযুদ্ধ। হানাহানি-খাদ্যমন্দা-ক্ষমতা দখলের লড়াইতে ডুবে ছিলো সমগ্র বিশ্ব। অনেকেই অনেক অর্জন করেছে, তারপর বছর বিশ যেতে না যেতেই আবার আরো বড় ভয়ংকর সময় -- সেই ক্ষমতা খাটানোর যুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিকে বিষাক্ত করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণনাশ করে দিয়ে আমেরিকান জাতিগোষ্ঠী বিশ্বকে কব্জা করেছে আপন কৌশলে। অথচ তার দুইশ বছর আগেও ব্রিটিশ সূর্য ডুবতো না কোথাও। এমন আরো অজস্র চোখ দিয়ে দেখা যাবে "সময়"গুলো।

আরেকটু উপরে উঠি? যখন সভ্যতাগুলো হারিয়ে গেলো। ফারাওদের মিশর, মেগাস্থিনিস, ব্যাবিলন, ইনকা, মায়া, পাল সাম্রাজ্য, সেনদের রাজত্ব, অটোমান এম্পায়ার -অমন শত শত সভ্যতা পাওয়া যাবে হয়ত যদি হিসেব করি এই সৃষ্টির শুরু থেকে। কিন্তু তাদের অমন হিসেব করে আমাদের লাভ নেই। সভ্যতা টেকে কয়েকশত বছর। আমরা বাঁচি খুব বেশি হলে অর্ধশত বছর। আমরা বাস করছি বিদ্যুত সভ্যতায়। মাত্র দু'তিনশ বছর আগে উদ্ভাবিত বিদ্যুত দিয়ে গত পঞ্চাশ বছরে প্রযুক্তিতে উন্নত হয়েই মাটিতে আমাদের আর পা পড়েনা। আমরা বুর্জ আল আরব বানাই, আমরা বানাই পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার, মনোহারি সিয়ার্স টাওয়ার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, আইফেল টাওয়ার। আমরা দম্ভে আর বড়ত্বে গলা ফুলিয়ে দিই।

অথচ প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চে যখন কয়েকটা হিমালয় ডুবে যাবে শুনি -- মনে হয়না ওই উঁচু হিমালয়, আর অমন গভীর খানা-খন্দটা কে তৈরি করলো! প্রকৃতি নামের শব্দটা দিয়ে লেখকমহল চালিয়ে দেন অগভীর চিন্তার পাঠকদের মনকে বাঁকিয়ে দেবার জন্য -- আমরাও সন্তুষ্ট হই। কিন্তু অমন পিরামিড বানালেন যারা, আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘর বা পিসার হেলানো মিনার যারা বানালেন -- তারা কোথায় চলে গেলেন? মরে গেলেন তো কেন আর কোন চিহ্নই রইলো না তাদের? কত বেশি দুর্বল সেই সভ্যতার এই ধারক ও বাহকদল -- কতনা ক্ষণস্থায়ী এই বিপুল দম্ভযজ্ঞ, সৃষ্টিযজ্ঞ আর ক্ষমতাযজ্ঞ! এসব সভ্যতা আসবে যাবে। একসময় আদ জাতি ছিলো, সামূদ জাতি ছিলো। দম্ভে আর জুলুমে তারা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো সবাইকে। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে ক্ষমতাধর জাতিকেও আল্লাহ এক মূহুর্তেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। কওমে লূতের মাঝে "সমকামিতা" প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিলো, তারা শুনেনি তাদের নবীর বলা কথাগুলো-- মাটিচাপা পড়ে, প্রকট শব্দে কানে তালা লেগে সমস্ত জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো।

পবিত্র কুরআনে এই পৃথিবী আর নভোমন্ডলসহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেই দিয়েছেন-- তিনি অনেক জাতিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন তাদের "কাজের জন্য"। তিনি জানিয়েছেন আমাদের মাঝে কেউ যদি তার দাসত্ব না করে, আল্লাহ তাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে আরেকটা জাতিই সৃষ্টি করে দিতে পারেন -- নিঃসন্দেহে এটা তার জন্য কোন ব্যাপারই না। কিন্তু আমরা যখন সেই কোন একটি জাতিস্বত্বার অংশ -- তখন সেটা আমাদের জন্য "ব্যাপার"। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনই আমাদের জন্য ব্যাপার। আমাদের একটা জীবন একবারের জন্যই। এই আত্মা, এই দেহ আর জীবন -- একবারের জন্যই। আমরা নিশ্চয়ই অবলীলায় ভেসে দিতে পারিনা আমাদের জীবন -- আমরা অবশ্যই চাইনা একটা নিশ্চিত ভয়ংকর পরিণতি। এমন উদ্দেশ্যহীন বর্বর লোভী, জালিম আর কামুক সমাজ তৈরি করে যে জাতি-- তার অংশ হওয়ায় আমাদের ভালো কাজের অ্যাকাউন্টে অনেক কিছু জমা থাকলেও -- সেই পুরো ব্যাঙ্কটাই মহান অধিপতি করে দিবেন "সিলড"। তাইতো খেয়ে দেয়ে, ঘুমিয়ে, চাকুরি করে দিন অতিক্রম করার পরেও মহান সর্বশক্তিমানের দাসত্বের কতখানি আমরা প্রত্যেকে/পরিবারসহ/ এই পুরো জাতি মিলে করছি তা চিন্তা করার দায় থেকে যায় সবারই। নইলে একদম শেষে সকল প্রাপ্তিই হয়ত মাল্টিপ্লাইড হবে শূণ্য দিয়ে,

(ধনসম্পদX প্রতিপত্তি X সম্মান X যশ X জ্ঞান) X শূণ্য = শূণ্য [ভিখিরী]

এখন চিন্তা করার বিষয় রয়ে যায় -- আমরা কি হাশরের ময়দানের বিশাল প্রান্তরে ভিখিরি বেশে দাঁড়াতে চাই?

আমি চাকুরি করি একটা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক "আধুনিক প্রজন্মের" তরুণ। আমাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলে আলাপ।

প্রায়ই টপিক আসে **"গার্লফ্রেন্ড-বিয়ে-মেয়ে"**। একদিন সহসা লম্বা চওড়া আলাপ হলো-- আমি শ্রোতা টাইপের। কিছু কিছু আলাপে সবার প্রবেশের ফাঁকফোকর থাকে না। তাই ওয়েস্টিন, রুচিতা বার, ভুত, রেস্তোরা, পিজা হাট, কেএফসি গুলশান ধানমন্ডির কিছু কিছু প্লেসের রঙ্গিন আলাপ চলতে থাকলে অন্য কাজে মন দিলাম। এলো বিয়ের আলাপ। প্রশ্ন আমার দিকে। কেন প্রেম করিনা -- এ নিয়ে কিছুক্ষণ হাসি তামাশা।

ইদানিং ছেলে মহলে একটা কথা খুব শুনি -- "লাভ ম্যারেজ মানে নিজের গার্লফ্রেন্ড, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ মানে অন্যের গার্লফ্রেন্ড"।

আমি এই প্রসঙ্গেও কথা বলিনা, শুধু স্মিত একটা হাসি উপহার দিই ওদের। একজন অভিজ্ঞতা বলছিলেন নিজ জীবনের -- কীভাবে তিনি স্কুলগামী একটা মেয়ের সাথে প্রেম করেছিলেন, কতবার চাকুরিজীবী বাবা মায়ের সেই মেয়েরটির বাসাতেই শয্যাগমন করেছেন, কীভাবে মেয়েটা রিলেশন ব্রেক করে *আপ* রিলেশনে চলে গেলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই। তারপর একজন বলতে শুরু করলো তাদের ভার্সিটিতে[ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে] কীভাবে ক্লাসের মধ্যেও ছেলে-মেয়ে আদিম আনন্দের স্বাদ নিতো। অমন কমপক্ষে ১০-১২টা গল্প। সত্য-মিথ্যা জানিনা, আমি স্তব্ধ হয়ে শুনি। বরফশীতল হয়ে জমে যাওয়া দেহে রক্তসঞ্চালনের চেষ্টা করতে থাকি। আমার দিকে তাকিয়ে একজন কলিগ বলতে থাকে -- "তুমি এই জেনারেশনে এমন কোন মেয়ে আশা করতে পারো না বিয়ে করতে গিয়ে, যে *ইউজড* না"! তার পরপরই আবার বলে "টাকা-পয়সা না থাকলে বউ *বাঁধতে* পারবা না, তোমাকে অনেক টাকা থাকতে হবে, নইলে বউ তোমার অফিসে থাকার সময়ে পাশের বাড়ির ছেলেটার সাথে ফোনে কথা বলবে, তারপর... "। আমি আর সহ্য করতে পারিনি, শক্ত গলায় বলে উঠেছিলাম -- "দুঃখিত আমি একমত না। এই সমাজে আমার মতন দুর্বল আত্মার একটা ছেলেও যখন এমন ভয়াবহতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এমন কেউ আমার জন্য আছেই যে আমার মতন করেই আমার মতন কারো জন্য অপেক্ষা করছে। সমস্ত মেয়েদের এক করে দিলে হবেনা কেননা আমি আমার বোনদের মতন অনেক মুসলিমাহ বোনদের চিনি যারা অসম্ভব সুন্দর অন্তকরণকে ধারণ করে"। যাদের চোখে পৃথিবী কেবলই কেনাকানা, গয়নাগাটি, সাজগোজ আর গাড়ি-বাড়ির না। তাদের কাছে এই জীবনটার একটা আলাদা অর্থ আছে। তাদের কাছে ব্র্যাডপিট-নিকোল কিডম্যান, শাহরুখ-গৌরি, প্রভা-রাজিবরা দাম্পত্য জীবনের আইকন না। তাদের কাছে আইডল হলো হলো ফাতিমা, আয়িশা, আসিয়া, খাদিজা নামের কিছু পবিত্র আত্মা।

মুসলিম যারা, তাদের আইডল তথা আদর্শ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যার জীবনে দারিদ্র ছিলো আগাগোড়া বন্ধু। আরবের ইসলামী রাস্ট্রের এই নেতা বিয়ের অনেকগুলো বছর পরেও মোহরানা আদায় করতে না পারায় স্ত্রী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে নিজ বাড়িতে তুলে নেয়ার সুযোগ করতে পারেননি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জরুরি ফান্ডে দান করতে কিছু জিনিস নিয়ে যাবার পর তাকে প্রশ্ন করা হলো বাড়িতে কি রেখে এসেছেন -- তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তার রাসূলকে। কারণ তার ঘর ছিলো শূণ্য! এমনই ছিলেন তারা, আর তাদের সহধর্মিনীগণ ছিলেন অমনই। কই, তারা তো *বউ বাঁধতে* বাড়ি-গাড়ি-ঐশ্বর্যে মুড়িয়ে রাখতেন না (যদিও তা করার সুযোগ তাদের ছিলো)। সেই আদর্শের বলে দাস যায়িদ বিন হারিসা সন্তান পেতেন উসামা বিন যায়িদদের মতন। যাকে নবীজী (সা) মাত্র উনিশ বছর বয়েসে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন, যার নেতৃত্বে অনেক

প্রবীণ সাহাবাও তাগুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন-- স্থাপন করে গেছেন অনুপম দৃষ্টান্ত। তাদের ছোটো একটা বাহিনীর কাছে প্রবল প্রতাপশালী রোমান সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। আমার আইডল তো সেই ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, যিনি একজন অতিথি ছাড়া খেতেই বসতেন না। আমাদের আইডল হলেন আইয়ুব আলাইহিস সালাম -- যার দেহের কোন ইঞ্চি বাকি ছিলো না রোগ থেকে, তবু তিনি ছিলেন প্রশান্ত আত্মায় তার মনীবের কৃতজ্ঞ দাস। আমি সেই দ্বীনকেই জীবনবিধান হিসেবে মানি -- যা সৃষ্টির শুরুতেও ছিলো, যা থাকবে বিশ্বজগত ধ্বংস অবধি। আমি সেই নৌকায় উঠতে পারি বা না পারি, এই দ্বীন ইসলামই বিজয়ীদের আরোহণের যান -- যা নিয়ে যাবে সফলতার মঞ্জিলে।

বউ বাঁধতে টাকা কামানোর আইডিয়ায় মগ্ন থেকে, ক্রমাগত অন্যের সাথে নিজেকে বড় করার টেক্কা দিতে দিতে, নিজেকে খুউল আর ইয়ো স্মার্ট বানানোর নেশাময়তায় ইনভলভ করতে শেখায়না আমার এই দ্বীন। আমাদের আমাদের সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহর জন্যই। সেই ভালোবাসায় সিক্ত আমি যেখানেই যাই, জীবনের প্রয়োজন সামলে ঘরে ফিরে যাবো প্রিয়জনের কাছে -- আবেগ আর ভালোবাসা ভাগাভাগি করতে। আমরা বিয়ের আয়োজনে কেবল আল্লাহর স্মরণে একটা দোয়া করতে উন্মুখ থাকি -- যেন আমাদের নতুন এই বন্ধন তার দাসত্বের জন্যই হয়। যেন দুজনের এই বন্ধন পৃথিবীর জীবন ছাপিয়ে কবর, হাশর, পুলসিরাত, মীযান পেরিয়ে জান্নাতেও অটুট থাকে। যেন দু'জন এই নতুন ভালোবাসার গ্ল্যামার নিয়ে থাকি অনন্তকাল, যেমন ছিলেন আমাদের আইডলেরা। আমরা জানি আমাদের ভালোবাসা নশ্বর নয় -- আমাদের ভালোবাসা হলো আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসার আলোকে উদ্ভাসিত। আমাদের বিশ্বাসের কমতি হবেনা কখনই। আমাদের সম্মানের ঘাটতি হবেনা কখনই। আমরা সবসময় নিজেদের শোধরাতে শিখি। তাই আমাদের ভুল বুঝাবুঝি রবে না বেশিক্ষণ। আমাদের মৃত্যুবধি আমরা নিজেদের উন্নত করি আত্মিকভাবে। আমরা কখনই হারিয়ে যাইনা সময়ের নষ্টদের দখলে যাওয়া প্রচারণার কাছে, আমরা কখনই হারিয়ে যাইনা প্রাচূর্যের প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন হওয়া গাফেলদের উঁচু উঁচু অট্টালিকা মতন অহংকার দেখে। আমরা জানি, আমরা মানুষকে, মানবতার জন্য নিজেদের বিলাই লোক দেখাতে না-- কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার আশায়।

আমরা খুব ভালো করে জানি, আমাদের প্রতিটি মূহুর্তের কাজ ও মনের চিন্তা-অনুভূতিরা রেকর্ডিং হচ্ছে -- যার কিছুই গোপন থাকবে না, তা থেকে রক্ষা পাবো না আমরা কেউই। মরুর বুকে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতিকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলো যেই দ্বীনের পূর্ণাবয়ব আমরা সেই সে দ্বীনের অনুসারী। মুশরিক সর্দার আবু জাহলের ছেলে ইকরিমা জীবনভোর মুসলিমদের বিরোধিতা করেছিলেন, হিন্দা হত্যা করেছিলেন তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। অথচ পরে তারা যখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নবীজীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন-- পেয়েছিলেন, হয়েছিলেন রাদিয়াল্লাহু আনহুম, আনহুমা। আর দ্বীনকে গ্রহণ করে নেয়ার পর তাদের জীবন ও চরিত্রও ছিলো অন্যরকম সুন্দর। এই উদার ভালোবাসাময় সুন্দরতম দ্বীন ইসলাম হলো আমাদের আদর্শ! এই সুন্দরতম জীবনবিধান আমাদের সম্পদ।

আমাদের সামনে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো, রাস্তার বিলবোর্ডগুলো, পত্রিকা-ম্যাগাজিনগুলো যতই হতাশা প্রচার করুন না কেন, প্রাচূর্যের নেশায় চুর হয়ে যাওয়া ব্যবসায়ীরা যতই ভয়াবহ সমাজ তৈরি করুক না কেন, আত্মিক মুক্তির জ্ঞানে মূর্খ শাসকদল আমাদের যতই শোষণ করে ছিবড়ে করে দিক না কেন, আমরা জানি আমাদের অন্তরের আলোতেই আমরা মুছে দেবো এই অন্ধকারের নোংরামি, কদর্যতা। আমাদের কর্মের আলোতে, অন্তরের ভালোবাসায় সিক্ত হবে অভাবীরা, মজলুমেরা, মানবতা। রুপালী আর সোনালী পর্দার প্রচারণায় পণ্য হওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে সম্মানিত হবেন আমাদের মা-বোনেরা এই দ্বীনেই স্পর্শেই। আমরা তো হতাশ নই! আমরা নোংরা মনের লোকের নোংরা কথায়

দুঃখের সাগরে ভেসে হতাশ হয়ে "আনইউজড" মেয়ে খুঁজতে প্রেম করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়িনা। আমরা প্রতিদিন সালাতের পরে, ইবাদাতের পরে হাত দুটি তুলে দোয়া করি,

"রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ক্বুররাতা আ'ইয়ুনিউ ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাক্বিনা ইমামা"। যার অর্থঃ **"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।"** [সূরা ফুরক্বানঃ ৭৪]

আমরা জানি, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত দোয়া কবুল করেন এবং দোয়ায় ভাগ্য ফিরায়। তাইতো এই ভয়ংকর সময়েও আমরা স্বপ্ন দেখি সুন্দরের, প্রশান্ত আত্মার। এই স্বপ্ন কোন ক্ষুদ্র স্বপ্ন নয়-- স্বপ্নের সুতোর এই প্রান্তে মালা গাঁথছি যখন, অন্য প্রান্তেও তখন আমাদের হয়ে মালা গেঁথে যাচ্ছে জান্নাতে, যেখানে শান্তিই শান্তি। আমাদের কাজই তো তৈরি করে দেয় আমাদের ভবিষ্যত, যে ভবিষ্যত অনন্ত কালের। যা সুন্দর কর্মের মানুষদের জন্য অনন্ত সুন্দর, অনন্ত শান্তির, সুখস্বপ্নের!

যারা বিয়ে করতে চাইছেন

4 November 2014

অনুবাদকঃ সাফওয়ান

যারা এই সমাজের অশ্লীলতা আর অন্যায়ের হাতছানি থেকে নিরাপদ থাকতে বিয়ে করতে চাইছেন, নিঃসন্দেহে আলহামদুলিল্লাহ্ তা একটি দারুণ নিয়্যাত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জীবনের লক্ষ্য আত্মাকে আল্লাহর দিকে রুজু রাখা, আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা, তার ইবাদাত করা।

সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী খুঁজতে অস্থির হয়ে, অশান্তিতে থেকে, হতাশ হওয়া মু'মিনের কাজ নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে নির্ধারিত রেখেছেন, তিনিই আপনার জীবনে আসবেন। কিন্তু তার কাছে পৌঁছতে আল্লাহর কাছেই কান্নাকাটি করা উচিত, তার কাছেই নফল ইবাদাতের মাধ্যমে অনাগত জীবনটাকে আরো কল্যাণময় করার জন্য বিনিয়োগ করা উচিত দু'আ। আল্লাহর আরো কাছে যেতে সাদাকাহ করুন।

ফেসবুকের প্রোফাইলে, ইনবক্সে, গুগল টকে, ইয়াহু মেসেঞ্জারে জীবনসঙ্গী না খুঁজে তার কাছেই হাত পাতুন, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। যিনি এই বিশ্বজগতের প্রতিপালক, সমস্ত দু'আ যিনি শোনেন। যিনি আপনার প্রতিটি দু'আর প্রতিউত্তর দেন। সেই আল্লাহর আরো কাছে যান, তার কাছেই চরিত্রের হিফাজতের জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দু'আ করুন। ইনশা আল্লাহ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন।

* * * * *

কখনো দু'আর শক্তিকে অবজ্ঞা করবেন না। দু'আ একটি ইবাদাত। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন বাজে চরিত্রের মহিলা কামনা পূরণ করার জন্য ডেকেছিলো, তখন তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছিলেন, পরবর্তীতে তার মর্যাদাকেও উন্নীত করেছিলেন। যারা চরিত্রকে সৎ রাখতে প্রতিকূল পরিবেশে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে নিজেকে পবিত্র রাখে, আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন বিশাল পুরষ্কার।

দু'আ মু'মিনের সবচাইতে বড় অস্ত্র। তাই, যেকোন কঠিন পরিবেশে, যখন কোথাও আশা নেই, প্রচন্ড যন্ত্রণা -- আল্লাহর কাছে চোখ ভিজিয়ে প্রার্থনা করুন। তাঁর ভান্ডারে কোন অভাব নেই, তিনি অভাবমুক্ত। তাই, দু'আ করুন। প্রচুর দু'আ করুন। যেকোন বড় চাওয়া আল্লাহর কাছে বিনীত হয়ে চেয়ে নিন। আল্লাহ আপনাকে অভাবমুক্ত, পুরষ্কৃত করবেন ইনশাআল্লাহ।

* * * *

হে আমার বোন , জেনে রাখো --

তুমি যদি একজন পুরুষকে তার সম্পদের জন্য বিয়ে করো, ধন-সম্পদ কিন্তু শেষ হয়ে যেতে পারে।

তুমি যদি কারো বাহ্যিক রূপ দেখে বিয়ে করো, সে চেহারার চমক মিলিয়ে যেতে পারে।

তুমি বিয়ে করতে পারো ক্ষমতার দাপট দেখে, কিন্তু সে ক্ষমতাও হারিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু তুমি যদি একজন দ্বীনদার আল্লাহভীরু ভাইকে বিয়ে করো, তাহলে সে তোমাকে সম্মান করবে, তোমার প্রতি দয়ার্দ্র থাকবে, সে তোমাকে আল্লাহর কাছে যেতে সাহায্য করবে। তোমাদের 'ভালোবাসার গল্প' হবে চিরন্তন একটি গল্প। তোমার প্রতি তার ভালোবাসা হবে দুনিয়ার জন্য জান্নাতের মতন, তোমার প্রতি তার সন্তুষ্টি হবে আখিরাতে তোমার জান্নাতের চাবি।

বিয়ে করে ভালোবাসা কেমনে পাব?

30 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

বিয়ে বিষয়টাতে মাঝে মাঝে কথা বলায় অনেক টিটকারি শুনেছি চেনাজানা মহলেই। তবু আমি বলতে থাকি, কেননা খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিয়ে পূর্ববর্তী আর পরবর্তী বিষয়গুলো একেকটা মুসলিমের জীবনের বিশাল অংশ 'কনট্রোল' করে। আমি অজস্র ঘটনা জানি যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানের রোস্টের স্বাদ নিয়ে কনেপক্ষকে জিহবার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে। মেয়েকে গয়নাগাটি দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হলেও সেখানে কত-ভরি-কত-আনা কম ছিলো, ফার্নিচার দিতে হবে, দিলেও কাঠটা ভালো হয়না... এমন আরো কত কী! মেয়েকে 'সাজিয়ে' দেয়া হয়নি কেন, ছেলেপক্ষের চাচা আর মামাকে আলাদা দাওয়াত দেয়া না হলে সম্মান তছনছ হয়ে যায়। এগুলো কি মানবিকতা বা ইসলামিক আচরণ?

ইসলামি বিধানে কোথাও উল্লেখ নেই একটা মেয়ের বাবা-মা এরকম খরচ করতে বাধ্য। অনেকে তবু অনুষ্ঠান নিয়ে এইসব আজেবাজে কথাতে সবর করেন। কিন্তু ঘরে নববধূকে সবাই মিলে ক্রমাগত তাচ্ছিল্য করতে থাকে -- 'আমাদের দেশের কালচার হ্যান ত্যান'। কীসের দেশ? চট্টগ্রামের মেয়েকে বরিশালের রান্না শিখে সেটা অবশ্যই খেতে হবে? তার পছন্দ-অপছন্দ থাকবে না? এদেশীয় সংস্কৃতিতে একটা মেয়ে তার পরিবার ফেলে রেখে একটা ছেলের সাথে বাস করতে ছেলের পরিবারে চলে আসে, অথচ সেখানে এরকম বিজাতীয় শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পেলে কীভাবে তাকে উন্নত মা হিসেবে আশা করা যায় যখন তার তার জীবনের বড় একটা অংশ অর্থহীন অযৌক্তিক মানসিক যুদ্ধ করেই যায়? আশ্চর্য সব কদর্য মানসিকতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আমাদের পরিবারগুলোর চিন্তাধারা। কীভাবে কেউ আশা করতে পারে যে সে কারো প্রতি ইনসাফ করলো না, অথচ আল্লাহ তার হিসাব নিবেন না?

একটু অর্থসম্পন্ন হলে মেয়েপক্ষও কখনো ছেলেদের ছেড়ে কথা কয়না। 'আমাদের মেয়েকে ভেসে যেতে দিতে পারিনা', 'বিয়ের অনুষ্ঠানেই খরচ করতে পারবে না ভবিষ্যতে কিভাবে খাওয়াবে', 'আমাদের বংশের মেয়েদের একটা আলাদা স্ট্যাটাস আছে', 'মোহরানা এত কম হলে হবেনা' -- এসব কথা দিয়ে শুরু হয় একটা সম্পর্ক। সম্মান পাওয়া একটা ছেলের মজ্জাগত চাওয়া, সেটাকে দুমড়ে-মুচড়ে মেয়েকে তার হাতে তুলে দিলে ভবিষ্যতে ভালো আশা করা অস্বাভাবিক নয়কি? সেই ছেলেটার হয়ত নিয়্যাহ করেছে আজীবন মেয়েটাকে আগলে রেখে সে সারাদিন ব্যয় করবে চাকুরিস্থলে। অথচ এসব অনর্থক কথা কেন? কীসের দাসত্ব এইসব? আল্লাহর? নাকি সমাজের? নাকি নিজদের অন্তর্নিহিত দানবের? ইসলামি শারিয়াহ-তে ওয়ালিমা খুবই মাইনর একটা অংশ, রোস্ট-পোলাও-বোরহানির ক্যাচাল একেবারেই অগ্রহনীয়। কিন্তু আল্লাহর কারণে জীবন পরিচালিত করতে চাওয়া ছেলে এবং মেয়েটার চরিত্র ও মানসিক-বুদ্ধিবৃত্তিক মিল থাকাটাই বেশি জরুরি।

সম্মান, ভালোবাসা, দু'আ -- এগুলো জোর করে পাওয়ার জিনিস না। এই সময়ের ছেলে বা মেয়ে কেউই মনে হয় ব্যাপারগুলো বুঝেনা। ভালোবাসা পেতে হলে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে দিতে হয়। প্রতিদানে তাদের কাছ থেকে ভালোবাসা না পেলেও আল্লাহ আরেকটা মানুষকে দয়া করার কারণে, ইহসান করার কারণে প্রতিদান অবশ্যই দিবেন ইনশা আল্লাহ। সম্মান পেতে হলে ত্রাসের সৃষ্টি করা লাগে না। একটা মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য এবং কর্মই আরেকজনের কাছে সম্মানের জায়গা তৈরি করে। আর এরপরেও দু'আ পেলে একজন ভাগ্যবান, তার অনন্তজগত আলোকিত হয়ে গেলো। তাই ছেলে বা মেয়ে, যে-ই হোক না কেন -- সবার আগে নিজের অন্তরের দানবের হাত থেকে, নখরবিশিষ্ট পশুটার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করা আবশ্যক। নইলে দুনিয়াতেও কোন উন্নত প্রাপ্তি হতে পারে না।

আর আল্লাহর কাছে মুক্তি পাওয়া? মানুষের জীবনে এত অন্যায় অত্যাচারের পরে মুক্তি পাওয়ার আশা করতে গেলে মনে রাখা উচিত --আমরা সবাই আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব একদিন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, তার পাকড়াও বড়ই শক্ত। নির্দিষ্ট সময়ের পর তিনি কাউকেই ছাড় দেন না। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে, আমাদের সমাজকে রক্ষা করুন।

দা'য়ীর জীবনে বড় বড় বাঁক বা মোড় : ১ম বাঁক- স্ত্রী

31 October 2014

লেখকঃ ফাতহী ইয়াকুন

জীবন যুদ্ধে ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে, রয়েছে বড় বড় বাঁক বা মোড়। আল্লাহর পথে দায়ীদেরকেও এসব বাঁক মাড়িয়ে এগুতে হবে। ইসলামের পথে কর্মরত ভাইয়েরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের জীবনেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ, লাভ-লোকসান হিসাব মিলাতে গিয়ে আসে নানা বাঁক বা বাঁধা।

বাস্তবে অনেক দা'য়ী ব্যক্তিগত লোভ লালসার জন্য জীবন সঙ্গিনী চয়নে এমন একজন সাথী বাছাই করে, যে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহায়ক হয় না। এটা সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি বয়ে আনে। কর্মজীবনে প্রবেশ করে সে বিরাট হোঁচট খায়। তারা শেষ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দূরে সরে যায়। জীবন প্রবাহের গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দেয়।

দা'য়ীর সমাজ যেহেতু জাহেলিয়াতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, এজন্য অনেক সময় দা'য়ী সমাজের প্রচলিত ভাবধারার সাথে তার প্রভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে না। সে কলুষিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে চাই-

১ম বাঁক- স্ত্রী

স্ত্রী দা'য়ীর জীবনে, সমস্ত মানুষের জীবনে এক বিরাট ভূমিকা রাখে। সে যেমন নেয়ামতের উৎস হতে পারে, তেমনি আবার হতে পারে দুর্ভাগ্যের উৎস। দা'য়ীর দাওয়াতের ক্ষেত্রেও এই দুই ধরণেরই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়। অনেক দা'য়ীর বিবাহোত্তর জীবনে আরো সুন্দরভাবে ইসলাম প্রভাব ফেলেছে। তারা ইসলামের সঠিক পথে অগ্রসর হয়েছে। তাদের ইসলামের খেদমত আরো বেগবান হয়েছে। আবার অনেকেরই বিবাহত্তোর জীবনে চরিত্র বিনষ্ট হয়েছে। ইসলামের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা কমেছে। এমনকি অনেকে দাওয়াতের পথ থেকে সরে গেছেন।

নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ফলাফলের পিছনেও কার্যকারণ রয়েছে, যারা দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থ হয়েছেন, তারা বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামী শর্ত শরায়েত এবং বিধি-বিধানের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেন নাই। যার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। তারা পরবর্তীতে আফসোস করেছেন কিন্তু যা হওয়ার তা তো ঘটেই গেছে।

ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে সঠিক ভাবে গড়ে তোলার কতিপয় দিক দির্দেশনা প্রদান করেছে। আমরা সেগুলো এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ

ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বীনি বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং বিবাহকে দ্বীনের পূর্ণতা হিসাবে গণ্য করেছে।

রাসূল (সা) বলেছেন- যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সৎ স্ত্রী দান করলেন তাকে অবশ্যই দ্বীনের অর্ধেক রক্ষা করায় সহায়তা করলেন। সুতরাং সে যেন বাকি অর্ধেককে রক্ষা করার জন্য আল্লাহকে ভয় করে চলে।

বায়হাকীর অপর বর্ণনায় রাসুল (সাঃ) বলেছেন- যখন বান্দা বিবাহ করে তখন তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণতা পায়, সুতরাং সে যেন বাকী অর্ধেক পূরণ করার জন্য আল্লাহকে ভয় করে চলে।

ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থাকে নফসকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এবং একে আল্লাহর আনুগত্যের পথে চরিত্র নিষ্কলুষ রাখার জন্য এক বিশেষ কার্যকারণ হিসেবে গণ্য করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ রয়েছে, তারা যেন বিয়ে করে। আর বিয়ে করার সামর্থ না থাকলে রোযা রাখে। কেননা এটাই তার জন্য ঢাল সরূপ।

বিশিষ্ট দার্শণিক প্লেটো বলেন- মানুষ সর্বদা ভীতি, অতৃপ্তিতে ভুগে থাকে, যেনো তার মাঝে একটি অংশ নেই। যখন তার বিবাহ দেওয়া হয় তখন সে তার হারানো অংশটি ফিরে পায় এবং তার মধ্য পূর্ণতা, তৃপ্তি এবং স্থিরতা ফিরে আসে।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- তিন প্রকার লোককে সাহায্য করা আল্লাহর উপর আবশ্যকীয় হয়ে যায়। আল্লাহর পথে যুদ্ধরত যোদ্ধা, চুক্তিবদ্ধ গোলাম, যে স্বাধীন হতে চায় এবং যে ব্যক্তি চরিত্র নিষ্কলুষ রাখার জন্য বিবাহ করতে চায়।

ইসলামে বিবাহের একটি বিশেষ লক্ষ্য হল- নিরাপদ পারিবারিক বন্ধন গড়ে তোলা, আর এ ক্ষেত্রে প্রথম ভিত্তি হচ্ছে, বিবাহ। এই ভিত্তি যদি সঠিক হয় তাহলে এই ভবনও সঠিক হবে বলে আশা করা যায়। এ বিষয়টি প্রতি লক্ষ্য করে মুমিমদের মনের আকুতি মিনুতিকে কুরআন মাজীদে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যারা বলে হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন- যারা আমাদের চক্ষু জুড়াবে আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা আল-ফুরকানঃ৭৪)

কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি শুধু মাত্র যৌন চাহিদা মিটানোই হয় তাহলে তাদের কাছে যৌনতা ছাড়া দয়া, মায়া, মহব্বত, ভালবাসা ও স্নেহের কিছুই আশা করা যায় না।

ইসলাম সঠিক সাথী নির্বাচনের জন্য বিশেষভাবে তাগাদা দিয়েছে। যদি মহিলার মধ্যে পাওয়া যায়- ভালো মন ও মানসিকতা, তাহলে সেতো সবচেয়ে ভালো মহিলা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বাণী মোতাবেক "মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই মহিলা, যার দিকে তার স্বামী দৃষ্টি দিলে সে আনন্দিত হবে আর যদি তাকে কোন কাজের আদেশ দেয়, তাহলে সে তার আনুগত্য করবে এবং যখন সে তার থেকে অনুপস্থিত থাকবে তখন সে তার ধন-সম্পদ, নিজের নফস এবং টাকা-পয়সার হেফাযত করবে"।

সুতরাং আমার ভাইদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ইসলাম কিভাবে শয়তান থেকে বাঁচার ব্যাপারে আমাদেরকে পথের নির্দেশনা দিয়েছে। টাকার-পয়সার পূর্বে স্বভাব-চরিত্রকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দিতে হবে। তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের অবিবাহিতদেরকে এবং তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। যদি তারা দরিদ্রও হয়, আল্লাহ তাদেরকে তার করুণা দিয়ে সম্পদশালী করে দিবেন"।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এ বাণীকেও সামনে রাখতে হবে, তিনি বলেছেন– কেউ যদি কোন মহিলাকে সম্মান প্রতিপত্তি লাভের জন্য বিয়ে করে, তাহলে আল্লাহ তার অপমান বাড়িয়ে দিবেন আর কোন মহিলাকে যদি টাকা পয়সার লোভে বিয়ে করেও, তাহলে আল্লাহ তাকে অধিকতর দরিদ্র করে দিবেন এবং কেউ যদি আভিজাত্য লাভের জন্য বিয়ে করে কোন মহিলাকে তাহলে সে আরো বেশি লাঞ্ছিত হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজের চক্ষুকে সংযত করতে, লজ্জাস্থান হেফাযত করতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তাহলে আল্লাহ তাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত দান করবেন।

সূত্রঃ ওয়ামী (ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অব মুসলিম ইয়ুথ) প্রকাশিত "দা'য়ীর আত্মপর্যালোচনা" গ্রন্থ

বিয়ে কোন বয়সে করা ভালো?

21 October 2014

লেখকঃ আহমেদ রফিক

একটা কথা শুনেছিলাম সেদিন। পশ্চিমা এক দেশে একবার একটি কুকুর একটি বাচ্চাকে আক্রমন করে। চারিদিকে লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছিলো। কেউ এগিয়ে আসছিলো না তাকে সাহায্য করতে। একজন মানুষ সাহস করে এগিয়ে গিয়ে কুকুরটিকে মেরে বাচ্চাটিকে বাচায়। চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে তার এই সাহসি ভুমিকার। লোকজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাংবাদিকরা এলো তার সাক্ষাতকার নিতে। জিজ্ঞাসা করলো আপনার নাম কী? সে বললো, মুহাম্মাদ। বিস্তারিত সাক্ষাতকার সবাই নিয়ে গেলো ঠিকই। কিন্তু পরের দিন পত্রিকায় এলো

‘মুসলমান সন্ত্রাসীর হাতে নিরীহ কুকুর নিহত’

ইসলাম ও ইসলাম্পন্থীদের বিরুদ্ধাচারিতার ক্ষেত্রে বিধর্মী ও সেক্যুলাররা কখনো কোনো নীতি-নৈতিকতা ও সততার তোয়াক্কা করে না। সব সময়ই ডার্টি গেইম প্লে করে। এমনকি আল্লাহর নবী নূহ আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সা.— কাউকেই এরা ছাড় দেয়নি। কারণ, এদের নৈতিকতার কোনো বালাই নেই। সেটা হোক বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা। সকল ক্ষেত্রেই।

সমাজের যা কিছু খারাপ কিংবা যা কিছুকে তারা ‘খারাপ সাজাতে’ চায় সব কিছুকে তারা ইসলামের সাথে ট্যাগ করে দেয়। এতে তাদের ফায়দা হলো, অসচেতন মানুষের মধ্যে একটা অবচেতন ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব তৈরি হয়।

কিছু দিন আগে একটা নিউজ পড়েছিলাম। এক ছেলেকে তার এক বন্ধু তার বাবার রেখে যাওয়া ১৪ লাখ টাকা ফু দিয়ে দিগুন করার লোভ দেখায়। সে জানায়, তার পরিচিত এক পীর/ফকীর আছে, সে নাকি ফু দিলেই টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায়। টাকা দ্বিগুণ করতে বন্ধুকে নিয়ে রওয়ানা হয় ফকীরের বাড়ি। সে আর ফিরে আসেনি টাকা নিয়ে। ফিরেছে তার লাশ। এই সংবাদের কমেন্টে দেখলাম একজন লিখেছে, ‘ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষকে কতো অন্ধ বানিয়ে দিতে পারে!’।

ডার্টি গেইমের এটাই হলো তাদের লাভ। ঘটনাটি ঘটার পেছনে যেখানে একমাত্র কারণই হলো ধর্মীয় মুল্যবোধের অনুপস্থিতি; সেখানে গোটা দায়ভারটাই চাপানো হলো ধর্মের ঘাড়ে।

এমন আরো কতো নিউজ দেখবেন। ‘প্রেমের কারণে যুবতীকে ৮০ দোররা’, ইত্যাদি। খবর নিয়ে হয়তো দেখা যাবে ঘটনা শুধু প্রেমেই নয়, প্রেম হয়তো শরীরেও গড়িয়েছিলো। এরপর গ্রামের মাতব্বররা হয়তো এই কাজ করেছে। পিটুনি দেওয়াটাকে বলা হবে দোররা। আর কয়টি পিটুনি হয়েছিলো সেটা কে-ইবা জানে। বলা হবে ৮০ দোররা। কারণ শরিয়াহ আইনে ৮০ দোররার একটা ব্যাপার আছে। ঘৃণা জন্মানো হবে ৮০ দোররার প্রতি। সহানুভূতি জন্মানো হবে অবৈধ প্রেমের প্রতি। চেপে যাওয়া হবে তাদের শরীর তত্ত্বের আসল ঘটনা। যদিও এখানে মাতব্বররা যা করেছে, যেভাবে করেছে, তার সাথে হয়তো ইসলামী আইনের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

খবরে দেখা যাবে, ‘বিধবাকে জোর করে হিল্লা বিয়ে দেওয়া হয়েছে’। খবরটা এমনভাবে পরিবেশন করা হবে, যেন হিল্লা বিবাহ ইসলামী বিধানের একটি অংশ। অথচ ইসলামের ব্যাপারে ন্যুনতম জ্ঞান রাখলেও জানার কথা যে, এর সাথে ইসলামের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই।

এমনই তথ্য সন্ত্রাসের শিকার একটি বিষয় হলো রাষ্ট্রের নির্ধারিত বয়স হওয়ার আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। যাকে নাম দেওয়া হয়েছে 'বাল্য বিবাহ'। শব্দটা দিয়েই একটা অপরাধের আবহ তৈরি করা হয়েছে। এরপর নানা রকম শ্লোগান তৈরি করা হয়েছে। কুড়িতে বুড়ি নয়, বিশের আগে বিয়ে নয়। আরো কতো কী। এর তথাকথিত ক্ষতিকারক দিক নিয়ে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে কী কী শারীরিক জটিলতা তৈরি করে তার ফর্দ বানানো হয়েছে। অথচ দেরিতে বিয়ের কারণে যে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে মানুষ তা নিয়ে কিন্তু এরা কখনো কিছু বলবে না। কারণ এটা বললে তাদের নোংরা এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করা যাবে না।

অল্প বয়সে বিয়েকে মাতৃ-মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অথচ একটি মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে যে বায়োলজিক্যালী সে গর্ভধারণের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত—এটা সায়েন্টিফিকভাবে প্রমাণিত। মাতৃ-মৃত্যু যদি হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই অন্য কোনো কারণে। হতে পারে সেটা অযত্ন অবহেলা, পুষ্টিহীনতা যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়া ইত্যাদি। এসবের কারণে তো খোদ বিয়েকে দায়ি করার কোনো যৌক্তিকতা নেই! এ ধরণের বায়াস কাজ অনেকেই করে। যেমন তামাকমুক্ত সমাজ গড়া নিয়ে যারা কাজ করে তারা সিগারেটের কারণে মৃত্যুর হারকে এমনভাবে দেখায়, যা সত্যিই আশংকাজনক। অথচ রিসার্চ করলে হয়তো দেখা যাবে, তাদের দেখানো মৃত মানুষগুলো সিগারেট হয়তো খেতো ঠিকই, কিন্তু সিগারেটের কারণেই যে তারা মারা গেছে তা কিছুতেই প্রমাণিত নয়।

এরা অল্প বয়সে বিয়েকে একটা জঘণ্য নোংরা কাজ হিসেবে উপস্থাপন করে। এরপর এর দায়ভার ইসলামের উপর চাপায়। এটাকে প্রমান করার জন্য আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর সাথে আয়েশা (রা.) এর বিয়ের ব্যাপারটিকে উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিয়ে, এই বিংশ শতাব্দিতে আবিস্কৃত কোনো রীতি নয়। পৃথিবীর প্রথম মানবজুটি থেকে নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে এ রীতি চালু আছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। আর সৃষ্টিগত ও চাওয়া-পাওয়ার দিক থেকে মৌলিকভাবে মানুষের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পৃথিবীর প্রথম মানুষের শারীরিক গঠন যেমন ছিলো, এখনো মানুষের গঠন তেমনই আছে। মৌলিকভাবে চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনার কারণ ও কার্যকারণও একই রকম আছে। কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অতএব বিয়ে এমন কোনো বিষয় নয়, যাকে আমাদের নতুনভাবে মুল্যায়নের কিছু আছে। আদম (আ.) এর সন্তান-সন্ততিরা হাওয়া (আ.) এর গর্ভে যেভাবে এসেছিলো আপনি আমিও সেভাবেই এসেছি। আমাদের সন্তানরাও সেভাবেই আসে।

ঐতিহাসিকভাবেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বয়সের ব্যাপারটি স্থানীয় রীতি-নীতি ও সামাজিক কালচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। উইকিপিডিয়ার দেওয়া তথ্যমতে প্রাচীন রোমান সমাজেও বিয়ের কোনো নির্ধারিত বয়স ছিলো না। সাধারণতঃ বয়প্রাপ্ত হওয়া বা পিরিয়ড শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো এবং তারা সে বয়সেই বাচ্চা জন্ম দিতো।

বর্তমান আধুনিক ইউরোপের সবগুলো দেশেই বিয়ের উপযুক্ততার ক্ষেত্রে ছেলেদের বয়স হলো আঠারো; স্কটল্যাণ্ডে তো মাত্র ষোল। অন্য দিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ দেশেই ষোল; কোনো দেশে পনের ও সতেরও রয়েছে। কেউ চাইলে

কোর্ট আরও কম বয়সেও অনুমতি দিয়ে থাকে। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে একমাত্র মালায়শিয়া ও বাংলাদেশেই ছেলেদের ২১ ও মেয়েদের ১৮ বছর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মালায়শিয়াতে মুসলিমরা শরিয়া কোর্টের অনুমতি নিয়ে এর নিচের যে কোনো বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আমার জানামতে একমাত্র বাংলাদেশেই বয়সের এই আইন ভঙ্গ করাকে ক্রিমিনাল অ্যাক্ট বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়।

সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে ইয়েমেন। দীর্ঘ দিন সেক্যুলাররা শাসন ক্ষমতায় থাকলেও এক্ষেত্রে তারা সাধারণ জনগনের উপর কোনো বিধান চাপিয়ে দেওয়ার সাহস পায়নি। সে দেশে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধেমতো সময়ে বিয়ে করার। আসলেই ইয়েমেনীরা ভাগ্যবান। আল্লাহর রসূলের কথা শাশ্বত সত্য। তারা সভ্য, তাদের হৃদয় নরম; দ্বীন ইয়েমেনে, প্রজ্ঞাও ইয়েমেনীদের মধ্যে। আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের জন্য এই ইয়েমেন থেকেই ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীর আবির্ভাব ঘটবে।

যোগাযোগব্যবস্থা, তথ্য প্রযুক্তিসহ নানা বৈষয়িক এককে আমরা কিছুটা উন্নতি সাধন করেছি সত্য; কিন্তু সমাজের, বিশেষ করে যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এটা কেউই অস্বীকার করে না। একমাত্র হলুদ আলোর সমর্থকেরা ছাড়া। সবাই-ই স্বীকার করেন যে, নৈতিক দিক থেকে আমাদের বাপ-দাদাদের যুগ আমাদের এই যুগের চেয়ে অনেক ভালো ছিলো। অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব এতো মারাত্মক তখন ছিলো না। সেই সমাজের বিয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের পল্লি কবি। তিনি লিখেছেন,

ঐখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে

তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।

এতোটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ

পুতুলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল বলে কেদে ভাসাইতো বুক

এখানে পুতুল খেলার বয়সে বিয়ের মধ্যে আমাদের দুমুখো প্রগতিশীলেরা নান্দনিকতা খুজে পেলেও, আয়েশা (রা.) এর পুতুল খেলার বয়সে বিয়ের মধ্যে তারা ঠিকই ধর্মান্ধতা ও ভয়ংকর অমানবিকতার গন্ধ খুজে পান! এসব প্রগতিশীলদের ব্যাপারে মন্তব্য করতেও রুচিতে বাধে। বিচারের দায়িত্ব পাঠকদের উপরই ছাড়লাম।

অনেকেই বিয়ের এই বয়স নির্ধারণকে আমাদের দেশের জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে যৌক্তিক ঠাহর করতে পারেন। তাদের জন্য ইনশা আল্লাহ শিঘ্রই আমি জনসংখ্যার উপরে একটি আর্টিকেল লিখবো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সার্বিক বিবেচনায় ভালো না মন্দ—সে বিষয়টি সেখানে বিস্তারিত তুলে ধরবো ইনশা আল্লাহ।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে তার বিপরিত লিঙ্গের প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। একের জন্য অন্যের সান্নিধ্যের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন। আর এই সান্নিধ্য প্রাপ্তির আইনগত, ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মের নাম হলো বিয়ে। ইসলামে বিয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নারীরও নয়, পুরুষেরও নয়। পুরুষের বয়স বেশী হবে না নারীর—তা নিয়েও কিছু বলেনি। এটা মানুষের স্থান-কাল-পাত্র, পরিবেশ-প্রতিবেশ, মন-মনন, ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও রুচিবোধের উপর ছেড়ে দিয়েছে। ইসলাম যেহেতু গোটা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহর দেওয়া ধর্ম। তাই মানুষের মানুষের স্বভাবজাতপ্রবণতা বা ফিতরাতের দাবীকে কখনো উপেক্ষা করেনি। কোনো রকম ভান-ভনিতা, লৌকিকতা ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি।

মানুষের স্বভাবজাত কোনো প্রবণতাকে যদি কোনোভাবে দমিয়ে রাখার অপচেষ্টা করা হয়, তখন ব্যাক-ফায়ার অনিবার্য। পানির স্বাভাবিক স্রোত যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে সে নিশ্চয়ই বিকল্প পথ বের করে নিবে। আপনারা যারা গ্রামেগঞ্জে গিয়েছেন তারা হয়তো একটি ব্যাপার দেখে থাকবেন। বদ্ধ পুকুর বা জলাশয়ে পানি আসা-যাওয়ার যদি নালা না থাকে তাহলে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হয় পানির নিকটতম স্রোতধারার সাথে। যেটাকে আমাদের অঞ্চলে বলা হয় 'হাইত্তা'।

২১ ও ১৮ বছর পর্যন্ত বিয়ে নিষিদ্ধ করে যে স্বাভাবিক স্রোতকে বন্ধ করা হয়েছে, তার বিকল্প 'হাইত্তা' আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। ডাস্টবিন থেকে নবজাতক উদ্ধার। অমুক অমুক এলাকায় রমরমা দেহ ব্যবসা। এক দড়িতে ঝুলে প্রেমিক যুগলের আত্মহত্যা। পত্রিকার পাতায় স্থান না পেলেও আপনি, হ্যা, আপনিও এমন অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী। নিজ পরিবার, আত্মিয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী আপনি নিজেই। আমাকে এর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না।

যে সমাজে নাটক-ছিনেমা, গল্প-উপন্যাসে, রেডিও-টিভি-বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনে সারাক্ষণ মানুষকে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়। যে সমাজে পর্ণছবি বাজারের আলু-পটলের মতো বিক্রি হয়; যে সমাজে অনলাইনে নোংরামী মাত্র একটি ক্লিকের মধ্যে সহজলভ্য করে দেওয়া হয়। অন্য দিকে সহজাত চাহিদা পুরণের বৈধ পথ বন্দ করে দেওয়া হয়, সেখানে পরিস্থিতি কেমন রুপ ধারণ করতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা এখনও টের পাননি, একটু অপেক্ষা করুন। আমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। আপনিই টের পাবেন হাড়ে হাড়ে। আপনার কলিজার টুকরা কন্যা, প্রাণপ্রিয় ছেলেই আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল করিয়ে দেবে।

সত্যিই ভাবনার বিষয়! যেখানে ১৮ বছর বয়সে একজন মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মতো জনগুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য ভোট দেওয়ার উপযুক্ত হয়; সেখানে তাকে বিয়ের মতো একটা একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয় 'তুমি অনুপযুক্ত'। বিচিত্র! সত্যিই বিচিত্র!!

বিয়ে-শাদী দেরিতে হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বাস্তববাদিতা, দায়িত্বশীলতা ও পরিপক্কতারও মারাত্মক অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ছ্যাবলামোর প্রভাব সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হয়। এমন দৃশ্য আপনাদের চারপাশে অহরহ দেখে থাকবেন যে, ২৫-২৬ বছরের এক শক্ত সামর্থ্য যুবক বাপের হোটেলে খায় আর আড্ডাবাজি করে বেড়ায়।

সমাজে কোনো অবদান তো রাখেই না, কারো দায়িত্ব তো নেয়ার মুরোদই নাই; বরং সে নিজেই সমাজের জন্য একটা বোঝা, একটা অভিশাপ।

রেস্পন্সিবিলিটি ছেলেদেরকে 'পুরুষ' বানায়। শুধু প্যান্ট পরা অর্থে পুরুষ নয়, বাস্তব অর্থে। তার চিন্তা-চেতনায় ও আচার আচরণেও তা ফুটে ওঠে । কথায়ও বলে, A man is not MAN until he takes the responsibilities of others. পুরুষ ততোক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ হয় না, যতোক্ষন সে অন্যের দায়িত্ব ঘাড়ে না নেয়। আর এটা যতো তাড়াতাড়ি হবে, সমাজ জীবনেও ততো তাড়াতাড়ি দায়িত্বশীলতার প্রভাব পড়বে।

ইসলাম বিয়ের কোনো বয়স নির্ধারণ না করলেও নীতিগতভাবে প্রাপ্ত-বয়স্ক ছেলে-মেয়েদেরকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র ও দায়িত্বশীল জীবন যাপনে উৎসাহ দেয়। অতএব আমরাও আমাদের স্রষ্টার নির্দেশনা মানতে চাই। আমাদের অধিকার ফেরৎ চাই। আমরা চাই, আমাদের ছোট ভাই-বোনেরা, ছেলে-মেয়েরা ছাড়া গরু ছাগলের মতো এ ক্ষেতে সে ক্ষেতে মুখ দিয়ে না বেড়াক; তারা দায়িত্বশীল হোক, তাদের মানসিক স্থিতিশীলতা আসুক; তারা পৃথিবীতে অধিক প্রোডাকটিভ ও মেচিউরড ভুমিকা পালন করুক।

আল্লাহ আমাদেরকে সত্য উপলব্ধির তাওফিক দান করুন। আমীন! আমীন!! আমীন!!!

পড়াশোনা শেষ করে তবেই বিয়ে? একটি অপসংস্কৃতির অপনোদন

31 October 2014

সংকলনে - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

এক.

"বয়সে যারা নবীন তাদেরকে তাদেরই মতন নবীনদের বিয়ে করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সন্তানদেরকে বলা হয় তাদের পড়াশোনা আগে শেষ করতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, অন্যান্য ডিগ্রি ইত্যাদি শেষ করে তারপর বিয়ে করতে। এই কারণে অনেক সন্তানকে তাদের জীবনের সবচাইতে কঠিন সময়টা অবিবাহিত অবস্থায় পার করতে হয়। যখন তারা ত্রিশের কাছাকাছি পৌঁছে, তখন তারা বিয়ে করে। তাহলে ১৩ থেকে ৩০ বছরের এই প্রায় বিশটি বছর কী ঘটে? কী হয় তাদের জীবনে? আর এই ভুলের জন্য দায়ী কে? প্রাথমিকভাবে, এটা বাবা-মায়ের দোষ। যখন সন্তানরা বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে যায় এবং শারীরিকভাবে সাবালক হয় তখন তাদের সকল কাজের দায়ভার অবশ্যই তারাই বহন করে, কিন্তু বাবা-মায়েরাও তাদের এই বিশাল পাপের ভাগীদার হয় তাদেরকে এই অবস্থাটি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য না করার জন্য।"

--- ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস

দুই.

"বর্তমান সময়ে ২০-২২ বছরের কোন যুবক যদি বিবাহ করতে চাই তাহলে সমাজ বলবে ছেলেটার লাজ-লজ্জা সব গেল । কিন্তু ২০-২২ বছরের কোন যুবক কে পার্কে/রিক্সায় কোন মেয়ের সাথে অপ্রকৃত অবস্থায় দেখা গেলে তখন সমাজের লাজ/লজ্জা যায় না । কারন সমাজের চোখে সেটা আধুনিকতা । যে আধুনিকতা একজন যুবকের বেহায়্যাপনা থেকে বাঁচার আকুতি শুনতে চাইনা কিন্তু একজন যুবক কে একজন যুবতীর সাথে লুতুপুতু করার অনুমতি দেয় সে আধুনিকতাকে আমি ফ্রি কিক মারি ।

একজন ২২ বছরের যুবক তার মোটামুটি আয়ের উপর ভরসা করে যখন বাসায় বিবাহ করার ইঙ্গিত দিবে তখন বাসায় ছেলেটা কে নির্লজ্জ ভাববে। কিন্তু রাত ১ টার পরও যখন ঐ ছেলের রুম থেকে ফোনে কথালাপের শব্দ শোনা যাবে তখন অভিভাবকরা ভাববে ছেলে বড় হয়েছে , ছেলে কে স্বাধীনতা দেয়া দরকার । ছেলে বিয়ে করার জন্য বড় হয়নি কিন্তু ঠিকই ফালতু-হারাম কাজের জন্য বড় হয়েছে । একসময় দেখা যায়, ঐ ফালতু কাজের জন্য বড় হওয়া ছেলেটি মা-বাবার মুখে চুন-কালি মেখে পালিয়ে বিয়ে করে । আর বিয়ে করতে চাওয়া আল্লাহ ভীরু সেই ছেলেটি ঠিকই মা-বাবার হৃদয় নরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে । এই হচ্ছে আমাদের কুলুষিত সমাজ ব্যবস্থা !"

- আব্দুল্লাহ (গুরাবা)

তিন.

বিয়ের কথা আসলেই আপনি টাকার কথা বলেন, কিন্তু আমি জানি, খুব ভালোভাবেই জানি যে শুধু টাকার জন্য আমাদের কারো বিয়েই আটকে থাকে না.. এটা আসলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার..

আমরা বিয়েকে তেমন জরুরি ভাবি না.. আমাদের কাছে মনে হয় "থাক, একটা প্রেম তো আছেই, গার্লফ্রেন্ড তো আছেই, কয়টা মেয়ে বান্ধবী তো আছেই.. আপাতত ওতেই কাজ চলবে"

বাবা-মাও বিয়ে বিষয়টা কে গুরুত্বের সাথে নেন না..

কেন ভাই বিয়ে করতে কত টাকা লাগে? বিয়ে করতে যত না টাকা লাগে, তারচে বেশি টাকা খরচ করি আমরা অনুষ্ঠানে, শাড়ি-গয়না কিনতে, ডিজে পার্টি ভাড়া করতে! বিয়ে করতে হলে যে এইসব করা লাগে কোথায় বলা আছে? লোকদেখানো কাজকর্ম করতে যেয়ে শেষে বিয়েটাই পিছিয়ে যায়!

এই যে বিয়ের কথা আসলেই আমরা টাকার দোহাই দেই, অথচ, আমাদের জীবনে সবকিছুই স্বাভাবিক গতিতে চলছে.. আমরা মোবাইল চালাইতে পারি, ল্যাপটপ কিনতে পারি!

আরো টাকা পেলে হয়ত একটা গাড়ি কিনব, তবু বিয়ের কথা ভাবব না! আল্লাহ তা'আলা কি বলসেন, সেটাও আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখি না.. আমরা কেমন মুসলিম হলাম?

আল্লাহ বলেন, বিয়ে করলে আমাদের রিজিক বৃদ্ধি করে দিবেন [সুরাহ নুর: ৩২]

আমরা তো কুর'আনের সেই আয়াতে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি না.. যদি করি, তাহলে সেটা খুব ভয়ঙ্কর! খুবই ভয়ঙ্কর.. আমরা মুসলিম.. অল্প কয়দিনের জন্য আমরা এই দুনিয়া তে আসি, এরপর বিদায় নেই.. জীবনে যেন সুন্দর ভাবে চলতে পারি এইজন্যই আল্লাহ আমাদের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি দিসেন, ইসলাম দিসেন.. আমাদের উচিত এই সমাজকে অনুসরণ না করে, এর ভ্রান্ত-দুষিত নিয়মগুলো মেনে নিজেদের উপর অত্যাচার না করা ।

আলী রা এর যখন বিয়ে হয়, তখন উনার মোহরানা দেয়ার টাকা টা পর্যন্ত ছিল না.. অথচ তার বিয়ে হলো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কন্যার সাথে! আর তার স্ত্রী হবে জান্নাতে নারীদের নেত্রী!

বিয়ে করতে অনেক টাকা লাগে না.. যেটা লাগে সেটা হচ্ছে তাওয়াক্কুল, আল্লাহর উপর ভরসা।

চার.

Late marriage-দেরীতে বিবাহ"-ইসলামের বিরুদ্ধে শতাব্দীর এক জঘন্য ষড়যন্ত্র!!

কুফফাররা অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলো যে, শুধু অস্ত্র দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে পরাজিত করা সম্ভব নয় কেননা মুসলিমরা তো আল্লাহর পথে শহীদ হওয়াকেই তাঁদের চূড়ান্ত সফলতা মনে করে। তাছাড়া যাদের একমাত্র লক্ষই হচ্ছে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া আপনি তাঁদেরকে কিভাবে থামাবেন??

তাই কুফফাররা চিন্তা করলো মুসলিম যুবকদের নৈতিকভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে কেননা নৈতিকতাই হচ্ছে মুসলিম যুবকদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এ অস্ত্রের জোরেই তারা আল্লাহর পথে কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

তাই তারা প্রথমে মুসলিম দেশগুলোতে বিবাহের উপর একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা বেধে দিলো যে, এর আগে বিয়ে করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ যদিও একটি ছেলে এবং মেয়ে এই নির্দিষ্ট সময় সীমার অনেক আগেই বিবাহের উপযুক্ত হয়। সেই সাথে তারা এমন শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু করলো যে, এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা ছেলে চাইলেও ২৮-৩০ বছরের আগে উপার্জনক্ষম হতে পারবেনা। যদিও একটা ছেলে ১৫ বছর বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়। তাহলে একটি ছেলে যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পরের ১৫ টি বছর কিভাবে পাড়ি দিবে??

এই জন্যে কুফফাররা ব্যাপকহারে পর্ণ ছবি ছড়িলে দিলো, বিবাহপূর্ব প্রেম ভালবাসাকে ছড়িয়ে দিলো। যুবকদের যুবতীদেরকে একটা মেসেজ দিলো যে, "এই নাও পর্ণ ছবি। এগুলো দেখো। এগুলো দেখে উত্তেজিত হও। উত্তেজিত তো হয়েছো কিন্তু এখন কি করবে?? বিয়ে তো করতে পারবেনা। তাহলে প্রেম করো, প্রেম করে প্রেমিকার সাথে সেক্স করো, যৌবনের চাহিদা মেটাও।

আর যে যুবক প্রেম করবে, পর্ণ দেখবে, প্রেমিকার সাথে অবৈধ সেক্স করবে সেই যুবক কি কখনো আল্লাহর রাস্তায় কুফফারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা চিন্তা করবে??

কস্মিশকালেও না। এভাবেই কুফফাররা মুসলিম যুবকদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, আমাদের যুবকদের জীবনী শক্তিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আসুন কুফফারদের এই গভীর চক্রান্তকে ধ্বংস করে দেই, সমাজে Early marriage এর বিপ্লব ঘটাই

পাঁচ.

মুফতি ইসমাইল মেঙ্ক বলেনঃ

“সন্তানদের জন্য বিয়েকে সহজ করে দেয়া আমাদের জন্য ইবাদাত স্বরূপ। আর তাদের জন্য বিয়েকে কঠিন করে ফেলা একটি পাপ, যা অন্যান্য আরো অনেক পাপের জন্ম দেয়।”

"ছেলেদের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়সটা আসলে কত হওয়া উচিত?" Sayeed Rageah কে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। উনি উত্তর দিয়েছিলেন-

"বিয়ের সাথে বয়সের সম্পর্ক নেই। বিয়ের সাথে সম্পর্ক আছে দায়িত্ববোধের। আমি এমন সব ভাইকেচিনি যাদের কাছে আমার মেয়ে দেয়া তো দূরের কথা, একজোড়া জুতার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েও আমি ভরসা পাইনা। আবার ১৫-১৬ বছরের এমন ভাইও আছে যাদেরকে পুরো মসজিদের দায়িত্বও যদিদিয়ে যাই তা সে সুষ্ঠু ভাবে পালন করতে পারবে।"

কত টাকা জমালে ছেলে বিয়ের যোগ্য হবে?

2 November 2014

লেখকঃ ব্লগার মোহায়মেন

বিয়ের বয়স নিয়ে কয়েকদিন আগে আলোচনা জমে উঠেছিল ব্লগে। ব্লগারদের যারা এই বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন, তাদের অধিকাংশের মতামত হচ্ছে, ছেলেদের বিয়ের বয়স ২৫ আর মেয়েদের ২২ - এর কাছাকাছি। তবে অনেকেই মনে করেন, স্ত্রীকে ভরণপোষণ করার আর্থিক যোগ্যতা না হলে বিয়ে করা একদমই ঠিক হবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভরণপোষণের আর্থিক যোগ্যতা টাকার অংকে কত? কত টাকা মাসিক আয় হলে বা জমা হলে একজন তরুন বিয়ের চিন্তা করতে পারে?

বেশ কয়েক বছর আগে টিভিতে একটা বিজ্ঞাপন দেখাতো। এক তরুন গাড়ীতে (প্রাইভেট কারে) চলন্ত অবস্থায় মাকে ফোন করে বলছে, "ব্রীজের কনট্রাক্টটা পেয়ে গেছি। .... তে একটা প্লট বুকিং দিয়ে দিলাম।"

মা বললেন, "গাড়ী হলো, বাড়ী হলো, এবার বিয়েটা করে ফেল বাবা।"

গাড়ী, বাড়ী হওয়ার পর একজন সুন্দরী নারীকে ঘরে আনার চিন্তা করাটা হয়তো অনেকেই নিরাপদ মনে করবেন। তবে, ব্রীজের কনট্রাক্ট পাওয়ার ভাগ্য যেমন সকলের হয় না, তেমনি গাড়ী, বাড়ী (বিশেষ করে এই ঢাকা শহরে) করার পর বিয়ে করতে হলে ছেলেটাকে হয়তো পুরো যৌবনটাই আইবুড়ো থাকতে হবে।

তাহলে আর্থিক সামর্থ্য কতটুকু হলে বিয়ে করা যাবে?

এ বিষয়ে নিজের জীবনের কাহিনী বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

২৫ বছর চলে যাচ্ছে দেখে আব্বা যখন জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলেন, তখন আমার চাকুরী নেই, একেবারে কপর্দকশূন্য যাকে বলে। বিয়ের সব খরচ বাবার - কনের গহনাগাটি, পোশাক থেকে শুরু করে বৌভাতের খরচ পর্যন্ত। মোদ্দাকথা, আমার একটা ফুটো পয়সাও খরচ করার সামর্থ্য ছিল না।

আমার দেওলিয়াত্বের বিষয়টি আব্বার কাছে মৃদুস্বরে তুলতে তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তো আছেই। বৌমার থাকার জন্য তোমার ঘরটি শেয়ার করবে আর একজন নতুন মানুষের খাবারের ব্যবস্থা আমি করতে পারবো।

চাকুরী না থাকাতে তেমন অসুবিধা হয়নি। সমূদ্রে বা পাহাড়ে হানিমুনে না গেলেও শুক্লপক্ষের প্রতিটা রাত দুজনে মিলে জ্যোস্নায় ভিজেছি। চাঁদের আলোয় ছাদে বসে বসে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করেছি, এমনকি বাড়ীর পিছনের নদীর ধারে বসে শান্ত নদীর পানির ঝিকিমিকি দেখেছি, নদীতে নামার জন্য বাসার সাথে সান বাধানো ঘাট করা আছে, পানিতে পা ডুবিয়ে তাতে বসে থেকেছি। দুইজন মিলে ক্ষেত-খামারে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। নদীর ধার দিয়ে হেটে হেটে চলে গিয়েছি অনেকদূর। বাড়ীর আশে-পাশে শাক-সবজি, ফুলের গাছ লাগিয়েছি। আমি কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করেছি আর সে তাতে বীজ পুতে দিয়েছে। সেই বীজ থেকে যখন প্রথম পাতাগুলো মাটির আড়াল থেকে মাথা বের করে হেসেছে, তখন মনে হয়েছে দুনিয়াতে এর চেয়ে বেশী আনন্দের দৃশ্য আর হতে পারে না। কপর্দকশূণ্য সেই দিনগুলোই জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন হয়ে রয়েছে।

এর মধ্যে ঘটলো আরেক ঘটনা। বিয়ের তিনমাসের মধ্যে আমাদের সংসারে একেবারো আনকোরা নতুন অতিথি আসার সম্ভাবনার কথা জানা গেলো। বউ বললো, অনেক তো হলো বৃক্ষলতা দেখা, চাষাবাদ করা আরে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকা, এবার বোধ হয় আয়-রোজগারের দিকে তোমার নযর দেয়া দরকার। সে তখনও ছিল ছাত্রী, তাই হয়তো নিজেই রোজগারের চিন্তা করেনি।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, চাকুরী খুজতে ঢাকায় এলাম আর চাকুরী পেয়ে গেলাম। বেতন তেমন বেশী নয়। দুই বেডরুমের একটা ছোট বাসা ভাড়া করে যখন আমার নিজের শুরু করলাম, তখন বাসায় ফার্নিচার বলতে ছিল মাত্র একটি জাহাজের খাট আর একটা স্টিলের আলমারি। টিভি নেই, ফ্রিজ নেই, সোফা নেই, এমনকি খাবার জন্য একটা ডাইনিং টেবিলও নেই। সেই শূন্য বাড়ীতে ফিরে যখন দেখতাম আমার কয়েক মাসের মেয়ে আমাকে দেখে হাসছে বা আমার কাছে আসার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আনন্দ ধরে রাখা কষ্ট হয়ে পড়তো। সবচেয়ে বড় কথা, যা ছিল, তা নিয়েই আমরা এতো সুখী ছিলাম যে, কী নেই তা ভাবার অবকাশ পেতাম না। এখনও আমরা কখনো কোন কিছুর অভাব অনুভব করি না।

পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একটি হাদীসের কথা মনে পড়ছে। একবার রাসুল (সঃ) এর কাছে এক নারী এলেন যিনি বিয়ে করতে চান। রাসুল (সঃ) এর সাথে বেশ কয়েকজন সাহাবা ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কী ই নারীকে বিয়ে করতে আগ্রহী?

একজন সাহাবা বললেন যে তিনি বিয়ে করতে চান, কিন্তু তার আর্থিক সামর্থ নেই। রাসুল (সঃ) জানতে চাইলেন, তোমার কী কোন কিছুই নেই? তিনি বললেন, তাঁর একটি লোহার আংটি আছে। তিনি তাঁকে লোহার আংটি বিক্রি করে তাই দিয়ে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে বললেন।

ইসলাম ধর্মে বিয়ের জন্য পুরুষের নূন্যতম আর্থিক সামর্থের বিষয় এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

কিন্তু পরিচিতজনদের মধ্যে দেখেছি, বিয়ের জন্য আমরা যে ধরণের প্রস্তুতি নিই, সে ধরণের প্রস্তুতি আগের যুগের রাজারা যুদ্ধে যাবার জন্যও নিতেন না। বিয়ের অনুষ্ঠানই হবে কয়েক সপ্তাহ ধরে। তাতে কয়েক হাজার লাইট জ্বলতে হবে, বর-কনের গায়ে হলুদ হবে একমাস ধরে (বিয়ের সময় যাতে শ্যামলা রঙ কোনভাবেই প্রকাশ হয়ে না পড়ে), তার জন্য আছে বিশেষ আয়োজন, বিশেষ ধরণের উপহার-সামগ্রী, বিশেষ আচার-বিচারও আছে। আছে কার্ড ছাপানোর ব্যবস্থা। তার পর হবে বিয়ের অনুষ্ঠান। তার জন্য বিশেষ পোশাক, বিশেষ উপহার, বিশেষ কার্ড। এ উপলক্ষে বিশেষ ভাবে সাজাতে হবে বাড়ী, প্রয়োজন হবে রাজকীয় গাড়ী। তারপর বউভাত। সেখানেও কার্ড, উপহার, সাজ-সজ্জা, হাজার বাতি। তারপরেও শেষ হয় না। বর শ্বশুরবাড়ীতে গেলে পচিশ কেজি ওজনের রুইমাছ নিয়ে যেতে হবে, উপহার সামগ্রীর স্তুপ নিতে হবে, ইত্যাদি কত কিছু। তারপর হানিমুন। আজকাল দেশের মধ্যে হানিমুন করার কথা উঠলে মান-সম্মান একবারেই চলে যায়।

আমাদের বিয়ের দিকে তাকালে মনে হয় ভোগবাদীতার কত গভীরে আমরা ডুবে গেছি - এ যেন তারই পরিমাপক। এখনকার যুগে রাজা-বাদশা নেই, গলায় গজমতির হার আর ময়ুর সিংহাসন দিয়ে নিজেদের শান-শওকত দেখানোর সুযোগ নেই। সে অভাবটা আমরা মেটানোর চেষ্টা করছি বিয়ের অনুষ্ঠান দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে গায়ে হলুদ, বিয়ে কিংবা বউভাতের কার্ড ছাপাতে যে খরচ করা হয়, তা দিয়ে হয়তো একটা গ্রামকে স্বাবলম্বী করে দেয়া যায়।

একজন ব্লগার একটি মন্তব্যে লিখেছিলেন, বউকে এফোর্ড করার ক্ষমতা না হলে বিয়ে করা উচিৎ নয়। এই এফোর্ড করার বিষয়টি খুব মারাত্মক, কেননা এর কোন সীমা নেই, শেষ নেই, বিশেষ করে যদি অর্থ-বিত্তের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। বছর শেষে আপনার পরিচিত কেউ বিদেশে বেড়াতে যায়। আপনার কাছে যদি এফোর্ড করার মানে তার সাথে টেক্কা দিয়ে বিদেশে বেড়ানো হয়, তাহলে এফোর্ড করাটা বড় কঠিন হয়ে পড়বে। কেননা, পরিচিতজনের মধ্যে অনেকেরই অনেক টাকা থাকবে, দামী গাড়ী থাকবে, অভিজাত এলাকায় আলিশান ফ্লাট থাকবে।

আমার মনে হয়, ভোগবাদিতা বর্জনের প্রধান ধাপ হচ্ছে বিয়ের ক্ষেত্রে মানবিক হওয়া। একটি ছেলে যখন কনে খোজার সময় ফর্সা রঙ দেখে, শ্বশুরের অর্থ-বিত্ত দেখে, তখন বিষয়টি যেমন নিন্দনীয়, তেমনি একটি মেয়ে যখন হবু স্বামীর টাকাটা বড় করে দেখে, তখনও বিষয়টি একই রকম। প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে, সৃষ্টিজগতের আসল কাজ হচ্ছে বংশ রক্ষা। বিয়ে করে সংসার করাই হচ্ছে মানব জীবনের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক লক্ষ্য। বিয়েকে কঠিন করতে থাকলে এক সময় মানব বংশ রক্ষাই দুস্কর হয়ে পড়বে। এখনই তার কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। পোপকে বলতে হচ্ছে, তোমরা বিয়ে করো, পৃথিবীকে শিশুদের থেকে বঞ্চিত করো না।

বিয়ে কি হাতকড়া

26 September 2014

লেখকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

খুব ছোটবেলায় কোন এক সময় এক বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে খুব ভাব নিয়ে বলেছিলাম, ‘বড় হয়ে আমি লিভ টুগেদার করব’. তখন আমার বয়স বার কি তের। ঐ বয়সের একটা মেয়ের পক্ষে এটা ‘কি’ তা জেনে বুঝে বলাটা খুবই অস্বাভাবিক। তবে ধারণাটা আমি পেয়েছিলাম কোন এক গল্পের বইয়ের পাতা থেকে এটা স্পষ্ট মনে আছে।

এখন এই ‘লিভ টুগেদার’ কথাটা শুনলেও আমি বেশ শিউরে উঠি। দু’জন মানুষ একটা সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবে শুধুই শরীরের ‘ক্ষুধা’ মেটানোর জন্য আর যখন যার ইচ্ছা সে এই সম্পর্ক থেকে নিজেকে ‘মুক্ত’ করে নিতে পারবে। পশ্চিমা মুভি-গুলোতে এই কনসেপ্টগুলি খুবই জমকালো ফ্যাশনেবল হিসেবে তুলে ধরা হয়। এমনভাবে দেখানো হয় মনে হয় যেন সত্যিকার ‘সুখ’ এভাবেই মিলবে। ভাগ্য ভাল হলে এক সময় ভালবাসার সন্ধানও এভাবেই পাওয়া যাবে। যদিও বাস্তবে সেটা একেবারেই মিথ্যা।

একটু চিন্তা করে দেখলেই এই ধারণাগুলোর খুঁত খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি নিতান্তই বোকাসোকা কেউও সহজেই তা বুঝতে পারবেন।

প্রত্যেক মানুষের মাঝেই দু'টি দিক আছে। তার বুদ্ধি, বিবেক বা চিন্তাশক্তি এবং তার কিছু ইমোশন বা ফিলিংস। এই দু'টি দিক ব্যবহার করেই আমরা যেকোন জিনিস বিবেচনা করি। তবে সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে বেশি ইমোশনই প্রাধান্য পায়। আর মনের এই অনুভূতিগুলো যখন কৈশোর, তারুণ্য এবং যৌবনে প্রবল হয়; ঠিক তখনি আমরা পাই লিভ টুগেদারের ধারণা, বিবাহ পূর্বক দায়বদ্ধতাযুক্ত সম্পর্কের পরিবর্তে দায়বদ্ধতাহীন প্রেম বা ভালবাসা টাইপ সম্পর্ক তৈরির অনুমোদন। গান, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট, নাটক, সিনেমায় অতিরিক্ত গ্ল্যামার দিয়ে এটাই বার বার ফুটিয়ে তোলা হয়।

তবে খেয়াল করি, এই প্রত্যেকটি সম্পর্কই শুধুমাত্র মানুষের জৈবিক আকাঙ্ক্ষা এবং ফ্রিডম এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। একটা মানুষের কিছু দৈহিক এবং মানসিক চাহিদা থাকে। কিন্তু সমাজ এই চাহিদাকে পূরণের জন্য থিওরেটিকালি বিয়েকে একমাত্র মাধ্যম বললেও, সমাজের মানুষের চিন্তা ভাবনায় তার উন্মেষ ঘটানোর কোন চেষ্টা চালাচ্ছে না। বরং তার উল্টোটাকেই নীরবে সায় দিয়ে চলেছে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরাই এই ধারণা নিয়ে বড় হচ্ছে, 'আমার ইচ্ছা হলে আমি সম্পর্ক করব, ইচ্ছা হলে ভেঙ্গে দিব'; মানুষকে বিশ্বাস দেয়া হয় লিমিট নির্ধারণ তার-ই হাতে। কোনটা ঠিক, কতখানি বেঠিক এটা নিজের চাইতে বেশি বুঝার আর কেউ নেই। তাই যা গতকাল ছিল নোংরা, নষ্টামি আর বেহুদাপনা; আজ তাই-ই প্রেমের মুখোশ পরে হাজির হয়। কথা বলা, বন্ধুত্ব একসময় হাত ধরা, কিস করা বা বিছানায় শোয়াতে পরিণত হওয়া।

গল্পের বই এবং উপন্যাসগুলোতেও এগুলোর ছড়াছড়ি। দেশের বিখ্যাত এক লেখকের বই থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরছিঃ

'আফসোস, লিভ টুগেদার বাংলাদেশে এখনো চালু হয় নাই। বিবাহ মানে বন্ধন। বন্ধনের ভিতর থেকে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ হয় না।'

গত কয়েক বছরে এই ধারণা প্রবল ভাবে মানুষের মানসিকতায় গেঁথে গিয়েছে। কয়েক বছর আগেও মানুষ 'প্রেম করি' বলতে ভয় পেত। লুকিয়ে রাখত। কিন্তু আজকে অনেকগুলি প্রেম করা হল গৌরবের বিষয়। না করলেই তারা ব্যাকডেটেড, ফিলিংসলেস, অ্যাবনরমাল। তাই এখন মানুষ বরং এটা বলতেই লজ্জা পায় যে আমার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড নাই। আর আমার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড আছে বলতে পারা মানেই যেন আমি বিশাল কিছু 'অ্যাচিভ' করে ফেললাম। একজন ছেলে বা মেয়ের 'স্ট্যাটাস' এর মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সম্পর্ক তৈরি করতে পারার ক্ষমতা। মানুষের আত্মসম্মান বোধ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, ভাল লাগার জন্য আরেকজনের দেয়া মিথ্যা বানোয়াট কিছু মন্তব্যের উপর ভরসা করে থাকতে হয়।

সমাজ শুধু বিবাহ নামক বন্ধন কে বৈধতা দিলেও, প্রেম ভালবাসাকে কিন্তু অবৈধ করে দেয়নি। বরং তার দিকেই provoke করছে। ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছে সেটা ভুল নয়। তাই ছেলেমেয়েরাও সমাজের সম্মোহনী শক্তির কাছে হার মেনে প্রেম আর ভালবাসায় জড়িয়ে 'ফান' খুঁজে পাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, লোভ আর স্বার্থপরতার কাছে আত্মসম্মানকে বিলিয়ে ভাবছে তারা উন্নত। তবে প্রেম ভালবাসা আর লিভ টুগেদারের সময় একজন নারীর সতীত্ব ও একজন পুরুষের ব্যক্তিত্ব কোথায় গিয়ে ঠেকে তার হিসাব সমাজ রাখে না। তখন জন্ম নেয়া একজন শিশুর বাবা-মার দায়িত্ব কে পালন করবে সে কথার উত্তরও সমাজ দেয় না। ওদের সামাজিক অবস্থান কি হবে, ভবিষ্যৎ কি তা নিয়েও সমাজ নির্বিকার।

এক রকম ঝাপসা ধারণা নিয়েই নতুন প্রজন্ম এই ভয়ানক অন্ধকারের দিকে ঝাঁপ দেয়।

তারপর যখন এক সময় তাদের কামনা-বাসনার পেট কিছুটা ভরে ওঠে, তখন নিজেকে আবিষ্কার করে নর্দমার চাইতেও নোংরাতম স্থানে। আর সেখান থেকে ফিরে আসার কোন পথ খুঁজে পায় না। দায়বদ্ধতা থেকে বেঁচে থাকার এই ভ্রান্ত পথ বেছে নিতে গিয়ে কতজনের মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সবচেয়ে বড় কথা একজন মানুষ শুধু পশুর মত তার দৈহিক আর যৌন চাহিদা মেটানোকেই জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দিক মনে করতে শুরু করে। কিন্তু মানুষ আর পশুর মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় থাকল?

একটা মেয়ের জন্য কয়েকটি ছেলের বিছানায় শুতে পারাটা কি লজ্জা নয়?একটা ছেলের চাহিদা পূরণে বিবাহের বাইরে মেয়েদের নিজের মান সম্মান শরীর মন আত্মা বিকিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত? একজন নারীর মূল্য কি এতোই কম?শরীরের একটু আনন্দের জন্য যার-তার সাথে সম্পর্ক তৈরিতে কি করে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে এটা স্থায়ী সমাধান?

যেই বয়ফ্রেন্ড এর হাত ধরে ঘুরতে এত মজা লাগে তাকে স্বামী হিসেবে কেন গ্রহণ করা যায় না?

এরকম সম্পর্ক কি আসলেই প্রেমের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কিনা সেটাও একটা বিশাল প্রশ্ন। আজ যে মানুষটি সার্ভিস দিচ্ছে, কাল তার একখানা ভুলের জন্যই সম্পর্ক ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তখন কি আমরা তার জন্য ভাবি নাকি নিজের জন্য? পুরো সম্পর্কটাই আসলে দাঁড়িয়ে আছে এক ধরনের স্বার্থপরতার উপর ভিত্তি করে, দায়িত্ববোধের ছিঁটেফোটাও সেখানে নেই। এখানে আমরা সবাই 'ড্যাম কেয়ার'; নিজের জন্য ভাবতেই বেশি আগ্রহী। আমি সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেললে কে কষ্ট পাবে সেটা নিয়ে আমার কিছু আসে-যায় না। শুধু 'আমার' ওকে ভাল লাগে, তাই 'আমি' ওর সাথে থাকতে চাই। সামনের মানুষটির চেয়ে তখন এই 'আমি' কেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ঠিক একই ভাবে সামনের মানুষটিও কিন্তু নিজেকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। 'গিভ অ্যান্ড টেইক' এর খেলা। যার ফলাফল শুন্য।

এবার একটি সহজ প্রশ্ন। রিলেশনে আছেন যারা, আপনারা কি সুখী?না, আমরা সুখী নই, কারণ যদি আমরা সুখী হতাম তাহলে এক বয়ফ্রেন্ড থাকতে আরেকজন ছেলের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলতাম না। সব সময়ই

আমাদের মন কাকে যেন খুঁজছে, কি যেন পাচ্ছে না। তাহলে যে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ এত ঠুনকো সেখানে জড়িয়ে থাকার মানে কি?

শুধুই শরীর। মনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। এই শরীরের দাস হয়ে একে ওকে ধর্না দিয়ে যখন কিছুই মেলে না, তখন এক সময় মনে হয় জীবনটা পুরাই বৃথা। ইসলামে তাই এরকম সম্পর্কের কোন অবস্থান নেই, যেখানে মানুষের সম্মানের চেয়ে বেশি স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যেখানে ভাল লাগাই সব, স্থায়িত্বের প্রসঙ্গ নেই। যেখানে চেতনা লোপ পায় আর শুধুমাত্র দেহের তৃষ্ণা, মনের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে মানুষ পশুর মত ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এরকম সম্পর্কের অনুমোদন দিয়ে আসলে মানুষের পশুবৃত্তিকেই জাগিয়ে তোলা হয়। যখন মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করে, অন্যের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়। আমরা কি চাইব কেউ আমার শরীর কে ব্যাবহার করে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিক? এই কি ভালবাসা? যে সম্পর্কে দুই পক্ষের দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজনের স্থায়ী সমাধান দেয়া হয় না সেই সম্পর্কের কোন মূল্য নেই। কোন সমাজ গড়তে এবং প্রগতির ক্ষেত্রে তা সহায়ক হতে পারে না।

বরং ইসলামে দুইজন মানুষ আল্লাহকে ভয় পেয়ে রাসুল (সা) এর সুন্নাহ পালনের উদ্দেশ্যে বিয়ের মাধ্যমে একত্রে পথ চলার অঙ্গীকার করে। সেখানে প্রেম আছে। ভালবাসা আছে। আছে ফুটফুটে সন্তান। পরস্পরের প্রতি সম্মান, মায়া-মমতা আর দায়িত্ববোধ নিয়ে দু'জনে সুস্থ সুন্দর পারিবারিক জীবন ধারন করার অঙ্গীকার।

ইসলাম মানুষকে শুরুতেই জীবনের উদ্দেশ্য দান করে। মানুষের সুবিধার জন্য সম্পর্ক, সম্পর্কের জন্য মানুষ নয়। তাই সম্পর্কের পিছে পড়ে একজন মুসলিমকে কাতর হতে ইসলাম শেখায় না। কিন্তু আমাদের সেকিউলার সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা আমাদেরকে বলে আমি যা চাই তাই পেতে পারি। আমার ইচ্ছার কোন সীমা নাই। তারপর সেই ইচ্ছার পিছনে অন্ধভাবে ছুটতে যেয়ে নোংরা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি হোক, হোক সম্পর্ককালীন বা পরবর্তী জটিলতা- তার দায়িত্ব সমাজের নেই। সেকিউলার সমাজ আমাদেরকে লোভী হতে বাঁধা দেয় না। তাই চিন্তাধারা থাকে, 'আমি এটা বা ওটা চাই'; কিন্তু ইসলাম বলে সংযমের কথা। এখানে একজন ছেলে আর মেয়ে একে অপরের সুবিধার কথা ভাবে। সম্পর্কের এই নোংরা পরিণতির কথা ভেবে ইসলাম প্রথমেই দিয়েছে দৃষ্টির সীমা, হিজাব আর মার্জিত আচরণের নিয়ম। তাই ইসলামিক সমাজব্যবস্থাতে নারী-পুরুষের পক্ষে সম্মান বজায় রেখে পাশাপাশি কাজ করে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব, আর সেকিউলার ত্রুটিপূর্ণ সমাজে আশা করা যায় শুধুই গ্লানি, হতাশা আর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী।

বাবা মায়ের দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের সময়মত বিয়ে দেয়া

2 November 2014

সংকলনে – বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক।

এক.

বিলম্ব বিয়ের কারণে নষ্ট এই সমাজ?

সরকারের 'ministry of women & children affairs' এইমাত্র মেসেজ কইরা জানালেন, মেয়েদের ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়সের আগে বিয়ে করা "Unlawful" এবং harmful তাদের "Physical & Mental Development"...

খুবই ভালো কথা !!

একই দিনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে পালিত হচ্ছে 'ভ্যালেন্টাইন ডে' বা ব্যভিচার ও পাপাচার দিবস। সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগা দিয়েই এই পাপাচার ও নোংরামি দিবস পালিত হচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে তো নির্বিকার সকলেই। উপযুক্ত Physical & Mental Development-এর বহির্প্রকাশ ১০ বছর ধরে প্রেম করে আত্মহত্যা, বিয়ের পরে পরকীয়া, ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ-পঞ্চভুজ প্রেমের কাহিনীগুলো... এমন নোংরামি-নষ্টামির মতন হাজার হাজার ঘটনার সূত্রপাত হবে আজকেই। স্বি, নিশ্চিত থাকুন, ১৪ ফেব্রুয়ারি,২০১৪ তারিখে নিদেনপক্ষে হাজার হাজার অন্যায় ও বেআইনী ঘটনার শুরু হচ্ছে!!

অথচ কোনদিন কেউ বলে নাই ছেলেদের ২১ এবং মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিত, আবশ্যক। তাহলে বলা যেত এইটা সুস্থ একটা বিশ্লেষণ এবং আহবান। আল্লাহর সৃষ্টি দুনিয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে চলতে বলেছেন তার বিপরীত উপায়ে

সব law তৈরি করে তাকে unlawful বললে যেসব development এর বাণী শোনানো হয়, তা নিঃসন্দেহে বাস্তবতাবিবর্জিত, অমানবিক এবং অপ্রীতিকর।

সমাজের মানুষের ভেতরে যেই ভালোবাসার হাহাকার, সম্পর্কের টানাপোড়েন, জিঘাংসা, ঘৃণা, অশান্তি, পাপাচার -- সেগুলোর পিছনে পারিবারিক শান্তির প্রবল অভাব অন্যতম প্রধান কারণ। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। পরিবারে মানুষের শান্তি নাই, সমাজে কই থেকে আসবে? বিয়ে ছেলেখেলা নয়। আমরা যাদের নিয়ে সমাজে চলি, তারা প্রতিটি পুরুষ ও মহিলাই একেকটি মানুষ। শৃংখলার বাইরে তাদের জীবন তাদের রক্তপিপাসু পশুদের চেয়ে নিকৃষ্ট করে দেয়।

আমরা মনে করি, বিয়ে নিষিদ্ধের বয়স নিয়ে হুড়পাড় না করে যদি বিয়েকে সহজ করা নিয়ে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া হতো, তাহলে এই দেশ ও জাতি অনেক এগিয়ে যেতো। উন্নতি ও সুস্থতা আমরা সবাই-ই তো চাই!!

দুই.

বাবা মায়ের দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের সময়মত বিয়ে দেয়া।

"একটি নির্দিষ্ট সময় তাদের মাঝে একজন সঙ্গীর চাহিদা সৃষ্টি হবে, এটা আল্লাহই নির্ধারণ করেছেন তাঁর সৃষ্টিকে প্রবাহমান রাখার জন্য। সে সময় সে যদি বাবামায়ের সহযোগিতা না পায় তাহলে তার জন্য সৎ থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকে বাবামাই ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করাতে গিয়ে বা তাদের ইনকামের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারটি ইগনোর করেন। ছেলেমেয়ে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে জানলেও বলেন, 'তোমরা যাই কর আমাদের কোন আপত্তি নেই, শুধু লেখাপড়া যেন ঠিক থাকে'। অনেকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের দোহাই দিয়ে ভাবেন, 'নিজেদেরই চলেনা তো বৌ আসলে চলবে কি করে?'...'

হফিজ সাহেব ইন্টেরাপ্ট করলেন, 'এই কথাটা কিন্তু ঠিক'।

'না, ঠিক না। আসল কথা হোল আমাদের দেশের বাবামায়েদের অনেকের কাছেই ইসলাম একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে বিশ্বাস এবং আস্থার ব্যাপার আছে তা তাঁদের অনেকের কাছেই স্বচ্ছ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির রিজিক তাঁর অবস্থানস্থলে পৌঁছে যায়। আমাকে কি আপনি খাওয়ান? না, সেই ক্ষমতা আপনার নেই। আমার রিজিকের মালিক আল্লাহ। আপনি যদি আমাকে কোন মরুভূমির মাঝে ফেলে আসেন তবে সেখানেও তিনি আমার

রিজিক পৌঁছে দেবেন। সুতরাং, ছেলেমেয়ে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে বাবামায়ের এই আশঙ্কা অমূলক। তাঁরা সময়মত বিয়ে দেন না বিধায় সন্তানেরা নানান অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে, যতদিনে তাদের বিয়ে দেয়া হয় ততদিনে তাদের আর বিয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকেনা, বিয়ের মাধ্যমে কিছু পার্থিব লাভ এবং সন্তান উৎপাদন ছাড়া আখিরাতের সাফল্য তাঁরা অনুসন্ধান করেন না, যে সংসার করবে বিয়ের ব্যাপারে তার মতামতের কোন গুরুত্ব দেয়া হয়না, ফলে বিয়ে করেও সে নৈতিক অধঃপতন থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারেনা। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ চিত্র'।"

বিবাহ উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদের পিতা- মাতাকে এখনই সতর্ক হওয়া দরকার !!!

হযরত আবু সাইদ খুদরী ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যার সন্তান হবে সে যেন তার ভালো নাম রাখে, তাকে উত্তম আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়, আর যখন বালেগহবে তখন তাকে বিবাহ দিবে । কেননা যদি বালেগ হওয়ার পর সন্তানকে বিবাহ না দেয় আর তার দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে যায় তাহলে তার পিতাও গুনাহগার হবে। (বায়হাকী ফী শুয়াবুল ঈমান-৬/৪০১, মিশকাত-২৭১,)

তিন.

নির্মম বাস্তবতা

"একটা ছেলে পাশ করে চাকরি করলেও হয়না। তাকে অনেএএক টাকা ইনকাম করতে হবে। এই ছেলের সম্ভাব্য বউ ততদিনে কলেজ ভার্সিটিতে ডজনখানেক রোমিওর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বসে থাকে। এরপর ৩০বছর, ৩২ বছরে সবাই ছেলেটিকে বিয়ে দিতে অস্থির হবে -- তখন তার চরিত্র কেমন আছে কে জানে, মেয়েটারটাও কে জানে। বিয়ের পবিত্র আবেগ বহু আগেই তাদের হারিয়ে ক্ষয়ে যায় -- তা যে কেউ বুঝে। শারীরিক-মানসিক এই চাওয়া পূরণে তারা যে আগেই কোথাও সাময়িক ঢুঁ মারেনি তাইবা কে জানে?

মুর্খ অভিভাবকদের চোখে পড়েনা এখনকার ডিভোর্স রেট? চোখে পড়েনা সবখানে অশ্লীলতা দেখে? তার সন্তানটি কী ভাবছে মনে করেন তারা? বিয়ের বয়সটা ছাত্র জীবনে রাখলে কী সমস্যা হবে? দায়িত্ববোধ যার কখনই ছিলনা, তার কখনই হবেনা। ছেলের ও মেয়ের বাবা মা আরো কিছুদিন (বিয়ের পরেও) ভরণপোষনের দায়িত্ব নিলে কি সমস্যা? তাদের কি সন্তানের চরিত্রের চাইতে লোকে কি বলবে --সেটাই বড় বিষয়? এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনেক অল্পতেই শারীরিক ব্যাপারগুলো ভালো করে বুঝে ফেলে। দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিয়ে সপাত্রে/সপাত্রীতে হস্তান্তর করে দিতে না পারলে ভুক্তভোগী পরিবারের হর্তাকর্তারাই হবে -- হচ্ছে হরদম।"

চার.

আবু দারদা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে,

"মিযানে (কিয়ামত দিবসে পাপ -পুণ্য মাপার পাল্লায়) সর্বাপেক্ষা ভারী বস্তু হলো, উত্তম চরিত্র ।"

-আস সহীহা, ৮৭৬

পাঁচ.

মুফতি ইসমাইল মেঙ্ক বলেনঃ

“সন্তানদের জন্য বিয়েকে সহজ করে দেয়া আমাদের জন্য ইবাদাত স্বরূপ। আর তাদের জন্য বিয়েকে কঠিন করে ফেলা একটি পাপ, যা অন্যান্য আরো অনেক পাপের জন্ম দেয়।”

courtesy : ১ - সাফওয়ান।

২- রেহনুমা বিনত আনিস।

বিয়ে, দ্বীনদার স্ত্রী এবং মানসিক সাপোর্ট !

6 April 2015

সংকলনে - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব

এক.

কথায় বলে, ভদ্রতার দাম নেই। এ কথাটি রাজনীতি, সমাজনীতি, বিভিন্ন নীতিতে যেমন সত্য, বিয়ের ক্ষেত্রে ততোধিক বেশি সত্য বলে মনে হয়। যতক্ষণ না ছেলের বিরুদ্ধে পাশের বাড়ীর চালে ঢিল মারার অভিযোগ আসছে ততক্ষণ অনেক অভিভাবক বুঝতেই চাননা ছেলের বিয়ের বয়েস হয়েছে। এক কথায় অনেক অভিভাবকের কাছে ছেলের বিয়ের উপযুক্ততার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো ইভটিজিং। ছেলে ইভটিজিং করছে মানেই হলো ছেলের বিয়ের বয়েস হয়েছে, অপরদিকে ছেলেটি ভদ্রভাবে লেখাপড়া করছে, লেখাপড়া শেষে চাকুরী করছে, মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে, চুল পেকে যাচ্ছে, তবুও ছেলেটির বিয়ের বয়েস হয়নি, কারন সে অতি ভদ্র।

যে সকল ছেলে মেয়েরা ভদ্রতা বজায় রেখে বিয়ের গোপন ইচ্ছেটা মনের সিন্দুকেই তালাবদ্ধ রাখে, আজকালকার অভিভাবকরা সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করেন, পারেনতো মনের সিন্দুকটাকে শেকলবন্দী করে সমুদ্রের তলদেশে ডুবিয়ে দেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেকটা ভাগ্যবতী। অতীতকাল থেকেই মেয়েদের উপার্জনে বাবা-মা অভ্যস্ত নয় বলে যতদ্রুত পারেন মেয়েকে পার করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইদানিং হঠাৎ করেই অভিভাবকরা অতিআধুনিক হয়ে উঠেছেন, মেয়ের লেখাপড়া শেষে রোজগেরে না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের চিন্তা করাকে তারা সেকেলে মনে করেন। ফলাফল, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে দীর্ঘকাল আইবুড়ো থেকে থেকে কমবয়েসী ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলেকে বিয়ে করছে।

এক তথ্যে দেখা যায় যুক্তরাজ্যে স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের বয়স ৫ বছর বেশী, এমনকি সদ্য বিবাহিত প্রিন্স উইলিয়াম ও কেট মিডলটনের মাঝেও ৫ মাসের বয়সের ফারাক।

দুই.

বিয়ের অন্যতম প্রধান উপযোগিতা হল মানসিক সাপোর্ট। রাসূলুল্লাহ □ এর সবচেয়ে কষ্টের দিনগুলোতে তাঁর মাথার ওপর বিশাল ছাতা হয়ে ছিলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। যখন সবাই আল্লাহ্‌র রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করছিল, যখন বুকের ওপর আঘাতের পর আঘাতের পাথর চেপে বসেছিল, তখন তিনি দুজন শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে পাশে পেয়েছিলেন। স্ত্রী খাদিজা আর বন্ধু আবু বকর। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

খাদিজার কথা আল্লাহ্‌র রাসূল সারাজীবনে ভোলেন নি। খাদিজার কাপড় ধরে স্ত্রীকে মনে করতেন, কাঁদতেন। রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদের ওপর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মর্যাদা দিয়েছিল এই বিষয়টি- স্বামীর জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগস্বীকার। গোটা দুনিয়া শত্রু হয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র রাসূলকে সাহস দেওয়া, প্রেরণা দেওয়া, কষ্ট ভোগের জীবন মেনে নেওয়া।

আল্লাহ্ মানুষকে প্রোগ্রামই করেছেন এইভাবে। একটা ছেলে যখন সংগ্রাম করে, কঠিন সময় পার করে, সেসময় সে পাশে একজন প্রিয় মানুষকে চায়, একজন সঙ্গীর অভাব অনুভব করে; যার মধ্যে সে মানসিক আশ্রয় খুঁজবে, সাহস খুঁজবে, অনুপ্রেরণা পাবে। যে ভালোবাসা দিয়ে তার ভুলগুলো শুধরে দেবে, যে তাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করবে। এমন একজন মানুষ যার সাথে সবকিছু শেয়ার করা যায়। না বলা অনুভূতিগুলো যাকে শোনানো যায়। যার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তরের বেদনা লাঘব করা যায়, চক্ষু শীতল করা যায়।

অথচ ট্রেডিশান হল এর উল্টোটা। একটা ছেলে তার স্ট্রাগলের সময়গুলো পার করে যখন সেটলড হবে, প্রচুর টাকা কামাবে, প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন আর তার সংগ্রাম থাকবে না, তখন তার হাতে কন্যার মা-বাবা রা মেয়েকে তুলে দিতে চান। এর আগে বিয়ের কথা বলাও পাপ। ত্রিশোর্ধ্ব একটা লাখ টাকা কামানো ছেলে স্ত্রীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র আর ঘরের কাজ করার লোকের বাইরে বিশেষ কিছু দেখবে না। কঠিন দিনগুলোতে তো সে একে পায়নি। অথবা ধনীর দুলালের হয়তো কঠিন সময় আসেই নি।

মা-বাবারা ছেলেমেয়েকে প্রচুর খাবার, ভালো কাপড়, ভালো স্কুল কলেজে পড়িয়ে ভাবেন ছেলেমেয়ের সব চাহিদাই তো পূর্ণ করছি। অথচ তা নয়। সুকুন তথা মানসিক প্রশান্তি কখনো মেটাতে পারবে না মা-বাবা। তখন সন্তানের আবেগের জায়গাগুলো হারাম বিনোদন কেড়ে নেয়। যে আবেগ পাওয়ার হক্বদার ছিল স্ত্রী সে আবেগ অন্যত্র ঢেলে দিয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বৌকে কী ভালোবাসবে সে? স্ত্রী তার মনের কতটুকু স্থান দখল করতে পারবে?

এজন্য মা-বাবাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করে আপনার ছেলেমেয়ের প্রয়োজনগুলো বুঝুন। টাকার বাইরে যে অনেককিছু আছে সেসব বুঝতে শিখুন। তার জন্য জীবনসঙ্গী/সঙ্গীনীর ব্যবস্থা করুন। আর মেয়ের মা-বাবারা দয়া করে বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসুন। দ্বীনদার যে ছেলেরা মানসিক প্রশান্তির জন্য, চরিত্র হিফাযতের জন্য বিয়ে করতে চায় তাদের কাছে নিজের কন্যাকে হস্তান্তর করুন। সমাজের বিরাট উপকার হবে। কবরে নিয়ে যাওয়ার মত পাথেয় হবে। আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান পাবেন। **

**Courtesy - Jubaer Hossain

তিন.

আমার এক আত্মীয়া বললেন তার ছেলে খুবই ডিপ্রেশনে ভোগে--সব সময় একাকিত্বে থাকে।

বললাম : বিয়ে দিয়ে দেন।

তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়েছি। বললাম, ইউনিভার্সিটিতে পড়া একটা ছেলেকে বিয়ে না দিয়ে কীভাবে দোকা বানানো যায় জানি না। তিনি বললেন, ছেলের কোনো পছন্দ থাকলে এক কথা ছিল...

ছেলের পছন্দ থাকলে, সে বাড়ি পালানোর হুমকি দিলে, বা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলে সবাই মেনে নেবে।

একই ছেলে যদি মায়ের পছন্দের উপরে ভরসা করে, বাবা-মায়ের মাধ্যমে প্রপার চ্যানেলে বিয়ে করতে চায় সেটা আমাদের সমাজে অকল্পনীয়।

দুনিয়াটা উলটে গেছে। সম্মানীরা সম্মান চান না। হালালগুলো অসম্ভব। হারামগুলোই নর্ম।

courtesy - Sharif Abu Hayat Opu

চার .

আপনার সন্তান জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে!! একজন বিশ্বাসীর কাছে জাহান্নামের আগুনের চেয়ে ভয়ংকর আর কোন দুঃস্বপ্ন হতে পারে না। তাহলে ভেবে দেখুন, দেরী করে বা তার 'প্রয়োজন মত' বিয়ে না দেয়ার জন্য, কবীরা গুনাহর chain reaction -এ পড়ে আপনার ছেলে যদি জাহান্নামী হবার সম্ভাবনা থাকে, আপনার পৃতিস্নেহ কি- 'লোকে কি বলবে', 'ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে', 'পর্যাপ্ত ধুমধাম হবে না' ইত্যাদি- মেকী ও ঠুনকো কারণে ছেলেকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দিতে পারে??

- "বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে বিবাহ ও নারীবাদ" বইয়ের পাতা থেকে।

পাঁচ .

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেন-আল্লাহ যাকে নেককার-দ্বীনদারস্ত্রী দান করেছেন, তাকে ,অর্ধেক দ্বীন দ্বারা সাহায্য করেছেন। এখন তার কর্তব্য হলো সে 'তাক্বওয়া' ও 'খোদাভীরুতা' দ্বারা বাকী দ্বীন অর্জন করুক।" (কানযুল উম্মাল ১৬:২৭৩)

”একজন পুরুষের সাথে দ্বীনদার নারী হলেন রাজার মাথায় স্বর্ণখচিত মুকুটের মতন, অন্যদিকে একজন পুরুষের সাথে খারাপ নারী হলো বৃদ্ধ ব্যক্তির মাথায় চাপানো ভারী বোঝার মতন।” — আব্দুল-রাহমান ইবনে আবজা (আল-মুসান্নাফ, ১৭৪২৮)

বিয়ে: আকাঙ্ক্ষা থেকে অনীহা

3 November 2014

লেখকঃ জাবাল আত তারীক

আমার একটা অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ। ছেলেদের কথাই বলছি, মেয়েদের সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নাই। সচেতন ছেলেরা একটা নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে করতে উঠে পড়ে লাগে। এদের মধ্যে যারা সময়মত বিয়ে করতে পারে না তারা সেই নির্দিষ্ট সময়টা পার হয়ে গেলে বিয়ের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে উঠে, অনেকে ষ্টাবলিশড হওয়া, সবকিছু গুছিয়ে নেয়া এবং পর্যাপ্ত সেভিংস ম্যানেজ করার অজুহাত দিয়ে তাদের বিলম্বে বিয়ের ব্যাপারটাকে আরও বিলম্ব করে। এর পেছনে সাইকোলজিক্যাল কারণটা কি হতে পারে তা নিয়ে আমার খুব আগ্রহ। তবে আমার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা কাজ করছে সেটা হল, বাস্তবতা, কোরআন, হাদিস, যুক্তি তর্ক ইত্যাদি দিয়ে আমি আমার পিতামাতাকে বুঝাইতে ব্যর্থ হইসি। শুধু যে ব্যর্থ তা না, বরং তাদের চোখে আমি এখন ভিলেন। তারা ভাবছেন আমি একটা উন্মাদ! দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে। যাই হোক, তথাকথিত বেয়াদবি যেন না হয় এবং উনাদের মনে যেন কষ্ট না লাগে সে জন্য আমি ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মোটামুটি সেই ধৈর্যের পিরিয়ড এখনও শেষ হয় নাই। আরও কতদিন চলবে তা আমার জানা নাই, জানার ইচ্ছাও নাই। এই মুহূর্তে আমি ২৯ বছর বয়সে পদার্পণ করে কয়েকটি মাসও অতিক্রম করে ফেলেছি। দিন দিন সিরিয়াসলি আমার বিয়ে করার ইচ্ছেটা ভয়ংকর ভাবে মরে যাচ্ছে। এর কারণ একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন,

ক্যালকুলেশনটা হল এই সমাজে যৌনতার যত্র তত্র ছড়াছড়ির মাঝে, যেখানে চাইলেই আপনি আপনার যৌনাকাংখ্যা বিভিন্ন ভাবে মিটাতে পারবেন, কেউ জানবে না, বুঝবে না। আকাম কুকাম করে যাবেন আর দৈনিক মসজিদে হাজিরা দিবেন। ব্যাস! আপনার মতো ভালো ছেলে দুনিয়ায় আর নাই। কিন্তু যখনি আপনি বিয়ের কথা বলবেন তখনই কেচ্ছা খতম। বেয়াদব, বেশরম বেহায়া ইত্যাদি উপাধির পাশাপাশি কুনজরে পড়ে যাবেন সবার। এরকম একটা সমাজে আমি আমার জীবনের প্রায় ত্রিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে আমার চারিত্রিক ভাবে সবচেয়ে ঝুঁকি পূর্ণ সময়টুকুও অন্তর্ভুক্ত। আঠারো থেকে ত্রিশ বছর এর মধ্যে আমরা এমন একটা সময় পার করি যখন উঠতে-বসতে, হাঁটতে-চলতে, গাইতে-নাইতে প্রতিটি মুহূর্তে যৌন-উত্তেজক বিষয় বস্তুর মুখোমুখি হতে হয় আমাদেরকে। এবং এ সময়টাতেই আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা থাকে সবচেয়ে দুর্বল। জীবনের ঠিক এই ভয়ংকর সময়টাতে আমরা যারা চরিত্র সচেতন তাদের সামনে বিয়েটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু এই সময়ে একটা নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়ে হারাম কাজের মাধ্যমে সমুদয় তৃষ্ণা মিটিয়ে সমাজের চোখে খোকাবাবু সেজে থাকাটা যতটা সহজ, একটি হালাল কাজ (বিয়ে) করার ইচ্ছা ব্যাক্ত করে নিজের চরিত্রটাকে রক্ষা করে দ্বীনের পথে টিকে থাকা তার চেয়ে হাজার গুনে কঠিন। কারণ একটাই, এই বয়সে বিয়ের কথা বলা বা চিন্তা করা আলেম হোক জালেম হোক সব বাবা মা এর চোখেই চরম নিন্দনীয় কাজ। ব্যাপারটা শুধু হাস্যকরই নয় বরং বড় বেশি আঁতলামী। যে সকল অভিভাবকরা নিজেরা সব কিছু বুঝেন বলে দাবী করেন তাদের পক্ষ থেকে এইরকম আচরণ কোন ভাবেই মানানসই নয়।

তো ২৯ বছর বয়সের প্রাথমিক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি যে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়টা আমি ইতিমধ্যেই পেরিয়ে এসেছি, এবং সেই সময়টা কোন ভাবেই পাপ ও পঙ্কিলতা মুক্ত ছিল না। বরং এই ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে যতটুকু পাপ হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা না করলে জাহান্নামের আগুন থেকে আমার যে রেহাই হচ্ছে না সেটাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন আমি যদি বাংলাদেশের গড় আয়ু ৬০ বছরও বেঁচে থাকি, তাহলে সেখান থেকে ত্রিশ বছর অলরেডি চলে গেছে। আর বাদ বাকী ত্রিশ বছর সময়ের মধ্য থেকে পঞ্চাশের পরের দশ বছর আমার চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতার জন্য কোন হুমকিই নয়। বাকী থাকলো আর বিশ বছর। এই বিশ বছরে অন্তত আঠারো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত সময়ের মতো চরম ঝুঁকিপূর্ণ সময়ের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমার চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতার জন্য ঝুঁকি পূর্ণ সময় অলরেডি গত হয়ে গেছে। এখন বিয়ে-শাদীর প্রশ্ন উঠলে সেটা নিতান্তই বংশ বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করেই উঠবে, সেই সাথে সামাজিক প্রথাটাও আসতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল একটি সুন্দর চরিত্রের চাইতে এগুলো আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কি না?

আরেকটা ব্যপার হল, বিগত ২৯ বছরের স্বাধীন জীবন যাপন, অফুরন্ত সময়, রঙের এই দুনিয়া দেখা এবং সমুদয় অনাচারের বিরুদ্ধে একটি সুন্দর কল্যাণ সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার তাবৎ স্বপ্ন কে কেন্দ্র করে, আমার মন ও মগজে যে পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গুলো অংকিত হয়ে আছে, সেগুলোর বাস্তবায়নে যে অফুরন্ত সময়ের প্রয়োজন হবে সেটুকু সময় আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে বিয়ে করাটা কি আমার জন্য অযাচিত সময় নষ্ট করার নামান্তর নয়? যখন আমার হাতে অগণিত কাজ পড়ে আছে, তখন আমি কেন বিয়ে করে একটা নতুন ঝামেলা পাকিয়ে ফ্যামিলি বানিয়ে তার পেছনে সময় নষ্ট করবো? কারণ সমাজে আমার মতো শতভাগ যুবক জীবনের কোন না কোন সময়ে গিয়ে বিয়ে করবে, সংসার করবে এবং বংশ বিস্তার করবে কিন্তু একটি কল্যাণময় সমাজ গড়ার চিন্তা এদের মধ্যে হাতে গোনা দু একজনের মাথাতেই শুধু কাজ করবে। এই হাতে গোনা কয়েকজনও যদি ত্রিশের কোঠায় এসে বিয়ে করে পরিবারের পেছনে সময় দিয়েই সার হয়ে যায় তাহলে কল্যাণময় সমাজ গড়ার কাজে আঞ্জাম দিবে কে?

আমার বাবা কলেজ লাইফেই বিয়ে করেছেন, আমরা ছয় ভাই বোন। আব্বুর বয়স ষাটের খুব বেশি হবে না। তিনি এখনও বেশ সবল এবং কর্মক্ষম। এমন সময়েই আমাদের ভাই বোনদের তিনি আর দু এক বছরের মধ্যেই নিজেদের

পায়ে দাঁড়াতে দেখবেন। এর পর তিনি নিজের মত করে তার নিজস্ব আদর্শিক কাজে মনোযোগ দিতে পারবেন। আগে আগে বিয়ে করার জন্যে আল্লাহ আব্বুকে এই অসাধারণ নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু আমি চিন্তা করছি, আমি যদি ঠিক ৩০ বছর বয়সেও বিয়ে করি তাহলে আমার সবচেয়ে বড় সন্তানটিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে আমাকে ষাট বছর পার করে দিতে হবে, তাহলে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সন্তান গুলোর ভাগ্যে কি হবে? তাদেরকে অনিশ্চয়তার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাকে অক্ষম জীবনে প্রবেশ করতে হবে। এটা যখন আমি এই মুহূর্তে বসেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তখন আমি কোন দুঃখে বিয়ের পিড়িতে বসবো?

মোট কথা, যেই আমি বিগত চারটি বছর, যুবমাজের চারিত্রিক পরিশুদ্ধতাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে অন্তত পঁচিশের আগেই বিয়ের করার বিভিন্ন যৌক্তিক দিক তুলে লেখালেখি করেছি, সেই আমিই কি না ত্রিশের দোর গোঁড়ায় এসে বিয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আগ্রহ হীন হয়ে পড়েছি। এবং এর সপক্ষে আমি হাজারটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি। এই র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জটা আমি অনেকের মাঝেই দেখেছি। তাদের মাঝে আমার বলা কারণ গুলো না থাকলেও অন্য অনেক কারণ আছে। সেগুলো জানা দরকার। তাছাড়া আমার বলা কারণ গুলো কেউ রিয়ালাইজ করুক বা না করুক, ম্যাক্রো লেভেলে কত মানুষ এই কারণ গুলোর শিকারে পরিণত হবে তার কোন হিসেব নেই। সুতরাং বিষয়টা যা দাঁড়ালো সেটা হল, সময় থাকতে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি না নিলে ভুক্তভুগী মুরুব্বীরা হবেন না, বরং আমরাই হবো। কারণ মুরুব্বীরা সত্তুর কিংবা ষাটের দশকের জেনারেশন। তারা তখনকার ধ্যান ধারণা দিয়েই একবিংশ শতাব্দীর দুনিয়াকে বিচার করেন। দুনিয়া কিভাবে ঘুরে, কিভাবে কি হয়, তা উনারা জানেন না। এখনকার যুবকরা কি সিচুয়েশনগুলো অতিক্রম করে তার ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নাই। তাদের কাছে বাস্তবতা হল আয়-রোজগার, সহায় সম্পত্তি, ওয়ালিমার খানা খাদ্যের খরচ-পাতি আর মোহরানার টাকা। আমাদের জন্যে সেখানে বাস্তবতাটা একেবারেই ভিন্ন, একটা গার্ল ফ্রেন্ড জোগাড় করতে আমাদের আয়-রোজগার, সহায় সম্পত্তি, ওয়ালিমার খানা খাদ্যের খরচ-পাতি আর মহরানার টাকার দরকার হয় না। সুতরাং আমাদের যুবকরা থেমে নেই, উনারা লিগ্যালি বিয়ে করতে না দিলে আমাদের যুবকরা ইল্লিগালি প্রেম করে বেড়াবে, নিষিদ্ধ পল্লীতে যাবে, পর্ণ দেখবে, আরও যা যা আছে তা তা করবে। মুরুব্বিরা কোনও ধারনাই রাখেন না, যে কতভাবে এই যৌন আসক্তিকে চরিতার্থ করার সহজ পথ ও পদ্ধতি যুবকদের হাতের কাছে পড়ে থাকে। কেউ জানবে না, বুঝবে না কিন্তু ইমান আকীদা ও চরিত্র খুইয়ে অথর্ব হয়ে যাবে গোটা যুব সমাজ। এটাই হল আমাদের বাস্তবতা, যা মুরুব্বিদের বাস্তবতার চেয়ে একেবারে ভিন্ন কিন্তু বড় বেশি ভয়ংকর। তাই সিদ্ধান্তটা আসতে হবে যুব সমাজের মাঝ থেকেই, যারা নৈতিকতা ভিত্তিক সমাজ গড়তে চায়, তাদের মধ্য থেকে। বিয়ে করুন সঠিক সময়ে, ছেলেদের ওয়ালীর দরকার হয় না, সুতরাং আপনাদের কোন বাধা নেই। মুরুব্বীদের দিকে চেয়ে থাকলে অন্য দশটা ছেলের মতো জন্ম নিয়ে শিক্ষিত হয়ে চাকরি করে দু একটা সন্তান জন্ম দিয়ে মরে যাবেন কিন্তু সমাজের কোন পরিবর্তনই আপনারা করতে পারবেন না। সমাজে ছড়িয়ে পড়া নোংরামী, বেহায়াপনা, ব্যাভিচার চলতে থাকবে হরদম। এগুলোর ক্ষতিকর দিক আপনি আমি ততোদিন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো না যদি না কোন দিন আপনার বা আমারই নিজের কোন ভাই বা বোন ধ্বংশের অতলে হারিয়ে যায়। সুতরাং সে দায় আপনিও এড়াতে পারছেন না কারণ আপনি কোন কার্যকর পদক্ষেপই নেন নি।

আমি আমার লজ্জার মাথা খেয়ে এগুলো বলছি তার কারণ হল লজ্জায় মুখ বুজে থাকলে কি এমন সুখ বা লাভ হবে তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

বিয়ে মানে কি কুরবানি? বিবাহিত মানে কি মৃত?

28 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

বিয়ে মানে কুরবানি, বিবাহিত মানে মৃত. এরকম কিছু কথা সমাজে প্রচলিত। নতুন প্রজন্মের মাঝে খুব বেশি ফান বা মজা-মশকরা হিসেবে এইসব ব্যহৃত হয়। আপনি কি ভেবে দেখেছেন আপনি যেই ফান করেন তা কি সঠিক নাকি বেঠিক? আপনার জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে কিনা তা যখন চিন্তা করবেন, এটাই আপনার ঈমানের পরিচয়।

বিবাহিত মানে কি আসলেই মৃত? অথচ আল্লাহ বলেছেন তিনি আমাদের জন্য আমাদের জীবনসঙ্গীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা প্রশান্তি, উচ্ছ্বাস আর দয়া অনুভব করি। আমাদের প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বলেছেন বিয়ে হলো দ্বীনের অর্ধেক। আল্লাহ বলেছেন আমাদেরকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য নির্লজ্জতার আশেপাশেও না যেতে। আমাদের প্রতি আদেশ রয়েছে আমাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে। এমতাবস্থায় আপনার শারীরিক আর মানসিক প্রয়োজনগুলো যদি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য না করে আপনি সামলাতে পারেন, তাহলে বিয়ে না-ই করলেন। সেক্ষেত্রেই হয়ত বিয়েকে 'মৃত্যু' হিসেবে ফান করে প্রাণ শীতল করতে পারেন। তবে এরকম হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বিয়ে তো কেবল তারাই এড়িয়ে যেতে চায় যারা অক্ষম অথবা চরিত্রহীন। তারাই বিয়ে নিয়ে বাজে কথা বলে যারা নিজেরা মূর্খ, হতাশ। যারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে তার কাছে দোয়া করতে চায় না, পারেনা।

সাবধান!! আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ যে পবিত্র বন্ধনকে ঘিরে রয়েছে, তা নিয়ে ঠাট্টা-মশকরাকে "নির্দোষ ফান" হিসেবে ধরে নেয়ার ধৃষ্টতা দেখাবেন না। আপনার "নির্দোষ ফান" কিন্তু আরো অনেকের মনে ডিরেক্টলি বা ইনডিরেক্টলি প্রভাব বিস্তার করে, হতাশ করে। বিয়ে বা পরিবারের মতন অতি-গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনার "ফানি" মন্তব্যগুলো নোংরা উপহাস হয়ে যায় কিনা সেটা খেয়াল করুন।

বিয়ে একটি পবিত্র বন্ধন। বিয়ের ফলে একজন মানুষ দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করতে পারে, বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করে। বিয়ে শেখায় দায়িত্ববোধ। বিয়ের ফলে চরিত্র রক্ষার ঢাল আপনি পেতে পারেন। আপনার

ব্যক্তিগত চরিত্র ও স্বভাবগুলোতে খুব কাছ থেকে আরেকটা মানুষ বেশ খেয়াল রাখতে পারেন তাই বিয়ে আপনার জন্য একটা রিফ্রেশার ও রিমাইন্ডারও বটে। বিয়ে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিয়ে নিয়ে তাই নোংরা বাজে ফান করার অপসংস্কৃতিকে না বলুন। আল্লাহকে ভালোবেসে তার ভালোবাসাকে আপন করে নিন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হিদায়াত দিন।

বিয়ে না হলে নাইবা হোল !

1 September 2015

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের কাছে বিয়ে মানেই ছিলো শামিয়ানা টাঙ্গানো বিয়েবাড়ী, লাল শাড়ীপরা কাঁদো কাঁদো বৌ, লজ্জা লজ্জা চেহারা করে বসে থাকা বর, মজার মজার খাবার আর ছুটাছুটি করার অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু বড় হতে হতে, বড়দের অদ্ভুত আচরণ দেখতে দেখতে, পৃথিবীটা একটু একটু করে বিস্বাদ লাগতে লাগতে একসময় মনে হোল এখানে কোনকিছুই যেমন দেখতে আসলে তেমন নয়। ছোটবেলায় বিয়েটাকে যেমন সহজ আর সুন্দর একটা জিনিস মনে হত, বড় হয়ে দেখি এটা অনেকের কাছে একটা ভালো ব্যাবসা আর তখন বিয়ের ওপর থেকে আস্থাই উঠে গেল। আমার self realization খুব ভালো। তাই আমার জন্য যখন প্রস্তাব আসতে শুরু করল তখন আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম ওরা কেন আমার ব্যাপারে আগ্রহী হবে? আমি একজন ছাত্রী মাত্র যার এখনো কোন যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি, দেখতেও ভালো না, কোন কাজকর্ম পারিনা – তাহলে ওরা কি দেখে আমার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে? আমাকে দেখে নিশ্চয়ই নয়!

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম বিয়ে করবনা। বাবার সাথে আলাপ করলাম। বললাম, "যে টাকাটা তুমি আরেকটা ছেলেকে দেবে কষ্ট করে আমার সাথে থাকার জন্য, সেটা দিয়ে আমাকে একটা ফ্ল্যাট আর একটা দোকান কিনে দাও। আরেকজনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আমি নিজেই এই দিয়ে চলতে পারব"।

যখন সেই আমিই একটা বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম তখন সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। পরে ওরা বুঝতে পারল যখন দেখা গেল সেই ভদ্রলোক শুধু এই বলেই ক্ষান্ত দেননি যে "আমি কিছু চাইনা"। অনেক ছেলেই বলে, "আমি কিছুই চাইনা, দোয়াই কাম্য"। যারা কিছু চায় তাদের চাহিদা তো পূরণ করা যায়। কিন্তু যারা কিছু চায়না তারা দেখা যায় যাই দেয়া হয় নিতে থাকে, কখনো বলেনা যে, "ব্যাস, এতেই চলবে"। কিন্তু উনি না নিয়ে প্রমান করলেন যে উনি আসলেই কিছু চাননা।

আর তাই আমার পরিচিতাদের দেখে আমার খুব কষ্ট লাগে যখন দেখি তারা বিয়ের ব্যাপারে এত অন্ধভাবে এগিয়ে যায় যে তাদের লক্ষ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই তাদের নজরে আসেনা।

আমাদের এক বান্ধবী, অসম্ভব সুন্দরী, বহু প্রস্তাব বেছেবেছে পরে এক ইউনিভার্সিটির লেকচারারের প্রস্তাব ওর পছন্দ হোল। আমরা সবাই ওর জন্য উৎফুল্ল। কিন্তু ক'দিন পর শুনলাম ওর বাবা ওনার একমাত্র প্রপার্টিটা বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সবাই ওকে বল্লাম, "তুমি তো ছেলের সাথে কথা বল, ঘুরতে যাও, কথায় কথায় একদিন তাকে বল যে কিভাবে তোমার বাবা তোমাকে বিয়ে দিচ্ছেন। ওনার প্রপার্টিতে তো তোমার ভাইদেরও হক আছে। তুমি কেন নিজের স্বার্থে তাদের বঞ্চিত করবে? তুমি তাকে বোঝাও যে তুমি একজন চাকুরীজিবী মেয়ে, নিজেই ভালো ইনকাম কর, উনি একজন শিক্ষিত লোক, ভালো চাকরী করেন। তোমার বাবার ব্যাপারে কন্সিডার করলে আল্লাহ তোমাদের বরকত দেবেন।" সে ভীষণ গাল ফুলিয়ে অভিমান করে বল্ল, "আমি এখন কিছুই বলবনা, বিয়ের পর আমি সব বলব"। আমরা সবাই হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বিয়ের পর বললে কি লাভ হবে? ওর বাবার প্রপার্টি কি ফেরত আসবে না ওরা যা যা নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেবে!

আরেক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছিলো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে। সে একদিন অহংকার করে বোঝাচ্ছিলো ওর বিয়ের সময় ওর বাবামা কিছুই দেয়নি। কিন্তু যখন কয়েকবছর পর ও শ্বশুরবাড়ী থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন ওঁরা ওর বাসার ফার্নিচার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দিয়েছেন। আমি আমার স্বল্পমস্তিষ্কে বুঝতে পারলাম না এর মাধ্যমে ওর বাবামা কি বোঝালেন? ওঁরা কি বোঝালেন যে শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ায় ওঁরা কতখানি খুশী হয়েছেন? নাকি চাকুরীজিবী মেয়ে আর জামাইকে তেলা মাথায় তেল দিয়ে ওঁরা প্রমান করলেন ওঁদের কত টাকা আছে?

আমার এক ভাই আমাকে এক বিয়ের কাহিনী শুনিয়েছিল। অভিভূত হয়ে গেছিলাম। এক বৌদ্ধ বিয়েতে দাওয়াত খেতে গিয়ে সে দেখল বরপক্ষ আর কণে পক্ষের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। ঘটনা কি? বিতর্কের বিষয় হোল কতটুকু নগদ দেয়া হবে আর কতটুকু পরে দিলেও বরপক্ষ কন্সিডার করবে। বর নিজেও রয়েছে তার্কিকদের মধ্যে। কণে অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে আছে তার বাবার লাঞ্ছনা আর গ্লানির দৃশ্যের প্রতি। অনেকক্ষণ পর ঠিক হোল যেভাবেই হোক অর্ধেক টাকা দেয়া হলে বিয়ে হবে নতুবা নয়। বাবা ভাবছেন কি করে এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই উনি টাকা সংগ্রহ করবেন। বর গিয়ে কণেকে বল্ল, "আমি দয়া করে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হলাম"। সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনলো, কণে বল্ল, "আমি রাজী হলাম না"। মেয়ের বাবাসহ সবাই কণেকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে এই বিয়ে ভেঙ্গে গেলে হয়ত মেয়ের বদনাম হয়ে যাবে, আর কখনো বিয়ে হবেনা। কিন্তু মেয়ে বল্ল, "বিয়ে না হলে নাইবা হোল। বিয়ে হতেই হবে বলে তো কোন কথা নেই। ওঁরা বিয়ের আসরেই এরকম আচরণ করছেন, বিয়ের পর কেমন আচরণ করবেন?" বরপক্ষের লোকজন হম্বিতম্বি করে চলে গেল কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজী হলোনা। মেয়ের বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, কণেপক্ষের লোকজন বিমর্ষ। এমনসময় আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছেলে এসে বল্ল, "আমার খুব একটা টাকাপয়সা নেই, কিন্তু লেখাপড়া জানি, একটা ছোটখাট চাকরী আছে। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি বিনা যৌতুকে ওকে বিয়ে করতে চাই"। বিয়ে হয়ে গেল! আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কথা বলি কিন্তু কার্যত এতটুকু বিশ্বাসের পরিচয় আমরা অনেকেই দিতে পারিনা। পারলে হয়ত আমাদের জীবনগুলো অন্যরকম হত।

আমাদের বিয়ের পর আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব অনুপ্রাণিত হয়ে যৌতুকবিহীন বিয়ে করলেন। তাদের মধ্যে এক ভাইয়ের কাহিনী খুব মজার। উনি গোঁড়া থেকে বলে আসছেন উনি ওনার শ্বশুরকে বলেছেন উনি যৌতুক নেবেন না আর ওনার বন্ধু আমাদের বলে চলেছেন, "আপনারা ওর কথা বিশ্বাস করবেন না"। বিয়ের দিন গিয়ে দেখি ওনার শ্বশুর ওনার চাহিদার তালিকায় অতিষ্ঠ হয়ে সব দিয়েছেন। কমিউনিটি সেন্টারে পুরুষ আর মহিলাদের খাবারের

জায়গার ঠিক মধ্যখানে বিশাল জায়গা জুড়ে গাড়ি থেকে শুরু করে ছুরি বটি পর্যন্ত যা যা দিয়েছেন সব সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন যেন সবাই বুঝতে পারে ছেলে কিরকম যৌতুকবিহীন বিবাহ করছে! বর লজ্জায় মাথাই তুলতে পারলোনা সম্পূর্ণ বিয়েতে!

ছেলেমেয়েদের বিয়েতে বাবামা খুশী হয়ে কিছু দিলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েরাই আশু আনন্দের ঝোঁকে ভুলে যায় তাদের বাবামা'র সামর্থ্যের কথা, তাদের খুশীর কথা ভেবে মুখ বুজে অনেক দুঃখ কষ্ট চেপে যাওয়ার কথা।

সারাজীবন পেলেপুষে, লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করার পর এই কি হওয়া উচিত তাদের প্রতিদান? মানলাম অনেকের বাবামা সামর্থ্যবান। কিন্তু তারা তাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে যা করতে পারছেন তা অনেকেই তাদের সন্তানদের জন্য করতে পারেন না। তখন তা পরিবারের অবুঝ সদস্যদের জন্য মর্মবেদনা আর অসহায় দায়িত্বশীলদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তার চেয়েও যারা দরিদ্র তারা যৌতুকের জন্য হয় মেয়ে বিয়ে দিতে পারেন না, নয় যৌতুকের ওয়াদা পূরন করতে গিয়ে ধারকর্জ করে দেউলিয়া হন, নতুবা তাদের মেয়েরা কষ্ট পেতে থাকে এই ওয়াদা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আর কপাল খারাপ হলে ঘরে আসে মেয়ের লাশ অথবা তার আত্মহত্যার খবর। ভালো করে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এর দায়ভার আমাদের। আমরা আমাদের অর্থসম্পদের জৌলুস দেখাতে গিয়ে অনেক অনেক মানুষকে হতাশা, গ্লানি এমনকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের শুধু ভালোবেসেই কিছু দেই, তাহলে লোকের জানার দরকার কি আমরা কি দিচ্ছি বা আদৌ দিচ্ছি? আর সব ভালোবাসা বিয়ের দিনই দিয়ে দিতে হবে বলে কি কোন কথা আছে? তার শ্বশুরবাড়ীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তার সুবিধা অসুবিধা দেখা, তার যেকোন প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেয়া, এভাবে কি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো যায়না?

এর উল্টোটাও আমাদের সমাজে খুব কমন। ইসলামে তো যৌতুকপ্রথা নেইই, তবুও এর কথা সব বিয়েতেই একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মোহরানা নির্ধারণ করার সময়ও ছেলের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঠিক করা হয়না। ফলে কার্যত খুব কম মেয়েই তাদের মোহরানা বুঝে পায়। অথচ রাসুল (সা) বলেছেন, অল্প মোহরানার বিয়েই অধিক বরকতপূর্ণ! মোহরানা যথা সম্ভব দ্রুত আদায় করার মধ্যেই মেয়ের সম্মান।

আমাদের এক ভাইইয়ের কাহিনী শুনে খুব ভালো লেগেছিল। শুনলাম বিয়ের আসরে বসে পকেট থেকে ৫০,০০০ টাকা বের করে তিনি বললেন, **"আমি এতটুকুই মোহরানা দিতে পারব, এখন আপনারা মেয়ে দিতে রাজী থাকলে দেন, নইলে আমি চলি"।** কণেপক্ষ আর কি বলবে? একসাথে মোহরানা আদায়ে ওনার বিয়ে হয়ে গেল!

আমার এক বান্ধবীর বাসায় গিয়ে আমার খুব ভালো লাগত। প্রথম যেদিন ওনার বাসায় গেলাম, উনি বললেন, "আমার বাসায় কোন দু'টা জিনিস একরকম দেখবেন না। আমরা বিয়ের পর একটা পাটি কিনে জীবন শুরু করেছিলাম। তারপর যখন যেভাবে প্রয়োজন হয়েছে, সামর্থ্যমত কিনেছি। আজ আমরা দুজনেই অনেক ভালো চাকরী করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এখন যা ইচ্ছা তাই কেনার সামর্থ্য আছে। কিন্তু আমার ঘরের প্রতিটি জিনিসের সাথে অর্জনের যে সুখ আর মর্যাদা জড়িয়ে আছে তার সাথে কি কোন কিছুর তুলনা হয়?" ওনার ঘরে ঢুকলেই যে শান্তির পরশ পাওয়া যায় সেটা আরো অতুলনীয়।

আমাদের বিয়েতে কোন গান বাজনা লাইটিং হয়নি, আমরা চাইনি। কারণ এসব দিয়ে আমাদের বৈবাহিক জীবনে সুখ নিশ্চিত করা যাবেনা। কিন্তু ঐ টাকাটা দিয়ে একটা গরীব মেয়ের বিয়ে দেয়া যায়। আর তার বরকতের ছোঁয়া আমাদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।

জীবনে অনেকসময় অল্প ছাড় দিলে আরো অনেক ভালো কিছু পাওয়া যায়। প্রতিদিন দু'জনে মিলে তিল তিল করে একটা সংসার গড়ে তোলার, সমস্ত সুখদুঃখ ভাগ করে নেয়ার যে আনন্দ, দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার যে সুযোগ, রেডিমেড সংসারে তার স্থান কোথায়? যে বিয়ে পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ আর দায়িত্বের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর যে বিয়ে লোভ আর ভীতির ওপর স্থাপিত, দু'টোর মধ্যে কি কোন তুলনা হয়?

আমাদের বাবামা তখনই সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ পাবেন যখন আমরা তাদের সাহস দেব ধৈর্য্ আর স্থিরতার সাথে, "বিয়ে না হলে নাইবা হোল, বিয়ে হতেই হবে বলে তো কোন কথা নেই।" আর বিয়ে হলে যেন সম্মানের সাথে হয়। এতটুকু আত্মসম্মান কি আমরা অর্জন করতে পারিনা?

বিয়ের ব্যাপারে দুই যুবকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি !

4 November 2014

সংকলনে – বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক।

এক.

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েরপ্রথম বর্ষের ছাত্র জুবায়ের বিয়ের ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে কথা বলেন। তার কথাগুলো তুলে ধরলাম-

" আমি ইসলামের পথে আসার আগে মূর্খতার যুগে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ডদের মধ্যে একাধিক মেয়ে ছিল। তাদের একজনের কাছে জেনেছিলাম,তাদেরকলেজের মেয়েরা কীভাবে হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে। তার অনেক বান্ধবীই বয়ফ্রেন্ডের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে,এর মধ্যে কেউ কেউ বহুগামী। মানে একটা মেয়ে কয়েকজন ছেলের সাথে রাত কাটিয়েছে। ওদের ক্লাসের এক মেয়ে হঠাৎ প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ায় এইচএসসি পরীক্ষার মাত্র ২০ দিন আগে তার গর্ভপাত করা হয়। এছাড়া শারীরিক সম্পর্কের দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করে আদান-প্রদান, সম্পুর্ণ উন্মুক্ত হয়ে ছবি তুলে বয়ফ্রেন্ডের মোবাইলে প্রেরণ-এসব তো ছিলই।

আমি শুনে অবাক হতাম-আমাদের দেশেও এসব চলছে !! আমি জানতাম এ পশ্চিমাদের সংস্কৃতি। ধীরে ধীরে বুঝতে পারি এসব আমার আশেপাশেই হচ্ছে। এক হাতে তালি বাজেনা। মেয়েদের কথা উল্লেখ করলাম মানে এই নয় যে ছেলেরা সাধু। তারাও সমানভাবে অপকর্মে লিপ্ত। তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম কেন বিয়ের প্রতি বর্তমান সমাজের এই অনাসক্তি।

যা হোক,অতীতের কথা গেল। এখন আসি আমার বর্তমান অবস্থায়।

আলহামদুলিল্লাহ ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করার পর থেকে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। চোখের সামনে অনেকগুলো দরজা খুলে গেছে-যা দিয়ে ভালোমন্দ বুঝতে পারি আগের চেয়ে অনেক বেশি। কিছুদিন আগে আমার এক ইসলামপন্থী বন্ধু বলল সে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। তাতে করে আরেক বন্ধু তাকে নিয়ে আমার ভার্সিটির ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট দিল। তাকে নিয়ে নানা তামাশা করা হল। 'মাত্র ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে,এখনই বিয়ে করতে চায়,সমস্যা কী?' এই টাইপ চিন্তার মানুষগুলো তাকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করল।

আশ্চর্য,যে ছেলে মেয়েদের গায়ে ঢলে পড়ে 'বন্ধুত্ব' দেখায়,রাত কাটায় গার্লফ্রেন্ডের সাথে-তারা ভালো ছেলে,আধুনিকমনা ছেলে,আর যে ছেলেটি নিজেকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রেখে পবিত্র সম্পর্ক করতে চায় বিয়ের মাধ্যমে,সমাজে সে ঠাট্টার পাত্র। এই যেমন আমার ঐ বন্ধুটি নিন্দিত হল,অথচ প্রায় দিনই আমার নন-ইসলামিস্ট বন্ধুরা রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস দেয়-ইন এ রিলেশন উইথ অমুক মেয়ে,তারা খুব প্রশংসিত হচ্ছে। তাদের রিলেশনশিপ স্ট্যাটাসে শয়ে শয়ে লাইক আর কমেন্ট-কংগ্র্যাটজ, ট্রিট কবে,অভিনন্দন ইত্যাদি।

এভাবে,ঠিক এভাবেই সমাজ আমাদের হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল করে দেখাচ্ছে। সুশীল সমাজ আমাদের বিয়েকে নিন্দার্থে প্রদর্শনে ব্যস্ত। জাফর ইকবালের বইয়ে বিয়েকে নিরুৎসাহিত করার স্পষ্ট নিদর্শন দেখেছি। কর্পোরেট সমাজ বন্ধুত্বের নামে নারী-পুরুষের অবাধ ও অবৈধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করার কাজটা করে যাচ্ছে মহা সমারোহে। বেশি কিছু না,মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায়। আর সমাজের কাছে তা বিয়েকে উপস্থাপন করছে এক মস্ত বোঝা হিসেবে। তারা দেখাচ্ছে এমনভাবে যে,বিয়ে মানে হল একটা মেয়ের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেলেটির হাতে দেওয়া হবে। মেয়েটির সবরকম দায়িত্ব পুরোপুরি ছেলেটির। কাজেই অনেক

বয়স এবং প্রচুর উপার্জন না হলে বিয়ে দেওয়া যাবে না। তারা এটা বলবে না বিয়ে হল দুটি প্রাণের পবিত্র বন্ধন,জৈবিক চাহিদা পূরণের একমাত্র হালাল পন্থা, দুটো হৃদয়ের পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতা,যা জান্নাত লাভের একটা মাধ্যম।

যা হোক। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন এই ভরসাতেই আমরা দিন কাটাই। আল্লাহকে ভুলে থাকা আর চরিত্রবান ছেলেমেয়েদের নিয়ে তামাশা করা তথাকথিত আধুনিক এই ছেলেমেয়েগুলোকে বলতে ইচ্ছে করে-একদিন চোখের পর্দা খুলে গেলে কাঁদবি বন্ধু,চোখের পর্দা খুলে গেলে কাঁদবি।"

দুই.

গতকাল নিখিল বাংলা আবিয়াইত্যা (অবিবাহিত) সমাজ নিয়ে অনেক্ষণ চিন্তা ভাবনা করলাম। (দীর্ঘশ্বাস!)

মূলত এদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে আর নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা লাগে না।

আওলাকি (রহ) সাহেবের একটা লেকচারে শুনছিলাম যে সাহাবাদের (রা) সময়ে কোন নারীই অবিবাহিত থাকত না। কি বিধবা আর কি তালাক্বপ্রাপ্ত, বিবাহযোগ্য সকল নারীই অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে থাকত না, তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে দেয়া হত বা বিয়ে করে নেয়া হত। (আরো একটি দীর্ঘশ্বাস!)

এই কথা গতকাল বাসার সবাইকে বলে বেড়ালাম (আব্বু বাদে) কিন্তু সকলের কাছে, ওই যে ইসলাম theoretically 'ok' but practically ……. content not found, we are extremely sorry!

আজকালকার ছেলে মেয়েরা লুকিয়ে প্রেম করে বেড়ায়! কেন? এই প্রশ্নটি কি আমাদের অভিভাবকদের মাথায় আসে না? তাদের কি উদ্বিগ্ন করে না? তাদের কি সমস্যা সমাধানের কোন ইচ্ছাই নেই? কি শয়তান কি ইসলাম, দুটো জিনিসই ব্যাপারটিকে তাদের কাছাকাছি রাখছে, তারপরও কেন তাদের মতিভ্রম হচ্ছে?

একটা সময় বাবারা মেয়ের বিয়ে দেয়াটাকে পবিত্র দায়িত্ব জ্ঞান বোধ করত অথচ এখন নাকি তারাই মেয়ের উপার্জন খেতে বসে থাকে! ব্যাপারটি কতটুকু সত্য ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি যে ব্যাপারটি পুরোপুরি মিথ্যা নয়।

নারী শিক্ষার নাম করে যে নারীকে চরম পর্যায়োর শ্রমিক বানিয়ে নেয়া হয়েছে, তা নির্বোধ নারীরা আমি আবারো বলছি, নির্বোধ নারীরা বুঝতে পারে না আর পারবেও না, যতদিন না পর্যন্ত তারা মুত্তাকীনা হতে পারবে। যেখানে বাবাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যদি তারা তাদের মেয়েদেরকে সঠিক ভাবে অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী

লালন পালন করে। নাহ! তারা মেয়ে বিয়ে দেয়া নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা তো করেই না, এর উপর আবার ননমাহরাম ছেলের কাছে কোচিং করতে পাঠায়! এমন কি মুশরিক, কাফির ছেলেদের কাছেও আল্লাহর দেয়া আমানতকে পাঠাতে দুইবার চিন্তা করে না! কি সাংঘাতিক কথা! কি সাংঘাতিক কথা! আল্লাহ হিফাজত করুক! আল্লাহ হিফাজত করুক! কিন্তু আল্লাহ কেন এদের হিফাজত করবে? এরা কি আল্লাহর কাছে হিফাজত চেয়েছে?

এই ব্যাপরটি বিভিন্ন ঘটনা ঘটার পর অনুধাবনে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে যাদের শিক্ষা নেয়াটা প্রয়োজন ছিল, তাদের এই ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই এবং শিক্ষা নেয়ার চেষ্টাও নেই! তাদের মূলত ঘটনা ঘটার পরও শিক্ষা হয় না, এটাই বাস্তব!

কি আর করার! আল্লাহর কাছে কেঁদে কেটে দু'আ করা ছাড়া আপাতত আমরা মত নগন্য আবিয়াইত্যার (অবিবাহিতর) করার কিছু নেই যে তিনি যেন অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন করে দেন এবং পিতা ইব্রাহিমের (আ) মত হুংকার দিয়ে সত্যকে বলার মত পরিস্থিতি এবং সাহস দিয়ে আবিয়াইত্যা (অবিবাহিত) সমাজ তথা দ্বীনের খিদমত করার যোগ্যতা এবং তৌফিক দান করেন। -আমীন।

-Brother Niloy Arman

বিয়ে না করতে পারলে সাওম ???

26 September 2014

লেখক অজ্ঞাত

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না" সুরা বাকারাহ ২৮৬

এবং "সামর্থ্য না থাকলে বিয়ে করা যাবে না"।

দুটোই ঠিক আছে। তবে আমজনতা সামর্থ বললে যা বুঝে বসে আছে তাতে গন্ডগোল আছে। কোন ছেলে বিয়ের কথা বললেই যারা মুখস্ত রোজার কথা বলে বসেন তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সাওম জিনিসটা কোন প্রকটতায়, কোন প্রেক্ষাপটে সেটা ভেবে দেখার সুযোগ পান নি।

একটু ভালভাবে নিচের হাদিসটির দিকে খেয়াল করা যাক

==========

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম,"হে আল্লাহর রাসুল, আমি একজন যুবক এবং আমি ভয় করি যে আমি হয়ত অবৈধ পথ বেছে নিতে বাধ্য হব কিন্তু আমার বিয়ে করার সামর্থ্যও নেই" তিনি [রাসুল (সাঃ)] চুপ থাকলেন।

অতঃপর আমি আমার প্রশ্নটি পুনরায় করলাম কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন।

আমি (তৃতীয়বার) একই প্রশ্ন আবার করলাম এবং তিনি চুপ থাকলেন।

তারপর আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি (চতুর্থবার) করলে কেবল তখন তিনি বললেন, "হে আবু হুরাইরা! তুমি কি করতে যাচ্ছ তা লিখে কলম শুকিয়ে গেছে। তুমি খাসি হয়ে যাও আর না যাও"

==========

সহীহ বুখারী, ভলিউম ৭, অধ্যায় ৬২, হাদিস ১৩

লক্ষনীয় বিষয়,

১. আবু হুরাইরা (রাঃ) আল্লাহর রাসুল (সা;)এর একজন সম্মানিত সাহাবা যিনি সাহাবা(রাঃ) গনের মধ্যে সবচাইতে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

২. আল্লাহর রাসুলের সম্মানিত সাহাবা হওয়া সত্বেও অক্ষমতার জন্য বিয়ে না করতে পারায় যে ফিতনার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তা অসহনীয় ছিল।

৩. আল্লাহর রাসুল(সাঃ) সমস্যার কথা শুনে তিন তিন বার চুপ থেকে চতুর্থবারে জবাব দিয়েছেন। প্রথমবারে শুনেই মহাআনন্দে " বিয়া করতে না পারলে রোযা রাখ" বলে দিয়ে দিগ্বিজয়ী হাসি হাসেন নি।

হ্যাঁ। আল্লাহর রাসুল(সাঃ) অবশ্যই বলেছেন, "হে যুবকেরা তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে বিয়ে করবার, সে যেন বিয়ে করে। কেননা এটা দৃষ্টিকে নত রাখা ও গোপন অংগসমূহের হেফাযতের জন্য সবচাইতে কার্যকর। আর যে তা

পারবে না, সে যেন সাওম পালন করে, কেননা এটা তার জন্য ঢাল স্বরুপ" [সহীহ বুখারী ৫০৬৫, সহীহ মুসলিম ১৪০০]

দুঃখের বিষয় হচ্ছে সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে বুঝে যায় যে এখানে সামর্থ্যহীন বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে। সুরা নুরের ৩২ নং আয়াতের সম্পূর্ণটা উপলব্ধি করার প্রয়োজনও বোধ করে না। আল্লাহতালা যে বলছেন, "যদি তারা নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছলতা দান করবেন।" এই নিঃস্বরা তাহলে কারা?

এই নিঃস্বদের মধ্যে একজন ছিলেন ইতোপূর্বে উল্লিখিত সাহাবা আবু হুরাইরা (রাঃ)। তিনি বলেছেন,

Bukhari :: Book 8 :: Volume 76 :: Hadith 459

By Allah except Whom none has the right to- be worshipped, (sometimes) I used to lay (sleep) on the ground on my liver (abdomen) because of hunger, and (sometimes) I used to bind a stone over my belly because of hunger.

Bukhari :: Book 7 :: Volume 65 :: Hadith 287

Once while I was in a state of fatigue (because of severe hunger), I met 'Umar bin Al-Khattab, so I asked him to recite a verse from Allah's Book to me. He entered his house and interpreted it to me. (Then I went out and) after walking for a short distance, I fell on my face because of fatigue and severe hunger. Suddenly I saw Allah's Apostle standing by my head. He said, "O Abu Huraira!" I replied, "Labbaik, O Allah's Apostle, and Sadaik!" Then he held me by the hand, and made me get up. Then he came to know what I was suffering from. He took me to his house, and ordered a big bowl of milk for me. I drank thereof and he said, "Drink more, O Abu Hirr!" So I drank again, whereupon he again said, "Drink more." So I drank more till my belly became full and looked like a bowl.

না। এই সাহাবা (রাঃ) যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখত না, তারা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ফাস্টফুডের দোকানে যাবার সামর্থ্য রাখতেন না। উনাদের বাবা-মা উনাদেরকে ল্যাপটপ, আইফোন, আইপ্যাড সব কিনে দিতে পারা সত্ত্বেও সামর্থ্যহীন সান্তনা দিয়ে বিয়ে থেকে দূরে রাখতেন না। কিংবা প্রতিমাসে ছেলে মেয়ের শিক্ষার পেছনে মৌলিক অধিকার হবার কারনে বস্তায় বস্তায় টাকা ঢালার সামর্থ্য রাখলেও যৌন চাহিদাকে গৌণ বিবেচনায় বিয়ে থেকে দূরে রাখতেন না। ওনাদের সমস্যা ছিল কি জানেন?

Volume 9, Book 92, Number 425:

Narrated Muhammad:

We were with Abu Huraira while he was wearing two linen garments dyed with red clay. He cleaned his nose with his garment, saying, "Bravo! Bravo! Abu Huraira is cleaning his nose with linen! There came a time when

I would fall senseless between the pulpit of Allah's Apostle and 'Aisha's dwelling whereupon a passerby would come and put his foot on my neck, considering me a mad man, but in fact, I had no madness, I suffered nothing but hunger."

যে সকল আর্থিক অস্বচ্ছল মুসলিম ভাইয়েদের একটা ল্যাপটপ বা পিসি আর একটা দামী মোবাইল সেট ছাড়া সম্পদ বলতে কিছুই নেই বিধায় সাওম পালন করে মাশা আল্লাহ কালাতিপাত করছেন তারা জেনে রাখুন ঐ সাহাবা (রাঃ) এর কথা যিনি বিয়ের মোহরানা হিসেবে একটা লোহার আংটিও যোগাড় করতে পারেন নি। আরো জেনে রাখুন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তার বিয়ে দিয়েছিলেন কেবল কুরআনের জ্ঞানের কারনে। [দেখুন বুখারী Volume 9, Book 92, Number 425]

আরো জেনে রাখুন লেখাপড়া-ক্যারিয়ার নামক যেসব মরিচীকার আশায় পবিত্রতা নামক জিনিসটিকে বিসর্জন দেয়া হচ্ছে সেটি বিয়ে না করার কোন বৈধ কারন নয়। দিব্যি চাকরী-বাকরী করা প্র্যাকটিসিং মুসলিম ভাইয়েরা কোন এক কারনে ফিতনা থেকে দূরে থাকতে এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছেন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যেই ফিতনাকে উম্মাতের জন্য সব চাইতে বড় বলে গেলেন সেই ফিতনার দরজা বন্ধ করবার জন্য তাড়াহুড়োর কিছু নেই ভেবে নিশ্চিন্ত আছেন।

আমি অবাক হই বর্তমান যুগের মুসলিম ভাইয়েদের আত্মসংবরণ ক্ষমতা দেখে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) যেখানে বলতেন,"আমি যদি বেচে থাকার জন্য দশ দিন সময় পেতাম আর আমি জানতাম যে এই সময়ের পর আমি মারা যাব আর আমার বিয়ে করার ইচ্ছা থাকত তবে আমি বিয়ে করতাম ফিতনায় জড়ানোর আশংকায়।"

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে এই সব ভাইবোনদের কাছে যারা আল্লাহকে ভয় করেন, প্রায় বছর দুই এক ধরে একটা কোন রকম জবও করছেন তারা বছরে ত্রিশ দিনের বেশি কয় দিন সাওম পালনের মাধ্যমে এমন কঠিন সবর ধারনের ক্ষমতা পেলেন যে আরও দুই তিন বছর এভাবেই কাটিয়ে দিতে পারার অনুপ্রেরণা পেলেন।

আল্লাহতালা আমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা ও তাওয়াক্কুল করবার তওফীক দান করুন। আমীন।

প্রসংগ: বিবাহ

26 September 2014

লেখকঃ মেহযাবিন প্রীতি

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে,

বিবাহ, বিয়ে, শাদি, নিকাহ। যা-ই বলি না কেন, এ হল মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রচলিত কথা অনুযায়ী জন্ম, মৃত্যু আর বিবাহ এই তিন হল খোদার হাতে; এই তিন নিয়েই মানবজীবন। বিয়ে নিয়ে লিখতে বসার কারণ হল সাম্প্রতিককালের বাহারী রঙ ঢঙ্গের ওয়েডিং পেইজ , যা বারবারই কোন না কোনভাবে চোখে পড়ে যাচ্ছে। এইসব চোখ ধাঁধানো পেইজের বাকি দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জন্ম বা মৃত্যু নিয়ে যে কোন মাথা ব্যথা নেই সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকি, বিয়ের দিনটা নিয়ে মেয়েদের অনেক স্বপ্ন থাকে। সব মেয়েই চায় তার বিয়ের দিনটাতে তাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগুক, তার রূপের বা সাজের ঝলকে কারও চোখের পলক আর না পড়ুক। বিয়ের দিন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যই উত্তেজনার একটা দিন, কিন্তু সেই উত্তেজনা যদি কেবল সুন্দর লাগানোর আর সাজপোশাকের জন্য হয় তবে ঐ স্বপ্ন দেখার মানসিকতায় পরিবর্তন আনা দরকার। আবার অনেকের মাঝে বেশ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও থাকতে দেখেছি, আমার বিয়েতে এর চেয়ে দশগুণ বেশি টাকা খরচ করব। এত ধুমধাম

করব যে সবাই সারাজীবনেও ভুলবে না ঐ মহাদিবসের কথা! আফসোস, বিয়ের দিন আজকাল যতটা না একটা পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সরল শুভ্র আনন্দ তার চেয়ে বেশি মান সম্মান, প্রতিপত্তি ফলানোর নষ্ট উৎসব।

প্রচলিত ধারার বিয়ের খরচের খাতগুলো আমি কিছুটা চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম।

- প্রথমত ছোটখাট একটা আকদ বা এংগেজমেন্ট। ভিত্তিহীন একটা আংটিবদল অনুষ্ঠানের জন্য কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া, কার্ড ছাপানো থেকে শুরু করে কী না করা হয় দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যায়!
- কার্ড ছাপানো (পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষেই)
- মেহেদী রাত
- হলুদ সন্ধ্যা (বর-কনে আলাদা বা একসাথে)
- বিয়ে (আমার জানামতে আকদ মানেই বিয়ে হওয়ার কথা)
- বৌভাত বা ওয়ালিমা বা রিসিপশন (একমাত্র ইসলামসম্মত উৎসব অনুষ্ঠান)
- প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য সাজপোশাক, খাওয়া দাওয়া, সেন্টার ভাড়া, ফটোগ্রাফার ভাড়া, ভিডিও সহ হাজারো আয়োজন

প্রতিটা ইভেন্টই যে সবাই করেন তা না, যার যার সাধ্যমত করা হয়ে থাকে। তবে একটা ইভেন্ট করতে গেলেও এক লাখের উপরে টাকা খরচ হয়ে যায় বলে শুনেছি। যারা অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রতিটা ইভেন্ট করে গ্র্যান্ড ওয়েডিং কার্য সমাধা করেন তাদের টাকার পরিমাণটা চিন্তা করতে গেলে আমার রীতিমত কান্না পেয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, এই বিশাল ধরনের আয়োজনমুখর বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেক অনেক টাকার পাশাপাশি অনেক অনেক খাবার নষ্ট হয়, কত খাবার ফেলে দেয়া হয় তার ইয়ত্তা নেই। যে খাদ্য, যে সম্পদ আল্লাহ আমাদের দয়া করে দিলেন তার এই যথেচ্ছ অপব্যয় তিনি কি সহ্য করবেন? ভরি ভরি সোনা দিয়ে মুড়ে দুইদিনের মাটির শরীরটা সাজিয়ে মানুষকে দম্ভ ভরে তৃপ্তমনে দেখিয়ে বেড়াতে আমাদের কি বুক কাঁপা উচিত না? আল্লাহর শপথ বিচার দিবসে এই সম্পদে, এই সোনায়, এই নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারে লাখ লাখ ভুখা হতদরিদ্র মানুষের হাহাকার ধ্বনিত হবে। আজ যে সুন্দর সুন্দর পোজ দিয়ে হাসিমাখা মুখে ছবির পর ছবি তুলে যাচ্ছেন ভেবে দেখেছেন কি আপনারই ওয়েডিং ভেন্যুর পাশের ফুটপাতে কোন এক মা হাসতে পারছেন না, নির্বাক চিৎকার করে যাচ্ছেন সন্তানের মুখে একমুঠো ভাত না দিতে পারার অক্ষমতায়। আর আপনি হাজার হাজার টাকা খরচ করে চারকোণা এক ফ্রেমে বন্দী করে চলেছেন নিছক এক কৃত্রিম হাসি? আপনি কি জানেন আপনার হাজার টাকা দামের কৃত্রিম হাসির চেয়ে ত্রিশ টাকার একপ্লেট ভাত পাওয়া অশ্রুসজল হাসির দাম কত বেশি? নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন যদি তার কিছুটাও অবশিষ্ট থাকে। সারা পৃথিবীর লাখ লাখ ক্ষুধার্ত মানুষের কথা না হয় বাদ দিলাম, শুধুমাত্র বিয়েতে করা বিপুল অপব্যয় রোধ করে এই অর্থ যদি সঠিকভাবে বন্টন হত ঠিক খলিফাদের স্বর্ণযুগের মত সারা বাংলাদেশেও কোন অনাহারী মানুষ পাওয়া যেত না।

সমস্যা আরও আছে বৈকি শুধু দেখার মত চোখের অভাব। বিয়ের জন্য মাত্রাতিরিক্ত এই খরচের ভয়ে কত ভাইবোন উপযুক্ত সময়ে বিয়ে করতে পারছে না, কারণ এই সমাজে আমরা এত জঘন্য (হ্যাঁ এই শব্দটাই ব্যবহার করলাম) একটা ট্রেন্ড চালু করে রেখেছি। বিয়ে করতে না পেরে অনেকেরই নৈতিক চরিত্রের স্খলন ঘটছে কিংবা হতাশ জীবনযাপন করছে। বিয়ে কঠিন করে ফেলার কারণে বিয়ে পূর্ববর্তী অবৈধ জিএফ/বিএফ সম্পর্ক এখন ডালভাত হয়ে গেছে। অথচ ইসলাম কত সহজ করে দিয়েছে বিয়ের মত পবিত্র এই সম্পর্ককে, বিয়ের ব্যাপারে কী পরিমাণ উৎসাহ দিয়েছে চিন্তাই করা যায় না। ইসলামে বিয়ে সহজ কারণ এখানে দেনমোহর নিয়ে নোংরা বাকবিতণ্ডার স্থান নেই, সম্পদ অপচয়ের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যে বিয়ের অনুষ্ঠানে শুধু ধনী লোকদের নিমন্ত্রণ করা হয়, কোন গরিব মিসকীনকে খাওয়ানো হয় না, সেই বিয়ে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীসটি থেকেই বুঝে নেয়া যায় আমাদের আজকালকার বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো আসলে কতটা আল্লাহর জন্য আর কতটা লোক দেখানোর জন্য। বিয়ে সম্পর্কিত ইসলামিক তথ্য জানার জন্য এই সাইটটি বেশ ভালো।১ ইসলামিক রীতি সম্পর্কে জানার দরকার কারণ এটা কেবল ধর্ম না, এ তো সেই জীবনব্যবস্থা যা গড্ডালিকা প্রবাহের স্রোতে ভেসে চলে না, স্রোতের বিপরীতেও চলে না, ইসলাম স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। একটু একটু করে সচেতনতাই আমাদের এই প্রচলিত ধারা থেকে বের করে আনবে সেই বিশ্বাস রাখি।

বিয়ে কিন্তু আসলেই অনেক মূল্যবান, দামি, অনন্যসুন্দর এক সম্পর্ক। বিয়ের দিনটা হোক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই অসামান্য সম্পর্ক শুরুর শপথ নেবার দিন, দু'টি আত্মায় আল্লাহর দিয়ে দেয়া "সাকীনা"র (হৃদয়ের শীতল প্রশান্তি) ঠিকানা পাবার দিন। বিয়ের দিনটা যেন হয় শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা কিংবা জরা প্রতিকূলতায় পরস্পরের "লিবাস" (পরিচ্ছদ) খুঁজে নেবার দিন। সর্বোপরি বিয়ে হোক দুনিয়া থেকে জান্নাহ পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সেতু তৈরির প্রয়াস শুরুর অনাড়ম্বরপূর্ণ কিন্তু আবেগমাখা এক পবিত্র উৎসব।

১ http://www.islamawareness.net/Marriage/

বি. দ্র. এই পোস্টের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি আর মানুষকে সচেতন করা, কাউকে হেয় করা নয় বরং নতুন করে চিন্তা করানোর একটা ছোট্ট প্রয়াস। ঠিক মনে হলে মেসেজটি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন, জাযাকাল্লাহু খাইরান।

বিবাহ সমাচার

26 September 2014

লেখক অজ্ঞাত

ভার্সিটির শেষ বর্ষে বিয়ে করলাম, বর্তমান আদু ভাই টাইপ সমাজে এটা নাকি অল্প বয়সে বিয়ে করা। যাই হোক , আমি আর আমার বউ সি এন জির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ ভার্সিটির এক স্যারের সাথে দেখা, আমার মত একজন দাঁড়িওয়ালা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো এক নিকাবির পাশে। ব্যস, স্যার ২+২=৪ মিলায় দিলেন।

-কি ব্যাপার ! তুমি বিয়া করসো নাকি !

-স্বি স্যার !

- হুহ ! (স্যার একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন, উচ্চারণটা হুহ+ঘুত এর কাছাকাছি, অবজ্ঞাসূচক ও ব্যাঙ্গাত্মক। কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি তার আয়নার মত চকচকে শেভ করা গালে বিকালের রোদ প্রতিফলিত করতে করতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন)

ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ও নিজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আল্লাহর দেয়া সমাধান গ্রহণের বিকল্প নেই। যখন অনুভব করলাম সমাধান গ্রহণের সামর্থ্য ও তাওফিক উভয়টাই আল্লাহ করে দিয়েছেন তখন আর দেরি করা নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হল।

সমাধানের প্রথমটা হল সিয়াম বা চলতি কথায় রোযা রাখা, আর দুই নাম্বার বিয়ে করা !

১ নাম্বার সমাধানটা স্থায়ী সমাধান নয়, বিশেষ অবস্থায় অস্থায়ী সমাধান,

আর ২ নম্বর হচ্ছে স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত উত্তম সমাধান।

দাওয়াতের কাজ নাকি ঘর থেকে শুরু করতে হয়। আমার আব্বা-আম্মা সমাজের টিপিকাল সেমি-সেকুলার ট্রেডিশনাল মুসলিম আব্বা আম্মা। তাদের সাথে কয়েক সেশন আলোচনা করে ক্লান্ত হলাম, অবশেষে তারা অনুরোধে ঢেঁকি গিলে ফেললেন।

বিয়ে করব !

- এ কথাটা শোনার পর নদী দুই ভাগ হয়ে গেল। একদিকে দজলা, আরেকদিকে ফোরাত।

কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে।

কেউ দাঁড়ায় পাশে, আর কেউ দাঁত বের করে হাসে।

বলাই বাহুল্য যারা মুরুব্বী গোছের আত্মীয় তারা সামনে মুরুব্বি'আনা ধরে রাখার জন্য সরাসরি দাঁত বের করে না হাসলেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই কাশি আটকাচ্ছিলেন বুঝা যেত। আর সমবয়সীদের স্বভাবই হচ্ছে 'তাল দেওয়া'; যে আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিবে সেও বলবে , "হুম, ঠিক, বর্তমান সময়ে এই ফিতনার যুগ। পবিত্রতা রক্ষার জন্যে বিয়ে করা দরকার। তাছাড়া ইউ নো, সবকিছুই নির্ভর করে নিয়তের উপর। সেদিক থেকে সব কাজই ইবাদত'; কেউ কেউ আবার এক কাঠি সরেস, সুযোগ পেয়ে একটা জাল হাদীসও শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না। "হায় ! বিবাহিতের এক রাকা'আত নামায, অবিবাহিতের সত্তর রাকা'আত নামাযের সমান"। **পালাও ! কৈ আইলাম !**

ফলে একদিকে সত্যিকার সৎ বন্ধুদের সদুপদেশ, আর আরেকদিকে কানাঘুষাকারীদের কারণে 'কি একটা অবস্থা'।

এরই মধ্যে আবার স্যারের ঐ অদ্ভূত "হুত, ঘুত" টাইপ শব্দ করে ভিড়ের মধ্যে অন্তর্ধান হওয়া।

যাই হোক, ব্যক্তিগত আলোচনা করা মূল প্রসংগ না। মূল প্রসংগ হল বিয়ের বয়স কোনটা ঠিক?

বিয়ে একটি সুন্নাহ, যা সামর্থ্যবানের উপর ওয়াজিব। এবং অবশ্যই একটি ইবাদত।

অল্প বা বেশি বয়সে বিয়ে নয়, সঠিক সময়ে বিয়ে করুন ।

শারীরিক>মানসিক>আর্থিক এই তিনটি বিষয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে পাত্রী খোঁজা শুরু করেদিন। শারীরিক সামর্থ্য ব্যক্তি নিজেই ভাল অনুভব করতে পারবে, আর মানসিক সামর্থ্য আছে কিনা নাই সেটা ঈমান ও তাকওয়ার সাথে সমানুপাতিক। কিছুদিন আগেই এক ভাইয়ের লেখা পড়লাম, চমৎকার লিখেছেন,

"কথাটা চিন্তা করে মাথাটা চক্কর দিল।

আমরা কি নাবালক হয়ে যাচ্ছি ? দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে, তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে সাবালকত্বের বয়সসীমা । ১৬-১৮-১৯-২১-২৪ এরপর কত ? ইতিহাসে দেখি ১৫ বছর বয়সে রাজত্ব পেয়ে বাকি ১৫ বছরে বিশ্বজয় করতে। মুহম্মদ

বিন কাসিম ১৭ বছর বয়সে সিন্ধু জয় করেছিলেন । তিনি ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মেয়ে জামাই । তারমানে তিনি বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর চেয়ে ৭ বছরের বড় আজকের যুবকটি **স্যরি শিশুটি** এখনো নাবালক...”

অবশ্য বলাই বাহুল্য, এই নাবালকত্ব কৃত্রিম ও আরোপিত, অনেকাংশে স্বেচ্ছা নির্বাচিত। যেমন বিয়ের কথা বললেই অনেকে বয়সের কথা চিন্তা করে। আবার অপরদিকে ঠিকই ক্লাস সেভেন-এইট থেকেই টাংকির পিছনে ফিল্ডিং করা শুরু হয়ে যায়। ফলে ক্রমেই দেখা যায় নানাবিধ অনাচার ও অশ্লীল আচরণ। এমনকি **জুমার খুতবা শুনতে গিয়ে একদিন খতীব জনৈক মুফতি** বলেই ফেললেন, **‘আজকালকার ক্লাস ওয়ান টু পড়ুয়া বাচ্চারাও যা জানে তা আমরা এখন পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছরেও জানি না। কাজেই এদের সামনেও মহিলারা পর্দা করবেন”**। যথার্থই বলেছেন।

বাকি থাকল আর্থিক সামর্থ্য, যাদের আছে তাদের ব্যাপারে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আর যারা মনে করছেন **‘আমার টেহা নাই’**, তাদের জন্যে এই লেখাটি, বিয়ে করতে না পারলে সাওম???

তিন ব্যক্তিতে **আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন** বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা হচ্ছেন, ১ মুজাহিদ; ২ মুকাতিব ; ৩ আর পবিত্রতা রক্ষার জন্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করতে চায়। (দ্র তিরমিযি ১৬৫৫, সহীহ)

আল্লাহর উপর ভরসা করুন, যদি বিয়ে করার কোন উপায়-ই নাই থাকে তাহলে আর কি করা , সবরের পরীক্ষা দিন, ইনশা আল্লাহ প্রতিদানে আল্লাহ আপনাকে আরো ভালো কিছু দান করবেন। “যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন...” (২৪;৩৩)

“...তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে **শান্তিতে থাক** এবং তিনি তোমাদের মধ্যে **পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া** সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে” (রুম ৩০;২১)

“আমি পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বড় কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না।” (বুখারী ও মুসলিম)

ফিতনার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। ফিতনার মধ্যে পড়লেন, পাশ-ফেল কিছু একটা করলেন।

এর থেকে সেই কঠিন পরীক্ষার দিকে না যাওয়াই উত্তম নয় কি?

ইব্রাহীম ইবন মায়সারা বলেনঃ তাউস আমাকে বলেছেন, “ হয় বিয়ে করো, নইলে আমি তোমাকে সেই কথাই বলবো যা উমার বলেছিলেন আবুল যাওয়ায়িদ কে, ‘দুইটা কারণ ছাড়া তোমার অবিবাহিত থাকার আর কোন কারণ দেখি না। হয় তুমি অক্ষম, নইলে অসচ্চরিত্র লোক”। (বিস্তারিত জানতে দ্র http://islamqa.info/en/ref/82968)

বিয়ে করতে কি কোন প্রস্তুতির দরকার হয় ?

24 September 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

আমাদের সমাজে ছেলেমেয়েরা কেন বিয়ে করে?

অনেক তরুণ-তরুণীরা হয়ত বিয়ে করতে চায় কারণ তাদের বন্ধুবান্ধবরা বিয়ে করে ফেলছে, কারও আবার বাবা-মা চাপ সৃষ্টি করছে বিয়ে করার জন্য, কেউ ঘরের পারিবারিক জীবনের সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যও বিয়ে করতে চায়। কেউ কেউ অন্যের শারীরিক সৌন্দর্য দেখে বা অর্থ-সম্পদের কারণে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। কেউ কেউ খুঁজে একজন সঙ্গী, কেউ পারিবারিকভাবে শক্ত একটা অবলম্বন পেতেও বিয়ে করতে চায় যেটা একটা বিয়ের মাধ্যমে সম্ভব। আবার মুসলিম হিসেবে রাসূলের সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে ইবাদাত হিসেবেও বিয়ে করতে চান।

আরেকটা মানুষের সাথে আজীবন থাকার অভিপ্রায়ে যখন যাত্রা শুরু হয় দু'জন ছেলে এবং মেয়ের, তখন তাদের অনেক রকমের প্রস্তুতির দরকার পড়ে। দু'টো পরিবারকে তারা জুড়িয়ে দেয়, এখানে আরেকটা পরিবারের সাথে *নিজেদেরকে* মানিয়ে নেয়ার ব্যাপার থাকে। অনেক ধরণের চারিত্রিক গুণ প্রয়োজন, যেগুলো ছাড়া দিব্যি সমস্যাবিহীন *সিঙ্গেল* লাইফ কাটানো গেলেও বিবাহিত তা অবধারিত প্রয়োজন। তাই এগুলোর অবর্তমানে যদি সম্পর্কে চাপ বা টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়, অন্য কাউকে দায় দেয়ার নেই, ভোগান্তি তো হবেই।

বর্তমান সময়ে টেলিভিশন মিডিয়া, কমার্শিয়ালের মাঝে ডুবে থেকে অনেক ছেলেমেয়েরাই বিয়েকে মডার্ন ডেটিং টাইপের কিছু ভেবে বসেন। কেবল অবিমিশ্র সুখ, উদ্দাম আনন্দ। অথচ, বিয়ের পর দেখা যায় টুথব্রাশ এখানে কেন, টাওয়েল ওখানে কেন টাইপের ছোট ছোট জিনিসেও অমিল পাওয়া যায় একজন আরেকজনের। বিয়ের প্রথম দিকে ভালোবাসা উপচে পড়ার কারণে এইসব অগ্রাহ্য করলেও কিছুদিন পর আরেকজনের এইসব ছোটখাটো অমিলগুলোও অসহ্যবোধ হতে থাকে।

পারিবারিক এই সম্পর্কের ব্যাপারে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ হলো — 'আল মুহসানাত', 'আল মুহসিনিন' যা 'ইহসান' শব্দটি থেকে এসেছে। [১] এই শব্দটির একটি অর্থ যেমনটা বুঝায় তা হলো — কোন একটি দুর্গ চারিদিকে সেনা দিয়ে শক্তিশালীভাবে সুরক্ষিত। সেইসূত্রে, একজন স্ত্রীকে দুর্গের ন্যায় কঠিন সুরক্ষা দেয় তার স্বামী — সুরক্ষা দেয় যাবতীয় দুঃখ থেকে, অস্থিরতা-শঙ্কা থেকে, অজ্ঞতা থেকে, লজ্জাহীনতা থেকে। একজন স্ত্রীরও একই রকম দায়িত্ব রয়েছে। তারা একে অপরের পোশাকের মতন। [২] বিয়ে তাই কেবল আনন্দ আর উচ্ছ্বাস নয়, দায়িত্ববোধের ব্যাপারও বটে।

ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির সার্চ যেসব দেশ থেকে হয়, তার মধ্যে প্রথমদিকে বেশ কিছু মুসলিম দেশের নাম আছে। [৩] পারিবারিক অশান্তি এবং সংসার জীবনে তৃপ্তি না থাকাই এই কারণ বলে মনে করেন বোদ্ধারা। সংসার জীবনের শুরুতে আবেগ-উচ্ছ্বাস বেশি থাকে, দেখা যায় প্রথম ছ'মাস ছেলে-মেয়ে কেউই তাদের বন্ধুমহলে কোন সময়ই দেন না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেতে থাকে। সবাই তার অধিকারের ব্যাপারে খেয়ালী হতে থাকেন, নিজের কর্তব্যের ব্যাপার ভুলে যেতে থাকেন। হ্যাঁ স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই দু'জনের প্রতি অধিকার রয়েছে, কর্তব্যও রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবারই উচিত নিজের কর্তব্যটা করে যাওয়া এবং অপরজনের কাছে আশা-আকাংখা না করা।

কথাটা অদ্ভুত ঠেকলো?

একজন মু'মিন কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপরেই ভরসা করে। তার সমস্ত চাওয়া, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার কথা কেবল আল্লাহর কাছেই হয়। মাটির তৈরি দুর্বল মানুষের উপরে যখন অনেক আশা-আকাংখার ভার ন্যস্ত হয় — তখন নিঃসন্দেহে সেই মানুষ এতটা ভার নেয়ার যোগ্য থাকে না।

আর তাই, মানুষ হিসেবে আমাদের আশাভঙ্গ হয়ে কষ্ট পেয়ে এলোমেলো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বিয়ে করার আগে বিয়ে করার উদ্দেশ্য ঠিক রাখা প্রয়োজন। কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই যেন মুখ্য থাকে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার আশায়, চরিত্রকে ঠিক রাখতে, নির্লজ্জতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনধারণ করছেন/করতে চান — এমন একজনকে মুসলিম/মুসলিমাহদের সঙ্গী করতে চাওয়া উচিত। আর এমন মানুষদের জন্যই বিয়ের অপর নাম প্রশান্তি, উচ্ছ্বাস আর দয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক জীবন নিয়ে মানসিক কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। দেখলাম, ভালো লাগলো, প্রেম করো, ধুম করে বিয়ে করো — এই সবই ভুল চিন্তা ও কাজ যা অস্বাস্থ্যকর দাম্পত্য জীবনের সূচনা করে। একজন পশ্চিমা সাইকোলজিস্ট আর ম্যারিজ কাউন্সিলরের একটা লেখা পড়লাম যাতে তিনি জোর দিয়েছেন বিয়ের আগে থেকে বিবাহ পরবর্তী দ্বায়িত্বগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ব্যাপারে। পারিবারিক আর ব্যক্তিগত পরস্পরের দ্বায়িত্ব গ্রহণ ও পালন এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন হলো, আপনি কীভাবে জানেন যে আপনি আসলেই বিয়ে করতে প্রস্তুত? আর আরো সূক্ষ্মভাবে বললে, আপনি যে আপনার পছন্দ করা একজন নির্দিষ্ট মানুষকেই বিয়ে করতে প্রস্তুত তা কী করে নিশ্চিত হলেন? আপনি বিয়ের জন্য প্রস্তুত কিনা, এটা জানার জন্য আপনার নিজেকে জানা জরুরি। এই কারণে কিছু ব্যক্তিগত হিসাব করতে বসতে হবে নিজের ভালো দিকগুলো জানতে আর নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে। আপনার জানা দরকার আপনার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কেমন, আর আপনার সঙ্গী/সঙ্গিনীর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক আপনি কেমন আশা করেন?

- আপনি কি আসলেই আপনার জীবনটা অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি করতে প্রস্তুত?

- আপনি কি আপনার পরিবার গঠনের জন্য দ্বায়িত্ব নিতে, বিভিন্ন বিষয়ে কম্প্রোমাইজ করতে, সঙ্গী/সঙ্গিনীর সাথে একত্রে কাজ করতে, আপনার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য প্রস্তুত?
- বিয়ের পর পরিবারে আপনি কতটুকু অবদান রাখবেন সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা স্বাস্থ্যকর, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠন করতে আপনি কতখানি কী করতে পারবেন, করতে চান – সেটা জানাও জরুরি।

প্রস্তুত হওয়া

আপনি আসলেই বিয়ে করতে চান কিনা এবং বিয়ে করতে প্রস্তুত কিনা, তা জানার জন্য বিবাহপূর্ব প্রস্তুতির জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের পর সাংসারিক সম্পর্ক কেমন হতে পারে, সেই ব্যাপারে কিছু জ্ঞান ও ধারণা জানা যেতে পারে এই প্রচেষ্টার ফলে। পশ্চিমা বিশ্বে ধর্ম নির্বিশেষে প্রি ম্যারিটাল কাউন্সেলিং হয়ে থাকে।

আপনার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য তাগিদ এবং প্রয়োজনীয়তা আপনি এই চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বের করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। এছাড়া বেশিরভাগ মানুষকেই দেখা যায় তারা কী — এটা বুঝার আগেই তারা বিয়ে করে ফেলে, ফলে নানাবিধ জটিলতা হয়, অস্বস্তিকর পারিবারিক সম্পর্কের পেছনে এর ভূমিকা থাকে।

- আপনার বাচনভঙ্গী, শব্দচয়ন = মোটকথা কমিউনিকেশন স্কিল
- বাজেট করা এবং টাকাপয়সার হিসেব করা
- রাগকে সংযত করতে পারা
- আপনার সাথে কারো সমস্যা হলে কীভাবে তা সামলান
- সম্পর্কের টানাপোড়েন হলে সমাধান করার ব্যাপারে আপনি প্রস্তুতি

বিয়ের জন্য এই সবগুলোই খুব দরকারি গুণাবলী। তাই এইসব ব্যাপারে সম্ভব হলে কারো সাথে কাউন্সেলিং করে নেয়া উচিত।

সম্ভাব্য পছন্দ?

যখন কেউ সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী নির্বাচনের কাছাকাছি চলে আসেন, তখন থেকেই ইস্তিখারা নামায আদায় করা প্রয়োজন, পরিবারের এবং বন্ধুদের মাঝে যারা জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষ — তাদের সাথে আলাপ করা দরকার। আলাপ ও উপদেশের জন্য যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে এবং আচরণে উন্নত — এমন মানুষের পরামর্শই নেয়া দরকার। ইসলামে আল্লাহর স্মরণকারীদের মাঝে পরামর্শ খুবই কল্যাণময় এবং প্রয়োজনীয়।

বিয়ে হলো দ্বীনের অর্ধেক। এটি জীবনে নেয়া সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটা। তাই সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে, তার আচার-আচরণ সম্পর্কে, দ্বীনের ব্যাপারে তার অবস্থান, তার চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব খোঁজ নেয়া ভালো। আর তার স্বভাব, ব্যবহারের সাথে অপরজনের মিলবে কিনা, এটা নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে।

জীবনসঙ্গী পছন্দ করার আগে একটা কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয় — তার ধন সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়নতা। এক্ষেত্রে ধর্মপরায়ন স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও, তোমার হাত কল্যাণে ভরে যাবে।" [বুখারী ও মুসলিম]৫

বিয়ের পর দু'জন নতুন মানুষ একসাথে থাকতে শুরু করলে সহনশীলতা খুবই দরকার পড়ে। সবাই মূলতঃ কেবল নিজের *প্রাপ্তি* বা *আকাঙ্ক্ষা* নিয়ে ভাবতে থাকে বেশি করে, আর তাই প্রবঞ্চিত অনুভব করার সম্ভাবনা থাকে।

সমগ্র পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবার। পরিবারে অশান্তি থাকলে মুসলিম সমাজে অরাজকতা তৈরি হবে। পরিবারে শান্তি না থাকলে তা চরিত্র স্খলনের সম্ভাবনা তৈরি করে দেয়। পরিবারে প্রশান্তি না থাকলে সদস্যরা তাদের দ্বীনের দায়িত্বসমূহ পালনে উদাসীন এবং অমনোযোগী হয়ে পড়তে পারেন। আর তাই, এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম তরুণদের উচিত প্রেম করতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণার্থে চরিত্রকে রক্ষার জন্য চোখকে, মনকে সংযত করা। একজন সফল মু'মিন হতে হলে নিজেকে সংযত রাখা জরুরী। [৪] পাশাপাশি দরকার আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করা। একটা সুন্দর দু'আ হলো– "রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ক্বুররাতা আ'ইয়ুনিন ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাক্বিনা ইমামা"।

অর্থঃ "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।" [সূরা ফুরক্কানঃ ৭৪]

আল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাই এবং বোনদের সহায় হোন, তাদের রহম করুন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের যোগ্য করে দিন। সুন্দর সুন্দর পরিবার গঠনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কলুষতা থেকে মুক্ত থাকুক, নতুন প্রজন্মকে সত্যিকার দ্বীন উপহার দেয়ার যোগ্য হোক নতুন পরিবার গড়া মুসলিম মুসলিমাহরা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রহম করুন।

রেফারেন্স

[১] [ভিডিও] দি হেলদি ম্যারেজ :: নুমান আলী খান

[২] আল কুরআন – সূরা আল-বাকারাহ [১৮৭]

[প্রবন্ধ] অন ইসলাম ডট নেট :: Do You Really Want to Get Married?: Dr Aneesah Nadir

[ভিডিও] ইস্তিখারা কী ও কীভাবে :: আব্দুল নাসির জাংদা

[প্রবন্ধ] বিয়ের প্রস্তাবে করণীয় ও বর্জনীয়

[৩] [পরিসংখ্যান] Internet Pornography Statistics

[৪] আল কুরআন – সূরা মু'মিনুন [১-৬]

[৫] রিয়াদুস সলিহীন হাদিস – ৩৬৫

বিয়ের আগে যেসব বিষয়ে চিন্তা করে নেয়া উচিত

31 October 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

অনেকে বলেন, বিয়ের আগে প্রস্তুতি বা চিন্তাভাবনার আবার কি আছে? কিন্তু এখনকার সময়ে চারপাশে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় বিয়ের মাধ্যমে বন্ধনের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি ভাঙ্গনের ঘটনাও অনেক বেশি। বেশি বয়সে বিয়ে হওয়ায় অনেকেরই ব্যক্তিজীবনের অনেক স্বভাব, আচার-ব্যবহার আর চরিত্র আর পরিবর্তন হয় না বলে দু'জনের পার্থক্যগত ব্যবধান বাড়তেই থাকে -- একসময় তা বিবাহবিচ্ছেদে রূপ দেয়। যে মানুষ দু'জন অনেক আশা-স্বপ্ন নিয়ে বন্ধন গড়ছেন, তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাক -- এটা শয়তান ছাড়া আর কেউ চায় না। অবশ্য অনেক সময় অমিলের বিয়ের কারণে অন্যায়, অত্যাচার ও পাপের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে তাই বিচ্ছেদ অনেক ভালো সমাধান।

তবে আমরা তো মুসলিম ভাইবোনদের মাঝে সুন্দর বিয়ে হোক সেটাই চাই। তাই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে চিন্তা করে নিজেদেরকে গুছিয়ে নেয়া, চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে নেয়া, নিজের চাওয়া ও পাওয়াগুলো নিরীক্ষা করে আগালে স্বাস্থ্যকর একটি দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনে সুবিধা হবে বলে বিশ্বাস করি। এখনকার সময়ে যারা বলে যে বিয়ের আগে চিন্তাভাবনা করার তেমন কিছু নেই, তারা নিরেট মূর্খ এবং আকাট অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিয়ের ব্যাপারটা যদিও অনেক অনেক বিষয় মিলে হয়, তাতে দু'জন মানুষ এবং দু'টি পরিবারের বন্ধন হয় বলা যায়, তাই অনেক কিছুই খেয়াল করা প্রয়োজন। বিয়েতে মানুষের জীবনের, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা আলাদা বিষয় গুরুত্ব পেয়ে যায় -- কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং ছোট ছোট কিছু বিষয় তুলে ধরবো যেগুলো চিন্তা করলে আপনার জন্য চিন্তা করতে সুবিধা হবে ইনশা আল্লাহ।

১) আপনার চাওয়া ও আকাঙ্খা নিয়ে আলাপ করে নিন:

মানুষ হিসেবে আমাদের অনেকেরই অনেক চাওয়া আছে, যার সবগুলোতেই একজন মানুষ কম্প্রোমাইজ করতে পারে না। আপনি আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করুন। আপনি কোন বিষয়ে ছাড় দিতে পারবেন না আর কোন বিষয়গুলো আপনার পছন্দ তা বলুন। হয়ত পছন্দের সবই আপনি তার কাছ থেকে পাবেন না, অন্তত তিনি চেষ্টা করবেন। আর যেসব বিষয় রাতারাতি অর্জন করা যায় না এবং আপনি তাতে ছাড় দিতে পারবেন না -- এমন বিষয় থাকলে নিষ্পত্তি করে নিন। নয়ত বিয়ের পর এইসব নিয়ে সাংসারিক জটিলতা শুরু হবে।

২. দু'জনের সম্মিলিত উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করুন:

একজন মানুষের সাথে আপনি আপনার গোটা জীবনটা শেয়ার করতে যাচ্ছেন। আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করুন। তিন-চার বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান। আলাপ করুন আপনি ক'জন সন্তান পেতে চান। জীবনে কোন কাজগুলো আপনার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম হিসেবে নিজের কোন দক্ষতাগুলো আপনি দ্বীন প্রচারে ব্যবহার করতে চান, তা নিয়ে অপরজনের সাথে আলাপ করুন। উদ্দেশ্য নিয়ে এই আলাপ দু'জনকে জানতে ও পরস্পরের প্রতি ধারণা পরিস্কার করতে সাহায্য করবে।

৩. সুন্দর উপায়ে কথা বলা এবং দ্বন্দ্ব নিরসন করা শিখুন:

আপনার সুন্দর করে, গুছিয়ে আর সুন্দর শব্দ দিয়ে বলা কথাগুলা জীবনসঙ্গীর জন্য খুবই স্বস্তিকর হবে। প্রিয়জনকে কিছু সুন্দর অনুভূতি কি উপহার দিতে চাননা? সৌজন্যতা শিখুন। অনুশীলন করুন। অনেকসময় আপনার মন খারাপ থাকলে দেখবেন আপনার প্রিয় মানুষটার একটু কথাই আপনার হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেল করবে। আপনার মুখের কথা বলে দেয় আপনার হৃদয়ের কথাগুলো, তাই অন্তরকে পরিচ্ছন্ন আর ঝলমলে রাখুন। প্রিয়জনদের সাথে কথাবার্তায় আন্তরিকতা নিয়ে আসুন। বিষয়টাতে নজর দিন। সুন্দর কথা বলা মানুষের জীবনের এক অভাবনীয় কল্যাণ। বিষয়টাকে অবজ্ঞা করবেন না। হতে পারে আপনার চাঁছাছোঁলা কথার তীব্রতা আর ধার আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য কষ্টের কারণ হবে। হয়ত তিনি আপনার উপরে আগ্রহ হারাবেন। সেই খারাপ পরিস্থিতি আমরা নিশ্চয়ই চাইনা...

৪. জীবনসঙ্গীর দ্বীনদারী সম্পর্কে জেনে নিন:

যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তার সম্পর্কে ভেবে নেয়ার জন্য এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে আপনার অবহেলা, আপনার উপেক্ষা আপনাকে সীমাহীন আফসোসের দিকে ঠেলে দিবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না, সে আর কাউকে সমীহ করে না। যে আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে স্যাক্রিফাইস করে না জীবনে সে কখনই তার 'কমফোর্ট জোনের' বাইরে সংসারের জন্য বা আপনার জন্য তেমন

কিছুই করতে আগ্রহী হবে না। অন্যদিকে যে মানুষটা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে বদলে দিয়েছেন, নিজের পছন্দকে ত্যাগ করে আল্লাহর পছন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এমন মানুষ ইনশা আল্লাহ আপনার জীবনের জন্য কল্যাণকর হবে।

দ্বীনদারী দেখার অনেক উপায় থাকতে পারে, আছে। অভিজ্ঞ এবং স্কলাররা সেই বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, যে মানুষটির সাথে আপনার বিয়ের আলাপ শুরু হয়েছে, তার জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে চিনতে পেরে তিনি কতটুকু বদলেছেন নিজেকে, তা দেখে নিবেন। ধরুন কোন মানুষ হয়ত ছোট থেকেই দ্বীনের উপরে ছিলেন একটু-আধটু, তবুও যখন তিনি বুঝতে শিখলেন, তিনি অবশ্যই ইসলামকে নতুন এক মাত্রায় চিনবেন এবং সেই উপলক্ষে তার জীবনেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তবে এখনকার সময়ে আমাদের সমাজে যারাই ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তারা অনেক বেশি কষ্ট-যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের জীবনেও অজস্র পরিবর্তন এসেছে।

আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী পুরুষ হলে খোঁজ নিয়ে জেনে নিতে পারেন তিনি মসজিদে নামাজে নিয়মিত কিনা। কর্মস্থলে, ইউনিভার্সিটিতে ফরজ নামাজে কেউ নিয়মিত হলে পরিচিতরা তার সেই পরিচয় পেয়ে যান। একইভাবে একটা মুসলিমাহ মেয়ের হিজাব বা নিকাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তিনি এটা কীভাবে দেখেন তা জেনে নিবেন। ছেলে হলে দাড়ি রাখা সম্পর্কে তার মতামত শুনে নিতে পারেন। আপনার সম্ভাব্য সঙ্গীর মতামত জেনে নিতে পারেন মিউজিক সম্পর্কে, কনসার্ট, সুদী ব্যাংকিং, মেয়েবন্ধু বা ছেলেবন্ধু থাকার বিষয়ে, সেলেব্রিটি ও নায়ক-নায়িকা-মুভি নিয়ে। এছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা নিয়ে তিনি কী চিন্তা করেন, নিজে তিনি কীভাবে ইসলামের জন্য অবদান রাখতে চান সেইসম্পর্কে জেনে নিবেন।

ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ হলে জেনে নিতে পারেন তিনি কুরআন কতটুকু মুখস্ত পারেন। কুরআন নিয়ে তার স্বপ্ন কী এবং তার জন্য কতখানি কী করেছেন তিনি জীবনে। নামাজ এবং কুরআন নিয়ে ঢিলেমি থাকা কোন মুসলিমের উচিত নয়। এছাড়া মুসলিমদের বিয়ে সম্পর্কে তার পরিকল্পনা, মোহরানা, বিয়ে নিয়ে তার ধারণা। ছেলে হলে স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে এবং মেয়ে হলে স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে ইসলাম কী বলে তা তিনি জানেন কিনা তা জেনে নিবেন। দ্বীনদারী দেখেই বিয়ে করা উচিত। আল্লাহ আপনার দু'হাত কল্যাণে ভরে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

বিয়ের আগে যেসব বিষয়ে চিন্তা করে নেয়া উচিত

31 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

অনেকে বলেন, বিয়ের আগে প্রস্তুতি বা চিন্তাভাবনার আবার কি আছে? কিন্তু এখনকার সময়ে চারপাশে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় বিয়ের মাধ্যমে বন্ধনের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি ভাঙ্গনের ঘটনাও অনেক বেশি। বেশি বয়সে বিয়ে হওয়ায় অনেকেরই ব্যক্তিজীবনের অনেক স্বভাব, আচার-ব্যবহার আর চরিত্র আর পরিবর্তন হয় না বলে দু'জনের পার্থক্যগত ব্যবধান বাড়তেই থাকে -- একসময় তা বিবাহবিচ্ছেদে রূপ দেয়। যে মানুষ দু'জন অনেক আশা-স্বপ্ন নিয়ে বন্ধন গড়ছেন, তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যাক -- এটা শয়তান ছাড়া আর কেউ চায় না। অবশ্য অনেক সময় অমিলের বিয়ের কারণে অন্যায়, অত্যাচার ও পাপের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে তাই বিচ্ছেদ অনেক ভালো সমাধান।

তবে আমরা তো মুসলিম ভাইবোনদের মাঝে সুন্দর বিয়ে হোক সেটাই চাই। তাই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে চিন্তা করে নিজেদেরকে গুছিয়ে নেয়া, চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে নেয়া, নিজের চাওয়া ও পাওয়াগুলো নিরীক্ষা করে আগালে স্বাস্থ্যকর একটি দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনে সুবিধা হবে বলে বিশ্বাস করি। এখনকার সময়ে যারা বলে যে বিয়ের আগে চিন্তাভাবনা করার তেমন কিছু নেই, তারা নিরেট মূর্খ এবং আকাট অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিয়ের ব্যাপারটা যদিও অনেক অনেক বিষয় মিলে হয়, তাতে দু'জন মানুষ এবং দু'টি পরিবারের বন্ধন হয় বলা যায়, তাই অনেক কিছুই খেয়াল করা প্রয়োজন। বিয়েতে মানুষের জীবনের, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা আলাদা বিষয় গুরুত্ব পেয়ে যায় -- কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং ছোট ছোট কিছু বিষয় তুলে ধরবো যেগুলো চিন্তা করলে আপনার জন্য চিন্তা করতে সুবিধা হবে ইনশা আল্লাহ।

১) আপনার চাওয়া ও আকাঙ্খা নিয়ে আলাপ করে নিন:

মানুষ হিসেবে আমাদের অনেকেরই অনেক চাওয়া আছে, যার সবগুলোতেই একজন মানুষ কম্প্রোমাইজ করতে পারে না। আপনি আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করুন। আপনি কোন বিষয়ে ছাড় দিতে পারবেন না আর কোন বিষয়গুলো আপনার পছন্দ তা বলুন। হয়ত পছন্দের সবই আপনি তার কাছ থেকে পাবেন না, অন্তত তিনি চেষ্টা করবেন। আর যেসব বিষয় রাতারাতি অর্জন করা যায় না এবং আপনি তাতে ছাড় দিতে পারবেন না -- এমন বিষয় থাকলে নিষ্পত্তি করে নিন। নয়ত বিয়ের পর এইসব নিয়ে সাংসারিক জটিলতা শুরু হবে।

২. দু'জনের সম্মিলিত উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করুন:

একজন মানুষের সাথে আপনি আপনার গোটা জীবনটা শেয়ার করতে যাচ্ছেন। আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে আলাপ করুন। তিন-চার বছর পর আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান। আলাপ করুন আপনি ক'জন সন্তান পেতে চান। জীবনে কোন কাজগুলো আপনার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম হিসেবে নিজের কোন দক্ষতাগুলো আপনি দ্বীন প্রচারে ব্যবহার করতে চান, তা নিয়ে অপরজনের সাথে আলাপ করুন। উদ্দেশ্য নিয়ে এই আলাপ দু'জনকে জানতে ও পরস্পরের প্রতি ধারণা পরিস্কার করতে সাহায্য করবে।

৩. সুন্দর উপায়ে কথা বলা এবং দ্বন্দ্ব নিরসন করা শিখুন:

আপনার সুন্দর করে, গুছিয়ে আর সুন্দর শব্দ দিয়ে বলা কথাগুলা জীবনসঙ্গীর জন্য খুবই স্বস্তিকর হবে। প্রিয়জনকে কিছু সুন্দর অনুভূতি কি উপহার দিতে চাননা? সৌজন্যতা শিখুন। অনুশীলন করুন। অনেকসময় আপনার মন খারাপ থাকলে দেখবেন আপনার প্রিয় মানুষটার একটু কথাই আপনার হৃদয়কে আনন্দে উদ্বেল করবে। আপনার মুখের কথা বলে দেয় আপনার হৃদয়ের কথাগুলো, তাই অন্তরকে পরিচ্ছন্ন আর ঝলমলে রাখুন। প্রিয়জনদের সাথে কথাবার্তায় আন্তরিকতা নিয়ে আসুন। বিষয়টাতে নজর দিন। সুন্দর কথা বলা মানুষের জীবনের এক অভাবনীয় কল্যাণ। বিষয়টাকে অবজ্ঞা করবেন না। হতে পারে আপনার চাঁছাছোঁলা কথার তীব্রতা আর ধার আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য কষ্টের কারণ হবে। হয়ত তিনি আপনার উপরে আগ্রহ হারাবেন। সেই খারাপ পরিস্থিতি আমরা নিশ্চয়ই চাইনা...

৪. জীবনসঙ্গীর দ্বীনদারী সম্পর্কে জেনে নিন:

যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তার সম্পর্কে ভেবে নেয়ার জন্য এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে আপনার অবহেলা, আপনার উপেক্ষা আপনাকে সীমাহীন আফসোসের দিকে ঠেলে দিবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না, সে আর কাউকে সমীহ করে না। যে আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে স্যাক্রিফাইস করে না জীবনে সে কখনই তার 'কমফোর্ট জোনের' বাইরে সংসারের জন্য বা আপনার জন্য তেমন কিছুই করতে আগ্রহী হবে না। অন্যদিকে যে মানুষটা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে বদলে দিয়েছেন, নিজের পছন্দকে ত্যাগ করে আল্লাহর পছন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এমন মানুষ ইনশা আল্লাহ আপনার জীবনের জন্য কল্যাণকর হবে।

দ্বীনদারী দেখার অনেক উপায় থাকতে পারে, আছে। অভিজ্ঞ এবং স্কলাররা সেই বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, যে মানুষটির সাথে আপনার বিয়ের আলাপ শুরু হয়েছে, তার জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে চিনতে পেরে তিনি কতটুকু বদলেছেন নিজেকে, তা দেখে নিবেন। ধরুন কোন মানুষ হয়ত ছোট থেকেই দ্বীনের উপরে ছিলেন একটু-আধটু, তবুও যখন তিনি বুঝতে শিখলেন, তিনি অবশ্যই ইসলামকে নতুন এক মাত্রায় চিনবেন এবং সেই উপলক্ষে তার জীবনেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তবে এখনকার সময়ে আমাদের সমাজে যারাই ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন, তারা অনেক বেশি কষ্ট-যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের জীবনেও অজস্র পরিবর্তন এসেছে।

আপনার সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী পুরুষ হলে খোঁজ নিয়ে জেনে নিতে পারেন তিনি মসজিদে নামাজে নিয়মিত কিনা। কর্মস্থলে, ইউনিভার্সিটিতে ফরজ নামাজে কেউ নিয়মিত হলে পরিচিতরা তার সেই পরিচয় পেয়ে যান। একইভাবে একটা মুসলিমাহ মেয়ের হিজাব বা নিকাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তিনি এটা কীভাবে দেখেন তা জেনে নিবেন। ছেলে হলে দাড়ি রাখা সম্পর্কে তার মতামত শুনে নিতে পারেন। আপনার সম্ভাব্য সঙ্গীর মতামত জেনে নিতে পারেন মিউজিক সম্পর্কে, কনসার্ট, সুদী ব্যাংকিং, মেয়েবন্ধু বা ছেলেবন্ধু থাকার বিষয়ে, সেলেব্রিটি ও নায়ক-নায়িকা-মুভি নিয়ে। এছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা নিয়ে তিনি কী চিন্তা করেন, নিজে তিনি কীভাবে ইসলামের জন্য অবদান রাখতে চান সেইসম্পর্কে জেনে নিবেন।

ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ হলে জেনে নিতে পারেন তিনি কুরআন কতটুকু মুখস্ত পারেন। কুরআন নিয়ে তার স্বপ্ন কী এবং তার জন্য কতখানি কী করেছেন তিনি জীবনে। নামাজ এবং কুরআন নিয়ে ঢিলেমি থাকা কোন মুসলিমের উচিত নয়। এছাড়া মুসলিমদের বিয়ে সম্পর্কে তার পরিকল্পনা, মোহরানা, বিয়ে নিয়ে তার ধারণা। ছেলে হলে স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে এবং মেয়ে হলে স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে ইসলাম কী বলে তা তিনি জানেন কিনা তা জেনে নিবেন। দ্বীনদারী দেখেই বিয়ে করা উচিত। আল্লাহ আপনার দু'হাত কল্যাণে ভরে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

যদি মনে করেন বিয়ের আগে প্রস্তুতি দরকার নেই তবে যেসব ক্ষতি হতে পারে !

29 October 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

বিয়ের আগে সত্যিই অনেক প্রস্তুতি দরকার। যারা মনে করেন প্রস্তুতি ছাড়াই বিয়ে করলে সমস্যা নেই,তারা এখনকার সময়ে চারিদিকে দাম্পত্য কলহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের পরিমাণ দেখলেই বুঝতে পারবেন মানুষে মানুষে অমিলগুলো এখন সংসারে সহাবস্থানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাই হোক, বিয়ের মূল প্রস্তুতিটা মানসিক, তবে এর সাথে আরো অনেক কিছুই চলে আসে। আপনাকে ফোকাসড হতে হবে। আবেগ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আপনাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, আপনি কি আসলেই আপনার জীবনটা আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে প্রস্তুত?

বিয়েতে যদি মনে করেন আরেকজন কেবল আপনাকে 'সার্ভিস' দিবে, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ভুলের উপরে আছেন যা আপনাকে অশান্তি এনে দিবে নিশ্চিতভাবে। ঠিক উল্টোটা যদি হয়, আপনি যদি আরেকজনকে কী কী 'কর্তব্য' পালন করে দিবেন তা চিন্তা করেন, এবং সেই কর্তব্য সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে যখন নিজের অভ্যাসগুলো নিয়ে ভাবতে পারবেন -- তখন আপনি কিছুটা বুঝতে পারবেন আপনার এখনকার আপনি মানুষটার সীমাবদ্ধতাটুকু। এই চিন্তাটুকু করে যদি তেমন কিছুই বের করতে না পারেন, নিশ্চিত থাকুন আপনি এখনও তেমন কিছুই বুঝেননি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে।

বিয়ের মাঝে আল্লাহ অনেক প্রশান্তি, আনন্দ ও দয়া রেখেছেন। কিন্তু একজন মানুষ কিন্তু মূলত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সংসার শুরু করে। একজন পুরুষ যখন বিয়ে করে, তখন সে তার স্ত্রী হওয়া নারীটির বাকি জীবনের সম্পূর্ণটার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। চিন্তা করে দেখেছেন তো আপনি কত বিশাল দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন? একইভাবে, একজন নারী যখন তার স্বামীর সংসারে যান, তিনি তার স্বামীর সংসারটির কর্ত্রী হয়ে তিনি সেই স্বামীর পরম বন্ধু হয়ে তার দেখাশোনা এবং মা হয়ে তার সংসারের সকল সন্তানদের জন্মদান এবং তাদের বড় করার মতন কিছু বিষয় কাঁধে নিয়ে ফেলেন। বিয়ের মূহুর্তটির পর থেকে এই ধাপগুলোসহ আরো অজস্র বিষয় অবধারিতভাবেই একজন পুরুষ বা নারীর কাঁধে চেপে বসে।

তাই, বিয়ে নিঃসন্দেহে অবহেলা বা হালকা করে নেয়ার বিষয় নয়। আপনার জীবনের সম্ভাব্য সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তগুলোর একটি এই বিয়ে। সুতরাং, বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে আবেগের চেয়ে একটু মাথা ঠান্ডা করে নিজের যোগ্যতা নিয়ে ভাবুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আপনাকে অনেক গুণ দিয়েছেন এবং অবশ্যই আপনি আরো কিছু সীমাবদ্ধতা নিয়ে আছেন। কী করলে আপনি নিজেকে উন্নত করতে পারবেন, কীভাবে সেই সংসার জীবনে শান্তি আনতে পারবেন সেই চিন্তা করে কাজ করতে থাকুন।

তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিয়ে করবেন যাকে, তার কিছু স্বভাব এবং আচার-আচরণ আছে, যা আপনার চেয়ে ভিন্ন হবে। তার কথাবার্তার বিষয় এবং ভালোলাগার বিষয়েও প্রচুর অমিল থাকবেই। তার পরিবার থাকবে, সেই পরিবারের প্রতি তার প্রচুর কর্তব্য থাকবে, আবেগ এবং জটিলতা থাকবে। যেই আপনি কথাবার্তা ভিন্ন হওয়ার কারণে অনেক বন্ধুদেরকে এড়িয়ে চলেছেন, সেই আপনি কি প্রায় পুরো অচেনা মানুষটির গোটা জীবনটাকে আপনি মেনে নিয়ে সম্ভাব্য কর্তব্যটুকু করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত তো?

এই প্রস্তুতিগুলো না থাকলে দেখা যাবে আপনি হয়ত এমন কিছু আচরণ করে বসবেন যাতে আপনার সেই স্বামী বা স্ত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হবেন। তার সেই প্রতিক্রিয়া থেকেই হতে পারে আপনার সংসারের অশান্তির শুরু। তাই ((যদি বিয়ে করতেই চান)) ব্যক্তিগত চরিত্র, চিন্তার ধরণ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মীতা, সচেতনতা, পরোপকারিতা, দায়িত্ববোধ নামক গুণগুলো যথাসম্ভব অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন!!

আল্লাহ আমাদেরকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলে দেন না যা আমাদের সমাধানের অতীত। এই বিষয়গুলোও অসম্ভব নয়। তবে, যদি কল্যাণ চান, যদি সুন্দর একটি দাম্পত্য জীবন আশা করেন, যদি সুখী পরিবার কামনা করেন তাহলে

আপনাকে অবশ্যই এইসব কিছু বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। একটুখানি ভাবুন, নিজেকে নিয়ে কাজ করুন, প্রস্তুত হোন -- ইনশা আল্লাহ আপনি কল্যাণপ্রাপ্ত হবেন।

সবচেয়ে বড় কথা, আমরা কিছুই করতে পারিনা যদি আল্লাহ সাহায্য না করেন, যদি আল্লাহ কবুল না করেন। তাই, আল্লাহর কাছে খুব বেশি করে দোয়া করুন। দোয়া একটি ইবাদাত, দোয়া ঈমানদারদের জন্য এক অব্যর্থ অস্ত্র যা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদের উত্তম স্বামী/স্ত্রী হবার এবং পাওয়ার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্দর একটি সমাজ গঠনের তাওফিক দান করুন।

দাম্পত্যজীবন, অজ্ঞতা ও পরিণাম

1 August 2015

সংকলনেঃ সাবেত বিন মুকতার

২০১২ সালের শা'বান মাসে এক মজলিসে এক বিশেষ উপলক্ষে দেশের একজন জনপ্রিয় আলিম মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ হুজুরের দাম্পত্যজীবনের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

[মাসিক আল কাউসার পত্রিকায় প্রকাশিত আর্টিকেল থেকে সংগৃহীত ও কিছুটা সংযোজিত]

কিছুদিন আগে আমার এক প্রিয় তালিবে ইলম দেখা করতে এসে বললো, হুযূর, আগামী পরশু আমার বিবাহ। চমকে উঠে তাকালাম। বড় 'বে-চারা' মনে হলো। কারণ আমিও একদিন বড় অপ্রস্তুত অবস্থায় জেনেছিলাম, আগামীকাল আমার বিবাহ! ভিতর থেকে হামদরদি উথলে উঠলো। ইচ্ছে হলো তাকে কিছু বলি, যিন্দেগির এই নতুন রাস্তায় চলার

জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পাথেয়, আল্লাহর তাওফীকে তাকে দান করি। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া আমরা কেই বা কী করতে পারি!

তো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিবাহের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো? বড় ভোলাভালা নও জোয়ান! সরলভাবে বললো, আমার কিছু করতে হয়নি, সব প্রস্তুতি আব্বা -আম্মাই নিয়েছেন। কেনা-কাটা প্রায় হয়ে গেছে, শুধু বিয়ের শাড়ীটা বাকি।

অবাক হলাম না, তবে দুঃখিত হলাম, আমার এই প্রিয় তালিবে ইলম এখন একজন যিম্মাদার আলিমে দ্বীন। দীর্ঘ কয়েক বছর আমাদের ছোহবতে ছিলো, তার কাছে বিবাহের প্রস্তুতি মানে হলো জিনিসপত্র এবং বিয়ের শাড়ী! তাহলে অন্যদের অবস্থা কী?!

বড় মায়া লাগলো; বললাম, দেখো, মানুষ যে কোন কাজ করতে চায়, প্রথমে সে ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। কাজটির হাকীকত ও উদ্দেশ্য কী? কাজটি আঞ্জাম দেয়ার সঠিক পন্থা কী? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী সমস্যা হতে পারে, সেগুলোর সমাধান কী? এগুলো জেনে নেয়। এজন্য দস্তুর মত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার আয়োজন আছে, এমনকি বাস্তব প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে।

অথচ জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল অধ্যায়ে মানুষ প্রবেশ করে, বরং বলতে পারো ঝাঁপ দেয়, কিছু না শিখে, না জেনে এবং না বুঝে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়। ফল কী হতে পারে? কী হয়?! অন্যদের কথা থাক, চোখের সামনে আমার ক'জন ছাত্রের ঘর ভেঙ্গে গেলো! একজনের তো এমনকি দু'জন সন্তানসহ। কিংবা ঘর হয়ত টিকে আছে, কিন্তু শান্তি নেই। স্বাভাবিক শান্তি হয়ত বজায় আছে, কিন্তু বিবাহ যে দুনিয়ার বুকে মানবের জন্য আল্লাহর দেয়া এক জান্নাতি নেয়ামত, সুকূন ও সাকীনাহ, সে খবর তারা পায়নি, শুধু অজ্ঞতার কারণে, শুধু শিক্ষার অভাবে।

আশ্চর্য, মা-বাবা সন্তানকে কত বিষয়ে কত উপদেশ দান করেন; উস্তাদ কত কিছু শিক্ষা দেন, নছীহত করেন, কিন্তু জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও জটিল বিষয়টি কেন যেন তারা সযত্নে এড়িয়ে যান!

তাকে বললাম, যদিও তুমি এ উদ্দেশ্যে আসোনি তবু তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই, যা ইনশাআল্লাহ আগামী জীবনে তোমার কাজে আসবে।

খুব জযবা ছিলো, অবেগের তোড় ছিলো, 'দিল কো নিচোড় কার', বাংলায় যদি বলি তাহলে বলবো, হৃদয় নিংড়ে, কিন্তু দিল কো নিচোড়না-এর ভাব হৃদয় নিংড়ানোতে আসবে কোত্থেকে! যাক, বলছিলাম, হৃদয়টাকে নিংড়ে কিছু কথা তাকে বলেছিলাম। পরে আফসোস হলো যে, কথাগুলো তো সব হাওয়ায় উড়ে গেলো, যদি বাণীবদ্ধ করে রাখা যেতো কত ভালো হতো! হয়ত আল্লাহর বহু বান্দার উপকারে আসতো। শেষে বললাম, এক কাজ করো, এ কথাগুলোর খোলাছা কাগজে লিখে আমাকে দেখিও।

আগামী পরশুর বিয়ের খবর দিয়ে ছেলেটা সেই যে গেলো, তিন বছরে আর দেখা নেই! দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময় দরসেও আমি অনেক কথা বলেছি। সবচেয়ে বেশী বলেছি আমার নূরিয়ার জীবনের প্রিয় ছাত্র (বর্তমানের হাতিয়ার হুযূর) মাওলানা আশরাফ হালীমীকে, আশা করি তিনি সাক্ষ্য দেবেন, অনেকবার বলেছেন, আমার কথাগুলো তার জীবনে বহু উপকারে এসেছে। আরো অনেকে বলেছে, কিন্তু কথাগুলো কেউ 'কলমবন্দ' করেনি।

তো এখন এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তোমাদের মজলিসে ঐ কথাগুলো আবার বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আফসোস, সেই আবেগ ও জযবা তো এখন নেই যা ঐ প্রিয় তালিবে ইলমকে বলার সময় ছিলো। আবেগ ভরা দিলের কথা তো রসভরা ইক্ষু, আর শুধু চিন্তা থেকে বলা কথা হলো রস নিংড়ে নেয়া ইক্ষুর ছোবা! তবু কিছু না কিছু ফায়দা তো ইনশাআল্লাহ হবে।

আমি আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বলেছিলাম, এখন তোমার জীবনের এই যে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে উর্দূতে এটাকে বলে ইযদিওয়াজী যিন্দেগী, বাংলায় বলে দাম্পত্য জীবন, অর্থাৎ এটা জীবন ও যিন্দেগির খুবই এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এটা তোমাকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্য বলছি না; প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও পাথেয় সংগ্রহ করার জন্য বলছি, যাতে পূর্ণ আস্থা ও সাহসের সঙ্গে তুমি তোমার এই নতুন জীবন শুরু করতে পারো। আল্লাহ যদি সাহায্য করেন তাহলে সবই সহজ।

এটা যে শুধু তোমার ক্ষেত্রে হচ্ছে তা নয়! আমার জীবনেও হয়েছে, আমার মা-বাবার জীবনেও হয়েছে! তোমার মা-বাবাও একদিন এ জীবন শুরু করেছিলেন। যদি সহজ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে তাহলে তোমার মাকে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কীভাবে তারা এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন? জীবনের শুরুতে তারা কী ভেবেছিলেন, কী চেয়েছিলেন, কী পেয়েছেন?

কখন কী সমস্যা হয়েছে, সেগুলো কীভাবে সমাধান করেছেন। এই জীবনের শুরুতে তোমার প্রতি তাদের কী উপদেশ? এ ধরনের সহজ আন্তরিক আলোচনায় সংসার জীবনের পথচলা অনেক সহজ হয়ে যায়। অবশ্য সব মা-বাবার সঙ্গে সব সন্তানের এমন সহজ সম্পর্ক থাকে না, তবে থাকা উচিত। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সন্তান মা-বাবার কাছেই আসবে, মা-বাবাকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করবে, বন্ধুবান্ধবকে নয়। কঠিন সমস্যার মুখে একজন অপরিপক্ক বন্ধু কীভাবে সঠিক পথ দেখাতে পারে! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই ঘটে। সন্তান মা-বাবাকে ভয় করে, হয়ত কোন জটিলতায় পড়েছে; তখন তাদের প্রথম চেষ্টা হয় যে, মা-বাবা যেন জানতে না পারে, কারণ তাদের কানে গেলে সর্বনাশ! ছেলে তার বন্ধুর শরণাপন্ন হয়, মেয়ে তার বান্ধবীর কাছে বলে, তারা তাদের মত করে পরামর্শ দেয়। ফলে অবস্থা আরো গুরুতর হয়।

অতীতে যাই ছিলো, এখন তো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, মা-বাবার জন্য সন্তানের বন্ধু হওয়া। বিপদে সমস্যায় সন্তানকে তিরস্কার পরে করা, আগে তার পাশে দাঁড়ানো। তাহলে সন্তান আরো বড় অন্যায় করা থেকে এবং আরো গুরুতর অবস্থায় পড়া থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু এখন অবস্থা হলো, সন্তান মা-বাবাকে ভয় করে, বন্ধুকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে। আমার ছেলেকে আমি এটা বোঝাতে চেয়েছি এবং আশা করি, কিছুটা বোঝাতে পেরেছি। অনেক সমস্যা থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, কারণ সবার আগে সে আমার কাছে এসেছে, আর আমি বলেছি, ভয় নেই, আমি তোমার পাশে আছি। আগে তাকে সাহায্য করেছি, তারপর প্রয়োজনে দরদের সঙ্গে তিরস্কার করেছি, বা শিক্ষা দিয়েছি। বন্ধুর কাছে আগে পাওয়া যায় সাহায্য, মা-বাবার কাছ থেকে আগে আসে তিরস্কার। তাই সন্তান সমস্যায় পড়ে মা-বাবার কাছে আসে না, বন্ধুর কাছে আসে। এভাবে নিজের কারণেই সবচেয়ে কাছের হয়েও মা-বাবা হয়ে যায় দূরের, আর দূরের হয়েও বন্ধু হয়ে যায় কাছের। সন্তানের সমস্যা বন্ধু জানে সবার আগে। মা-বাবা জানে সবার পরে, পানি যখন মাথার উপর দিয়ে চলে যায় তখন।

তো আমি আশা করছি, জীবনের অন্যসকল ক্ষেত্রে যেমন তেমনি, আল্লাহ না করুন দাম্পত্যজীবনে যদি কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে সন্তান সবার আগে আমার কাছে আসবে, তার মায়ের কাছে আসবে, আমাদের উপদেশ, পরামর্শ নেবে। আলহামদু লিল্লাহ, সেই রকমের সহজ অন্তরঙ্গ সম্পর্কই সন্তানের সঙ্গে আমার, আমাদের।

আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বললাম, কথা অন্য দিকে চলে গেছে, তো এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটি আগাম নাসিহাত করি; আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী, দু'দিন পরেই হয়ে যাবে, মা এবং বাবা। সেটা তো জীবনের আরো কঠিন, আরো জটিল অধ্যায়। আমি প্রায় বলে থাকি, প্রাকৃতিক নিয়মে মা-বাবা হয়ে যাওয়া খুব সহজ। কিন্তু আদর্শ মা-বাবা হওয়ার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ শিক্ষা ও দীক্ষা। তো তোমরা দু'জন জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করো যে, একটি মেয়ে কীভাবে একজন আদর্শ মা হতে পারে এবং একটি ছেলে কীভাবে একজন আদর্শ বাবা হতে পারে! আগে বলেছিলাম একটি নাসিহাত, এখন বলছি দু'টি নাসিহাত।

সন্তানের সামনে কখনো তার মাকে অসম্মান করো না। তোমাকে মনে রাখতে হবে, সে তোমার স্ত্রী, কিন্তু তোমার সন্তানের মা, তোমার চেয়েও অধিক শ্রদ্ধার পাত্রী। সন্তান যেন কখনো, কখনোই মা-বাবাকে ঝগড়া-বিবাদ করতে না দেখে। এ নাসিহাত আমি তোমাকে করছি, আল্লাহর শোকর নিজে আমল করি। আমার বড় সন্তানের বয়স ত্রিশ বছর, এর মধ্যে কখনো সে আমাদের বিবাদ করতে এমনকি তর্ক করতেও দেখেনি। দ্বিতীয়ত তোমরা উভয়ে সন্তানের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করো, এমন বন্ধু যাকে নিজের মনের কথা, সব কথা নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারে।

আগের কথায় ফিরে আসি; আগামী পরশু তোমার বিবাহ। তার মানে, আজ তুমি নিছক একটি যুবক ছেলে, অথচ আগামী পরশু হয়ে যাচ্ছো, একজন দায়িত্ববান স্বামী। কত বিরাট পার্থক্য তোমার আজকের এবং আগামী পরশুর জীবনের মধ্যে। বিষয়টি তোমাকে বুঝতে হবে। কেন তুমি বিবাহ করছো? বিবাহের উদ্দেশ্য কী? দেখো, আমাদের দেশে পারিবারিক পর্যায়ে একটা নিন্দনীয় মানসিকতা হলো, সংসারের প্রয়োজনে, আরো খোলামেলা যদি বলি, কাজের মানুষের প্রয়োজনে ছেলেকে বিয়ে করানো। সবাই যে এমন করে তা নয়, তবে এটা প্রবলভাবে ছিলো, এখনো কিছু আছে। আমি নিজে সাক্ষী, আমার একজন মুহতারাম তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিলেন, বিয়ে হওয়া মাত্র ছেলের বাবা স্বমূর্তি ধারণ করে বলতে লাগলেন, আর দেরী করা যাবে না, তাড়াতাড়ি মেয়ে বিদায় করেন। মেয়ের মা ও বাবা তো হতবাক!

মেয়ে বিদায় হলো। শ্বশুরবাড়ীতে রাত পোহালো, আর পুত্রবধুর সামনে কাপড়ের স্তুপ নিক্ষেপ করে শাশুড়ী আদেশ করলেন, কাপড়ে সাবান লাগাও, দেখি, মায়ের বাড়ী থেকে কেমন কাজ শিখে এসেছো!

আমার এক ছাত্রের কথা, বিয়ের প্রয়োজন। কেন? কারণ মা-বাবার খেদমত করার কেউ নেই।

এটা কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য বা মাকছাদ হতে পারে না। মা-বাবার খেদমত মূলত তোমার দায়িত্ব। এখন সে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমার সাথে এতে শরীক হয়, তবে সেটা তোমাদের উভয়ের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে। দেখো, আল্লাহ চাহে তো অচিরেই আমাদেরও ঘরে পুত্রবধু আসবে। আমরা আমাদের না দেখা সেই ছোট্ট মেয়েটির প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আমি আমার পুত্রকে অবশ্যই বলবো, বিবাহের উদ্দেশ্য মা-বাবার খেদমত করা হতে পারে না।

আমি দু'আ করি, তোমার মা-বাবা তোমার যেমন, তেমনি তোমার স্ত্রীরও যেন মেহেরবান মা-বাবা হতে পারেন। আমার দুই মেয়ের শশুর, দু'জনই এখন জান্নাতবাসী (ইনশাআল্লাহ)। আল্লাহর কাছে আমার সাক্ষ্য এই যে, সত্যি সত্যি

তারা আমার মেয়ে দু'টির 'বাবা' ছিলেন। আমার ছোট মেয়ের শশুর বড় আলিম ছিলেন, তাঁকে আমার একটি বই হাদিয়া দিয়েছিলাম এভাবে, 'সাফফানার আব্বুর পক্ষ হতে সাফফানার আব্বাকে'। তিনি খুশী হয়ে অনেক দু'আ করেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'আপনি তো এই ছোট্ট একটি বাক্যে সম্পর্কের মহামূল্যবান এক দর্শন তুলে ধরেছেন!

আমার বড় মেয়ের অবস্থা হলো, মায়ের বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় সে কাঁদে না, কাঁদে 'আম্মার' বাড়ী থেকে আসার সময়। দুআ' করি, আমার দেশের প্রতিটি মেয়ে যেন মা-বাবার ঘর থেকে এমন মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করতে পারে। আর তুমি দু'আ করো, আমরা দু'জন যেন আমাদের অনাগত মেয়েটির জন্য তেমন মা-বাবাই হতে পারি।

তো বলছিলাম বিবাহের উদ্দেশ্যের কথা। বৈধ উপায়ে স্ত্রী পরিচয়ে কাউকে ভোগ করা, এটাও বিবাহের উদ্দেশ্য বা মাকছাদ হতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে বলা হয় শরীকে হায়াত, জীবনসঙ্গী এবং জীবনসঙ্গিনী। বস্তুত এই শব্দটির মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের সুমহান উদ্দেশ্যটি নিহিত রয়েছে। আর যদি কোরআনের ভাষায় বলি তাহলে বিবাহের উদ্দেশ্য হল,

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।" [সূরা বাকারাঃ ১৮৭]

তুমি তো কোরআন বোঝো। ভেবে দেখো, দাম্পত্য-সম্পর্কের কী গভীর তাৎপর্য এখানে নিহিত! পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নত। আর বলেছেন, যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হবে সে আমার উম্মতভুক্ত নয়। বিবাহ নবীর সুন্নত! সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, বিরাট ও মহান কোন মাকছাদ রয়েছে এর পিছনে।

বিবাহের আসল মাকছাদ বা উদ্দেশ্য হলো স্বামী ও স্ত্রী- এই পরিচয়ে একটি নতুন পরিবার গঠন করা এবং মা ও বাবা- এই পরিচয়ে সন্তান লাভ করা। তারপর উত্তম লালন-পালন এবং আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের মাধ্যমে নেক সন্তানরূপে গড়ে তুলে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করা, যাতে মানববংশ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পছন্দমত আগে বাড়তে থাকে।

এটাই হলো বিবাহের আসল উদ্দেশ্য; অন্য যা কিছু আছে তা সব পার্শ্ব-উদ্দেশ্য। তো এখনই তুমি নিয়ত ঠিক করে নাও যে, কেন কী উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে। উদ্দেশ্য যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে দেখতে পাবে, আল্লাহ চাহে তো এখনই তোমার ভিতরে কত সুন্দর পরিবর্তন আসছে! কী আশ্চর্য এক পরিপূর্ণতা নিজের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে! আগামী জীবনের সকল দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য গায়ব থেকে তুমি আত্মিক শক্তি লাভ করছো। আল্লাহ তাওফীক দান করেন।

এবার আসো জীবনের বাস্তবতার কথা বলি, এতদিন তোমার জীবনে ছিলেন শুধু তোমার মা, যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসব বেদনা ভোগ করেছেন। নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে তোমাকে প্রতিপালন করেছেন। এতদিন তোমার উপর ছিলো তাঁর অখন্ড অধিকার। হঠাৎ তিনি দেখছেন, তাঁর আদরের ধন, তাঁর আঁচলের রত্ন পুত্রের জীবনে স্ত্রী পরিচয়ে অন্য এক নারীর প্রবেশ (অনুপ্রবেশ?) ঘটেছে! এভাবে পুত্রের উপর তার অখন্ড অধিকার খন্ডিত হতে চলেছে। যে পুত্র ছিলো এতদিন তাঁর একক অবলম্বন, এখন সে হতে চলেছে অন্য এক নারীর অবলম্বন। এ বাস্তবতা না তিনি অস্বীকার করতে পারছেন, না মেনে নিতে পারছেন। সংসারে প্রত্যেক মায়ের জীবনে এ কঠিন সময়টি আসে। এমন এক অর্ন্তজ্বালা শুরু হয় যা শুধু তিনি নিজেই ভোগ করেন, কাউকে বোঝাতে পারেন না, এমনকি এতদিনের আদরের ধন পুত্রকেও না। ফলে সামান্য সামান্য কারণে, এমনকি অকারণেও তিনি খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়েন; তাঁর অনুভূতি আহত হয়। এমন সময় ছেলে (এবং তার স্ত্রী অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও অপিরপক্কতার কারণে) যদি অসঙ্গত কিছু বলে বা করে বসে তাহলে তো মায়ের মনে কষ্টের শেষ থাকে না। প্রসববেদনা থেকে শুরু করে প্রতিপালনের সব কষ্ট একসঙ্গে মনে পড়ে যায়।

আম্মার কাছে শুনেছি, গ্রামের এক মা তার পুত্রবধুকে বলেছিলেন, 'ততা ফানি আমি খাইছিলাম, না তুই খাইছিলি?'

তখনকার যুগে প্রসব পরবর্তী বেশ কিছু দিন মা ও শিশুর স্বাস্থ্যগত কল্যাণ চিন্তা করে মাকে গরম পানি খেতে দেয়া হতো, ঠান্ডা পানি দেয়া হতো না। তো কথাটা কিন্তু নির্মম। আমার জন্য 'তাতানো পানি' আমার মা খেয়েছেন, আমার সব আবর্জনা আমার মা পরিস্কার করেছেন। নিজের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে তিনি আমাকে বড় করেছেন, উপযুক্ত করেছেন। সেই সব কষ্টের সুফল হঠাৎ করে অন্য একটি মেয়ে এসে অধিকার করে বসেছে। তখন সব হারানোর একটা বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। তো তোমার মায়ের অন্তরেও এরকম অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। মায়ের মনের এই কষ্টের উপশম, এই বেদনার সান্ত্বনা তোমাকেই চিন্তা করতে হবে।

মায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে বাবার কথা, তারপর ভাই-বোনদের কথা। (এসম্পর্কেও ছাত্রটিকে বিশদভাবে বলেছিলাম।)

তৃতীয়ত তোমার স্ত্রী। যদিও তৃতীয় বলছি, কিন্তু বাস্তবে এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নাজুক। তবে এটা থাকবে তোমার দিলে, তোমার অন্তরে। মা-বাবার সামনে মুখের কথায় বা আচরণে এটা প্রকাশ করা প্রজ্ঞার পরিচায়ক হবে না।

কেন বলছি স্ত্রীর বিষয়টি সবচেয়ে নাজুক? তার আগে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও; কোন বিবাহে কোন ছেলেকে কাঁদতে দেখেছো?! কোন ছেলের মা-বাবাকে বিষণ্ন দেখেছো?! দেখোনি; (হয়তো ব্যতিক্রম এক দুইটি ঘটনা থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থা এটিই, এদের কেউ কাঁদে না।) কেন? কারণ বিবাহের মাধ্যমে ছেলে কিছু হারায় না, ছেলের মা-বাবা কিছু হারায় না, বরং অর্জন করে। তাই তাদের মুখে থাকে অর্জনের হাসি এবং প্রাপ্তির তৃপ্তি।

বিবাহের আসরে কাঁদে শুধু মেয়ে, আর মেয়ের মা-বাবা। কেন কাঁদে একটি মেয়ে? কারণ তাকে সবকিছু হারাতে হয়, সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। মা-বাবাকে ছেড়ে আসতে হয়, শৈশবের সব স্মৃতি তাকে মুছে ফেলতে হয়। একটি ছোট্ট

মেয়ের জীবনে এটি অনেক বড় আঘাত। এ যেন একটি ছোট্ট গাছের চারাকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে বহু দূরে ভিন্ন পরিবেশে নতুন মাটিতে এনে রোপণ করা। বাকি জীবন তাকে এই মাটি থেকেই রস আহরণ করে বেঁচে থাকতে হবে।

হিন্দিতে বলে, 'আওর‍্যত কী ডোলী যাহা উত্যরতী হ্যয়, উসকী আর্থী ওহী সে উঠতি হ্যয়।' অর্থাৎ মেয়েদের পালকি যেখানে গিয়ে নামে, সেখান থেকেই তার জানাযা ওঠে।

কত বড় নির্মম সত্য! তো তোমার স্ত্রীরূপে তোমার ঘরে আসা এই ছোট্ট মেয়েটির যখমি দিলে তাসাল্লির মরহম তোমাকেই রাখতে হবে। এক মাটি থেকে উপড়ে এনে আরেক মাটিতে রোপণ করা একটি চারাগাছ থেকে দু'দিন পরেই ফল দাবী করা কতটা নিষ্ঠুরতা! ফল পেতে হলে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। চারা গাছটির পরিচর্যা করতে হবে, সকাল-সন্ধ্যা তার গোড়ায় পানি দিতে হবে। ধীরে ধীরে শিকড় যখন মাটিতে বসবে এবং মাটি থেকে রস সংগ্রহ করার উপযুক্ত হবে, তখন তোমাকে ফল চাইতে হবে না; সজীব বৃক্ষ নিজে থেকেই ফল দিতে শুরু করবে।

কত আফসোসের বিষয়, দাম্পত্য জীবনের শুরুতে যত আদেশ-উপদেশ সব ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বর্ষিত হয়। প্রথম দিনেই তাকে শুনতে হয়, এখন থেকে তাকে স্বামীর মন জয় করতে হবে, শশুর-শাশুড়িকে সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে, শশুর বাড়ীর সবার মন যুগিয়ে চলতে হবে। তার নিজের যেন কোন 'মন' নেই। সুতরাং সেটা জয় করারও কারো গরজ নেই।

তো মায়ের মন তোমাকেই রক্ষা করতে হবে, আবার স্ত্রীর মনোরঞ্জনও তোমাকেই করতে হবে। সবদিক তোমাকেই শামাল দিয়ে চলতে হবে। কত কঠিন দায়িত্ব! অথচ না শিক্ষাঙ্গনে, না গৃহপ্রাঙ্গণে, কোথাও এ সম্পর্কে শিক্ষার নূন্যতম কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় দু'টি অপরিপক্ক তরুণ-তরুণীকে যেন সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া! মেয়েটিও জানে না, আজ থেকে সে আর ছোট্ট মেয়েটি নেই। সে এখন স্ত্রী হয়ে একটি অপরিচিত মানুষের জীবনে প্রবেশ করছে, যার মা আছে, বাবা আছে, ভাইবোন আছে এবং তাদের প্রতি তার স্বামীর অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। সহানুভূতির সঙ্গে কোমলতার সঙ্গে এই দায়িত্ববোধ কেউ তার মধ্যে জাগ্রত করে দেয়নি। এ দোষ কার!

তো আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বলেছিলাম, কথা দ্বারা আচরণ দ্বারা তোমার মাকে তুমি বোঝাবে, মা, আমি আপনারই ছিলাম, আছি এবং থাকবো। স্ত্রী হলো আমার জীবনের নতুন প্রয়োজন; আপনি আমার প্রাণ, আপনার সঙ্গে আমার নাড়ির টান।

অন্যদিকে স্ত্রীকে বোঝাতে হবে, এই সংসার সমুদ্রে তুমি একা নও; আমি তোমার পাশে আছি। নতুন জীবনে চলার পথে আমারও অনেক কষ্ট হবে, তোমারও অনেক কষ্ট হবে। তবে সান্ত্বনা এই যে, তুমিও একা নও, আমিও একা নই। আমার পাশে তুমি আছো, তোমার পাশে আমি আছি। আমার কষ্টের সান্ত্বনা তুমি, তোমার কষ্টের সান্ত্বনা আমি। আমরা পরস্পরের কষ্ট হয়ত দূর করতে পারবো না, তবে অনুভব করতে পারবো এবং হয়ত কিছুটা লাঘব করতে পারবো। আল্লাহর কসম, এমন কোন নারিহৃদয় নেই যা এমন কোমল সান্ত্বনায় বিগলিত হবে না।

তোমার স্ত্রীকে তুমি এভাবে বলবে, আমাদের জীবন তো আলাদা ছিলো। আমরা তো একে অপরকে চিনতামও না। আল্লাহ আমাদের কেন একত্র করেছেন জানো?! একা একা জান্নাতে যাওয়া কঠিন। আল্লাহ আমাদের একত্র করেছেন একসঙ্গে জান্নাতের পথে চলার জন্য। আমি যদি পিছিয়ে পড়ি, তুমি আমাকে টেনে নিয়ে যাবে; তুমি যদি পিছিয়ে পড়ো,

আমি তোমাকে টেনে নিয়ে যাবো। তুমি সতর্ক থাকবে, আমার দ্বারা যেন কারো হক নষ্ট না হয়; আমিও সতর্ক থাকবো, তোমার দ্বারা যেন কারো প্রতি যুলুম না হয়।

প্রিয় ছাত্রটিকে আমি আরো বললাম, স্ত্রীকে বোঝানোর জন্য তার সন্তানকে সামনে আনতে হবে। অর্থাৎ তুমি তাকে বলবে, দেখো, জীবন কত গতিশীল! সবকিছু কত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে! দু'দিন আগে আমরা শুধু যুবক-যুবতী ছিলাম, আজ হয়ে গেছি স্বামী-স্ত্রী। দু'দিন পরেই হয়ে যাবো মা-বাবা। আমি বাবা, তুমি মা! আল্লাহর কাছে একজন মায়ের মর্যাদা কত! তোমার কদমের নীচে হবে তোমার সন্তানের জান্নাত! যেমন আমার মায়ের কদমের নীচে আমার জান্নাত। তো তোমার সন্তান কেমন হলে তুমি খুশী হবে? আমাকেও আমার মায়ের ঐরকম সন্তান হতে তুমি সাহায্য করো। আমি যদি ভুল করি, মায়ের কোন হক নষ্ট করি, মায়ের সামনে 'উফ' করি, তুমি আমাকে সাবধান করো, আমাকে সংশোধন করো। তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার সন্তানও তুমি যেমন চাও তেমন হবে।

প্রয়োজন হলে স্ত্রীকে মা-বাবার সামনে তিরস্কার করবে, তবে ঘরে এসে একটু আদর, একটু সোহাগ করে বোঝাতে হবে, কেন তুমি এটা করেছো?! বোঝানোর এই তরযগুলো শিখতে হবে, আর এটা দু'একদিনের বিষয় নয়, সারা জীবনের বিষয়। কিন্তু আমরা ক'জন এভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করি?! হয় মাতৃভক্তিতে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করি, না হয়, স্ত্রীর ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে মা-বাবার দিলে আঘাত দেই, আর দুনিয়া-আখেরাত বরবাদ হয়। আমার একটা কথা মনে রেখো, মায়ের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা মূলত মায়ের প্রতি যুলুম, তদ্রূপ স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে মায়ের হক নষ্ট করা আসলে স্ত্রীর প্রতি যুলুম। আমার এ কথার উৎস হলো এই হাদিসটি,

"তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো জালেম অথবা মজলুম অবস্থায়"। অবশ্য সবকিছু হতে হবে হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে।

একটি ঘটনা তোমাকে বলি, তোমার মত আলিমে দ্বীন নয়, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ আমাকে বলেছেন, একবার তার মা তাকে বললেন, তোর বউ আজ তোর এত আপন হয়ে গেলো কীভাবে! আমি বললাম, দেখো মা, তোমাকে আমি মা বলি; এই 'মা' ডাকটুকু পাওয়ার জন্য তোমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে! অথচ 'পরের বাড়ীর মেয়েটি'র মুখ থেকে তুমি বিনা কষ্টে 'মা' ডাক শুনতে পাও! তোমাকে যে মা বলে ডাকে সে আমার আপন হবে না কেন মা?

আরেকটা ঘটনা, এক মা তার মেয়ের শাশুড়ী সম্পর্কে বললেন, মানুষ না, মেয়েটাকে আনতে পাঠালাম, দু'টো পিঠে বানিয়ে খাওয়াবো, দিলো না, ফেরত পাঠিয়ে দিলো!

দু'দিন আগে তিনিও একই কাজ করেছিলেন, ছেলের বউকে নিতে এসেছিলো মায়ের বাড়ী থেকে। তিনি বললেন, দু'দিন পরে আমার মেয়েরা আসবে এখন তুমি গেলে কীভাবে চলবে!

ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনার কাজটা কি ঠিক হয়েছিলো? আপনাকে কষ্ট দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, সতর্ক করা উদ্দেশ্য। আল্লাহর কাছে যদি আটকা পড়েন তখন তো আপনিই বলবেন, তুমি তো হাদীছ-কোরআন পড়েছো, আমাকে সতর্ক করোনি কেন?

মোটকথা, মেয়েদেরকে তারবিয়াত করতে হবে যাতে তারা আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা এবং আদর্শ শাশুড়ীরূপে আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে। পুরুষ হচ্ছে কাওয়াম ও পরিচালক। সুতরাং তারবিয়াত ও পরিচালনা করা পুরুষেরই দায়িত্ব। স্ত্রী, মা ও শাশুড়ী, জীবনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ধাপের জন্য ঘরে ঘরে আমরা যদি আমাদের মেয়েদের গড়ে তুলতে পারি, আদেশ দ্বারা, উপদেশ, সর্বোপরি নিজেদের আচরণ দ্বারা তাহলেই সংসার হতে পারে সুখের, শান্তির।

প্রিয় ছাত্রটিকে আরেকটি কথা বললাম, তোমার স্ত্রীর কোন আচরণ তোমার অপছন্দ হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে ভাবতে হবে, তোমার সব আচরণ কি সুন্দর, তোমার স্ত্রীর পছন্দের? তাছাড়া তোমার স্ত্রীর ভালো দিক কি কিছু নেই। সেই ভালো দিকগুলোর জন্য শোকর করো, আর যা তোমার কাছে মন্দ লাগে তার উপর ছবর করো। আর যদি সংশোধন করতে চাও তাহলে ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করো, তারপর কোমল ভাষায় বলো, তোমার এই বিষয়টা যদি না থাকতো তাহলে তুমি আরো অনেক ভালো হতে। তবে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ মনে রাখতে হবে, একটু বাঁকা থাকবেই, এই বক্রতা, সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে নায, আন্দায, মান, অভিমান, লাস্যতা, এই বক্রতা নারীর সৌন্দর্য, নারীর শক্তি। এটাকে সেভাবেই গ্রহণ করে তার সঙ্গে জীবন যাপন করতে হবে, পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে, আর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

সত্যি সত্যি যদি তোমার স্ত্রীর গুরুতর কোন ত্রুটি থাকে তবে সেটা সংশোধনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই তোমার। তবে সেক্ষেত্রেও সংশোধনের জন্য অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দিনের পর দিন চেষ্টা করে যেতে হবে। ধমক দিয়ে, জোর খাটিয়ে সংশোধন করা যায় না, ঘরে অশান্তি আনা যায়, ঘর ভাঙ্গা যায়, আর সন্তানদের জীবনে বিপর্যয় আনা যায়।

ইসলামপুরে আমার আব্বার দোকানের অপর দিকে এক ভদ্রলোকের দোকান ছিলো। অবস্থা ছিলো এই যে, দোকানে বসেই মদ খেতো। আব্বা তাকে দাওয়াত দিলেন, আর সে খুব দুর্ব্যবহার করলো, কিন্তু আববা ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত চালিয়ে গেলেন। দু'বছর পর তিনি মসজিদমুখী হলেন এবং এমন মুবাল্লিগ হলেন যে, বউকে তালাক দেবেন। কারণ সে দ্বীনের উপর আসছে না।

আববা তাকে এভাবে বুঝালেন, 'আমার সঙ্গে আপনার আচরণ কি মনে আছে? আমি যদি ধৈর্যহারা হয়ে আপনাকে ত্যাগ করতাম! এই পুরো কথাটা স্মরণে রেখে স্ত্রীকে তালিম করতে থাকেন। ছবর করেন, ছবর করলে আমার প্রতি আপনার যুলুম আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন আমার বান্দা তোমাকে আমার ঘরের দিকে ডেকেছে, তুমি তার প্রতি যুলুম করেছো কেন? তখন আপনি বলতে পারবেন, হে আল্লাহ, আমিও আপনার বান্দীর পিছনে ছবরের সঙ্গে মেহনত করেছি।'

সেই লোকের স্ত্রী কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরদানশীন হয়েছিলো। অথচ জোশের তোড়ে লোকটা তো ঘরই ভেঙ্গে ফেলছিলো। আসলে দোষ আমাদের। আমরা তারবিয়াত করার তরীকা শিখিনি। বোঝানোর তরয আয়ত্ব করিনি। প্রিয় ছাত্রটিকে আরো অনেক কথা বলেছিলাম, প্রায় দু'ঘন্টা সময় তার জন্য ব্যয় করেছিলাম। সব কথা এখন মনেও নেই।

তবে একটা কথা তাকে বলা হয়নি, এখন তোমাদের মজলিসে বলি, স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, এ সম্পর্কে একজনকে যা বলতে শুনেছিলাম, তা ছিল খুবই মর্মান্তিক। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েলোক যেন তোমার মাথায় চড়ে না বসে, তাই প্রথম দিন থেকেই তাকে শাসনের মধ্যে রাখবা। পূর্ণ ইতা'আত ও আনুগত্য আদায় করে নিবা, গোরবা কুশতান দর শবে আওয়াল।'

এ প্রবাদ এমনই বিশ্ববিশ্রুত যে, আমাদের নিরীহ বাংলাভাষায়ও বলে, 'বাসর রাতেই বেড়াল মারতে হবে'। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও আমাদের অনুসরণীয় হলো সুন্নাতে রাসুল, আর তিনি ইরশাদ করেছেন,

"যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচাইতে উত্তম, ঈমাদের দৃষ্টিতে সেই পূর্ণাঙ্গ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সেই সব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম। (তিরমিযী)

তো জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়তের সীমারেখায় থেকে স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণই আমাকে করতে হবে, যাতে সে মনে করে, আমি সর্বোত্তম স্বামী, আমার মতো উত্তম স্বামী হয় না, হতে পারে না।

স্ত্রীগণের সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কী ছিলো তা জানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। স্বামীর খেদমত করার মাধ্যমে স্ত্রী অনেক আজর ও ছাওয়াবের অধিকারিণী হতে পারে, এটা আলাদা কথা। তবে আমাকে মনে রাখতে হবে যে, এটা স্ত্রীর মহত্ব, স্বামীর অধিকার নয়। তারা যদি কখনো মায়ের বাড়ী যেতে চায়, আমরা প্রশ্ন করি, 'আমার খাওয়া-দাওয়ার কী হবে?' অথচ এটা তার বিবেচনার বিষয় হতে পারে, আমার প্রশ্ন করার বিষয় নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামান্য কথা বলেই মজলিস শেষ করছি। সহবাস দাম্পত্য জীবনের একটি অপরিহার্য সত্য। এ বিষয়ে আলোচনাকে হায়া-শরমের খেলাফ মনে করা হয়। ফলে বিষয়টি অজ্ঞতার মধ্যে থেকে যায়। একারণে এমনকি অনেক সময় দাম্পত্য জীবন বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

স্ত্রী তোমার সারা জীবনের সম্পদ এবং সেরা সম্পদ। স্ত্রী তোমার সম্পত্তি নয়, স্ত্রী হলো তোমার জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ, যা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তোমাকে রাখতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে। প্রথমেই বর্বর ও পাশবিকরূপে নিজেকে স্ত্রীর সামনে তুলে ধরা বিরাট মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। স্ত্রী স্বামীর ভোগের পাত্রী নয়,বরং স্বামী-স্ত্রী হলো পরস্পরকে উপভোগ করার জন্য। যত দিন লাগে, দীর্ঘ সাধনা করে প্রথমে হৃদয় জয় করো, মনের দুয়ার খোলো, অন্তরের গভীরে প্রবেশ করো।

শাইখ আব্দুল মালেক(দাঃবাঃ) এর কথাঃ

দাম্পত্যজীবন সুখময় হওয়ার জন্য শুধু পুরুষের প্রচেষ্টা ও সচেতনতাই যথেষ্ট নয়, নারীরও সদিচ্ছা ও সচেতনতা অতি প্রয়োজন।

এ বিষয়ে তারও আছে অনেক দায়িত্ব। কিন্তু নারীর তালীম-তরবিয়তের ভারও তো পুরুষেরই উপর। বিয়ের আগে পিতামাতা তার তরবিয়ত করবেন, বিয়ের পর স্বামী। দাম্পত্যজীবনে নারীর দায়িত্ব কী কী, সেই সকল দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন করার পদ্ধতি কী এবং তার তালীম-তরবিয়ত কীভাবে করতে হবে-এটি আলাদা একটি বিষয়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে শাইখের নাসিহাহ মতো দাম্পত্যজীবনে চলার তাওফিক দান করুন।

এখনকার বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো

30 October 2014

লেখকঃ **স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ । তানভীর আহমেদ আরজেল । সাবিত বিন মুক্তার । রাশেদুর রহমান রিয়াদ**

এক.

এক ছোট ভাই প্রশ্ন করেছিলো, ভাইয়া এখনকার বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোর অবস্থা তো খুবই খারাপ হয়। গান-বাদ্য, ছেলে-মেয়ের মেলামেশা, নাচানাচিগুলো, ডিজে... এসব থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?

উত্তর আর কী দিবো? কাছের বন্ধুদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো দেখে-শুনে বুঝেছি এখানে 'ইসলামিক্যালি মডিফিকেশন' করার সুযোগ নেই বললেই চলে, বেশিরভাগ অনৈসলামিক কাজ। পারিবারিক আর সামাজিক চাপে পিষ্ট হয়ে করতে হয়। এখন অনেক ধাপ থাকে বিয়েতে, আমি এতটা 'ব্যাকডেটেড'(!) যে ঠিক সব জানিও না। তবু শুনেছি -- মেহেদি ১, মেহেদি ২, গায়ে হলুদ ১, গায়ে হলুদ ২, বিয়ে, বৌভাত, (রিসিপশন)। এগুলো থেকে যারা কমায়, তারা মূলত টাকার ঠেলাতে পড়ে কমায়।

এককালে হিন্দুয়ানা নানান সংস্কৃতিতে তাল মিলিয়ে আমাদের এই দেশীয় বিয়েতে কনেকে সাজুগুজু করে স্টেজে বসে থেকে ভিডিও/ফটোর জন্য পোজ দিলে হত। একধাপ বেশি হতো যখন 'গায়ে হলুদ' হতো আর গাইর-মাহরাম পুরুষরাও গিয়ে তার মুখে হলুদ ডলতে যেত, চারপাশ থেকে শ'খানেক জোড়া চোখ সেজে থাকা কনের সৌন্দর্যে হারাম উপায়ে মুগ্ধ হত। এখন তো সবার সাথে তারাও নাচে, উদ্দামতায়; শয়তানও নাচে সেই পার্টিগুলোতে, আনন্দে উদ্বেল

হয়ে... এখন তাতে পাশ্চাত্য, ভারতীয়সহ তাবৎ পৃথিবীর নোংরা বিষয়গুলো স্থান পাচ্ছে। কেউ জানেই না কী করে, কেন করে!!

গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, উদ্দেশ্য ঠিক করা। কেন এই অনুষ্ঠান? যারা আল্লাহকে খুশি করতে জীবনযাপন করে, তারা এমনিতেই জানি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে এইসবের স্থান ইসলামি বিয়েতে নাই। সুন্নাহ তো খুবই সহজ। মুহর ঠিক করা, খুতবা, ওয়ালিমা (সাধ্যানুযায়ী) হলেই হলো। আর কিছুই না। ইসলাম জীবনকে সহজ করে, সুন্দর করে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পাপাচারের সুযোগ ইসলাম দেয় না। একটা সুন্দর বিষয় শিখেছিলাম। ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ নয়, বাদবাকি সবই তো করা যায়। খেয়াল রাখতে হবে কী কী নিষেধ, এটা তো যে কোন মুসলিমই বুঝে (যারা বুঝতে চায়)। আমাদের সামনে যেসব ঘটনা সুন্নাহ হিসেবে জেনেছি তাতে আছে বিয়েতে কম খরচ উত্তম, তাতে অপব্যয় মুক্ত থাকা উচিত, গরীবদের অংশগ্রহণ থাকা উচিত। এগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন। খুব ভালো করে জানি, অধিকাংশ বাবা-মা-অভিভাবকরা *সমাজের কাছে মুখ টিকিয়ে রাখতে* এসব অনুষ্ঠানের জন্য অস্থির থাকেন, চাপ দেন। অথচ আল্লাহর কাছে কী করে মুখ দেখাবো সেই হিসেব করা হয়না।

একটা কথা জানি, আল্লাহকে ছেড়ে মানুষের দাসত্ব করা এইসব সংস্কৃতিকে একদম বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চেইন ভেঙ্গে ফেলার জন্য বর-কনে উভয়ের এবং তাদের পারিবারিক সমঝোতার প্রয়োজন হয়। তবু, একবারেই হয়ত কিছু হবেনা। এখনকার অনেক ভাই-বোনেরা নিজেদেরকে চলমান নোংরা সংস্কৃতি থেকে নিজেদেরকে আলাদা করার আপ্রাণ প্রয়াসে এসব অনুষ্ঠানের ইতরামি, নোংরামি, বাহুল্য এড়িয়ে ছোটখাটো আয়োজনে সারছেন। হয়ত তাদের পারিবারিক পূর্ণ সমর্থন নেই। তবে ইনশা আল্লাহ তাদের পরের প্রজন্ম সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তি অর্জন করবে।

আমরা তো সেই উম্মাহ, যাদের শেষ সময়ে ঈমান টিকিয়ে রাখা জলন্ত কয়লা হাতের মুষ্ঠিতে ধরে রাখার চাইতে কঠিন হবে। জাহান্নামি এসব সংস্কৃতি থেকে মুক্তি পেতে কষ্ট তো করতে হবেই, ধৈর্যধারণকারীদের জন্যই তো সুসংসবাদ। তবে হ্যাঁ, একান্ত আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হলো -- এসব সংস্কৃতিকে ইসলামাইজেশনের কিছু নেই। এগুলোর প্রায় পুরোটাই নষ্টধারার, তাই এদের ছুঁড়ে ফেলে মসজিদকেন্দ্রিক সমাজের সেই সোনালিযুগে ফিরে যাবার সংকল্প করলে ইনশা আল্লাহ সব সহজ হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্য তো সন্নিকটে...

দুই.

বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি বড় ফিতনার নাম হচ্ছে Wedding Photography. এটা যে কত বড় ফিতনা এটা যে প্রত্যক্ষ করে নাই সে কখনো চিন্তাও করতে পারবেনা। এক কথায় বলতে গেলে- লাক্স চ্যানেল আই মডেলদের নিয়ে ফটোগ্রাফাররা যেভাবে খেলে ঠিক সেইভাবে চার পাঁচ জন ফটোগ্রাফার নববধূকে নিয়ে খেলে। কখনো কখনো এতো

কাছ থেকে ফোকাস করে যে.....কিছু কিছু বিয়েতে নাকি এমনও হয় ফটোগ্রাফার নববধূর গায়ে হাত দিয়ে কাপড় ঠিক করে দেয়, দাঁড়ানোর ভঙ্গি ঠিক করে দেয়। নায়ুজুবিল্লাহ।

যে মেয়েটার ইসলামের বিষয়ে তেমন জ্ঞান নেই কিন্তু সাধারণত পর্দা করার চেষ্টা করে তাঁকেও তার বিয়ের দিন চার পাঁচটা বেগানা ফটোগ্রাফারের সামনে মডেল হিসেবে ঠেলে দেওয়া হয়। কাজটা কখনো তার ইচ্ছায় হয় আবার কখনো অনিচ্ছায়।

বিয়ের মতো একটি পবিত্র বন্ধন এবং ইবাদতে অশ্লীলতার এই জঘন্য পর্যায় কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই এখনই আমাদেরকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে, করতে হবে, নিজের পরিবার থেকেই এই সচেতনতা শুরু করতে হবে।

আর আপুদেরকে বলি, আপনি কি চান বিয়ের পর আপনার সংসার জীবন সুখী হোক?? জানি বলবেন, কে না চায়??

যদি চান তাহলে এটা কিভাবে আশা করেন, যে বন্ধনের, ইবাদতের শুরুই হচ্ছে অশ্লীলতা দিয়ে, আল্লাহর চরম অবাধ্যতা দিয়ে সেখানে আল্লাহর রহমত থাকবে, দয়া থাকবে। আর আল্লাহর রহমত ছাড়া, দয়া ছাড়া সংসার জীবনে সুখী হওয়ার এই অবাস্তব স্বপ্ন কিভাবে দেখেন???

তাই বিয়ের দিন নিজেকে মডেল হিসেবে এইসব বেগানা ফটোগ্রাফারদের সামনে নিজেকে সপে দেওয়ার আগে একটি বার চিন্তা করুন, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারতেছেন না তো??, নিজে হাতে আল্লাহর রহমত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন না তো??

তিন.

তথাকথিত বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে জামাই আর বউকে চিড়িয়াখানার প্রাণীর মতো স্টেইজে বসিয়ে রাখা হয় আর মাহরাম-গায়রে মাহরাম সবাই একজন আরেকজনের সাথে খোশ গল্পে মেতে উঠে। জামাইয়ের শালি জাতীয় কিছু উদ্ভট প্রাণী থাকলে তো কথাই নেই। এরা পারে না জামাই বাবুর গায়ে উঠে পরে। আর দুনিয়ার সব পুরুষ এসে বউকে দেখে আর তাদের চোখকে পরিতৃপ্ত করে। একজন পুরুষের জন্য এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কী হতে পারে? বিষয়টা এতোটাই ডিস্টার্বিং যে এগুলো চিন্তা করলে আমার নিজের কাছেই লজ্জা লাগে। "দাইয়্যুস" টার্মটা যেন আমরা ভুলে না যাই। খুব ক্লোজ রিলেটিভ না হলে এই অনুষ্ঠানগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

যে পবিত্র সম্পর্কের শুরু এইভাবে হারামের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সেখানে শান্তি আসবে কোথা থেকে? এই সবকিছু দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণেই হয়ে থাকে। এভাবে মহান আল্লাহ্‌র দেয়া ফরয বিধান পর্দাকে অবজ্ঞা করে কস্মিনকালেও কেউ সত্যিকারের সুখী হতে পারবে না।

তথাকথিত সামাজিকতার দোহাই দিয়ে গোমরাহির মধ্যে আর কতদিন? পরিবর্তনটা শুরু হোক নিজেদের মধ্য দিয়েই বিইযনিল্লাহ।

চার.

আশ্চর্যের ব্যাপার! মুসলিম মেয়েটি বাড়ীর বাইরে বা বাজারে গেলে,স্কুলে/কলেজে গেলে বোরকা পরে যায় পূর্ণ পর্দা পালন করে যায়।অথচ তার বিয়ের দিন গোটা বাড়ীটা যখন একটা বাজারে পরিণত হয় সেদিন সে পর্দাহীন ভাবে অতি সাজগোজের সামনে সবার চোখের সামনে উপস্থিত হয়!

অসহায় একাকীত্ব, পরম প্রিয়জন ও একটি খরুচে বিয়ে

30 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

{ ১ }

মাঝে মাঝে যখন নিজেদের অসহায়ত্ব টের পাই, আপন ক্ষুদ্রতাকে অনুধাবন করি এই সমাজের উদ্ধত মানুষদের, পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহের মাঝে। যদি অনেকসময় নিজের একাকীত্ব অনুভব করি, আশেপাশের মানুষগুলো নিজ নিজ জীবনধারনের কাজে ব্যস্ত থাকলে যদি একা হয়ে যাই খুব বেশি, তখন বুঝতে হবে, এই অনুভূতিগুলো আসলে একটা সুযোগ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চারপাশ থেকে সবাইকে সরিয়ে এই সময়টিতে আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে যেতে চাইছেন, তাকে গভীর করে স্মরণ করতে বলছেন। মৃত্যু তো সবার একা একাই হবে, তার পরের অনন্তকালের যাত্রাতেও একাই থাকব। আমাদের পৃথিবীর বন্ধন, সম্পর্ক সবই তো বিভ্রম। সেই কঠিন সময়ের যাত্রার প্রকৃত অনুভূতিটা এখন অনুভব করে প্রস্তুতি নিতে পারাটাই বেশি কল্যাণকর না?

{ ২ }

খুব সোজা-সাপটা ভাষায় একটা ভীষণ কথা বলতে চাই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে এই দুনিয়াতে আর কেউই সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আর তার রাসূলের (সা) নির্দেশ ছাড়া আমাদের আর কোন বন্ধু নেই।

কোন মানুষকেই পৃথিবীতে বেশি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করা উচিত নয়, মনের ভিতরেও নয়। কারো কথাই অনবদ্য সত্য নয়, কারো চিন্তাই পরম সঠিক নয়, কারো জীবনই পরম সুন্দর নয়। সুন্দর কেবল আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে তিনি পৃথিবীতে রাহমাতাল্লিল আলামীন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

তাই, প্রায়োরিটি সেট করাতে, নিজেদের সম্মান-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-ভক্তি-মনোযোগ ভুল মানুষকে ভুল উপায়ে দিলে তো পুরো ফলাফলেই অশান্তি হবে, ভুল হবেই। খেয়াল রাখতে হবে এই ব্যাপার...

খুউউব খিয়াল কইরা পথে চলতে হইবেক.....

{ ৩ }

প্রায় সমবয়েসি এক কলিগ আজকে ক্রেডিট কার্ড জোগাড়ের জন্য কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি বিয়ে করতে ইচ্ছুক। তিন চার বছর প্রেম হয়েছে, এবার বিয়ে না করলেই নয়। কথার প্রসঙ্গে জানলাম, তিনি অর্ধলক্ষের কাছাকাছি বেতন পেলেও হয়ত আগামী কয়েক মাস মিলিয়ে ১ লাখ জমাতে পারবেন, লোন নিয়ে তিনি ৩-৪ লাখ টাকা প্রস্তুত করবেন, যা দিয়ে নাকি কেবল হলুদের অনুষ্ঠান পর্যন্তই কেবল চলবে। আরো অনেক খরচ হবে। বিয়ের অনুষ্ঠান হবে এই বছরের শেষে...

খরচের কথাটুকু শুনে আমি একটু ভিরমি খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

- মোট কত খরচ হবে তাহলে? কে দিবে?

- কেন? আব্বু দিবে! আরো হয়ত ১২-১৪ লাখ টাকা লাগবে। মোট ২০ লাখ লাগবে কমপক্ষে। নইলে তো বিয়ে হবেই না।

- (বিস্ময় প্রকাশ করে) এত টাকা খরচ করে কেবল বিয়েই?

- হ্যাঁ। আবার জিগস। এর কমে কেউ বিয়ে করবে নাকি? দেখেন না চারপাশে এত আনম্যারিড পোলাপাইন, বিয়ের টাকা না থাকলে কে কারে বিয়ে করে?

- (হতভম্ব চেহারায়) ওওওহ। আচ্ছা!

কিছুক্ষণ পরে ঘটনা হজম করতে গিয়ে আমার শুধু কিছু পুরোনো কথা মনে হয়... নতুন কিছু না।

মুসলিম ছেলে মেয়েদের "গায়ে হলুদ" বা "হলুদ বরণ" ও সাজসজ্জা !

31 October 2014

সংকলনে -বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক।

এক.

"হলুদ বরণ"

আজকে এমন একটি পাপের কথা নিয়ে আলোচনা করবো, যা আমাদের সমাজের এমন কোন যুবক-যুবতী নেই যারা এই কাজটি তাঁদের অবিভাবকদের ছত্রছায়ায় করেন নি ! আর তা হলো, ছেলে হয়ে মেয়ের শরীরে হাত দেওয়ার পাপ আর মেয়ে হয়ে ছেলেদের গায়ে হাত দেওয়া পাপ! আরেকটু খুলে বলি, আমাদের সমাজে বিয়ের মতো একটি পবিত্র আয়োজনকে অ-পবিত্র করতে যা যা লাগে তা সবই করা হয়ে থাকে"হলুদ বরন" বা"গায়ে হলুদের" নামক অনুষ্ঠানে !

আমরা বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে কি দেখতে পাই ! একটি মেয়ে (পাত্রী) কে, মঞ্চের মধ্যে সাজিয়ে রেখে প্রদর্শন করা হচ্ছে, আর মেয়ে পক্ষের এবং ছেলে (পাত্র) পক্ষের তথা উভয় পক্ষের দর্শনার্থীগণ পাইকারি হারে একজন গাইরে মাহরাম মেয়ের গায়ে হাত ছোঁয়াচ্ছে ! তাও হচ্ছে আবার নিজ নিজ অভিভাবকদের উপস্থিতিতে ! ইন্নালিল্লাহ !!!

এর চেয়ে আর বিপর্যয় মূলক কর্মকাণ্ড কি হতে পারে একটি মুসলিম সমাজে !

যেখানে নারী-পুরুষ যাতে একত্রিত না হতে পারে,তাই রাসুল (সাঃ) যে সকল মহিলা সাহাবীগনেরা মসজিদে সালাত আদায়করতে আসতেন, তাঁদের কে নামাজ শেষে মসজিদ থেকেপুরুষদের পরে বের হতে বলতেন ! যাতে বের হতে গিয়ে নারী- পুরুষ একাকার না হয়ে যায় ! অথচ, নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হলে একজন এইযুগের মুসলিমের ও অন্তরের অবস্থাকেমন থাকে আমরা সকলে জানি ! তারপরও রাসুল (সাঃ) একত্রিত হওয়ার কোন অবকাশ রাখেন নি ! আর, আজ আপনি চিন্তা করুন, আমাদের সমাজে আজকে গায়ে হলুদের নামে যা হচ্ছে, তা কি শরিয়া সম্মত ! তাও আবার দেখা যায় তাঁদের মাঝে হয়তো অনেক হাজি-গাজি নামাজী লোকেরাও আছে !

এবং অনেকেই তাঁদের ছেলে মেয়ের বিয়ের বিয়ের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন বা ইন্ধন যুগিয়ে থাকেন ! আরও যেটি আপত্তিকর বিষয় ঘটে সেইসব অনুষ্ঠানে জোরছে, হিন্দি-বাংলা গান বাজনা বাজিয়ে নিজের ঈমান আমলের ১২টা বাজিয়ে প্রতিবেশির ১৪ টা বাজানোর দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে ! আর তাঁদের মাঝে আবার কারো কারো অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়ে থাকলে শুনা যায় সেই সব অনুষ্ঠানে "রঙ্গিন পানির" ব্যবস্থা ও নাকি করা হয়ে থাকে ! এককথায় সমস্ত ধরনের পাপ কাজের-ই সরঞ্জামের আঞ্জাম দেওয়া হয়ে থাকে !

আর এইসকল কর্মকাণ্ড চোখের সামনে হতে দেখে সবচাইতে পীড়াদায়ক ঈমানী কষ্ট অনুভব করেন যারা, তাঁরা হলেন, ইসলাম কে জেনে বুঝে পরিপূর্ণ ভাবে পালনকারী দ্বীনি ভাই ও বোনেরা!

অনেক সময় হয়তো তাঁদের নিজ ফ্যামিলিতেই ঘটেথাকে এহেন কর্মকাণ্ড ! কিন্তু বড়দের কারনে নিজের কিছু হয়তো করার থাকে না, শুধু মাত্র সেই অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে বিরত রেখে অন্তর থেকে ঘৃনা করার মাধ্যমে ! আসলে আমাদের সমাজের মানুষেরা ইসলাম কে শুধু নামাজ-রোজা আর দান সাদকার মাধ্যমেই সীমিত করে ফেলেছে, অথবা অনেকে এইসব ইসলামিক সংস্কৃতি বিরোধী কর্মকাণ্ড জেনেও অনীহার সাথে তা করে যায় !

আমরা আমাদের সেই সব অভিবাভকদের ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে এহেন শরিয়া বিরোধী যেকোন অনুষ্ঠান থেকে তাঁদের কে বিরত থাকার আহ্বান জানাই, তাঁদের কে বুঝাই সমাজের গড্ডালিকার প্রবাহে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া যাবে নাহ, কারন আমাদের বিচারের দিন আমাদের কর্ম সমন্ধেআমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে !

আর, আমাদের দ্বারা যাদের এহেন, পাপকার্য সম্পাদন হয়ে গেছে, আমরা আল্লার কাছে তওবা করি এবং এর কাফফারা হিসেবে, ওপর কে এহেন কাজ থেকেবিরত থাকার ব্যাপারে নসিহত করি, আল্লাহপাক আমাদের সকল ফিতনা থেকে দূরে রাখুক। আমীন।

দুই.

গায়ে হলুদঃ ইসলাম কি বলে?

আজকাল বিয়ের আগে গায়ে হলুদের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়, এমনকি বিয়ের মূল আকর্ষণ থাকে গায়ে হলুদ। এই গায়ে হলুদ কি ইসলামে হারাম? এক কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। আসুন একটু বিস্তারিত জেনে নিই।

বিয়ের সময় বর ও কনেকে চাকচিক্যময় পোষাকে সাজানো ও তাদের গায়ে হলুদ মাখানো ইসলামী শরিয়তে সম্পূর্ণ জায়েজ। ইসলামে হলুদ একটি পছন্দনীয় রঙ। বিয়ের সময় গায়ে হলুদ মাখানো, হলুদ রঙের জামা পরা এবং সুগন্ধী দেয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। একদা হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রাঃ) রাসুল (সঃ) এর দরবারে এলেন। তখনো তার গায়ে হলুদের চিহ্ন ছিল। রাসুল (সঃ) তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন তিনি এক আনসার মহিলাকে বিয়ে করেছেন। রাসুল (সঃ) এটা অপছন্দ করেন নি।

আমরা ছোটবেলায় এরকম গায়ে হলুদ দেখেছি। বিয়ের আগের দিন বিকালে আত্মীয় এবং প্রতিবেশি মহিলারা হলুদ বাটতেন এবং বিভিন্ন রকমের গীত গাইতেন। সেইসব গীতে বরের নাম হত "মনু মিয়া" আর কনের নাম হত "মলকা বানু"। আমরা ছোটরা একজন আরেকজনের গায়ে হলুদ মেখে মজা করতাম। বিয়ের দিন দুপুরে গোসলের

আগে বরকে মাহরাম মহিলারা (মা, দাদী, নানী, ফুফু, খালা প্রমুখ) গায়ে হলুদ লাগিয়ে দিতেন, এরপর পুরুষরা তাকে গোসল করাতেন। আর কনেকে হলুদ লাগানো এবং গোসল করানো সব মহিলারাই করতেন। তখন এটাই ছিল গায়ে হলুদ।

বিয়ের সময় দফ (বাংলায় বলা হয় খঞ্জনী/তম্বুরা, ইংরেজীতে বলা হয় tambourine। এটা একধরণের একমুখওয়ালা বাদ্যযন্ত্র) বাজানো এবং নির্দোষ গান-গীত গাওয়া "অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের" জন্য যায়েজ। শুধু যায়েজ বললে কম বলা হবে, এটা সুন্নতও বলা যেতে পারে। অনেক বিশুদ্ধ হাদীসে এর প্রমান রয়েছে। রসুল (সঃ) বলেছেন, "তোমরা বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার কর, এর অনুষ্ঠান মসজিদে সম্পন্ন কর এবং এসময় দফ বাজাও।" অপর এক বর্ণনায় এসেছে, এক বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাসুল (সঃ) কে জানানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা সে বিয়েতে কোন মেয়ে পাঠাও নি, যে বাদ্য বাজাবে আর গান গাইবে?" উল্লেখ্য বিয়ের কথা সমাজে প্রচার করা শুদ্ধ বিয়ের অন্যতম শর্ত। গোপন বিয়ে শুদ্ধ হয় না, যদিও শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থিত থাকে। তাই বিয়ের প্রচারের উদ্দেশ্যে মসজিদে বিয়ে পড়ানো, দফ বাজানো এবং নির্দোষ গান গাওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে দফ বাজানো ও গান গাওয়া শুধু নাবালিকা মেয়েদের জন্য যায়েজ।

কিন্তু বর্তমানে যেভাবে গায়ে হলুদ করা হয়, সেটা সম্পূর্ণ নাযায়েজ। মোমবাতি জালানো, গাইরে মাহরামরা গায়ে হলুদ লাগিয়ে দেয়া, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যুবতীদের সাজগোজ করে সৌন্দর্য প্রদর্শন, নিষিদ্ধ বাদ্য বাজানো, অশ্লীল গান এসবই হারাম।

*সূত্রঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন- মাওলানা আবদুর রহীম

তিন.

বিয়ে বা ছোট থেকে বড় যে কোন অনুষ্ঠানে মেয়েদের সাজগোজ দেখলে খুব বেশী ভয় লাগে। তারা মানুষের কাছে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য এতো বেশী সাজগোজ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতেও পরিবর্তন করে দেয়। যেমন; ওরা মেকআপ দিয়ে নিজের চেহারা বেটে থেকে লম্বা করে, খুব লম্বা চেহারা স্বাভাবিক করে, ভুতা চেহারা খাড়া করে, খাড়া চেহারাটা আরো খাড়া করে ফুটিয়ে তুলে, ভ্রু চুল উপড়ে ফেলে, শরীলের লোম উপড়ে ফেলে ইত্যাদি। আর সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তখন, যখন দেখি শরীলের কালো রং মেকআপ দিয়ে এমন ভাবে সাদা করে যে বুঝবার উপায় নেই মেয়েটা আসলে কালো। কত বার যে আমি ধোঁকা খেয়েছি এসবের জন্য বিশেষ করে বিয়ের কনেদের নিয়ে। যাই হোক; আসল কথা হল, যারা এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন করে আল্লাহ্‌ তাদের অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের শাস্তি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা আমারা খুব ভাল করেই জানি। খুবই কষ্ট হয় যখন কোন পর্দাশীল মেয়েদের এই অবস্থায় দেখি।

যারা ইসলামের নিষিদ্ধ কাজগুলো সম্মন্ধে জানা সত্যেও তা উপেক্ষা করে চলে, তাদের পরিণতি কি হবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ভাল জানেন। আমাদের উচিৎ এইসব ব্যাপারে খুব বেশী সাবধানও সতর্ক থাকা আর নিজেদের পরিবার-পরিজনদেরও সাবধান করে হেফাজত করা। কারণ হাদীসে আছে,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যেসব নারী দেহে উল্কি এঁকে নেয়, আর যারা এঁকে দেয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিনী এবং চোখের পাতা বা ভ্রূর চুল উৎপাটনকারিনী এবং এভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন কারিণীদের আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেছেন। এক মহিলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)- কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যাকে রাসুলুল্লাহ (স) অভিসম্পাত করেছেন আমি তাকে কেন অভিসম্পাত করব না, আর এটা পবিত্র কুরআনেও আছে। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন, "রাসুল তোমাদেরকে যা কিছু করতে বলেন তা তোমরা গ্রহন কর, আর যে বস্তু হতে বিরত থাকতে বলেন তা হতে বিরত থাক"।

(সূরা হাশর, ৭) (বুখারী ও মুসলিম)

হে আমার বোন, নিজেকে প্রদর্শিত করার, লোকজনকে নিজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ করাতে যেই আয়োজন তা রীতিমত অন্যায়। আপনার সৌন্দর্য কেবলই আপনার স্বামী জন্যই আয়োজিত হওয়া উচিত।

চার.

বুঝিনা এ সমাজে একজন মা তার তরুণী, যুবতী মেয়েদেরকে সাজ সজ্জায় সাজিয়ে কি করে বিয়ে বাড়ীতে যেতে অনুমতি দান করে? এ যুগে ছেলে মেয়েদের জন্য বিয়ে বাড়ীর মত ফিৎনা বোধহয় দ্বিতীয়টি আর নেই। এ সব বাবা মা দেরকে কি করে বুঝাই যে ইসলাম শুধু সালাত আদায় আর সিয়াম পালনে নয়। ইসলাম জানার নাম। ইসলাম আল্লাহর হুকুম সব ক্ষেত্রে মানার নাম।

পাঁচ.

মিথিলা নামের এক বোন যা বললেন-

আমি নিজে মেয়ে মানুষ। আমি খুব ভাল করেই জানি মেয়েরা এত সাজ গোজ কেন করে। খুবই সিম্পল উত্তর। মানুষ তাদের দিকে তাকাবে , প্রশংসা করবে। কার না ভাল লাগে প্রশংসা শুনতে!

আমারো ভাল লাগে। কিন্তু আপারা দুনিয়ায় খালি আমরা মেয়েরাই নাই। আমাদের ভাইরাও আছে। সৃষ্টিগতভাবে যারা আপনাদের উপর এবং আপনারা তাদের উপর দূর্বল। কিন্তু এইটা ভাইদের ক্ষেত্রে একটু না অনেক বেশি। এই কথাগুলা

বলতে আমার খুবই খারাপ লাগে। অনেক বেশি লজ্জা লাগে এই জন্য যে এত ব্যাখ্যা করে আমার বোনদেরকে এসব আমার বলতে হয়। আমি বাংলায় এসব লিখতে পারবনা।

Most of the man gets sexually aroused when—

আপনি টাইট ফিটিং কাপড় পরেন। আপনি ওড়না পরেন না/ গলায় ঝুলায় রাখেন/ একপাশে ঝুলায় রাখেন।

আপনি যখন অর্ধস্বচ্ছ কাপড় পরেন।

আপনার পেট/পা/পীঠ যখন দেখা যায়।

আপনি যখন ঠোঁট রাঙ্গান।

আপনি যখন চোখে স্মোকি সাজ পরেন।

আরও শত শত কারন থাকতে পারে।

কি ? মনে হচ্ছে যে ছিঃ ছিঃ ছেলেরা এত খারাপ! তাইনা?

The fact is that they are CREATED like this. Do you understand my dear sisters? THEY ARE CREATED BY ALLAAH LIKE THIS.

বিয়ের অনুষ্ঠানে ফিতনা, মনে পড়ে একটা গল্পের কথা !

4 November 2014

লেখক অজ্ঞাত

আমাদের সমাজে আজকালকার বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোর মত বড় ফিতনা বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। হিন্দু কালচারের মত ‘গায়ে হলুদ’ জাতীয় অর্থহীন আচার থেকে শুরু করে গানবাজনা, ফ্রি মিক্সিং–কিছুই বাদ নেই। নারীরা যেন তাদের সমস্ত রূপ যৌবন নিয়ে ধরা দিতে চান এসব অনুষ্ঠানে। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পার্লারে যেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সাজগোজ আর টাকার শ্রাদ্ধ–এসব এখন খুবই কমন ব্যাপার। অথচ এই নারীদের সৌন্দর্য উপভোগের একমাত্র যিনি হকদার ছিলেন, সেই স্বামীর ঘরে তাঁরা সবচেয়ে দীনহীন বেশে থাকতে পছন্দ করেন।

মধ্যবয়স্কা নারীরা যখন পার্লারে গিয়ে অল্পবয়স্কা তরুণী সাজতে চান, আমার মনে পড়ে একটা গল্পের কথা।

সম্রাট আকবর চুলে কলপ লাগানো শুরু করেছেন বয়স বেড়ে যাওয়ায়। একদিন অন্দরমহলে তিনি কলপ লাগাচ্ছেন, তখন বীরবল হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লেন। বাদশাহ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন আর কলমের কৌটা লুকিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন–“ইয়ে মানে বীরবল, আচ্ছা, চুলে কলপ দিলে কি মস্তিষ্কের ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে?”

বীরবল মুচকি হেসে বললেন, “মহারাজ, ভয় নেই।”

- কীসের ভয় নেই?

- মস্তিষ্কের ক্ষতির ভয় নেই। কারণ যারা চুলে কলপ লাগায় তাদের আসলে মস্তিষ্ক নামক বস্তুটাই নেই। কাজেই ক্ষতি হওয়ার প্রশ্ন আসে কীভাবে?

- মস্তিষ্ক নেই মানে?

- হুজুর, মস্তিষ্ক থাকলে কি আর বাজে কাজে সময় নষ্ট করত? যে সময় চলে গেছে তাকে কি ফিরিয়ে আনা যায়? নদীর যে স্রোত চলে গিয়েছে তাকে কি আবার ফিরিয়ে আনা যায়?

বাদশাহ লজ্জিত হলেন। কিন্তু আমরা লজ্জিত হতে নারাজ। সত্যিই আমরা লোকের দেখনদারির পেছনে কতটা সময় নষ্ট করি চিন্তা করলে শিউরে উঠতে হয়। একটা পার্টিতে যেতে হলে সাজগোজের পেছনে ঘন্টার পর ঘন্টা বেরিয়ে যায়, অথচ কুরআনের একটা ছোট্ট সূরা বুঝতে আধঘন্টা সময় আমাদের হয় না।

আজকালকার মা বোনেরা যে পরিমাণ সময় সিরিয়াল দেখে, সাজগোজ করে আর পরচর্চা করে কাটান, তাতে হয়তো বীরবল বেঁচে থাকলে এদের দেখেও বলতেন–"মস্তিষ্কনামক কোন পদার্থ নেই।"

একটা গাড়ির পেছনে লেখা দেখেছি–

"Mosques are free but empty, and clubs are paid but full. It's amazing that we ignore Jannah which is free but buy Jahannam with money."

সত্যি, কতবড় মস্তিষ্কহীনই না আমরা !!

বিয়ের দিনে সাজসজ্জা সমস্যা বরের নয়- বউয়ের !

4 September 2015

লেখকঃ ফাতেমা মাহফুয

ছোটবেলায় আমাদের ঢাকায় প্রত্যেকটা বিয়েতে দেখতাম একই সেন্টারে উপর-নিচ তলায় মহিলা-পুরুষদের জন্য আলাদা জায়গা থাকতো। এদিকে পর্দা রক্ষার জন্য ছেলে-মেয়ে আলাদা ব্যবস্থা করলেও ছেলেদের সেকশান থেকে কেউ কেউ মেয়েদের সেকশানে উঠে আসলেও কেউ বাঁধা দিতো না, কিছু বলতো না। ছেলেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতো। তাই আলাদা স্থান বরাদ্দ থাকলেও প্রায়ই দেখতাম মেয়েরা ছেলেদের স্থানে না গেলেও ছেলেরা মেয়েদের তলায় এসে যথারীতি জটলা বেঁধে হাজির। এদিকে বর্তমানে দেখছি- বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারগুলো এমনভাবে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে যে- ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে free mixing হয়। বড়ও একটা হল রুম, সাথে ডাইনিং স্পেস। একপাশে বসার জায়গা আরেকপাশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। মহিলা-পুরুষ একসাথে থাকবে। আর সবাই যাতে বর-কনেকে দেখতে পারে তাই হল রুমের এমন জায়গায় বর-কনের একসাথে বসার ব্যবস্থা।

এহেন পরিস্থিতিকে, অনেকে ঝামেলামুক্ত (ছেলে-মেয়েদের পর্দা নিয়ে যারা ভাবেন না, আলাদা ব্যবস্থা করতে অনাগ্রহী), স্মার্ট মনে করলেও সমস্যায় পড়েন তারা, যারা জানেন- পরপুরুষের সামনে সাজসজ্জা করা (মহিলাদের জন্য) গুনাহের কাজ আর যারা (পুরুষরা) জানেন-দৃষ্টি সংযত রাখার বিধান। তাই বর্তমানের প্রায় সব বিয়ে যেহেতু কো-এরেঞ্জমেন্টে হয়, তাই দেখা যায়- অনেক মেয়েরা (যারা পর্দার গুরুত্ব বুঝে) সাজতে চাইলেও (স্বাভাবিকভাবেই বিয়েতে আপনজন সবার সাথে অনেক দিন পর দেখার একটা সুযোগ হয়, সবাই বেশ সেজেগুজে আসে, আর সেই সবার মাঝে নিজেকে সুন্দর লাগুক-এটা সবাই চায়) ছেলে-মেয়ে একসাথে থাকলে যেহেতু তার ওপর অন্য ছেলের দৃষ্টি পড়তে পারে তাই সাজতেও পারে না। তাই দেখা যায়- অনেক মেয়ে বিয়েতে এসেও হিজাব দিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং, আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে- যাতে মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবে তাদের সাচ্ছন্দ্যমত সাজতে পারে আর ছেলেরাও তাদের দৃষ্টির গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকে।

হ্যা, সেই পদ্ধতি অবশ্যই করা যায়। শুধু লাগবে একটা Strong নিয়্যত, পরিবারের সবার সহযোগিতা এবং ইচ্ছাশক্তি। বিয়েতে ছেলে-মেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে বসা-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। সেন্টার যদি দু'তলার হয়, তবে নিচ তলা ছেলে-উপরের তলা মেয়ে, আর এক তলা হলে হলরুমের মাঝে পর্দা টেনে পার্টিশন করতে হবে। মেয়েদের প্রাইভেসিতে যাতে সমস্যা না হয়। ছেলেদের ডাইনিং এ ছেলে খানসামা তথা ওয়েটার আর মেয়েদের ডাইনিং এ মহিলা খানসামা থাকবে।

এদিকে প্রশ্ন উঠতেই পারে বা অনেক পুরুষ বলতেই পারেন যে- "আশ্চর্য! আমি আমার মা/বোন/স্ত্রীর সাথে দেখা করতে যেতেই পারি, সেখানে আমাকে কেনো বাধা দেয়া হবে? বা এমন কথাও উঠতে পারে- ওমা! বিয়েতে এসে যদি বউকেই না দেখি তাহলে আসলাম কেন? বা এমন কথাও উঠতে পারে- "দেখুন! আমাদের নজর আর নিয়্যত দুটোই ভালো, তাছাড়া আমরা তো বউ এর মামাতো/ফুফাতো/খালাতো/চাচাতো ভাই/ দুলাভাই, -- আমরা আমরাই তো। আমরা আপন মানুষ উপরে গেলে সমস্যা কি"?

উত্তরগুলো ক্রমানুসারে দিচ্ছি।

নিজের মা/বোন/স্ত্রী কারো সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে সমস্যা নেই, তবে আপনি তাদের সাথে দেখা করতে গেলে সেটা অপর এক মহিলার পর্দায় ব্যাঘাত ঘটাবে। যেটা আপনাকে বুঝতে হবে। কি নিশ্চয়তা আছে যে, আপনার নজর অন্য কোনো মহিলার ওপর যাবে না?

যদিও নজর দেয়াটা উচিত নয়।

সুতরাং, আজকাল যেহেতু সবার হাতে হাতে মোবাইল, তাই সেটার সদব্যবহার করা উচিত। ফোন করে নিজের আপনজনকে ডেকে নিন বা প্রয়োজনীয় কথা বলুন। উপরে যাওয়ার দরকার কি?

এটা আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত কথা যে, বিয়ে থেকে আসলেই (ধরি, এক ছেলে তার বন্ধুর বোনের বিয়ে খেয়ে এসেছে) সবাই জিজ্ঞাস করে-

" কি রে, বউ কেমন দেখলি? কি! বউ না দেখেই চলে এলি? তাহলে গিয়েছিলি কি করতে"?

আসলে বউ দেখাটা কার জন্য জায়েজ আর কার জন্য নয়- এটা সবার জানা উচিত।

মাহরাম পুরুষ ব্যতীত বউ এর সাজ দেখার অধিকার কারো নেই। তাই যে কোনো ছেলের এটা বুঝা উচিত, আমি বউকে দেখার অধিকার রাখি কি রাখি না।

এদিকে আমি কারো নিয়্যত বা দৃষ্টি খারাপ এমন বলিনি। আমরা সবাই ভালো ,কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যারা ভালো তাদেরকেই শয়তান পেয়ে বসে, কারণ শয়তান আল্লাহ'র কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েই এসেছে যে, সে তাঁর প্রিয় বান্দাকে বিভ্রান্ত করবেই।

আপনি মামাতো/ফুফাতো..... ইত্যাদি হতে পারেন, তবে নিজের স্বার্থে এবং জীবনকে সহজ- করতেই মাহরাম-গায়ের মাহরাম এর বিধান জানা প্রত্যেক ছেলে-মেয়ের উচিত। ছোটবেলার খেলাধুলার সম্পর্ক বড় হয়ে ভিন্ন রূপ নেয়, সচেতনতা বশত পর্দা মেনে চলতে হয়- তার মানে এই নয় যে- পর্দা মেনে চলা মানে, কথা-বার্তা বন্ধ করে দেয়া।

আমি এমনও এক মেয়ের ঘটনা জানি- সে যখন জেনেছে যে, খালাতো ভাই গায়ের মাহরাম এবং তাদের সাথে পর্দা করতে হবে- সেই মেয়েটা তখন থেকে তাদের সামনে আসা এমনকি কথাবার্তাই বন্ধ করে দিলো। অথচ পর্দা মেনে চলা মানে আত্মীয়তা থেকে দূরে সরে যাওয়া নয়। পর্দাপ্রথা সম্পর্কের অন্তরায় নয়। আত্মীয়স্বজন আল্লাহ'র নিয়ামত স্বরূপ। এদিকে, আত্মীয়দের এটা বুঝা উচিত- আমি কি করে আমার অপর আত্মীয়'র অধিকার অটুট রাখতে পারি। আর নিজের পর্দা ঠিক রেখে অন্যের পর্দার সম্মান করতে পারি। তাই এই অধিকার দেয়ার মানসিকতা একে অপরের মধ্যে থাকতে হবে। এজন্যই শুরুতে বলেছি, বিয়েতে আলাদা ব্যবস্থাপনা সবার জন্য সহায়ক ভূমিকা তখনই রাখবে যখন পরিবারের সবাই উপলব্ধি করে তা কায়েম করতে সচেষ্ট হবে।

এতক্ষণ মেহমানদের নিয়ে বলছিলাম। এবার একটু বর-কনের দিকে তাকাই।

পর্দার দিক থেকে বরের কোনো সমস্যা না হলেও যত সমস্যায় পড়তে হয় বউকে। অনেকেই হয়ত বলবেন এবং বলেনও- "**আরে, বিয়েতে আবার এত পর্দা টর্দা কি**"? হ্যা, অনেকটা এমনই মনোভাব থাকে অধিকাংশ বর-কনে এবং তাদের পরিবারের।

অনেক হিজাবী মেয়েদেরকেও দেখা যায়- বিয়ের সময় পর্দা উঠে যায়।

প্রশ্ন হলো- পর্দা কি তাহলে শুধু বাসা থেকে কলেজ যাওয়া পর্যন্ত? যদিও পর্দার বিধান এমনটি বলে না। পর্দার নির্দেশনা একই। মাহরাম ব্যতীত আর সবার সামনে পর্দা করতে হবে। তা, বিয়েতে মাহরাম ব্যতীত আর সবার সামনে বেপর্দা হওয়া জায়েজ হয়ে যায়? তাই তো দেখি নির্বোধ বর পর্যন্ত নিজের ১০/১২ জন বন্ধু নিয়ে বউ এর

সামনে এসে ফটোসেশন শুরু করে দেয়। হ্যা, নিজের বউ কে নিয়ে অন্যের সামনে (একটা সীমার মধ্যে থেকে) গর্ব করতেই পারেন, তবে তাই বলে বিয়ের মঞ্চে সাজগোজ অবস্থায় থাকা নিজের বউকে গায়ের মাহরাম তথা বন্ধুর সামনে হাজির করা ঠিক নয়।

আপনার স্ত্রী তো বেপর্দা হবেই সেই সাথে তার জীবনের প্রতিও যেনো আপনি শত্রুতা করলেন। এমন অনেক ঘটনা পত্রিকায় আসে- বন্ধুর সাথে স্ত্রীর পালিয়ে যাওয়া, কিংবা তাদের ষড়যন্ত্রে স্বামীর মৃত্যু। আমি কারো বন্ধুদের খারাপ বলছি না, তবে কথাটা সেই আগের মতোই- কেউ জানে না, কখন তার দ্বারা গুনাহ হয়ে যাবে, তাই সেইফ সাইডে থাকা উত্তম। নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আর পরিচিতির জন্য কখনো আপনার বন্ধু বাসায় আসলো, আপনার স্ত্রীর সাথে দেখা হলো সেটা আলাদা প্রসঙ্গ, তবে বিয়ের সাজে দেখা ঠিক নয়।

এদিকে দুঃখের সাথে বলতে হয়- বউ এর সাজসজ্জা দেখার অধিকার তার স্বামীর থাকলেও কো-এরেঞ্জমেন্টে অনেক গায়ের মাহরাম পুরুষ বউকে দেখে ফেলে এতে বউ-এবং সেসকল পুরুষ সবাই গুনাহের শামীল হয়। উভয়ের পর্দার নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায়- মেয়েটি ইসলামি মাইন্ডেড তবে তার পরিবার সেরকম না হওয়ায় বিপাকে পড়ে যায় মেয়েটি। বাধ্য হয়ে বিয়ের দিন এক প্রদর্শনীর পুতুলের মতো মঞ্চে বসে থাকে মাহরাম-গায়ের মাহরাম সবার দেখার জন্য।

সুতরাং স্বয়ং বউ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যমত সাজতে পারে এবং কারোই পর্দা যাতে লঙ্ঘিত না হয়- সেই দিকে খেয়াল রেখেই বিয়েতে ছেলে-মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থাপনা করা অতি জরুরী।

বিয়ে বাড়ি কার না ভাল্লাগে !

4 November 2014

সংকলনে - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

এক .

//ইচ্ছামতো বিরিয়ানি, কেউ খায় কেউ নষ্ট করে, আবার ইচ্ছেমত ফ্রি মিক্সিং, নেক্সট বিয়ের জন্য বা প্রেম করার জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা খাতির জমানোর জন্য বিয়ে বাড়ির কোন তুলনা কি আসলে হয়? বিয়ে বাড়ি কার না ভাল্লাগে !//

অস্বিকার করার উপায় আছে কি যে বর্তমান বিয়ে বাড়ীর চিত্র উপরের কথা গুলোর মতন নয়! আমরা মুসলিম শুধু সালাত আদায়ে? আমরা মুসলিম কি শুধু জন্ম গ্রহনে নাম রাখা ক্ষেত্রে? আমরা মুসলিম কি শুধু মৃত্যু হলে জানাজায় অংশ নেয়াতে? আর শুধু বিয়ের দিন কাজীর কলমে?

না আমরা ইসলামিক জীবন ব্যবস্থাকে জানা ও মানা ইবাদাত মনে করি। তাই আমাদের মুসলিম সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো হোক পাপের সুযোগ মুক্ত। বিয়ের পরিবেশ নিয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে। আর চুপ থাকলে চলবেনা ভাই, ওপারে (পরকালে) অনেক কিছু হারাতে হবে! মুরুব্বী তথা পরিবারের সবাইকে বুঝাতে হবে বিয়ে হোক আল্লাহর আদেশ মেনে , শয়তানকে খুশী না রেখে! আমাদের মাঝে আল্লাহমুখী অন্তর এগিয়ে আসুক এসব পরিবর্তন করতে আমীন।

দুই .

বাংলাদেশের বেশিরভাগ বিবাহিত নারীর জন্য বাস্তবতা এটাই -

তারা বাইরে যাবার সময়, বিয়ের দাওয়াতে উপস্থিত হবার জন্য, বা কোন পার্টিতে যোগদানের সময় এতোটাই মোহনীয় সাজগোজ ও রংবেরং-এর মেকআপে নিজেদের রাঙিয়ে তোলে যে তাদেরকে দেখে মনে হয় তারা বুঝি কোন রূপালি পর্দার "মডেল কন্যা"!

প্রয়োজনে তারা বিউটি পার্লারে যেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় এবং স্বামীর পকেটের হাজার-হাজার টাকা নির্দ্বিধায় ব্যয় করে হলেও নিজেকে "আকর্ষণীয়" করে তোলে!

আল্লাহু 'আলেম! তাদের এই সাজসজ্জা কাকে দেখাবার জন্য? কার প্রশংসা পাওয়ার জন্যই বা তারা এমনটা করে? কিসের আশায় তারা মাত্র এক ঘন্টার পার্টির জন্য অজস্র সময়-শ্রম-মূল্য বিনিয়োগ করে?

খুব করুণ সত্য হচ্ছে - এইসব নারীদেরকেই নিজের বাড়িতে দেখলে আপনি হয়তো আত্কে উঠবেন! কারণ নিজ-ঘরের আবরণে তাদের যে "looks" থাকে, তা বুয়াদের-ও অধম..!

হায়রে আধুনিক নারীর দল! তোরা এখনও বুঝলি না স্বামীর চোখে সুন্দরী হওয়াতেই তোদের মর্যাদা ছিল। পরপুরুষের চোখের জ্বালা বাড়িয়ে তুই শুধু গুনাহ ছাড়া আর কিছুই পাবি না, হ্যাঁ, কিছু সস্তা মূল্যবোধ-অলা-মানুষের "সস্তা" প্রশংসা কুড়াতে পারবি বটে... ওতে যদি তোর সস্তা আত্মতৃপ্তির বোধ কিছুটা বাড়ে তাহলে চালিয়ে যা...!

//বিয়ের অনুষ্ঠানে লাস্যময়ী তরুণীদের মেলা।//

মাঝে মাঝে বেশী সুন্দর মেয়ে দেখলে নারীদের চোখ ও যে আটকে যায় না, তা না। বরং, অনেক সময় মনে হয়

মেয়েরাই ছেলেদের চেয়ে দামী শাড়ি, দামী গহনা, একে অন্যের গেট আপ বেশী দেখে!

আনকমন শাড়িটা কোথা থেকে কেনা, চুড়িটার দাম কতো, আর বেশী পছন্দ হলে সে জিনিষ হাসিলের ইচ্ছা, এসব মেয়েদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়!

কয়দিন আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে এসব লাস্যময়ী তরুণীদের দেখে একজন খুব আফসোস করে বলছিল- যতো কিছুই বলো! হিজাব পড়ে মানুষ যতোই সাজুক, এতো সুন্দর লাগেনা, যতো সুন্দর হিজাব ছাড়া লাগে!

আমি ইচ্ছা করলে তখন পর্দা হিজাবের মর্ম বুঝাতে পারতাম। কিন্তু তার কথাটা বুঝার চেষ্টা করলাম। আসলেই তো কথা ঠিক!

হিজাব পরার পরেও যদি মেয়েদেরকে বাসায় যেমন সুন্দর লাগে তেমন সুন্দর লাগবে, মানুষের তেমনই মাথা ঘুরিয়ে যাওয়া টাইপ রূপসী লাগবে, তাহলে এই হিজাবের দরকারই বা কি ছিল!

হিজাব তো মূল্যবান সুন্দর কোমর সমান কেশ কুন্তলাকে লুকিয়ে রাখার জন্যই, যা দেখে জীবনানন্দ দাশরা কবিতা লিখে, চুল তার কবে কার!

হিজাব তো সেই সুন্দরকে লুকিয়ে রাখার জন্য যা দেখলে জাহান্নামে হাজার হাজার সাপ কামড় দিবে!
তো? আমরা কেন হিজাব পরেও এমন সুন্দর শুনার,বলার বা পাল্লা দেওয়ার প্রতিযোগিতা করবো?

কিংবা বান্ধুবির কোমর সমান চুল যার তার চুল দেখে মনে মনে ভেবে মরবো- আহ! যেই রূপ লুকিয়ে রেখেছি, তা দেখালে কতো ছেলের যে মাথা যেতো! আমার কি চুল নাই নাকি!

আসলে ইসলাম কিন্তু মুসলিম জাতির বিপর্যয়ের পিছনে কোন পরাশক্তির আক্রমণকে ভয় করেনি, ভয় করেনি বড় বড় অস্ত্রশস্ত্র কেও!

যেটা ভয় করেছে সেটা হোল- নারী!
যেই শেভিং ক্রিমের নারীর কোন কাজ নাই, যেই শার্টের অ্যাডে নারীর কোন উপকার নাই, যেই ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্দসাম ক্রিম নারী মাখে না, সেই বিজ্ঞাপনে নারী কেন আসে?

কারন- এই এক বিষয়ই পৃথিবীর তাবৎ দুর্বলতা আর আবেগের মূল!

তাইতো নারীদের নিয়েই চিন্তিত ধর্ম!
আর আমাদের তো একটা ধারনা হয়েই গেছে যে- বোরখা সিজনাল!

বাসার ছেড়া জামাটা লুকাতে , বাজারে যেতে কাপড় পাল্টানোর ভয়ে বোরখা পড়ে অনেকেই!

তাই তারা আবার বিয়েতে বোরখা পড়বো শুনলেই চোখ কপালে তুলে ফেলে!

আপু, ড্রেস তো ড্রেস ই! তাইনা?

তোমার লজ্জা নিবারণের কাজ ই যার মুখ্য উদ্দেশ্য! আর নারী হলে উদ্দেশ্য শালীন থেকে আর ১০ জনকে নিজেদের ঈমান বাঁচাতে সাহায্য করা!

বিয়েতে সাজুগুজু করে সারা বছরের বাজারে যাওয়ার, আর তাড়াহুড়া করে বাইরে যাওয়ার পোশাক ছুড়ে ফেলবে,

আবার ছেলেরা তাকালেও দোষ হবে, এটা তো কাজের কথা না!

সবসময় এক রকম থাকলে ক্ষতি কি!

- Sheikh Safwana Jerin

বিয়ের দিনে হিজাব এবং হিজাব শুরু করার গল্প !

7 April 2015

সংকলনে - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

এক.

এক বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলাম। কনে আমার দুঃসম্পর্কের চাচাতো বোন।

মেয়েটা হিজাব পরেই বাইরে চলাফেরা করে। কিন্তু বিয়ের সময় এতগুলো মানুষের মাঝে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে শুধু বিয়ের শাড়ি পরিয়ে। ছেলে মেয়ে সবায় কত আগ্রহ নিয়ে দেখছে। আমিত অবাক।

চাচিকে বললাম- ওকে অন্তত একটা বড় ওড়না দিতে পারতেন।

চাচি বললেন- মা বিয়ের দিন থাকনা

আর কিছু বল্লাম্না। কিন্তু মেয়েকে যখন বিদায় দেই তখনও সে হিযাব ছাড়া। মন খারাপ হয়ে গেল। আবার চাচীকে বললাম তাকে হিজাব পরাতে। চাচী বললেন বিয়ের দিন থাকনা।

পর্দার বিধানে বিয়ের সময়কে পর্দার আওতা মুক্ত রাখা হয়েছে বলেত আমার জানা নাই। কিন্তু প্রায় বিয়ের অনুষ্ঠানে এটা দেখা যায়।

আমার মতে বিয়ের দিনই পর্দার দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া দরকার। কেননা সেদিন কনে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতেথাকে

সেদিন এক আত্মীয় বলছিলেন, 'বাংলাদেশে এখন একটা ভালো ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, কোনো বিয়েবাড়ীতে গিয়ে এখন আর বোঝা সম্ভব না, এটা মুসলিম না হিন্দু বিবাহ'।

কী করে বোঝা যাবে?

সব তো একই পোশাক, একই সাজে সজ্জিত ! রীতিরেওয়াজগুলোর মধ্যেও আর তেমন একটা তফাত দেখা যায়না। সিরিয়ালে যা দেখা যায় সেভাবেই সবকিছু সম্পন্ন করার উদগ্র আগ্রহ সর্বত্র। আমরা কোথায় চলেছি, কেনই বা চলেছি এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারো নেই। তবে এই গড্ডলিকা প্রবাহ আমাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে চিন্তা করার সময় হয়ত শেষ হয়ে এসেছে।

এখনো যদি আমরা মাথাব্যাথার প্রতিষেধকের প্রয়োজন বোধ না করি পরে হয়ত মাথাটাই আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা!

দুই.

একটি ঘটনা বলি?

আজ কেন জানি লিখতে ইচ্ছা হলো জানিনা কেন তবুও লিখছি।

আমার ননদের যখন বিয়ে হলো,খুব জাকজমক পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠান হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টার,ভিডিও, ক্যামেরা সব কিছুর সমারোহ ছিল। যখন ওকে স্টেজে বসানো হলো তখন সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল। বড় ভাবী মেজ ভাবী,শরিয়তের সকল হুকুম লঙ্গন করে পার্লার থেকে সেজেগুজে ভিডিওর সামনে ছিল সর্বদা উপস্থিত। এত মানুষের মাঝে ছোট ভাবি (আমি) ছিলামনা। কেউ আমাকে ডাকেওনি। আমি ছিলাম বোরকা পড়া,হাত মোজা পা মোজা পড়া,স্টেজের এক কিনারে দাড়ানো।

ভিডিওর সামনে যাবনা,ছবি তুলবনা এটা আমি আগেথেকেই বলে রেখেছিলাম।

বড় ভাবীমেজ ভাবি সবাই স্টেজে ভিডিও করছিল। তাই ঐ দিন আমার ননদের শ্বশুড়বাড়ীর কেউ আমাকে চিনেওনি। সব জায়গায় বড় ভাবীকেপ্রাধান্নদেয়াতে মেজ ভাবী খুব রাগ হয়। সব কিছুতে বড় ভাবীকে কেন ডাকা হচ্ছে। তাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছেনা কেন।

রাগকরে সে না খেয়েই সেন্টার ছেড়েচলে যায়। বোরকা পড়ে আমি এক পার্শ্বে দাড়িয়ে ছিলাম। কেন আমাকে ডাকা হচ্ছেনা পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছেনা,এগুলো আমার কাছে একটুও কষ্ট লাগেনি। বরং বিধর্মীদের অনূকরণ থেকে হারামভাবে নিজেকে বাচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। সবাই বলছিল একদিনের জন্য বোরকা না পড়লে কি হয়?যাই হোক বউ বিদায়ের সময়হলো। জামাই বউয়ের গাড়িতে যাওয়া নিয়েও সমস্যা হলো কে যাবে?বড় ভাবী বলে ও যাবে বউয়ের সাথে।

আমার শ্বাশুড়ি বলছিল যাতে আমি যাই। ভাবী রাগ সে যাবে। যাই হোক সেই যায়। আমি বেচে যাই এক গাড়িতে বসা থেকে। তো সব কিছুর মাঝে কোন ভিডিও ক্যাসেট,ছবি কিছুতেই আমি ছিলামনা। যখন সবাই বিয়ের পর ক্যাসেট দেখে আমাকে খুজে। আমার ননদকে বলে তোমার ছোট ভাবী কোথায়?সবাই জেনে যায় যে,ছোট ভাবী পর্দা করে সে

ভিডিও বা ছবি তুলেনি,ভাইয়াও তুলতে দেয়নি। তখন আমার প্রতি সবার সম্মান বেড়ে যায়। এখনো ঐ বাসার প্রতিটি মানুষ আমাকে অনেক আদর করে,অনেক সম্মান দেয়। কোন ভাবীকে ফোন দেয়না। কিন্তু আমাকে ফোন দিয়েপ্রায়ই খোজ নেয়।

কিছু জানার হলে জানতে চায়। যদিও ক্ষনিকেরজন্য সব কিছুতেই আমাকে অবহেলা করা হচ্ছে,সম্মান দেয়া হচ্ছেনা,এমনটি ভেবেছিলাম। পুরোটা অনুষ্ঠানে আল্লাহর হুকুম মেনে চলাতে,বিনয় প্রকাশ করাতে আমার সম্মান এতটা বেড়ে যায় যা আমি এখনো পাচ্ছি। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। দুনিয়ার জীবনটাও এমন। আল্লাহ যাকে সম্মান দেন তাকে কেউ অপমানিত করতে পারেনা। দুনিয়ার নিকট কিছু সময়ের অপমানিত হলে ও আল্লাহর নিকট সে হয় সর্বদা সম্মানিত। আল্লাহ এই বিষয়টা আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুক।

তিন .

বিয়ে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিলো...বিয়ের অনুষ্ঠান এমন হবে, বিয়ের সাজ এমন হবে...আল্লাহর রহমতে একটু করে হলেও ইচ্ছের সবগুলোই পূরণ হয়েছে, তবে কাঠখড়টা পোড়াতে হয়েছে অনেক বেশি!!

হিজাব করা নিয়ে এই জীবনে কম কথা শুনতে হয় নি...মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মঞ্চে আবৃত্তি করতে যাবার আগে আমাকে বলা হয়েছিলো, হিজাব খুলে আবৃত্তি করার কথা...মিডিয়াতে লেখালেখির কাজ যখন শুরু করলাম, আমাকে বলা হলো, 'এইখানে তো কেউ হিজাব পরে না, মানুষকে নাচাইতে এসে ঘোমটা দিলে হবে?'

আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের একজন কী দুইজন বাদে কেউ হিজাব করে না...বিয়েতে সবাই অনেক করে অনুরোধ করলো, 'একটা দিনই তো মানুষ বউ দেখবে, একদিন হিজাব না পরলে কী হয়?'

কোন কিছুতেই আমি টলি নি...যতদূর শুনেছিলাম, কুষ্টিয়াতে এখন পর্যন্ত আমিই একমাত্র মেয়ে যে হিজাব পরে বিয়ের স্টেজে কনে সেজে বসেছিলো!! আমার যুক্তি খুব সাধারণ...আমি যেমন চলি, আমি সবসময়ই তেমন চলতে চাই...শুধু একদিনের জন্যে কেন আমাকে আমার নিজস্ব আইডোলজি থেকে সরে আসতে হবে? কেন মানুষের জন্যে আমি নিজের ভেতরের চেতনাকে জলাঞ্জলি দেবো?

চার .

আমি হিজাব করা শুরু করি লন্ডনে, এর আগে বাংলাদেশে থাকতে হিজাব নিয়ে কোন জ্ঞানই আমার ছিল না। এটা যে প্রত্যেক মুসলিম নারীর জন্য "অপশনাল" নাহ, বরং ৫ ওয়াক্ত সালাহ বা রমজানের রোজার মতোই "ফরয" একটা কাজ তা আমার চিন্তার শত শত মাইল দূরে ছিল।

আলহামদুলিল্লাহ,লন্ডনে দ্বীন ইসলামের সাথে সত্যিকারভাবেই যখন পরিচিত হলাম, হিজাবের প্রতি ভালোবাসা গড়ে উঠলো। পরম মমতায় মাথায় কাপড় টেনে নিলাম।

এরপর একে একে স্কার্ফ, বোরকা সবই পরেছি এবং কন্টিনিউ করছি।

লন্ডনের তাপমাত্রা বাংলাদেশের তুলনায় বাড়াবাড়ি রকম কম!

সেখানে সামারে সবচেয়ে গরমের দিনটিতেও তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাংলাদেশে এবার পা দিয়েই বুঝলাম ২৩ ডিগ্রী চলছে। বসন্ত পার হয়ে গ্রীষ্ম আসতে না আসতেই তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রীও ছাড়িয়ে গেছে, সুবহানআল্লাহ! এই গরমের মাঝে অনেকেই আছেন, "গরম লাগে" বলে হিজাব করেন না, মাথার কাপড়টাও ঠিকমতো দেন না, আজ তো বাইরে যেয়ে দেখলাম অনেকের বুকের ওড়নাখানাও নেই!

আসলে কি, লন্ডনে এতোদিন হিজাব করে আসা এই আমিও কোনদিন এতো রোদের মাঝে, ফুটন্ত সূর্যের নিচে কালো বোরকা পরে হেঁটে অভ্যস্ত ছিলাম না। কিন্তু তবুও আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে সহজেই হিজাব রক্ষা করে চলতে পারছি।

আজ একটা ব্যাপার আবারো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম, আমাদের সমস্যাটা "গরম"কে নিয়ে নয়, আমাদের সমস্যা আমাদের আক্বীদায় বা আমাদের "বিশ্বাসে"।

যার মনে এই ভয় আছে হিজাব না করার অপরাধে জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে, যে আগুনের উত্তাপ এই দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০গুণ বেশি, সে কি আর গ্রীষ্মকালের গরমের ভয় পাবে?

আর যে জানবে এটাই মুসলিমাহর ভূষণ, তার সম্মান, তার মর্যাদা, সে ভালোবেসেই হিজাব করতে পারবে। আর যে হিজাবকে ভালোবাসবে, সে প্রচণ্ড রোদে ঘেমেনেয়েও হিজাব ধরে রাখতে পারবে।

After all, ভালোবেসে মানুষ কতো অসম্ভবকেই সম্ভব করে ফেলে, আর আল্লাহকে ভালোবেসে, রাসূলুল্লাহ (সা) ভালোবেসে, ইসলামকে ভালোবেসে সে সামান্য হিজাব করতে পারবে না তা কি হয়?

পাঁচ .

একটা সময় মনে হতো (পর্দা শুরু করার আগে) মাহরাম ছাড়া যে কোন ছেলের সাথে কাভার করে চলবো, কথা বলবো না , কিভাবে সব কিছু ম্যানেজ করবো তাহলে ? পড়াশোনার ক্ষেত্রেই তো কত হেল্প লাগে !! কত ইনফরমেশন জানার দরকার হয়, যা বান্ধবীদের কাছে সবসময় পাওয়া যায় না!!!

আমার কোন বড় ভাই ছিলো না। বাবাও অনেক ব্যস্ত থাকতেন ওনার অফিসের দায়িত্ব নিয়ে।

এমন সব হাবিজাবি চিন্তার মধ্যে একজন বড় আপুর (দ্বীনি বোন) সাথে কথা হচ্ছিলো।সারমর্ম টা দাঁড়ালো এমন.....

যাদের সাথে আল্লাহ পাক এত কঠিন পর্দা করতে বলেছেন, তাদের কাছে আসলেই আমাদের কোন প্রয়োজন রাখেন নাই। যে মিক্সিং টা হচ্ছে, যেটাকে আমরা প্রয়োজন ভাবছি, সেটা পুরোটাই আসলে অপ্রয়োজনীয়, শয়তানের ওসওয়াসা। আমরা এখান থেকে বের হতে পারছি না, তাই আল্লাহও আমাদের কে নন-মাহরাম দের প্রতি Dependent করে দিচ্ছেন।পর্দা নষ্ট করে যে হেল্প টা আমরা পাচ্ছি এখানে আল্লাহ'র সন্তুষ্টি, আল্লাহ'র বারাকাহ কতটুকু থাকে?

আলহামদুলিল্লাহ!! আপুর সাথে এই ডিসকাশনটা আমাকে আল্লাহ'র উপর তাওয়াক্কুল (ভরষা) করে এগিয়ে যেতে অনেক বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে।এর পর আল্লাহ তায়ালা ও আমার সামনে হাজার টা পথ খুলে দিয়েছেন। যেটা আগে আমি কখনো চিন্তাও করতে পারিনি।

আমাদের কাজ তাওয়াক্কুল করে লক্ষ্যের দিকে হালাল উপায়ে এগিয়ে যাওয়া..... বাকী কাজ আমাদের অভিভাবক আল্লাহ তায়ালার!!! সুবহানাল্লাহ!!!

ছয় .

গতকাল একটি মেয়ে আমার বাসায় এসেছিল ড্রেসের কালেকশন দেখতে। দেখালাম। ওগুলো নেড়েচেড়ে হঠাৎ বলল, আপনার পেইজে কিছু বোরকা দেখেছি, ওগুলো একটু দেখান না প্লিজ। আমি দেখালাম। দেখে বলল, একটু পরে দেখি? বলে সবগুলো পরে সারা ঘরে ঝলমলে মুখে হেঁটে হেঁটে দেখতে লাগল। একটা বোরকা একেবারে তার মাপমত হয়ে গেল। সেটা পরে তার এক্সপ্রেশন–এটা মনে হয় আমার জন্যই বানানো হয়েছে! বলে বলতে লাগল, আমার বাবা সৌদিতে থাকে। আমাকে সবসময় বলে বোরকা পরতে। আমি পরা শুরুও করেছিলাম কিন্তু ভাল লাগেনা বলে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আপনার বোরকাগুলো এত ভাল লাগে, আমি এখন থেকে বোরকাই পরব। বলে উচ্ছ্বলভাবে এটা নিব, ওটা নিব বলে বাছাই করা শুরু করে দিল!

প্রোডাক্টিভ মুসলিম ওয়েবসাইটের এক লেখায় পড়েছিলাম, ব্যবসা কেন করা উচিৎ– কারণ একজন ব্যবসায়ী সমাজকে ইনফ্লুয়েন্স করার ক্ষমতা রাখেন। মা খাদিজা (র) ছিলেন ব্যবসায়ী। ইন্দোনেশীয়া মুসলিমপ্রধান দেশ হবার পেছনেও নাকি রয়েছে মুসলিম বনিকদের ভূমিকা! আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার কাজটাকে প্রচন্ড ভালবাসি (smile emoticon)।

সেইসাথে ঝট করে আমার অতীতের কথা মনে পরে গেল। আমিও বোরকা পরা শুরু করেছিলাম একদম পর্দা ফরজ হবার সময়েই। দাদুর বোরকা পরতাম। কিন্তু আফসোস! কেউ উৎসাহিত তো করেইনি, বরং বোরকাওয়ালী তকমা শুনতে হয়েছে অনেক। ওই এক বোরকাই পরে আড়াইটা বছর পার করে অবশেষে শয়তানের সহায়তায় বোরকা ছেড়ে দিলাম। এখন মনে হলে বড্ড খারাপ লাগে। তবে এই অভিজ্ঞতা আমায় একটা জিনিস শিখিয়েছে, ঈমানের ব্যাপারে আমাদের আত্মবিশ্বাস থাকাটা খুব প্রয়োজন। শয়তান এটা নিয়েই প্রথমে কাজ করে। একটা মানুষের উৎসাহের প্রয়োজন হয়। ধার্মিক পরিবেশে সে চারপাশের মানুষকে দেখে মোটিভেটেড হয়। কিন্তু যারা এরকম পরিবার পায়না তারা?

তাদের প্রয়োজন সুন্দর করে পর্দার দিকে আকৃষ্ট করা, একটা ইসলামিক এনভায়রনমেন্ট দেয়া যাতে করে হিজাবে সে কমফোর্ট ফিল করে, আর তাকে ইলম অর্জনে সাহায্য করা, এটাই তাকে পরবর্তীতে "কালো ভুত" হতেও কনফিডেন্স দেবে!

নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে পজিটিভ চেইঞ্জ আশা করাটা বোকামি।

আর তাই, হিজাব নিয়ে কটাক্ষ করে একটা মেয়ের কনফিডেন্স লেভেল নষ্ট করে পারতপক্ষে আমরা শয়তানের কাজটাই সহজ করি।

লিখেছেন- ১. Rehnuma Bint Anis

২. Umme Mabrura Jahin

৩. Kaniz Fatima Chhanda

৪. Anika Warda Tuba

৫. Tamanna Afroz

৬. Fariza Binte Bulbul

শ্বশুরবাড়িতে পর্দা করতে ও জাহেলি গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠানকে না বলতে কি খুব কষ্ট হয়?

31 October 2014

লেখকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

এক.

শ্বশুরবাড়িতে পর্দা করতে কি খুব কষ্ট করতে হয়? আল্লাহর সাহায্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

বিয়ের পর নববধূ হয়ে যখন শ্বশুর বাড়িতে যাই, তখন পর্দাহীন পরিবেশের সাথে নিজেকে পর্দার মাঝে রাখা অনেক কষ্টকর হতো। যদিও সংসার স্বামী আর শ্বাশুড়ি ছাড়া আর কেউ ছিলনা। কিন্তু যখন বড় দুই ভাশুর আসতেন, তখন বলা হতো বড় ভাই তো হয়, সামনে গেলে কিছু হবেনা।

অথচ ভাশুর কখনো মাহরাম হয়না, তাদের সামনে পর্দাহীনভাবে যাওয়া ইসলামে কঠোর ভাবে নিষেধ করে এই কথাটি ঐ সময় বুঝাতে অনেক কষ্ট হয়েছিলো। এমন ও সময় গিয়েছে সারাদিন বোরকা পড়েই থাকতে হয়েছে। যে কোনো বিয়ের অনুষ্টান,ঘরোয়া কোনো পরিবেশে কখনোই পর্দাকে লঙ্গন করিনি, যদিও নিজেকে বাঁচানো অনেক কষ্টকর হতো।

কিন্তু আজ এমন একটি পরিস্থিতিতে এসেছি যে, সবাই বুঝে এই মেয়েটি পর্দা করে চলার চেষ্টা করে, তাকে সাহায্য করা উচিত। তাই বড় ভাইয়ারা যখনি বাসায় আসে ভিতরে ঢুকার পূর্বেই জিজ্ঞেস করে আমি আছি কিনা!

থাকলে আমি যেন ভিতরে চলে যাই। আল্লাহর রহমতে ননদের স্বামী, ভাশুরদের সামনে কখনোই পর্দার লঙ্গন হয়নি। আমি শুধু চেষ্টা করেছিলাম গুনাহের পরিবেশের মাঝেও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার। সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহ করেছেন।

তাই জীবনের কঠিন কোনো মূহূর্তেও এখন আর হতাশা কাজ করেনা। মনের মাঝে প্রশান্তি আসে এই ভেবে যে, আল্লাহতো মুমীনের সাথে সর্বদাই আছেন। তিনি থাকতে কিসের ভয়, আর কিসের পেরেশানী? আল্লাহ যার সাথে থাকেন তার কোনো ভয় নেই, কোনো পেরেশানী নেই।

হৃদয়ের আকুতি একটি, তিনি যেন সর্বদা তার রহমতের দৃষ্টির মাঝে আবদ্ধ রাখেন আমায়। আমাদের কে তিনি যেন পরিপূর্ণ রুপে পর্দা করে চলার তৌফিক দান করেন।

লিখেছেন : মারইয়াম উম্মে মাবরুরা

দুই.

দেবর-ভাবীর মাঝে পর্দা/হিযাবের প্রয়োজনীয়তা !

ওকবা ইবনে আমের জুহানী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনসারী সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী পক্ষীয় আত্মীয় সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললে, সে তো মৃত্যু। -সহীহ বুখারী ৯/২৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৭২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ১১৭১; মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪৯, ১৫৩

এই হাদীসে বেগানা নারী-পুরুষের একান্ত অবস্থানকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে স্বামী পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন যেমন দেবর-ভাসুর ইত্যাদির সাথে অধিক সাবধানতা অবলম্বনকে অপরিহার্য করা হয়েছে।"

তিন.

জাহেলি গায়ে-হলুদের উত্সবকে আপনার হয়তো 'না' বলতে অস্বস্তি হবে। তবুও এড়িয়ে চলুন প্লিজ !

"ইসলামের কথা, নামাজের কথা, হিজাবের কথা বলতে যেয়ে অনেকের মুখেই আমি একটা অভিযোগ বা কইফিয়ত শুনে আসছি - "মন থেকে আসছে না, মন থেকে না আসলে কীভাবে মানবো?"

কিন্তু তাদের কাছে আমার প্রশ্ন- আমরা জীবনে যা কিছুই করি, সবকিছুই আমাদের মন থেকে আসে??

একজন মায়ের ঘাড়ে রান্নাবান্না, ঘরদোড় ঝাড়ু দেয়া-ধোয়ামোছা, একগাদা থালাবাসন মাজা, ময়লা কাপড় কাচা থেকে শুরু করে বাচ্চার পায়খানা-পেশাব-বমি পরিষ্কার সব দায়িত্ব এসে পড়ে। সব সময়ই কি তার ইচ্ছা করে এগুলো করতে? এ কাজ গুলো সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারটা সব সময়-ই কি তার মন থেকে আসে??

একজন শিক্ষার্থীকে ইচ্ছা না থাকলেও পছন্দ-অপছন্দ সব সাবজেক্ট পড়তে হয় 'পরীক্ষা পাশের জন্য', 'ভালো গ্রেড পাওয়ার আশায়' এমন পড়াশুনার কাজটা কি তার মন থেকে আসে?? ভাইভা দেবার আগে সাধারণ জ্ঞানের মোটা মোটা দু'টো গাইডবই মুখস্থ করে ফেলতে হয় - এটা করতে কি তার মন থেকে ইচ্ছা/ আগ্রহ কোনটাই আসে??

একজন চাকরিজীবি ব্যক্তিকে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ঘেমে-নেয়ে বা বর্ষায় চেপচেপা কাদা পেড়িয়ে অফিসে যেতে হয়, প্রতিদিন কাজ করার ইচ্ছা কি তার মন থেকে আসে??

না! উপরের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর-ই না। এ কাজগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কারো মন থেকে আসে না, কারোই করতে ইচ্ছা করে না। তবুও করতে হয়। বিনিময়ের আশায় বা দায়িত্ববোধ থেকেই একাজগুলো আমরা করে ফেলি। প্রচণ্ড অনিচ্ছা নিয়েও করে ফেলি! আমাদের জীবনে এমন কাজের উদাহরণ দেয়া যাবে আরো ভুরি ভুরি ……..

ঠিক একইভাবে ইসলামের অনেক কাজ হয়তো আপনার মন থেকে আসবে না। হিজাব করতে কষ্ট হবে, আগ-বাড়িয়ে সালাম দিতে লজ্জা লাগবে, নামাজ পড়তে আলসেমি আসবে। ইসলামের কথা বলতে গেলে মুখে বাধো-বাধো লাগবে। জন্মদিনের দাওয়াতে, ছেলেমেয়ে মেশানো ক্লাসপার্টিতে বা জাহেলি গায়ে-হলুদের উত্সবে 'না' বলতে অস্বস্তি হবে। হ্যাঁ বোন, প্রথম প্রথম এমন হবেই। কিন্তু তবুও, তবুও আপনাকে কাজগুলো করতে হবে। অনিচ্ছা-অনীহা-ভয়-সংকোচ-লজ্জা নিয়ে হলেও কাজগুলো করে ফেলুন। ইসলামের জন্য করুন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করুন। আখিরাতে উত্তম বিনিময় লাভের জন্য কাজগুলো করুন। জান্নাতে একটা ঘর পাবার আশায় কাজগুলো করুন! আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (বাক্বারাঃআয়াত ২১৬)

আসুন আমরা হাত তুলে মন থেকে sincerely দু'আ করি যেন আল্লাহ আমাদের মন থেকে এ ভয়-সংকোচ-আলসেমি উঠায় নেয়!

“হে আল্লাহ! যা কিছু ভালো, যা কিছুই ইসলাম করতে বলেছে, তার প্রতি আমাদের মনকে ঝুঁকিয়ে দাও, আর যা কিছু খারাপ, যা কিছু থেকে ইসলাম বিরত থাকতে বলেছে, আমাদেরকে তার থেকে বিমুখ করে দাও, আমীন!”

আল্লাহ আমাদের সবার জন্য ইসলাম মেনে চলাকে সহজ করে দিক…আমীন।

''আমাকে বিয়ের প্রস্তাবকারী ছেলে আমার হিযাব পরাকে মেনে নিচ্ছে না, আমি কি তার সাথে সম্পর্ক করব; নাকি প্রত্যাখ্যান করব?''

26 January 2015

প্রশ্ন: আমি তিউনিসিয়ার অধিবাসী একজন ধার্মিক মেয়ে। আমার সমস্যা হচ্ছে- আমাকে বিয়ের প্রস্তাবকারী ছেলে আমার হিযাব পরাকে মেনে নিচ্ছে না, এমনকি সেটা যদি আধুনিক যুগের হিযাব হয় সেটাও না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমি কি তার সাথে সম্পর্ক করব; নাকি প্রত্যাখ্যান করব?

উল্লেখ্য, অধিকাংশ তিউনিসিয়ান ছেলে এ ধরনের মানসিকতার হয়ে থাকে।

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

সম্মানিত বোন, আপনার জন্য আমাদের উপদেশ হচ্ছে- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া উপদেশ। যে উপদেশের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে – 'তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় কর।'[সূরা নিসা, আয়াত: ১৩১]

আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে দুনিয়ায় কি ভাল কিছু পাওয়া যাবে! আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ ছাড়া কি সুখের কোন পথ আছে! কোন মুমিন কি আখেরাতকে ধ্বংস করে দুনিয়া পেতে চাইবে! আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে ঈমানদারেরা, আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করে দেখুক আগামী দিনের জন্য সে কী (পূণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই পাপাচারী।" [সূরা হাশর, আয়াত: ১৮-২০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেলেকে যেমন দ্বীনদার মেয়ে পছন্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক তেমনি মেয়েকে ও মেয়ের পরিবারকে দ্বীনদার ছেলে পছন্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

“তোমরা যে ছেলের দ্বীনাদারি ও চরিত্রের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পার সে যদি প্রস্তাব দেয় তাহলে তার কাছে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে মহা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।” [সুনানে তিরমিজি (১০৮৪) আলবানী সহিহ সিলসিলা (১০২২) গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হিযাব পরিধানে বাধা দেয় সে দ্বীনদার ও চরিত্রবানদের কাতারে পড়ে না; যা দেখে বিয়ে দিতে বলা হয়েছে। বরং প্রবল ধারনা হচ্ছে- যে লোক তার স্ত্রীকে হিযাব পরতে বাধা দেয় সে অন্য আরো অনেক কবিরা গুনাহ, হারাম ভক্ষণ, আল্লাহর বিধানাবলীর মর্যাদা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিথিলতা করবে।

এ ধরনের লোক তার স্ত্রী ও পরিবারকে কিভাবে হেফাযত করবে, কিংবা কিভাবে তার সন্তানসন্ততিকে আল্লাহর আনুগত্যের উপর লালন-পালন করবে অথচ সে নিজেই গুনাহ করে ও গুনার কাজের নির্দেশ দেয়। আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা (ফিকহী বিশ্বকোষ) গ্রন্থে (২৪/৬২) এসেছে-অভিভাবকের কর্তব্য হচ্ছে- তার অধীনস্থকে তাকওয়াবান ও দ্বীনদার পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়া।

শাইখ সালেহ আল-ফাওযান ‘আল-মুনতাকা’ গ্রন্থে (৪, প্রশ্ন নং ১৯৮) বলেন: বিয়ের ক্ষেত্রে সৎ ও দ্বীনদার পাত্র নির্বাচন করা কর্তব্য। যে পাত্র বিয়ের পবিত্রতা রক্ষা করবে ও সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। এ ক্ষেত্রে কোনরূপ ছাড় দেয়া জায়েয নয়। বর্তমানে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যাপক অবহেলা দেখা যাচ্ছে। এখন লোকেরা এমন ছেলেদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয় অথবা তাদের আত্মীয়দের বিয়ে দেয় যে ছেলেরা আল্লাহকে ভয় করে না, পরকালকে পরোয়া করে না। নারীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের স্বামীর ব্যাপারে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নারীরা এ ধরনের স্বামীদের নিয়ে সাংঘাতিক পেরেশানিতে পড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বিয়ের আগে তারা যদি সৎ পাত্র তালাশ করত আল্লাহ তাদের জন্য এমন পাত্র পাওয়া সহজ করে দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে, অথবা সৎ পাত্রের ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটি ঘটছে। খারাপ লোক কোনদিন ভাল হয় না। তাই পাত্র নির্বাচনে অবহেলা করা জায়েয নয়। কারণ খারাপ লোক তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করবে। এমনকি স্ত্রীকে দ্বীনবিমুখ করে ফেলতে পারে। সন্তান-সন্ততির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সমাপ্ত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) নুরুন আলাদ দারব ফতোয়া সংকলনে (বিবাহ/পাত্র নির্বাচন/প্রশ্ন নং-১৬) বলেন:

মেয়ের অভিভাবকের উপর ফরজ হচ্ছে- প্রস্তাব দেয়া ছেলের দ্বীনদারি ও চারিত্রিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া। যদি ভাল তথ্য পাওয়া যায় তাহলে বিয়ে দিবে। আর যদি বিরূপ তথ্য পাওয়া যায় তাহলে বিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকবে। যদি আল্লাহ দেখেন যে, এই অভিভাবক শুধু দ্বীনদারি ও চারিত্রিক কারণে এই ছেলের কাছে বিয়ে দেয়নি তাহলে তিনি অচিরেই তার মেয়ের জন্য দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলের ব্যবস্থা করে দিবেন। সমাপ্ত।

আমরা আপনার জন্য ভাল মনে করি যে, আপনি এই ছেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন। আল্লাহ আপনার জন্য এর চেয়ে ভাল কোন পাত্রের ব্যবস্থা করে দিবেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।

মূল লেখাঃ শায়খ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদঃ islamqa.info বাংলা ভার্সন থেকে সংগৃহীত

চলমান বিয়ের অনুষ্ঠানের বাজে বিষয়গুলো নিয়ে বাসায় আলাপ শুরু করুন আজই

1 November 2014

এক.

হিন্দুয়ানী আর পশ্চিমা সংস্কৃতিকে চেটেপুটে যেই নোংরা বিয়ে-সংস্কৃতি দাঁড়িয়েছে বাংলা মুসলিম সমাজে, সেই নষ্ট স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হলে মুসলিম ভাইবোনদের তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস নিলে হবে না। আমাদের আগের প্রজন্মটা যেমন করে অতিক্রম করেছিলেন, তাতে তরুণ-তরুণী হয়ে, যুবক-যুবতী হয়ে ঈমান টিকিয়ে রাখতে আমাদের মতন স্পষ্ট যুদ্ধ ছিলো না।

চিন্তা করুন, আপনার বিয়ের অনুষ্ঠান মানেই গাদা-গাদা ছেলে খোলামেলা মেয়েদের ছবি-ভিডিও করবে, তারপর সেগুলো নিয়ে রসাত্মক আলাপ করবে... (নতুন জেনারেশনের মধ্যে চলমান এই কালচারের ব্যাপারে যারা অস্বীকার করবেন, তারা হয় নির্বোধ আর নাহয় স্পষ্ট মিথ্যাবাদী ভন্ড) আর এই পাপের সমুদ্রের মূল কারণ কে? আপনি। যিনি আরেকজন মানুষের সঙ্গী হচ্ছেন দুনিয়া থেকে জান্নাতে একসাথে চলার অভিপ্রায়ে -- তার বিয়েই হচ্ছে হাজারো পাপাচারের মূল কারণ। আপনি কি রাজি হবেন এতে?

যদি আপনি চান আপনার বিয়ে নারীপুরুষ উদ্দাম মেলামেশা আর পাপাচারের মচ্ছব না হোক, তাহলে আপনি আজ থেকেই অল্প অল্প করে মুরুব্বিদের সাথে দাওয়াহ কাজ শুরু করুন। তাদেরকে ইসলামের সহজ-সরল সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত করুন। তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন, সমাজের কাছে মুখ দেখানোর নামে তারা সমাজকে যে ভয় করছেন, সেই ভয় আল্লাহর প্রতি ভয়কে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহকে অখুশি করে সমাজকে খুশি করার এই অসুস্থ ও অন্যায় দুঃসাহসের বিরুদ্ধে নিজ নিজ পরিবারে কথা বলুন স্মিত স্বরে, মিষ্টি ভাষায়। আমাদের দাওয়াতের শুরু আসলে ঘর থেকেই। নিকটাত্মীয়দেরকে বুঝাতে হবে। এই কাজটি সফল হয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ, যদি আপনি সত্যিই একজন পরিবর্তিত দ্বীনদার ছেলে বা মেয়ে হয়ে যান, আপনার অন্তর প্রশান্ত থাকে এবং আপনি আপনার কথাবার্তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত থাকেন...

আজই কাজ শুরু করুন, দাওয়াহ শুরু হোক ঘর থেকেই। আন্তরিক, ধীর-স্থির কিন্তু দৃঢ়তার স্পর্শে শুরু হোক দাওয়াতের কাজগুলো আপনার ভালোবাসাময় দাম্পত্য জীবনের অনুপ্রেরণায়...

দুই.

কেন বিয়ের গোসল তাতে কী হয়েছে? তাই বলে ভাবী অধিকার খাটিয়ে কিছু নারী ছেলের গা ডলে ধুয়ে দেবে ? তাকে গোসল করিয়ে দেবে ! বুঝিনা বিয়ের সময় কি এরা প্রতিবন্ধি হয়ে যায় ? পাত্রী/মেয়ের ক্ষেত্রেও যা হয় তা লজ্জাজনক বটে ! গায়ে হলুদের নামে মেয়েটির হাতে, মুখে পুরুষের হাত পড়ে ! এসব প্রথা-কুপ্রথা থেকে আল্লাহ আমাদের মুসলিমদের হুশ দান করুন। বিবাহের অশ্লীলতা থেকে আল্লাহ আমাদের বাচিয়ে রাখুন।

তিন.

এক ছোট ভাই প্রশ্ন করেছিলো, ভাইয়া এখনকার বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোর অবস্থা তো খুবই খারাপ হয়। গান-বাদ্য, ছেলে-মেয়ের মেলামেশা, নাচানাচিগুলো, ডিজে... এসব থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?

উত্তর আর কী দিবো? কাছের বন্ধুদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো দেখে-শুনে বুঝেছি এখানে 'ইসলামিক্যালি মডিফিকেশন' করার সুযোগ নেই বললেই চলে, বেশিরভাগ অনৈসলামিক কাজ। পারিবারিক আর সামাজিক চাপে পিষ্ট হয়ে করতে হয়। এখন অনেক ধাপ থাকে বিয়েতে, আমি এতটা 'ব্যাকডেটেড'(!)

যে ঠিক সব জানিও না। তবু শুনেছি -- মেহেদি ১, মেহেদি ২, গায়ে হলুদ ১, গায়ে হলুদ ২, বিয়ে, বৌভাত, (রিসিপশন)। এগুলো থেকে যারা কমায়, তারা মূলত টাকার ঠেলাতে পড়ে কমায়।

এককালে হিন্দুয়ানা নানান সংস্কৃতিতে তাল মিলিয়ে আমাদের এই দেশীয় বিয়েতে কনেকে সাজুগুজু করে স্টেজে বসে থেকে ভিডিও/ফটোর জন্য পোজ দিলে হত। একধাপ বেশি হতো যখন 'গায়ে হলুদ' হতো আর গাইর-মাহরাম পুরুষরাও গিয়ে তার মুখে হলুদ ডলতে যেত, চারপাশ থেকে শ'খানেক জোড়া চোখ সেজে থাকা কনের সৌন্দর্যে হারাম উপায়ে মুগ্ধ হত। এখন তো সবার সাথে তারাও নাচে, উদ্দামতায়; শয়তানও নাচে সেই পার্টিগুলোতে, আনন্দে উদ্বেল হয়ে... এখন তাতে পাশ্চাত্য, ভারতীয়সহ তাবৎ পৃথিবীর নোংরা বিষয়গুলো স্থান পাচ্ছে। কেউ জানেই না কী করে, কেন করে!!

গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, উদ্দেশ্য ঠিক করা। কেন এই অনুষ্ঠান? যারা আল্লাহকে খুশি করতে জীবনযাপন করে, তারা এমনিতেই জানি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে এইসবের স্থান ইসলামি বিয়েতে নাই। সুন্নাহ তো খুবই সহজ। মুহর ঠিক করা, খুতবা, ওয়ালিমা (সাধ্যানুযায়ী) হলেই হলো। আর কিছুই না। ইসলাম জীবনকে সহজ করে, সুন্দর করে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পাপাচারের সুযোগ ইসলাম দেয় না। একটা সুন্দর বিষয় শিখেছিলাম। ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ নয়, বাদবাকি সবই তো করা যায়। খেয়াল রাখতে হবে কী কী নিষেধ, এটা তো যে কোন মুসলিমই বুঝে (যারা বুঝতে চায়)। আমাদের সামনে যেসব ঘটনা সুন্নাহ হিসেবে জেনেছি তাতে আছে বিয়েতে কম খরচ উত্তম, তাতে অপব্যয় মুক্ত থাকা উচিত, গরীবদের অংশগ্রহণ থাকা উচিত। এগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন। খুব ভালো করে জানি, অধিকাংশ বাবা-মা-অভিভাবকরা *সমাজের কাছে মুখ টিকিয়ে রাখতে* এসব অনুষ্ঠানের জন্য অস্থির থাকেন, চাপ দেন। অথচ আল্লাহর কাছে কী করে মুখ দেখাবো সেই হিসেব করা হয়না।

একটা কথা জানি, আল্লাহকে ছেড়ে মানুষের দাসত্ব করা এইসব সংস্কৃতিকে একদম বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চেইন ভেঙ্গে ফেলার জন্য বর-কনে উভয়ের এবং তাদের পারিবারিক সমঝোতার প্রয়োজন হয়। তবু, একবারেই হয়ত কিছু হবেনা। এখনকার অনেক ভাই-বোনেরা নিজেদেরকে চলমান নোংরা সংস্কৃতি থেকে নিজেদেরকে আলাদা করার আপ্রাণ প্রয়াসে এসব অনুষ্ঠানের ইতরামি, নোংরামি, বাহুল্য এড়িয়ে ছোটখাটো আয়োজনে সারছেন। হয়ত তাদের পারিবারিক পূর্ণ সমর্থন নেই। তবে ইনশা আল্লাহ তাদের পরের প্রজন্ম সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তি অর্জন করব ।

courtesy : ১, সাফওয়ান।

২, মিডিয়ায় নারী যখন পণ্যঃ উপেক্ষিত হিজাব পেজ।

৩, স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ।

বিয়ের প্রস্তাব : করণীয় ও বর্জনীয়

4 September 2015

লেখার শিরোনাম দেখেই অনেকে চমকে উঠতে পারেন। না আসলে চমকাবার কিছু নেই। সবার জীবনেই আসে বিয়ের ঘটনা। আর বিয়ের আগে আসে কনে দেখার পর্ব। ইসলাম শুধু নামায-রোযার নয়; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই এখানে সালাত-সিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে-শাদীর আমলও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল মসজিদে আমরা মুসলিম পরিচয় বজায় রাখি; কিন্তু বিয়ে-শাদীতে কেন যেন ইসলাম পরিপন্থী কাজই বেশি করি। বিয়ে-শাদীর আগে যেহেতু কনে দেখার পর্ব তাই আগে বিয়ের প্রস্তাব বা কনে দেখা সংক্রান্ত ইসলামী নির্দেশনাগুলো আগে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি এ নিবন্ধে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

শরীয়তে বিবাহ বলতে কী বুঝায় :

নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর সঙ্গে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত।

বিবাহের তাৎপর্য :

বিবাহ একটি বৈধ ও প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে করা নবী-রাসূলদের (আলাইহুমুস সালাম) সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

'আমি নারীকে বিবাহ করি। (তাই বিবাহ আমার সুন্নত) অতএব যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'

এ জন্যই আলিমগণ বলেছেন, সাগ্রহে বিবাহ করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ, এর মধ্য দিয়ে অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়।

কারও কারও ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন : যদি কেউ বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। তখন নিজেকে পবিত্র রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাঁচতে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء.

‘হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, তার কর্তব্য রোযা রাখা। কেননা তা যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।’

বিয়ের প্রস্তাব এবং তার নিয়ম :

কেউ যখন কোনো নারীকে বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তার জন্য সমীচীন হলো ওই মেয়ের অভিভাবকের মাধ্যমে তাকে পেতে চেষ্টা করা। আর এর জন্য রয়েছে কিছু মুস্তাহাব ও ওয়াজিব কাজ, যা উভয়পক্ষের আমলে নেওয়া উচিত :

১. শরীয়তে বিয়ের প্রস্তাব কী বুঝায় :

এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিয়ে করতে চাওয়া যার কাছ থেকে এমন প্রস্তাব গ্রহণ হতে পারে। এটি বিবাহ পর্ব সূচনাকারীদের প্রাথমিক চুক্তি। এটি বিবাহের ওয়াদা এবং বিবাহের প্রথম পদক্ষেপ।

২. ইস্তিখারা করা :

মুসলিম নর-নারীর জীবনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই যখন তারা বিবাহের সিদ্ধান্ত নেবেন তাদের জন্য কর্তব্য হলো ইস্তিখারা তথা আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করা। জাবির রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ كَانَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ : (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لاَ أَقْدِرُ، وَ تَعْلَمُ وَ لاَ أَعْلَمُ، وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ- أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِه- فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِيْ- أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَ آجِلِه- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَ اصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَ اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِيْ بِه. (وَ يُسَمِّيْ حَاجَتَه.)

‘যখন তোমাদের কেউ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় সে যেন দু’রাকাত নফল নামাজ পড়ে অতপর বলে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ، وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي.

‘হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহা অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা আপনি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন, আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ, এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি উল্লেখ করবেন) আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার পরিণতির ক্ষেত্রে অথবা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকর হয়, তবে তাতে আমাকে সামর্থ্য দিন। পক্ষান্তরে এই কাজটি আপনার জ্ঞান মোতাবেক যদি আমার দীন, জীবিকা ও পরিণতির দিক দিয়ে অথবা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি তা আমার থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং কল্যাণ যেখানেই থাকুক, আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দিন। অত:পর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন।

৩. পরামর্শ করা :

বিবাহ করতে চাইলে আরেকটি করণীয় হলো বিয়ে ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ, পাত্রী ও তার পরিবার সম্পর্কে ভালো জানাশুনা রয়েছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পরামর্শ করতেন। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অন্য কাউকে আপন সাথীদের সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে দেখি নি।’

হাসান বসরী রহ. বলেন,

ثلاثة فرجل رجل ورجل نصف رجل ورجل لا رجل فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور وأما الرجل الذي ليس

برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور

‘মানুষের মধ্যে তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব রয়েছে : কিছু ব্যক্তি পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কিছু ব্যক্তি অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং কিছু ব্যক্তি একেবারে ব্যক্তিত্বহীন। পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং পরামর্শও করেন। অর্ধেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে পরামর্শ করেন না। আর ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি তিনিই, যিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আবার কারো সঙ্গে পরামর্শও করেন না।’

এদিকে পরামর্শদাতার কর্তব্য বিশ্বস্ততা রক্ষা করা। তিনি যেমন তার জানা কোনো দোষ লুকাবেন না, তেমনি অসদুদ্দেশে আদতে নেই এমন কোনো দোষের কথা বানিয়েও বলবেন না। আর অবশ্যই এ পরামর্শের কথা কাউকে বলবেন না।

৪. পাত্রী দেখা :

জাবের ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ جَابِرٌ : فَلَقَدْ خَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ فِى أُصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا أَعْجَبَنِى فَتَزَوَّجْتُهَا.

‘তোমাদের কেউ যখন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, অতপর তার পক্ষে যদি ওই নারীর এতটুকু সৌন্দর্য দেখা সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিবাহ করতে) উদ্বুদ্ধ করে, সে যেন তা দেখে নেয়।’

অপর এক হাদীসে রয়েছে, আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ».

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জানাল যে সে একজন আনসারী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি

কি তাকে দেখেছো?' সে বললো, না। তিনি বললেন, যাও, তুমি গিয়ে তাকে দেখে নাও। কারণ আনসারীদের চোখে (সমস্যা) কিছু একটা রয়েছে'।'

ইমাম নববী রহ. বলেন, 'এ হাদীস থেকে জানা যায়, যাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক তাকে দেখে নেয়া মুস্তাহাব।'

৫. ছবি বা ফটো বিনিময় :

নারী-পুরুষ কারো জন্য কোনোভাবে কোনো ছবি বা ফটো বিনিময় বৈধ নয়। কারণ, প্রথমত. এ ছবি অন্যরাও দেখার সম্ভাবনা রয়েছে, যাদের জন্য তা দেখার অনুমতি নেই। দ্বিতীয়ত. ছবি কখনো পূর্ণ সত্য তুলে ধরে না। প্রায়শই এমন দেখা যায়, কাউকে ছবিতে দেখে বাস্তবে দেখলে মনে হয় তিনি একেবারে ভিন্ন কেউ। তৃতীয়ত. কখনো এমন হতে পারে যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়া হয় বা প্রত্যাখ্যাত হয় অথচ ছবি সেখানে রয়েই যায়। ছবিটিকে তারা যাচ্ছে তাই করতে পারে।

৬. বিবাহের আগে প্রস্তাবদানকারীর সঙ্গে বাইরে বের হওয়া বা নির্জনে অবস্থান করা :

বিয়ের আগে প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে নির্জন অবস্থান বা তার সঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা, এখনো সে বেগানা নারীই রয়েছে। পরিতাপের বিষয়, আজ অনেক মুসলমানই তার মেয়েকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রস্তাবদানকারী পুরুষের সঙ্গে ঘরের বাইরে যায়! উপরন্তু তার সঙ্গে সফরও করে! ভাবখানা এমন যে মেয়েটি যেন তার স্ত্রী হয়ে গেছে।

৭. বর-কনের পারস্পরিক যোগাযোগ করা :

প্রস্তাব দেয়া নারীর সঙ্গে ফোন বা মোবাইলে এবং চিঠি ও মেইলের মাধ্যমে শুধু বিবাহের চুক্তি ও শর্তাদি বোঝাপড়ার জন্য যোগাযোগের অনুমতি রয়েছে। তবে এ যোগাযোগ হতে হবে ভাব ও আবেগবিবর্জিত ভাষায়, যা একজন বেগানা নারী-পুরুষের জন্য বৈধ ভাবা হয় না। আর বলাবাহুল্য, বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণকারী কনের কেউ নন, যাবৎ না তারা বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, এ যোগাযোগ উভয়ের পিতার সম্মতিতে হওয়া শ্রেয়।

৮. একজনের প্রস্তাবের ওপর অন্যজনের প্রস্তাব না দেয়া :

যে নারীর কোথাও বিয়ের কথাবার্তা চলছে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ ، أَوْ يَتْرُكَ.

‘কেউ তার ভাইয়ের প্রস্তাবের ওপর যেন প্রস্তাব না দেয়, যাবৎ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।’

হ্যা, দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতা যদি প্রথম প্রস্তাবদাতার কথা না জানেন তবে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে ওই নারী যদি প্রথমজনকে কথা না দিয়ে থাকেন তবে দু’জনের মধ্যে যে কাউকে গ্রহণ করতে পারবেন।

৯. ইদ্দতে থাকা নারীকে প্রস্তাব দেয়া :

বায়ান তালাক বা স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারী নারীকে সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয়া হারাম। ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়া বৈধ। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

‘আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে প্রস্তাব করবে।’

তবে ‘রজঈ’ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে সুস্পষ্টভাবে তো দূরের কথা আকার-ইঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়াও হারাম। তেমনি এ নারীর পক্ষে তালাকদাতা ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও প্রস্তাবে সাড়া দেয়াও হারাম। কেননা এখনো সে তার স্ত্রী হিসেবেই রয়েছে।

(সুস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। অস্পষ্ট প্রস্তাব : যেমন এ কথা বলা, আমি তোমার মতো মেয়েই খুঁজছি ইত্যাদি বাক্য।)

১০. এ্যাংগেজমেন্ট করা :

ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিয়েতে এ্যাংগেজমেন্ট করার রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে। এই আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে এর মাধ্যমে বিবাহের কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা, মুসলিম সমাজ বা শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। আরও নিন্দনীয় ব্যাপার হলো, এ আংটি প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে কনেকে পরিয়ে দেয়। কারণ, এ পুরুষ এখনো তার জন্য বেগানা। এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি। কেননা, কেবল বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেই তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হবেন।

১১. উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা :

উপযুক্ত পাত্র পেলে তার প্রস্তাব নাকচ করা উচিত নয়। আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

‘যদি এমন কেউ তোমাদের বিয়ের প্রস্তাব দেয় যার ধার্মিকতা ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট তবে তোমরা তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ব্যাপক অরাজতা সৃষ্টি হবে।’

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আজ আমাদের ভেবে দেখা দরকার, ইসলামের আদর্শ কোথায় আর আমরা কোথায়। ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি। আমরা কি অস্বীকার করতে পারি যে, এসব আদর্শ আজ আমাদের আমলের বাইরে চলে গেছে। আমাদের যাপিত জীবনে ইসলামের বিমল রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, আমরা বরং বর্জনীয় কাজগুলো করি আর করণীয়গুলো ভুলে থাকি। আল্লাহ মাফ করুন। এ কারণেই আমাদের বিয়ে-শাদীতে বরকত নেই। বিবাহিত জীবনে সুখ নেই।

দাম্পত্য জীবনের সুখ আজ সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত সুখের পরশ পেতে হলে, সুখ পাখির আগুন ডানা ছুঁতে হলে আজ আমাদের তাই ইসলামের কাছেই ফিরে আসতে হবে। ইসলামের আদর্শকেই আকড়ে ধরতে হবে। শুধু কনে দেখা আর বিয়ে-শাদীতেই নয়; জীবনের প্রতিটি কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মুখে নয়; কাজে পরিণত করতে হবে তাঁর উম্মত দাবী। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সবাইকে তাঁর যাবতীয় আদেশ এবং তাঁর রাসূলের সকল আদর্শ মেনে চলার তাওফীক দিন। আমীন।

. রা‘দ : ৩৮।

. বুখারী : ৫০৫৬; মুসলিম : ৩৪৬৯।

. বুখারী : ৫০৬৬; মুসলিম : ৩৪৬৪।

. বুখারী : ১১৬৬; আবূ দাউদ : ১৫৪০।

. তিরমিযী : ১৭১৪; বাইহাকী : ১৯২৮০।

. শিহাবুদ্দীন আবশীহী, আল-মুসতাতরিফ ফী কুল্লি মুসতাযরিফ : ১/১৬৬।

. বাইহাকী, সুনান কুবরা : ১৩৮৬৯।

. মুসলিম : ৩৫৫০।

. নববী, শারহু মুসলিম : ৯/১৭৯।

. বুখারী : ৫১৪৪; নাসায়ী : ৩২৪১।

. সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৫।

. ফাতাওয়া জামেয়া লিল-মারআতিল মুসলিমা।

. তিরমিযী: ১০৮৪।

সংকলক : আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : মো: আব্দুল কাদের

source : https://goo.gl/vWh0aY

বিয়ে কি এমনই হওয়া উচিত?

30 October 2014

লেখকঃ **স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ**

আমরা এমন একটা সমাজে বসবাস করছি এখন, যেখানে প্রেম করার জন্য তেমন একটা ইচ্ছা/আগ্রহেরও দরকার পড়েনা, কিছু বুঝে উঠার আগেই তা একেকজনের উপরে আপতিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমস্ত মেয়েরা এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। বন্ধুর মাধ্যমে, ফোনে, ফেসবুকের ইনবক্সে কেবলই প্রেমের জয়গান। শ্লোগান শোনা যায়, "যদি বন্ধু হও হাতটা বাড়াও", আর এই হাত বাড়ালেও হলো, তারপরেই পথ খুলে যায় আনন্দের -- শহরের এখানে-ওখানে অজস্র আনন্দ-আবেগের ভাগাভাগি, খুঁনসুঁটি, হাসি-ঠাট্টা-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা যায় আরো অজস্র পথচারীদের সামনেই। আর এই অপার আনন্দকে পেতে কেবল একটা জিনিস লাগে -- "ইচ্ছা"।

কিন্তু এই সমাজেই বিয়ে করার জন্য শত-সহস্র কঠিন ধাপ আছে। সেই ধাপের একেকটা পূরণ না করতে পারলে অপরাধী-আসামী হয়ে যেতে হয় নিকটাত্মীয়-পরিবারের কাছে, সর্বোপরি *সমাজ* নামের প্রতিষ্ঠানটির কাছে। হারাম সম্পর্ক গড়া যতটাই সহজ, হালাল সম্পর্ক করা ততটাই কঠিন।

আর হ্যাঁ, আমি অবশ্যই কেবল মুসলিম কমিউনিটি নিয়েই বলছি, যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী অন্তত করেন। আমার কলিগদের অনেকেই বিয়ে করলেন এই বছরেই। অনেক বড় ভাইরাও বিবাহিত হলেন। কয়েকটা ঘটনা বলি সাম্প্রতিক সময়ে দেখা...

প্রথম ঘটনাঃ এক কলিগের বিয়ে হলো। শান্তশিষ্ট, নিরহংকারী টাইপের ভালো ছেলে। বিয়েতে তিনি মোটামুটি তেমন কিছুই আয়োজন করেননি, গ্রামের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই নূন্যতম আনুষ্ঠানিকতাতেও তার কয়েক বছর ধরে তিলে তিলে জমানো টাকার অনেক বেশি -- দুই লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে। তার স্ত্রী পূর্বপরিচিত এবং তারাই নিজেরা নিজেদের সিলেক্ট করেছিলেন। তাই মুহর নিয়ে কথা উঠেনি খুব বেশি। এই কলিগের বেতন তখন ছিলো বিশ হাজার টাকার মতন। তার বাবা অনেকদিন আগেই অবসর নিয়েছিলেন, সরকারি চাকুরে ছিলেন তাই তাদের মাসের আয় মাসেই শেষ হয়। বিয়ে হিসেবে এই খুব সাদামাটা বিয়েতে তার কত কষ্ট হয়েছে আমি জানি। প্রতিদিনই মুখ শুকিয়ে বলতেন, "*ভাই, দুইটা বছর আমি দশটা টাকা হলেও জমিয়ে রেখেছি, তাও আব্বা-আম্মার কাছে চাইতে হলো। ছোট ভাই এখনো ইন্টার পাশ করে নাই। আমাকে এই টাকা দিয়ে দিতে হবে*" আমার মনে হচ্ছিলো, তার এখনই প্রতি মাসে সংসারে টান লাগে এই বেতনে চলতে গিয়ে। কীভাবে বাবা-মায়ের কষ্টার্জিত টাকা আরো কষ্ট

করে ফেরত দিবেন জানিনা। তবে, বিয়েটা তাড়াতাড়ি সুন্দর করে করে ফেলার আগ্রহ দেখে তার প্রতি এখনো শ্রদ্ধা আসে আমার।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ আমার এক নিকটাত্মীয়ের, বয়স প্রায় ৩৪ বছর। দীর্ঘদিন যাবত তার চাকুরি হচ্ছিল না। এখানে ওখানে কোনরকম নিজেকে চালিয়ে নিতেন। জেলা শহরে বাড়ি আছে বলে ফ্যামিলিও তাকে চাপ দেয়নি, নিজেরাই চালিয়ে নিয়েছে খরচাপাতি। বছরখানেক আগে একটা সরকারী চাকুরি পেলেন তিনি, বিয়ের চেষ্টা শুরু হলো, বিয়ে হচ্ছেও। সপ্তাহখানেক আগে তিনি মেয়েবাড়ির জন্য বিয়ে উপলক্ষে শাড়ি এবং কসমেটিকস কিনলেন প্রায় ৭০ হাজার টাকার। কেনার পরে বলছিলেন, "*ধার করে এত টাকা খরচ করতে হচ্ছে। আমার বউকে আমি বিয়ের পরে বলে দিবো স্রেফ এই টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত নতুন শাড়ি নাই*"। উনি বিয়ের আনুমানিক খরচ আরো দেড় লাখ টাকা ভাবছিলেন। এই বিয়েটা গ্রামে না, জেলা শহরে। তার শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক থেকে তিন লক্ষ টানা দেনা দিয়ে সংসার জীবন শুরু করতে হচ্ছে, প্রতি মাসেই এই টাকার সুদ দিতে হবে। সেই দেনার চাপে পিষ্ট হয়ে সংসার জীবনে কী কী সমস্যা হবে, আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় ঘটনাঃ পরিচিত এক ভাই মোটামুটি একটা অনুষ্ঠান করলেন ঢাকা শহরে -- সবাইকে হাসিমুখ দেখিয়ে, অভিজাত কমিউনিটি সেন্টারে জমজমাট আপ্যায়নে বিয়ে হলো। আনুসঙ্গিক দুই বাড়ির হলুদ, বৌভাত হয়েছিলো ফুটবল লীগের প্লে-অফ ম্যাচের মতন। সাথে ছিলো DSLR ক্যামেরায় শত শত ছবি, জামাই-বউয়ের পেছনে দলবেঁধে দাঁড়ানো গ্রুপ ছবিগুলোতে ফেসবুকে সবাই গুষ্টিধরে ট্যাগ করা হলো। এই আয়োজন দেখে তার ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করতে বললো, বললো মাত্র দশ লক্ষ টাকার একটু বেশি খরচ হয়েছে। সেই ভাইয়ের বেতন সম্ভবত হাজার চল্লিশেক টাকা। বাবার ঢাকায় ফ্ল্যাট আছে। আর কিছু জানিনা।

প্রেমের বিয়ের কথা আলোচনায় না আসুক, কারণ ইসলামে তার স্থান নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ বলে যেই জিনিসটা চালু আছে, তাতে মা-খালা-ফুফুসহ অন্য অভিভাবকমহলের প্রভাব আর আগ্রহ দেখলে মনে হয়না বিয়েটা একজন তরুণ আর এক তরুণীর। বরং দেখা যায় তাতে অন্য সবার অংশগ্রহণ, খায়েশ অনেক বেশি। আয় এবং খরচের এই অদ্ভূত অনুপাতটার হিসেব কে দিতে পারবে? তাছাড়া, ইসলামের একটা সংস্কৃতি আছে যা আল্লাহর নির্দেশনা থেকে উৎসারিত। কিন্তু এসব বিয়ের খরচের সঠিক সার্বজনীন কারণটাই কে দেখাতে পারবে?

ক'দিন আগে একটা কথা পড়লাম, বেশ যৌক্তিক লেগেছিলো আমার কাছে -- **"এখনকার মেয়েরা বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে ঘোরাক্রান্ত হয়ে স্বপ্ন দেখে বছরের পর বছর, তাই বিবাহিত জীবন নিয়ে ভাবার সময় পায়না। সিরিয়াল, ম্যাগাজিন, অ্যাডভার্টাইজ দেখে মাথায় তাদের wedding নিয়ে এত বেশি চিন্তা ঘুরে marriage লাইফ নিয়ে, আজীবনের সঙ্গীটাকে নিয়ে ভাবার সময় পায়না তারা"।**

ইমাম সুহাইব ওয়েব একদিন এক আলোচনায় বলেছিলেনঃ **"বিয়ে ফিকহের বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং আমাদের সংস্কৃতিতে সবচেয়ে কঠিন একটি বিষয়।"**

একটা ছেলে যদি বিয়ে করতেও চায়, তার প্রতিবন্ধকতা আসে -- "*তুমি তো এখনো তেমন আয় করো না*"। অথচ এই আয় না করা ছেলেটা জীবনের একটা কঠিন সময় অতিক্রম করে, যদিও কোনভাবে ভয়াবহ কঠিন মুহূর্তগুলো পাশ কাটিয়ে একটা চাকুরি করে বিয়ে করতে যায়, তার সামনে কমপক্ষে একবছরের বেতনের সমান খরচের বিয়ের আয়োজনের বার্তা আসে। আমাদের এই দেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু, তবু এই সমাজের মানুষগুলো বিশাল ঢাক-ঢোল আয়োজন ছাড়া বিয়ে না করলে তাকে গ্রহণ করেনা।

আরো আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, ইসলামিক [মুসলিম বলছিনা কিন্তু] অথবা নন-ইসলামিক -- যেকোন পরিবারগুলোই পৃথিবীর আর কিছু যা-ই থাক, বিয়েতে বিশাল আয়োজনের, টাকা খরচ করার, সমাজের কাছে মাথা উঁচু করে(!) তাদের খুশি করার চেষ্টাতে কিছুতেই কমতি করেনা। মানুষের ইসলামের অনুভূতি মূলত আর্থিক অবস্থানের সাথে সাথে নিজস্ব ব্যাখ্যা পায়। যার হয়ত একটা বাড়ি থাকে, গাড়ি থাকে, হাতে কিছু মোটা অংকের ক্যাশ থাকে, তখন তার কাছে বিয়ের আদিখ্যেতা খরচ করতে না পারাটা *ছোট মনের* বলে প্রতীয়মান হয়।

আমাদের দেশের বিয়েগুলোতে মেয়েপক্ষ সজ্ঞানে-অজ্ঞানে ছেলেপক্ষের কাছে *দায়গ্রস্ত* থাকেন, খুব প্রচলিত একটা ঘটনা হলো ফার্নিচার দেয়া। মেয়ের বাবা যেমন অর্থ-সম্পদের মালিকই হোন না কেন, তিনি ধার-দেনা করে মেয়ের বিয়েতে খরচ করতে মরিয়া হয়ে যান। মেয়ের সুখের জন্য তাকে যে করেই হোক জামাইকে কিছু দিতে হবে। এখানেও যন্ত্রণা, কষ্ট, ধার-দেনা। কতরকম খোঁটা খাওয়ার ভয়! বিয়ের আয়োজনেই অস্থির অবস্থা। ওইদিকে আছে বৌভাত, হলুদ, আরো কত কী!!

আল্লাহ তো কুরআনুল কারীমে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকেঃ

[১] **"কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ"। [আল ইসরাঃ ২৬-২৭]**

[২] **"খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না"। [আল আরাফঃ ৩১]**

আরো কতরকম আদিখ্যেতা বিয়ের অনুষ্ঠানে! যেগুলোর কোনটাই সুন্নাহ নয়, বরং স্কলারদের মতে অনেকগুলোই নিষিদ্ধ। আঞ্চলিক কিছু প্র্যাকটিস তো বলার মতই না, এতই জঘন্য। আমার এক বোনের বিয়েতে সেই বাড়ির নিয়মানুযায়ী দুধে পা ডুবানো, আয়নায় মুখ দেখা, অনেকগুলো মিষ্টি খাওয়া -- এরকম আরো অনেকগুলো অসভ্য ঢং করার পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষটাকে ঘুমাতে দেয়া হয় কয়েক ঘন্টা পর, মাঝরাতে পেরিয়ে গেলে। এইসব ছাড়াও সার্বজনীন আর বাহুল্য কালচার যেসব আছেঃ

- আংটি পড়ানো

- দামী কার্ড ছাপানো,
- শুধু শুধু বা আভিজাত্য জাহিরের জন্য দামী কমিউনিটি সেন্টার/হোটেল ইত্যাদি ভাড়া করা,
- শুধু মাত্র বিয়ের দিনের জন্য দামী পোশাক কেনা যা আর কখনও পড়া হয় না
- গায়ে হলুদ
- কনের/বরের সাজসজ্জায় অপ্রয়োজনীয় খরচ।
- অনুষ্ঠানে নারী পুরুষ একসাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ, নাচ-গানের আয়োজন
- গেটে টাকার জন্য বর-কনেদের বিব্রত করা, বাদানুবাদ
- বিয়ের দিনে সাজুগুজু আর অতিথি আপ্যায়ন করতে গিয়ে নামায না পড়া

অথচ আল্লাহর দ্বীন হলো একদম সহজ। বিয়েতে কথা তোলার জন্য দরকার হয় একজন ওয়ালী, যিনি হবেন মেয়ের বাবা/অভিভাবক। তিনি মেয়ের মত নিয়ে কথা বলবেন ছেলের সাথে। মুহর ঠিক হবে যার সুন্নাহ হচ্ছে পুরোটাই কনেকে পরিশোধ করে দিবে বর বিয়ের আগেই, তবে যদিবা না পারে, তবে পরে দিতে পারবে যদি কনে তাতে অনুমুতি দেয়। এই মুহর থেকে কোন অংশ সাংসারিক কাজে ব্যয় করতে বলতে পারবে না ছেলে। এই টাকা একান্তই মেয়েটার।

আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিয়ে নিয়ে উস্তাদ নুমান আলী খানের তিন মিনিটের দারুণ এক উপভোগ্য আলোচনাঃ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=94pRtiCsDKk

আমাদের দ্বীনে মেয়ের/মেয়েপক্ষের বলতে গেলে কোনই খরচ নেই একটা বিয়েতে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত যত বোঝা, তার সমস্ত কিছুই আমরা নিয়ে এসেছি অন্য ধর্মের সংস্কৃতি থেকে। একইভাবে একটা বিয়েতে যত কম খরচ হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সেই বিয়ে বেশি পছন্দের। আমরা কি আল্লাহর পছন্দের বান্দা হতে চাই, নাকি সমাজের দাস?

আমাদের আদর্শ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

[৩] **"সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে সেই ওয়ালিমাহ এর খাদ্য যেখানে কেবল ধনীরাই নিমন্ত্রন পায়, গরীবেরা নয়"। [সহীহ বুখারী]**

[৪] **''সবচাইতে উত্তম বিয়ে হচ্ছে সহজতম বিয়ে (মোহরানার দিক থেকে)"। [ইবন মাজাহ, আবু দাউদ]**

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ হচ্ছে দ্বীনদারীর যোগ্যতা দেখে জীবনসঙ্গী বাছাই করে বিয়ে করা। জীবনের সাথী হতে হবে এমন একজন মানুষ যিনি আল্লাহকে ভয় করেন। কোনকিছুতে আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ পাওয়ামাত্র যিনি মেনে নিবেন, শুধরে নিবেন নিজেকে। সংসার জীবনে কীভাবে আর দ্বিমত হবে, মনোমালিন্য হবে যখন কুরআন আর সুন্নাহ মানতে আগ্রহী দু'জনেই? বরং তারা আজীবন আল্লাহকে ভালোবেসেই নিজেদের আঁকড়ে ধরে থাকবে এই দুনিয়া ছাপিয়ে অনন্ত জীবনের সঙ্গী হবার স্বপ্নে।

আল্লাহর নির্দেশ তো অনুপম, তার পালনকারীও হবেন সেরা মানুষ! হতে পারি আমরা জীবনে অনেক ভুল করেছি, এখন চাইলেই নিজেদের শুধরে নিতে পারি। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশকে এড়িয়ে যেতে চাইলে, নিজেদের মতন চলতে চাইলে সেটা কি আল্লাহর দাসত্ব করা হয়? নাকি নিজের নফসের?

আল্লাহ যে রাহমানুর রাহিম, সেইটার অনুধাবন করতে অনেক জ্ঞানী হতে হয়না। এই কঠিন আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সময়ে চারপাশে তাকালেই বোঝা যায়। আল্লাহ তার অনন্ত ভালোবাসা আর রাহমাতের হাত তিনি প্রশস্ত করে দেন সবাইকেই। সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিয়ে জীবন পরিচালিত কতে পারে, নিজেকে নিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আখিরাতে আল্লাহর বিচার যে অনেক সূক্ষ্ম হবে। কেউ ছাড় পাবেনা একটুও। কিছুতেই না। আর সেই ছাড় না পাওয়াটা যে আসলেই সবচাইতে সুন্দরতম জিনিস -- সেই উপলব্ধিটা প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন অমানুষদের আচরণ, কাজ দেখলে অনুভব করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশনা মেনে দুনিয়াতে চলার তাওফিক দান করুন, অতীতের ভুলগুলোর তাওবা করে তার পথে ফিরে আসার তাওফিক দিন, আখিরাতের অনন্ত জীবনে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য করে দিন। আমিন।

রেফারেন্স

- [ভিডিও] The Healthy Marriage :: নুমান আলী খান
- [পিডিএফ] বিয়ের ফিকহ --Garment of Love and Mercy :: ডক্টর বিলাল ফিলিপস
- [১] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-ইসরা, আয়াতঃ ২৬-২৭
- [২] আল কুরআনুল কারীম, সূরা আল-আরাফ, আয়াতঃ ৩১
- [৩] সহীহ বুখারী , হাদিস নম্বরঃ ৭/১০৬
- [৪] "The best of marriages (or dowries) are the easiest"

Recorded by Abu Dawud, Ibn Majah, and others. Verified to be authentic by al-Albani (Sahih ul-Jami' no. 3279, 3300, as-Sahihah no. 1842, & Irwa' ul-Ghalil no. 1924).

বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথা

24 September 2014

লেখকঃ হুসাইন বিন সোহরাব

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহ করা নবীগণের (আলাহিসসালাতু আসসালাম) সুন্নাত।

রাসুল(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

যে বাক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (দারিমী-কিতাবুন নিকাহ)

ইমাম রাগিব বলেনঃ

বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে,কেননা(বিয়ে) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সকল প্রকার লজ্জাজনক কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতোয় বাচিয়ে রাখে। (মুফরাদাত)

তবে এই পবিত্র কর্ম পালন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কু-প্রথা মানা হয়।যা কিনা অনুচিত।আসুন নবীগণের(আলাহিসসালাতু আসসালাম) এই সুন্নাত কে সুন্নাত তরীকায় পালন করি।

বিবাহে প্রচলিত কু-প্রথা:

১.চন্দ্র বর্ষের কোন মাসে বা কোন দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্ব পুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিবাহ শাদী হওয়া অথবা যে কোন শুভ সৎ কাজ করার জন্য ইসলামী শারী'য়াতে বা ইসলামী দিন তারিখের কোন বিধি নিষেধ নেয়। বরং উপরিউক্ত কাজগুলো বিশেষ কোন মাসে বা যে কোন দিনে করা যাবে না মনে করাই গুনাহ।

২.বিবাহ উৎসবে অথবা অন্য যে কোন উৎসবে পটকা-আতশবাজি ফুটান,অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা, রংবাজী করা বা রঙ দেওয়ার ছড়াছড়ি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অপচয়।

আল্লাহু-তা'য়ালা বলেনঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।" (বানী ইসরাঈল-২৭)

৩.বাঁশের কুলায় চন্দন,মেহদি,হলুদ,কিছু ধান-দূর্বা ঘাস কিছু কলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়।মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্ত্রী ও বরের কপালে তিনবার হলুদ লাগায় এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধুঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেওয়া হয়। এসব হিন্দুয়ানী প্রথা ও অনৈসলামিক কাজ।

৪.বরের আত্মীয়রা কনেকে কোলে তুলে বাসর ঘর পর্যন্ত পৌছে দেওয়া অথবা বরের কোলে করে মুরুব্বীদের সামনে স্ত্রীর বাসর ঘরে গমনের নীতি একটি বেহায়াপনা, নিরলজ্জতা ও অনৈসলামিক কাজ।

৫.বরের ভাবী ও অন্য যুবতী মেয়েরা বরকে সমস্ত শরীরে হলুদ মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেওয়া নির্লজ্জ কাজ যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৬.বর ও কনেকে হলুদ বা গোসল করতে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথার উপর বড় চাদর এর চার কোনা চার জনের ধরা হিন্দুয়ানী প্রথা।

৭.বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরকে পিড়িতে বসিয়ে বা সিল-পাটাই দাড় করিয়ে দই-ভাত খাওয়ান ইসলামিক প্রথা নয়।

৮.বিবাহ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বরকে দাড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীদের (রাযি আল্লাহু আনহুম) দ্বারা প্রমানিত নয়।

৯.বর ও কনের মুরুব্বীদের কদমবুসি করা একটি মারাত্মক কু-প্রথা। বিয়ে তো নয় এমনকি যে কোন সময় কদমবুসি করা রাসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবীদের (রাযি আল্লাহু আনহুম) দ্বারা কোন কালে প্রমানিত নয়। কদমবুসি করার সময় সালাতের রুকু-সিজদার মত অবস্থা হয়। বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসেবে নিয়ে আসা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়।

ইয়া আল্লাহ,দয়া করে আমাদের তুমি সুন্নাত তরীকায় বিবাহ করার তওফিক দিয়।আমিন।

Source link: http://www.quraneralo.com/unislamic-rituals-in-marraige/?wpmp_tp=1

বিয়েতে “এ্যাংগেজমেন্ট” এবং “পুরুষের স্বর্ণ” ব্যবহার!

2 November 2014

সংকলনে : বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

এক.

বর্তমানের বিয়েগুলোর আগে ‘‘এনগেজম্যান্ট’’ নামে একটা জাহেলি সিস্টেম চালু আছে। তা একদিকে যেমন বিদআত, অন্যদিকে অনেক গুনাহের দরজাও উন্মুক্ত করে দেয়। এখনও আকদ তথা বিয়ে পড়ানো হয়নি অথচ নব জামাই মেয়ের হাত ধরে আংটি পরিয়ে দেয়। যা সুস্পষ্টত হারাম। আবার জামাই বাবুকেও তার হাতে স্বর্ণের আংটি পরিয়ে দেয়া হয়। এখানে ২টি হারাম। এক, পরনারীর হাতের স্পর্শ পাওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

"নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভাল, যে তার জন্য হালাল নয়।"

(তাবারানী,ছহীহুল জামে হাদীস –৪৯২১)

*__স্বর্ণ ব্যবহার করা :__ পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম।

আমাদের মুসলিম পরিবারে বিয়েতে কনে/কনে পক্ষ বরকে স্বর্ণের আংটি পরিয়ে দেয়। এই রেওয়াজ বহু বছর ধরে চলে আসছে। শুধু বরকে নয় বরের বোন-জামাইদের/বরের দুলাভাইদেরকেও স্বর্ণের আংটি উপহার দেয়া হয়। আর বিয়েতে বরকে তার অনেক আত্মীয়-স্বজনও স্বর্ণের আংটি উপহার দিয়ে থাকে । আমরা কি জানিনা স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষদের জন্য হারাম ?

নাকি নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিস পড়েও না জানার ভান ধরে এই প্রথা চালিয়ে দিচ্ছি । এর জন্য কি শাস্তি পেতে হবে না ? যারা জেনে শুনে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশকে অমান্য করছে তারা কি জান্নাতে যেতে পারবে ? তারা কি পুলসিরাত পার হতে পারবে?

পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হালাল না কি হারাম কয়েকটি হাদিস থেকে জেনে নিই:

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখতে পেয়ে তা খুলে নিয়েছিলেন এবং তা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) বলেন, "তোমাদের কেউ কী ইচ্ছে করে যে, সে আগুনের টুকরা তুলে নিয়ে নিজের হাতে রাখবে?" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়ার পরে কোন এক ব্যক্তি ঐ লোকটিকে বলল, 'তোমার আংটিটি তুমি তুলে নিতে পারো এবং এই আংটি অন্য কাজে ব্যবহার করে লাভবান হতে পারো'। এ কথা শুনে তখন লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে জিনিস ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন - আমি সেই জিনিস কখনোই আর গ্রহন করবো না।"

[সহীহ মুসলিমঃ খন্ড ০২৪, হাদীস ৫২০৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ পরিধান করবে এবং সেই স্বর্ণ পরিহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, মহান আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের স্বর্ণ হারাম করে দিবেন। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের পোষাক পরিধান করবে এবং সেই পোষাক পরিহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, মহান আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের রেশমের পোষাক হারাম করে দিবেন।"

[মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৫৫৬]

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, " নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।" (বুখারী- আদাবুয যুফাফ-২১৪)

.আলী (রা:) বলেন,"রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।" (তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ,ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫৬,'পোশাক অধ্যায়)

আবু হুরায়রা (রা: বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রিয়জনকে (পুরুষকে) আগুনের কড়া বা আংটি পরানো পছন্দ কওে, সে যেন তাকে সোনার কড়া বা আংটি পরায়। (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪০১, বাংলা মিশকাত হা/৪২০৫)

ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিয়েতে এ্যাংগেজমেন্ট করার রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে। এই আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে এর মাধ্যমে বিবাহের কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা, মুসলিম সমাজ বা শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। আরও নিন্দনীয় ব্যাপার হল, এ আংটি প্রস্তাব দানকারী পুরুষ কোন-কোন ক্ষেত্রে নিজ হাতেই কনেকে পরিয়ে দেয়। অথচ, এ পুরুষ এখনো তার জন্য হালাল হয়নি। এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি। কেননা, কেবল বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হবার পরেই তারা স্বামী-স্ত্রী বলে গণ্য হবেন।

দুই.

ইদানীং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে বিয়েতে এ্যাংগেজমেন্ট করার রেওয়াজ ব্যাপকতা পেয়েছে। এই আংটি পরানোতে যদি এমন ধরে নেওয়া হয় যে এর মাধ্যমে বিবাহের কথা পাকাপোক্ত হয়ে গেল তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। কেননা, মুসলিম সমাজ বা শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। আরও নিন্দনীয় ব্যাপার হলো, এ আংটি প্রস্তাবদানকারী পুরুষ নিজ হাতে কনেকে পরিয়ে দেয়। অথচ এ পুরুষ এখনো তার জন্য অবৈধ। এখনো সে মেয়েটির স্বামী হয়নি।

বিজাতীয় কালচারে ভরে গেছে মুসলিম সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান! আমাদের মনে রাখতে হবে বিয়ে দুটি অন্তরের পবিত্র মিল বন্ধন। সে বন্ধনের সূচনাতেই যদি যিনার ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবেন কিভাবে? আল্লাহ সেখানে বরকত দিবেন এ কথা ভাবলেন কি করে? মডেলিং পেশার মত কনেকে সাজিয়ে ক্যামেরায় পোজ দেয়া ওটা কি গুনাহ নয়? কনের গালে হলুদ ঘষে দিল আপনার চোখের সামনে একটা যুবক, ওটা কি গুনাহ নয়? পর্দা নাই, ছেলে মেয়েরা যে যেভাবে পারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওটা কি গুনাহ নয়! কে বলেছে আপনাকে শয়তানকে খুশী করে এসব করতে? আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীন পালনে অন্তরগুলোকে নরম করে দিন। বিয়ে গুলোকে সহজ করে দিন। আমীন।

আপনার বিয়ের অনুষ্ঠানটাও কি গ্ল্যামারাস ও কালারফুল ছিলো বা হবে? তুলনা করে দেখুন তো !

29 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

ফেসবুক দেখলে বুঝা যায় কত মানুষ যে নিজেকে স্পেশাল ভাবে, কিংবা অন্যরা যেন তাদের স্পেশাল মনে করে সেই চেষ্টা করে। হোমপেইজে ঢুকে সবার নিজ নিজ বিয়েকে গ্ল্যামারাস প্রকাশ করার তোড়জোড়ে বর-বধূর এপাশ-ওপাশ করা ছবি আপলোড করতে দেখা যায়। এই ছবিতে সবাই কমেন্ট আর লাইক দিলে ওরা খুশি হয়। হয়ত হিসেব করে অমুক বন্ধুর ছবিতে ৬৮২ লাইক হইসিলো, আমারটায় এখনো মাত্র ২১৭ টা...

বর-বধু যেমনই হোক, কাক হোক অথবা বক হোক, কিংবা বিউটি পার্লারের হাতে প্যাঁচা হয়েই বের হোক, তাদের কমেন্টগুলাতে থাকে -- 'খুব ভাল্লাগতেছে', 'অসাম', 'দারুন জোড়ি', 'আপনাদের দুজনকে খুব মানিয়েছে', 'তোকে খুব সুন্দর লাগতেসে', 'ভাইয়া দারুণ স্মার্ট, 'তোকে মিষ্টি লাগছে' ... এমন শত শত কমেন্ট, একটু এদিক ওদিক শব্দ...

এই সমাজে মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষ মনে করে তার বিয়েটা স্পেশাল, তার বউটা/হাজব্যান্ডটা এক্সেপশনাল। তাদের ওয়েডিং হতে হবে স্পেশাল, স্মরণীয়। তাই ৩-৪-৫ লাখ থেকে ১০-১৫-২০ লাখ টাকা খরচ, কনভেনশন সেন্টার ভাড়া, স্টেজ সাজানো, বিউটি পার্লার, বিয়ের শাড়ি, গহনা, শেরওয়ানি, নাগরা, হলুদ, হ্যান-ত্যান খরচ করে শত-শত মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা, শত-জনের কাছে আলাদা হবার চেষ্টা, নিজেকে সুন্দর আর প্রশংসিত করার চেষ্টা...

শুধু আল্লাহকে খুশী করার ইচ্ছাটাই বাদ পড়ে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহকে নারাজ করে, আল্লাহর অপছন্দের কাজ করে, আল্লাহকে ভুলে থেকে, আল্লাহর নিষেধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা হয়।

এসব বিয়েতে হয়ত বিয়ের পরের দিনেই লোকের বলা কথা, অ্যারেঞ্জমেন্টে ভুলত্রুটি, হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের পাত্তা না দিয়ে নিজের খুশিমত আচরণ দেখে বর-বধূর বুক ছিঁড়ে যায়। অশান্তির সূচনা এমন করেই হয়... ক্রমাগত তা কেবল বাড়তেই থাকে...

ফেসবুকের লোকের আড়ালে থেকে কিছু মানুষের এমন বিয়েও হয়, যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে প্রতিটি ধাপে তাকে মেনে চলতে, তার বান্দা ও বান্দী হাতে-হাত মেলায় জীবনের বাকিটা পথ একসাথে বন্ধু ও সহযোগী হয়ে জান্নাতের পথপানে এগিয়ে যেতে। সমাজ, পরিবার, সংস্কৃতির এই অপস্রোতে তারা আল্লাহকে স্মরণ করেই ঘর বাঁধেন। কে জানে, হয়ত ডিএসএলআর ক্যামেরায় তাদের ছবি নেই, হয়ত প্রচুর লাইক আর কমেন্ট নাই তাদের বন্ধনে। হয়ত আল্লাহর দরবারে তার ফেরেশতারা দোয়া করেন এই নবদম্পতির জন্য, তাদের আগামীর সন্তানদের জন্য, তাদের দু'জনার প্রতিটি ভালোবাসা আর পরীক্ষামাখা সময়ের কল্যাণের জন্য, তাদের জান্নাতের জন্য...

যেদিন অসহায়ের মতন একটা সাওয়াবের জন্য মানুষ অন্যের কাছে ছুটে বেড়াবে কিন্তু কেউ কাউকে মুখ তুলেও তাকাবে না, সেদিন হয়ত তাদের জন্য এমন বিয়ের মতন কিছু ইবাদাতের উসিলায় আল্লাহ তাদের মাফ করে দিতে পারেন। লোকজনকে খুশি করার চেষ্টা করে না তাতে নিশ্চিত ব্যর্থ হবার বোকামিটা না করে যদি লোকদেখানো কাজ করার পরিবর্তে আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করে সফল হওয়া যায়, সেটাই করা উচিত নয় কি? আল্লাহ আমাদেরকে তেমন সৎকর্মশীলদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন।

বিয়ে বৈধ হবার শর্তাবলী

1 September 2015

লেখকঃ **কানিজ ফাতিমা**

একটি বিয়ে বৈধ হওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী পূরণ হওয়া বাধ্যতামূলক- তা নিয়েই সামনের আলোচনা।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে কেবল একজন নারী ও একজন পুরুষের একত্রে বসবাসের জন্য অর্থনৈতিক ও দৈহিক সুবন্দোবস্তই নয় (Financila and physical arrangement) বরং এটি আল্লাহর দেয়া একটি নেয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষ সুখ ও স্বস্তি লাভ করে, জীবনকে উপভোগ করে এবং নিজের বংশধারা অব্যাহত রাখে। বিয়ের শর্তের ব্যাপারে আমাদের সমাজে নানা ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। যা দূরীভূত হলে জীবন সহজ ও সুন্দর হতো।

অনেকে বিয়েতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান বা মহাভোজের (Grand feast) আয়োজনকে বিয়ের জন্য অপরিহার্য মনে করে। আবার ভারী স্বর্ণের অলংকার আদান প্রদান না করলে বিয়েটা যেন ঠিক সামাজিক বৈধতা পায় না।

এগুলো একেবারেই ভুল ধারণা। এর ফলে পাত্র, পাত্রের পরিবার এবং পাত্রীর অভিভাবকের (অনেক ক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম পাত্রীর) উপরে একটি বড় খরচের বোঝা এসে পড়ে- যা বিবাহকে কঠিন করে তোলে। এ খরচের কথা চিন্তা করে অনেক মুসলিম যুবাই বিয়ের ব্যাপারে পিছপা হন এবং পাত্রীর পরিবারও কঠিন আর্থিক সমস্যায় নিপতিত হয়। অথচ ইসলামে বিবাহকে যতটা সম্ভব সহজ করতে বলা হয়েছে।

মহাভোজ, জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান বা ভারী স্বর্ণালংকার কোনটিই বিবাহ বৈধ করার শর্ত নয়।

বিশেষতঃ স্বর্ণালংকারের দাম যেভাবে বেড়েই চলছে তাতে অধিক পরিমাণ স্বর্ণ দেয়া বর, বরপক্ষ, পাত্রী, এমনকি দেশের অর্থনীতি কোনটির জন্যই কল্যাণকর নয়।

ভারী অলংকার কিনতে বর বা বরপক্ষের একবারে মোটা অংকের টাকা খরচ করতে হয় (কিস্তিতে অলংকার কেনার রেওয়াজ যেহেতু নেই)। পাত্রীর জন্যও এটা ততটা লাভজনক নয়। কারণ স্বর্ণালংকার কেনার টাকাটা তার মোহরানার উসুল হিসেবে ধরা হয়। এটি স্বর্ণ হিসেবে আলমারীতে থাকার চেয়ে ক্যাশ হিসেবে ব্যাংকে থাকার সুবিধাটা বেশী। প্রয়োজনে এটাকে কাজে লাগানো সহজ হয়। অনেকে বলতে পারেন স্বর্ণ বিক্রি করে ক্যাশ পাওয়া সম্ভব। বাস্তবে এটা সত্যিই সহজ নয়। স্বর্ণ বিক্রিতে বর বা বরপক্ষের আপত্তি থাকতে পারে। এটা বিক্রি করা ঝামেলাপূর্ণ। তাছাড়া বিক্রির সময় স্বর্ণের খাদ বাবদ মূল স্বর্ণ থেকে অনেকটা বাদ দেয়া হয়। ফলে মূল্য অনেক কম পাওয়া যায়। উপরন্তু ছিনতাই বা চুরি হওয়ার ভয়তো রয়েছেই। বর্তমানে কিছুদিন পরপরই গহনার ফ্যাশন বা ডিজাইনে পরিবর্তন আসে। সেক্ষেত্রে বাজারে অনেক ধরনের অলংকার পাওয়া যায় যেমন ইমিটিশন, সিটি গোল্ড ইত্যাদি। এর ডিজাইন

বাহারী, রঙ টেকসই, খরচও কম। অনায়াসে এক দেড় বছর চালানো যায়, তাই ফ্যাশন সচেতনদের জন্য এটাই উত্তম পন্থা।

আমরা জানি স্বর্ণের যাকাত দিতে হয়। যেসব নারীদের নিজেদের উপার্জন নেই তারা এ ব্যাপারটিতে এক ধরনের দোটানায় ভোগেন। যেমন– স্বর্ণেল মালিক তার স্বামী নন। তাই যাকাত দিতে তিনি বাধ্য নন। স্বর্ণের মালিক হিসেবে যাকাত ঐ মহিলার উপর ফরজ (অনেক আলেমদের মতে)। অথচ যাকাত দেয়ার মতো ক্যাশ তার নেই। সেক্ষেত্রে হয় ঐ স্বর্ণ বিক্রি করে ঐ স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে নতুবা স্বামীর নিকট থেকে অর্থ নিয়ে যাকাত দিতে হবে। এ সমস্যার সব থেকে সহজ সমাধান স্বর্ণ কমিয়ে সাড়ে সাত ভরির নীচে নামিয়ে আনা। এটা আপনার সমস্যাকে যেমন হাল্কা করে তেমনি দেশের অর্থনীতিতেও পজিটিভ ভূমিকা রাখে। কারণ স্বর্ণটা স্থবির অবস্থায় আপনার আলমারিতে পড়ে থাকা অর্থনীতির জন্য ভালো নয়। এটা লিকুইড করলে তা কোন না কোন উপায়ে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের কাজে আসে। আর মুসলমান হিসেবে আমাদের সেটাই করা উচিত যেটা আমাদের জন্য সহজ কিন্তু অধিক কল্যাণকর।

এবার দেখা যাক একটি বিবাহ বৈধ হবার শর্তগুলো কী কী - বিয়ে মূলত একটি সামাজিক চুক্তি।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী নিুলিখিত শর্তসমূহ বিয়ের বৈধতার জন্য যা অপরিহার্য –

১. পাত্র ও পাত্রীর পূর্ণ সম্মতি :

বিয়েতে পাত্র ও পাত্রীর পূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি প্রয়োজন যা ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) এর মাধ্যমে গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত পাত্র প্রস্তাব করে ও পাত্রী কবুল করে। তবে পাত্রীর প্রস্তাব করা ও পাত্রের গ্রহণ বা বর্জন করার নীতিও ইসলামে স্বীকৃত। দ্রষ্টব্য বুখারী, কিতাবুন নিকাহ। অনেক আলেম মনে করেন পাত্রী পক্ষের অভিবাবকের সম্মতিও বিবাহ বৈধতার শর্ত। তবে অনেক আলেম ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন আবু হানিফার মতে সাবালক নারীর ক্ষেত্রে তার মতই যথেষ্ট, অভিভাবকের সম্মতি বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ সাবালক নারীর অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত তার নিজের সম্মতিতে বিবাহ বৈধ হবে।

২. স্বাক্ষী : বিবাহ দু'জন নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষী থাকতে হবে।

৩. প্রচার : স্কলাররা এ ব্যাপারে একমত যে বিয়ের ব্যাপারটি গোপন রাখা ঠিক নয় বরং সেটিকে সমাজে প্রচার (Publicize) করা জরুরী। এজন্য বর (বা বর পক্ষ) তার সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজের ব্যবস্থা করবে। আগেই বলা হয়েছে যে, বড় ভোজের আয়োজন করা বাধ্যতামূলক নয়। বড় বা ছোট ভোজ এ ব্যাপারে ইসলাম কোন বাধ্য–

বাধকতা দেয় নি। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজকেই (কৃপণতা বা বিলাসিতা দু'ই ইসলাম অপছন্দ করে) ইসলাম উৎসাহিত করে।

এখানে উল্লেখ্য আমাদের সমাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাত্রী পক্ষের ওপর বড় ভোজ আয়োজনের দায়িত্ব বেশী থাকে। অথচ ইসলাম ভোজ আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছে বরপক্ষকে। তবে পাত্রী পক্ষ যদি স্বেচ্ছায় সামর্থ্য অনুযায়ী ভোজের আয়োজন করে তাতে দোষের কিছু নেই। পাত্র পক্ষের উচিত হবে না পাত্রী পক্ষের উপরে এ ভোজ আয়োজনের জন্য প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করা।

আমাদের দেশে অনেকেই বরযাত্রীর নাম করে একটি বড় সংখ্যা পাত্রীপক্ষের উপর চাপিয়ে দেন।

৪. দেনমোহর : আর একট গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো দেনমোহর (Bridal gift)। এটি আদায় করা প্রতিটি স্বামীর জন্য ফরজ, তা মিলনের পূর্বে হোক বা পরেই হোক। এ ক্ষেত্রে স্বামীর উচিত তার সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা সম্ভব দ্রুত দেনমোহর আদায় করায় সচেষ্ট হওয়া। **অনেকে মনে করেন কেবল তালাক হলেই মোহর দিতে হয়। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। দেনমোহর বিয়ে বৈধতার একটি শর্ত। কাজেই বিয়ের সময়ই দেনমোহর ফরজ হয়ে যায়।** এবার জানা যাক বিয়ের সময় একজন ইমাম বা কাজীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কি না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কাজী বা ইমামের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। উপরোক্ত চারটি শর্ত পূরণ হলেই ধর্মীয়ভাবে বিয়ে হয়ে যাবে। তবে বিয়ে পড়ানোর জন্য (Solemnize) বিয়ে পড়ানোর অনুমতি প্রাপ্ত (Authorized) কেউ উপস্থিত থাকা উচিত। যেমন আমাদের দেশে রেজিষ্টার্ড কাজী। এবার আলোচনা করবো আইনগত ব্যাপারটি নিয়ে। **উল্লিখিত চারটি শর্ত পূরণের মাধ্যমে বিয়ে ধর্মীয় বৈধতা পেয়েও আইনগত বৈধতা পাবার জন্য দেশীয় আইন মতে কিছু কাগজপত্র (Legal paper) তৈরী করা বাধ্যতামূলক।** এটা না করা হলে বিবাহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে (Event to dispute) তার আইনী সমাধান পাবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের চাহিদা কাবিন করা ও বিবাহ রেজিস্ট্রি করা আইনগত বাধ্যতামূলক যাতে মোহরানা ও অন্যান্য শর্তাবলী উল্লেখ থাকে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ আইনী কাগজপত্র বাধ্যতামূলক না হলেও বর্তমানে আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে এটা প্রতিটা মুসলমানের করা কর্তব্য।

অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজ কি শরী'আতসম্মত?

12 October 2014

প্রশ্ন (২৮৮) : অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে প্রচলিত কোর্ট ম্যারেজ কি শরী'আতসম্মত? যদি শরী'আতসম্মত না হয় তবে পরবর্তীতে করণীয় কি?

উত্তর :রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,'অলী ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ নয়'(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)।

তিনি বলেন, ‘কোন নারী অলী ছাড়া বিবাহ করলে তা বাতিল, বাতিল, বাতিল’

(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩১)।

অন্যত্র তিনি বলেন, ‘কোন নারী অপর নারীকে বিবাহ দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে নিজে বিবাহও করতে পারে না’ (ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২, মিশকাত হা/৩১৩৭)।

অতএব এভাবে বিবাহ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবেএবং তাদেরকে পুনরায় বৈধভাবে বিয়ে করতে হবে। দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বর-কনের একত্রে বসবাস অবৈধ ও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে। সঠিক পন্থায় বিবাহ সম্পাদনের পর তাদের এই ঘৃণ্য অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে খালেছ অন্তরে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। বৈধ বিবাহের জন্য মেয়ে ও অলী উভয়ের সম্মতি আবশ্যক। সাবালিকা ও বিধবা নারীগণ বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অলীর চাইতে বেশী হকদার (মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭)।

কিন্তু তারা অলীকে বাদ দিয়ে বিবাহ করবে না। যা উপরের হাদীছে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোন নারী ও পুরুষ স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একত্রে বসবাস করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যে হলফনামা সম্পাদন করে, তাই-ই এদেশে কোর্ট ম্যারেজ নামে পরিচিত। এরূপ কোর্ট ম্যারেজের পর রেজিস্ট্রীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পসন্দমত সাক্ষী মানা হয়। সুতরাং প্রচলিত এরূপ প্রতারণাপূর্ণ বিবাহ কখনোই বৈধ নয়।

ইসলামে বিবাহ কী বাধ্যতামূলক?

1 September 2015

লেখকঃ কানিজ ফাতেমা

একটি মধ্যমপন্থী ধর্ম হিসেবে ইসলামের মূলনীতি হলো- ইসলাম বিবাহকে উৎসাহিত করে।

কারণ মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের এবং মানব বংশের ধারা অব্যাহত রাখার এটিই একমাত্র বৈধ পন্থা। কৌমার্য বরণের মাধ্যমে স্বাভাবিক ((Natural)) চাহিদা দমন করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। তাছাড় বিবাহ রাসূলুল্লাহ (স.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত বোখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদিসটি তার প্রমাণ:

"তিন ব্যক্তির একটি দল রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণের কাছে নবী (স.) এর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আগমন করল। তাদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলে তারা নিজেদের ইবাদাতের পরিমাণকে যথেষ্ট মনে করলো না এবং তারা বলল- কীভাবে আমরা নবীর সমকতা অর্জন করতে পারি যাঁর পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এ সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল- আমি আজীবন রাতভর নামাজ পড়তে থাকব।

অন্যজন বলল-

আমি সারা বছর রোজা রাখবো এবং কখনও রোজা ভাঙ্গবো না (অর্থাৎ বিরতি দেব না)।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল-

আমি সর্বদা নারী থেকে দূরে থাকবো এবং কখনও বিবাহ করবো না।

অতঃপর নবী (স.) তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কী সেই লোক যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশি অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোজা রাখি আবার বিরতিও দেই, রাতে নিদ্রা যাই এবং মহিলাদের বিবাহও করি। যারা আমার সুন্নতের প্রতি বিরাগ পোষন করে (অনুসরণ করে না), তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

ইসলাম একদিকে যেমন কৌমার্য (Celibacy) এর দ্বারা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করার পক্ষপাতী নয় ঠিক তেমনি এটি লাগামহীন অবিবেচক যৌন জীবনকেও অনুমোদন করে না।

রাসূল (স.) বলেন,

"হে যুবসমাজ, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সমর্থ তারা যেন বিবাহ করে, কারণ এটি চোখকে আকাংখাপূর্ণ দৃষ্টি থেকে দূরে রাখে এবং পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না তারা যেন রোজা রাখে। যাতে এটি

ঢাল হিসেবে তাকে রা করতে পারে। এতদসত্ত্বেও বিবাহ সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনা ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কখনও এটি বাধ্যতামূলক, কখনও বিশেষ পছন্দনীয় বা মুস্তাহাব, কখনও এটি শুধুমাত্র হালাল বা বৈধ আবার কোন কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি হারামও হতে পারে।

ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টরোন্টো, কানাডা এর একজন সিনিয়র লেকচারার শেখ আহমদ কুট্টি বলেছেন, যদিও ইসলামিক ফিকাহ শাস্ত্র মতে বিবাহ একটি বিশেষ পছন্দনীয় (Highly recommended) কাজ, তদুপরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা–১. ফরজ বা বাধ্যতামূলক (Obligatory)

২. মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় (Recommended)

৩. হালাল বা বৈধ (Permitted)

৪. হারাম বা নিষিদ্ধ (Forbidden) বিবাহ তখনই ফরজ বা বাধ্যতামূলক হয় যখন একজন ব্যক্তি (নারী ও পুরুষ) তীব্র যৌন চাহিদা অনুভব করে এবং তার দ্বারা ব্যভিচার ঘটে যাবার আশংকা থাকে। যেহেতু ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা ফরজ এবং বিবাহই একমাত্র এই চাহিদা পূরণের বৈধ পন্থা, সেহেতু ঐ ব্যক্তির জন্য বিবাহ ফরজ।

এ ক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতিটি হলো,

"যদি একটি ফরজ কাজ অন্য একটি কাজ ব্যতীত আদায় সম্ভব না হয় তবে ঐ সহায়ক কাজটিও মূল ফরজের মতোই ফরজ হিসেবে গণ্য হবে।"

যদি কোন ব্যক্তির যৌন চাহিদা খুব তীব্র না হয় এবং তার দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হবার সম্ভাবনা না থাকে কিন্তু বিবাহ করার সবরকম সামর্থ্য ও সুযোগ তার থাকে এমতাবস্থায় বিবাহ তার জন্য মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় কাজ। কারণ এটির দ্বারা সে রাসূল (স.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে অনুসরণ করছে।

একজন ব্যক্তির বিবাহ করার মতো ন্যূনতম অর্থনৈতিক সামর্থ্য যদি না থাকে (মোহরানা আদায় ও স্ত্রীর ভরণ–পোষণ স্বামীর জন্য ফরজ) এবং এভাবে সে যদি বিবাহের দায়িত্বসমূহ পালনে অসমর্থ হয় কিন্তু বিবাহের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে, সেক্ষেত্রে বিবাহ করা তার জন্য হালাল (Permitted) এই শর্তে যে–– সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী সৎপন্থায় উপার্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং - ভাবী স্ত্রীকে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান করবে।

সত্য গোপন করা এক্ষেত্রে প্রতারণার সামিল । আল্লাহ এরূপ অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হলো ঐ ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হবার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য করা। কিন্তু পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ব্যক্তিটি সৎভাবে উপার্জনের কোন পথই পাচ্ছে না এবং বৈবাহিক দায়িত্ব (অর্থনৈতিক) পালনের কোন উপায়ই তার সম্মুখে খোলা নেই, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে রোযা ও অন্যান্য সংযম সাধনের (Acts of sublimation) মাধ্যমে নিজেকে দমনের চেষ্টা চালাতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে তার দ্বারা বিবাহের আবশ্যক (ফরজ) দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা সম্ভবপর নয় এবং তার ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সম্ভাবনাও নেই, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য বিবাহ হারাম বা নিষিদ্ধ।

ইসলাম আমাদের অন্য ব্যক্তির প্রতি অন্যায় (Injustice) এবং অন্য ব্যক্তির অধিকার হরণকে হারাম করেছে। কাজেই স্বামী বা স্ত্রীর একের অন্যের প্রতি ফরজ দায়িত্বের অবহেলা পুরোপুরি হারাম।

বিবাহ কখন হরাম সে সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, ফিকহ আস-সুন্নাহ বই এর লেখক মরহুম শেখ সাইয়্যেদ সাবিক বলেন,

"একজন পুরুষের জন্য বিবাহ হারাম তখন যখন তার স্ত্রীর অধিকার রক্ষার সামর্থ্য না থাকে। এ সামর্থ্যহীনতা দৈহিক বা অর্থনৈতিক যেটাই হোক না না কেন। কোন পুরুষ যদি দৈহিক মিলনে অক্ষম হয় বা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যয় বহনের মতো অর্থনৈতিক সামর্থ্য তার না থাকে তবে তার জন্য বিবাহ বৈধ নয়।"

এ সম্পর্কে অপর একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আল কুরতুবী (রহ.) বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি বিবাহের খরচ বহনের মতো সামর্থ্যবান না হয়, যদি তার মোহরানা পরিশোধের সামর্থ্য না থাকে বা স্ত্রীর অন্যান্য অর্থনৈতিক অধিকার (Financial right) আদায়ের সামর্থ্য না থাকে তবে তার বিবাহ বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে তার অবস্থা ভাবী স্ত্রীকে জানায় অথবা সে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ করে। আর যদি সে দৈহিক দুর্বলতা বা ত্রুটির কারণে দৈহিক মিলনে অসমর্থ হয় তবে তাও ভাবী স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে জানাতে হবে। এক্ষেতে লুকোচুরি বা গোপন করার মাধ্যমে স্ত্রীকে প্রতারিত করা স্পষ্ট নিষিদ্ধ। একই নিয়ম মহিলাদের ক্ষত্রেও প্রযোজ্য। কোন মহিলা যদি স্বামীর হক আদায়ে অসমর্থ হন অথবা তার এমন কোন ত্রুটি থাকে যার ফলে সে দৈহিক মিলনে অক্ষম হন তবে এসব গোপন করে বিবাহ করা স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ (হারাম)।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- স্থায়ী মানসিক রোগ (Insanity), কুষ্ঠরোগ (Leprosy), গোদ রোগ (Elephantiasis) অথবা স্ত্রীর অঙ্গের কোন রোগ (Genital or vaginal disease)।এমন এক সমস্যা থাকলে তা বিবাহের পূর্বেই পুরুষটিকে জানিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটি অনেকট ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির ন্যায়। বিক্রেতা বাধ্য থাকবে পণ্যের ত্রুটি সম্পর্কে ক্রেতাকে অবহিত করতে। যদি কোন পক্ষ নিজের ত্রুটি অপর পক্ষের নিকট গোপন করে তবে এক পক্ষ (যার নিকট গোপন করা হয়েছে) বিবাহ বাতিলের অধিকার রাখে। যদি স্বামী বিবাহের পর এমন কোন মারাত্মক ত্রুটি

স্ত্রীর মধ্যে পান যা তার নিকট গোপন করা হয়েছিল তবে তিনি বিবাহ বাতিল করতে পারবেন এবং মোহরানা ফেরত নিতে পারবেন (যদি তিনি ইচ্ছা করেন)। অনুরূপ কোন স্ত্রী যদি বিবাহের পর স্বামীর এমন কোন ত্রুটি পান যা গোপন রাখা হয়েছিল, তাকে বিবাহের পূর্বে অবহিত করা হয় নি (যা দ্বারা তার ফরজ অধিকার লঙ্ঘিত হয়), তবে তিনি বিবাহ বাতিলের সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।"

এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার মোহরানা কতটা পাবেন সে ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ.) দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন।

যদি দৈহিক মিলন ঘটার পরে (After consummating marriage) স্ত্রী বিবাহ বাতিল করেন তবে তিনি পূর্ণ মোহরানা পাবেন।

অন্যথায় (অর্থাৎ বিবাহের পর পরই দৈহিক মিলন ঘটার পূর্বেই বিচ্ছেদ ঘটলে) তিনি অর্ধেক মোহরানা পাবেন।

আমরা জেনেছি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য বিয়ে বাধ্যতামূলক কি না।

এখন আমরা যে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই তা হলো নারীদের জন্য বিবাহ বাধ্যতামূলক কি না।

এ ব্যাপারে ২৬ বছর বয়স্ক একজন মহিলা চিঠি লিখেছিলেন ইসলাম অনলাইনে একথা জানতে চেয়ে যে, তার মা-বাবা তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু আশে-পাশে অনেক অসুখী পরিবার দেখে সে ভীত। একদিকে পিতা-মাতার অনুরোধ, অন্যদিকে বিয়ে ভীতি-এমতাবস্থায় তার কী করণীয়। এর উত্তরে বলা হয়েছে যদিও সাধারণত বিয়েকে ইসলাম উৎসাহিত করে তথাপি অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার উপর ভিত্তি করে এটি কোন কোন ব্যক্তির জন্য ফরজ হয়, কারও জন্য মুস্তাহাব, কারও জন্য শুধুই হালাল এমনকি কারও কারও জন্য হারামও হয়ে থাকে (বিস্তারিত পূর্ব আলোচনায়)।

এই নীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। কাজেই মেয়েটির উচিত হবে নিজ অবস্থা পর্যালোচনা করে সেরূপে সিদ্ধান্ত নেয়া। বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শেখ আহমদ কুট্টি প্রশ্নকারী মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলেন :

"যেহেতু ইসলাম পিতা-মাতাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখার নির্দেশ দেয় সেহেতু তাদের সাথে যে কোন ব্যাপারে মত বিনিময়ের সময় তাদের প্রতি বিনয়ী, নম্র ও সহানুভূতিশীল হওয়া আমাদের কর্তব্য। সব পিতা-মাতাই সন্তানের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সেটি বাবা-মা এর জন্য কতটা কষ্টদায়ক হবে তা চিন্তা

করে সন্তানদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তবে ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি দান করা বা না করার পুরোপুরি অধিকার নারীকে দিয়েছে। এ ব্যাপারে পিতা-মাতার মতামতের চেয়ে পাত্রীর মতামতকে ইসলাম প্রাধান্য দেয়।"

এর স্বপক্ষে কিছু হাদিস উল্লেখ করা যেতে পারে :

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোন বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। কোন কুমারী মহিলাকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া চলবে না। (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

"হযরত খানসা বিনতে খিযাম (বা খিদাম) (রা.) এর একবার বিয়ে হয়েছিল। এরপর তিনি স্বামীহীন হন। এমতাবস্থায় তার পিতা তাকে অন্য এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত খানসা এ বিয়ে পছন্দ করেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে এসে তাঁকে একথা জানালেন। ঘটনাটি শোনার পর নবী করীম (স.) এ বিয়ে বাতিল করে দিলেন।" (বুখারী)

শেখ আহমদ কুট্টি আরও বলেন,

"পিতা-মাতার অধিকার আছে সন্তানকে উপদেশ দেয়ার। তাঁরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সন্তানদের জন্য মঙ্গলজনক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য সন্তানদের তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু ব্যাপারটি যখন বিয়ে সম্পর্কিত এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ইসলাম সংশ্লিষ্ট নারীটিকে দিয়েছে, তার বাবা-মাকে নয়, সেক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে চিন্তা-ভাবনা করে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার নারীর আছে। কারণ সারা জীবন ঐ ব্যক্তির সাথে তাকেই থাকতে হবে, বাবা-মাকে নয়। তাছাড়া আশেপাশের অসফল বিবাহ বা অসুখী দম্পতি (Disfunctional marriage) দেখে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ভুল যে, সব বিবাহই অসফল বা সব দম্পতিই অসুখী। বিয়ে সফল হবে কি বিফল হবে তা নির্ভর করে স্বামী এবং স্ত্রী জীবনের ব্যাপারে কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তার উপর।

মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং আমাদের আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত। সূরা আল ইসরা এর ৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

”এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাধিক সরল .....”। (১৭:৯) কাজেই স্বামী এবং স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হয়, ইসলাম প্রদত্ত পরস্পরের হকসমূহ আদায় করে, অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে এবং নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে তবে আশা করা যায় বিবাহ সফল হবে এবং দম্পতি সুখী হবে।”

আমার অভিভাবক আমার বিয়ে দিচ্ছে না, আমার কি করণীয়?

24 September 2014

আমি ৩১ বছর বয়সী একজন শিক্ষিকা, ১৯৯৬ সাল থেকে আমি শিক্ষকতা করছি। ১৯৯৭ এর শেষের দিকে এক সহকর্মী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, আমি তাকে বলি তিনি যেন আমার বড় বোনের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। আমার বড় বোনের বিয়ে হয় ২০০০ সালে। আর তখন এই কলিগ আমার বাসায় প্রস্তাব পাঠান। আমার বাবা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও আমার মা রাজি ছিলেন। আমার বাবা তার অমতের কারণ হিসেবে এই কারণ দর্শান যে আমাকে আমার মাস্টার্স ডিগ্রী করা চালিয়ে যাওয়া উচিত তাহলে পরে হয়তো কোন ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পাব। আমার বাবা এ পর্যন্ত বহু পাত্রকে না করে দিয়েছেন, কেননা তার মতে তাদের কেউই আমার জন্য যথেষ্ট ভাল (বা যোগ্য) নয় আর আমি আরো ভালো কাউকে পেতে পারি (যদিও একজন ইঞ্জিনিয়ার সেই যথেষ্ট ভালো পাত্রদের একজন ছিল)।

২০০২-এ আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে সুযোগ পাই, এবং প্রচুর প্রস্তাবও আসতে থাকে; কিন্তু আমার বাবা তাদের সবাইকে না করে দেন, তার মতে, এইসময়ে বিয়ে করলে তা আমার লেখাপড়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এর মাঝে একজন ছিলেন ডাক্তার, আমার বাবা এতেও অসম্মত হন কারণ তার মনে হয়, পাত্র আমার বেতনের টাকার জন্য লোভে পড়ে বিয়ে করতে চেয়েছেন।

আমার প্রথম সহকর্মী আমাকে আবারো প্রস্তাব পাঠান কিন্তু আমার বাবা আবারো অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, কেননা সে কেবল একজন শিক্ষক আর আমি ইউনিভার্সিটির লেকচারার।

যদিও আমি আমার বাবাকে বলেছি যে তাকে (আমার সহকর্মীকে) স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে কারণ তার আর আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা একই রকম, আমরা দুজনই মাস্টার্স করেছি। পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও

সামাজিক দিক থেকেওতার সাথে আমার মিলে যায়। তিনি ধার্মিক, উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং আর্থিক ভাবেও সচ্ছল।

২০০৩ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ ২০০৬ এর শেষে, আমাকে এই প্রথম সহকর্মী বাদে আর কেউই প্রস্তাব পাঠাননি। তিনি আমাকে বিয়ে করার দৃঢ় ইচ্ছা রাখেন এবং আমিও। আমার বাবা বলেন, এই শিক্ষককে বিয়ে করার চাইতে, বিয়ে না করে থাকাটাই তার জন্য ভালো। কেননা আমার অনেক বেতনের চাকরি, যতক্ষণ না খুব ভালো প্রস্তাব না আসছে, আমার বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। ভালো প্রস্তাব বলতে বুঝায়, তার খুব ভালো প্রফেশন থাকতে হবে (সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, খুব কম পেশাই তার মতে ভালো) এবং পাত্রকে ধনী হতে হবে। আমার বাবা এই ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। আমি অনেক কষ্টে আছি, অনেক ভালো সম্মানজনক ক্যারিয়ার পাবার উচ্চাভিলাষ আমার নেই, আমার আকাঙ্ক্ষা একটা সংসারের।

আমার প্রশ্নঃ

আমার জন্য অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা কি হালাল? আমার বাবা কি আমার জন্য একজন অনুপযুক্ত/ অযোগ্য অভিভাবক হিসেবে বিবেচিত হবেন? দয়া করে আমাকে বিস্তারিত উত্তর দিন, আল্লাহ আপনাদের উপর দয়া ও রহমত বর্ষণ করুক এবং উত্তম প্রতিদান দিক!

"There is no marriage without a wali." Narrated by Abu Dawood (2085), al-Tirmidhi (1101) and IbnMajaah (1881) from the hadeeth of Abu Moosa al-Ash'ari; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi.

And he (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "There is no marriage except with a wali and two witnesses of good character." Narrated by al-Bayhaqi from the hadeeth of 'Imraan and 'Aa'ishah; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Jaami' 7557.

And he (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Any woman who gets married without the permission of her guardian, her marriage is invalid, her marriage is invalid, her marriage is invalid. But if the marriage is consummated then the mahr is hers because she has allowed him to be intimate with her. If they dispute, then the ruler is the guardian of the one who has no guardian." Narrated by Ahmad (24417), Abu Dawood (2083) and al-Tirmidhi (1102); classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Jaami' no. 2709.

The woman's guardian is her father; then her paternal grandfathers, no matter how far the line of ascent reaches; then her son and his sons, no matter how far the line of descent reaches (this applies if she has a son); then her (full) brother through her father and mother; then her (half) brother through her father only; then their sons, no matter how far the line of descent reaches; then her paternal uncles; then their children, no matter how far the line of descent reaches; then the father's paternal uncles; then the ruler. (al-Mughni 9/355).

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য!

প্রথমত,

বেশিরভাগ আলিমদের মতে,অভিভাবক ব্যতীত কোন বিয়েই বৈধ নয়, এর কারণ হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ **"(নারীদের জন্য) ওয়ালী (অভিভাবক) ব্যতীত কোন বিবাহ নেই"।**[আবু দাঊদ (২০৮৫), আত-তিরমিযী (১১০১) এবং ইবন-মাজাহ (১৮৮১) থেকে বর্ণিত আবু মূসা আল-আশ'আরীর হাদীস; আল-আলবানী সহীহ আত-তিরমিযীতে হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যা দেন]

এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ **"ওয়ালী (অভিভাবক) এবং দুইজন উত্তম চরিত্রের সাক্ষী ব্যতীত কোনো বিবাহ (বৈধ) হবে না"।** [আল বায়হাক্বী থেকে বর্ণিত ইমরান এবং 'আয়িশা এর হাদীস; সহীহ আল-জামি' ৭৫৫৭ এ আল-আলবানী হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।]

আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ **"যে নারী তার ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করে, তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল। তবে যদিও বিবাহ সুসম্পূর্ণ করা হয়ে যায়, তবে মাহর হবে তার (নারীর) কেননা সে তাকে নিজের কাছাকাছি হবার সুযোগ দিয়েছে। যদি তারা বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে যার কোন অভিভাবক নেই, জনৈক শাসক তার অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত হবেন"।**[আহমাদ (২৪৪১৭), আবু-দাঊদ (২০৮৩) এবং আত-তিরমিযী (১১০২) দ্বারা বর্ণিত; সহীহ আল-জামিতে আল-আলবানী কর্তৃক সহীহ হিসেবে আখ্যায়িত; নম্বর ২৭০৯]

নারীর জন্য অভিভাবক হলো তার পিতা, (যদি না থাকতে তাহলে) এরপর তার দাদা, (তিনি বর্তমান না থাকলে) এভাবে তাদের উপরে যতজন আছেন তারা। (তাদের কেউ না থাকলে) তারপর তার পুত্র এবং পুত্রের পুত্র, এবং এভাবে যতজন তাদের পরে আসতে থাকে (এটা শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য যদি তার পুত্র থাকে); (তাদের কেউও যদি না থাকে) এরপর তার আপন ভাই; এরপর তার সৎ ভাই (একই পিতা); এরপর তাদের পুত্রগণ, (বা তাদের পুত্রগণ) এবং এভাবে বংশের ধারা যতই নিচে যাক না কেন। এরপর (তাদের অবর্তমানে) পিতার চাচাসমূহ, এবং তা নাহলে শাসক। [আল-মুগনী ৯/৩৫৫]

কিন্তু যদি অভিভাবক বারবার কোন যোগ্য পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন, তাহলে ধরা হবে তিনি তাঁর অধীনস্থ নারীর বিবাহে বাধা দিচ্ছেন, সুতরাং তার অভিভাবকত্ব নাকচ বা বাতিল হয়ে যাবে, এবং এই অধিকার হস্তান্তরিত হয়ে পিতার দিকের পরবর্তী যে আত্মীয় আসে তার উপর বর্তাবে।

দ্বিতীয়ত,

এখানে যে সামঞ্জস্যতার কথা বলা হচ্ছে তা হলো দ্বীনের ব্যাপারে কতোটা একজন কতোটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আন্তরিক, সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্যতা। একজন আরব এবং একজন অনারবের মাঝে, কিংবা একটি সাদা চামড়া ও একটি কালো চামড়ার লোকের মাঝে আল্লাহর চোখে তাক্বওয়া (আল্লাহভীরুতা বা ধর্মপরায়ণতা) ব্যতীত আর কোন তফাৎ নেই। কিছু ফুক্বাহা' অবশ্য পাত্র-পাত্রীর মাঝে সামঞ্জস্যতার আরো কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন, যেমন বংশ ইত্যাদি। তবে সত্যি বলতে, পাত্র একজন শিক্ষক, আর আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক এর অর্থ এই নয় যে তিনি আপনার অনুপযুক্ত, যদি আপনার বর্ণনা অনুযায়ী উনি সচ্চরিত্র, ধার্মিক এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে থাকেন।

তৃতীয়ত,

আমাদের কাছে যা মনে হয় তা হলো আপনি আবারো আপনার বাবাকে বুঝানোর চেষ্টা করুন, এবং এ ব্যাপারে এমন কারো সাহায্য নিন যার সুপারিশ আপনার বাবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন কোন বন্ধু বা আত্মীয়। যদি তিনি আপনাকে এই পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যান, এটাই আপনি চাচ্ছিলেন; তা নাহলে আপনি আপনার বাবার পরে পরবর্তী অভিভাবক (শরীয়াহ নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ীযিনি ওয়ালি) হিসেবে যিনি আসেন, তার কাছে ব্যাপারটি উত্থাপন করুন। যদি তিনিও আপনার বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে প্রত্যাখ্যান করেন অথবা এমন কোন পরিস্থিতি থাকে যে আপনার অভিভাবক সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ বিরাজ করছে, তাহলে আপনি ব্যাপারটি নিয়ে কাজীর কাছে যাবেন এবং তাঁর উপরবিয়ে পড়ানোর দায়িত্বে ন্যস্ত করবেন।

চতুর্থত,

এই অভিভাবক এবং উনার মত অন্য সকলে খুব অদ্ভুত একটা কাজ করে থাকে! সেটা হচ্ছে তারা নিজেদের কন্যাদেরকে ব্যবসায়ের মালে পরিণত করে ফেলে, যে উঁচু দর দিবে তার কাছে মেয়ে তুলে দেয়া হবে অথবা তাকে দেয়া হবে যে বাকি অন্যদের চেয়ে ভালো দর দিচ্ছে! এরচেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যখন তারা এটা দাবি করে বসে যে তাদের কন্যার বিয়ে করার-ই কোন দরকার নেই! এই হতভাগারা একটা মানুষের চাহিদার কী বোঝে? সে কি জানেনা যে মানুষের প্রশান্তি, ভালোবাসা এবং দয়া-মায়ার প্রয়োজন, এগুলোই মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা আর অসীম প্রজ্ঞাময় ও মহান আল্লাহ এভাবেই তাদের সৃষ্টি করেছেন? এই নারীর অভিভাবকের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং তাদের বুঝা উচিত যে নিজের মেয়ে বা বোনকে যোগ্য পাত্র, যে তার মেয়েকে নিয়ে সন্তুষ্ট, এমন ছেলের হাতে তুলে না দিয়ে সে অন্যায় করছে এবং শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করছে, যার অর্থ সে একজন ফাসিক বা পাপী

ব্যক্তি যার চরিত্রিক উৎকর্ষতা লোপ পেয়েছে। শায়েখ ইবন ‘উথাইমিন (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাজিল করুন) বলেনঃ

যদি ওয়ালি/ অভিভাবক (তার অধীনস্থ) নারীকে এমন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ দিতে অসম্মত হয় যে দ্বীনদার এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী, তবে সেই ওয়ালির অভিভাবকত্ব নারীর পিতার দিক থেকে এরপরে যিনি (শরীয়াহ অনুযায়ী) অভিভাবক হিসেবে বিবেচিত, তার কাছে হস্তান্তর হয়ে যাবে, বা তার পরবর্তী অভিভাবকের কাছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি তারাও তার বিবাহ দিতে আপত্তি জানায়, যেটা সাধারণত হয়ে থাকে, তাহলে অভিভাবকত্ব চলে যায় কাজীর কাছে। এবং তখন কাজীর দায়িত্ব মেয়েটির বিবাহের ব্যবস্থা করা। যখন কাজীর কাছে ব্যাপারটি নিয়ে আসা হবে, এবং তিনি জানেন যে উক্ত নারীর অভিভাবকগণ তার বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তখন তার এটাই করা উচিত (অর্থাৎ বিবাহ সম্পাদনে সাহায্য করা উচিত), কেননা যাদের কোন নির্দিষ্ট ওয়ালি/ অভিভাবক থাকে না, তাদের জন্য ওয়ালি হলো কাজী।

ফুক্বাহাগণ (আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেন, যদি ওয়ালি বার বার যোগ্য পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, তবে সে একজন ফাসেক ব্যক্তি (পাপী) এবং তাকে সচ্চরিত্রের লোক বলে আর বিবেচনা করা যাবে না, না তাকে ওয়ালী হিসেবে গণ্য করা হবে। বরং এ বিষয়ে পরিচিত মতবাদ হলো, ইমাম আহমেদের মাযহাব অনুযায়ী, এমন ব্যক্তি নামাজে ইমামতি করতে পারবে না, এবং তার পিছে দাঁড়িয়ে কোন জামা’আতের সালাত আদায় করা যাবে না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিদের মত অনেকেই আছেন, যারা উপযুক্ত পাত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কিন্তু একজন নারী অনেক সময়ই কাজীর কাছে এসে নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নেবার কথা বলতে লজ্জা পান, এমনটাই হয়ে থাকে। তবে তার উচিত বিষয়টির ভালো এবং খারাপ উভয়দিক বিবেচনা করা। এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যে কোনটার জন্য ফলাফলটা বেশি ক্ষতিকারক হবে- স্বামী ছাড়া থাকা, আর তার বর্তমান অভিভাবক কে এই সুযোগ করে দেয়া যেখানে তার নিজের অভিভাবক নিজের মনমত, বা তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মেয়ের জীবনকে যেমন খুশি চালাতে থাকবে... আর যখন সে বুড়ি হয়ে যাবে, তার বিয়ের ইচ্ছা মরে যাবে, তখন তারা তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে; নাকি কাজীর কাছে যাওয়া এবং তাকে বলা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতে, কেননা শরীয়াহ তাকে এ অধিকার দিয়েছে।

নিঃসন্দেহে, দ্বিতীয় অপশনটি-ই উত্তম। অর্থাৎ যে কাজীর কাছে যাবে এবং তার বিবাহের ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা বলবে। কারণ এটা তার অধিকার এবং এভাবে তার কাজীর কাছে যাওয়ার কারণে এবং কাজীর এ বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে অন্যদেরও উপকার হবে, কেননা অন্যরাও তখন তার দেখাদেখি কাজীর কাছে আসবে, এবং এভাবে কাজী সেসব লোকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন, যারা নিজেদের অধিকারভুক্ত নারীদের সাথে অন্যায় করে এবং তাদেরকে যোগ্য পাত্র বিবাহে বাধা প্রদান করে। বলতে গেলে এ কাজটি তিনটি উদ্দেশ্য সাধন করেঃ

১। নারীর নিজের মঙ্গল, যেন তাকে স্বামী ছাড়া থাকা না লাগে।

২। অন্যদের মঙ্গল সাধন, কেননা এটা সেসব নারীর জন্য একটা নজির জারি করবে, যারা এমন কিছু হবারই অপেক্ষা করছিল, যাতে করে তারাও এ কাজের অনুসরণ করতে পারে।

৩। সেসব অত্যাচারী ওয়ালিদের কে প্রতিহত করা, যারা নিজেদের খুশিমত বা সুবিধা অনুযায়ী নিজেদের কন্যা বা অধিকারভুক্ত নারীদের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়।

কাজটি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূরণকরে। তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশ পালন করা, তিনি (সা) বলেনঃ **"যদি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা কোন মুসলিম যুবকের দ্বীন এবং ব্যবহার (চরিত্র) তোমাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তোমার অধীনস্থ নারীর সাথে তার বিয়ে দাও। এর অনথ্যায় হলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে।"** [আল তিরমিযি তে আবু হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।]

এছাড়াও, কাজটি আরো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণ করে, দ্বীনএবং সচ্চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে তাদেরকে হারাম কাজ এবং নষ্ট হবে যাবার হাত থেকে রক্ষা করে।

ফাতওয়া ইসলামিয়া থেকে উদ্ধৃত। ৩/১৪৮

আমরা দু'আ করি যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম ও মঙ্গলজনক কাজ করার তওফিক দান করুক!

এবং আল্লাহ সর্বপেক্ষা ভালো জানেন।

বিঃদ্রঃ এ লেখাকে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। পাত্র দ্বীনদার/ সচ্চরিত্রের না হলে, অথবা বাবা/ অন্য ওয়ালীকে রাজি করানোর পূর্ণ প্রচেষ্টা না করে, আগেই নিজে নিজে কাজীর কাছে যেয়ে সম্পাদনকৃত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই ইসলাম মেনে চলার ব্যাপারে সকলে নিজের সাথে এবং আল্লাহর সাথে সৎ হতে সচেষ্ট হোন, আর সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।

Source: http://islamqa.info/en/ref/95405/wali

এখনকার সময়ে “বিয়ে” অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে !

30 May 2015

সংকলেন - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক।

এক.

এখনকার সময়ে "বিয়ে" অনেক কঠিন হয়ে গিয়েছে। "রিলেশান" হয়ে গিয়েছে সহজ। আপনি পত্রিকায় মাঝে মাঝে কিছু সংগ্রামী মেয়ে দেখবেন যারা পড়ালিখা শেষ না করে বিয়ে করতে চায় না। এদের বয়স যে কিন্তু আঠারো পার হয় নি তা নয়। অর্থাৎ, আপনি এটলিস্ট "বাল্যবিবাহ" বলতে পারবেন না। তারা এই বয়সে নিজেও বিয়ে করবেন না, অন্য মেয়েদের বিয়েও ঠেকাবেন। কিন্তু, এদের অনেকেরই প্রেমিক থাকতে পারেন, সেটা সমস্যা নয়। প্রেমিক থাকলে যা খুশি সেটা করতেও পারেন। তাতেও সমস্যা নেই। এবং এর ফলে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত "গর্ভপাত" করা লাগে তাতেও কোন সমস্যা নেই। আসলে কোন কিছুতেই সমস্যা নেই। বিয়ের কথা বললেই সমস্যা।

তারপরেও এসব বাঁধা কাটিয়ে যারা বিয়ে করছেন তারাও জড়িয়ে পড়ছেন নানারকম হারাম কাজে যেগুলো মূলত কাফিরদের দ্বারা সৃষ্ট। যেমন, "এনগেজমেন্ট।" কনে দেখাকে উপলক্ষ্য করে আংটি অথবা যেকোন গয়না মেয়েকে পড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ, আমাদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম তো দূরের কথা, কোন সাহাবা (রাযি'আল্লাহু আনহুম) এই কাজ করেন নি। কিন্তু আমরা ঠিকই করছি। তাছাড়াও, এই "কনে দেখা" কে কেন্দ্র করে হবু দুলাভাই, ভাবী, চাচা, চাচী প্রভৃতির মাঝে হাসি ঠাট্টার নামে আরো যা হয় আমরা কম বেশি সবাই জানি।

যেখানে এক পর্বে এই কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে আমরা কয়েকটা ধাপে বিয়ে সম্পন্ন করাটাকে অধিকতর পছন্দ করি অনেকেই। তাই তো পুরো প্রক্রিয়াটা একটা "যজ্ঞ" তে পরিণত করে ফেলি। প্রায় তিন থেকে চারদিন পুরো কাজটা চলে। বিয়ের পাঞ্জাবী, শেরওয়ানী, স্যুট, বিয়ের শাড়ি, বেনারসী ইত্যাদি ক্রয় থেকে শুরু করে অনেক কিছুই করে ফেলি। এর খারাপ প্রভাব মূলত দুইটি। অপচয় করছেন। বিয়ের সুন্নতের বরখেলাপ করে কিছু মনগড়া কাজ নিয়ে আসছেন। এখানে, অনেকে বলবেন, "একটা মাত্র মেয়ে একটু খরচে কী আসে যায়?" তবে ব্যাপারটা তো আসলে তা নয়। বরং, আপনার বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে ৩০০০ লোক খাইয়েছে দেখে আপনি ৪০০০ লোক দাওয়াত করেছেন। প্রেস্টিজ থাকছে না তো!

একজন ছেলে যে কি না মাত্র তার চাকরী জীবন শুরু করলো, সে এত টাকা কোথায় পাবে? দেনমোহর যদি আট লাখ টাকা ধরে বসে থাকেন? এছাড়াও, বাকী যেসব খরচ আছে সে এত টাকা পায় কোথায়? হয়ত বাবা মায়ের টাকা অথবা কারো কাছ থেকে লোন করা টাকা। ভেবে দেখুন, যার জীবন শুরু হতে যাচ্ছে কয়েক লাখ টাকার লোন দিয়ে সে কিভাবে তার সংসারের বাকী টাকা দিয়ে সস্ত্রীক চলবে বাকী জীবন?

গায়ে হলুদের নামে যা হয় তারা নিশ্চয় কমবেশি সবাই জানেন। "গায়ে হলুদ ছাড়া বিয়ে!!!" আজকাল কল্পনা করতে পারেন? গায়ে হলুদের সাথে আজকাল নানা ধরণের বাদ্য বাজনার মিশ্রনও দেখা যায়। তাছাড়াও, হিন্দি সিরিয়ালের কল্যাণে ভাবীমা, চাচীমা ইত্যাদি "মা" নিয়ে নন মাহরামগণ যে ঠাট্টা তামাশা করেন তা পছন্দনীয় নয়।

সব মিলিয়ে বলতে গেলে- একটা ভালো কাজ করতেও অনেক হারাম কাজ করে ফেলছেন। বিয়ের নিয়ত ছিলো- হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থেকে শরীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করা। সেখানে এটাকে আরো ক্রিটিকাল বানিয়ে ফেলছেন। তাহলে দিন শেষে কি পেলেন? আল্লাহর অসন্তুষ্টি। এটাই কি চেয়েছিলেন?

দুই.

একটা ছেলে/মেয়ে যখন তার বন্ধুদের মাঝে গিয়ে মিশে শুধু গার্লফ্রেন্ডের/বয়ফ্রেন্ডের আলাপ শুনে তার কাছে মনে হতে থাকে, আমারো হয়ত একটা গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ড থাকা উচিত ছিল। যখন টিভি দেখতে বসে সেখানেও শুধু ভালবাসা আর একগাদা প্রেম কাহীনি। এদিকে অনেক দিন থেকেই শুনে আসছে বন্ধু ছাড়া লাইফ ইম্পসিবল,ভালবাসার টানে কাছে আনে।

এফ,এম,রেডিয় কলেজ ভারসিটি ক্যাম্পাস যেখানেই যাই সেই পুরোনো প্রেম ভালবাসার গল্প না হয় রোমাঞ্চকর কোনো দৃশ্য। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মোবাইল ভরতি গান তো আছে।আর আজকাল হুজুর মোল্লাদের বাড়িতেও ডিশ এন্টেনা আছে।বাড়িতে উঠতি বয়সী তরুণ/তরুণীরা সেই পিচ্চিকাল থেকে ভালবাসার গান শুনে বড় হচ্ছে। ১৫ ১৬ বছর থেকে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের স্বাভাবিকভাবে একজন সঙ্গী পাওয়ার আকাঙ্খা যাগে।এদিকে ছোটকাল থেকেই সে প্রেম ভালবাসার গাণ শুনে বড় হয়েছে। এর উপড় ডিশ এন্টেনা,বন্ধু বান্ধব,কলেজ ভারসিটি এরকম নানানরকম পরিবেশগত চাপ তো আছেই। এরকম একটি অবস্থায় এই ছেলেটি/মেয়েটি ধর্মীয় বিধি নিষেধ/নৈতকতার সাথে যুদ্ধ করে কতদিন প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক থেকে দুরে থাকতে পারবে?

আপনি হইত বলবেন হইত কিছুদিন যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারবে।কিন্তু সারা বছর পারবেনা কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ছেলেটিকে/মেয়েটিকে ৮ থেকে ১০ বছর এভাবে যৌবনযুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলাফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে।কেউ অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে এরপর কিছুদিন না যেতেই সম্পর্ক ভেঙ্গে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। কেউ বা প্রেমের অফার দিয়ে প্রত্যাক্ষিত হয়ে ইভজটিজিং করছে ধর্ষণ করছে। উঠতি বয়সী তরুণ তরুণীরা পর্ণ দেখায় অভ্যস্ত হয়ে ধীরে নপুংশক হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই ছেলে মেয়েদের আজ দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে ময়দানে থাকার কথা ছিল তারা কিনা আজ যৌবনযুদ্ধে ব্যাস্ত! আমাদের সমাজের বাবা মারা চোখের সামনে এগুলি দেখছে তবু তার ছেলে/মেয়েকে এই যৌবনযুদ্ধ থেকে উদ্ধার করছেনা যেনো তারা কিছুই বুঝেনা কোনো দিন এই অবস্থায় তাদের পড়তে হয়নি। নিজেদের বিয়ে হওয়ার পর বেমালুম ভুলে গেল নিজের ছেলে মেয়েদেরও বিয়ে দরকার! বাবা মাদের বুঝানোর মত কেউ নেই! তাহলে আমাদের কি হবে? আমাদের যা হওয়ার হউক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যেনো এমন কঠিন করুণ অবস্থায় না পড়তে হয় এটাই হোক আমাদের শপথ। এই বৃহৎ সমাস্যার সমাধান করতে হলে গোটা সমাজ ব্যাবস্থা/রাষ্ট্র ব্যাবস্থা পরিবর্তন করতে হবে।চালু করতে হবে ইসলামি শাসন ব্যাবস্থা। ইসলামি শাসন ব্যাবস্থা চালু করতে আমাদের প্রত্যেককে দ্বীনের পথে মুজাহিদ হয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। এতে আমাদের লাভ? আমাদের লাভ এই যে আল্লাহ আমাদের বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন! আল্লাহ্ বলেন, " হে মুমিনগণ আমি কি তোমাদের এমন বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে? এটা এই যে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে ইহাই মহা সাফল্য " (৬১:১০-১২)

এডাম টিজিং

24 September 2014

লেখকঃ **শরীফ আবু হায়াত অপু**

ছোটবেলায় "না-মানুষী বিশ্বকোষ" নামে একটা বই আমার খুব প্রিয় ছিল - প্রাণী জগতের মজার মজার সব তথ্য আর ছবিতে ঠাসা। সে বইয়ের একটা ছবি আমার এখনো চোখে ভাসে - এক অজগর একটা বিশাল বন বরাহকে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে, আস্ত। সাপ যাই খায় সেটার মাথা আগে গিলে, তারপর শরীরের আর বাকি অংশ। এখন অজগরটা গেলার সময় বুঝতে পারেনি শুকরটা এত বড়। কিছুটা গেলার পর সে এখন আর বাকি অংশটা গিলতেও পারছেনা, বেরও করতে পারছেনা - এসব ক্ষেত্রে বেশিভাগ সময় অজগরটা মারা যায়। যদি অনেক কষ্টে-সৃষ্টে সে শিকারটা গিলে ফেলতেও পারে তবুও অজগরটা খুবই অসহায় হয়ে যায়। মানুষ তাকে পিটিয়ে মারে বা অন্যান্য বড় পশু তাকে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে ফেলে - সে গলায় খাবার নিয়ে অসহায় ভাবে দেখে, রা-টি কাড়তে পারেনা।

আজকাল খবরের কাগজ দেখলে এদেশকে আমার ঐ সাপের মতই লাগে। পশ্চিমা সভ্যতার শুকরটাকে আমরা হাভাতের মত মুখে ঢুকিয়েছি, গিলতে পারিনি। লাঠির বাড়ি আর হায়েনার নখের আঘাতে আমরা গোঁ-গোঁ করছি, শত্রুদের তাড়িয়ে দেয়া তো দূরে থাক চিৎকারও করতে পারছিনা।

মানুষ একটা যুক্তিবাদী প্রাণী। সে তার বিবেক-বোধ যৌক্তিকতার সাথে ব্যবহার করে পশুত্বকে দমন করে রাখে। যখন তার জৈবিক প্রবৃত্তির উপরে তার মন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। এখন এই নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আপসে আসেনা। স্রষ্টা মানুষকে কিছু আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন যা দিয়ে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। পশ্চিমা সভ্যতার সেক্যুলার শিক্ষা মানুষকে এই মূল্যবোধ শেখায় না। ফলে সমাজে তৈরি হতে থাকে পশু। বড় দুঃখ লাগে যে আমাদের সমাজপতিরা এই পশুদের অত্যাচার থেকে হাত পেতে পশ্চিমা দাওয়াই খোঁজেন, ঘায়ে এসিড ঢেলে চামড়া পুড়িয়ে ফেলেন - অসুখ পেয়ে যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

মানুষ বায়োলজিক্যালি একটা প্রাণী। এর ক্ষুধা আছে, পিপাসা আছে, যৌন তাড়না আছে। মানুষকে স্রষ্টা এভাবেই তৈরি করেছেন। মানুষের বায়োলজিক্যাল চাহিদা যখন পূরণ না হয় তখন একটা পর্যায়ে তার মনের শাসন আর শরীর মানেনা - এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্য। যেমন কোন মানুষ যদি পানিতে ডুবে যায় তখন সে সচেতনভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে নিঃশ্বাস না নিতে। কিন্তু কয়েকমিনিট পর জোর করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখার মেকানিসমটা নষ্ট হয়ে যায়, ফুসফুস আপনাআপনি বাতাস ভরার পথ খুলে দেয়। এর ফলে ফুসফুসে পানি ঢুকে মানুষটা মারা যায়। অথচ অক্সিজেন ছাড়া মানুষ প্রায় আধঘন্টা বেঁচে থাকতে পারে!

ধরুন রংপুরের চরম মঙ্গাপীড়িত একটা গ্রাম। মানুষজন দিনে একবার খায় - তাও কচুর শিকড় সেদ্ধ, ভুসি আর আটার গোলা। আমি সপরিবারে সেখানে গেলাম প্রশাসক হয়ে। আমার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া অনেক সম্পদ আছে, বেতন-উপরি মিলিয়েও কামাই কম না। আমার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান খাওয়া দাওয়া। আমি খাবার জন্য গরু জবাই করলাম, খাসি কাটলাম, মুরগি পটকালাম। পুকুরে জাল ফেলে ধরলাম বুড়ো রুই, বড় কাতল আর বাঘা বোয়াল। পোলাওতে এতটাই ঘি ঢালা হলো যে তার সুবাস গ্রামের শেষ প্রান্তের অন্ধ বুড়ির দরজাতেও গিয়ে কড়া নেড়ে আসলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে রান্না আর খাওয়া-দাওয়া সবই করা হচ্ছে বাড়ির সামনের খোলা মাঠটিতে। আমি সপরিবারে খেতে বসলাম খোলা ময়দানে। মাথার উপর চাদর আছে বটে কিন্তু চারপাশে কোন রাখঢাক নেই। কোটরে ঢোকা চোখ নিয়ে সারা গ্রামের ছেলেপেলে আমার খাওয়া দেখছে। খাওয়া দেখছে সে বুড়োটা যে ক্ষুধার জ্বালায় সোজা হয়ে দাড়াতে পারছেনা। মনের চোখ দিয়ে খাওয়া দেখছে সেই অন্ধ বুড়িটাও।

আমার যদি বিবেক বলে কিছু থাকে তবে বুঝব ঘটনাটা ঠিক হয়নি। ভুখা মানুষের না দিয়ে খাওয়াই একটা অন্যায়। আর তাদের সামনে বসে তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে এমন খাবার খাওয়া যার খরচ দিয়ে তাদের সবার ডাল-ভাত হয়ে যেত - এটা কোন মাপের অন্যায়?

কিন্তু আমি বিবেকহীন। রাতেও একই ঘটনা ঘটালাম। পরের দিনও। প্রতিদিন একই ঘটনা চলতে থাকলে একদিন কি মানুষ জেগে উঠবেনা? আমার মুখের খাবার কেড়ে নেবেনা? যদি নেয় তখন কি তাকে খুব দোষ দেওয়া যায়?

প্রেক্ষাপটটা একটু বদলাই। আমি সুবোধ টাইপের একটা ছেলে। ছোটবেলা থেকে যে মিশনারি স্কুলে পড়ে এসেছি, সেখানে কোন মেয়ের বালাই নেই। প্রকৃতির নিয়মে শরীরে দিন বদলের ডাক এসেছে। ছাদ থেকে বারান্দায়, সেখান থেকে ঘরের জানালায় অস্থির আমি। কি যেন খুঁজে বেড়াই। বাবা-মার কানের কাছে অবিরাম ঘ্যানর ঘ্যানর করে অবশেষে ভর্তি হলাম কোচিং-এ। সেখানেই খঁজে পেলাম পিছনের পাড়ার সেই মিষ্টি চেহারার মেয়েটিকে - কী সুরেলা তার গলার

স্বর, কী চমৎকার তার হাতের লেখা। স্যর পড়ানোর ফাকে তো বটেই, বাসায় অবধি বই খোলা রেখে আমি তাকে দেখতে পাই। বিছানায় শুয়ে চোখ মুদলেও আমি তাকেই দেখি। একদিন কোচিং থেকে বেরোনোর সময় সাহস করে বলে ফেললাম - দাড়াও, কথা আছে। সে পাত্তাই দিলনা। মরিয়া হয়ে সব আবেগ ঢেলে চিঠি লিখলাম। চকিতে তার হাতে দিলাম পাড়ার মোড়ে, একটা গোলাপ সহ। চিঠিটা পড়লোও না! ছিড়ে মুখে ছুড়ে মারলো আমার। আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত। কই কোন উপন্যাসে তো এমন ঘটেনি কোনদিন। কোন নাটকে হয়নি। কোন সিনেমাতে না। তবে আমি কী দোষ করলাম? নিজের ভেতর কুঁকড়ে যাবার সাথে সাথে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমিও চূড়ান্ত অপমান করব ওকে।

আবার প্রেক্ষাপট বদলাই। আমি সুস্থ সবল একটা ছেলে। মোটর সাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ করি। শরীরে যৌবন এসেছে অনেক দিন হল। হলে গিয়ে এক টিকিটে দু ছবি দেখি আর হাত এবং কোলবালিশের সখ্যতায় দিন চলে। অভাবের সংসার তাই বিয়েও করতে পারিনা। হঠাৎ সেদিন ব্রেক ঠিক করাতে একটি ধনীর দুলাল আসলো। তার পিছনে বসা সাদা গেঞ্জি পড়া এক দুলালী। বুকের থেকে চোখ নামাতে পারছিলামনা। গায়ে কি যেন মেখেছে, কাছে যেতেই মাথা ঘুরতে লাগল। অনেক কষ্টে কাজ সারতে সারতে দেখলাম মেয়েটার হাত খেলা করছে ছেলেটার শরীরে। ধোঁয়া ছেড়ে যখন চলে গেল ওরা তখন পিছন থেকে আমি দেখছি ভার্জিনের বোতল। এরপর থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য একটাই। এ মেয়েটির শরীর আমি চাইই চাই - এক রাতের জন্য হলেও চাই। হঠাৎ পাশে তাকিয়ে দেখি আমার মত দোকানের আর তিন জনও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একই দিকে তাকিয়ে। ওরাও কি তবে... আমার মতই ভাবছে?

একটা ছেলে বায়োলজিকালি যৌবনপ্রাপ্ত হয় তের থেকে পনের বছর বয়েসে, স্বল্পকালীন বীর্যপাতের মাধ্যমে। আমাদের দেশে বিয়ে করার জন্য ন্যুনতম বয়স একুশ বছর। স্রষ্টা পরিবার গঠনের যে সামর্থ্য একটা পুরুষকে দিয়ে দিলেন সে সামর্থ্য রাষ্ট্র চেপে রাখল ছয় থেকে আট বছর। কি অদ্ভুত সেই আইন! নিয়মমাফিক বিয়ে করতে পারবেনা কেউ এই সময়ে কিন্তু অবৈধভাবে যে কারো সাথে শোয়া যাবে। একটা মেয়ে বায়োলজিকালি সন্তান ধারণের যোগ্যতা অর্জন করে বার থেকে চৌদ্দ বছরে। কিন্তু তাকে বিয়ে করতে হলে আঠার বছর হতে হবে। এ সময় সে কীভাবে দেহের ক্ষুধা মেটাবে? বিয়ের ফলে সন্তান হলে সাংবাদিকের দল ছুটে আসবে বাল্যবিবাহের হট স্টোরি কাভার করতে, বিয়ে ছাড়া সন্তান হলে নারীবাদীরা আসবে ছুটে - কিশোরী মাকে রক্ষা করতে, তার সন্তানকে হেফাজত করতে।

আমাদের আইনে ব্যভিচারের শাস্তি নেই বরং ব্যভিচারে বাধা দিলে তার শাস্তি আছে! যে রাষ্ট্র বিয়ে করে শরীরের জ্বালা মেটালে জেলে পুরবে সেই রাষ্ট্র বিয়ে না করে একই কাজ করলে চোখ বন্ধ করে থাকবে!

এবার দ্বিতীয় আসামী - সমাজ। ধরা যাক একটা ছেলের বয়স একুশ বছর, সে কি বিয়ে করতে পারবে? তার বাবা-মা বলবে পড়াশোনা শেষ কর। তারপর চাকরি কর, তারপর চাকরি করে কিছু টাকা জমাও - তারপর? হ্যা, এবার বিয়ে করলেও করতে পারো। স্কুল-কলেজ আর ইউনিভার্সিটির সতের বছরের (সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হলে বিশ) পড়াশোনা শেষ করে অন্তত পাঁচ বছর চাকরি করার পর একটা ছেলের বয়স হয় ত্রিশ। ঝরণা যেমন বসে থাকেনা তেমন যৌবনও বসে থাকেনি। একটু ডিস্কো টাইপের হলে আসল নারীদেহের স্বাদ পাওয়া হয়ে যায় এর মধ্যেই। অল্প কয়টা পয়সা দিলে গার্মেন্টসের মেসে থাকতে দেয় দু'ঘন্টা। আর তপ্ত যৌবন নিয়ে আমার ব্যাকুল বান্ধবীরা তো আছেই।

হাবলা বা অপেক্ষাকৃত সৎ টাইপের ছেলেগুলোর ভরসা এক্স মার্কা ছবি আর লক্ষ লক্ষ পর্নসাইট। বাবা-মা বেশ জানেন ছেলে বাথরুমে গিয়ে কী করে, দরজা লাগিয়ে কম্পিউটারে কী দেখে। তবু উট পাখির মত বালিতে চোখ গুঁজে থেকে বলেন - 'এ বয়সের দোষ'। আচ্ছা বয়সের দোষে ছেলেটা যদি ভার্চুয়াল জগতের কাজগুলো আসল জগতে করতে চায় তাহলে সবার এত আপত্তি কেন?

আমাদের কালের কন্ঠ পত্রিকা আধাপাতা জুড়ে জোলি-বিপাশার ছবি ছেপে যৌনাবেদনের স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দিচ্ছে। আমাদের প্রথম আলো বিতর্ক উৎসবের নামে অনেক কটা মেয়েকে আমার বয়'স স্কুলে এনে ঢোকাচ্ছে আমাদের চেনা-পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য, সন্ধ্যায় একটা ব্যান্ড শোও আয়োজন করে দিচ্ছে একটু কাছাকাছি হবার জন্য। আমাদের ব্র্যাক ভার্সিটি টার্কের নামে ছেলে-মেয়েদের পাশের বিল্ডিং-এ রাখছে, প্রমের নামে ছেলে-মেয়ে একসাথে নাচতে বাধ্য করছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষক হুআজাদ বইয়ে প্রশ্ন করেন একটা মেয়েকে ঘরে আনলে কী হয়? কনডম আছে, পিল আছে; পেট না বাঁধলেই হল। খারাপ কাজ কর, কিন্তু সমাজ যেন না জানে। আমাদের মুক্তমনা সোশ্যাল ডারউনিস্টরা তত্ব শেখায় ধর্ষণে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা বাড়ে। এটা তাই মনুষ্য জাতের টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক!

- আমরা জ্ঞান অর্জন করতে থাকি।

আমাদের বাবা-মারা ডিশের লাইন ঘরে এনে দেশী গার্লের বিদেশী দেহ দেখিয়ে ছেলেদের সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আমাদের লাক্স বিউটি শোতে বিন্দু আর মমরা শাড়ী বাঁকা করে পড়ে এসে আমাদের মনে ঢেউ তুলছে, কার কোমর কত বাঁকা সে হিসাব করে তাদের এসএমএস পাঠাতে বলছে। আমাদের বেরাদর ফারুকি ফাঁকা আপ্যার্টমেন্ট আর নৌকাতে লীলাখেলা করবার আইডিয়া আমাদের মাথায় ঢোকাচ্ছে। আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে বোঝাই যায়না কী বিক্রি হবে গ্রামীন ফোনের সিম না একটা গ্রাম্য নারী? আড়ং এর দুধ না নারীর? আমাদের নগর বাউল গান বেঁধে জানায় একা চুমকি পথে নামলে তার পিছু নেয়াই রীতি।

- আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে থাকি।

আমাদের রাস্তার মোড়ে বড় বিলবোর্ড লাগিয়ে শিক্ষা দেয়া হয় - ভাসাভির সূক্ষ শাড়ী দিয়ে কিভাবে নাভি ঢেকেও খোলা রাখা যায়। ড্রেসলাইনের পুরুষ মডেল আমাদের শিখিয়ে দেয় কিভাবে আলগা নাভিতে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। আমাদের ভাবীরা পিঠের চওড়া জমিনের শুভ্রতা প্রকাশ করে পয়লা বৈশাখকে ডাকে। আমাদের বোনেরা গলায় রুমাল ঝুলিয়ে টাইট ফতুয়া টাইটতর জিন্স প্যান্ট সহযোগে পড়ে বসুন্ধরায় বাতাস খেতে যায়। আমাদের হাইকোর্ট আদেশ দেয় যে যা খুশি পড়বে কিছু বলা যাবেনা।

- আমরা উন্মুখ চাতকেরা উন্মুখা চাতকীদের কড়া ইশারা পেয়ে যাই।

কিন্তু রাষ্ট্র আর সমাজ কি চায় আমাদের কাছে? আমরা সেই সব ভুখা মানুষদের মত যাদের সামনে দিয়ে পোলাও-কোর্মা আর মুরগির ঠ্যাং যাবে আর তারা হাঁ করে দেখে বলবে আহা কি চমৎকার খাবার; কিন্তু তাদের একটুও খেতে ইচ্ছে করবেনা? আমরা আদমের সেই সব পুরুষ সন্তান যারা একজন সঙ্গীনির অভাবে মনে মনে মরবে। আমাদের সামনে নানাভাবে নারীর মাংশ উপস্থাপন করা হবে আর আমাদের ধস্বভঙ্গ-ঋষির নির্লিপ্ততায় তা উপেক্ষা করে যেতে হবে?

যে ভদ্রলোকটা টকশো আর পত্রিকায় বিবৃতি দেয় ইভ টিজিং এর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার তার ভন্ডামির মুখোশে আমি থুতু দেই। আমি থুতু দেই সেই সমাজপতির নষ্টামিতে যে একটা বেকার ছেলের একটা কাজের ব্যবস্থা করেনা যাতে সে একটা বিয়ে করতে পারে; কিন্তু তাকে বখাটে ছেলের তকমা লাগিয়ে জমি আর রাজপথ দখলের কাজে লাগায়। আমি থুতু দেই এই সমাজের মুখে যা আমার পুরুষত্ব প্রাপ্তির পরের পনের বছরের পুরোটা সময় ধরে এডাম টিজিং করে আজ আমাকে ইভ টিজার বানিয়েছে।

আইন করে, 'জনমত' গঠন করে ইভ টিজিং বন্ধ করা যায়নি, যাবেওনা। সেক্যুলার না মানুষকে মুসলিম হতে শেখাতে হবে। এত কষ্ট করে আইন না বানিয়ে আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন তা মেনে নিতে হবে। ইভ টিজিং কেন বাংলাদেশ সব পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের সব সমস্যার একটাই ম্যাজিক বুলেট আছে - ইসলাম। আমার মেয়েকে ইভ টিজিং এর হাত থেকে বাঁচাতে চাইলে হিজাব পরাই, মুসলিমাহ বানাই। সমাজকে রক্ষা করতে চাইলে আমার ছেলেকে চোখ নামিয়ে চলতে শেখাই, মুসলিম হতে শেখাই, তাড়াতাড়ি বিয়ে দেই।

রাস্তার মোড়ের বখাটে ছেলেগুলোর নষ্ট হবার পেছনে আমাদের অবদান আছে বৈকি। খারাপ হবার উৎসগুলো বন্ধ না করলে নিত্য-নতুন খারাপ আসতেই থাকবে? নষ্টামির গাছের গোড়ায় পানি আর সার ঢেলে পাতা ছাটাই করলে কি কোন লাভ হবে?

ইসলামের বাঁধন দিয়ে মানুষের ভিতরের পশুটাকে বেঁধে না রাখলে আমাদের সমাজ ঐ অজগরের মত মরে যাবে। নিশ্চিত যাবে। অবধারিত যাবে।

দেরিতে বিয়ে করার ফলে নারী ও পুরুষ যেসব ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারে

18 November 2014

লেখকঃ ফরহাদ হোসেইন মিঠু

পুঁজিবাদী সমাজের বেঁধে দেয়া বিয়ের বয়সের কারণে "Late Marriage" এর প্রচলন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হল পুঁজিবাদী সমাজ অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যেকোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার সময় তারা মূলত সে বিষয়ের "Economical " দিকের কথা চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত দেয়। "Biological,Physical" দিক তারা বেশি গুরুত্ব দেয় না। বিয়ের ক্ষেত্রেও তারা "Economical " দিক বেশি গুরুত্ব দেয় যেখানে তাদের বেশি গুরুত্ব দেবার কথা ছিল "Biological" দিককে। ফলে যাই হবার তাই হচ্ছে,মানুষ দেরি করে বিয়ে করে যৌন রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে,স্বামী/স্ত্রীর অক্ষমতার কারণে ডিভোর্স এর ঘটনা বেশি হচ্ছে। "Late Marriage" এর কারণে নারী-পুরুষ উভয়ই তাদের বিবাহিত জীবনে নানা ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হয়।

১) পুরুষরা সাধারণত যেসব ঝামেলার মুখে পড়েঃবর্তমানে পুরুষরা নারীদের থেকে অনেক বেশি "Late Marriage" করছে। কারণ একটাই সেটা হল "ক্যারিয়ার"। বেশিরভাগ পুরুষই এখন ৩০-৩৭ এই বয়সের মধ্য বিয়ে করছে ,ফলে অনেকেই বিবাহিত জীবনে নানান ধরনের ঝামেলার মুখে পড়ছে।

ক)পুরুষ সবচেয়ে বেশি 'Fertile ' থাকে যখন তাদের বয়স ২৪-২৫ বছর হয়।[১] বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষের Fertility কমতে থাকে যদিও নারীদের তুলনায় ধীরে কমে। বয়স্ক পুরুষ তার স্ত্রীর " Miscarriage (loss of an embryo or fetus before the 20th week of pregnancy)" এ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদী সমাজে নারীদের বয়স বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা হ্রাস পাবার বিষয়টাকে যতটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয়,পুরুষদের ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্বের সাথে দেখে না। এই সম্পর্কে Dr. Harry Fisch বলেন,**""Not only are men not aware of the impact their age has on infertility, they deny it. They walk around like they're 18 years old,"** [২] ২০০২ থেকে ২০০৬ এর মাঝে "Miscarriage" এর সম্ভাবনা নিয়ে এক গবেষণায় দেখা যায় যাদের বয়স ৩০-৩৪ বয়স তাদের "Miscarriage" হবার সম্ভাবনা ১৬.৭% ,যাদের বয়স ৩৫-৩৯ তাদের ১৯.৫% এবং যাদের বয়স ৪০ এর উপর তাদের ৩৩%।[৩] এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত হস্তমৈথুনের কারণে তো পুরুষের infertility বাড়েই। আর দেরিতে বিয়ে হবার কারণে অনেকেই বিকল্প হিসেবে হস্তমৈথুন কে বেছে নিয়েছে।

খ)পুরুষ যদি দেরি করে সন্তান গ্রহণ করে তাহলে সেই সন্তানের মাঝে জেনেটিক্যাল এবনরমালিটি দেখার সম্ভাবনা থাকে। আর এই সম্ভাবনা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যাদের বয়স ৪৫-৪৯ তাদের সন্তানের Schizophrenia রোগ হবার দ্বিগুণ ঝুঁকি আছে তাদের তুলনায় যাদের বয়স ২৫ বা তার কম।[৪]

গ)পুরুষের যৌন ক্ষমতাকে আপনি প্রাসের গতিবেগের মত ভাবতে পারবেন। মানে পুরুষের যৌন ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা সর্বোচ্চ হয়ে আবার কমতে শুরু করে। এই জন্য পুরুষের জন্য বিয়ে করার সবচেয়ে ভাল সময় হল ১৮-২৭ এর মধ্যে। সাধারণত ৩০ এর পর পুরুষের দেহে যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরনের উৎপাদন প্রতি বছরে ২% করে কমতে থাকে।[৫] বড়ই দুঃখের বিষয় এইদেশের বেশিরভাগ পুরুষ ৩০ এর পর

বিয়ে করে এবং যৌনতা বিষয়ক সমস্যায় ভুগে আর কলিকাতা হারবালের সাহায্য নেয়। তাছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ২০-২৫ বছরের একজন পুরুষ সংগমের পর মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যেই পুনরায় সংগম করার জন্য প্রস্তুত হয়। এক সংগমের পর আরেক সংগমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার বিরতিকে 'Refractory Period" বলে। আর এই 'Refractory Period" এর সময় বয়স বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। [৬] এর মানে একজন ২০ বছরের পুরুষ একদিনে যতবার সংগম করতে পারে একজন ৩০ বছরের পুরুষ ততবার সংগম করতে সক্ষম নয়।

ঘ)বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষের স্পার্ম কোয়ালিটি দুর্বল হতে থাকে। জার্মানির বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে একজন পুরুষের স্পার্মের পরিমাণ কমতে থাকে (মানে স্পামাটোজেনেসিস কমতে থাকে) ,স্পার্মের motility (ability to move toward its destination, an awaiting egg) কমতে থাকে এবং স্পার্ম গাঠনিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। [৭] Embryologist Yves Menezo এই বিষয়ে মত দেন যে বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্পার্মে Genetic Defects সৃষ্টি হয়। [৮]এছাড়া পুরুষের যৌনাঙ্গও দুর্বল হতে থাকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে কারণ যৌনাঙ্গের পেশীসমূহ দুর্বল হতে থাকে। তাই এক কথায় বলা যায় যে সকল পুরুষ ২০-২৬/২৭ বয়সে বিয়ে করে তারা বায়োলজিকাল দিক থেকে পূর্ণ সুখ লাভ করতে পারবে।

২)নারীরা সাধারণত যে ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হয়ঃ

ক)নারীরা দেরিতে বিয়ে করার ফলে যে সমস্যা সবচেয়ে বেশি ভুগেন তা হল " Miscarriage (loss of an embryo or fetus before the 20th week of pregnancy)" . একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে,যাদের বয়স ২০-২৫ তাদের Miscarriage এর ঝুঁকি হল ১০ পার্সেন্ট,যাদের বয়স ২৬-৩০ তাদের ২০ পার্সেন্ট। [৯]

খ) নারীদের 'Fertility rate' ' (সন্তান জন্ম দানের ক্ষমতা) বয়স বাড়ার সাথে সাথে হ্রাস পায়। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারীদের 'Infertility rate' বাড়তে থাকে। তার মানে ২০-২৫ বয়সের নারীরা যতটুকু Fertile, ২৬-৩০ বয়সের নারীরা তত Fertile হবে না। বেশিরভাগ নারীদের 'Fertility rate' সর্বোচ্চ হয় ২৪ বছর বয়সে। [৯] আর এইজন্য নারীদের 'Fertility rate' যখন উপরে উঠতে থাকে মানে তখন তাদের বিয়ে করার সবচেয়ে ভাল সময় হয়,অর্থাৎ যখন তাদের বয়স ১৭-২৪ হয়। তাছাড়া নারীদের এই সময় কনসিভ করাও সহজ কারণ এই সময়ে তাদের ব্লাড প্রেসারের ঝামেলা ,ডায়াবেটিস এবং Gynecological প্রবলেম যেমন Fibroids,endometrisis এর সম্ভাবনা কম থাকে।

গ)বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারীদের ডিম্বাণুর Quality খারাপ হতে থাকে। এই সম্পর্কে Connie Matthiessen বলেন, "As you get older, your ovaries age along with the rest of your body, and your eggs become less viable. For that reason, younger women's eggs are less likely than older women's to have genetic abnormalities that result in Down syndrome and other birth defects." [৯]

এখন অনেককে দেখা যায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় প্রভাবিত হয়ে ২৬-২৭ বছরে বিয়ে করে এবং কনসিভ করতে করতে বয়স গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিশের কোঠায়। এই কারণেই মানব সমাজের একটা বিরাট অংশ আজকে জেনেটিকালি দুর্বল হচ্ছে। মানে ফিজিক্যাল,বায়োলজিক্যাল দিক থেকে দুর্বল হচ্ছে। নারীদের মনে রাখা উচিত যে সুস্থ ও সবল মানব শিশু জন্মদানে তাদের ভূমিকাই বেশি। বর্তমানে দেরি করে সন্তান নেয়ার ফলে যেসব অসুবিধা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে তা এক কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন **The New Republic এর, science editor Judith Shulevitz।তিনি বলেন,"“For we are bringing fewer children into the world and producing a generation that will be subtly different—‘phenotypically and biochemically different,’ as one study I read put it—from previous generations.”[১০]**

শেষ কথাঃ আসলে দেরিতে বিয়ে করার শারীরিক অপকারিতার থেকে আত্মিক অপকারিতা বেশি। আমি আসলে ইসলামের আলোকে লেখাটা লিখি নাই। আমি এই লেখা দিয়ে এটা বুঝাতে চেয়েছি যে এই পুঁজিবাদী সমাজ একটা জাহেল সমাজ,এই সমাজ না বিজ্ঞান মানছে না ইসলাম মানছে যদিও বিজ্ঞান ইসলামের প্রতিটি বিধানের সাথে একমত। মুসলিমরা জীবনের কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় বিজ্ঞানকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেয় না,সিদ্ধান্ত নেয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সামনে রেখে। আর এই জন্যই অনেক মুসলিম নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য দ্রুত বিয়ে করতে চাইছে কিন্তু এই পুঁজিবাদী সমাজ তাতে বাধা দিচ্ছে। তাই আমাদের সবারই উচিত দেরি করে বিয়ে করার আত্মিক ও শারীরিক উপকারিতা এই সমাজের কাছে তুলে ধরা,সমাজের কাছে তুলে ধরতে না পারলেও অন্তত পরিবারের কাছে তো খুলে বলা যায়ই।

তথ্যসূত্রঃ-

[১]www.sophisticatededge.com › Health and Fitness › Pregnancy › Fertility

[২]http://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/features/age-raises-infertility-risk-in-men-too

[৩]http://www.theguardian.com/society/2008/jul/07/health.children

[৪]http://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/features/age-raises-infertility-risk-in-men-too

[৫]http://www.askmen.com/daily/austin_150/155_fashion_style.html

[৬]Seminars in Reproductive EndocrinologyVolume 9, Number 3, August 1991Sherman J. Silber, M.D.

[৭]Human Reproduction Update,2004[৮]The Guardian

[৯]http://www.babycenter.com/0_age-and-fertility-getting-pregnant-in-your-20s_1494692.bc

[১০]http://www.catholicworldreport.com/Item/2278/should_we_bring_back_young_marriage.aspx

যে ভাল থাকার সে এমনিতেও ভাল থাকবে?

26 September 2014

ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের দোহাই দিয়ে কতিপয় অকাটমূর্খ অভিভাবকেরা তাদের জাহেলী ধ্যানধারনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে , "বিয়ের পরেও অনেক ছেলেমেয়ে বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কে লিপ্ত হয়। সুতরাং যে ভাল থাকার সে এমনেও ভাল থাকবে আর যে খারাপ থাকার সে বিয়ে করলেও খারাপই থাকবে।" যুক্তিতে চরিত্র হেফাযতে বিয়ের বিষয়কে অগ্রাহ্য করে।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, লেখাপড়া করতে করতে চুলে পাক ধরিয়ে, শত শত ডিগ্রি নিয়েও কত লোক যে কর্মসংস্থানের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে জুতোর তলা ক্ষয় করছে তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং যে লেখাপড়ার দোহাই দিয়ে ছেলে-মেয়েকে বিয়ে থেকে দূরে রাখছেন সে লেখাপড়ার জন্য অযথা দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে ছেলে-মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলেই পারেন। যে টাকা আয় করবার সে এমনিতেও করবে, আর যে না করার শত ডিগ্রিও তার রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারবে না।

আমাদের যুক্তি নিতান্তই সাধারন। বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য খেতেই হবে; হোক সেটা হারাম শুকরের মাংস কিংবা হালাল গরুর গোশত। তেমনি খাদ্যের মত অন্যান্য জৈবিক চাহিদা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। সেটা পুরন করার জন্য হারাম পথ যেমন আছে তেমনি আল্লাহ যা হালাল করেছেন সেটাও আছে।

একজন লোকের সামনে হালাল খাদ্য দেয়া হলে এর মানে এই না যে সে আর হারাম খাদ্য খাবে না। কিন্তু কারো সামনে যদি হালাল কিছু না দিয়ে কেবল হারামটাই রাখা হয় সেক্ষেত্রে সে হারামটা গ্রহণ করতে বাধ্য। মানুষ কোন না কোন উপায়ে তার জৈবিক চাহিদা গুলো মেটাবেই। আমরা মুসলিমরা সেটা বিয়ের মাধ্যমে করবো। অর্থাৎ আমরা বলছি না যে বিয়ে একটা অমানুষকে ফেরেশতার মত নিষ্পাপ বানিয়ে দিতে পারে, বরং আমরা বলছি যে বিয়ে একটা চরিত্রবান মানূষের চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখতে সাহায্য করে।

হে যুবকেরা তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে বিয়ে করবার, সে যেন বিয়ে করে। কেননা এটা দৃষ্টিকে নত রাখা ও গোপন অংগসমূহের হেফাযতের জন্য সবচাইতে কার্যকর। আর যে তা পারবে না, সে যেন সাওম পালন করে, কেননা এটা তার জন্য ঢাল স্বরুপ" [সহীহ বুখারী ৫০৬৫, সহীহ মুসলিম ১৪০০]

"প্রেম নয়, বিয়ে করুনঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুন" পেইজ থেকে।

''আমার ছেলে-মেয়ে কিন্তু আর দশজনের মত না"!!

26 September 2014

লেখক অজ্ঞাত

ঢাকা শহরে আমার ক্যাম্পাস থেকে বাইরে যাওয়া মানে মাঝে মাঝে এক আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া। সবসময় নীলক্ষেত মোড় থেকেই বাসে উঠি। একদিন কি জানি হল খুব সম্ভবত সেদিন বন্ধের দিন ছিল তাই বাস পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম একটু হেঁটে আজিমপুর বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাই। যেতে হলে ইডেন কলেজের সামনে দিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যার পরে এই প্রথম হেঁটে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া। আমি জানি না কথাটা কেমন কটু শুনাবে কিন্তু হাঁটতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমার মনে হল হয়ত কোন পতিতালয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, খদ্দেররা তাদের পছন্দের

প্রমোদিনীদের নিয়ে বসেছে রাস্তার দু'পাশে। তাদের পাশ দিয়ে মানুষ আসছে যাচ্ছে, বাস আসা যাওয়া করছে, বাসের হেডলাইটের আলো এসে পড়ছে তাদের গায়ে, সেই আলোয় তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কিছুটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে বেশ দূর থেকেও। কারো এতে এতটুকু বিকার নেই, কোন মাথাব্যথা নেই, এতটুকু লজ্জাবোধ কিংবা অস্বস্তি নেই। তাদের পাশ দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছে কোন অস্বস্তি নেই তাদেরও, যেন সবকিছু স্বাভাবিক। আমার মাথায় তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিসটা ঘুরপাক খাচ্ছিল, **"মানুষের উপর থেকে যখন হায়া উঠে যায় সে যা খুশি তাই করতে পারে"।**

আমি সমাজের এই নির্লজ্জতা, অশ্লীলতার রসালো বর্ননা লিখতে বসিনি কিংবা এসব খবর ফলাও করে প্রচার করাও আমার লক্ষ্য নয়। যাদের ধানমন্ডি লেক, সোহরাওয়ার্দি উদ্যান, রমনা পার্ক এসব জায়গা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা আছে তারা হয়তো বুঝতে পারবেন এর চেয়ে ভয়ংকর নোংরা ব্যাপার আপনার আমার চারপাশের নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি সেসব বাবা মায়েদের কথা যারা প্রতিদিন ইডেন কলেজের সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করে, যারা পার্কে আপত্তিকর অবস্থায় থাকা তরুণ তরুণীদের দেখে "সমাজটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে" ভাবগম্ভির মন্তব্য ছুড়ে নাক সিটকায়, যারা হয়ত রাস্তা ঘাঁটে রিকশা কিংবা সিএনজিতে নর্দন কুর্দনরত তাদের সন্তানদের বয়সি ছেলেমেয়েদের আচরণ দেখে অভ্যস্ত বেশ! কিন্তু যারা কখনই এটা ভেবে চিন্তিত হয়না যে, তাদের বাড়ির আদরের ছেলে মেয়ে স্কুল কলেজ আর ভার্সিটিতে কাটানো এই সময়গুলোতে প্রকাশ্য ব্যভিচারীদের অন্তর্ভুক্ত কিনা! যারা সবসময়ই গর্বভরে বলে বেড়ায় "আমার ছেলেমেয়ে কিন্তু আর দশজনের মত না"!

আমি ভেবে প্রচণ্ড অবাক হই এইজন্য যে যারা এসব নির্লজ্জ বেহায়াপনা করে বেড়াচ্ছে প্রকাশ্যে, কোন প্রকার সঙ্কোচ ছাড়াই এরা রাস্তার অশিক্ষিত, মুর্খ কেউ নয়। এরা দেশের সেরা সেরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু জ্ঞানপাপী। যারা বুক ফুলিয়ে সবখানে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গরম দেখিয়ে বেড়ায়। যারা লোকাল বাসে নিরীহ হেলপারের সাথে নিজেদের শিক্ষিত স্ট্যাটাসের পার্ট নেয়। আমি যেবার ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেবার আমার ইউনিটে পরীক্ষার্থী ছিল ৭৪ হাজার। সেবার চান্স পাওয়া আমার অনেক বন্ধুকে আজো আমি "এত এত ছেলেমেয়ের সাথে কম্পিটিশান করে চান্স পাইছি" বলে গর্ব করতে দেখি। সেই গর্ব করা ছেলেদের বেহায়াপনাও আমি দেখেছি। তাদের শিক্ষার দৌড় কতটুকু আমার জানা হয়েছে।

প্রথম প্রথম ভার্সিটিতে গিয়ে রাতে একা একা হাঁটার অভ্যাস ছিল। একবার দেখি একটা বাইকে করে একটা ছেলে আর মেয়ে হৈ হৈ করতে করতে আসছে। মেয়েটা চিৎকার করে গাইছে, "চলে গেছ তাতে কি নতুন একটা পেয়েছি... তোমার চেয়ে অনেক ভাল"। ঠিক একই জায়গায় আরেক রাতে এক ছেলের কাঁধে মাথা রেখে এক মেয়ে বসে আছে। মেয়েটির ফোন বেজে উঠল। হয়ত তার মা, হয়ত বাবা ফোন করেছিল। এপাশের কথা শোনে অপাশের প্রশ্নগুলো বুঝে নিলাম, "কোথায়?" "এই তো রুমে" "কি করছ?" "নুডুলস বানাচ্ছি!!" আদরের মেয়ে এত রাতে এক পরপুরুষের গা জড়াজড়ি করে বসে আছে এর বদলে "নুডুলস বানাচ্ছে" এই সান্ত্বনায় বাবা মা হয়ত সেদিন আরামেই ঘুমোতে গেছে প্রতিদিন যেমন যায়। ক্যাম্পাসে কোন এমারজেন্সি কারনে যদি রাতে বের হয় প্রচণ্ড অস্বস্তি আর লজ্জায় পড়তে হয়। আমার কেবলই মনে হয় এই ছেলে মেয়েগুলো হয়ত আপনার আমার আদরের ভাইটি নয়, আদরের বোনটি নয় কিন্তু কারো না কারো তো বোন, কারো না কারো তো ভাই। এরাও তো কোন না কোন দুর্ভাগা বাবা মায়ের সন্তান। দিনের পর দিন এরা নিজেদের সাথে নিজেদের বাবা মায়েদেরও দুর্ভাগা করে। ছোট বেলা থেকে ওটা কর না, এটা করোনা, ওখানে যাবেনা, এখানে এমন করবে টাইপ কারণহীন, যুক্তিহীন শাসনে বড় হওয়া ছেলেমেয়েগুলো যখন ছাড়া পেয়ে দেশের বিদ্যাপীঠগুলোতে আসে এদের অবস্থা হয়ে যায় বাধা গরু হঠাৎ ছাড়া পাওয়ার মত। মন যা চায়

তাই করতে যাওয়া এই ছেলে মেয়েগুলোর প্রতিটি কুকামের পেছনে আছে বাবা মায়েদের মূল্যবোধহীন, নৈতিকতাহীন, জীবনবোধহীন "তোকে জীবনে অনেক বড় হতে হবে" এই সেকুলার হলফনামার মুখস্থ পাঠ।

রমনা পার্কের একটা গেটে লেখা "স্কুল কলেজের ড্রেস পরে পার্কে আপত্তিকর অবস্থান নিষেধ"!! আমি জানি এই লেখাটা আসতে যেতে অনেক বাবা মা ই দেখেছেন কিন্তু তারা কি কখনো ভেবে দেখেছেন তাদের আদরের ছেলে মেয়েরা প্রতিদিন সকালে এই স্কুল কলেজের ড্রেস পরে "আম্মু আসি" "আব্বু আসি" বলে যে বেরিয়ে যায় তারা এই পার্কের "আপত্তিকর" অবস্থানকারীদের মাঝে আছে কিনা??? বিষয়টা আলোচনায় আসা দরকার! আলোচনা করলে বিবেচনা আসবে!! আমার ক্যাম্পাসের পাসেই সোহরাওয়ার্দি উদ্যান। সকালবেলা সেখানে বেন্সগুলো স্কুল কলেজের ড্রেস পরা ছেলেমেতে ভরে যায়। কেউ ক্লাস ফাঁকি দিয়ে, কেউ বাসায় মিথ্যে বলে, কেউ ক্লাসম্যাটের সাথে, কেউ হাউসটিউটর কিংবা মামাতো খালাতো ফুফাতো ভাইয়ের সাথে প্রেম করতে বসে যায়। সবাই দেখে, সবাই শুনে, যেন সবকিছু স্বাভাবিক। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে আমি যদি ঢাকা শহরের সব বাবা মায়েদের শুধু দশটা মিনিটের জন্য সন্ধ্যার পর একবার সোহরাওয়ারদি উদ্যানে একটা চক্কর দেওয়াতে পারতাম!! শুধু দশটা মিনিট!! আমাদের বাবা মায়েরা সব বোঝে কিন্তু ছেলে মেয়েদের বয়সের নোংরামি করার প্রবণতাটা বোঝে না!! ছেলে মেয়েকে আধুনিক বানানোর পেছনে জান মাল সময় সবকিছু খরচ করতে করতে ভুলেই যায় ছেলে মেয়েকে মূল্যবোধ শেখানো হয়নি, নৈতিকতা শেখানো হয়নি!! এই নৈতিকতাহীন ছেলেরাই একদিন বাবা হয়, এই নৈতিকতাহীন মেয়েরাই একদিন মা হয়!! তারা কি তাদের সন্তানদের কোন আদর্শ শেখাতে পারে?? কোন আত্মসম্মানবোধ?? কোন নৈতিকতা?? না পারেনা!! প্রজন্মের পর প্রজন্মের সময়ের ব্যবধানে এভাবেই আমাদের চারপাশে মানুষের আড়ালে অমানুষ তৈরি হচ্ছে!! এই চক্র চলতে থাকবে! এই চক্র কোনদিন ভাঙবে না!! মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অমানুষের চাষ হবে আমাদের নোংরা সমাজে.....

বাড়ীর পাশের সাইবার ক্যাফেতে জুটি বেঁধে নিয়মিতই যায় কিছু তরুণ তরুণী। সেখানে একটু আড়ালে তাঁরা কি করে তা ক্যাফের কর্মচারীরা রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে। দুঃখের যায়গাটা হল এই ছেলেমেয়েগুলোর সাথে আমার রাস্তায় কোন না কোন সময় দেখা হয়। স্কুল কলেজের ড্রেস পড়ে কিংবা ভদ্র, শান্ত চেহারার বাবা মায়ের সাথে যখন এদের সাক্ষাৎ মিলে তখন সেসকল বাবা মায়েদের জন্য আমার প্রচন্ড মায়া হয়। আর তখনি আমি ভাবি এরা হয়ত আমার আদরের ভাইটি নয়, আমার আদরের বোনটি নয় কিন্তু কারো না কারো আদরের ভাই/বোন। তাদের মায়েরা এখনো হয়ত সন্তানকে হাতে তুলে খাইয়ে দেন। এদের বাবা মায়েরা সন্তানের পরীক্ষার রেজাল্টের খবর রাখে, স্কুল কলেজের খবর রাখে, তাদের ক্যারিয়ার কোনদিকে গেলে ভালো হবে সেই খবর রাখে। শুধু খবর রাখেনা ছেলেমেয়ে কোথায় যায়, কি করে!! আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।" [সূরা তাহরিমঃ ৬]

সন্ধ্যার পড়ে রস্তায় কোন রিকশা কিংবা সিএনজিতে ভুলে চোখ গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। এসব অকালপক্ক ছেলেমেয়েগুলোর প্রকাশ্য ব্যভিচার 'বয়সের দোষ' হলেও বাবা মায়েদের লজ্জায় মাথা কাটা যায় যখন দাড়িওয়ালা ছেলেটা বিয়ের কথা তোলে! যখন সে রাস্তা ঘাটে, পার্কে, অন্ধকার কফি শপে অশ্লীলতার পসরা সাজিয়ে পথচারীদের

বিনা খরচে প্রাপ্তবয়স্ক মুভি দেখার বিনোদন না যুগিয়ে এসব থেকে পবিত্র থাকার আর্তি জানায়, কেবল তখনি বাবা মায়েরা সন্তানের ভবিশ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ছেলে মেয়েকে দেশের সেরা সেরা বিশ্ববদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে লোকসমাজে নিজেদের স্ট্যাটাস বৃদ্ধির তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে কেউ কেউ। তাদের ছেলেমেয়েদের এসব আধুনিক রঙ্গশালায় এসে ব্যভিচার আর নষ্টামির আমলনামা ঢের দেখেছি! গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঝোপে ঝাড়ে জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করে বন্ধুদের সাথে রসালো বর্ণনা করে আড্ডা জমায় আদরের সন্তানেরা। মোবাইলের লাউড স্পিকারে বান্ধবির সাথে অশ্লীল কথোপকথন বন্ধুদের নিয়ে উপভোগ করে সভ্য সমাজের ভদ্র বাবা মায়েদের স্মার্ট ছেলেরা!| আমার রুমম্যাটের এলাকার চেয়ারম্যানের মেয়ে, এলাকায় তার সুখ্যাতি একজন পর্দানশিল মেয়ে হিসেবে যে এক ওয়াক্ত নামাজও কাযা করেনা, প্রতিদিন সকালবেলা কুরআন তিলাওয়াত করে! একালায় মানুষের কাছে গুণবতী সেই বাবা মায়ের গর্বের মেয়ে ভার্সিটির ক্যামপাসে টাইট জিন্স আর ফতোয়া পরে বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে! আর তাদের বাবা মায়েরা ঠিকই বলে বেড়ায় " আমার ছেলে/মেয়ে কিন্তু আর দশজনের মত না"! আমার খুব ইচ্ছে করে এসব বাবা মায়েদের তাদের "আর দশজনের মত না" গর্বের সন্তানের নষ্টামির আখলাখের সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়ে বলি, "এই নেন আপনার আখিরাতের সঞ্চয়"!!

এই ছেলেমেয়েগুলো একদিন ঠিকই তাদের যৌবনের ব্যাভিচারময় সময়গুলো ফেলে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এসব ছেলেরা ঠিকই বিয়ের সময় ভালো সতী মেয়ে খুঁজবে। এসব মেয়ের বাবা মায়েরা ঠিকই পাত্রপক্ষের সামনে হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলবে, “আমার মেয়ে কিন্তু আর দশজনের মত না”।কিন্তু পাপ বাপকেও ছাড়ে না। এসব ছেলেমেয়েরা কোনদিন কি তাদের সন্তানদের মূল্যবোধ শেখাতে পারবে, নৈতিকতা শেখাতে পারবে? একদিন হয়ত তাদেরকেও অসহায়ের মত তাদের সন্তানদের পার্কে, সাইবার ক্যাফে, অন্ধকার কফি শপে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে হবে। একদিন হয়ত তারাও তাদের সন্তানদের রিকশা সিএনজি কিংবা অন্ধকার রাস্তার পাশে নিজের ছেলে মেয়েকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে কষ্টে চোখ মুছবে।

একদিন বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে শরীর। ঝুলে পড়বে যত্ন করে রাখা মসৃণ চামড়া। থাকবেনা রাস্তা ঘাঁটে জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার বুনো মাদকতা। এই অশ্লীলতা আর নষ্টামির সময়গুলো নিয়ে আমরা আকাশের ওপারে অনন্ত এক জীবনের দিকে পরিচালিত হব।খুব বেশী দেরী নেই। খুব শীগ্রই আমরা একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত হতে যাচ্ছি। আমরা মিলিত হতে যাচ্ছি আমাদের রবের সাথে একাকি, সম্পূর্ণ একাকি! আমাদের প্রশ্ন করা হবে, যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোন কাজে ব্যয় করেছ? জীবন কোন পথে ব্যয় করেছ? কি উত্তর জমা করেছি তার জন্য??

৭০০০০ ফেরেশতা ৭০০০০ সেঁকল দিয়েও বেঁধে রাখতে পারছে না জাহান্নামকে। এত তীব্র গর্জন করবে সে জাহান্নামীদের দেখে। নষ্ট, ভ্রষ্ট আর উদ্দাম তারুন্যের এই সময়গুলোকে নিজ হাতে ধ্বংস করার আগে চুলার আগুনে একটু হাত দিয়ে দেখিস তো, আগুন সইবার ক্ষমতা কেমন!!

আপনাদের ছেলে-মেয়েরা আমার সিঁড়িঘরে কী করে?

19 October 2014

লেখকঃ আহমেদ রফিক

আমাদের অফিস চারতলা থেকে পাঁচ তলায় এক্সটেনশন করেছে গত মাসে। পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। তবু আমার ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমি উপরে চলে গেছি। আমি সেদিন যোহরের সালাহ আদায় করতে নিচে নামবো। বের হতে গিয়ে যেই না দরজাটা ভেতর থেকে টান দিয়ে খুলেছি; একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আচমকা প্রায় ফ্ল্যাটের মধ্যে পড়ে যেতে গেলো। তারা দু'জনই বাইরে থেকে দরজায় হেলান দিয়ে দাড়িয়েছিল। আমি তো অবাক! এক জোড়াই নয়, তার সাথে সেখানে আরো দু'জোড়া টিনেজ ছিলো সেখানে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, তারা উপরে একটি ইংলিশ মিডিয়াম কোচিং সেন্টারে এসেছে পড়ার জন্য।

মাস ছ'য়েক আগের কথা। আমি আমার মেয়ের পড়ার জন্য একজন মহিলা হোম টিউটর খুজছিলাম। আমার বাসার কাছেই একটা কোচিং সেন্টার আছে। ভাবলাম, সেখানে গেলে হয়তো পাওয়া যাবে। তো মাগরিবের সালাহ আদায়ের জন্য একটু টাইম হাতে নিয়ে নামলাম; যেন আগে সেখানে গিয়ে এসে জামা'আত ধরতে পারি। দো তলার সেই কোচিং সেন্টারে উঠে তো আমি লজ্জায় পড়ে গেলাম। ক্লাসরুমে টিচারদের কাউকে দেখলাম না। তারা তাদের রুমে। দেখলাম সন্ধার আলো-আধারিতে প্রায় প্রতিটি রুমেই দু' তিনটি জোড়া ঘনিষ্ট হয়ে বসে 'কোচিং' করছে। এমন 'আদর্শ' স্থান থেকে মেয়ের জন্য টিচার নেওয়ার কথা ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করে উঠলো। চলে এলাম তখনই। একটু ধৈর্য ধরতে হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমার মেয়ের জন্য পর্দানাশীন একজন ভালো টিচার মিলিয়ে দিয়েছেন।

আমার বাসার এলাকাতেই একটি বেশ ভালো কোচিং সেন্টার ছিলো। নাম প্রতিশ্রুতি কোচিং। আমার পরিচিত ক'জন আদর্শবান তরুন মিলে এটি আরম্ভ করেছিলো। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলো শোভন ও ফরিদ ভাই। ইন্টারমিডিয়েট কোচিং এখান থেকে করে মেডিক্যাল, বুয়েট, ঢাবি সহ প্রথম সারির অনেক প্রতিষ্ঠানে চান্সও পেয়েছে অনেকে। আমাকে তারা মাঝে-মধ্যে দাওয়াত করতো ছাত্রদের চরিত্র গঠন বিষয়ে কিছু বলার জন্য। বছর তিনেক পর শুনলাম, আমার সেই পরিচিত তরুণরা গরুর ফার্ম করার উদ্যেগ নিয়েছে। হালাল উপার্জনের জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন কোচিংএর কী হলো? তারা জানালো যে, তারা মেয়েদেরকে এখানে পড়ায় না বিধায়, মেয়েদের তো আসার সুযোগই নেই, ছেলেরাও এখানে পড়ে 'মজা' পায় না। তাই বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে সেন্টারটি বন্ধই করে দিতে হয়েছে।

এর প্রত্যেকটি সত্য ঘটনা। আমি নিজেই এর প্রত্যেকটির প্রত্যক্ষদর্শী।

টিনেজ বয়সটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বয়স। এই সময়ে কিশোর কিশোরীদের—বিশেষ করে বর্তমান সমাজের—মধ্যে ভালো-মন্দ বোঝার মতো কোনো পরিপক্কতা তৈরি না হলেও অপরাধ করার মতো শারীরিক ও মানসিক সকল সক্ষমতাই থাকে। কোন কাজের কী পরিণতি হতে পারে তা ভাবার মতো বুদ্ধি-জ্ঞান তাদের মধ্যে কাজ করে না। ক্ষণিকের ভালো লাগা, মন মাতানো আনন্দ, মাদকতা আর নিষিদ্ধ জিনিষ তাদেরকে এমনভাবে টানে যে, তারা তা পাওয়ার জন্য যেকোনো রকম ঝুকি নিয়ে ফেলতে পারে।

তাই এই বয়সটাতে বাবা-মা'দের মোটেই উচিৎ নয় তাদেরকে কোনো বাছবিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়া যেখানে সেখানে যেতে দেওয়া, যার তার সাথে মিশতে দেওয়া। আপনার সন্তান পড়ার নাম করে কোথায় যাচ্ছে; সেখানকার পরিবেশ কেমন সে সম্পর্কে যথাযথ খোজ খবর অবশ্যই আপনার রাখা উচিৎ। যে কোনো অকল্যাণকর কাজ ও পরিবাশ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা উচিৎ। তবে এটা জোর করে বন্ধ না করে এর ক্ষতিকর দিকগুলো বুঝিয়ে বন্ধ করা অবশ্যই ভালো। তবে হ্যা, যদি তারা বুঝ না নিতে চায় তবে একটু যত্নের সাথে জোর করে হলেও তাদেরকে নিয়ম শৃংখলার মধ্যে রাখতে হবে।

আপনার শিশু সন্তান যদি ইলেকট্রিক ছকেটের ভেতর হাত ঢুকাতে চায় আপনি কী করেন? যদি ধারালো কিছু নিয়ে খলতে চায় আপনি কী করেন? যদি গ্যাসের চুলার কাছে যায় কী করেন? তারা চাইলেই কি আপনি তাদেরকে এসব করতে দেন? দেন না। তাহলে সেই প্রাণপ্রিয় সন্তানটি একটু বর হবার কেন আপনি গাছাড়া ভাব দেখান? যেসব বিষয় তার স্বভাব-চরিত্র ও গোটা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সেখানে আপনি কিভাবে আপোষ করেন?

আপনার সন্তানকে যদি আপনি তার নিজ ইচ্ছা-মর্জির উপরই ছেড়ে দেন তাহলে আপনার তো আর কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার একটু যত্নশীল কঠোরতা তার জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর আপনি যদি তার বন্ধু হতে গিয়ে তার কথামতো চলা শুরু করেন; আর একারণে যদি তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এক সময় এই সন্তানরাই আপনাদেরকে দোষ দেবে। বলবে তোমরা কেমন বাবা মা ছিলে? তোমরা কেন আমাদেরকে জোর করে সঠিক পথে রাখোনি? কেন আমাদেরকে সঠিক বুঝ দাওনি?

আমাদের সমাজে কিশোর অপরাধের যে চিত্র আমরা পত্রিকার পাতায় দেখি, তা তো আপনিও দেখেন। নিজ ক্লাসমেটকে হত্যা করে খেলার মাঠের পাশে বালু চাপা দিয়ে রাখা; ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে মধ্য রাতে ঐশির বাবা-মাকে হত্যা করার ঘটনা তো কারোই অজানা নয়। এমন আরো অসংখ্য কিশোর অপরাধের ঘটনা প্রতি দিন পত্রিকার পাতায় আসে। কিন্তু তবুও আমাদের হুশ হয় না। আমরা সবসময়ই কোনো এক অজানা কারণে ভাবি 'আমার সন্তানরা' তেমনটা করবে না। মনে করি, এরা তো খারাপ কিংবা দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়ে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। এদের অধিকাংশই আপনার আমার মতো তথাকথিত ভদ্র পরিবারের সন্তান।

প্রত্যেক বাবা-মা'ই নিজ সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসা পোষণ করেন। করাটাই স্বাভাবিক। আর ভালোবাসা যে মানুষকে অন্ধ করে দেয় এটা শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই কিন্তু নয়। সন্তান সন্ততির ক্ষেত্রেও হয়। নিজ সন্তানের একটা

নিস্পাপ প্রতিচ্ছবি মনে সারাক্ষণ সেটে থাকার কারণে আমরা ভয়ংকর বাস্তব অভিজ্ঞতার শিকার হওয়ার আগে কখনোই তাকে অপরাধী ভাবতে পারি না। মনে করি, এতোটুকুন মাত্র ছেলে/মেয়েটি! কী আর বোঝে! আমার ছেলে/মেয়ে কি এই কাজ করতে পারে? কিন্তু আমরা চোখ বুজে থাকলেই কিন্তু বাস্তবতা কখনো পালটে যাবে না।

অতএব মধ্য রাতে নিজ সন্তানের হাতে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগেই সতর্ক হোন। আপনার মেয়েটি বিয়ের আগে গর্ভবতি হয়ে পড়ার আগেই সতর্ক হোন; মাদকাশক্ত হয়ে পড়ার আগেই খবর নিন, আপনার ছেলেটি বখে যাওয়ার আগেই তার তত্তাবধানে যত্নশীল হোন। আপনি যদি সত্যিই মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে ভুলে যাবেন না যে, সেও একটি মানব সন্তান। মানব সন্তান কুকুরছানা নয় যে, খাবার আর থাকার জায়গা পেলেই চলে যাবে। বুঝবেন না তার যত্ন মানে কেবল তার উন্নত খাবার, অভিজাত ফ্ল্যাট, দামী জামা-কাপড় আর লেটেস্ট তথ্য-প্রযুক্তির উপকরণ হাতে তুলে দেওয়া।

সন্তানের তত্তাবধানের সর্ব প্রধান কাজ হলো তাকে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া। সকল অনৈতিকতা থেকে বাচিয়ে রাখা। আদর্শবান করে গড়ে তোলা। আপনার সন্তান কোনো পশুর বাচ্চা নয়, যে নিছক বস্তুগত চাহিদা পূরণ হলেই তার চলে যাবে। রাস্তাঘাটে আজকাল মেয়েরা যে ধরণের কাপড়-চোপড়ে বের হয় তা দেখে ভাবি, কোনো বাবা-মা'র চোখের সামনে দিয়ে এমন পোষাক পরে কিভাবে তারা বের হয়ে আসতে পারে? লজ্জা-শরম না হয় খেয়েই বসেছে, এদের কি রুচিবোধ বলতেও কিছু নেই? শালীনতা শব্দটি কি এদের ডিকশনারি থেকে হারিয়ে গেছে? এরা সত্যিই বাবা মা, নাকি নিছক 'মানুষের ছাও উৎপাদনকারী'?

প্রখ্যাত লেখক মির্জা ইয়াওয়ার বেইগ তার সন্তান প্রতিপালন বিষয়ক বইতে একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ কথা লিখেছেন। তিনি বলেন,

"আজকাল অনেক বাবা-মাই অভিভাবক হওয়ার বদলে সন্তানদের 'বন্ধু' হতে চায়। আর তাই বাচ্চাদের প্রতি সদয় হতে গিয়ে তাদের সকল চাওয়া পূরণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন এই সন্তানরা অভিভাবক ও বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। বাবা-মারা সবকিছুতেই সন্তানদের সাথে আপস করতে থাকে এবং সন্তানরাও তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, যতক্ষণ না তারা তাদের কাঙ্খিত জিনিসটি আদায় করতে পারে। ফলে বাচ্চাদের চাওয়া-পাওয়ার সীমারেখা দিন দিন বাড়তেই থাকে। তাই বাবা-মাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সন্তানদের অনেক বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু বাবা-মা কেবল তারা দুজনই। তারা সন্তানদের অভিভাবক। বাবা-মায়ের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকা পালন করাটা তাদের জন্য মোটেই ভালো নয়। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান যেন সত্যিকার আদর্শ-মানুষ হয় সেভাবে প্রতিপালন করা এবং এটাই তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ"।

(বইটির ইংলিশ ভার্ষণের নাম Bringing up a Muslim chaild অনুদিত বাংলা সংস্করণ ও মুল ইংলিশ—উভয়টিই সিয়ান পাবলিকেশন থেকে বের হতে যাচ্ছে ইনশা আল্লাহ)

যে তিনটি ঘটনাচিত্র দিয়ে আমি লেখা শুরু করেছিলাম সেখানে ফিরে আসি। আজ আমাদের কিশোর কিশোরীরা যেসকল কারণে বখে যাচ্ছে তার মধ্যে সামাজিক পারিবারিক অনেক কারণ রয়েছে নিসন্দেহে। আমি শুধু এখানে

ফোকাস করতে চেয়েছি এই কিশোর বয়সে ছেলে-মেয়েতে অবাধ মেলামেশার দিকটিতে। আর এর অন্যতম একটি কেন্দ্র হচ্ছে এই কোচিং সেন্টারগুলো। তবে এটা যে শুধু কোচিং সেন্টারে হয়, তা-ই নয়। সহশিক্ষার স্কুল; এমনকি অসচেতন অনেক বাবা-মায়ের ঘরেও এমনটি হয়।

এভাবেই তারা এই অল্প বয়সে অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আজকাল ইন্টারনেট, কম্পিউটার সহ তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের কারণে তারা শরীর তত্ত্বের এমন অনেক কিছুই জানে, যেগুলো হয়তো আপনি কেবল বিয়ের পরেই জেনেছেন। এসব বিষয়ের পরিণতি নিয়ে ভাবার মতো পরিপক্কতা না থাকলেও হেমিলিয়ানের বাশির মতো তা তাদেরকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে।

যেহেতু এই বয়সটি মারাত্মক আবেগপ্রবণ একটি সময়। তাই এই সম্পর্ক তাদের মন-মননের উপর ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে। মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয়, সাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। লেখা-পড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। বাবা-মা ও পারিবারিক পবিত্র বন্ধন তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আর এই মানসিক দুরাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তখন তারা মাদকের আশ্রয় নেয়। মাদকের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে হয় চোর, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী ইত্যাদি। ধংস হয়ে যায় একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত। হ্যা, এটা আপনারই সন্তানের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত।

আমি আপনাকে কোনো আখিরাতে মুক্তির ওয়াজ করছি না। আপনার পরিবারের শান্তির কথা বলছি। অশান্তি থেকে বাচার কথা বলছি। যা আপনার জীবনের প্রতিটি দিনকে প্রভাবিত করবে, আমৃত্যু। আখিরাত আপনি কতোটা বিশ্বাস করেন, সেটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আপনার বখাটে ছেলে বা মেয়েটা তো এই সমাজেরই অংশ। তার বখাটেপনার শিকার শুধু আপনি একাই হবেন না, আমিও হতে পারি; এই সমাজের আরো পাঁচ জন হতে পারে। নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য আপনার সন্তান আপনাকে রান্না ঘরের দাও-বঠি নিয়ে তেড়ে আসতে পারে। গলির মাথায় আমার পেটে ছুরি ঠেকাতে পারে; কারো হাতের মোবাইলটি নিয়ে দৌড় দিতে পারে। কি, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনার সোনামনিটি এই কাজ করতে পারে?

ঐশির বাবা-মাও কিন্তু এমনটিই মনে করতো। তাদের সেই 'মনে করা' দিয়ে কিন্তু তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। অতএব সময় থাকতে সচেতন হোন। এক্ষুনি। হ্যা, এক্ষুনি। আর কারো জন্য নয়, অন্য কারো স্বার্থে নয়। আপনার নিজের জন্য, নিজের স্বার্থেই।

আমি কি ভালোবেসে বিয়ে করতে পারবো?

28 March 2014

লেখকঃ সাজিদ করিম

গত শতাব্দীতে মুফতি সাহেবদের কাছে এটা বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ছিলো, 'আমি কি ভালোবেসে বিয়ে করতে পারবো?' অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের প্রশ্নেরও বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখন আমরা বিয়ের প্রশ্নেই যাই না, জিজ্ঞাসা করি, 'আমরা কি প্রেম করতে পারবো?'

গতবার ইসলামপন্থীদের মাঝে প্রেম নিয়ে কিছু কড়া কথা লেখার পর এক ভাই আমাকে ফেসবুকে জানালেন, 'উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে উনি কোন ভালবাসা-বাসির মধ্যে যাবেন না এবং 'পারিবারিক পছন্দে' বিয়ে করবেন। কারণ এটাই একমাত্র ইসলামসম্মত পন্থা।'

তার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে খুব পুলকিত বোধ করলাম না। বিয়ের পূর্বে কাউকে ভালোবাসা যাবেনা কে বলেছে আপনাকে। আল্লাহ আপনার জন্য যা হারাম করেননি তা নিজের ওপর হারাম করে নিবেন কেনো? আমি ফকীহ বা মুফতি নয়, তাই কোনটা জায়েয বা নাজায়েয তার সমাধান আমি দিতে পারবনা। তবে এ বিষয়ে পড়তে গিয়ে দেখলাম, আমরা যা ধারণা করছি প্রকৃত অবস্থা ঠিক তার উল্টো। আমাদের ভেতরে এ ভুল ধারণা কাজ করছে কারণ আমরা প্রেম (Relationship) ও ভালোবাসাকে একই পাল্লায় মাপছি।

সে ভাইয়ের মতো আমারও আগে এই ধারণাই ছিলো যে বিয়ে শুধু 'পারিবারিক পছন্দে'ই হওয়া উচিৎ। কিছু উনিশ বিশ সহকারে বিষয়টা মোটামুটি এমন দাঁড়ায় যে, ছেলে পড়াশোনা শেষ করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা চাকরি যোগাড় করার পর বাবা-মার খেয়ালে আসে যে ছেলের বিয়ে দেয়া দরকার। শুরু হয় পাত্রী খোঁজার মহাযজ্ঞ। পাত্রী পাবার পর ছেলেকে পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করেন, এরকম একটা মেয়ে পেয়েছি, তোমার কি মত? লাজুক ছেলে সলজ্জে উত্তর দেয়, 'আপনারা মুরুব্বী মানুষ, আপনারা যা ভালো বুঝেন তাই করেন।' মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে মেয়ে উপহার দেয় আবহমান উত্তর, 'আমার আর কি বলার আছে; আপনাদের মতই আমার মত।' অবশেষে সকল খালা-ফুফুকে সন্তুষ্ট করে তাদের বিয়ে হয়। তবে যাদের বিয়ে তাদের পছন্দের চেয়ে দুই পরিবারের পারস্পরিক পছন্দই বিয়েতে প্রাধান্য পায় বেশী।

আমি বলছিনা যে এটা ইসলামসম্মত নয় বা এটা ঠিক নয়, তবে এটাই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কি? আসুন প্রথমেই দেখি আল্লাহ সুবনাহানাহু ওয়া তায়া'লা কুরআনে কি বলেছেন। সূরা নিসার ৩ নম্বর আয়াতে তিনি বলেন,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

'মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই।' (৩:৩)

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আমাদের সেইসব নারীদেরকে বিয়ে করতে বলছেন যাদেরকে আমাদের ভাললাগে। মারীফুল কুরআনে বলা হয়েছে, 'যাদের তোমরা পছন্দ করো' আর হাফেজ মুনির ভাই অনুবাদ করেছেন, 'যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো'। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা আমাদের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি এটার ব্যাখ্যা বোঝার তাফসীর ইবন কাসীর, মারীফুল কুরআন আর তাফহীম দেখলাম। কেউই মূল কথার সাথে দ্ব্যর্থক কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। সীহাহ সিত্তার অসংখ হাদিসেও এ বিষয়টি এসেছে।

আনাস (রাঃ) এ ধরণের একটা ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন(১), একবার এক মহিলা সম্ভবত তার নাম লায়লা বিনতে কায়স ইবনুল খাতিম রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে তার সাথে নিজেকে বিয়ের জন্য সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন। এ কথা শুনে পাশে থাকা আনাস (রাঃ) এর কন্যা বলে উঠলেন,

'মা কানা আ'কাল্লা হা'য়াহা'

'মেয়েটা কত নির্লজ্জই না ছিল'

আনাস (রাঃ) তাকে বললেন, 'সে তোমার তুলনায় অনেক ভালো ছিল। সে রাসুল (সঃ) এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং নিজেকে রাসূলের (সঃ) নিকট বিয়ের জন্য পেশ করেছিলো।'

এর জন্য রাসূল (সঃ) লায়লা বিনতে কায়সকে কোনরকম তিরস্কার করেননি; তিনি নীরব থাকেন। পরবর্তীতে এক সাহাবী তাকে বিয়ের জন্য আগ্রহী হলে রাসূল (সঃ) তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। আবার খানসা বিনতে খিদাম (রাঃ)র স্বামী উহুদ যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করলে তার বাবা তাকে এক ব্যাক্তির নিকট বিয়ে দিয়ে দেন।(২) তখন হযরত খানসা (রাঃ) রাসুলের(সঃ) কাছে এসে বললেন,

'আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন; অথচ আমি আমার সন্তানের চাচাকেই অধিক পছন্দ করি'।

তার কথাগুলো লক্ষ্য করুন। তার বিয়ে হয়ে যাবার পর তিনি রাসূলের (সঃ) কাছে এসে জানান, তার স্বামী হিসেবে তার সন্তানের চাচাকেই তিনি বেশী পছন্দ করবেন। এরপর যা ঘটলো তা হল, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তার বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন।

এ ধরণের আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায় মুগীরা ইবন শুবা (রাঃ)র ক্ষেত্রে(৩)। উসমান ইবন মাযউন(রাঃ)র মৃত্যুর পর তার কন্যাকে তার চাচা কুদামাহ বিয়ে দিয়ে দেন ইবন উমার(রাঃ)র সাথে। কিন্তু ইবন উমার (রাঃ) প্রথম সারির একজন সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটি এ বিয়েতে রাজি ছিলনা কারণ সে মুগীরা ইবন শুবা(রাঃ)কে পছন্দ করতো এবং সে চেয়েছিল যেন মুগীরা ইবন শুবা(রাঃ) তাকে বিয়ে করেন। অবশেষে তার চাচা এ বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে মুগীরা(রাঃ)র সাথে তার বিয়ে দেন।

এমন আরও অনেক অনেক ঘটনা সহীহ হাদীসে রয়েছে। বিয়ের পূর্বে আপনি কাউকে ভালোবাসতে পারবেননা এমন কোন উদাহরণ আমি ইসলামের যুগে পাইনি । এমনকি আপনি অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ করলেও রাসূল(সঃ)এর পরামর্শ হলো,

"তুমি আগে গিয়ে তাকে দেখে নাও কেননা এটি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে সহায়ক হবে(৪)।

আপনি কোন মুসলিমাহর প্রতি আকৃষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক, কেননা এটা আপনার ফিতরাত। সূরা আর-রূমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা বলছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে হচ্ছে যে তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যুগলদের, যেন তোমরা তাদের মধ্যে স্বস্তি পেতে পার, আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও করুণা সৃষ্টি করেছেন। (৩০:২১)

কোন মুসলিমাহ বোনের দ্বীনদারী, চরিত্র আপনার ভালো লাগতেই পারে। তবে এ ভালোবাসার একটা সীমারেখা রয়েছে। যদি তাকে পেতে চান, তাহলে চিরদিনের জন্য তাকে আপন করে নিন; দুই মাস বা দুই বছরের জন্য নয়। কাউকে পছন্দ করলে ইসলামের মূলনীতিটা হল,

'ইঝা আতাকুম মান তারদাওনা দীনাহু ওয়া আক'লাহু ফাংকিহু'হু ' (তিরমিযী)

'তোমরা যখন বিয়ের জন্য এমন ছেলে বা মেয়ে পেয়ে যাবে যার দীনদারী চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে তোমরা পছন্দ করবে, তো তখনই তার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করো।'

আবার ওয়ালীদেরকে বলা হচ্ছে,

"যদি এমন কেউ তোমার কাছে আসে (বিয়ের পয়গাম নিয়ে) ---যার চরিত্র এবং তাকওয়া সন্তোষজনক, তাহলে তার কাছে (তোমার মেয়েকে) বিয়ে দাও । যদি এমনটি না কর, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মকরকম ফেতনা ও বিপর্যয় দেখা দিবে ।" (তিরমিযি)

এটাই অবৈধ সম্পর্কের সাথে এর মাঝে পর্দা টেনে দিয়েছে। আপনি কাউকে পছন্দ করতে পারবেন কিন্তু তার সাথে কোনরূপ সম্পর্কে জড়াতে পারবেন না। বিয়ের প্রস্তাব সংক্রান্ত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। আপনি কাউকে পছন্দ করলেই তাকে গিয়ে জানাতে পারবেননা , 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। আপনাকে সেই বোনের ওয়ালীর (অভিভাবক) সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং বিয়ের প্রস্তাব দিতে হবে।

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ

আর বিয়ে দিয়ে দাও তোমাদের মধ্যের অবিবাহিতদের (২৪:৩২)

আর যদি বিয়ে করতে কোন সমস্যা থাকে তাহলে আল্লাহ বলছেন–

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ

যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। (২৪:৩৩)

তবে সামর্থ্য বলতে ত্রিশ হাজার টাকার চাকরি, আর ফ্ল্যাট না থাকার কথা বলা হয়নি কারণ সেই সূরাতেই রব্বুল আলামীন বলেন–

إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ

তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (২৪:৩২)

এতে বিয়ের পূর্বে কোন প্রকার প্রেম বা রিলেশনের সুযোগ নেই। আর আমরা যারা অবিবাহিত আছি তাদের সবার উচিত আল্লাহর বলে দেয়া পন্থায় সিজদায় তারই নিকট পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদের তাউফিক চাওয়া–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (২৫:৭৪)

রেফারেন্সঃ

১. সাহল ইবন সাদ(রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এ ঘটনাটি সাহীহ বুখারীতে এসেছে। ৮ম খন্ড, ৬০০৭ ও ৬০৩৬ নং হাদিস।

২.সাহীহ বুখারী,৮ম খন্ড, ৬০৫৪ ও ৬০৫৩ নং; আবু দাউদ,৩য় খন্ড, ২০৯৭ নং হাদিস।

৩.ইবনে মাজা,২য় খন্ড,১৮৭৮ নং হাদিস।

৪.ইবনে মাজা,২য় খন্ড, ১৮৬৫ নং হাদিস।

দাইয়্যুস কে?

4 November 2014

এক.

দাইয়্যুস শব্দটার সাথে আমাদের অনেকেরই কম বেশি পরিচয় আছে। অথচ দাইয়্যুসের ব্যাপারে ধারণা রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এই বিষয়ে ভয়ানক কিছু সাবধানবানী সহ হাদীস রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"তিনজন আছেন যাদের দিকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কিয়ামাতের দিন নজর দেবেন না। যে পিতামাতার অবাধ্য, ও যে নারী বেশভূষায় পুরুষের অনুকরণ করে, এবং দাইয়্যুস ব্যক্তি।" (সূনান আন নাসাই : ২৫৬২, হাদিস হাসান, আলবানী সাহীহ বলেছেন)

ইমাম আহমাদের বর্ণনাকৃত অন্য আরেকটি হাদীসে 'আল্লাহ নজর দেবেন না' এর সাথে এসেছে দাইয়্যুস ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। (আহমাদ শাকির যার ইসনাদ সাহীহ বলেছেন,

দেখুনঃ http://islamqa.info/en/9611)

দাইয়্যুস শব্দের ব্যাখ্যায় উলামা কিরামদের মতামতঃ

ইবন তাইমিইয়্যাহ: দাইয়্যুস হল যার কোন ঘীরাহ) Protective jealousy(নেই।]Majmoo‘ al-Fataawa, 32/141[

মুফতি শাফি উসমানী: দাইয়্যুস হল সেই ব্যক্তি যে তার নির্লজ্জতার ওপর এমন সন্তুষ্ট যে সে তার স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের)বিশেষত নারী(অসম্মানের পথে চলা থেকে বিরত রাখেনা। (মা’রিফুল কুর’আন, ভলিউম ২ : সূরাহ নিসা আয়াহ ৩১)

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন বায: “দাইয়্যুস হল সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীকে জিনা করার অনুমতি দেয় ও তা থেকে নিজ স্ত্রীকে বিরত রাখেনা, এমনকি আত্মসম্মানের অভাব আর ঈমানের দুর্বলতার কারণে সে আল্লাহর ওয়াস্তে রাগান্বিতও হয়না আর এভাবেই সে তার স্ত্রীর পাপকে স্বীকার করে নেয়)বাধা দেয় না(।”]Sheikh Bin Baz Fatawa Islamiyah, vol. 5, p. 188[

শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ: দাইয়্যুস হল যে তার পরিবারের)স্ত্রী, কন্যা, বোন, অধিকারভুক্ত নারী(পাপকে অনুমতি দান করে। (http://islamqa.info/en/162851)

স্থায়ী কমিটির ফাতওয়া: দাইয়্যুস শব্দটি এমন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যে তার অধিকারভুক্ত কোন নারীকেই, হোক তা তার স্ত্রী, কন্যা, বোন এবং অন্যদের জিনা করা থেকে বিরত রাখেনা, তা সরাসরি জিনাই হোক, আর এমন সব কাজ হোক যা জিনার দিকে নিয়ে যায়, যেমন গায়ের মাহরামের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে যেসব আওরা)শরীরের অংশ(ঢেকে রাখতে হয়, তা প্রকাশ করা, গায়ের মাহরাম এর সাথে একাকী অবস্থান করা, ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দেহে সুগন্ধি লাগানো, আর অন্যান্য কাজ যা ফিতনা আর অপরাধ সৃষ্টি করতে পারে।

)একই মতনের আরেকটি হাদীস উল্লেখ করে(এটা জানা বিষয় যে, অপরাধের/ পাপের বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা হারাম। হোক তা নিজের ঘরের নারীদের দ্বারা সংঘটিত বা অন্য কারো দ্বারা। তবে অপরাধ/পাপকে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকা আরো কঠিন হারাম এবং আরো গভীর পাপ কারণ ঐ ব্যক্তি একজন অভিভাবক)তার স্ত্রীর বা অন্যান্য নারীদের(যে তার অভিভাবকত্বের জন্যে জিজ্ঞাসিত হবে। নিশ্চুপ থাকার অবশ্যই অপরাধ, এটা তাকে দাইয়্যুস হিসেবে চিহ্নিত করুক আর নাই করুক, কারণ কুরআনের আয়াত ও হাদীস তাই নির্দেশ করে।

]Fatwas of the Permanent Committee<group hijab="" and="" adornment="" dress="" on="" as="" prescribed="" by="" islam="">

হাদিসটির টেক্সটের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি, তাহলে দেখতে পাই মূলত সেই ব্যক্তিকেই দাইয়্যুস বলা হচ্ছে, যে তার স্ত্রীকে জিনা করতে বাধা দেয় না। কিন্তু যদি সম্মানিত উলামা কিরামদের ব্যাখ্যার দিকে নজর দিই, তাহলে এর মূল ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই ব্যক্তিই দাইয়্যুস, যে তার স্ত্রীকে বেপর্দা চলতে দেয়, মাহরাম – গায়ের মাহরাম বিষয়ে তোয়াক্কা করেনা আর জিনার নিকটবর্তী হতে যেইসব পাপ করা হয়, সেইসব পাপ করতে বাধা দান করেনা।

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“আল্লাহ প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্যে তার অংশের অনিবার্য জিনা লিখে রেখেছেন, হোক সে তার ব্যাপারে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত। চোখের জিনা হল দৃষ্টিপাত করা)যে দিকে বা যার দিকে দৃষ্টি দেবার অনুমতি নেই সেদিকে বা তার দিকে(, জিহ্বার জিনা হল উচ্চারণ করা)যা উচ্চারণ করা বা বলা বৈধ নয়(। আর নফসের ইচ্ছা জাগে)জিনার জন্যে(এবং গুপ্তাংগ তা বাস্তবতায় রূপ দেয় অথবা তা অস্বীকার করে।“ (সাহীহ বুখারী ৬৬১২)

উলামা কিরামের মতে মুখের জিনা, চোখের জিনা, হাতের জিনা, পায়ের জিনা সবই জিনার দরজা আর অনস্বীকার্য অংশ। অতএব যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এইসব জিনা থেকে বাধা দেবেনা, সে ব্যক্তিও দাইয়্যুসের কাতারে পড়ে যাবে।

এখানে উল্লেখ করা জরুরী, একজন মুসলিম নারীর মাহরাম পুরুষ হলেন তার পিতা, দাদা, পর দাদা এবং উপরের দিকের পুরুষ। তার ছেলে, নাতি, নাতির ছেলে এবং নিচের দিকের পুরুষ। তার চাচা, তার আপন ভাই, আপন ভাই

এর ছেলে ও আপন বোনের ছেলে। এছাড়া তার দুধ মাতার স্বামী ও ভাই। বিবাহ সূত্রে তার পুরুষ মাহরাম হলেন তার স্বামী, শ্বশুর, স্বামীর দাদা, স্বামীর সন্তান, স্বামীর নাতি ও নিচের দিকের পুরুষ।

স্বামীর ভাই)অর্থাৎ দেবর(কিংবা অনান্য ভাই জাতীয় পুরুষ, যেমন কাজিন, তারা স্পষ্ট গায়ের মাহরাম।] বিস্তারিত জানতে : http://islamqa.info/en/5538[

আমাদের সমাজে অনেক স্বামী দেখা যায়, যারা তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে উদাসীন। তারা নিজেরা প্র্যাক্টিসিং মুসলিম, স্ত্রীও নামায কালাম পড়ছেন, কিন্তু তিনি গায়ের মাহরামদের সাথে হাসি ঠাট্টা করছেন, কথা বলছেন, আওরাহ না ঢেকে সামনে আসছেন, গল্প করছেন।

স্পষ্টতই এইসব গর্হিত কাজ ও চোখ, কান, জিহ্বার জিনা। অথচ স্বামী তার স্ত্রীকে এইসব জিনা আর গুনাহ থেকে বিরত রাখছেন না, বরং কোনক্ষেত্রে উৎসাহ দিচ্ছেন। সুবহান আল্লাহ!

এমন অনেক ভাই আছেন, যারা আলমদুলিল্লাহ দ্বীন পালন করছেন। তাদের স্ত্রীও দ্বীনি। কিন্তু উল্লিখিত পাপ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে বাধা না দেয়ার কারণে অনেক ভাই দ্বীন পালন করেও জান্নাত থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক ভাবে দ্বীন পালনের তাওফীক দান করুন।

courtesy - ghurabadiary

দুই.

ভাইয়েরা আপনারা যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে পরপুরুষের চোখের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করছেন, স্ত্রীদের ছবি ফেসবুকে দিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছেন, স্ত্রীকে সাজিয়ে নিয়ে বাইরে বের হচ্ছেন আর পরপুরুষ ও লম্পটরা চোখকে পরিতৃপ্ত করছে

সেসব প্রত্যেক পুরুষের "দাইয়্যুস" টার্মটির ব্যাপারে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। একজন পুরুষ হাদিসের ভাষ্যমতে দাইয়্যুস সাব্যস্ত হবে যদি সে তার বোন, স্ত্রী, কন্যাদের বেপর্দাভাবে চলাফেরা করাকে বন্ধ না করে, তাদেরকে অশ্লীলতা, ব্যভিচার থেকে দূরে না রাখে। যেসব ভাইয়েরা এখনও দাইয়্যুসের কাতারে আছেন আজই তাওবা করুন, নিজের পরিবারের মহিলাদের বুঝান, দাওয়াহ দিন। তারপরও না বুঝলে বাধ্য করুন, কেননা তাদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। এমনকি আপনার জান্নাত জাহান্নামও অনেকাংশে তাদের উপর নির্ভর করছে। কারণ তারা আপনার অধিনস্ত।

রাসুলুল্লাহ (□) বলেছেন,

"তিনজন আছেন যাদের দিকে আল্লাহ সুবহানু তায়ালা কিয়ামাতের দিন নজর দেবেন না। যে পিতামাতার অবাধ্য, যে নারী বেশভূষায় পুরুষের অনুকরণ করে এবং দাইয়্যুস ব্যক্তি।"

[সুনান আন নাসাঈ: ২৫৬২, হাদিস সাহীহ]

ইমাম আহমাদের বর্ণনাকৃত অন্য আরেকটি সাহীহ হাদীসে 'আল্লাহ নজর দেবেন না' এর সাথে এসেছে দাইয়্যুস ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। [মুসনাদে আহমাদ]

রাসুলুল্লাহ (□) আরও বলেছেন,

"আল্লাহ প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্যে তার অংশের অনিবার্য জিনা লিখে রেখেছেন, হোক সে তার ব্যাপারে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত। চোখের জিনা হল দৃষ্টিপাত করা (যে দিকে বা যার দিকে দৃষ্টি দেবার অনুমতি নেই সেদিকে দৃষ্টিপাত করা), জিহ্বার জিনা হল উচ্চারণ করা (যা উচ্চারণ করা বা বলা বৈধ নয়)। আর নফসের ইচ্ছা জাগে (জিনার জন্যে) এবং গুপ্তাংগ তা বাস্তবতায় রূপ দেয় অথবা তা অস্বীকার করে।" [সাহীহ বুখারীঃ ৬৬১২]

উলামায়ে কিরামের মতে মুখের জিনা, চোখের জিনা, হাতের জিনা, পায়ের জিনা সবই জিনার দরজা আর অনস্বীকার্য অংশ। অতএব যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এইসব জিনা থেকে বাধা দেবে না, সে ব্যক্তিও দাইয়্যুসের কাতারে পরে যাবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দাইয়্যুস হওয়া থেকে হিফাজত করুন এবং মা বোনদের যথাযথভাবে পর্দা করার তাওফিক দান করুন।

Courtesy - Sabet Bin Mukter

তিন.

নারীর বা পুরুষের সৌন্দর্য পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফেতনাগুলোর একটি। এই ফেতনা থেকেই পৃথিবীর নিকৃষ্টতম কাজের সূচনা হয়। সৌন্দর্য আগুনের মতো। পরিমিত ব্যবহারে অনেক ভালো কিছু হয়। কিন্তু অপরিমিত ব্যবহারে দাউ দাউ জ্বলে ওঠে। রাস্তার দেখা এইসব সৌন্দর্য অন্যের বেড রুমেও আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মনকে অতৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। যেই স্ত্রীর চক্ষু শীতলকারিণী হবার কথা তাকেই চোখের বিষ বানিয়ে দেয়। সুন্দর করে সেজে সেলফি তুলে ফেইসবুকে আপলোড দেওয়ার আগে, আল্লাহর দেওয়া ঐশ্বর্য নিয়ে রাস্তায় বের হবার আগে একবার ও কি ভেবে দেখেছেন এই সৌন্দর্য অন্য কারো স্বামীর মাথা নষ্ট করে দিবে কিনা?

আমার বা আমাদের মতো মেয়েদের ও মাঝে মাঝে শয়তান ওয়াস ওয়াসা দেয় বা মনে চাওয়ায় টানা টানা ডাগর চোখের ছবি আপলোড করি। কিন্তু নিজেকে টেনে ধরি। কারন, এটা একটা সমাজ। সমাজে আরও ১০ জন মা বোন আছে, তাদের কথা আমাদের ভাবতে হয়।

আমরা কারো অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারিনা, উপকার না করি, সংসার ভাঙ্গার কারন হতে পারি না। আর এটাই প্রকৃত নারীবাদ হওয়া উচিৎ। যা অন্য নারীর অধিকার রক্ষার জন্য সৌন্দর্য প্রদর্শনের মতো লোভনীয় খেলা থেকে দূরে থাকবে। এই আত্মত্যাগ আরেক বোনের জন্য।

- শেখ সাফওয়ানা জেরিন

“বিয়ের আগে প্রেম নয়, বিয়ের পরে পরকীয়া নয়”

1 November 2014

সংকলনে – বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

এক.

‘মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই।’ (সূরা নিসা–৩)

‘মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে’ আয়াতের এই অংশটুকু খুব গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমান ছেলে–মেয়েরা বিয়ের জন্য পছন্দ করতে, ভালোবাসতে পারবে কিনা– তা এই আয়াত থেকে চিন্তা করার বিষয়। কিছুদিন আগে একটা লেখা পড়েছিলাম, ‘আমি কি ভালোবেসে বিয়ে করতে পারবো?’

ওই লেখায় বলা হয়েছে, পারিবারিক পছন্দে বিয়ে হওয়াই একমাত্র ইসলামসম্মত পন্থা নয়। মুসলিম ছেলেমেয়েদের নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার আছে। সূরা নিসার ওই আয়াতের অনুবাদে মারীফুল কুরআনে বলা হয়েছে, ‘যাদের তোমরা পছন্দ করো’ আর আল কুরআন একাডেমির হাফেজ মুনির আহমেদ অনুবাদ করেছেন, ‘যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো’। তবে ভালো লাগা, পছন্দ করা, ভালোবাসা আর প্রেম এক কথা নয়। প্রেম হচ্ছে সম্পর্ক (রিলেশনশিপ)।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রেম হতে পারে একমাত্র বিয়ের মাধ্যমে। আমরা নিশ্চয়ই কাউকে হুট করে ‘ভালোবাসি’ বলে প্রেমে জড়াই না। তার সম্পর্কে জেনে বুঝে যখন মনে হয় এই মেয়েটা বা এই ছেলেটার সাথে একটা জীবন পার করে দেওয়া যায়, তখন তাকে বলি, ‘আই লাভ ইউ।’ ‘আই লাভ ইউ’ বলার পূর্ব পর্যন্ত চিন্তা–ভাবনা বৈধ (তবে এই জানা–বোঝার জন্য তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে মিশে অভিজ্ঞতা অর্জনের অনুমতি নেই)। প্রেম করতে হলে আগে তাকে চিরদিনের জন্য আপন করে নিতে হবে।

‘তোমরা যখন বিয়ের জন্য এমন ছেলে বা মেয়ে পেয়ে যাবে যার চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে তোমরা পছন্দ করবে, তো তখনই তার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করো।’ (তিরমিযী)

এ অধিকার মেয়েদের জন্যও সমান। সাহল ইবন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার এক মহিলা সম্ভবত তার নাম লায়লা বিনতে কায়স ইবনুল খাতিম রাসূলুল্লাহর (সা.) কাছে হাজির হয়ে তার সাথে নিজেকে বিয়ের জন্য সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন। (বুখারি) অতএব পছন্দের ব্যক্তিকে ভালোবাসি বলতে হবে বিয়ের দ্বারা। আর সেটা অবশ্যই অভিভাবকদের মাধ্যমে। অভিভাকদের কর্তব্য এতে সাড়া দেওয়া।

‘যদি এমন কেউ তোমার কাছে আসে (বিয়ের পয়গাম নিয়ে) – যার চরিত্র এবং তাকওয়া সন্তোষজনক, তাহলে তার কাছে (তোমার মেয়েকে) বিয়ে দাও। যদি এমনটি না করো, তাহলে পৃথিবীতে মারাত্মকরকম ফেতনা ও বিপর্যয় দেখা দিবে’। (তিরমিযি) দুঃখজনক হচ্ছে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় বিয়েকে অনেক কঠিন করে রাখা হয়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়ানো, চাকরি পাওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া কত কিছু। অথচ বিয়ের আগে প্রেমের সম্পর্ক কত সহজ! এর জন্য কিছুই লাগে না। অথচ এর চেয়ে সহজ হওয়া দরকার বিয়ে। আমার মতে, ছাত্রাবস্থায় বিয়ে হওয়া দরকার। তবে তখনই কেউ কারো দায়িত্ব (আর্থিক) নিবে না। প্রেম করার সময় তো নেয় না। ঠিক সংসার করারও দরকার নেই। অনেকটা প্রেমের মতোই, তবে মানুষটিকে চিরদিনের জন্য নিজের করে নিয়ে, ভবিষ্যতের আশায় বসে থেকে নয়। সেটা অবশ্যই অবিভাবকদের সহযোগিতায়। এ ধরনের সংস্কৃতি চালু হওয়া কি খুব কঠিন?

যাকে আমি ভালোবাসছি, একসাথে ঘুরছি, বাসা থেকে খাবার রান্না করে এনে পরম মমতায় খাওয়াচ্ছি, কষ্টের টাকা বাঁচিয়ে উপহার কিনে দিচ্ছি, মন খারাপের বিকেলে যার ভালোবাসায় আমার জীবন সুখের হয়ে উঠছে, হৃদয়ের মতো পবিত্রতম জায়গা যার জন্য বরাদ্দ করেছি, তখনও আমি নিশ্চিত নই- এই মানুষটার সাথে আজীবন থাকা হবে কিনা। প্রতিষ্ঠিত হওয়া-না হওয়া, নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা আর পারিবারিক পছন্দের ফাঁদে আটকে যায় আমাদের ভালোবাসার অনুভূতি। এর চেয়ে অমানবিক আর কী হতে পারে! চোখের সামনে কত হৃদয় ভেঙে যেতে দেখলাম! তরুণ বয়সে আমরা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হবো এটাই স্বাভাবিক। ভালো লাগবে, ভালো বাসবো এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

‘আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের মধ্যে স্বস্তি পেতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও মায়া সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা রুম-২১)

কিন্তু ইসলামের নির্দেশনা না মেনে পারিবারিক-সামাজিক মূর্খতার আনুগত্য করে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ অনুভূতির প্রকাশে চোরাপথে প্রেমের দ্বারস্থ হই। তারপর হয়তো একদিন প্রিয় মানুষটিকে হারিয়ে গতানুগতিক বিয়ে করতে হয়। অথচ অনুভবে মিশে থাকে অন্য কেউ। বিষণ্ন সন্ধ্যায় পুরনো প্রেমের স্মৃতি মনে করে জীবনটা ছন্দহীন নীরস লাগে।

বিয়ে সহজ হোক। বিয়ের আগে প্রেম নয়, বিয়ের পরে পরকীয়া নয়।

দুই.

পাশের বাসায় বিশাল ঝগড়া, মারামারি কাটাকাটি অবস্থা। কারণ হচ্ছে পাড়াতো শ্যালিকার সাথে দুলাভাইয়ের অন্যরকম সম্পর্ক আঁচ করতে পারা। বউটা আমার সমবয়সী, একসাথেই বড় হয়েছি। ওর বিয়ে হয়েছে বছর চারেক আগে। একটা বাচ্চাও আছে। আর শ্যালিকা,ও তো আমাদের অনেক ছোট। সেদিনের বাচ্চা মেয়েটা হঠাৎ করেই অনেক বড় হয়ে গেলো। বেশ কয়েকদিন ধরেই কানাঘুষা শুনছিলাম। আজ বিষয়টা ক্লিয়ার হলো। পাশাপাশি বাসা হওয়ার এবং দুলাভাইয়ের সাথে ফ্রি থাকায় একই সাথে উঠাবসা, আড্ডা দেয়া, হাসি তামাশা করতে করতে দুজনেই দুজনের প্রতি উইক হয়ে পড়েছে এবং তারা এটাকে চুড়ান্ত রুপ দিতে চাচ্ছে মানে বিয়ে করতে চাচ্ছে!!!

.

আমাদের বেশীরভাগ মুসলিম পরিবারে যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত তা হলো পর্দা। শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছিনা, ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

যদি শ্যালিকা এবং দুলাভাই দুজনই নিজেদের পর্দার ব্যাপারে সচেতন থাকতো তবে এমন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটতোনা।

.

কলেজে আসা যাওয়ার পথে প্রায়ই দেখতাম সবাই মিলে পরিপাটি হয়ে দরজার সামনের সিড়িতে গল্পের আসর জমিয়ে বসেছে। হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়েতেছে। কি আনন্দের, কি মজার দিন না ছিলো। সেদিনের সেই মজা গুলোই আজ বিষাক্ত কাঁটা হয়ে দুইটা পরিবারের মানুষের জীবন বিষিয়ে তুলছে।

মানুষকে প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে আর শয়তান তো সারাক্ষণ সুযোগ খুঁজে কখন কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কাকে বিপথগামী করা যাবে। শয়তানের এই ধোঁকা থেকে,ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা,নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে বড় জিহাদ।

.

আমাদের সমাজে শালী –দুলাভাই, দেবর -ভাবী মানে সেই মাপের কেমিস্ট্রি। সেই মাপের দহরম মহরম। বাইরে পর্দার ব্যাপারে অনেকেই বেশ সচেতন থাকলেও পরিবারে গায়রে মাহরামের ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন! আর এই উদাসীনতার জন্য কত সংসার যে ভাঙ্গলো তার কোনো হিসাব নেই। মনে আছে পায়েল আর পাবন নামে দুই বাচ্চার সুইসাইড নোট পড়ে কেঁদেছিলাম। তারা তাদের মা সহ সুইসাইড করেছিলো এই শালী – দুলাভাই পরকীয়ার জের ধরে। অথচ হাদীসে এসেছে– ''দেবর মৃত্যু সমতুল্য।'' (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৭২)

হাতেনাতে এর কুফল দেখতে পেয়েও আমাদের বিবেক আজ অন্ধ। পূর্ণ পর্দা মানতে আমাদের অস্বস্তি লাগে! লোকে কি বলবে, বাসার মানুষ কি ভাববে??

মেয়েদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো, "আপু, নিজেকে হেফাজত করে চলো। কেউ ব্যঙ্গ করবে, কেউ ক্ষেত বলবে, কেউ হুজুরনী বলে ক্ষেপাবে। সো হোয়াট! লোকের কথায় কি আসে যায়?

তুমি নিজে একটা অন্যরকম শান্তি পাবে। তোমার বাবাকে তোমার জন্য জবাবদিহি করতে হবেনা। তোমার জন্য কোনো নারীর স্বপ্ন ভঙ্গ হবেনা, কোনো অবুঝ শিশু তার মা হারা হবেনা। সর্বোপরি তুমি আল্লাহর কাছে সম্মানিত হবে "।

আল্লাহ আমাদের ফেতনা ফেসাদ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন

তিন.

তিনটি সত্য ঘটনা, পাত্র-পাত্রীর নাম গুলো পরিবর্তিত।

১।

রাসেদ এবং তানিয়ার বিয়ে হয়ে গেলো, মহা ধুম ধামের বিয়ে। তানিয়া রক্ষণশীল পরিবারের ভদ্র মেয়ে, অন্যদিকে রাসেদ মহা আধুনিক পরিবারের ডিজুস ছেলে, সংসার জীবন ভালোই চলছিলো, বাচ্চাও হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই তা নিয়ে লক্ষ করলো রাসেদের মধ্যে কিছু প্রব্লেম আছে, ভাবলো ইয়াং বয়স বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেলে সংসারী হবে, সংসারের প্রতি দায়ীত্ববোধ বাড়বে। কিন্তু কল্পনা এক বাস্তবতা আরেক। রাসেদ এক সময় সম্পূর্ণ কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেলো, রাত করে বাড়ি ফেরা, মাঝে মাঝে লাল পানি খেয়ে গায়ে হাত তোলা, একাধিক মেয়ে বন্ধু মেইনটেন করা, সবই চললো সমান তালে, স্ত্রী'র প্রয়োজনীয়তা রাসেদের নেই।

তানিয়া মাঝে মাঝে গুমড়ে গুমড়ে কাদে, অভিমান করে। কিন্তু তার অভিমান ভাঙাবে কে? শ্বশুর শ্বাশুরীর কাছে এগুলো কোনো ব্যাপারই না, এই বয়সে ছেলেরা একটু আধটু এমন হবেই এটা নিয়ে কান্নাকাটি হুলস্থুল করার কিছুনেই।

শিক্ষাঃ দুনিয়াতেই জাহান্নামের আজাবের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে হলে কু-চরিত্রের ছেলে/মেয়ে বিয়ে করার বিকল্প নেই।

২।

হাসান এবং জেরিন একই ক্লাসে পড়ে। অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে জেরিন, অসাধারণ বলতে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় এমন সুন্দরী। কিন্তু প্রব্লেম হলো কাপড় পাল্টানোর মতো করেই প্রেমিক পাল্টায় জেরিন, আজকে এর সাথে তো কালকে ওর সাথে, এভাবেই চলছিলো। হাসানও মনে মনে জেরিনকে পছন্দ করে, কিন্তু সিরায়াল পাচ্ছিলোনা, একদিন হয়ে গেলো, সবাইকে টেক্কা দিয়ে হাসানের সাথে জেরিনের প্রেম হয়ে গেলো।

হাসান আবার ভীষণ চালাক ছেলে, প্রেম গরম থাকতে থাকতেই একা একা বিয়ে করে ফেললো জেরিনকে, বিয়ে মানে পাকা পাকি সম্পর্ক। বিয়ে এমনই সম্পর্ক চাইলেই কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে যেতে পারবেনা। উভয় পক্ষের গার্জিয়ানরা প্রথম দিকে ক্যা-কু করলেও পরবর্তীতে মেনে নিতে বাধ্য হলো। নিশ্চিন্ত হাসান, কিন্তু সেটা বেশিদিনের জন্যনা। সংসারের ভিত্তি মজবুত করার লক্ষে বছর খানেকের মধ্যেই ঘর আলো করে সন্তান এলো। হাফ ছেড়ে বাচলো হাসান, যাক আর দূর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

অভ্যাস হচ্ছে কুত্তার লেজ, বারো বছর চোঙের ভেতরে রাখলেও সোজা হয়না। অথবা বলা যায় কয়লা ধুইলে ময়লা যায়না। একদিন হুট করে হাসানের বন্ধুর সাথে পালিয়ে গেলো জেরিন, বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে বউকে ফিরিয়ে আনা হলো। বছর খানেক পরে অন্য এক ছেলের সাথে আবার পালিয়ে গেলো, বাচ্চার মুখের দিকে তাকিয়ে নাকি নিজের কাপুরুষতার কারণে জানিনা, আবারো ফিরিয়ে আনা হলো জেরিনকে। এখনো তারা সংসার করছে, এটাকে কি সংসার বলা হয়, নাকি একসাথে থাকা বলা হয়, বিজ্ঞজনেরাই সেটা ভালো বলতে পারবেন।

শিক্ষাঃ প্রেম কইরা রোমান্টি/পোলা মাইয়া বিয়ে করার পরেও যদি তাদের রোমান্টিকটা আগের মতো চলতে থাকে তবে মাইন্ড করার কিছু নাই।

৩।

নাম তার শিমু, চমৎকার সেই মেয়ে, অসাধারণ তার চুল। ডাগর ডাগর চোখের কোণে যেনো জাহাজ ডুবে যায়, প্রথম দেখাতেই মনে হয় কোথায় যেনো দেখেছি। প্রেম মানেনা নিয়ম কানুন, নবম শ্রেণীতে থাকা অবস্থাতেই একটা ছেলের সাথে পালিয়ে গেলো। সুখের সংসার, ভালোবাসার সংসার, সুখ উপচে পড়ছে দু'জনার জীবনে। জীবিকার তাগিদে একদিন ছেলেটি বিদেশ পাড়ি দিলো, চোখের জলে গাল ভাসিয়ে, বুক ভাসিয়ে বিদায় দিলো প্রেয়সি।

বিরহেই কাটতে থাকলো শিমুর দিনগুলো, কিন্তু সেটা বেশি দিনের জন্য নয়। মনের বন্দরে নোঙর করলো নতুন জাহাজ। একদিন সেই জাহাজে করেই স্বামীর সংসার ত্যাগ করলো শিমু।

বেচারা স্বামী! বিদেশে বসে বুক ফাটা আর্তনাদ করা ছাড়া কিছুই করার ছিলোনা।

শিমু নতুন সংসার, নতুন জীবন। সুখে দুঃখে ভালোই কাটছিলো দিনগুলো, কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে মন ভরলেও পেট ভরেনা। পেটের জন্য চাই টাকা, অনেক টাকা। নতুন স্বামীও একদিন উড়াল দিলো বিদেশের উদ্দেশ্যে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শিমু এখন তিন নম্বর স্বামীর সংসার করছে। এটাও নাকি ভালোবাসার সংসার, এখানেও সুখ আছে, ভালোবাসা আছে, তবে ভালোবাসা বাড়াবাড়ি রকমের উপচে পড়ছে কিনা জানিনা।

শিক্ষাঃ অপরের সুন্দরী বউ কিংবা পয়সা ওয়ালা স্বামীকে কেড়ে নিয়ে তার ঘর ভাঙার প্রস্তুতি নিচ্ছেন? অপেক্ষা করেন আরেক জন আসছে সে আপনার ঘর ভাঙবে।

লিখেছেন্ –

*১. তানিম ইশতিয়াক

*২. নাজমুন নাহার

*৩. শামীম রেজা

হারাম প্রেম বনাম হালাল বিয়ে এবং কাছে আসার গল্প

5 November 2014

সংকলনে – বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

বিয়ের আগে অবাধ মেলামেশায় তৈরি যে কাজটাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে , শয়তান আদর করে সে কাজটার নাম দিয়েছে প্রেম! বিয়ে পূর্ব প্রেম শয়তানের জন্য এবং বিয়ে পরবর্তি প্রেম আল্লাহর জন্য তৈরি হয় ।

যারা হারাম সম্পর্ক প্রেম করে, তাদের মাঝে সারাক্ষণ একটা চোর-চোর ভাব থাকে। তারা অচেনা ছেলের/মেয়ের সাথে আজেবাজে সময়ে বেড়ায়, রিকসায় চড়ে যা-তা করে, ফাস্টফুডে ঢুকে লুকিয়ে থাকে, ফোনে আরো অনেকের সাথে আলাপ করে। কেউ সন্দেহ করে কিছু বললেই তাদের টেনশন হয়। প্রেমিক বা প্রেমিকার নামে কেউ কুৎসা বললে তাদের বিশ্বাস হয়ে যায় কেননা তারা নিজেরাই তো একটা অন্যায় ও অশ্লীল আচরণ করছে। এভাবে সন্দেহ আর অশান্তি তাদের মনে গেঁড়ে যায় একদম। প্রেম যারা করে তাদের চরিত্রে তাই অস্থিরতা বেশি হয়, দৃঢ়তার অভাব হয়।

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় বিয়ে করে, তারা জানে প্রিয় মানুষটা সমস্ত দুনিয়ার ফিতনা থেকে বেঁচে থাকে, তার কাছে ফিরে তার সমস্ত আবেগ ভাগাভাগি করতে। তাদের প্রতিটি বাক্য আর খুনসুঁটি তাদের আত্মবিশ্বাস জাগায়। তাদের দু'জনার উপস্থিতিতে আনন্দ ভাগ করে নেয়ার সময়গুলোতে তারা জানে, এই মূহুর্তগুলো ইবাদাতের সমতূল্য কেননা তারা অন্যায় সমস্ত পথ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর হালাল করে দেয়া উপায়ে আনন্দ উপভোগ করছেন...

তাই, বিবাহপূর্ব প্রেমকে না বলুন। প্রেম থেকে দূরে থাকুন। নিজের চরিত্রকে সংরক্ষণ করুন। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় বিয়ে করার চেষ্টা করুন। যদি বিয়ের সম্ভাবনা দেখতে না পান খুব শীঘ্রই, তবে রোজা রাখুন এবং আল্লাহর কাছে প্রচুর দোয়া করুন। আল্লাহ একদিন আপনার জন্য পথ খুলে দেবেন ইনশা আল্লাহ, সহজ করে দিবেন আপনার পথ। নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন চান, তখনই বান্দাকে তার প্রিয় উপহারটি দান করেন। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কেবলই তার কাছে চায়, আল্লাহ তাকে দান করেন, শ্রেষ্ঠতম উপহারটি তাকে দান করেন। আল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের রহম করুন।

দুই.

সাইফুল্লাহ সাহেবকে তার স্ত্রী ডাকছেন , এই উঠো ! ফজরের আযান হচ্ছে। চোখ কচলাতে কচলাতে সাইফুল্লাহ সাহেব ঘুম থেকে উঠে বসে প্রথমে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেই চোখ চলে যায় ক্লোরে । জায়নামায বিছানো দেখে আলহামদুলিল্লাহ বলে উঠেন । স্ত্রীকে বলেন , তুমি তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে আর ঘুমাও নি? স্ত্রী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ না ।

সাইফুল্লাহ সাহেব আর কিছু না বলে খাট থেকে নামতেই স্ত্রী বলে উঠেন , বাথরুমে তোমার জন্য গরম পানি রাখা আছে । উযু করে নাও এবং সুন্নাত বাসায় পড়ে ফরজটা মসজিদে । সাইফুল্লাহ সাহেব মুচকি হেঁসে জাযাকাল্লাহু খাইরান বলে দ্রুত বাথরুমে চলে গেলেন । মসজিদ থেকে এসে দেখেন স্ত্রী কুরান পড়ছে ।

সাইফুল্লাহ সাহেব ১০ টার দিকে অফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন । স্ত্রী অফিসের ব্যাগটা গুছিয়ে দিলেন । যথারীতি আজকেও বিদায় নেয়ার সময় দুজন একসাথে সালাম দিতে গিয়ে মুচকি হেঁসে দিলেন ।

অফিস পথে সাইফুল্লাহ সাহেব জ্যামে পড়লেন । ভাবছেন , একজন দ্বীনদার স্ত্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ নেয়ামত । বিয়ে করার পর থেকে প্রতিদিন স্ত্রী আমাকে তাহাজ্জুদ পড়তে ডেকে দেয় । বিয়ের পর থেকে স্ত্রীর জন্য জামায়াতেও নিয়মিত নামায পড়া হয় । এগুলো ভাবতে ভাবতে হটাত স্ত্রীর কথা খুব বেশি মনে পড়লে স্ত্রীকে একটা কল দেয় । এবারো যথারীতি দু'জন একসাথে সালাম বিনিময় করে । বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর সালাম বিনিময় করে কল কেটে দেয় । কথা বলা শেষে সাইফুল্লাহ সাহেব আবার ভাবনায় পড়লেন । আলহামদুলিল্লাহ বলে মনে করলেন নিজের সে দুয়ার কথা যা তিনি নিয়মিত করতেন । দুয়াটি বিড় বিড় করে আবার পড়লেন-

" হে আল্লাহ ! আমাকে উত্তম চরিত্র দান কর । আমার তাকওয়া বৃদ্ধি করে দাও । হারাম থেকে বাঁচিয়ে হালাল রোজগার দিয়ে আমার রিযিক প্রশস্ত করে দাও । হে আল্লাহ !আমাকে একজন উত্তম স্ত্রী দান কর । আমার জন্য তুমি যাকে রেখেছো তাকে তুমি উত্তম চরিত্র দান কর । তাকে বিপদ-দুশ্চিন্তা থেকে তুমি মুক্তি দাও । তার জীবনকে তুমি সুন্দর করে দাও । তাকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। হে আল্লাহ ! আমাকে হিদায়াহ'র উপর মৃত্যু দান কর। আমি একমাত্র তোমার উপরেই ভরসা রাখি"

নিজের নিয়মিত করা দুয়া মনে মনে পড়ে সাইফুল্লাহ সাহেব খুশি মনে আলহামদুলিল্লাহ বলেন উঠলেন এবং প্রমাণ পেলেন পূর্ণ ভয় করে আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে আল্লাহ বান্দাকে নিরাশ করেন না ।

অফিসের কাজকর্ম সব শেষ । এখন বাসায় ফিরবেন । তার আগে প্রতিদিনের মত ফুলের দোকানে যাবেন স্ত্রীর জন্য ফুল আনতে । যথারীতি ফুল কিনলেন । আজ কেন জানি সাইফুল্লাহ সাহেব অনেকগুলো ফুল কিনেলন । বাসার সামনে এসে দরজা নক করলেন । স্ত্রীর দরজা খুলতেই যথারীতি দুজন আবার একসাথে সালাম বিনিময় করলেন । সাইফুল্লাহ সাহেব স্ত্রীকে বললেন , তুমি কি আমাকে কখনো আগে সালাম দিতে দিবে না ? স্ত্রীও একই প্রশ্ন করলেন । তারপর সাইফুল্লাহ সাহেব পেছন থেকে অনেকগুলো ফুল স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলেন , আই লাভ ইউ ফর দ্য সেইক অফ আল্লাহ । স্ত্রীও বললেন , লাভ ইউ টু ফর দ্য সেইক অফ আল্লাহ ।

এই হচ্ছে প্রেম । হালাল প্রেম এবং কাছে আসার গল্প । যেখানে নাই কোন নোংরামি, নাই কোন অশান্তি , নাই কোন আল্লাহর অবাধ্যতা । যেখানে আছে শুধু , সুখ আর শান্তি যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত । আলহামদুলিল্লাহ ।

courtesy - ১- সাফওয়ান।

২- গুরাবা।

কাছে আসার গল্প !!!

19 May 2015

লেখকঃ আরমান ইবনে সোলাইমান

অনেককাল আগে একটা হিন্দি সিনেমা দেখেছিলাম। নায়ক ইউরোপের কোন এক দেশে ঘুরতে গেছে। ট্রেনে ঠিক তার পাশের সিটেই অপরূপ রূপবতী এক তরুণী এসে বসে পড়ল। সেখান থেকেই তাদের পরিচয়,খুনসুটি,প্রেম। শেষ পরিনাম সিনেমার হ্যাপি এন্ডিং এবং একটি মারদাঙ্গা মধুর মিলনের সঙ্গীত। কখনো কখনো মানুষের বাস্তবজীবন রুপালি পর্দার সিনেমার চাইতেও অনেক অনেক বেশী অদ্ভুত,কাকতালীয় কিংবা আকর্ষণীয় হয়। আমার একটা ঘটনা বলি ...

লন্ডন থেকে আমার কিছু কাজিনদের সাথে ব্রডস্টেয়ারস যাচ্ছি। সমুদ্র দেখতে। একাই বসেছি,পাশের সিট খালি। একা বসার সমস্ত বিরক্তি এক কৌটা প্রিংগেলস চিপসের উপর ওঠাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর গভীর নীল চোখ আর আগুনরঙা চুলের এক অপরূপ রূপবতী তরুণী বাসে উঠলো। এগুতো লাগলো আমার সিটের দিকে। আমি ঝট করে পেছনে তাকালাম,না পেছনে কোন সিট খালি নেই। তাহলে কি আমার পাশেই.....এক পা দুপা করে এগুতে এগুতে তরুণীটি আমার পাশের সিটে এসে একটা ঝলমলে হাসি দিয়ে,হাই জানালো!! প্রবল শীতেও আমি ঘামতে শুরু করলাম,দু হাঁটু ঠকঠক করে একে অপরের সাথে বাড়ি খেতে লাগল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আমি কোনমতে বললাম,হ্যালো।

আমার তখন পুরোপুরিই ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া অবস্থায়। ঘটনা কি সত্যি ঘটছে? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি? জোর করে বার দুয়েক চিমটি লাগালাম নিজের হাতে,কামড়ও লাগালাম একবার হাতের আঙ্গুলে। নাহ! ব্যথা তো লাগে। আমার স্বপ্নও তো এত সুন্দর হতে পারেনা। অসম্ভব। আমি বরাবরই মুখচোরা স্বভাবের। কখনো আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারিনা। আর সামনে বসা মানুষটা যদি কোন রূপবতী তরুণী হয় তাহলে তো কথাই নেই। খানিকটা তোতলানো শুরু করি। কি বলা যায়,কিভাবে ইম্প্রেস করা যায়। এসব ভাবতে ভাবতেই প্রায় আধঘন্টা সময় পার করে দিলাম। ঠিক তখনই মেয়েটা সামনের সিটে কাঁদতে থাকা একটা বাচ্চাকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসে নিজের কোলে বসালো। আগত বাচ্চাটির সাথে সাথে আমার কথা বলার বিষয়বস্তুও চলে এলো পাশের সিটে। সাহস,শক্তি সবকিছু একত্রিত করে পিচ্চির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি জানি না ঈশ্বর কেন শুধু সাদা মানুষদেরকেই নীল চোখ দেন। হিংসা লাগে। এই পিচ্চির চোখ এত সুন্দর কেন? বাক্যটা ম্যাজিকের মতো কাজ করল। শুরু হয়ে গেল আমাদের ননস্টপ কথাবার্তা। অনেক কথা হলো তার জীবন,পরিবার,তার ফেলে আসা দেশ আয়ারল্যান্ড, তার

ভালো-লাগা, মন্দ লাগা এসব অহেতুক বিষয় নিয়ে। পুরো সময়টাই আমি চোখ বড়বড় করে ভেবেছি, স্বপ্ন দেখছি না সত্যিই এসব ঘটছে আমার সাথে? একটা অদ্ভুত ভালো লাগা আর ঘোরের মাঝে ক্রমেই হারিয়ে যেতে লাগলাম আমি।

কথা বলতে বলতেই হঠাৎ মেয়েটার একটা প্রশ্ন আমার ঘোর লাগা ভাব কাটিয়ে মোটামুটি ৫০০ ভোল্টের একটা ঝাটকা মারলো। প্রশ্নটা ছিল,ডু ইউ হ্যাভ এনি বিলিফ? আমি বললাম,হ্যাঁ, আমি মুসলিম। মেয়েটি খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থার জন্য কাজ করত। সে আমাকে খ্রিস্ট ধর্মের বিভিন্ন আকর্ষণীয় দিক, যিশু এবং তার মহানুভবতার বিভিন্ন দীক্ষা আমাকে দিতে লাগল। আমি সেসব বোরিং তত্ত্ব মুখ হা করে গিলতে লাগলাম। একটা সময় সে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে বসল,"আচ্ছা তোমাদের মুহাম্মাদ কি বলেছেন ইসলামের ব্যাপারে? আমি ইসলামের ব্যাপারে কিছুই জানি না।" আমি এবার মনে মনে ভাবলাম,এবার তরে বাগে পাইছি,ইসলাম কি জিনিস তোরে বুঝামু। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হল। তাকে বোঝাতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম,আমি ইসলাম নিয়ে বলার মতো তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছিনা। কোথা থেকে শুরু করবো,আর কোথায়ই বা শেষ করবো আমার জানা নেই। আমি এমনসব তোতা পাখির বুলি আওড়াচ্ছি যেসব বুলি প্রায় সব ধর্মেই আছে। ইসলাম কেন ইউনিক,কেন আলাদা সেটা আমি নিজেও ঠিকমতো জানি না। যার দরুন তাকে বোঝাতেও পারছি না।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, বহুদূরে একের পর এক গ্রাম, একের পর এক শহর, অথবা মানুষ সবকিছুকে পেছনে ফেলে আমাদের বাসটা এগিয়ে চলছে। আমার এ জীবনটাও এগিয়ে চলেছে ছুটে চলা এই বাসটার মতো করেই। অনেক কিছুকে পেছনে ফেলে জীবনের ২১টি সৌরবর্ষ পার হয়ে গেছে। এই ২১ বছরে কোনকিছুই এই সর্বদা প্রানবন্ত আমার কপালে দুশ্চিন্তা কিংবা অস্থিরতার ভাঁজ ফেলতে পারেনি। কিংবা প্রশ্নের সম্মুখীন করতে পারেনি আমার অস্তিত্ব, বিশ্বাস কিংবা আদর্শকে। কিন্তু আজ কোন এক অচেনা দেশে, অচেনা শহরে, অচেনা এক তরুণীর অতি সাধারণ গোছের এক এলোমেলো প্রশ্ন আমার সবকিছুকে এলোমেলো করে দিলো। এর কোন মানে হয়?সত্যি বলতে কী আমি মুসলিম ঘরে জন্মেছি,আমার বাবা-মা বলেছিলেন আমি মুসলিম। তাই আমি মুসলিম। আমার মুসলিম হওয়া কেবল মাত্র কলেজ-ইউনিভার্সিটির ফর্ম পূরণে লেখা মুসলিম এবং ছোটবেলায় সুরা ফাতিহা মুখস্থ করাতেই সীমাবদ্ধ। আমি জানি না ইসলাম কেন আর পাঁচটা ধর্ম হতে আলাদা। কেন ইসলাম ইউনিক? কী আছে এতে? আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার কী কী বলার আছে আমাকে টা আমি জানি না। কোন কিছু না জেনেই পার করে দিচ্ছি জীবনটা। মানে কী এসবের? এর ক'মাস পরেই আমি দেশে চলে আসি। তখন রামাদান। আমার এক প্র্যাক্টিসিং মুসলিম বন্ধুর সাথে ইসলাম নিয়ে চায়ের দোকানে বসে আলাপ করছি। হঠাৎ করেই আমার সেদিনকার সে বিদেশিনীর প্রশ্নের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় আমার মূর্খতার কথা। ব্যর্থতার কথা। আমি আমার সেই বন্ধুর সহযোগিতায় শুরু করি ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা এবং বিভিন্ন স্কলারদের লেকচার শোনা। কোনদিন ভুল করেও পশ্চিমে মুখ না ঘোরানো আমি পরিবর্তিত হয়ে ফিরে গেলাম আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে। তার রহমতের কাছে। তার ভালোবাসার কাছে। ক্রমশ: চলার চেষ্টা শুরু করলাম তার পথে।

আমার এই কাছে আসার গল্পটা আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে যাওয়ার গল্প। সেই সত্বার কাছে যাওয়ার গল্প যিনি আমাদের ভালোবেসে প্রতিনিয়ত দান করে যাচ্ছেন তাঁর অগণিত নিয়ামত।

প্রকৃতপক্ষে,আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌসুলী। তিনি যখন যাকে চান সাহায্য করেন। যখন যাকে চান করেন ধ্বংস। আমাকে হয়তো তিনি সাহায্য করেছিলেন এক অজানা অচেনা বিদেশী অবিশ্বাসী তরুণীর একটি সাধারণ প্রশ্নের দ্বারা। জীবনের এমন অনেক ঘটনা দ্বারাই তিনি আমাদের তাঁর নিদর্শন দেখান। আগ্রহী করে তোলেন তাঁর দ্বীনে ফিরে আসার জন্য। পার্থক্য শুধু এতটুকুই কেউ তার হেদায়াত কে পায়ে ঠেলে শয়তানের পথেই থাকে অবিচল। আর কেউ ফিরে যায় তারই দিকে। তার পথেই। ভালোবাসে শুধু তাকেই সবকিছুর থেকে বেশী। অনেক অনেক বেশী।

“গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ড মেইনটেইন করেও কি

তারা দ্বীনের প্রতি অটল থাকতে পারে??”

2 November 2014

প্রশ্নঃ

কিছু মুসলিমের ব্যাপারে আমি জানতে চাই যারা অনেক পাপ করে আবার একই সাথে তারা প্র্যাকটিসিংও! আমার অনেক বন্ধু আছে যারা ইসলামের ব্যাপারে অনেক জ্ঞান রাখে এবং ইসলাম প্র্যাকটিসও করে। কিন্তু তাদের বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড আছে যাদের সাথে তারা চ্যাট করে এমনকি দেখা সাক্ষাতও! জিনার মত পর্যায়ে না গেলেও তারা অনেক ঘনিষ্ঠ! যেমনঃ জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা তাদের রয়েছে! আমি তাদের কি বলব বুঝতে পারিনা, কেননা তারা নিজেরাই জানে এটা ভুল এবং এসব করার পর তারা দুঃখিতও হয়। এধরনের মানুষের ইবাদাত কি গ্রহণযোগ্য? তাদের স্বলাত কি গ্রহণযোগ্য এবং পুরস্কৃত হবে? তারা অজুহাত দেয় যে তারা ইমোশনালি খুব বেশি attached এবং তারা বলে তারা তো এক সময় বিয়ে করবেই! আপনি তাদের কি উপদেশ দিবেন?

উত্তরঃ

সেসকল মানুষেরই আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার প্রতি অধিক আন্তরিক থাকা উচিত যাদেরকে আল্লাহ সুবাহানু ওয়া তায়ালা হেদায়াতের পথে রেখেছেন। ইসলামের ইলম আর আল্লাহর দ্বীনের পথে সেই ইলমের ব্যবহার কি ভিন্ন কোন সত্তা? তাই প্র্যাক্তিসিং মুসলিম হিসেবে আপনি আপনার যে বন্ধুদের কথা উল্লেখ করেছেন তারা আসলে আল্লাহর নিষেধকৃত কাজে শামিল হয়ে শয়তানের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছে! দ্বীনের পথে চলার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ যে রহমত দান করেছেন তাদের কি উচিত ছিল না তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া? তাদের কি উচিত ছিল না দ্বীন পালন করে অন্যদেরকে দ্বীনের পথে আগ্রহী করার মত উদাহরণ সৃষ্টি করা?

আর তারা হারাম কাজ করছে নিজেদের মধ্যে এই "সচেতনতা" আর এর জন্য যে "দুঃখবোধ" তাদের রয়েছে মূলত এখানে এর কোন গুরুত্বই নেই! তারা কি মনে করেছে কেবল তাদের ইলমই তাদেরকে পাপ থেকে বিরত রাখবে? ইবলিশ কি জানতো না যে মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তই সঠিক? ইহুদিরা কি জানতো না যে মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল? মগজভর্তি ইলম একজন মানুষকে সবকিছু থেকে মুক্তি দিতে পারেনা। এজন্য চাই সে ইলমের যথাযথ প্রয়োগ যা মূলত আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলোকে আন্তরিক চিত্তে মেনে চলার মাধ্যমেই সম্ভব।

“তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে; তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশনিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।“ [সূরা রুমঃ ০৯]

“এছাড়া তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল”[সূরা নামলঃ ১৪]

দ্বীনেরব্যাপারেযে ইলমরাখে এবং উপদেশ দেয় তার দায়িত্বটা অনেক বড় এবং সে যখন নিজেই তার ইলমের বিরুদ্ধে যায় তখন সেটা খুবই ভয়ংকর এবং নিন্দনীয়!

“মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।“ [সূরা সফঃ ২-৩]

তোমার এখন যে কাজটা করা উচিত তা হল তাদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

“উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন,যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে” [সূরা আলাঃ ৯-১০]

“অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এবৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি;

তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও-কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।" [সূরা আরাফঃ ২০]

তাদেরকেমনে করিয়ে দাও যে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এধরনের ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হওয়াটা দুঃখজনক। একজন মুসলিম যখন আল্লাহর দ্বীনের প্রতি নিজের commitment এর বাহ্যিক খোলস তৈরি করে মানুষের কাছে নিজের দ্বীনের পরিচয় বহন করে আবার আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলোকে নিজের জীবনে স্থান দিতে পারেনা তখন তার ফলাফল খুবই ভয়াবহ!

সহিহ বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত উসামা ইবন যাইদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিজ নাড়ীভুঁড়ির চারদিকে ঘুরতে দেখা গেলো। যেভাবে গাভী তার খুঁটির চারপাশে ঘুরতে থাকে। অন্যান্য জাহান্নামীরা তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো- আপনার কি হল? আপনি তো আমাদেরকে ভালো কাজের উপদেশ দিতেন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। সে উত্তর দিলো- আমি তোমাদেরকে ভালো কাজ করতে বলে নিজে তা করতাম না। তেমনি তোমাদেরকে খারাপ কাজ ছাড়তে বললেও নিজে তা ছাড়তাম না!"

এছাড়াও বর্ণিত আছেযে রাসুল (সঃ) বলেছেন, *"মানুষকে ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া আর নিজের বেলায় তা ভুলে যাওয়া আলেমের উদাহরণ হল সেই প্রদীপের মত যা নিজে পুড়ে গিয়ে অন্যকে আলোকিত করে।"* [আলি খাতিব তার ইকতিদা আল ইলমে এটা উল্লেখ করেন এবং শায়খ আলবানি এটাকে সহিহ বলেছেন]

আব্দুল্লাহইবন আল মুবারাক (আল্লাহ তার উপর রহমকরুন) বলেন, *"আমি দেখেছি পাপ অন্তরকে নির্জীব করে ফেলে এবং পাপের ধারাবাহিকতাশেষপর্যন্ত মানুষকে অপদস্ত করে"*।

ধর্মযাজক, আলেম আর শাসকের চেয়ে দ্বীনকে কেউ বেশি কলুষিত করতে পারেনা। ন্যায্য মূল্য ফেলে যারা কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই অন্তরগুলোকেবিক্রি করেছে। তাদের উদাহরণ সেই মানুষের মত যে মৃত লাশের মুখে খাবার তুলে দেয় আরবুদ্ধিমান মাত্রই জানে এধরনের মানুষগুলোই থাকে পরাজিতদের কাতারে!

আর বয়ফ্রেন্ড/ গার্লফ্রেন্ডের প্রতি আবেগতাড়িতহয়ে এমন কাজ করছে, এধরনের উদাহরণ যেসব জ্ঞানীগুণী প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের মধ্যথেকে আসে, তারা মূলত কামনা বাসনা আর খেয়াল খুশিরই অনুসরণ করে যা তাদেরকে শেষপরিণতির দিকেই ধাবিত করে।

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?"[সূরা জাসিয়াঃ ২৩]

কাতাদা (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) বলেন, *"সেকোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ বোধ না করলেও এটা তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কারন সে আল্লাহকে ভয়করেনা। [তাফসীর আল তারাবীঃ ২২/৭৬]*

আর আল্লাহ মুমিনা সতী নারীদের ব্যাপারে বলেছেনতারা তাদের "বয়ফ্রেন্ড" পরিত্যাগ করবে।

"আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরাপরস্পর এক, অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে- ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহবন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" [সূরা নিসাঃ ২৫]

এই আয়াতে "মুসাফেহাত" বলতে বোঝানো হয়েছে ঐ সবব্যাভিচারিনীদের যাদের সাথে কেউ যেনা করার ইচ্ছে করলে তাকে সে তার সাথে যেনা করাথেকে বিরত রাখেনা। ইবন আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য সালাফগন "গোপনে ভিন্ন পুরুষেরসাথে মিলামেশা করে এমন মহিলার কথা বলেছেন" যার আধুনিক ডিজিটাল ভার্সন বয়ফ্রেন্ডনিয়ে ঘোরা!!

একইসাথে আল্লাহ সৎ মুমিনদের কথা বর্ণনা করেছেনযারা আল্লাহ্‌র অনুমোদিত এবং কল্যাণের বিষয়টাই গ্রহণ করে।

"আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদেরজন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[সূরা মাইদাঃ ৫]

ইবন কাসির (আল্লাহ্‌র তার উপর রহম করুন) বলেন,নারীদের ক্ষেত্রে যেমন জিনা থেকে বিরত থাকার শর্ত আরোপ করা হয়েছে তেমনি একই শর্তপুরুষের বেলাতেও আরোপিত হয়েছে।"ব্যাভিচারের জন্য নয়" বলে ওসব ব্যাভিচারিদের বোঝানো হয়েছে যারা অপরাধ করতে কেঁপেউঠেনা, তাদের কাছে যে কেউ অন্যায়ে লিপ্ত হতে আসুক তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়না। আর তারাএমন প্রেমিক যারা শুধু তাদের প্রেমিকাদের সাথেই অবৈধ যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। যাসূরা নিসায় নারীদের বলা হয়েছিল তাদের বয়ফ্রেন্ডের ব্যাপারে আর এখানে সূরা মাইদায় পুরুষদের বলা হয়েছে তাদের গার্লফ্রেন্ডেরব্যাপারে!

পরিশিষ্টঃ এই প্রশ্নটা এক বোন করেছিলেন একটা ওয়েবসাইটে। এটা মূলত অনুবাদ নয় আমি মূল কথাগুলো নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করেছি।আল্লাহ আমার সীমাবদ্ধতাকে ক্ষমা করুন। এই কাজটা গুরুত্ব নিয়ে করার কারণ দ্বীনেআসার পর অসংখ্যবার আমি এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আমার জাহেল বন্ধুদের কাছ থেকে।কেন ঐ হিজাবির বয়ফ্রেন্ড আছে? কেন অমুক হুজুর গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে? তারাও তোইসলাম পালন করে!! ইসলামে এত কঠোরতা নেই!! ব্লা ব্লা ব্লা! আমাদের আধুনিক সমাজেরদৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে খুবই ছোট একটা কাজ, "অমুকের গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ড আছে"।কিন্তু এই ছোট মনে হওয়া কাজটির জন্য ইসলামের কি কঠিন কঠিন বিধান! তাই না??

একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বাজে ব্যাপারটা হলনিজের পাপকে ছোট মনে করা কিংবা অগ্রাহ্য করা! হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে "আমি তো ইসলামপ্র্যাকটিস করি" সান্ত্বনায় নিজের পাপকে ছোট ভাবা মানুষগুলো জানেনা শয়তান তাদেরজন্য হাজারটা হারামের পথ খুলে রেখেছে এই একটা পাপকে পুঁজি করে এবং তারা অলরেডিসেসব হারামের পথে পা বাড়িয়েছে। মানুষের ইলম যদি হয় গাধার পিঠে বস্তা বোঝাই বইয়েরমত তাহলে তার কি কোন মূল্য আছে? সেই ইলমের গুরুত্ব আল্লাহ্‌র কাছে আছে যা কাজেরসমানুপাতিক! আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে অন্তর উন্মুখ সে অন্তর কখনো হারামেলিপ্ত হতে পারেনা আর লিপ্ত হলেও তাতে অবিচল থাকতে পারেনা। আল্লাহ্‌র ভয়ে বিগলিতঅন্তর কোন পাপকে নিজের ভেতর পুষতে পারেনা। অজুহাত দেখাতে পারেনা স্বীয় পাপের জন্য।এটা অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার একটা লক্ষণ। এটা একটা sign যেআপনি আল্লাহ্‌র দ্বীন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। শয়তানের হাতে নিজের প্রবৃত্তিকেসঁপে দেওয়ার নাম ইসলাম নয়। বাহ্যিক কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করে দ্বীন পালনেরমিথ্যে কিছু সান্ত্বনা হয়ত আছে কিন্তু যতক্ষণ আপনার প্রবৃত্তি শয়তানের জিম্মায়থাকবে ততক্ষন সবকিছুই শূন্য! স্রেফ শূন্য! আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলোকে হেফাজত করুন।আমীন।

- এক মুসলিম ভাইয়ের পক্ষ থেকে

একজন মুসলিম বোনের প্রশ্ন এবং তার উত্তর!!

আমার মুসলিম ভাই বোনদের ভেবে দেখার অনুরোধ রইল ...

13 September 2014

লেখকঃ সাজিদ ইসলাম

হঠাৎ করে কয়েকটা পেজের এডমিন হয়ে গেছি। যখন পেজগুলোতে ঢুকি মেসেজগুলো দেখে খুবই interesting লাগে। কইদিন আগে মেসেজে এক মেয়ে একটা প্রশ্ন করেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে এই প্রশ্নগুলো আমাদের অনেকের মনেই আছে যারা ইসলাম নিয়ে খুব একটা জানেনা! তাই আমি প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে!!

প্রশ্নঃ আমার একটি প্রশ্ন আছে --ইসলাম এ তো প্রতিটি মানুষ এর জোড়া আল্লাহ আগে থেকে বানিয়েছে ...।আয়াতটা কি সত্যি ???? তাহলে যে আজকাল অনেক ধার্মিক ছেলে মেয়ে ও প্রেম এর সম্পর্কে আছে ।। তাহলে কি আয়াতটা ভুল।??? আমি যদি আল্লাহ র কাছে আমার ভালবাসার মানুস এর জন্য দুয়া করি তাহলে।।??? আমি কি ভাবে আল্লাহ র কাছে দুয়া করব।।??? এই সম্পর্কে ইসলাম কি বলে।।??? প্রেম ভালবাসা কি খারাপ।।??? প্লিজ আমাকে জানাবেন।

উত্তরঃ

আসসালামু আলাইকুম

আপনার প্রশ্ন পড়ে মনে হচ্ছে ইসলাম নিয়ে আপনি খুবই ভয়ংকর ধারণা পোষণ করছেন। আপনার মন সন্দেহবাতিকগ্রস্থ। আমি আপনাকে স্পষ্ট করে কিছু কথা বললাম। আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন। যদিও আপনার প্রশ্নটি নারী পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই কারন আপনি কুরানের আয়াত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন। একজন মুসলিম সে যদি মনে করে কুরানের কোন আয়াত ভুল কিংবা তার কোন যথার্থতা নেই তাহলে সে আর মুসলিম থাকতে পারেনা কেননা আল্লাহ নিজেই কুরানের সত্যতা দিয়েছেন...

"(এই) সেই মহাগ্রন্থ আল কুরান এতে কোন সন্দেহ নেই, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এই কিতাব তাদের জন্যই পথপ্রদর্শক'। [বাকারাঃ২]

আর তাই কেউ যদি কুরানের আয়াত কে অস্বীকার করে তাহলে সে আল্লাহকেই অস্বীকার করে, তার মানে সে কাফির! আল্লাহ আমাদেরকে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করুন... আমীন!

এবার আপনার মুল প্রশ্নে আসি। আপনার প্রশ্নটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করলাম

- প্রত্যেক মানুষের জোড়া কি নির্ধারিত?
- প্রেম করা মানে সহজ কথায় বিয়ের আগে নারী পুরুষ অবৈধ সম্পর্ক কি হারাম?
- প্রেম করা অবৈধ হলে অনেক ধার্মিক ছেলে মেয়ে প্রেম করে কেন?
- পছন্দের মানুষের জন্য দোয়া করা যাবে কি?

জোড়া বিষয়ে কুরানের স্পষ্ট আয়াত আছে। একটা না, কয়েকটা...

"আমি প্রতিটি জিনিসই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে করে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর"। [আয যারিয়াতঃ ৪৯]

“পবিত্র নিখুঁত সেই মহান স্রস্টা, যিনি জুড়ি সৃষ্টি করেছেন সবকিছুর__উদ্ভিদের, স্বয়ং তাদের (মানুষের) এবং এমন সব কিছুরও যাদের তারা জানেনা”। (ইয়াসিনঃ ৩৬]

“হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে”। [আল হুজুরাতঃ১৩]

“হে মানুষ! তোমরা সতর্ক হও তোমাদের সেই মহান প্রভুর ব্যাপারে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, আর তাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন বিপুল সংখ্যায় পুরুষ আর নারী” [সূরা নিসাঃ ১]

এসব আয়াত থেকে একথা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি মানুষকে তার জোড়া বানিয়েই এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এমনকি উদ্ভিদও সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে আল্লাহ আমাদের জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করেছেন কিনা!

 # ইসলামে নারী পুরুষের সম্পর্কের পবিত্র আর বৈধ পন্থা হল বিয়ে। এর বাইরে অর্থাৎ “বিয়ের আগে নারী পুরুষের সম্পর্ক, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, লিভ টুগেদার এসব সম্পূর্ণ হারাম।

এটা শুধু আপনি নয়, নামাজ রোজা করা মুসলিম ছেলেমেয়েদেরও মেনে নিতে কষ্ট হয়! তার কথা তো আপনিই বললেন যে আপনি অনেক ধার্মিক ছেলেমেয়েকেও রিলেশন থাকতে দেখেছেন। আমরা যারা ইসলামটাকে একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যাবস্থা হিসেবে মেনে নিয়ে তা জীবনে প্রয়োগ করে দেখাতে পারিনা তার অন্যতম কারন আমরা ইসলামটাকে দেখি একটা হালাল হারামের লিস্ট হিসেবে। আমরা যখন আমাদের প্রবৃত্তির পূজা করতে যাই, যখন সেখানে ইসলামের বাধা আসে তখনই আগে পিছে চিন্তা না করে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে why?? Why this is haraam in islam?? আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুনতো এই প্রেম করা নিয়ে কোন প্রশ্ন কি ছোটবেলা থেকে এসেছে? না! আসেনি!

আমরা সবাই একটা নির্দিষ্ট বয়স পার করি, যে বয়সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একই সাথে খুবই ভয়ংকর! যে বয়সটাতে আবেগ, ভালোলাগা, সবকিছু পজিটিভ ভাবা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ সবকিছু আমাদের চারপাশে গিজগিজ করে! আর এই বয়সের সরলতা আর ভালোলাগার সুযোগ নেই শয়তান আর তা কাজে রুপান্তর করে দেখায় কাফির আর ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তি যারা আল্লাহর নয় নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা করে! আর তাই আজকে সমাজে স্কুলে প্রেম, কলেজে প্রেম, ভার্সিটিতে প্রেম, নাটক- সিনেমা- গল্প উপন্যাসে প্রেম! আর এসব দেখে শুধু আপনি নয় অনেকের মনে সেই একই প্রশ্ন why?? Why প্রেম is haraam in islam??

কারন আল্লাহ মহা পরিকল্পনাকারী! তিনি তার সৃষ্টির জন্য মঙ্গলজনক পন্থাই পরিকল্পনা করেছেন! তিনি মানুষের শরীর আর আত্মিক ক্ষতির আসংখ্য থেকে মানুষকে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেছেন। অতি সসীম এই মস্তিস্ক নিয়ে আমরা কখনও অসীম মহান আল্লাহর পরিকল্পনা বুঝতে পারবনা! কিন্তু আমরা এই দুনিয়াতেই তার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আর আদেশ অমান্যকারিদের পরিণতি দেখেছি, দেখছি, দেখব ইনশাআল্লাহ! আমরা একটা হারামকে শুধু হারাম হিসেবে দেখি কিন্তু একটা হারাম শুধু হারাম নয় এটা অনেকগুলো পথ যে পথে মানুষের অপকার আছে সেই পথগুলোও বন্ধ করে দেয়! ইসলামে মদ হারাম। কিন্তু মদ তো মানুষ ভাল লাগে বলেই খায়!! তাহলে হারাম হবে কেন?? এটা বোঝা আমার আপনার কাছে দুরহ তো বটেই হজরত ওমর (রাঃ) ও বুঝতে পারেননি! তার প্রার্থনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তিনবার আয়াত নাযিল করার পর হজরত ওমর (রাঃ) বুঝতে পারেন কেন মদ হারাম হল! আর আমরা এখন জানতে পেরেছি বর্তমানে বিশ্বে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ...অ্যালকোহল! মদপান! যেটা আল্লাহ ১৪০০ বছর আগেই হারাম করেছেন! ইসলামে এরকম অনেকগুলো হারামের একটি হল বিয়ে বাদ দিয়ে কিংবা বিয়ের আগে নারী পুরুষ প্রেমের সম্পর্ক! আর বরাবরের মতই ইসলামকে অন্তরে ধারণ না করে পাশ্চাত্য আর কুফরি সিস্টেমর আধুনিকতা অন্তরে ধারণ করা আজকের তরুণ তরুণী সেই হারামের ধার দারে না! অনেকের কাছে এই হারামের জন্য ইসলাম হয়ে যায় সেকেলে! তার পরিণতিও হাতে নাতে!! পেতে অবৈধ বাচ্চা নিয়ে হাসপাতালে গর্ভপাত, রিকশা- সি এন জি তে মূল্যবোধ নৈতিকতা বিসর্জন, বয়ফ্রেন্ডের লালসার শিকার হয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গণধর্ষণ, বাজারে সেক্স ভিডিও, নিজের অসম্মান, পরিবারের অসম্মান আর সবশেষে এত এত অসম্মান সইতে না পারে গলায় ফাঁস!

না না না!! হ্যাঁ আমি জানি! শুধু আপনি না সবাই এমনকি যারা এই পরিণতিগুলো বরণ করেছে তারাও বলেছিল, " না না আমরা তো সত্যই ভালোবাসি!! আমরা এসব করব না!"। সেজন্যই প্রথমে বলেছিলাম ইসলামে কোন একটা হারাম শুধু হারাম নয় এটা অনেকগুলো ক্ষতির পথও রুদ্ধ করে। যে পরিণতিগুলোর কথা বললাম নিজের প্রতি সৎ থেকে বলুনতো এই পথগুলো কে উন্মুক্ত করেছে?? সহজ উত্তর___ নারীপুরুষ অবৈধ সম্পর্ক যেটা ইসলাম হারাম করার পরও তারা মানতে চায়না! ইসলাম সেই জীবন ব্যবস্থা যা মানুষকে নৈতিকতা আর মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়! মানুষকে নিজের শরীর আর মনের নিরাপত্তা দান করে! আর তাই ইসলামে নিজের শরীর আর মনের নিরাপত্তা এসেছে পবিত্র বিয়ের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন...

"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের (মানব জাতির) মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য (বিপরীত লিঙ্গের) জুড়ি, যাতে করে তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো! এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন হৃদ্যতা- বন্ধুতা আর দয়া- অনুগ্রহ অনুকম্পা। এতে রয়েছে বিপুল নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য"। [সূরা আর রুমঃ ২১]

সুবাহানাল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন বিবাহের মাধ্যমেই নারী পুরুষ পাবে প্রশান্তি, সৃষ্টি হবে হৃদ্যতা-বন্ধুতা, দয়া অনুগ্রহ অনুকম্পা! আর এটা চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ! কিন্তু আমরা কেউ চিন্তাশীল নই! আমরা মানুষের হারাম সম্পর্ক দেখে স্বপ্নের বীজ বুনি! হলিউড- বলিউড তারকাদের "রিলেশনশিপ উইথ অমুক" দেখে ভাবি হ্যাঁ "আমারও চাই"!! সেলিনা-বিবার, এঞ্জলিনা- ব্র্যাড পিট লিভ টুগেদার দেখে ভাবি, "আহা! তারা কতই না সুখে আছে! কেন যে ইসলামে এসব হারাম করল বুঝি না!!" এসব আধুনিকতার art of living এর রঙিন পর্দাটাই আমরা শুধু দেখি! পর্দার আড়ালের কঙ্কালসার, কুড়ে কুড়ে ধ্বংস হওয়া জীবনবোধের গল্প আমরা কেউ জানিনা! আসুন কয়েকটা গল্প শুনি.....

শুধু আমেরিকাতেই একজন পুরুষ বিয়ের আগে গড়ে ৮ জন নারীর সাথে সম্পর্কে জড়ায়! তাদের সবার সাথেই অবাধ যৌনসম্পর্ক থাকে। এরপর সে একটা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারে। এবং বিয়ের পরও দুই তিনটা অবৈধ যৌনসম্পর্ক থাকে একজন আমেরিকানের। ভারতের একটি পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে (৮-১০ বছর আগের, জাকির নায়িকের লেকচার থেকে) শুধু মুম্বাই শহরেই ৫০% মেয়ে স্কুল জীবন শেষ করার আগেই তাদের কুমারিত্ত হারায়! এখন ২০১৩!! সেই % টা কি এখন ১০০%?? কিংবা তার কাছাকাছি??? আর যেসব তারকার প্রেমের সম্পর্ক দেখে আমাদের আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠে তাদের কিছু গল্পও শুনি.....

বছর কয়েক আগে প্রেম করে বিয়ে করেন তিন্নি- হিল্লোল, নওশিন, প্রমিকের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন ন্যান্সি, জনপ্রিয় তারকা জুটি হিসেবে পরিচিত ছিলেন শওকত আলি ইমন- বিজরি, প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন আরেফিন রুমি, একবছর আগে প্রেম করে বিয়ে করেন কঙ্গনা সেন শর্মা- রনবির, সেলিনা গমেজ- বিবার কে দেখে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন অনেক টিনেজার, " গভীর ভালোবাসার" বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সেক্স টেপ বানিয়েছিলেন প্রভা সেটা ছড়িয়ে পরে তার ক্যারিয়ারটাই শেষ, জনপ্রিয় আরজে নিরব একের পর এক মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে তাদের সাথে প্রতারণা করেন_ এক লাইভ অনুষ্ঠানে যা এক মেয়ে এক কথায় প্রকাশ করেছেন এভাবে, "আর কইটা মেয়ের জীবন তুই নষ্ট করবি??" এরকম আরও অনেক.....অনেক.....অনেক.....

এগুলো তো প্রেমের গল্প! তারা অনেকেই বিয়েও করেছেন এই নিষিদ্ধ প্রেমকে পুঁজি করে। তার ফলাফলটা দেখবেন না?? আসুন দেখি.....

তিন্নি- হিল্লোল, নওসিন-তার স্বামী ছাড়াছাড়ি! এখন প্রেমের ট্রায়ালে আছেন হিল্লোল- নওসিন!! ন্যান্সির ছাড়াছাড়ি! বিজরির সাথে ছাড়াছাড়ির পর অনেক মেয়ের সাথে প্রনয়ে জড়িয়েছেন ইমন! তার একজন তার বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেন! আরেফিন রুমির বিয়ে প্রথম স্ত্রীর সম্মতি নিয়ে বলে সবাই জানলেও সেটা ছিল তার নিষিদ্ধ পরকীয়ার ফল! বিয়ের পর প্রথম স্ত্রীর হাতে পায়ে ধরে সে তাকে রাজি করায়! (সুত্রঃ প্রথম স্ত্রীর রেডিও সাক্ষাৎকার)!! আর হলিউড, বলিউডের কথা বলার কোন দরকার মনে করছিনা!!

বোন! হিসাবটা সোজা!

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সেখানেই কল্যাণ আর প্রশান্তি লুকায়িত আছে! আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা অমান্য করায় আছে এই দুনিয়ায় ক্ষতি, লাঞ্ছনা, অসম্মান আর আখিরাতেও কঠিন শাস্তি! এই অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক, মোবাইল ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা, একসাথে ঘুরতে যাওয়া, long drive (মতান্তরে sex drive) অন্ধকার কফি শপ!!

অতি সহজ ভালোলাগা থেকে শুরু করে দুইটা শরীর কাছাকাছি আসলে দুর্বল চিত্তের অতি স্বাভাবিক শরীরের চাহিদা চরিতার্থ করার প্রয়াস আসবেই। আপনি বা আমরা কেউই "innocent intention" এর দোহাই দিয়ে এই চাহিদাকে হালকা করতে পারবনা! একটি হারাম রিলেশন যেখানে আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, প্রশান্তির চেয়ে বেশী থাকে সন্দেহ, শরীরকেন্দ্রিক ভোগবাদী চিন্তা, মানসিক উত্তেজনা আর ধীরে ধীরে আত্মিক অবক্ষয়! আমরা আমাদের চারপাশে এগুলোই দেখে এসেছি, এখনো দেখছি আর ভবিষ্যতেও দেখব! আর তাই ইসলাম দুইজন নারী পুরুষকে বিয়ের পবিত্র বন্ধনে বেঁধে

তাদের শারীরিক, আত্মিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে! একজন স্ত্রী, একজন স্বামী একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আস্থা, বিশ্বাসে যে সম্পর্ক তৈরি করে সেখানেই আছে যথার্থ tranquility!!

একজন গার্লফ্রেন্ড তার বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে যতটা অনিশ্চিয়তা নিয়ে ভাবে, "ও কি সত্যিই আমাকে ভালবাসে??" একজন স্ত্রী তার স্বামীর হাত ধরে ততটাই আস্থা আর বিশ্বাসের সাথে ভাবতে পারে, "He is mine"!! একজন গার্লফ্রেন্ড যতটা অনিশ্চয়তা, ভয় আর আত্মসম্মানের হুমকি নিয়ে একজন বয়ফ্রেন্ডের সাথে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের দিকে যায় , একজন স্ত্রী ঠিক ততটাই আস্থা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তার স্বামী তার পবিত্রতার সঙ্গী, তার স্বামী তার অনাগত সন্তানের বাবা!!

ইসলাম এভাবেই সুন্দর! এভাবেই পবিত্র! এভাবেই শরীর মনের ক্ষতি রোধ করে! এভাবেই দুইজন নারী পুরুষকে একেবারে আপন করে দেয়! তার জন্য কোন হারাম সম্পর্ক দরকার পড়েনা! মিথ্যার মায়ায় সান্ত্বনা খোঁজার দরকার পড়েনা!!

আপনার এই প্রশ্নটা আমাদের সবার জন্যই লজ্জার! কিছু ইসলামের লেভেলধারী কুপ্রবৃত্তির পূজারির কার্যকলাপের কারণে প্রতিনিয়ত ইসলামকে অপমানিত হয়ে হয়! একটা কথা মনে রাখবেন, মানুষকে দিয়ে ইসলামকে বিচার করবেন না__ ইসলামকে দিয়ে মানুষকে বিচার করবেন! আমার এতক্ষণের আলোচনা থেকে নিশ্চয় আপনি এটা বুঝতে পেরেছেন যে আপনি যাদের দেখেছেন তারা নিষিদ্ধ কাজ করছে। ইসলাম নিয়ে জানার দরকার পড়েনা আমরা স্কুলে বিদায় হজ্জের ভাষণ পড়েছি! যেখানে রাসুল (সাঃ) বলে গিয়েছেন, "আমি তোমাদের কাছে দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি, কুরান আর সুন্নাহ (রাসুল (সাঃ) এর হাদিস)"! সুতরাং ইসলামে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক আমরা তা কুরান সুন্নাহ থেকে শিখব কোন মানুষকে দেখে নয় হোক তারা নিজেদের পরেহেজগার বলে জাহির করে!

আপনার এই প্রশ্নটা খুবই interesting! আমরা কি পছন্দের মানুষের জন্য দোয়া করতে পারব?? অবশ্যই আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারবেন যেন আপনার জোড়ার সাথে বিয়ের পবিত্রতায় আবদ্ধ হতে পারেন! আপনার জন্য নির্ধারিত মানুষটি যেন সৎ, তাকওয়াবান হয়! সে যেন আপনার হৃদয়ে প্রশান্তির বার্তা নিয়ে আসে! But it doesn't mean that আপনি একটার পর একটা সম্পর্কে জড়াবেন আর প্রত্যেকজনকে আপনার জোড়া ভাববেন!! নিজের নফসকে সংযত করে , নিজের প্রতি, আল্লাহর প্রতি সৎ থেকে আপনি অপেক্ষা করবেন! আপনি যদি নিজের সততা বজায় রাখতে পারেন তাহলে আশা করা যায় আপনার জোড়াও সংযম অবলম্বন করে আপনার অপেক্ষায় থাকবে। আপনি সেই পুরুষটির জন্য সততার ভিত্তিতে প্রস্তুতি নেন ইনশাআল্লাহ মানুষটিকে আল্লাহই আপনার কাছে পৌঁছে দেবেন!

Allah has already written the name of your spouse for you. What you need to work on is your relationship with ALLAH (swt). He will send him to you when you are ready. It is only matter of time.

আর যদি চান আপনার মানুষটি সৎ আর ভাল হবে তাহলে আপনাকেও তা অর্জন করতে হবে। কারন আল্লাহ স্পষ্ট করেই বলেছেন...

"(জেনে রেখো) নষ্ট নারীরা হচ্ছে নষ্ট পুরুষের জন্য, নষ্ট পুরুষরা হচ্ছে নষ্ট নারীদের জন্য, (আবার) ভাল নারীরা হচ্ছে ভাল পুরুষদের জন্য, ভাল পুরুষরা হচ্ছে ভাল নারীদের জন্য, (মোনাফেক) লোকেরা (এদের সম্পর্কে) যা কিছু বলে তারা তা থেকে পাক পবিত্র; (আখিরাতে) এদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক"। [আন নুরঃ ২৬]

অনেক কথা বলে ফেলেছি। অনেক কথাই আপনি জানতে চাননি আমি নিজ থেকেই বলেছি একটা পরিপূর্ণ সমাধানমূলক উত্তর দেওয়ার জন্য। হয়তো আপনি আমার সব কথা বুঝতে পেরেছেন, হয়তো বুঝতে পারেননি, হয়তো একদিন বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদেরকে ইসলামের সমাধান মেনে নেওয়ার আর এতে আস্থা রেখে হেফাজতে থাকার তৌফিক দিন। আমরা যেন সাময়িক সুখ আর আবেগের কাছে এই দুনিয়া আর আখিরাতের যথার্থ প্রশান্তি নষ্ট না করি!

বিনীত

একজন মুসলিম যুবক!!

তোমরা যারা.....বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কের মাঝে আছো !

24 May 2015

সংকলনে - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড না থাকাটা যেন আজকাল ছেলে-মেয়েদের কাছে বেকডেটেড-এ পরিণত হয়েছে।

না! ব্যাপারটা কখনও এইরকম হতে পারেনা। ইসলাম একজন মুসলিমের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপডেটেড এবং কাল হাশরের ময়দান থেকে আপনার অবাধ মেলামেশায় তৈরি এই বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেনা। জান্নাত পেতে হলে শইতানি কর্ম ছেড়ে আল্লাহকে ভয় করতে হবে, নতুবা আমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ ' শাস্তি '।

"হে যুবক! জীবনে উন্নতি করিতে চাইলে চলার পথে আল্লাহকে ভয় কর, কঠোর পরিশ্রম কর এবং বিয়ের আগে নারীকুল প্রাণী থেকে দূরে থাকো। কিন্তু বিয়ের পর তুমি তোমার বৌয়ের সাথে প্রেম কর, কেউ তোমাকে বাধা দিবেনা কারণ সে তোমার জন্য আল্লাহ কর্তৃক উত্তম দান এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ফসল (জান্নাত) "

"হে নারী! তোমাকে আল্লাহ উত্তম মর্যাদা দিয়ে একজন পুরুষের জন্য ঈমানের অর্ধেক পূর্ণতা এবং উত্তম দান হিসাবে দুনিয়ায় আবির্ভাব করেছেন, সেই তুমি কিনা আল্লাহ'র নির্দেশ ভুলে নিজেকে লম্পটদের ভোগ পণ্যে পরিণত করছ, শালীনতা ভুলে কুচক্রের পাল্লায় ধাবিত হয়ে অশালীনতাকে জীবনের অংশ হিসাবে পছন্দ করে নিয়েছ। কিন্তু তুমি জাননা আল্লাহ কাকে তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং তোমার জন্য আল্লাহ'র নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার অপর সঙ্গীকে সতর্ক কর "

আল্লাহ আমাদের শইতানের কুমন্ত্রনাযুক্ত সুড়সুড়ি থেকে হেফাজত করুন এবং সুন্দর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার তওফিক দান করুন। আমীন।

হাদীসে এসেছে,

"যে পুরুষ এমন মহিলার দেহে কামনার সাথে হাত দেবে যে তার জন্য হালাল নয়,কিয়ামতের দিন তার হাত তার কাঁধের সাথে বাঁধা অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিতিত হবে। যদি সে ঐ মহিলাকে চুমো খায় তবে জাহান্নামে তার ঠোঁট দুটি কাটা হবে। যদি সে তার সাথে ব্যাভিচার করে তবে তার উরু কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।

এবং বলবে।...

, "আমি হারাম কাজের জন্য তার উপর আরোহন করেছি।"

তখন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং তার চেহারার গোশত খসে পড়বে।

আল্লাহ বলবেন তুমি কি করেছ?

তখন তার জিহ্বা বলবে, আমার জন্য যা হারাম ছিল তা বলেছি ; তার হাত বলবে আমি হারাম বস্তু গ্রহণ করেছি ;

তার চোখ দুটো বলবে, আমি হারামের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি।

তার পা দুটো বলবে, আমি হারামের পথে অগ্রসর হয়েছি ;

তার যৌনাঙ্গ বলবে, আমি ব্যভিচার করেছি

; রক্ষী ফেরেশতাদের একজন বলবে, আমি শুনেছি এবং অপরজন বলবে আমি তা লিখেছি।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন আমি এ সম্বন্ধে অবগত ছিলাম কিন্তু তা গোপন রেখেছি। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "হে আমার ফেরেশতাগণ! তাকে পাকরাও কর এবং আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাও। যার লজ্জা নেই তার প্রতি আমার ক্রোধের অন্ত নেই!"

(ইমাম হাফিজ শামসুদ্দীন আয যাহাবী (র) এর "কিতাবুল কাবায়ের" থেকে উদ্ধৃত)

২ .

#স্বামী স্ত্রীদের জন্যঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যখন স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি প্রেম এবং মহব্বতের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করেন আল্লাহ

সুবহানাল্লাহু তা'য়ালাও তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টি বর্ষণ করেন !

(বুখারী ৬১৯, তিরমিজি ১৪৭৯)

#আর গার্লফ্রেন্ড ওয়ালাদের জন্যঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"ব্যভিচারের একটি অংশ আদম সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে। নিঃসন্দেহে এটা সে পাবেই। দুই চোখের যিনা পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত, দুই কানের যিনা হলো যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শোনা, মুখের যিনা হলো আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশে চলাফেরা করা ।

মন ঐ কাজের প্রতি কু-প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে । আর যৌনাঙ্গ এই রকম অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে"

-বুখারীঃ ৬৩৪৩, মুসলিমঃ ২৬৫৭

প্রেম উভমুখী.....একই মঞ্চে জান্নাত ও জাহান্নাম! চাই শুধু একটু সংযমতা, একটু বশ্যতা, জাহান্নামটাকে পাশ কাটিয়ে জান্নাতটাকে খুজে নেওয়ার একটুখানি তীব্র ইচ্ছা!

৩.

যে সমাজে বিয়ে নামক হালাল সম্পর্ক কঠিন হয়ে যায়, সে সমাজে গালফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড এর নামে হারাম সম্পর্কস্বরূপ জিনা-ব্যভিচার সস্তা

হয়ে যায়!

উদাহরণস্বরূপ ঢাকা নগরীর বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, গুলশান পার্ক, ধানমণ্ডি লেকসহ বিনোদনের জায়গায়গুলোতে একটু উঁকি মারলেই বাস্তবতা টের পাওয়া যাবে!

আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিন।

৪.

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ককে থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। এটা হারাম, এটা পাপ, এটা আরো অনেক পাপের রাস্তা খুলে দেয়।

“কোন পাপ করার জন্য আপনার কামনা যত বড় হবে, সেই পাপকে এড়িয়ে গেলে আপনার ঈমান তত বড় হবে।”

– শাইখ মুহাম্মাদ বিন আল-উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)

[ফাতহ-উর-রব, পৃ ১০৫]

"এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাব যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহপ্রবাহিতা, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্যপরায়ণ?"

(সূরা আন-নিসা ঃ১২২)

" আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। [১৭: ৩২] আল-ইসরা "

৫.

প্রেম করে বিয়ে করা দম্পতির স্বামী বা স্ত্রীকে মাঝে প্রায়ই অভিযোগ করতে শোনা যায়, বিয়ের আগে অপরজনকে একরকম দেখেছে, এখন দেখছে আরেকরকম। বিয়ের আগে সে কত ভালো ছিল, অথচ বিয়ের পরই যেন তার আচরণ বদলে গেছে!

আসলে কী হয়েছে জানেন? বিয়ের আগে যখন তারা হারাম সম্পর্কে লিপ্ত ছিল তখন শয়তান সুযোগটা নিয়েছে। সে তাদেরকে একে অপরের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এরপর যখন বিয়ে হল তখন শয়তান সরে গেল আর তারা দুজনের প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়ে গেল। এবারে শয়তান আবার এল এবং এখন পরস্পরের মধ্যে বৈরীভাব সৃষ্টি করে তাদের বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করতে লাগল।

মানুষ হারাম সম্পর্কের মাধ্যমে সুখ খোঁজার চেষ্টা করে। এটা কত বড় নির্বুদ্ধিতা যে, সুখ দেওয়ার যিনি মালিক, তাঁকে অসন্তুষ্ট করে আমরা সুখী হবার চেষ্টা করি!!

--- মুফতী ইসমাঈল ইবন মূসা মেঙ্ক

৬.

Love before wedding এটি ইসলামে হারাম, ইসলাম Love after wedding মানে। ইসলাম LAW মানে কিন্তু LBW মানে না।

LAW মানে আইন, শরীয়ত। মানলে ধরা খাওয়ার চান্স নাই। LBW হলে তো পুরাই ধরা।

মানুষের মধ্যে ইদানিং খুব সচেতনতা Grow করেছে কিছু শুনলে দলিল চায়।

অত্যন্ত ভাল আলামত। তাই একজন আমার কাছে দলিলও চেয়ে বসল।

আমি বললাম আল্লাহ কি কুরআনে সুরা নূরে ৩০ নং আয়াতে পুরুষদেরকে এবং ৩১ নং আয়াতে নারীদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেন নি?

যেখানে চোখ পড়লেই ইসলামে দৃষ্টি সরানোর কথা বলেছেন সেখানে TSC ,

ধানমন্ডি লেক কিংবা ফুলার রোডের রাস্তার পাশে বসে পুতুপুতু কথা বলা ইসলাম জায়েজ করে এ চিন্তা আসল কোথায় থেকে?

মহানবী (সাঃ) বলেছেন কোন জায়গায় ছেলে ও মেয়ে একা একসাথে থাকলে তৃতীয়জন হচ্ছে শয়তান"।

'ট্রু লাভ' এর ছড়াছড়ি আর কিছু মুসলিম ছেলেমেয়ের কথা

4 November 2014

যেসব ভাইবোনেরা চারপাশের উত্তাল বন্যার স্রোতের মতন 'ট্রু লাভ' দেখে, সস্তার চাইতে সস্তা ভালোবাসা আর কামের প্রচারণা দেখেও নিজেদের সংযত রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, তাদের জন্য বলছি -- হে আমার ভাই/বোন, আপনি তো আল্লাহর জন্যই নিজেকে সংযত রাখছেন তাইনা? আপনি তো জানেন, আমাদের যেকোন সময় যে মৃত্যু আলিঙ্গন করতে পারে, এবং তার পরেই আল্লাহর কাছে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসের খবর রাখেন, তিনি আমাদের জীবনের কষ্টগুলোর, পরীক্ষাগুলোর বিপরীতে তার জন্য আঁকড়ে ধরে থাকা ভালোবাসাকে পছন্দ করেন।

আপনি যদি আপনার অনাগত মানুষটির জন্য পবিত্র থাকতে চেষ্টা করতে থাকেন, যত কষ্টই হোক, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আল্লাহর পুরষ্কার তো আমাদের কল্পনারও অতীত, তাইনা? আপনি যদি জীবনসঙ্গীর সাথে মিলিত হবার আগেই দুনিয়া থেকে চলে যান, জান্নাতে আল্লাহ আপনাকে উত্তম ও পবিত্র সঙ্গী দান করবেন। আল্লাহর জন্য কষ্ট করা আপনার প্রতিটি মূহুর্ত, প্রতিটি ক্ষণ আপনার জন্য অকল্পনীয় পুরষ্কারের ব্যবস্থা করে দিবে। আল্লাহ প্রিয় বান্দাদেরকে কিন্তু একটু বেশি করে পরীক্ষা করেন, তাদের হাতগুলো যখন দু'আর জন্য উঠে থাকে আর চোখের পানি ঝরতে থাকে -- সেই মূহুর্ত আর অন্তরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

প্রচুর দু'আ করুন। আল্লাহর কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আপনার জন্য যাকে নির্ধারিত রেখেছেন সে-ও যেন পবিত্র থাকে। সমাজের, সংস্কৃতির নখরের জঘন্যতা যেন তাকে স্পর্শ না করতে পারে। আল্লাহর ভান্ডার অফুরন্ত, আল্লাহ নিশ্চয়ই সমস্ত দু'আ শোনেন। প্রতি ওয়াক্ত নামাজে আপনি আপনার অনাগত মানুষটির জন্য দু'আ করতে থাকুন। কে জানে, হয়ত যিনি আপনার জন্য নির্ধারিত আছেন, তিনি আপনার দু'আর বদৌলতেই বদলে যাবেন, আরো উন্নত হবেন, ছুটবেন জান্নাতের পথে, ইসলামকে আঁকড়ে ধরবেন আপনার চাইতে বেশি করে।

দু'আ হচ্ছে বান্দার এমন এক মাধ্যম যা ভাগ্য বদলে দেয়, যা আমাদেরকে আল্লাহর খুব কাছে নিয়ে যায়। ভাই ও বোন আমার, দু'আ করুন, প্রচুর দু'আ করুন। ইনশা আল্লাহ খুব শীঘ্রই আল্লাহ আমাদেরকে পুরষ্কৃত করবেন। আল্লাহ অভাবহীন, দয়াময়, প্রেমময় ও অসীম দয়ালু।

-একজন মুসলিম ভাই

কোথায় পাব তারে

23 September 2014

লেখকঃ **শরীফ আবু হায়াত অপু**

আমি জীবনে যখন প্রথম 'ক্রাশ খাই', তখনও বাগধারাটার মানে জানতাম না। জানার কথাও না, কারণ বাগধারাটার মতই খাদ্যদ্রব্য হিসেবে 'ক্রাশ' বেশ আধুনিক। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে মানুষ 'ক্রাশ' খাওয়া তো দূরের কথা ক্রাশ খাওয়ার সুযোগও পেত না। আমরা ফিরিঙ্গিদের দেখাদেখি সিনেমা-নভেল-নাটকের বরাতে সভ্য-ভব্য হয়েছি, পাৎলুন পরে শিল্প-ঐতিহ্য চর্চায় নেমেছি। শেষমেশ ঘরের কোণে এক বাক্সে বাঈজীখানা, থিয়েটার আর সিনেমা হল বন্দী করে সভ্যতার সুঁইয়ের মাথায় আরাম করে বসেছি। নব্বইয়ের দশকে আকাশ থেকে সংস্কৃতির বর্ষণ শুরু হবার পরে সেই সূচবৃষ্টি থেকে বাঁচে কার বাবার সাধ্য! তো রাস্তাঘাট থেকে বনেদি বৈঠকখানা, সকাল-সন্ধ্যা 'এক লাড়কি কো দেখা তো এয়সা লাগা' শুনে বড় হওয়া আমার জন্য যা অবধারিত ছিল, তাই হয়ে গেল। আমি ক্রাশ খেলাম।

ধর্ম মানি আর না মানি, ধর্মবোধটা আমার মধ্যে সবসময়ই টনটনে ছিল। বিড়ালতপস্বীদের কিভাবে হাত করতে হয় সেটা শয়তান ভালই জানে। অধিকাংশ ক্রাশের সূতিকাগার 'স্যার'-এর বাসায় যে মেয়েটা আমার মনে ধরল তার মাথাসহ সারা গায়ে জড়ান ছিল বিশাল এক কাল চাদর। সুন্দর চেহারার সাথে ধার্মিক চলন – আর কি লাগে? পড়ার বইয়ের চেয়ে জানালা দিয়ে আকাশের মেঘ দেখতে বেশী ভাল লাগা শুরু করল। সে সামনে দিয়ে হেটে যায় আর আমি নড়তেই পারিনা। মা লক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন – কাকে পছন্দ। বললাম। তিনি বললেন –

ক. তুই এখনও মেট্রিক পাশ। তোর কি এমন যোগ্যতা আছে যার কারণে মেয়েটা তোকে পছন্দ করবে? (মোটা চশমা আর গোল-গাপ্পু চেহারা নিয়ে আমি আশার কোন কারণ দেখলাম না)

খ. তোর পায়ে সমস্যা আছে। একটা মেয়ে চাইতেই পারে যে তার স্বামী খুঁড়িয়ে হাটবে না, আর দশজনের মত সুস্থ-নীরোগ হবে। (তিতা, কিন্তু সত্যি কথা। আমি লোহার পাত লাগান জুতা পরি, দৌড়াতে পারি না)

গ. যার মাধ্যমে তুই সত্যিকার যোগ্য হয়ে উঠতে পারবি সেটা হল লেখাপড়া। কিন্তু ইন্টারে প্রেমে পড়লে আর যাই হোক লেখাপড়া হয়না। (এ মর্মে মা বিবিধ পরিসংখ্যান এবং জীবন থেকে নেয়া উদাহরণ উপস্থাপন করলেন)

আমি ক্রাশ হজম করে ফেললাম, নিবিষ্টমনে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলাম।

পরে বহুবার ভেবে দেখেছি মানুষ ক্রাশ খায় কেন বা প্রেমে পড়ে কেন। আল্লাহ সুরা রুমে এই প্রশ্নটার চমৎকার একটা জবাব দিয়েছেন – যেন সে 'সুকুন' লাভ করে। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন মানুষ অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা আর একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাবে কিসে। তিনি দয়া করে আমাদের জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যারা আমাদের 'সুকুন' দেবে। সুকুন মানে শান্তিময় একটা পরিবেশে নিমজ্জিত থাকা, যেন পাহাড়ী হ্রদের স্বচ্ছ জলে স্তব্ধ এক পাথর। সুকুন মানে জগতের ঝঞ্ঝাময় পরিবেশে হৃদয় জুড়ে থাকা প্রশান্তি, যেন ঝড়ো হাওয়ার তান্ডব আর মুষল বৃষ্টি থেকে পাথুরে প্রাসাদের দেয়া নিরাপত্তা। পুরুষ ও নারী এভাবেই একে অপরকে ভালবাসায় নিমগ্ন করে রাখে, নিরাপত্তা দেয়, প্রশান্তি দেয়, পৃথিবী রূঢ়তা থেকে পালিয়ে বাঁচবার একটা অভয়াশ্রম দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাই শুধুই দৈহিক চাহিদা কিংবা বংশরক্ষার মাধ্যম নয় – এর চেয়ে অনেক গভীর কিছু। এই গভীরতা জৈবিক ডারউইনিসম বা সামাজিক ডারউইনিসম এর চশমা পড়া বস্তুবাদী মানুষ মাপতে পারবে না।

আমাদের মানুষদের খুব বড় একটা সমস্যা হল – আমরা সব ভুলে যাই। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাসায় এসে 'বাড়ীর কাজের' কথা ভুলে যেতাম। এখন যখন ছাত্র পড়াই, তখন হামেশাই ভুলে যাই সে সময়টার কথা যখন আমাদেরও একটুও পড়তে ইচ্ছে করত না। ঠিক তেমনি আমাদের বাবা-মা-বড় ভাইরা দিব্যি ভুলে যান ভাত পেট ভরায়, মন না। 'থার্মোডাইনামিক্স', 'ফার্মাকোলজি' কিংবা 'বিজনেস ল' – সবই মস্তিষ্কে দগদগে ঘা তৈরী করে, হৃদয়ের উপশম তো দূরের কথা। তারুণ্যের অস্থির বয়স পার হয়ে আসা আমাদের অভিভাবকরা কখন আমাদের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে ভাবেন না – তাদের সন্তানেরাও রক্ত-মাংশে গড়া মানুষ। তাদেরও সুকুন চাইবার অধিকার আছে, সুকুন পাবার দরকার আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো মনে পড়ে। কলাভবনে বসন্ত উৎসবের নাম করে ভবিষ্যৎ কপোতদম্পতি হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন পড়েই কাহিল। ক্লাস, পরীক্ষা, প্র্যাকটিকাল আর ল্যাবরিপোর্ট লেখার যন্ত্রণার মাঝের সময়টা বন্ধুদের সাথে কাটত। বিকেলে-সন্ধ্যায় টুইশনি। রাতে বিধস্ত অবস্থায় যখন বাসায় ঢুকি তখন মন নিয়ে ভাবনার সময় মিলত না খুব। অর্থহীন শতেক কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখা, পাছে বিশাল পৃথিবীতে একা

হয়ে যাই! হঠাৎ কখনও বুকের বিশাল শুন্যতা কৃষ্ণ গহবরের মত সব কিছু গ্রাস করে নিতে আসত। একটু সুকুনের জন্য কত পাপের দরজায় কড়া নাড়া! শান্তি তো মিলতই না উলটো নিজের সামনে নিজে ধরা পড়ে গেলে বিবেকের তীব্র দংশন। চারপাশের সম্পর্কগুলো দেখে আর প্রেম করার ইচ্ছে জাগতো না। খালি আল্লাহর কাছে ভিক্ষে চাইতাম এমন একজন মানুষ সঙ্গীকে যে আমার সমস্যাগুলো বুঝবে। যে একান্তই আমার হবে; আর আমি যার কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারব। যে আমার ভাল-মন্দ সব সহই গ্রহণ করবে। যে আমার গুণগুলোর গোলাপ গাছে উৎসাহের পানি দেবে; দোষগুলোর আগাছা ভালবেসে দেখিয়ে দেবে, সেগুলো উপড়ে ফেলতে হাতে হাত রাখবে। এত বড় পৃথিবী – এত মানুষ; অথচ মনের মানুষের খোঁজ মিলল না। সব মিথ্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

এমনই একটা সময়ে ইসলাম সম্পর্কে জানার, পড়াশোনার আগ্রহ বাড়তে থাকল। জানার সাথে সাথে আবিষ্কার করলাম এতদিন যেসব দিয়ে পরকালের আসল জীবনটাকে ভুলে ছিলাম সেগুলোর অন্তসারহীনতা। তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম এই বিশাল পৃথিবীরই একটা ছোট কোণে আল্লাহ ঠিক এইভাবেই আরেকজনকে মানুষকে অপেক্ষা করাচ্ছেন। আমাকে যেমন তিনি তৈরী করছেন তাকেও তিনি প্রস্তুত করছেন সেই বিশেষ ক্ষণটির জন্য। যে দিন তিনি আমাকে আমার 'লিবাস', আমার সারা জীবনের পরিচ্ছদের সাথে একত্রিত করবেন। যে মুহূর্তে দু'টো মানুষ কেবল আল্লাহকে ভালবেসে, তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একসাথে জীবনের বাকি পথ পাড়ি দেবার সংকল্প করবে।

একজন মুসলিম তাই যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কেঁদে বলে, আল্লাহ এই পৃথিবীতে পবিত্র থাকতে চাই বলেই তোমার কাছে একজন পবিত্র জীবনসঙ্গী চাইছি – আল্লাহ সে হাত ঘুরিয়ে দেন না। কিন্তু তার আগে তিনি পরীক্ষা নেন, আসলেই এই চাওয়াতে কতটা আকুলতা মিশে আছে। যে জিনিসটা খুব সহজে পাওয়া যায়, তার মূল্য মানুষ বোঝে না। যা অনেক চাওয়ার পর, অনেক ধৈর্য ধরার পর মেলে তার কদর থাকে বেশী। একজন মুসলিমের জন্য তার জীবনসঙ্গীর চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই এই পৃথিবীতে। তাই আল্লাহ প্রকৃত মুসলিমদের অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ে তবেই তাকে সেটা দেন। এই পরীক্ষা যারা দেয় না, তাদের প্রাপ্তিটার মূল্যও তারা বোঝে না। আমাদের চারপাশে মিথ্যা ভালবাসার বন্যায় যারা ভেসে যায় তাদের সম্পর্কটা তাই খুব ঠুনকো হয়। সামান্য সন্দেহ, ছোট্ট ভুল বোঝাবুঝি কিংবা চাওয়া-পাওয়ার কষে আসা অংকের উত্তরে একটু গরমিল দেখলেই এ সম্পর্কের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে। যে সম্পর্ক সুকুন দেয়ার কথা ছিল, সেই সম্পর্ক নরকযন্ত্রনা নিয়ে হাজির হয়। কত মানুষ সেই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী ছেড়েই চলে যায়।

বিয়েকে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের অর্ধেক বলে সাব্যস্ত করেছেন১ এবং কিসের ভিত্তিতে এই সম্পর্কটা হবে তাও তিনি বলে দিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশের তথাকথিত মুসলিম সমাজ ইসলামের থোড়াই কেয়ার করে। যেখানে রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিভাবকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যদি কোন মুসলিম যুবকের দ্বীন এবং ব্যবহার তোমাকে সন্তুষ্ট করে তাহলে তোমার অধীনস্থ নারীর সাথে তার বিয়ে দাও। এর অনথ্যা হলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে বলেও তিনি ভয় দেখিয়েছেন।২ অথচ আমাদের দেশে ছেলে দেখা বলতে বোঝান হয় ছেলের অর্থসম্পদের পরিমাণ দেখা। চরিত্রও যে একটা সম্পদ এবং একজন মুসলিম তরুণ তার সচ্চরিত্র দিয়ে একটা মেয়েকে কতটা সুখী রাখতে পারে সেটা অভিভাবকেরা ভেবে দেখেননা। একটা লম্পট বিয়ের আগে পাঁচটা প্রেম করলেও লাখ টাকা বেতন পায় বিধায় ভাল পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। টাকার গুণে তার শত লুইচ্চামিও মোল্লা ছেলের দাড়ির চেয়ে অনেক বেশী সহনশীল মনে হয়। অথচ স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওয়াদা করেছেন কোন অভাবী যদি বিয়ে করে তবে তিনি আপন ঐশ্বর্যের দ্বার তার জন্য খুলে দেবেন, তাকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।৩ মাথায় টুপি পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া বাবারাও যখন আল্লাহর আয়াতের চেয়ে ব্যাংকের স্টেটমেন্টকে বেশী বিশ্বাস করে, তখন আমার দুঃখে বুক ভারী হয়ে আসে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কি মসজিদের তাকে ধূলার আস্তরণে বন্দী

হয়ে থাকবার জন্য নাযিল হয়েছিল? অথচ আজ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন শুধুমাত্র বিবাহিত হবার কারণে প্রতিবছর মানুষের সম্পদ ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।৪

কিন্তু দিনশেষে আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় বিয়ে একটা সামাজিক ইবাদাত। আমাদের বাবা-মার উপরেই আমাদের জোর চলে না, মেয়ের বাবা-মা তো দূরের কথা। তাই আমরা ফিরে যাই আমাদের শিক্ষক রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যিনি বিবাহযোগ্য অথচ অবিবাহিত তরুণদের শিক্ষা দিয়েছেন বিয়ে না করতে পারলে সিয়াম পালন করতে, কারণ এই সিয়াম তার জন্য ঢাল হয়ে পাপের রাশিকে প্রতিহত করবে।৫ আমি এমন মুসলিম ভাইকে চিনি যিনি বিয়ের আগে নিয়মিত একদিন অন্তর একদিন সিয়াম পালন করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, এর ফলে আল্লাহ তাকে খুব চমৎকার একজন স্ত্রী উপহার দিয়েছেন। আমরা ফিরে যাই আমাদের প্রকৃত অভিভাবক, আমাদের রব্ব – আল্লাহর কাছে, তাকে কাতর কন্ঠে বলি –

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার রব্ব, তুমি আমার প্রতি যেই অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তারই মুখাপেক্ষী৬।

হয়ত আল্লাহ মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত স্ত্রী এবং রিযিক – দুইয়েরই ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা আত্মার শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে আকুলভাবে বলি -

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ করুন৭

আল্লাহ যেন আমাদের মুসলিম তরুণ ভাইদের জন্য ইসলাম মেনে জীবন ধারণ করা সহজ করে দেন। তিনি যেন আমাদের 'লিবাস', আমাদের প্রাণসখা-দের সাথে আমাদের শীঘ্রই মিলিয়ে অস্থির একাকিত্ব থেকে মুক্তি দেন। আমিন।

২৫শে রবিউল আউয়াল, ১৪৩৩ হিজরি

রেফারেন্স

১ আল হাকিম তার আল মুসতাদরাকে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২ আল তিরমিযি তে আবু হুরাইরা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

৩ সুরা আন নূর, ২৪:৩২

৪ ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর হিউম্যান রিসোর্স রিসার্চ এর গবেষক জ্য জাগরস্কি এর গবেষণা সূত্রে

৫ সহীহ বুখারি ১৯০৫, সহীহ মুসলিম ১৪০০

৬ সূরা আল কাসাস, ২৮:২৪

৭ সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৪

আকাশে বাতাসে ভালবাসা...

20 September 2014

আমার এক বিবাহিত বন্ধুর বলা কিছু কথা নিয়ে ভাবতে ভাবতে কিছু প্রশ্নের উদয় হল মনে। সে আসলে আমাকে বলছিল তার ভালবাসার মানুষটিকে কাছে পেলে তার কেমন লাগে। তার কথায়ঃ ***"তাকে কাছে পেলে সামনে দিয়ে কে এলো গেল তা আর চোখে ধরে না।"***

বন্ধুটির কথাটি নিয়ে যতই ভাবছিলাম, ততই আমি যেন ঘোরের মধ্যে আঁটকে যাচ্ছিলাম, আর ততই নিজের ভেতর একধরনের বিস্ময় বোধ তৈরি হচ্ছিল।

মানুষ হিসেবে আমাদেরকে এমনভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আমরা পারস্পারিক ভালবাসা এবং প্রীতির জালে জড়িয়ে পড়ি। আর এই বিষয়টি আমাদের মানবীয় সত্বারই একটি অংশ বৈকি। প্রিয়জনটিকে কাছে পাওয়ায় যদি চোখের সামনে কে এলো গেল তা ধরা না পড়ে, তাহলে প্রতিদিন পাঁচবার যখন আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ স্বরূপ সালাতে প্রবেশ করি তখন আমাদের কেমন মনে হওয়া উচিৎ!!! আমার তো প্রশ্ন জাগে, সারা জীবনে কয়বার (একবারও কি হয়েছে এমনটি?) এমনটি ঘটেছে যে, সালাতে আমার মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালক, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের সামনে দাঁড়ালে সারা দুনিয়ার কথা আমি এক্কেবারে ভুলে যাই!!! প্রকৃতঅর্থে, আমরা কয়জন এই দাবি করতে পারব যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি আমার যে ভালবাসা তা পৃথিবীর অন্য যে কোন কারোর প্রতি আমার ভালবাসার থেকে বেশী?

আমরা প্রায় মনে করে থাকি যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে শুধু দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন; কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। তিনি সুখের মধ্য দিয়েও আমাদের পরীক্ষা নেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমেও পরীক্ষা করে থাকেন। আমরা যা কিছু ভালবাসি সে সকল বস্তুর মাধ্যমেও তিনি আমাদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। আর উক্ত পরীক্ষাগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা ব্যর্থ হয়ে থাকি। আমরা ব্যর্থ হয়ে থাকি কারণ হল, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যখনই আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কিছু দান করেন তখনই আমরা বুঝতে ভুল করে তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর অনুগ্রহকে পূজা করা শুরু করি। তিনি না হয়ে তাঁর দেয়া সাফল্যই তখন মুখ্য বিষয় হয়ে উঠে আমাদের কাছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যখন আমাদের ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত দিয়ে অনুগ্রহ করেন তখন আমরা তাঁকে ভুলে গিয়ে তাঁর দেয়া ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্তের পূজা করা শুরু করি। আমরা ভুলেই যাই যে, ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত ইত্যাদি নিজে থেকে আসেনি; আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এগুলো দিয়েছেন বলেই আমরা এসবের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েছি মাত্র। অন্য ব্যবসায় টাকা খোয়া যাওয়ার ভয় আছে তাই সেই টাকা দিয়ে মদের ব্যবসা শুরু করি। নয়তবা কোন সুদী ব্যাংকে টাকা রেখে ব্যবসায়ীক ক্ষতির ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকতে চাই। চাই বোকার মতই বলি আর ভাগ্যের পরিহাসই বলি- আমরা কিন্তু মাল রক্ষার জন্য মালের আসল মালিকেরই বিরুদ্ধাচারন করে ফেলি।

অনুগ্রহ করে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যখন জীবনে একজন উত্তম সঙ্গী/সঙ্গিনী জুটিয়ে দেন, তখন আমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে সেই সঙ্গী/সঙ্গিনীকে এমন ভালবাসতে শুরু করি যেমনটি ভালবাসা উচিৎ ছিল আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন'কে। ভালবাসার সেই প্রিয় মানুষটিকে নিয়েই তখন মনের মধ্যে গড়ে উঠে এক নতুন জগত। নিজের সমস্ত আবেগ-অনুভুতি, চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি আবর্তিত হয় সেই ভালবাসার মানুষটিকে কেন্দ্র করে। ভালবাসার মানুষটি যদি স্বামী/স্ত্রী না হয়ে বিবাহ বিবর্জিত সম্পর্কের কেউ হয় তাহলে তাকে কাছে পাওয়ার জন্য আমরা হারাম কর্মেও লিপ্ত হতে দ্বিধা বোধ করিনা। আর সেই মানুষটি কোন কারনে আমাদের ছেড়ে চলে গেলে তাকে নিয়ে মনের মাঝে ভালবাসার সাজানো বাগানে ঝড় বয়ে গিয়ে সবকিছুকে লন্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়;

হৃদয়খানা দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমার অনুগ্রহদানকারীকে আমাদের মালিক হিসেবে গ্রহণ না করে খোদ অনুগ্রহটিকেই আমদের মালিক বানিয়ে ফেলেছি!!

এই ধরনের মানুষদের সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের বক্তব্য হলঃ

"এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমন কিছুলোক আছে- যারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় অন্যকে সমকক্ষ স্থির করে, আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে-আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢতর..." [সূরা বাকারাহ্; ২:১৬৫]

আমাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন; তারপরও আমরা আমাদের প্রতি তাঁর দেয়া অসংখ্য অগণিত অনুগ্রহকে দেখেও না দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখি। আর তাই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সতর্ক করতে গিয়ে বলেনঃ

"হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমারা মন্দা পড়বার আশংকা করছো এবং ঐ গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করছো, (যদি এসব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতিক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, (অর্থাৎ, আযাব) আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" [সূরা তাওবা; ৯:২৪]

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্যনীয় বিষয় হল এই যে, উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যেসব জিনিসের তালিকা উল্লেখ করেছেন তার প্রত্যেকটিই হালাল এবং আমাদের কাছে প্রিয় বস্তু, যেগুলোকে ভালবাসাও বৈধ। তার চেয়েও বড় কথা হল, উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের একেকটি নিদর্শন বা নে'য়ামাত।

তবে একদিকে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন যেমন বলেনঃ

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা রূম; ৩০:২১]

আবার অপরদিকে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেনঃ

“হে মু’মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু...” [সূরা তাগাবুন; ৬৪:১৪]

উক্ত আয়াতে যে সতর্কবাণী উচ্চারন করা হয়েছে তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়।

এখানে স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের কথা উল্লেখ করার কারণ হল আমাদের প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীনের দেয়া অনুগ্রহসমূহের মধ্যে তারা অন্যতম যাদেরকে আমরা অসম্ভব রকমের ভালোবেসে থাকি। এবং পরীক্ষা হবে সেখানেই যেখানে ভালোবাসা সবচেয়ে গভীর। তাই, যদি মনে হয় গাদা গাদা শুভেচ্ছা পত্র আর লাল গোলাপ দিয়ে সেই ভালবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে, তো তাই হোক। কারণ পরীক্ষার মোক্ষম সময় তো এটাই!!

কারণ, আর যা-ই হোক, ভালবাসা আকাশে বাতাসেই উড়ছে!!

(ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত; আবদ্ আল-আহাদ ভাই কর্তৃক অনুবাদকৃত)

ভালোবাসা !!ভালোবাসা !!

26 May 2015

লেখকঃ তানভির আহমেদ আরজেল

বিসমিল্লাহহীর রাহমানের রাহিম

“ভালোবাসা”পৃথিবীর সবচেয়ে আরাধ্য এবং শিহরন জাগানো এক শব্দ। চার অক্ষরের এই ছোট্ট শব্দটিকে কেন্দ্র করে কত কিছু যে আবর্তিত হচ্ছে তার ইয়েত্তা নেই। ভালোবাসা কারো কাছে আরাধনা, কারো কাছে স্বপ্ন, কারো কাছে ধ্যান-ধারণা, কারো কাছে হয়ত জীবন। এই ভালোবাসা নিয়ে কত উপন্যাস,কত চলচিত্র, কত নাটক, কত কবিতা, কত গান, কত সুর রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার কোন হিসেব নেই। কত জন যে এই ভালোবাসার জন্যে নিজের জীবন দিয়ে ইতিহাসের (?) পাতায় নাম লিখিয়েছে তাও লিখে শেষ করা যাবে না। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় আধুনিক লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদরা ভালোবাসার জন্যে নিজের মহা মুল্যবান জীবনটাকেই বিসর্জন দিচ্ছেন। **আসলে এই ভালোবাসা জিনিসটা কি? এটা খায় নাকি মাথায় দেয়? আর ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এত আরাধনার বিষয়টা নিয়েই বা কি বলে?**

ভালোবাসা নিয়ে আমার ধ্যান ধারনা সেই কৈশোর থেকেই শুরু। বলতে পারেন অনেকটা পি এইচ ডি করার মত অবস্থা। আর ভালোবাসার সঠিক সংজ্ঞাটি আবিষ্কার করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, জীবননান্দ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পড়ে যে কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। জীবননান্দের মত হয়তবা হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাটা হয়নি কিন্তু যেটুকু হেঁটেছি তাতেই বা কম কিসে। তবুও যৌবনের আগ পর্যন্ত ভালোবাসার সঠিক রূপটি আবিষ্কার করতে পারিনি।

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের প্রারম্ভেই আমার শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ভালোবাসা নিয়ে আমার ধ্যান ধারনার পরিবর্তন শুরু। যৌবনের প্রারম্ভেই বুঝতে পারলাম ভালোবাসা নিয়ে এতদিন যা জেনেছি, শুনেছি বা বুঝেছি তার সবটাই ভুল বা মিছে। আমার শরীরে এখন ভরা যৌবন!। এখন আমার কিছুই ভাল লাগে না। সবকিছু কেমন জানি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন এক অজানা শিহরণ কাজ করতে শুরু করেছে। কেন এমন হচ্ছে? মানুষ বলে কারো প্রেমে পড়লে বা কাউকে ভালোবাসলে এমনটা হয়। কিন্তু কই আমিতো নির্দিষ্ট কারো প্রেমে পড়িনি বা কাউকে ভালোবাসিনি তাহলে কেন এমন হচ্ছে। আসলে আমি প্রেমেই পড়েছি আর সেটা প্রাকৃতিক নিয়মেই। আমার শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথেই নিজের অজান্তেই আমি প্রেমে পড়েছি। আর সেটা নির্দিষ্ট কারো প্রতি নয়। সেটা আমার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই আমাকে এই প্রেমে পড়তে হয়েছে। এই প্রেমে পড়াকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি এবং কেউ কোনদিন পারবেও না যদি না সে অসুস্থ হয়ে থাকে। তখন থেকেই আমি বুঝতে পারলাম যে,

“ভালবাসা হল বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এক অজানা আকর্ষণ যেটা কখনোও দেখা যায়না শুধু অনুভব করা যায় মাত্র।”

আসলে প্রেম-ভালোবাসা ব্যাপারটা পুরোটাই জৈবিক। **অনেকেই বলে প্রেম-ভালোবাসার উৎপত্তি হয় হৃদয় থেকে। মিথ্যে কথা, ডাহা মিথ্যে কথা।** আসলে প্রেম-ভালবাসার উৎপত্তি হয় মানুষের sex organ থেকে। একটা ছেলে বা মেয়ে যখন বিপরীত লিঙ্গের কারো প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তখন তার শরীরের সংবেদনশীল অঙ্গগুলোতে এক ধরনের সংবেদনশীলতা কাজ করে। আর সেই সংবেদনশীলতা যখন স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিস্কে প্রেরিত হয় তখন তা আরো প্রকট আকার ধারন করে। আর তখন থেকেই এই স্বাভাবিক আকর্ষণ, প্রেম বা ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। তখন শরীর বলে ওকে আমার চাই চাই। ওকে আমার পেতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? যেভাবে পাওয়া যাবে সেই পদ্ধতি বা পন্থার নামই হচ্ছে তথাকথিত প্রেম বা ভালোবাসা। প্রেম-ভালোবাসা যে একটা জৈবিক ব্যাপার সেটা অনেক সাহিত্যিকও অস্বীকার করেন নাই যদিও অনেকে মানসিক ব্যাপার বলেও চালিয়ে দিয়েছেন।

“মেয়েদের ভালো করেই জানা আছে যে বড় বড় বিষয়ে আলাপ শুধু কথার কচকচানি। আসলে পুরুষ যা চায় সেটা হলো শরীর।”-(কেন আমি আমার স্ত্রীকে খুন করি, লিও তলস্তয়)।

“আমি তাকে ভালোবাসি এই জন্যে সে দায়ী নয়,দায়ী তার দর্জি যে এই পুরুষ তাতানো জামাটা তৈরি করেছে এবং তার মা যিনি এই জামাটা তার মেয়েকে পড়ার অনুমতি দিয়েছে।”-(কেন আমি আমার স্ত্রীকে খুন করি, লিও তলস্তয়)।

“ভালোবাসায় শরীরটাই আসল- আরম্ভ, শেষ, সবই শরীর। আধা-বয়সী স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে অত ঝগড়াঝাঁটি খিটিমিটি কেন? যেহেতু তাদের শরীর পড়ে আসছে। বুড়ো স্বামী-স্ত্রীরা নানাভাবে উৎপীড়ন করে কেন পরস্পরকে? যেহেতু তাদের শরীর মরে গেচে। প্রতিহিংসা- প্রকৃতির উপর প্রতিহিংসা। ভালোবাসা জৈব। ভালোবাসা যৌন। শরীর না থাকলে কিছুই থাকেনা ভালোবাসার। বিদ্যুতের মতো। বৈদ্যতিক সংস্পর্শের মতো শরীরের সঙ্গে শরীরের প্রেম। ঘরে সবসময় আলো স্বালতে হয়না। কিন্তু সুইচ টিপলেই স্বলে ওঠে, যেহেতু তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলছে সব সময়। এও তেমনি। আছে শরীরে শরীরে বৈদ্যুতিক যোগ, তাই যখন প্রেম করোনা তখনও থাকে প্রেম। শিরায় শিরায় বয়ে চলে সারাক্ষন- তাই কথা মধুর, হাসি মধুর, কাছে আসা মধুর, দূরে যাওয়া মধুর। কলহ মধুর, কলহের পড়ে মিলন আরো বেশী মধুর, সবই শরীর।”(-রাত ভরে বৃষ্টি, বুদ্ধদেব বসু)।

“প্রেম বলতে আসলে কিছু নেই সবই কাম”-(হুমায়ূন আজাদ)।

একটা ছেলে বা মেয়ে যখন যৌবন প্রাপ্ত হয় তখনই তার ভিতর এই প্রেম বা ভালোবাসার জন্ম হয়। তখন থেকেই সে তার এই প্রেম বা ভালোবাসা শেয়ার করার জন্যে হন্য হয়ে খুজে বেড়ায় বিপরীত লিঙ্গের কাউকে। অনেকেই বলে এই প্রেম বা ভালোবাসা স্বর্গ থেকে আসে। সত্যিকার অর্থে এই ধরনের প্রেম বা ভালোবাসা আসে জৈবিক চাহিদা থেকে। যদি কারো জৈবিক চাহিদা না থাকে তাহলে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তার প্রেমে পড়াটা এক অসম্ভব ব্যাপার!।

আজকাল দেখা যায় শতকরা নব্বই ভাগ ছেলে মেয়েই কোন না কোনভাবে প্রেমের সাথে জড়িত। দেখা যায় যে ছেলেটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে বা যে মেয়েটা নিয়মিত হিজাব পড়ছে তারও একটা গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড আছে। সে জানে কাজটা হারাম বা অবৈধ তারপরেও সে নির্দ্বিধায় করছে। কেন করছে? ১৫ বা ১৬ বছর বয়স থেকে তার যে চাহিদার শুরু হয়েছে এখন ২৪ বা ২৫শে এসেও সে বৈধভাবে তার চাহিদা মেটাতে পারছেনা। তাহলে সে কি করবে? বলবেন রোজা রাখবে বা ধৈর্য ধরবে। কিন্তু সেটা কতদিন? ধৈর্যেরতো একটা সীমা থাকে। এক বছর, দুই বছর এবং তিন বছর। যখন একটা ছেলেকে বলা হয় ১৫ বছর ধৈর্য ধরার জন্যে তখন সেটা জুলুম হয়ে যায়। তখনতো তাকে একটা পথ খুজে বের করতে হবেই। মানুষের যখন একটা কাজ করার জন্যে যখন সকল বৈধ পথ বন্ধ হয়ে যায় তখনই সে অবৈধ পথে পা বাড়ায়। আমারা কেউই ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে চাইনা কিন্তু যখন কোন উপায় থাকেনা তখন তখন ঘুষ দিতে বাধ্য হই। আর সমাজ ছেলে-মেয়েদের কাছে আসার এই অবৈধ পথটার নাম দিয়েছে প্রেম- ভালোবাসা। আর নাটক, সিনেমা ও উপনাস্যের মধ্য দিয়ে চলছে এই অবৈধ প্রেম-ভালোবাসাকে বৈধতা দেয়ার প্রাণপণ প্রয়াস।

বিয়ের আগে প্রেম-ভালোবাসা এবং কিছু অপ্রিয় সত্য কথাঃ

গবেষনায় উঠে এসেছে যে, একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মধ্যকার বিবাহপূর্ব প্রেমের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যর্থ হয়, অন্য দিকে যে সকল বিয়ে এ ধরনের হারাম সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি যেগুলোকে লোকেরা *“প্রথাগত বিয়ে”* বলে থাকেন সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হয়।

একজন ফ্রেঞ্চ সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক মাঠপর্যায়ে চালানো এক গবেষনায় উঠে এসেছে,

"যখন দুই পক্ষ বিবাহ পূর্ব প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত হয় না তখন সে বিয়ের সফলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়"

প্রফেসর ইসমাঈল আবদ আল বারি কর্তৃক প্রায় ১৫০০ পরিবারের ওপর চালানো অন্য এক জরিপের ফলাফল ছিল এরকম যে শতকরা ৭৫ ভাগ "*ভালোবেসে বিয়ে*" এর পরিণতি ছিল ডিভোর্স যেখানে "*প্রথাগত বিয়ে*" এর ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগেরও কম।

এধরনের পরিণতির পেছনে কারন হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে,

১) আবেগ একজন মানুষকে অপরের ভুলগুলো সম্পর্কে অন্ধ করে তুলতে পারে; যেমনটি বলা হয়ে থাকে "ভালোবাসা অন্ধ"। একপক্ষ বা উভয়পক্ষেরই এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যেগুলো তাদেরকে বিপরীত পক্ষের জন্য তাকে অযোগ্য করে তুলতে পারে, কিন্তু এই ত্রুটিগুলো ঠিক বিয়ের পরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২) প্রেমিক-প্রেমিকারা ভেবে থাকতে পারেন যে, এই জীবন শুধুই ভালবাসার পথে অন্তহীন একযাত্রা, তাই দেখা যায় তাদের মাঝে কেবল ভালবাসার গল্প আর স্বপ্নের জাল বোনা আর একজন আরেকজনকে খুশি করার জন্যে আবেগ প্রবণ কথাবার্তা। তারা বাস্তব জীবনের সমস্যা এবং সেগুলোর সমাধান নিয়ে সে সময়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। এই প্রবণতাটি বিয়ের পর কেটে যায়, যখন তারা নানা দ্বায়িত্ববোধ ও সমস্যার মুখোমুখি হয়।

৩) প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল তিক্ত আলোচনা কিংবা পারস্পরিক তর্কে কম অভ্যস্ত হয় কেননা বেশিরভাগ সময়ই একে অপরকে খুশি করবার জন্য ত্যাগ ও মেনে নেয়ার প্রবণতা থাকে। তাদের মধ্যে যখনই কোন কথা কাটাকাটি হয় তখন একপক্ষ ত্যাগ স্বীকার করে অপর পক্ষকে খুশি করতে চায়। বিয়ের পর ঠিক উল্টোটি ঘটে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায়না এবং তাদের বিবাদগুলো সমস্যায় রূপ নিতে থাকে এবং শুরু হয় পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য কলহ ।

৪) বিয়ের আগে অর্থাৎ প্রেম করার সময় কোন পক্ষই অপর পক্ষের সত্যিকার রূপটা বুঝে উঠতে পারে না। কারন উভয় পক্ষই অন্যের কাছে নিজেকে শান্ত, ভদ্র হিসেবে তুলে ধরতে ও তাকে সন্তুষ্ট করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে কারণ না হলে ছেড়ে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। নিজেকে এভাবে উপস্থাপনের ঘটনাটা ঘটে থাকে তথাকথিত *"ভালোবাসার"* পর্যায়ে, কিন্তু কেউই সারা জীবন এই প্রবণতাকে ধরে রাখতে পারে না। ফলে সত্যিকার চিত্র ফুটে ওঠে বিয়ের পরে এবং জন্ম দেয় নানা সমস্যার।

৫) ভালবাসার সময়টা থাকে স্বপ্ন আর বিলাসিতার যা বিবাহ পরবর্তী বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়। প্রেমিক মনে করে যে সে তার প্রেমিকাকে একখন্ড চাঁদ এনে হাতে দেবে এবং সে তার প্রেমিকাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসেবে না দেখতে পেলে নিজেও সুখী হতে পারবে না। এবং বিনিময়ে প্রেমিকা তার সাথে একই ছাদের নিচে থাকবে এবং তার অন্য কোন আবদার থাকবে না, কোন অনুরোধ থাকবে না। অপরদিকে প্রেমিকা বলে "আমাদের জন্য একটা ছোট্ট কুটিরই যথেষ্ট" এবং "দু-একমুঠো ভাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে" কিংবা "তুমি আমাকে এক টুকরো অমুক অমুক খাবার এনে দিলেই আমি খুশি থাকবো"। এগুলো নিতান্তই বাস্তবতা বিবর্জিত কল্পনাপ্রসূত কথাবার্তা এবং বিয়ের পর উভয়পক্ষই এগুলো ভুলে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর আর্থিক দুরাবস্থার অভিযোগ করে এবং স্বামী স্ত্রীর চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। তখন স্বামীও পালটা অভিযোগ আনে স্ত্রীর বেশি বেশি চাওয়া-পাওয়া নিয়ে।

এগুলো এবং আরো বেশ কিছু কারনে যখন উভয় পক্ষ বলে যে আমরা প্রতারিত হয়েছি এবং বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি সেটা শুনে আমরা অবাক হই না। স্বামী আক্ষেপ করে কেন বাবা-মায়ের পছন্দের অমুক অমুককে বিয়ে করলো না কিংবা স্ত্রী আক্ষেপ করে কেন সে অমুককে বিয়ে করলো না অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই সেটা করেনি নিজেদের আকাঙ্ক্ষার কারনে। ফলে মানুষ যেটাকে ভাবে পৃথিবীর জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে অর্থাৎ তাদের "ভালোবেসে বিয়ে" টি সেটি কিন্তু কিছুদিন পরেই ভেঙ্গে যায় এবং রেখে যায় সারা জীবনের আক্ষেপ ও যন্ত্রণা। যে যন্ত্রণা কাউকে বলা যায় না, শেয়ার করা যায় না। শুধু চোখের জলে বালিশ ভেজাতে হয়।

ইসালাম কি বলে?

ইসলাম কি এই ধরনের জৈবিক আকর্ষণ বা ভালোবাসাকে অস্বীকার করে? ইসলাম কখনই এই ধরনের প্রাকৃতিক, জৈবিক ভালোবাসা বা আকর্ষণকে অস্বীকার করেনা কারণ ইসলাম একটি প্রাকৃতিক জীবন ব্যবস্থা। এটি মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেয়ার জন্যেই এসেছে। তবে ইসলাম ভালোবাসার সাথে আরও একটা জিনিস যোগ করে দেয় সেটা হল দায়িত্ব**। ইসলাম বলে যাকে তুমি এত ভালবাস, যার জন্যে তোমার এত আকর্ষণ, যার জন্যে তুমি বিশ্ব সংসার তন্য তন্য করে খুজে আনতে পারো একশ আঁটটা নীলপদ্ম, তাহলে নিশ্চয়ই তার দায়িত্ব নিতে সমস্যা হওয়ার কথা না। ইসলাম জানে দায়িত্ব না নিয়ে বিশ্ব সংসার তন্য তন্য করে একশ আঁটটা নীল পদ্ম এনেও লাভ নেই, বরুনা প্রতারনা করবেই। ইসলামে ভালোবাসা আর দায়িত্বের যোগফল হচ্ছে বিবাহ।** লিও তলস্তয়ের মতে ভালোবাসা হচ্ছেঃ

"মন যখন সবাইকে ছাড়িয়ে একমুখী হয় তাই ভালোবাসা "।(কেন আমি আমার স্ত্রীকে খুন করি)

আর এই ধরনের ভালোবাসা একমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলাম সব সময়ই বিয়ের ব্যাপারে যুবকদেরকে উৎসাহিত করে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিয়ে করার জন্যে আদেশ করে যখন কারো আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"হে যুব সমাজ, তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে কারণ তা চোখকে সর্বাপেক্ষা বেশি আনতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হেফাজতকারী। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাদের কর্তব্য রোজা রাখা। কারণ এটিই তার যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার হাতিয়ার।" -সহীহ বূখারী ও মুসলিম

আবু হুরাইরা(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল(সাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালা নিজ দায়িত্ব মনে করেনঃ ১। ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে তা পরিশোধের চেষ্টা করে। ২। সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্র হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। ৩। সেই মুজাহিদ, যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত।– তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে ।"-সুরা রুমঃ ২১

"আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে এবং তারই প্রজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে করে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো ।"-সুরা আরাফঃ ১৮৯

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের, তোমরা তাদের পোশাক স্বরুপ।"-সুরা বাকারাঃ ১৮৭

একবার চিন্তা করে দেখুন ইসলাম বিয়েকে অর্থাৎ নারী পুরুষের সম্পর্ককে কথটুকু গুরুত্ব দেয়। একজনের জীবনে পোশাক যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি ইসলামে একজন পুরুষের জীবনে নারী এবং একজন নারীর জীবনে পুরুষ টিক ততখানি প্রয়োজনীয়। আর এই প্রয়োজনটা মিটাবার পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে বিবাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসা নামের এই সব অবৈধ সম্পর্কের ফাঁদকে পায়ে মাড়িয়ে বিয়ের পিড়িতে বসার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সখী ভালোবাসা কারে কয়

14 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

"ভালোবাসা" আমার জীবনের অপার বিষ্ময়ের একটা শব্দ। সেই কৈশোর থেকে যখন বুঝতে শিখেছিলাম -- আমি এই শব্দ দিয়েই পড়েছি কবিতা, সমস্ত গানেই পেয়েছি এই শব্দ। প্রথম পড়েছিলাম রোমিও-জুলিয়েট। কী অপার বিষ্ময়কর সেই "ভালোবাসা", কী চরম বিভেদ তাদের দুই পরিবারে, তারপরেও তাদের সেই "গভীর ভালোবাসা" তাদের নিয়ে গেলো মৃত্যুর টানে। একজন বিষ খেলো দেখে আরেকজন ছুরি বসিয়ে বিদায় নিলো পরপারে। শেক্সপীয়রীয় সাহিত্য -- সাহিত্যজগতে সর্বাধিক পাঠ্যগুলোর একটা এই রোমিও-জুলিয়েট, নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি এই পাঠে শেখার চেষ্টা করেছিলাম "ভালোবাসা" কী জিনিস।

সবাই বলতো দেবদাসের কথা। সেই কিশোর বয়সেই হাতে তুলে নিলাম শরৎ রচনাসমগ্র। পথের দাবী, দেবদাস, বড়দিদি, মেজদিদি ছিলো আজো মনে রাখার মতন। কিন্তু দেবদাসের জীবনটাও সেইরকম "ভালোবাসার"। পড়তে পড়তে স্বভাবসুলভভাবে নিজেকে বসিয়ে দিতাম দেবদাসের জায়গায়। পার্বতী এলোচুলে যখন বাসায় বসে, আমি বহুদূর থেকে ফিরে তাদের বাড়িতে গিয়ে পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবার চেষ্টা করলাম কল্পনায়। তারপর নিজের সমস্ত বিশেষত্ব, প্রতিভা জলাঞ্জলি দিয়ে শহরে "ভালোবাসায়" চুর হয়ে চন্দ্রমুখীর বাহুবন্ধনে জ্ঞানহারা হবার ব্যাপারটাতে নিজেকে কিছুতেই বসাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মৃতদেহ যখন পার্বতীর বাড়ির সামনে পড়ে থাকলো --তখনো সেই "ভালোবাসার" স্বরূপ উদঘাটনপূর্বক অনুভব করতে না পারার কষ্টে আমি দেবদাসের বিশেষত্ব নিয়ে গল্প করিনি। এই মুভি (বাংলা বা হিন্দী) কোনটাই দেখতে যাইনি। আমি বইয়ের প্রতিটি লাইন যেভাবে গভীরতায় অনুভব করেছিলাম, চলচ্চিত্র সেখানে কোন প্রকৃত "ভালোবাসা" চেনাতে পারবে বলে বিশ্বাস করিনি। আরেকটু বড় হতেই হাবিবের গান খুব ভালো লাগতো -- "দিন গেলো তোমার পথ চাহিয়া, মন পোড়ে সখী গো কার লাগিয়া, সহেনা যাতনা, তোমারো আশায় বসিয়া, মানেনা কিছুতে মন আমার যায় যে কাঁদিয়া, পুড়ি আমি আগুনে..." তারপরের লাইনে ছিলো "যার কথা মন ভেবে যায়, যার ছবি মন এঁকে যায়, যারে হায় এ মন যায়, জীবনে পাবো কি তার দেখা"... শুনতে এত ভালো লাগতো যে কারো জন্য "মন পোড়াতে" ইচ্ছে করতো। শেষের লাইনটা হতাশার -- জীবনে পাবো কি তার দেখা। সুরের মূর্ছনায় ডুবে সব জলাঞ্জলি দিয়ে "কারো জন্য" অপেক্ষার ব্যাপারটাতেই "ভালোবাসা" পাওয়া যায় বলে বোদ্ধা বন্ধুদের দাবী ছিলো। আমি আরেকটা স্বরূপ পেলাম, যাকে ঠিক বিশেষায়িত করতে পারলাম না তখনো।

টাইটানিক মুভিটিতে নাকি কেট আর ডিক্যাপ্রিওর ছিলো অমর প্রেম, অনবদ্য ভালোবাসা। ভালোবাসার খোঁজে সেই মুভিটাও দেখেছিলাম। কিশোর ছেলের জন্য উষ্ণতা দেয়া ছাড়া, আর বিশাল টাইটানিকের ডুবে যাওয়ার মাঝে আমি "ভালোবাসা" খুঁজে পাইনি। তারপর "দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যাউঙ্গা" দেখতে বসেছিলাম -- সেটাও বন্ধুদের দাবীর "অপার ভালোবাসা" খুঁজে পেতে। পারিবারিক কোন্দলকে বাড়িয়ে দেয়ার "চলচ্চিত্র" কাহিনীর মাঝে বাস্তবিক "ভালোবাসা" আমার খুঁজে পাওয়া হয়নি। শুধু নায়িকার রূপসৌন্দর্যে নিজের ভিতরের বুভুক্ষু প্রেমিকটা আরেকটু 'বিরহে' পড়ে গিয়েছিলো।

এই কাহিনীর ফিরিস্তি দিতে গেলে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যাবো। হয়ত এরকম আরো অন্তত ৫০গুণ লাইন লিখতে হবে -- কেবল অভিজ্ঞতা তথা অনুভূতি/ভাবনা শেয়ার করা হবে। কিন্তু আসল কথা হলো--সবকিছুর পরেও ছিলাম অন্ধকারেই। এরপর তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনে এলাম। চারপাশে যৌবনের জয়জয়কার। এই যৌবন কোন বাধা মানে

না। এই যৌবনে আছে "ভালোবাসা" যেটা বাবা-মায়ের অগোচরে রোমান্টিক হওয়া। সিনেমার নায়িকাদেরকে নিজের "প্রেমিকা", যাকে "তোমাকে ভালোবাসি" বলে অ্যাচিভ করা হয়েছে তার মাঝে খুঁজে পাবার শত চেষ্টা। কত বান্ধবীর যে পোশাক বদলে গেলো প্রেমের ফলে! বলাই বাহুল্য, এটুকু আমি শিখেছিলাম যে অপার ভালোবাসায় পতিত হবার পর সেটা যখন শেকলে আবদ্ধ হয় -- তাকে প্রেম বলে। সবই আমার শেখা --আমার পারিপার্শ্বিকে আমি জীবনে এই শিক্ষাটা সস্তায় এবং সর্বাধিক পেয়েছিলাম -- 'ভালোবাসা কারে কয়'। দুঃখের ব্যাপার হলো -- আমি বুঝিনি। আমি ভালোবাসার "ডেফিনিশান"টাই বুঝিনি।

কোথায় আমার লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট, দেবদাস-পার্বতী, অপূর্ব-প্রভা, শাহরুখ-গৌরি সবাই আমাকে এমন কিছু দিয়ে গেলো। যা আমার জীবন দিয়ে অর্জন করা সম্ভব না। আমি ধুম করে মরে যেতে পারবো না এমন কারো জন্য যে আজ না হয় কাল মরেই যেতো। আমার যেই জীবনটার জন্য আমি দুই-তিনটি বছরের কোনরাতেই মা-কে ঘুমাতে দেইনি, লাথি দিয়ে, পেশাব করে, চিৎকার করে জীবনটা ফ্যানা ফ্যানা করে দিয়েছিলাম যেই মা'র, তার কথা না ভেবে আমি একটা নারীর জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অমর "প্রেম" রচনা করে ভালোবাসার সাক্ষর রেখে যাবো বলে বিশ্বাস করিনা, করিনি।

কবিগুরু আমার মত করেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, হয়ত সেদিনও উনি কনফিউজড ছিলেন (কবিতাটির ব্যাকগ্রাউন্ড জানিনা বলে ইউজ ভুল হতে পারে)। বেশ মজার লাইনগুলো। কবিতাংশটা অনেকটা এরকম --

তোমরা যে বল দিবস রজনী

'ভালোবাসা, ভালোবাসা' -

সখী ভালোবাসা কারে কয়?

সে কি কেবলই যাতনাময়!

সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?

লোকে তবে করে কি সুখেরই তরে এমনই দুখের আশ!

ক্যারিয়ারের চিন্তা করে বহু সায়েন্সের বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাংলা-ইংরেজি পড়বি? ওদের উত্তর ছিলো -- তাদের চাকরি-বাকরি নাই, এই জিনিস পড়ার প্রশ্নই উঠেনা। সবচাইতে কম চিন্তার গভীরতাসম্পন্ন বন্ধুরাও এই উত্তরটাই দিতো। কী চিন্তা! যেখানে বিশেষ "লাভ" নেই বলে জানে, সেখানে পা দিবে না -- এটাই সুস্থ মানবিক গুণাবলী। অথচ, নিশ্চিত "দুখের শ্বাস" সমৃদ্ধ ভালোবাসাতে কারো আগ্রহের কমতি থাকতো না। আমি জীবনের বহুবছর এই "ভালোবাসা" নাক জিনিসটার সঠিক কোন সংজ্ঞা পাইনি। উইকিপিডিয়া টাইপের সাইটের লিঙ্ক দিয়ে লেখাটার ভার বাড়াতে চাইছিনা। সংজ্ঞার চাইতে অনুভূতিটা নিয়েই ভাবছি আপাতত।

আমার বন্ধু ছিলো -- ধরি তার নাম আকাশ আর তার প্রেমিকা নীলা। তিন বছর সম্পর্কের পর তারা পরস্পরের নামে এমন সব কথা বলে বেড়াত নিজ নিজ মহলে। যেই কথা শুনলে, তার অশ্লীলতা চিন্তা করলে কানে আঙ্গুল দিয়েও নিবৃত্ত হতে পারিনি। প্রভা-রাজিবদের ঘটনাগুলো সেলিব্রিটি বলে কানে এসেছে -- অমন দেহসর্বস্ব ভালোবাসা এখন তারুণ্যের মাঝে খুব খুব বেশি এভেইলেবল। আর এই ঘটনাগুলোও একই ছাঁচে বাঁধা। যার জন্য পরান দিওয়ানা বলে সবাই জানতো -- কোন এক সময়ের স্রোতে তার প্রতিই ঘৃণা, ক্রোধ জমা হয়ে জিঘাংসা তৈরি হলো... সবচাইতে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো -- ভালোবাসি ভালোবাসি বলে যার নাম বলে এসেছি "রিলেশনশিপ স্ট্যাটাসে", পরমূহুর্তে তাকেই "খারাপ, ঘৃণা করি" বলে চিৎকার করার মাঝে যে নিজেরই অতীতকে অস্বীকার করা হয় -- সেটা কেন কারো মাথায় আসে না?

আমি ভালোবাসা কারে কয় জানিনা। তবে বুঝেছি এই ভালোবাসা আমরা শিখেছি নাটকের সুন্দরী মেয়েটার প্রতি ছেলেটার শব্দচয়ন থেকে। সিনেমায় ক্যাটরিনা কাইফের, প্রিয়াংকা চোপড়ার হাসিতে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া শাহেদ কাপুরদের অস্থির আচরণ থেকে। আমি পথ চলতে দেখি "দীঘল কালো চুলের বাঁধনে বাঁধুন প্রিয়জনকে", ভুরু প্লাক করে, চুল সিল্কি করে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে "ভালোবাসা" ধরে রাখাটা শিখেছি "গীত, কাহানি ঘর ঘর কী" টাইপ শত-সহস্র সিরিয়াল থেকে। আমার জীবনের সবচাইতে "ক্রুশিয়াল, সফিস্টিকেইটেড" তথা গুরুত্বপূর্ণ আর সংবেদনশীল শিক্ষার ভার আমি টেলিভিশনের থেকে, প্রথম আলোর নকশা আর আনন্দ আলোর পাতা থেকেই শিখছি। অথচ ঢাকার সবচাইতে দামী টিচার "আজমল" স্যারের বাসায় লাইন ধরে অ্যাডভান্স ভর্তি হয়ে নিশ্চিত করি জীববিজ্ঞান শিক্ষা।

আসলে পুরো ব্যাপারগুলোই কেবল বয়ে যেতে দেয়া! সবাই চিন্তা ছাড়াই চালিয়ে দেয়। স্কুল-কলেজের রেজাল্টটা দেখা যায় তাই বাবা মা কনসার্নড। কিন্তু জীবনের এই শিক্ষাগুলোর পরীক্ষার মার্কসগুলো দেখা যায়না বলেই এই আধুনিক বাবা-মায়েরা যার-তার হাতে সন্তানের শিক্ষাটা তুলে দিচ্ছেন। আসলে আমি ভাবছিলাম, ভালোবাসা কী আমাকে জিঘাংসু হতে শেখায়? যাকে ভালোবাসতাম, তার সামনের শুভ্র-সুন্দর দিনের সম্ভাবনা থাকলেই কেন পুরোনো প্রেমিক তার গর্দান নিতে দৌড়ে যায়? তাহলে কেন এই ভালোবাসা? তা কেবলই ভোগের জন্য? ক্ষতিই যদি করতে চাই, তাহলে তো সে আমার নিজের হলেও তার ক্ষতিতে আমার কিছু যেত আসতো না! কী ভয়ংকর আমাদের রূপ! কী ভীষণ স্বার্থপর আমরা!!

ভালোবাসা যেন কেবল আমারই কোর্টের বল! তার অন্যথা হলেই, ভোগ করতে না পারলেই পাশবিক রূপ বের হয়ে পড়ে। এই ইন্দ্রিয়ের ভালোবাসার নামই আসলে ভালোবাসা-- লোকে যাকে প্রেম নাম কহে। আমার দেহ, আমার চোখ, আমার কানকে তুমি যতক্ষণ সার্ভিস দিচ্ছ -- ততদিন আমি ভালো, তোমায় ভালোবাসি। এর অন্যথা হলেই তোমায় ঘৃণা করি। আবার এই দামী জীবনটা যাদের বছরের পর বছরের কষ্টে, ক্লেদে, পরিশ্রমে বেড়ে উঠেছে -- সেই মা-বাবা, ভাই-বোনেরাও দুধভাত হয়ে যায় একটা পুরুষ বা নারীর জন্য, যে আসলে তার ফিটনেস পরীক্ষায় পাসও করেনি। হয়ত প্রিয়জনদের কয়েক যুগের অপজিটে দশদিন কনসিস্টেন্সি রাখার যোগ্যতাও তার নেই।

যিনি আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করেছেন অপরূপ সুষমায়, যিনি আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি-মেধা দিয়েছেন তাকে ভালোবাসার কথা ভেবেও দেখিনা কখনো। উনি যদি "তোমার জন্য এত করলাম, তুমি আমার দিকে ফিরেও দেখলেনা, এখন তোমার খবর আছে" বলে আমাদের দেখে নিতেন -- হলফ করে বলতে পারি এই পৃথিবীময় কেবল ছাই দেখা যেত কমপক্ষে। আমার এই ভালোবাসা কাকে দেবো বলে অনেকদিন ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছি। জনমভোর বিদঘুটে ঘটনা, অপবিত্র-অশ্লীল ঘটনার মূলে আমাদের সমাজের লোকের কাছে শেখা "ভালোবাসা"কে খুঁজে পেয়ে আমি ক্লান্ত হয়েছি। তারপর, একদিন সংকল্প করেছি ভালোবাসাকে নষ্ট হতে দেবো না। সুন্দরতম, প্রিয়তম, প্রেমময়, অন্তরতম জন, যিনি সবসময় আমাকে ভালোবাসতেন, ভালোবাসবেন -- আমি তাকেই ভালোবাসবো। সবচাইতে বিপদের দিন যখন জগতের কেউ আমার পাশে আসবে না-- সেদিন যিনি বিচারকের সামনে আমার পক্ষে হয়ে কথা বলবেন -- তাকে ভালোবেসেই আমি স্বার্থপর হবো। এই স্বার্থপরতায় জগতে ক্ষতি নেই, এই প্রেমে নেই উন্মাদনা, নেই প্রচলিত নোংরা পরিণতি। এই ভালোবাসাতে হোক আমার জগত ভালোবাসাময়। এই ভালোবাসা ছড়িয়ে যাক সৃষ্টি চরাচরে, আমি চাই প্রেমময় পৃথিবী, আমি অর্থহীনতার মাঝে আমার ভালোবাসাকে উজাড় করে দিতে চাইনা। এক ভালোবাসাতেই ভালোবাসা ছেয়ে যাবে আমার চারপাশের মানুষের প্রতি। সবাই পাবে স্বার্থহীন ভালোবাসার স্পর্শ। যার পাওনা কেবল অনন্ত জগতেই, এই ক্ষুদ্র জীবনে তাই ভোগের স্বপ্ন নেই। অথচ সুন্দরতম ভালোবাসা আমি পাবই ইনশাআল্লাহ। এই স্বপ্নটাও দেখতে পারি কেবল উনাকে ভালোবাসবো বলেই! আর তাইতো আমি আর কাউকে হন্তদন্ত হয়ে প্রশ্ন করবো না -- "সখী, ভালোবাসা কারে কয়।"

'ভালোবাসা' তুমি কার?

6 April 2015

লেখকঃ সিরাজুম মুনিরা

মানব সন্তান এই দুনিয়ায় আসে দুজন মানব-মানবীর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। এই দুনিয়ায় এসেই সে দেখে তার চারপাশে বহু আগ থেকেই কে যেনো ভালোবাসার মহাসমারোহ সাজিয়ে রেখেছে। চারপাশের মানুষগুলোর ভালোবাসায় সিক্ত হতে হতে বেড়ে ওঠে শিশুটি। বড় হতে হতে আরো কতনা মানুষের সাথে ঘটে তার পরিচয়। এই পরিচয়ের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে আরো কত রং-বেরঙের ভালোবাসার সম্পর্ক! কিছু ভালোবাসা মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকে আমৃত্যু, আর কিছু ভালোবাসা মন নামক গহীন অরন্যের ভেতর কিছু রঙ ছিটিয়ে দিয়ে সময়ের আবর্তনে উড়ে যায় ফানুসের মতো করে। এই 'ভালোবাসা' কি? কাকে বলে 'ভালোবাসা'? এ এক অদৃশ্য সুতোর টান, যাকে না যায় ধরা, না যায় ছোঁয়া। মানুষের চর্মচক্ষু দেখতে পায়না একে। 'ভালোবাসা' নামক এই অদৃশ্য বস্তুকে শুধু অনুভব করা যায়। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন মানুষের অন্তরের ভেতর দিয়ে দিয়েছেন এক সুতীব্র অনুভূতি। এই 'ভালোবাসা', এই 'মায়া', এই অদৃশ্য সুতোর অবস্থান শুধু মানুষের সেই সুতীব্র অনুভূতির ভেতরই।

মানুষ একবার শুধু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করুক, এমন একটা জীবনের ভেতর সে দিনযাপন করে যেখানে কোন ভালোবাসার অস্তিত্ব নেই, তার চারপাশের মানুষগুলোর অন্তরে তার জন্যে একটি ফোঁটাও ভালোবাসা নেই। সত্যি কি চিন্তা করা যায় এমন একটা ভালোবাসাহীন নির্জীব, কাঠখোট্টা জীবনের কথা? মানুষ কী আদৌ পারে এমন একটা জীবনের গ্লানি আমৃত্যু টেনে নিয়ে যেতে? পারেনা। এটি আদতেই সম্ভব নয় কোন মানব সন্তানের পক্ষে। সম্ভব নয় বলেই যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনি মানুষকে 'ভালোবাসাহীন' কোনো জীবনের ভেতর নিক্ষেপ করে দেননি। মানুষতো 'মহাকাল' নামক এক অনন্ত পথের যাত্রী। সেই অনন্ত পথের মাঝখানের একটি অংশ হলো দুনিয়া নামক এই জায়গাটি। 'মানুষকে ভালোবাসার মুখাপেক্ষী করেই সৃষ্টি করা হয়েছে' এটি খুব ভালোভাবে জানেন বলেই আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন মানুষের অনন্ত পথপরিক্রমার 'দুনিয়া' নামক অংশটির দু'পাশ ভালোবাসার হাজারো সমারোহ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। তাই মানুষকে ভালোবাসা পেতে হয়, ভালোবাসতে হয়।

আচ্ছা কে আমার কাছে সবচে' বেশী ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য? আমার বাবা, মা, ভাই, বোন, আমার ঘনিষ্ট বন্ধু, আমার প্রিয়তম স্বামী, প্রিয়তমা স্ত্রী, নাকি আমার কলিজার টুকরো সন্তান? কে? নাকি যিনি আমার জীবনের এই সমস্ত প্রকারের ভালোবাসার সৃষ্টিকর্তা সেই করুনাময়, অদৃশ্য মহাপরাক্রান্ত সত্বা? যুক্তিতো বলে অবশ্যই শেষের জন। অবশ্যই মানুষের কাছ থেকে সবচে' বেশী ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য সেই আল্লাহ সুবহানাতা'লা যিনি মানুষসহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি মানুষের একমাত্র প্রতিপালক, তার মালিক। মানুষ যখন প্রতি মুহূর্তেই তাঁর করুনার মুখাপেক্ষী, তিনিই যখন মানুষের শুরু, এবং তিনিই শেষ, তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে প্রতিটি তাহলে কেন তিনি মানুষের কাছ থেকে সবচে' বেশী ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য হবেননা??

'সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসা'...আচ্ছা কেমন সেই ভালোবাসার স্বরূপ? বাবা-মা, সন্তান, মানব-মানবী, অথবা ধনসম্পদ, অথবা প্রিয় কোন জিনিষের প্রতি মানুষ যে রকম ভালোবাসা অনুভব করে সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা কি সেই রকম কিছু? 'আমি আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে এই সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসি' অথবা 'এই সমস্ত কিছুর চেয়ে আল্লাহর প্রতি আমার ভালোবাসার অনুভূতি বেশী তীব্র' এইটা সজোরে দাবী করলেই কি প্রমান হয়ে যায় যে 'আমি আল্লাহকে ভালোবাসি', 'আমার সমস্ত কিছুর চেয়ে তাঁকে বেশী ভালোবাসি'?

মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কথা বলে তখন এই ভালোবাসা একটি ইবাদাত (Worship). 'ভালোবাসা' যখন ইবাদাত হয়ে যায়, তখন সেই ভালোবাসা পূর্ণাংগভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট হতে হয়। এই 'ভালোবাসায়' যদি মানুষ আর কাউকে ভাগ দিতে চায়, তখন সেই ভাগপ্রাপ্ত মানুষটি হয়ে যায় 'তাগুত'।

তাগুত কি? তাগুত হলো এমন কেউ বা এমন কিছু যাকে বা যেটিকে আল্লাহর সাথে অথবা আল্লাহর বদলে পূজা করা হয়, ইবাদত করা হয়। অর্থাৎ মিথ্যা খোদা অথবা false God...

"অবশ্যই আমরা প্রত্যেকটি জাতির কাছে একজন বানীবাহক প্রেরণ করেছি। তারা মানুষকে বলেছে, তোমরা এক আলাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর"। (সূরা আন-নাহলঃ ৩৬)

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার এই স্বরূপ কখনো সেই ভালোবাসার মতো নয় যে ভালোবাসা মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুভব করে। মানুষ যখন স্রষ্টার ভালোবাসা এবং সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসাকে একীভূত করে ফেলে তখন মানুষ 'শিরক' করে। এই একীভূতকরনের মাধ্যমে মানুষ মূলত স্রষ্টাকে সৃষ্টির কাতারে নামিয়ে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর গুণ ও সিফাতের ব্যাপারে শিরক করে। শিরকের এই প্রকারভেদকে বলা হয়, 'Shirk in al-Asmaa' was Sifaat'

আচ্ছা কেমন হবে তাহলে আল্লাহকে ভালোবাসার স্বরূপ? একমাত্র তিনিই যখন আমার কাছ থেকে সবচে' বেশী ভালোবাসা পাওয়ার দাবীদার, কিভাবে আমি এই ভালোবাসার দাবী পূরণ করবো? অন্য কারো কথা বলবোনা। এইক্ষেত্রে নিজের জীবনের গল্প শোনাই। জীবনের বিশাল একটা সময় আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে থেকেই জীবনটাকে কাটিয়ে দিয়েছি। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইসলামের আলো যেদিন আমার দু'চোখকে ধাঁধিয়ে দিলো, সেদিন সেই আলোকে পাওয়ার জন্যে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়েই সেই আলোর সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কী প্রশান্তির সাথেই না সেই মহাসমুদ্রে সাঁতরাতে শুরু করেছিলাম আমি! এরপরও মাঝে মাঝে হঠাৎ কি যেনো হয়ে যেতো। পেছনের সেই বিভীষিকাময় জীবন হঠাৎ টেনে ধরতো আমাকে। আবার প্রানপণ সংগ্রাম চলতো নিজের সাথে। বহুকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ঝাঁপ মারতাম প্রশান্তির সেই আলোকজ্জ্বল মহাসমুদ্রে। কিন্তু প্রথম থেকেই একটি অনুভূতি আমায় প্রচন্ডভাবে পেয়ে বসেছিলো, "ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে, আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়েই তাঁকে ভালোবাসতে হবে"।

কিন্তু এই ভালোবাসার প্রকৃত স্বরূপ যে কি তা নিয়ে আমি প্রচন্ড দোটানায় থাকতাম। সেই সময় যাকে ভালোবাসা মনে করতাম, আজ বুঝি তাকে ভালোবাসা বলেনা। কারন আমি ভালোবেসেছিলাম আবেগ দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে নয়। স্রষ্টার সৃষ্ট জীবকে আবেগ দিয়ে ভালোবাসা যায়,কিন্তু স্রষ্টাকে ভালবাসতে হয় জ্ঞানের ভিত্তিতে। চেতনে, অবচেতনে আল্লাহর দেয়া সীমা লঙ্ঘন করতে করতেও বহুবার জোর গলায় বলেছি, "Yes I Love ALLAAH" !

হায়রে মূর্খ, হায়রে বেকুব! ভালোবাসার অর্থই যদি না বুঝলি, তবে ভালোবাসার দাবি করিস কেনো??

ইসলামে 'আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে' শুধু একভাবেই প্রকাশ করা যায়... 'পূর্ণ আনুগত্য', i.e., 'TOTAL OBIDIENCE to ALLAAH subhanata'la' ... এটিই হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সত্যিকার স্বরূপ। এই ভালোবাসা শুধুমাত্র কোন আবেগ-অনুভূতির নাম নয়। এই ভালোবাসা হল তার স্রষ্টার প্রতি মানুষের ইবাদাত। এই ভালোবাসা হলো আল্লাহর কাছে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির total surrender. এই পূর্নাংগ আত্মসমর্পনের নামই হলো 'আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা'।

" (হে মুহাম্মদ (সা)) বলঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো আমার অনুসরন কর। আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন"। (আলে' ইমরান ৩১)

"যে কেউ আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহরই আনুগত্য করবে"। (আন-নিসা ৮০)

শুধু মুখে ভালোবাসার দাবী করলেই তাকে ভালোবাসা বলেনা। বাস্তব কর্মই মৌখিক দাবীকে সত্যে পরিণত করে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যহীন, আত্মসমর্পনহীন ভালোবাসার দাবী মিথ্যা দাবী। এই দুনিয়ার বুকে গলার জোরে, তাকওয়াহীন বাহ্যিক কাজকর্মের জোরে সেই ভালোবাসাকে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করলেও, পরকালে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে মানবসন্তান কিছুতেই সেই মিথ্যা দাবীকে সত্যে পরিণত করতে পারবেনা।

আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে যদি ইবাদত বলা হয়, তবে অবধারিত ভাবেই এইখানে 'শিরক' এর প্রসংগও চলে আসবে। কারন চিরকাল মানবসন্তানের একটা অংশ যেমন খালেসভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছে, তেমনি একটা অংশ এই ইবাদতে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্বও স্থাপন করেছে। ভালোবাসার ক্ষেত্রেও কি মানুষ আল্লাহর সাথে শিরক করে? হুম করে... কুর'আন বলে মানুষ এই ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে শিরক স্থাপন করে।

"মানুষদের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহতা'লাকেই তাদের ভালোবাসা উচিত; আর যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহতা'আলার উপর ঈমান আনে তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমানে ভালোবাসবে। যারা আল্লাহর আনুগত্য না করে বাড়াবাড়ি করছে তারা যদি আযাব স্বচক্ষে দেখতে পেতো তাহলে এরা বুঝতে পারতো , আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর"। (আল-বাকারাঃ ১৬৫)

মানুষ যখন তার নিজের ও আল্লাহর মাঝখানে অন্য কোন কিছুর প্রতি অথবা অন্য কারো প্রতি ভালোবাসাকে আসার অনুমতি দেয় তবে সে ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর বদলে ভালোবাসার সেই জিনিষটির অথবা ভালোবাসার সেই মানুষটির ইবাদাত করে। এইভাবে টাকা বা ধনসম্পত্তি মানুষের ইলাহ হয়ে যায়, অথবা মানুষের নিজের 'নফস' বা 'desire' তার ইলাহ হয়ে পড়ে। কিভাবে? গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডকে খুব ভালোবাসেন? এতোই ভালোবাসেন যে এই রিলেশন হারাম জেনেও, এই হারাম কাজ আপনার রবকে রাগান্বিত করছে জেনেও এর থেকে বের হয়ে আসতে পারছেননা। তবে মনে রাখুন আপনি আপনার নফসের দাস হয়ে গেছেন, আপনি আপনার desire কে নিজের প্রভু বানিয়ে নিয়েছেন; যদিও মানুষ একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে নির্দেশিত হয়েছিলো।

'তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখোনি যে নিজের কামনা-বাসনাকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?' (আল-ফুরকান ৪৩)

আমার এক পরিচিত বোনের গল্প বলি। আমার চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিলেন। এক ছেলের সাথে বহু বছরের রিলেশন ছিলো। আল্লাহর দাসত্বের স্বরূপটি যেদিন তিনি অনুধাবন করলেন তখন ওই রিলেশন ছেড়ে বের হয়ে আসতে চাইলেন। ছেলেটি বললো, 'দেখো তুমি যেসব কথা বলছো সেইসব এই যুগে সম্ভব নয়। তুমি যে মাত্রার পবিত্র থাকতে চাইছো সেই মাত্রায় আজকাল কেউই থাকতে পারেনা'।

বোনটি তখন প্রশ্ন করলেন ' আজ থেকে ১৪০০শত বছর আগে যদি মানুষ এমনটা করে থাকতে পারে তাহলে আজকালকার মানুষরা কেনো পারবেনা?' এইবার ছেলেটি আমতা আমতা করে উত্তর দিলো, 'তাঁদের উপর তো আসলে আল্লাহর একটা আলাদা রহমত ছিলো, এইজন্যে তারা পারতেন'।

এইবার মেয়েটি বললো, ‘তাঁদের উপর আল্লাহর যে রহমত ছিলো সেই রহমত আমার কাছে এসে পৌঁছাতে যদি আমার আর আল্লাহর মাঝে কোন বাঁধা থেকে থাকে তবে সেই বাঁধাকে আমি সরিয়ে দিলাম”।

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর প্রতি এমনতরো আনুগত্য ও ভালোবাসাই হলো সত্যিকার ভালোবাসা, যেই ভালোবাসায় বান্দা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে অংশীদার করেনা।

মানুষের ধনসম্পদ, টাকা-পয়সা, ক্যারিয়ার সেও পারে তাগুত হতে। এই জিনিষগুলোই যখন বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তখন মানুষ এইগুলোর দাস হয়ে যায়, এইসবের ইবাদাত করে। মানুষ যখন কোন রকম বাছ-বিচার ছাড়াই ধন-সম্পত্তি, টাকার পেছনে দৌড়াতে থাকে, এই দুনিয়ার সমস্ত কিছুকেই একমাত্র monetary value দিয়েই যাচাই-বাছাই করতে চাই, শুধু মাত্র টাকার হিসেবেই লাভ-ক্ষতি খুঁজতে চায় তখন মানুষ সেই ধন-সম্পত্তির দাস হয়ে যায়। তাঁর বিবেককে সে বিক্রয় করে দেয় ‘Money’ নামক নকল ইলাহের কাছে। রাসূল (সা) এইসব টাকা, ডলার, পাউন্ড ও দিরহামের দাসদের জন্যে ধ্বংসের সংবাদ দিয়ে গেছেন। “ধ্বংস হয়ে গেছে দিরহামের দাসেরা” (সহীহ বুখারী, ৮ম খন্ড, হাদীস নং ৪৪৩)

অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদারিত্বের গুনাহ কখনোই ক্ষমা করবেননা। এ ছাড়া আর বাকি যে কোন গুনাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। (আন-নিসা ৪৮)

একটি অসাধারণ হাদীসে কুদসী দিয়ে শেষ করছি।

আল্লাহ সুবহানাতা’আলা বলেন, “হে আদম সন্তান’ আমি তো তোমাকে কেবলমাত্র আমার জন্যে সৃষ্টি করেছি। আর অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করেছি তোমার জন্যে। তোমার উপর আমার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত, তা তুমি কখনোই ভুলে যেওনা। যেসব জিনিষ আমি তোমার জন্যে সৃষ্টি করেছি তাতে তুমি এতোটা মনোনিবেশ করোনা যাতে তোমাকে যার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর কথাই তুমি ভুলে যাও। হে মানুষ! আমি তোমাকে আমার নিজের জন্যে সৃষ্টি করেছি, এটাকে তুমি খেলা মনে করোনা। আমিত তোমার রিযিক ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছি। অতএব তুমি হতাশা ভারাক্রান্ত হবেনা।

হে মানুষ! তুমি আমাকে পেতে চাইবে, তবে তুমি আমাকে পাবে। আর তুমি যদি আমাকে পেয়েই যাও তবে তো সবকিছুই পেয়ে গেলে; কিছুরই অভাব বা অপূর্ণতা থাকলোনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকেই হারিয়ে ফেলো, তাহলে তুমিই হবে সর্বহারা। আমিই যেনো হই তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়”।

স্টুপিড কিউপিড অথবা ভ্যালেন্টাইনের দিবস

24 September 2014

লেখকঃ শরীফ আবু হায়াত অপু

পরম করুণাময়-দয়াশীল আল্লাহ'র নামে শুরু করছি -

সত্যিকার মুসলিম আসলে কারা? যারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা এবং সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা অনুভব করে নিজেদের আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের অর্থ সন্তুষ্টিচিত্তে আল্লাহর পথ নির্দেশনা মেনে নেয়া যাতে উভয় জীবনেই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায়। জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম সম্পূর্ণ - এর মূলনীতিগুলো সময় কিংবা স্থানের সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল নয়, তা চিরায়ত। ইসলাম আমাদের যা দিয়েছে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাতে পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করবার কোন অবকাশ আমাদের নেই। তাই বিদায় হাজ্বের দিন মহান আল্লাহ নতুন কোন জীবন-দর্শন বা ইবাদাতের পদ্ধতি বা মানবরচিত বিধানের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ বন্ধ করে দিলেন –

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পুর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পুর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" [মায়িদাহ, ৫-৩]

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এতে জাগতিক ও পারলৌকিক - উভয় জীবনের মঙ্গল নিহিত আছে। আমাদের দ্বীনে এমনভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে যেন তা কোন বিষয়কে অবহেলা না করে আবার কোন বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়িও না করে। ইসলামে মূল লক্ষ্য আত্মা কিন্তু তাই বলে দৈহিক চাহিদা উপেক্ষিত নয়। আমাদের প্রাধান্য পরকাল কিন্তু তা প্রাপ্তির মাধ্যম ইহকাল।

"আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না" [কাসাস, ২৮-৭৭]

এমন একটা সময় ছিল যখন মুসলিমরা পথ দেখাত, প্রভুভক্ত কুকুরের মত অন্যদের পিছনে হাটত না। একটা সময় ছিল যখন মুসলিমরা হুকুম দিত, হুমকি শুনতনা। যে মানুষেরা ইসলামকে আকঁড়ে ধরে রাখে আল্লাহ তাদের আঁকড়ে ধরার অনুপাতে ক্ষমতা ও সম্মান দেন, যারা যতটা ইসলাম ত্যাগ করে আল্লাহ তাদের সে অনুপাতে লাঞ্ছিত করেন।

আজ আমরা কোন দোষে সম্মানের সেই স্থান থেকে সরে এসেছি তা রসুলুল্লাহ (সাঃ) আগেই জানিয়ে দিয়ে গেছেন, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনায় তা এভাবে এসেছে–

"তোমরা প্রতি পদে পদে তোমাদের আগে যারা এসেছে তাদের পদক্ষেপ অনুসরণ করবে, এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্তেও ঢোকে তবুও তোমরা তাই করবে।" সাহাবিরা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কথা বোঝাচ্ছেন?" রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তারা নয়তো কারা?"

ইহুদি–খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যবাদী–পুঁজিবাদীরা সবসময়ই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এখনও তারা মুল্যবান সময় ও সম্পদ ব্যয় করে নানামুখী পরিকল্পনা করছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তাদের মেধা–মনন–অর্থ ব্যবহার করছে। শিক্ষা, বিনোদন, তথ্য–প্রযুক্তি, রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র, তথা–কথিত আলোকিত মানুষ এমনকি ইসলামের লেবাসধারী হুজুর ইত্যাদি হাতিয়ারের সুকৌশল ব্যবহারে ইসলাম বিহীন "মডারেট মুসলিম" তৈরি করতে চাইছে। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর একটা সুন্নাত – কেউ যদি পরিশ্রম করে তবে সে অধ্যাবসায় অনুযায়ী ফল পাবেই, এদের ষড়যন্ত্র যে কতটা সফল হয়েছে তা বুঝতে গুলশানের রাস্তায় চারপাশ দেখতে দেখতে এক বিকেল হাটলেই হবে। হাঁটার কষ্ট বাচাতে চাইলে ইসলাম কেন অগ্রহণযোগ্য এ সংক্রান্ত ব্লগগুলো পড়া যেতে পারে বা ফারুকীর দু'একটা নাটকও দেখা যেতে পারে।

আমাদের সামনে ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে একটা বিশেষ দিন আসছে, ভালোবাসার নামে অনাচারের ঢেউ বয়ে যাবার দিন আসছে। আসলে শয়তানের কৌশলগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম – ভালোর সুদৃশ্য মোড়কে মন্দকে উপহার দেয়া। যে ছেলেটা ঢাবির টিএসসির বারান্দায় বসে প্রেমলীলা করছে তাকে যদি জানানো যায় যে তার বোন ফুলার রোডের ফুটপাথে বসে একই কাজ করছে তবে প্রতিক্রিয়াটা হবে দেখার মত, অথচ তার প্রেমিকাও হয়ত কারো বোন। দুঃখজনকভাবে তার নিজের অন্যায়টা তার চোখে পড়ছেনা।

ইসলামের মূলনীতি হল যে কোন কিছু করতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে ইসলামে তার অনুমোদন আছে কিনা অথবা তা নিষিদ্ধ কিনা। ভ্যালেন্টাইন'স ডে করব কিনা তার আগে তার সম্পর্কে জানতে হবে। বিভিন্ন বর্ণনার ইতিহাস থেকে নিচেরটাই আমার কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে –

পৌত্তলিক গ্রিসে ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে বসন্ত উৎসব করা হতো। সে সময় সম্রাট দ্বিতীয় ক্লদিয়াস তার সৈন্যদের জন্য বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন নামে এক তরুণ খ্রিষ্ট ধর্ম–প্রচারক এই নিষেধ অমান্য করে গোপনে সৈন্যদের বিয়ে পড়াতে থাকে। এই ব্যাপারটা বেশিদিন গোপন থাকেনি, ভ্যালেন্টাইন ধরা পড়ে যান এবং কারারুদ্ধ হন। কারাবাসে তিনি এক কারারক্ষকের মেয়ের প্রেমে পড়েন। কিন্তু খ্রিষ্টান ধর্মের একটি বিকৃত নীতি যে ধর্ম যাজকেরা বিয়ে বা নারীদের সাথে কোন সম্পর্কে জড়াতে পারবেনা সেহেতু ভ্যালেন্টাইন শেষমেশ এই প্রেম অস্বীকার করেন। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি তার এই অনুরাগ দেখে সম্রাট তাকে একটি লোভ দেখান। তিনি প্রস্তাব দেন তিনি ভ্যালেন্টাইনকে ক্ষমা করবেন ও নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দেবেন এই শর্তে যে তাকে খ্রিষ্ট ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। ভ্যালেন্টাইন অস্বীকৃত জানালে তাকে ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। একসময় গ্রিস খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করল। পৌত্তলিক বসন্ত উৎসবের নতুন নাম হলো ভ্যালেন্টাইনের দিবস। সাধু ভ্যালেন্টাইনের নতুন নতুন মহিমা শোনা যেতে লাগল – তিনি প্রেমের শহীদ, ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যদিও খ্রিষ্টান ধর্মে বিবাহ বহির্ভুত প্রেম এবং ক্যাথলিক ধর্ম-প্রচারকদের যে কোন ধরণের প্রেমই নিষিদ্ধ তবুও তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম ভ্যালেন্টাইনের দিবস একটি উদযাপনযোগ্য দিবস কিন্তু তারপরেও এটি খ্রিষ্টানদের উৎসব, মুসলিমদের নয়। পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই দিবসের চমৎকার একটা আবেদন আছে। লাল গোলাপ, লাল পোষাক, প্রেম-বার্তা বহনকারী কার্ড, বিভিন্ন উপহার বিপণনের এমন সুব্যবস্থা ভোগবাদীদের লাল-গালিচা অভ্যর্থনা পেয়ে দিনটি হয়ে উঠলো "পবিত্র প্রেম" আর "নিখাঁদ ভালোবাসার" প্রতীক। পুঁজিবাদী প্রচারযন্ত্র যুদ্ধ-বিদীর্ণ পৃথিবী আর অপবিত্র প্রেম-খাঁদযুক্ত ভালোবাসাময় পচা সমাজগুলোতে ভালোবাসার সুবাতাস বইয়ে দেয়ার পবিত্র দায়িত্ব তুলে নিল নিঃসীম নিঃস্বার্থে। আর আমরা হতভাগা মুসলিমরা পশ্চিমাদের জাতে উঠার এমন সুযোগ পেয়ে সস্তা প্লাস্টিকের নকল ময়ুর-পাখনা খুঁজে মরলাম।

একজন মুসলিম মূলত তিনটি কারণে ভ্যালেন্টাইনের দিবস পালন করবেনা -

প্রথমত, ইসলামে নবআবিষ্কৃত যে কোন উৎসবই প্রত্যাখ্যাত। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, "যে দ্বীন ইসলামে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে, তা প্রত্যাখান করা হবে।" [বুখারি ও মুসলিম] মুসলিমদের আলাহর প্রদত্ত উৎসব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এটা আল্লাহ ও তার রসুলকে ভালোবাসার নিদর্শন। আর আমাদের উৎসব হল ঈদ। আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মাদিনায় আসলেন তখন তিনি তাদের জাহিলিয়াতের দু'টি দিন উৎসব হিসেবে পালন করতে দেখেন। তিনি তখন বলেন যে, "আল্লাহ এই দু'টি দিনের পরিবর্তে তোমাদের আরো উত্তম দু'টি দিন দিয়েছেন, আর তা হলো - ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতর" [আহমাদ, নাসাঈ, আবু-দাউদ]

দ্বিতীয়ত, একজন মুসলিম বিবাহ বহির্ভুত কোন প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতে পারেনা। আর বিবাহিতদের ক্ষেত্রে একজন স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বছরের একদিন ঘটা করে ভালোবাসবে, অন্যান্য দিন উদাসীন থাকবে এমনটি হতে পারেনা। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন হাদিসে উপহার, সুন্দর কথা এবং ভাল ব্যবহার দিয়ে পরস্পরের মন জয় করতে বলেছেন এবং তা সবসময়, হঠাৎ একদিন নয়।

তৃতীয়ত, আমরা ইসলামের এই মূলনীতি সবসময় মনে রাখব যে "যে যেই সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত" [আহমদ , আবু দাউদ]

আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বর্তমান সংস্কৃতিকে করুণার চোখে দেখব, মুগ্ধবোধ নিয়ে নয়। আমাদের মায়া হবে কারণ তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ তাদের সত্য থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর মোহ তাদের এমনভাবে গ্রাস করে ফেলছে যে তারা নিজেদের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তার অবকাশও পাচ্ছে না। কি হতভাগা এই মানুষেরা। আমরা তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ দেব বারবার, আর বলব - "রদীতুবিল্লাহি রব্বাও ওয়া বিল ইসলামি দীনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিইয়া"।

আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে সন্তুষ্ট, ইসলাম কে দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট আর মুহাম্মাদ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নাবি হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

আল্লাহ আমাদের ঘুমিয়ে থাকা বিবেকগুলো কে জাগিয়ে দিন।

ভালোবাসা দিবসে আপনি যা যা করতে পারেন

29 October 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

ভ্যালেন্টাইন ডে নামের ব্যভিচার ও বেহায়াপনা দিবসে আপনি যা করতে পারেন:

- যেসব জায়াগাতে এইসব নির্লজ্জতা হতে থাকে, সেসব জায়গায় থাকলে আপনি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই নিঃশঙ্কোচে দূরে থাকা প্রথম কাজ। সম্ভব হলে বাইরে বের হবেন না বা ঐসব এলাকায় যাবেন না যেখানে কামের কেনাবেচা হয় বা উন্মুক্তভাবে নির্লজ্জতার প্রদর্শনী হয়।

- টেলিভিশন থেকে দূরে থাকুন। সমস্ত বাণিজ্যিক প্রোডাক্টই এখন মূলত কাম বিক্রি করে পণ্যের আগে। তাই তাদের প্রচারণাও হবে অসুস্থ ও জঘন্য। যতদিন এইসব সংস্কৃতি উলটে দিতে না পারছেন, দূরে থাকাই শ্রেয়।

- নিজেকে এবং পরিবারকে আগুণ থেকে বাঁচানোর নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। তাই আপনার পরিবার পরিজনকে এইসব নিকৃষ্ট সংস্কৃতি থেকে রক্ষা করুন।

- প্রচুর দু'আ করুন আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনী এবং সন্তান-সন্ততিদের জন্য। বিশেষ করে যারা অবিবাহিত, আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন আল্লাহ আপনার সঙ্গীটিকে এই নগ্নতা-বেহায়াপনার চারপাশ থেকে দূরে রাখেন।

- সারাক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করুন। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান যেন তিনি আপনাকে রক্ষা করেন যাবতীয় অন্যায়-পাপাচার-কামাচারের হাত থেকে। আল্লাহ আপনাকে কেমন করে রক্ষা করবেন তা আপনি একসময় খেয়াল করে অবাক হয়ে যাবেন।

- ব্যাভিচারের ধারে-কাছেও না যেতে আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ। গাইর-মাহরাম কারো সাথে আলাপ আপনার অন্তরকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। আপনি তখন নামাজেও হয়ত কারো কথা স্মরণ করতে শুরু করতে পারেন। তাই, অন্তরকে কেবল আল্লাহর জন্যই রাখুন। অন্তরকে সুরক্ষিত রাখতে আপনার জন্য গাইর মাহরাম নারী অথবা পুরুষদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

- শয়তান মূলত সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হয় অন্তরে, মনে। তাই নিজেকে কোন প্রকার ছাড় দিবেন না শয়তানের ওয়াসওয়াসা কানে ঢুকার জন্য।

- সবশেষে মনে রাখবেন। এইরকম নোংরামির সমাজে যারা নিজেদের চরিত্রকে সুরক্ষিত করে চলবে, আল্লাহ তাদের প্রতি তার রাহমাতের স্রোতধারা বইয়ে দিবেন। হয়ত এটুকু চেষ্টা আপনার হিদায়াতের কারণ হতে পারে। আল্লাহ

আপনাকে চরিত্রবান জীবনসঙ্গী দান করবেন এবং আখিরাতেও আপনি সার্বিকভাবে মুক্তি লাভ করবেন। তাই ন্যুনতম চেষ্টাটুকু করে হলেও জাহান্নামের আগুণ থেকে দূরে থাকুন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন থেকে এবং আমাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করুন। আল্লাহ আমাদের উত্তম চরিত্র অর্জনের তাওফিক দান করুন যা তিনি ভালোবাসেন।

ভ্যালেন্টাইন ডে – ইসলামে কি ভালবাসা নিষিদ্ধ?

21 October 2014

লেখকঃ ইমরান হেলাল

" তাঁর নিদর্শনসমূহের মাঝে আরো হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের মাঝে প্রশান্তি খুঁজে পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এর মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে "। [সূরা আর-রুম, আয়াত ২১]

পরবর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানু ওয়াতায়ালা তাঁর আরো কিছু উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, আল্লাহ নারী-পুরুষের মধ্যকার এই সম্পর্ককে স্থান দিয়েছেন রাত-দিন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শনের সাথে। অতএব বুঝতেই পারছেন, ভালোবাসা মোটেই তুচ্ছ কোন বিষয় নয়!

" কোন সন্দেহ নেই, তার জন্য আমার ভালোবাসায় কোন ঘাটতি ছিল না " - বলুন তো, কথাগুলো কার হতে পারে?

এই বাক্যটি ছিল আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, যা তিনি বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে। তিনি এখানে কোন লুকোছাপা করেননি। তিনি শুধু এও বলেননি যে, আমি তাকে ভালো বাসতাম। বরং তিনি তাঁর ভালোবাসাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সবার মাঝে প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ইসলামে ভালোবাসা মোটেই নিষিদ্ধ কিছু নয়। আল্লাহর জন্য আপনার মুসলিম ভাইকে ভালোবাসা, এমনকি সেই কথা তার কাছে প্রকাশ করার প্রতি বরং ইসলামে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কিংবা আপনি যদি সৎ এবং আল্লাহভীরু কোন দম্পতির দিকে তাকান, দেখতে পাবেন আল্লাহ 'বিয়ে' নামক অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বন্ধনের মাধ্যমে তাদের কত কাছে নিয়ে এসেছেন। এটি কোন হলিউড বা বলিউড মুভির কৃত্রিম ভালোবাসার গল্প নয়, বরং পারস্পরিক সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির এক অনন্য বহিঃপ্রকাশ।

ভালোবাসা যদি ইসলামে অনুমোদিতই হবে, তাহলে ভালোবাসা দিবস পালন করতে অসুবিধা কোথায়?

এক্ষেত্রে প্রথম সমস্যাটি হলো ভ্যালেন্টাইন ডে'র উৎপত্তি প্রসঙ্গে।

একেবারে সঠিক সময়টি নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও, ভালোবাসা দিবসের মূল উৎপত্তি যে রোমান প্যাগানদের কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তারা দেবতা লুপারক্যালিয়াসকে সন্তুষ্ট করার জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারিতে এক ধরনের উৎসবের আয়োজন করতো, যেদিন পশু উৎসর্গ করা হতো এবং লটারির মাধ্যমে পরবর্তী এক বছরের জন্য নারীপুরুষের জোড়া নির্ধারণ করা হতো।

খৃস্টানরা যখন রোম দখল করে নেয়, ভালোবাসা দিবসের প্রেক্ষাপটও খৃস্টানীকরণ করা হয়। লুপারক্যালিয়াসের জায়গা দখল করে নেয় সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন। ক্যাথলিকদের ইতিহাসে মোটামুটি তিন জন বিখ্যাত সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের উল্লেখ

পাওয়া যায়। একজন তো নিজেই প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, একজন জেলারের মেয়ের প্রেমে পড়ে প্রাণ দিয়েছিলেন আর একজন সম্রাটের অলক্ষ্যে সৈনিকদের মধ্যে ঘটকালি করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ঘটনা যাই হোক, পোপ গেলিয়াসই সর্বপ্রথম খৃস্টান মোড়কে ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে হাজির হন। তার আগে পিউরিটানদের সময় এটি নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে আমেরিকায় এটি জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর মূল উৎস এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে ভ্যালেন্টাইন ডে'র জনপ্রিয় প্রতীক কিউপিডের মাঝে, যা ছিল রোমান প্যাগানদের ভালোবাসা আর সৌন্দর্য্যের দেবতা।

আর আজ আমরা মুসলিম নামধারীরা তবে কি পালন করছি? ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে কি আমরা সন্তুষ্ট নই? আল্লাহর জন্য যখন প্রতিটি মুসলিমকে সারা বছরই ভালোবাসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা কেন সেই ভালোবাসাকে একটিমাত্র দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ করতে চাচ্ছি?

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা মূর্তিপূজা করতো, আমরা কি তবে সেই রোমান প্যাগানদের পূজার মাঝেই সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি না?

ভেবে দেখুন, আপনি কি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে চান নাকি আমাদের প্রতিপালক যে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার জন্য আমাদের মনোনীত করেছেন, তার অন্তর্ভুক্ত থাকতে চান। আমরা আজ কেন অন্যের ধারস্থ হচ্ছি, যখন আমাদের জন্য সামনে আছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত? যিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা আর দাম্পত্য জীবনের এক অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন আমাদের জন্য।

"... প্রত্যেক জাতির জন্য আমি সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট শারিয়াহ এবং নির্দিষ্ট পন্থা ..." [সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৪৮]

" প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি ইবাদাতের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, যা তারা অনুসরণ করে থাকে ..." [সূরা হাজ্জ, আয়াত ৬৭]

অর্থাৎ কিবলা, সালাত বা সিয়াম যেমন নির্দিষ্ট, মুসলিমদের উৎসবও তেমনি নির্দিষ্ট। কুফফার, তা সে মুশরিকই হোক আর আহলে কিতাব, তাদের অনুকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। আর তাদের প্রচলিত সংস্কৃতি এবং আচরণের চেয়ে বেশি অনুকরণযোগ্য আর কি-ই বা হতে পারে?

আল্লাহ ইসলামকে সকল দেশের সকল মানুষের জন্য উপযোগী করে পাঠিয়েছেন। অতএব জীবনের চলার পথে কোন ক্ষেত্রেই কুফফারের অনুকরণ মুসলিমদের প্রয়োজন নেই। এটি পরীক্ষিত সত্য যে, যারা কাফিরদের অনুকরণ করে বা তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করে, তাদের মাঝে কাফিরদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং তারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেও ইতস্তত বোধ করে না। তারা মুসলিম, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামের বীরযোদ্ধাদের ভুলে গিয়ে কাফিরদের নিয়েই সার্বক্ষণিক মেতে থাকে।

দ্বিতীয়ত ভালোবাসা দিবসের নামে দেশব্যাপী অশ্লীলতা আর বেহায়াপনার যে প্রদর্শনী চলে, তা কোনভাবেই ইসলামে অনুমোদিত নয়। পার্টি, কনসার্ট আর মোজ মাস্তির নাম দিয়ে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা, হাসিঠাট্টা বা উপহার আদানপ্রদান; কোনটাই ইসলামে বৈধ নয়। দাড়িওয়ালা বয়ফ্রেন্ড, হিজাবি গার্লফ্রেন্ড, নিষ্পাপ দৃষ্টি কিংবা যাস্ট ফ্রেন্ড নাথিং এলসের কোন স্থান ইসলামে নেই। সাবধান!! কোনভাবেই যেন আমরা ভ্যালেন্টাইন ডে'র ইসলামাইজেশন করার চেষ্টা না করি।

তাহলে? ইসলামে ভালোবাসার প্রক্রিয়াটা কেমন?

যাকে আমরা সত্যিই ভালোবাসি, এই পৃথিবীতে আমরা তার উন্নতি এবং পরকালে তার সফলতা কামনা করি। আমরা ঠিক সেভাবেই তাদের ভালোবাসি যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের শিখিয়েছেন। এর জন্য আমাদের কোন অবৈধ সম্পর্ক আর বেহায়াপনার আশ্রয় নিতে হয় না কিংবা হাজার হাজার টাকা এবং আমাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে হয় না।

" যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য বিয়ের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই " [সুনান ইবন মাজাহ]

" আর বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, আর তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে, আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে। তাদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহ করুণা বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্মানিত এবং মহাজ্ঞানী " [সূরা তাওবা, আয়াত ৭১]

আমরা শুধু নির্দিষ্ট একটি দিনেই আমাদের ভালোবাসাকে সীমাবদ্ধ করে রাখি না। আর আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন কোন উৎসবও আমরা পালন করি না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " যে ব্যক্তি কারো অনুকরণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত "।

সবাইকে ভালবাসলাম, কিন্তু যিনি আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আমাদের জন্য আলো বাতাস মাটি পানি সৃষ্টি করেছেন, যার আরো অসংখ্য নিয়ামাতের মাঝে আমরা দিবানিশি নিমজ্জিত, তাঁকে ভালোবাসার কথা কি আমাদের একবারও মনে হয়েছে?

তাঁর প্রিয়তম মানুষটিই শিখিয়ে গেছেন সেই দু'আ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " দাউদ আলাইহিস সালামের একটি দু'আ ছিল এরকম, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাই আপনার ভালোবাসা; আপনাকে যারা ভালোবেসেছে, তাদের ভালোবাসা এবং এমন কাজ যা আপনাকে ভালোবাসার কাছাকাছি নিয়ে যায়। হে আল্লাহ! আমার নিজের সত্তা, পরিবার এবং শীতল পানির চেয়েও আপনার প্রতি ভালোবাসা, আমার কাছে প্রিয়তর করে দিন "।

ভালোবাসা, ভালোবাসি ! ভালবাসতেই হবে !

ভালোবাসা না আসলে জোর কইরা আনতে হবে.....

13 September 2014

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"দোস্ত কোনদিন প্রেম করেছিস??"

"না মানে ইয়ে..... বিষয়টা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে"

"আরে এটা হইল গিয়ে জলের মত সহজ! খালি মাইয়ার ফোন নাম্বারটা নিবি, কিছুক্ষণ ভুজুং ভাজুং দিবি! ব্যস প্রেম হয়ে গেল!"

"বলিস কি? এত্ত সহজ?"

"তুই না পারলে আমারে দিস। পটাইয়া তোরে দিয়া দিমু!"

"না মানে ইয়ে... পটাবি তুই, প্রেম হবে তোর সাথে আবার আমার কাছে আসবে কিভাবে?"

"তুই কি মনে করিস? আজকাল পুলা মাইয়ারা যার সাথে প্রেম করে তাঁর সাথে কবুল বইলা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকে? প্রেম প্রেম ভাব নিয়ে এরা একটা সঙ্গী খোঁজে! সেটা আমি হলেও যা তুই হলেও তা!"

এটা অনেক আগে এক বন্ধুর সাথে আমার আলাপচারিতা। এরপর থেকে আজ অবধি জীবনের এই ছোট পরিক্রমায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের আনাচে কানাচে বিদ্যানদের সংস্পর্শে এসে অনেককিছু জেনেছি, শুনেছি, বুঝেছি। এই ধরণের অনুভূতিনির্ভর বিষয়গুলোতে আমার চিন্তা বেশ ভালো কাজ করে কিন্তু প্রতিভার সবটুকু খরচ করেও **"ভালোবাসা"** নামক বিষয়টাকে কোন ব্যাকরনিক সংজ্ঞায় আনতে পারলাম না। প্রচলিত ধারায় আমাদের চারপাশের তরুণ তরুণীদের ভাবালুতামার্কা বোধহীন আবেগের নাম যে ভালোবাসা নয় সে বিষয়ে অবশ্য আমার কোন সন্দেহ নেই। চারপাশের মানুষগুলোর ভালোবাসা নামের অতি পবিত্র বিষয়টা নিয়ে অবিশ্বাস্য রকম অর্থহীন, জঘন্য এবং জোর করে মাথায় ঢুকানো সস্তা আবেগে মিশে যাওয়া দেখে অবাক লাগে। ভালোবাসা যেখানে একটা অনুভূতির ব্যাপার সেখানে আমরা আচরণ কই রোবটের মত, অন্ধ- কানা- বোবার মত। ভোগবাদী , সেকুলার এই সমাজে অন্য সবকিছুর মতই মানুষের অন্তরের একান্ত আপন অনুভূতিও আজ যেন ফর্মালিটি মেইনটেইন করা। ভালবাসতেই হবে, একটা বয়ফ্রেন্ড/ গার্লফ্রেন্ড লাগবেই, এই করতে হবে, সেই করতে হবে.....হবে... হবে.....হবেই হবে! ভালোবাসা না আসলে ভালোবাসা জোর করে আনতে হবে! কি বুঝে আসলো?? স্কুল ড্রেস পরে মামাতো খালাতো ফুফাতো কিংবা হাউজ টিউটর না হয় বন্ধুদের কারো সাথে বাবা মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে **প্রেম প্রেম খেলা** করে বেড়ানো মেয়েটা আসলে কি বোঝে? হঠাৎ করে দেখা কোন মেয়েকে পটিয়ে গার্লফ্রেন্ড বানানোর পেছনে অকালপক্ক প্রতিভার সবটুকু খরচ করা, রাতের পর রাত জেগে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলা আর অর্ধেক মাসেই বাড়ীতে মাস খরচের টাকা চাওয়া ছেলেটার কাছে ভালোবাসা আসলে কি? চারপাশের এই ছেলেমেয়েগুলো আসলে চলে ভাড়া করা মগজ দিয়ে। হিন্দি সিরিয়ালের পরকিয়া প্রেম দেখে এরা প্রেম করতে শেখে, *'আমি তুমি- তুমি আমি'* গান কবিতায় এরা আবেগের রসদ খোঁজে। গল্প উপন্যাস পড়ে নিজেদেরকে নায়ক নায়িকার আসনে বসিয়ে 'কল্পনা' আর 'বাস্তবতা' গুলিয়ে জীবনে রং লাগায়। সেলুলয়েডের রঙিন পর্দায় নায়ক নায়িকাদের চিত্রনাট্যের আবেগি উপস্থাপন দেখে প্রেমের স্বরূপ বোঝে! ইমরান হাশমি-মল্লিকাদের অর্ধনগ্ন শরীরের ভাষা থেকে সহজলভ্য পর্ণগ্রাফিতে জৈবিকতার আদিম রীতিতে এরা 'ভালোবাসা' টাকে 'শরীর' দিয়ে replace করে। এরা বোঝে শরীর শরীর খেলায় বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া ফ্যান্টাসিটুকুই ভালোবাসা! তাদের কাছে তাই ভালোবাসা মানে প্লেটোর ভাষায়, *"love is a serious mental disease."* **wrong! সিরিয়াসলি it's wrong!** এই ধরণের ভাড়া করা মগজপ্রসুত ভালোবাসা কোন অন্তরের রোগ নয়, এটা প্রবৃত্তিপূজা। স্রেফ desire. ভালোবাসা মানে যদি অন্তরের সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া, কোন কাজে মন বসাতে না পারা, জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করা বোঝায় তাহলে সেটা ভালোবাসা নয়। আমরা এসবকে ভালোবাসা মনে করলেও আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এটাকে **hawa** বলেছেন। আর যারা এই desire কে অন্ধভাবে পূজা করে তাদেরকেই আল্লাহ্ বলেন,

"অতঃপর তারা যদি তোমার কোথায় সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রেখ, তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ ছাড়া যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।" [সূরা আল কাসাসঃ ৫০]

আমাদের প্রবৃত্তিকে মহান আল্লাহ্‌র কাছে সঁপে দেওয়ার বদলে আমরা সেই প্রবৃত্তিরই পূজা করি আর স্রষ্টার দেওয়া রহমতের একটা মাধ্যমকে পূজা করে সেখানেই রব খুঁজি! আল্লাহ্ বলেন, **"আর কোন কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরুপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার মত তাদের ভালোবাসে। কিন্তু যারা মুমিন আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালোবাসা প্রগাঢ় এবং কি উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত যে , সমস্ত শক্তি আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।" [সূরা আল বাকারাহঃ ১৬৫]**

কারো প্রতি ভালোবাসা যদি হয় পরিবারকে ছেড়ে যাওয়া, ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া নিজেদের সম্মান, আত্মমর্যাদা, আমাদের শরীর, আমাদের দ্বীন এমনকি ত্যাগ করা সেই মহান আল্লাহ্‌কেও যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুন্য থেকে তাহলে ***we are not in 'love'. we are slaves to that 'love'.*** আল্লাহ্ বলেন, **"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি যে তার খেয়াল খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনে শুনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আর তার কানে ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহ্‌র পর আর কে (আছে যে) তাকে সঠিক পথ দেখাবে? এরপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?"[সূরা আল জাসিয়াহঃ ২৩]** ভালোবাসার মরীচিকার আবরণে আমাদের এই কুপ্রবৃত্তির সাময়িক আনন্দ প্রকৃতপক্ষে যথার্থ স্বাধীনতা নয়____ ***বন্দীশালা!*** এই বন্দিত্ব মনের, শরীরের আর আত্মার!

একটা সহজ বিষয় একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খেয়াল করি। মনে করুন আমি কোথাও যাচ্ছি। যাওয়ার আগে আপনার হেফাজতে আমার একটি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি যার বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না। আমার জিনিসটার safety হিসেবে আমি কি আপনাকে কিছু direction দিয়ে যাবনা? এটা এমন করোনা, অমন করোনা ইত্যাদি ইত্যাদি...! তাই নয় কি? আর এই যে আপনার মনে ভাল লাগা-মন্দ লাগার অনুভূতি আছে, আপনি কাউকে পছন্দ কিংবা অপছন্দ করতে পারেন। এই অসাধারণ রহমত আল্লাহ্ আপনাকে দিলেন তা কোন rules and regulations ছাড়াই?? কোন security ছাড়াই? rules and regulations ছাড়া আপনি একটা চার চাকার গাড়ী চালাতে পারেন না, একটা ছোট্ট মোবাইল চালাতে পারেন না..... কিছুই করতে পারেন না আর **যে মনটার খবর মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেনা সেই মনের ভালোবাসা ধরে রাখার জন্য rules and regulations কি তিনি দেবেন না?** এই ভালোবাসার কোন security কি নেই? **"আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের (মানব জাতির) মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য (বিপরীত লিঙ্গের) জুড়ি, যাতে করে তোমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো! এ উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন হৃদ্যতা- বন্ধুতা আর দয়া-অনুগ্রহ অনুকম্পা। এতে রয়েছে বিপুল নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য"। [সূরা আর রুমঃ ২১]**

সুবহানাল্লাহ এখানে boyfriend/girlfriend এর কথা নেই, *'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, মরে যাব' 'তুমি জীবন তুমি মরণ'* অসার বাক্যে বিলিয়ে দেওয়া ভালোবাসার অপচয় নেই, শরীর ভোগের চাটুকারিতা নেই__ আছে **নিরাপত্তা, প্রশান্তি আর পবিত্রতা!** যে ভালোবাসা মহান আল্লাহ্ দিয়েছেন তিনিই ভালো জানেন কিভাবে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। আমরা আমাদের মনটাকে purify করব। আমাদের ভালোবাসাকে নির্ধারণ করব শুধুমাত্র আল্লাহ্র দিকে। আর গ্রহণ করব তার অনুমোদিত সিস্টেমটাকে যাতে আমাদের কাছে গচ্ছিত রাখা তার আমানত হেফাজতে থাকে। আমরা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে আস্থা রাখব, আমাদের কুপ্রবৃত্তির উপর নয়! অফিসে যার অধীনে চাকরী করি আমরা তার কথা শুনতে বাধ্য, তাকে সন্তুষ্ট করাই থাকে মূল লক্ষ্য। তার অধীনে থাকা অন্য কারো কথা শুনলে ফায়দা কিছু নেই। ঠিক তেমনি আমাদের প্রতিটি ভালোলাগা, মন্দলাগা, আবেগ অনুভূতির কেন্দ্র যেন হয় মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। তিনি তার সন্তুষ্টি অর্জনের যে মাধ্যমগুলো দিয়েছেন সেই মাধ্যমকে ভালোবেসে দুনিয়ায় হয়ত কিছু সময়য়ের সস্তা আবেগের মাখামাখি সম্ভব কিন্তু আত্মার কোন সন্তুষ্টি এতে নেই। দোকানে সিডি কিনতে গেলে আমরা সিলভার ডিস্ক এর সন্ধান করি প্রিন্ট যেন ভালো হয়। সেই একই ছবি অতি সস্তা পাইরেটেড সিডি কিনে দেখা যায় কিন্তু তাতে সন্তুষ্টি থাকে না। মহান আল্লাহ্কে এবং তার জন্য কাউকে ভালোবেসেই আমরা পাব যথার্থ সন্তুষ্টি। আর নোংরা সমাজের এই নাটুকেপনা আবেগ, সস্তা লোকদেখানো মেকি সুখ সুখ ভাবের প্রেম, নারী পুরুষের শরীর ভোগের এই জগন্য 'বিশ্বাসযোগ্যতা' ফুটপাতের পাইরেটেড সিডির মত! চাকচিক্য দেখে মনে হবে 'পাইলাম ইহাকে পাইলাম', কিন্তু মোড়ক খুললেই বেরিয়ে আসে ঝাপসা- বিবর্ণ জীবনের এক সস্তা চিত্রনাট্য। আর তাই ভালোবাসা হবে আল্লাহ্র জন্য, নফস এর জন্য নয়। তাকেই ভালবাসব যাকে মহান আল্লাহ্ ভালবাসেন, তাকে ভালবাসবো না যাকে আল্লাহও ভালোবাসে না! আল্লাহর জন্য যে ভালোবাসার সুত্রপাত হয় সেই ভালোবাসা নিজের স্বার্থে কখনো অগ্রাহ্য করা যায়না! আমাদের মা রা কেন আমাদের এতোটা ভালোবাসে?? কেন অপরিচিত দুইজন নারীপুরুষ হঠাৎ একদিন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরকে এতো বেশী ভালবাসতে পারে?? কারণ এই সম্পর্কগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত রহমত থাকে! ঠিক সেভাবেই একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে তখন সেই ভালোবাসার সবটুকু জুড়ে থাকে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা! শুধুমাত্র এই কারনেই একজন বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ড যতো সহজে "break up" শেষে "new relationship" শুরু করতে পারে একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী তাঁর স্বামীকে অত সহজে জীবন থেকে বাদ দিতে পারেনা যেভাবে পারেনা মা তাঁর সন্তানকে ছাড়তে!! শুধুমাত্র এই কারণে একজোড়া কপোত কপোতী যতো সহজে অন্ধকার ঝোপ-ঝাড় কিংবা রিকাশা সি এন জির সুযোগ নেয় একজন স্বামী আর স্ত্রীর কাছে তা এতো সহজ নয়! কারণ একজন স্বামী জানে তাঁর স্ত্রীর সম্মান তারও সম্মান যেভাবে একজন স্ত্রী জানে তাঁর স্বামীর ভালোবাসা শুধুই তাঁর এটা রাস্তা ঘাঁটে দেখানোর বিষয় নয়!! একজন বয়ফ্রেন্ডর কাছে তাঁর গার্লফ্রেন্ড যেন দোকান থেকে কেনা আইসক্রিম!! সে জানে আইসক্রিমটা তাঁর কিন্তু খুব অল্প সময়য়ের জন্য একটু পরেই সেটা পানি হয়ে যাবে!! আর তাই একজন বয়ফ্রেন্ডের মনে তাঁর গার্লফ্রেন্ডের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা, সহমর্মিতার চেয়ে বেশী থাকে শরীরকেন্দ্রিক ভোগবাদী ক্ষণস্থায়ী আবেগ যেটা কঠিন বরফ থেকে খুব সহজেই পানি হয়ে যায় দোকান থেকে সদ্য কেনা আইসক্রিমটার মত!! সুবহানাল্লাহ! ইসলাম মানুষকে সেই সম্পর্করেই অনুমতি দিয়েছে যেখানে একে অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থাকবে, সহানুভূতি থাকবে, শ্রদ্ধাবোধ থাকবে আর থাকবে একে অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ গুলো একেবারে নিজেদের মত করে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ!! আর তাই একজন মুসলিমের কাছে বিয়ে মানেই একটা বউ আর কয়েকটা বাচ্চা-কাচ্চা নয়! বিয়ে মানে অনেক কিছু..... অনেক কিছুর মাঝে ঠিক কয়েকটা লাইনে বোঝানো যায়না এমন কিছু হয়তো!!

আর কয়দিন পর বিশ্ব ভালোবাসা দিবস নামের এক গাঁজাখুরি দিবস আমাদের সবার কাছে ভালোবাসা বিসর্জনের উপলক্ষ্য হয়ে আসবে প্রতি বছরের মতই। আধুনিক শরীরে বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে গর্বের সাথে বেড়ে উঠা আমাদের তরুণ তরুণী প্রস্তুত এই দিনটির জন্য। কিছু অতি উৎসাহী কিংবা চলাক পুরুষ তৈরি নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে। কিছু বোকা নারী প্রস্তুত ভালোবাসার মোড়কে ব্যবহৃত হতে। সারা পৃথিবী জুড়েই এদিন নষ্টামির চূড়ান্ত হবে। ভালোবাসা দিবসের

নামে এই ভোগ দিবসে আমাদের অনেক বোনই জীবনের অনেককিছু হারিয়ে নোংরা সমাজ থেকে বুঝতে শিখবে 'this is love'. ধর্ষকদের বৃহস্পতি যখন তুঙ্গে তখন এই দিনে ধর্ষণও পাবে এক নতুন মাত্রা! লাল নীল রঙিন স্বপ্ন, টকটকে লাল গোলাপ, হাজারো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি– অঙ্গীকার সাথে স্বপ্ন ভাঙ্গার অশ্লীল আনন্দ সবকিছু ছাপিয়ে শুন্য জীবনের আধ্যাত্মিক পরাজয়ে এই মানুষগুলো কোনদিনও জানতে পারবেনা ভালোবাসা আসলেই কি!! ভালোবাসার আল্লাদিপনার চূড়ান্ত রকম হাস্যকর রেডিও প্রোগ্রামগুলো গায়ে প্রচণ্ড রকম জ্বালা ধরায়। 'ভালোবাসা' কে 'শরীর' দিয়ে relpace করা মানুষগুলোর জন্য প্রথম আলোর মত স্বীকৃত প্লাটফর্মও আছে। *অমুককে ভালবাসতাম...কথা হল.....দেখা হল.....সেক্স হল.....ব্রেক আপ হল.....এখন আমি কি করব??* এই ধরণের চটি প্রশ্নগুলো মানুষ যতটা গর্বের সাথে করে ততটা গর্বের সাথেই উত্তর আসে এই চটি গল্পগুলোকে সাহস যোগানো আমাদের আকাইম্মা সুশীলদের কাছ থেকে। এ যেন আর্টসেলের গানের মতই *"তোমরা কেউ কি দিতে পার প্রেমিকার ভালোবাসা"* দিয়ে শুরু মাঝখানে *"দেবে কি জীবনে কেউ উষ্ণতার সত্য আশা"* আর শেষমেশ *"ও আমায় বোঝে নি, অতল এ ভালোবাসা সে তলিয়ে দেখে নি"* সান্ত্বনায় আবার "তোমরা কেউ কি দিতে পার প্রেমিকার ভালোবাসা" .....!! অন্ধ ভালোবাসার পূজারী মানুষগুলোর কাছে ছবির ডায়লগের মতই "ভালোবাসা জাত ধর্ম বর্ণের ঊর্ধে" যেন এক মুখস্থ ছবক! প্রথম আলোর নকশায় (১ জানুয়ারি ২০১৩) এক মেয়ে অন্য ধর্মের এক ছেলের সাথে প্রেমে পড়েছে। সে বলছে ধর্ম পরিবার ত্যাগ করে তারা একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে না। তার প্রশ্নের একটা অংশ হুবুহু দিচ্ছি, *"সে বলে ভবিশ্যতের কথা ভেবে আমি যেন বর্তমান সম্পর্কের এই সুন্দর সময়টা নষ্ট না করি। সে চায় আমি অন্য কাউকে বিয়ে করার আগ পর্যন্ত তার সাথে সম্পর্ক রাখি।"* আর এতে জনাবা সারা যাকের কি সুন্দর সাহস দিলেন, *"যত দিন চলছে চলুক এই মনোভাব নিয়ে চললে ক্ষতি বৈ লাভ কিছু হবেনা। তুমি নিজে বিবেচনা করে দেখ তুমি কোনদিকে যেতে চাও। অনেক ক্ষেত্রে গভীর ভালোবাসা যেকোনো বাধা অতিক্রমও করতে পারে। বিষয়টা ভেবে দেখ।"* এই মাথামোটা মেয়েগুলা "গভীর ভালোবাসা যেকোনো বাধা অতক্রমও করতে পারে" আশ্বাসে নিজদের ভালোবাসার গভীরতা যাচাই করতে ঘর ছেড়ে পালাবে না তো কি করবে??? আমরা কবে বুঝব এসব ভালোবাসা নয়__ desire! ভয়ংকর desire! কত গর্বের সাথে আমরা ভালোবাসার মোড়কে নোংরা গল্পগুলো বলে বেড়াই। কত নির্লজ্জভাবে boyfriend/girlfrend এর সাথে নিত্যদিনের লীলা গল্প সবাইকে জানিয়ে বেড়াই। আমি জানি এই ছেলেমেয়েগুলো একদিন ঠিকই অন্য কারো সাথে কবুল বলে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। ফেসবুকে 'in a relationship' দিয়ে যার বাহুডোরে সুখ সুখ ভাব নিয়ে প্রফাইল পিক আপলোড হয় একদিন এই প্রফাইল পিকে হয়তো সন্তান কোলে ছবি থাকবে___ শুধু বাবা ভিন্ন!! দুইজনের হাসিমুখের ছবি বসার ঘরের ছবির ফ্রেমে টাঙ্গানো হবে। কিন্তু এই মেয়েটি কি তার পাশের মানুষটিকে কোনদিন বলতে পারবে___ **আমি পবিত্র, আমি শুধু তোমার জন্য পবিত্র ছিলাম!** কোনদিনও কি বলতে পারবে জীবনে কারো গোলাপ আমি হাতে নেয়নি, কারো হাতে হাত রেখে আমি ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা খেলিনি, আমি শুধু আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছি একজন ভালো মানুষের হাতে হাত রাখার জন্য। এই ছেলেটি কি কোনদিনও বলতে পারবে___ আমি আমার চোখকে সংযত করেছি শুধু তোমার জন্য! কোনদিনও কি বলতে পারবে? কোনদিনও পারবে না! কোনদিনও পারবে না বলে এরা জানতেও পারবে না ভালোবাসা আসলে কি!! পারবেনা বলে প্রবৃত্তিপূজা ছাপিয়ে এরা কোনদিন আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসতে পারবেনা। ভালোবাসার নামে "অসহ্য যন্ত্রণার কিট" নিয়ে এরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ভান করে যাবে।

একদিন রাতে ক্যাম্পাসে একা একা হাঁটছিলাম। হঠাৎ এক ছেলে পেছনে মোবাইল ফোনে চিৎকার করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করল। সে তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে ব্রেক আপটা তাহলে করেই ফেলছে। ফেসবুকে বিভিন্ন সময় uncensored কথা বলার কিছু অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আছে। কিন্তু সেই চিৎকার করে রাস্তার মানুষের সামনে বলা কথাগুলোর একটা শব্দও এখানে লিখতে পারলাম না। কিছুদিন আগেই হয়তো কুসুম কুসুম প্রেমের শেখানো বুলি দিয়ে এরা রঙিন রঙিন ভালোবাসার গল্প শুরু করেছিল । অর্থহীন সেই আবেগের কি বীভৎস সমাপ্তি আরেকটি রঙিন গল্প শুরুর আগে! আমাদের হিজাবি, দাঁড়ি– টুপির দ্বীনী ভাইবোনদের শয়তানি হিকমার *'দ্বীনী রিলেশন'* এর কথা বলে মনটা

খারাপ করতে চাইনা আর লেখাটাও দীর্ঘ করতে চাইনা। আল্লাহ্ তায়ালা সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে যেখানে নারীদেরকে জন জন করে তাদের মাহরাম কারা তা বলে নন মাহরাম থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেখানে দ্বীনী লেভেলের শয়তানগুলোর কাছে পিরিতির বাকবাকুম *"ওহ! এ কিছু না!"* অনেকের কাছেই আবার অতি কমন শয়তানি সান্ত্বনা___ *আরে বিয়ে তো করবই!* যেন "বিয়ে তো করবই" এটা সবকিছু হালাল করার সার্টিফিকেট! আমাদের কাছে বিয়েটা যেন সবকিছুর একটা ফুলস্টপ! গল্প শেষ..... *সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল!* তারপর আবার গল্প শুরু হবে জান্নাতের হুর দিয়ে! এত সহজ?? বরং বিয়ে দিয়েই প্রত্যেকের পরীক্ষা শুরু আসলেই ভালোবাসাটা আল্লাহ্র জন্য কিনা! ঈমানের পরীক্ষা এখান থেকেই শুরু। আর যারা মনে করে যা কিছু করার করে নিই তারপর আল্লাহ্র কাছে তাওবা করে বিয়ে করে ফেলব! তাদেরকে একটা কথা বলে রাখি আপনি তাওবার অর্থটাই বোঝেননি। আর **ইসলামটা একটা সিস্টেম। one way road. এই সিস্টেমে হারাম দিয়ে enter করে হালাল দিয়ে exit করা যায়না।** অবৈধ প্রেমের হারাম enter করে যারা হারামটাকে হালাল বানিয়ে এই সিস্টেম থেকে exit করতে চেয়েছে চারপাশে তাদের জীবনের গল্পগুলো পড়ে দেখুন! এই হারাম আপনাদের জীবন থেকে আপনাদের সন্তান হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ছড়িয়ে যাবে। বিষ নির্মূল করতে না পারলে তা পুরো শরীরকেই বিষিয়ে তোলে!

ভালোবাসার জন্য যারা ভালবেসেছিল, যারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র জন্যই ভালবেসেছিলেন । পেয়ছিলেন আল্লাহ্র সন্তুস্টি , আমরা তাদের কাছেই ভালোবাসা শিখব , সমাজের এই নোংরামি থেকে নয়। ভালোবাসা! যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) সমস্ত সম্পত্তি দ্বীনের পথে কুরবান করেছিলেন যে মানুষটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন তার হাতে! ভালোবাসা____ যখন রাসুল (সাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) এর পান করা পানির গ্লাস তোলে নিয়ে তার চুমুক দেওয়া জায়গাতেই চুমুক দিয়েছেন। ভালবাসা___যখন হযরত আয়িশা (রাঃ) কে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে তার সাথে কৌতুক করেছিলেন। ভালোবাসা___ যখন কেউ শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্কে ভালোবেসে আধুনিকা গার্লফ্রেন্ড আর হারাম সম্পর্ক ছাড়তে পারে। ভালোবাসা___ যখন প্রিয় স্ত্রীকে রেখে রহমতের বান্দা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যায় আর প্রতিশ্রুতি দেয় জান্নাতে তার জন্য অপেক্ষা করবে। ভালোবাসা___ রাতের আঁধারে ক্রন্দনরত যুবকের চোখের পানিতে মহান আল্লাহ্র কাছে একজন সচ্চরিত্রের সঙ্গিনীর প্রার্থনা! এই ভালোবাসা কি কেউ কখনো অনুভব করেছে? কখনো মেপে দেখছে কত ওজন এই ভালোবাসার?? এটা মাপা যায়না___ অনুভব করা যায়। এই ভালোবাসায় কোন ব্যক্তিস্বার্থ নেই, কোন ঘৃণা নেই। ভালবাসা আর ঘৃণা দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়! কিন্তু দুইটার মাঝে কেমন একটা মিল খুঁজে পেলাম! আপনি যা সত্যিকার অর্থে ভালবাসেন তা কখনোই ঘৃণা করতে পারবেন না! আর সত্যিকার অর্থে ঘৃণা করা কাউকে পারবেননা ভালবাসতে! তুমি জীবন, তুমি মরণ, স্বপনে তুমি, জাগরণে তুমি টাইপ কথায় ভালবাসার স্বরূপ বুঝতে চাওয়া বোকামি! আমি-তুমি টাইপ কবিতা আর কিছু লাভ-মেসেজ ভালবাসা হলে কেউ তার প্রিয় মানুষটাকে না পাওয়ার ভয়ে জবাই করতে পারত না, পারত না ২৬ টুকরা করে রক্তের হোলি খেলতে! এসবে ভালবাসা নামক মানুষের অনেক গভীরের বিষয়টা থাকে না! থাকে সমাজ থেকে জোর করে মাথায় নেওয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জনের কিছু জঘন্য মাদকতা! প্রিয় মানুষটার কোন দোষত্রুটি কিংবা দুর্বল কোন বিষয়কে আয়না করে তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখুনতো!! এখনো কি ভালবাসেন তাকে?? নাকি অন্তরে ঘৃণা জমছে?? যদি ছোট্ট কোন দুর্বলতার জন্য প্রিয় মানুষটার প্রতি ঘৃণা আনতে পারেন তাহলে আপনি তাকে কখনোই ভালবাসতে পারেন নি! ভালবাসা সবসময় পাশে থাকা! ভুলকে মেনে তা শোধরানোর চেষ্টা করা! দিকভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথের মশাল দেখিয়ে বলা ___**সখি হাতটা ধর... একসাথে জান্নাতের পথে হাঁটি!!**

- - - - -

শেষকথাঃ শাহবাগ ইস্যুর মত মহামারী আকার ধারণ করা ইস্যু নিয়ে আমি কিছু লিখিনি কারণ সবাই লিখেছে। হঠাৎ মনে হল ১৪ ফেব্রুয়ারি ইস্যুটা সবাই ভুলে যাবে এই ডামাডোলে! ভাবালুতা আর নোংরামিতে মিশে যাওয়ার আগে আমার মুসলিম ভাই বোনেরা ভুলে যাবে এখানে ইসলামেরও say আছে। কিন্তু আমি জানি যাদের উদ্দেশ্য করে এই লেখাটা লেখা তারা কেউ এটা পড়বে না। যে কয়জন সমমনা বন্ধু এটা পড়বে তাদের না পড়লেও হয়। তারপরও ছোট্ট আশা যাদের জন্য এই লেখা তাদের কেউ একজন একদিন..... কোন একদিন এই লেখাটা পড়ে দেখবে। হঠাৎ করে হয়তো নিজের মিথ্যে ভালবাসাটাকে purify করার তাড়না পাবে। অনেক অনেক পরের প্রজন্মের কেউ একজন এই সমাজের নোংরামিতে ভালোবাসা খোঁজার আগে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসতে শিখবে। এরকম হলে এই লেখাটা সেই কয়েকজনের জন্য থাক। তারপরও অনেকের কাছেই এই লেখা হাস্যকর মনে হবে। আমাকে ছাগু ছাগু মনে হবে। তাদের জন্য দোয়া থাকল আল্লাহ্‌ যেন সবাইকে হেদায়াত দেন। কিন্তু মনে রাখিস.....একদিন এই অবুঝের কথাগুলো জীবনের পাতায় পাতায় মিলিয়ে দেখিস। যেদিন ভালোবাসাহীন জীবনে নিজেকে দেওয়ার মতও এতটুকু ভালবসা থাকবে না, যেদিন অন্তরাত্মা শুকিয়ে কঙ্গালসার শরীরে নিজেরই ঘৃণা জমবে সেদিন এই অবুঝের কথাগুলো মিলিয়ে দেখিস! ভালোবাসার মোড়কে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আত্মসম্মানের শেষ বিন্দুটুকও বিসর্জন দিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়ার আগে এই অবুঝের কথাগুলো বুঝে নিস! জীবনের ওপারে আল্লাহ্‌র জন্য কারো ভালোবাসা যদি পেতে চাস তবে এপারে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসতে শিখিস! মনে রাখিস ধুঁকে ধুঁকে ক্ষয়ে যাওয়া তোর জীবনে আর কেউ না থাকুক অসীম রহমতের আঁধার মহান আল্লাহ্‌ তোকে কোনদিনও নিরাশ করবেনা। অনেক অনেক দোয়া থাকল সবার জন্য। ভালোবাসা সবার ঘরে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসুক.....

(উপরের লেখাটি একজন মুসলিম ভাইয়ের লেখা)

ভালোবাসব বাসব রে বন্ধু : আজকে একটা সম্ভাব্য প্রেমের ধ্বংস দেখতে পেলাম !!

21 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

আজকে একটা সম্ভাব্য প্রেমের ধ্বংস দেখতে পেলাম !!

অফিস থেকে ফিরছিলাম, রিকসা থেকে যেখানে নামলাম, সেখানে অচেনা দু'টো ছেলে আর একটা মেয়ে দাঁড়ানো, একটা রিকসা দাঁড়ানো পাশে। সেই মেয়েটার বান্ধবীকে সম্ভবত একটা' ছেলে *লাইক* করে, সেই কথাটা বন্ধুটা মেয়েটাকে বলছিলো বলে বুঝলাম। মেয়েটা কিছু একটা উত্তর দিলো। পরে শুনলাম বন্ধুটি মেয়েটিকে বললো, "ও কি ফ্রেন্ডশিপ টাইপের রিলেশনও করবেনা?"। মেয়েটা রিকশায় উঠতে উঠতে বললো, "তোমরা রাগ কইরো না, ঠিকাছে? ভালো থাইকোওও, বাআআই!! " (একটু সুর করে)

বেচারা প্রেমিক ছেলেটা কষ্টে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ানো। সারাদিন কাজের চাপে সময় কাটানোর পর দিনশেষে এই কষ্ট পাওয়ার ঘটনা দেখে আমিও স্তব্ধ। বন্ধুটি সেই রোমিও প্রেমিককে ঠেলে রিকশায় তোলা পর্যন্ত ওদের দেখলাম। রিকসা রওনা হবার পর আমিও একটু বিষণ্ন মন নিয়ে হাঁটা ধরলাম। এরকম করে দেখা অনেক দৃশ্য মনে পড়ে গেলো। এমন কত প্রেমের শুরু-শেষ দেখলাম এইটুকু জীবনেই!

কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ঘোরা স্কুল-কলেজের এই ছেলেমেয়েগুলোর জীবনে প্রেম একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে। এটা আজ থেকে দশ বছর আগে ছিলো না। বিলবোর্ড, মিউজিক ভিডিও, নাটক-সিরিয়াল, শাহরুখ খান-শাহেদ কাপুর, কারিনা-প্রিয়াঙ্কা-রনবীরদের সিনেমা দেখে প্রেম করাটাকে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কাজ বানিয়ে ফেলেছে। তাই যেকোন মেয়ে দেখলেই তাদের নিজেদের রোমিও বানাতে ইচ্ছে হয়। আমার ভাইবোনদের কাছে শুনতে পাই, কলেজে বা ভার্সিটিতে ক্লাসের কোন মেয়ে (যে কিনা প্রেম করেনা) পেলেই সবাই তাকে *অফার* দিয়ে বসে। এই আতঙ্কে অনেক মেয়ে নিজেকে *ইন এ রিলেশনশিপ* দেখিয়ে থাকে!!

স্বভাবগতভাবে কোমল আর কিছুটা *ভদ্র* ছেলেরা দুঃখ পায় এবং ছ্যাঁকা খেয়ে অনেক কাজে অমনোযোগী হয়ে যায়। আমার অনেক বন্ধুরা সেই সময়েই সিগারেট ধরে "দুইডা টান" দিয়েছিলো আর সেখান থেকেই জীবনের মতন শুরু হয়ে যায়।

অন্যদিকে, যেসব ছেলের স্বভাবে ছোট থেকেই কোমলতা বর্জিত হয়ে গেছে, ছোটবেলা থেকেই যারা প্রয়োজনীয় পারিবারিক শিক্ষা কম পেয়ে বড় হয়েছে, তারা প্রেম করতে না চাওয়া সেই মেয়ের পিছু ছাড়েই না। মেয়েটা এই অফারকে ফিরিয়ে দিলেও *প্রেমের নেশায় কাতর* নাছোড়বান্দা ছেলেটা ক্রমাগতভাবে ফোনে, ক্লাসে, রাস্তায়, ফেসবুকে মেয়েটিকে ফলো করার চেষ্টা করতে থাকে। আসলে এটাকে "বিরক্ত" করা বলাটাই সঠিক হবে। এই বিরক্ত করার স্কেল যেসব ছেলে যত বেশি নোংরা আর পশু তাদের কাছে ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর হয়। আর বখে যাওয়া ছেলেরা তখন "জোর করে" ভালোবাসা আদায়ে অনেক মেয়েরই ক্ষতি করতে চায় -- যা কিনা স্বাভাবিক প্রাণীজ গুণাবলী। এই প্রাণী থেকে মানুষ হতে চেষ্টা করতে হয়।

আর সমাজের আধুনিকা ইয়ো-টাইপের মেয়ে অথবা পরিস্থিতির শিকারে পড়ে মেয়েরা এই অফার গ্রহণ করে, প্রেম খেলা শুরু হয়। স্কুল কলেজের বাইরে রাস্তার উপরে, ফাস্ট-ফুডের দোকানে, বাসের কাউন্টারের সামনে, কোন পার্কে বা বসুন্ধরা সিটিতে তাদের একসাথে দেখা যায়। প্রচুর ফোনালাপ শুরু হয় -- কী খেয়েছ, তুমি কী পছন্দ করো, তোমার স্বপ্ন কী, তুমি কোথায় বেড়াতে যেতে চাও, তোমার কোন রঙ পছন্দ -- এইসব বলে এফএনএফ নাম্বারের ব্যাপক উসুল করা হয়। জীবনের সমস্ত কথা এক দুই সপ্তাহেই বলা শেষ হয়ে যায়। তারপর ছেলেটা যদি উত্তম চরিত্রের না হয়, আর কোন একটা আদিম চাওয়া পূরণ করতে চাইলে তা না দেয়ায় মেয়েটা পুনরায় আবার দোষী হয় এবং এতকিছুর পরেও ছেলেটা তার উপরে খেপে যায়। মেয়েটা এমন অবস্থায় পেছানোর চেষ্টা করে কিন্তু অনেকদিনের অনেক অন্তরঙ্গতায় বাধা পড়ে যেখানেই আটকে যায়। স্মৃতিরা বাধা হয়ে যায়। শুরু হয় "প্রেমের নাম বেদনা" টাইপের অবস্থা।

আবার, কোন একদিন তৃতীয় কোন ছেলের/মেয়ের আগমন হয়, ঝগড়া আর ভুল বোঝাবোঝির শুরু। অথবা কেউ একজন ছেলেবন্ধু-মেয়েবন্ধুর স্বাধীনতা চায়, অপরজন তাকে আপন করে চায় -- আবার শুরু হয় যুদ্ধ। আবারো এই সম্পর্ক ভাঙ্গনের পথে যায়, একসময় আবারো পিছনে লাগা স্টেজ। দুইজন তাদের সম্ভাব্য সকল বন্ধুমহলে অপরের নামে খারাপ কথা বলতে থাকে, যাকে গীবত বলা যায়। এখানে প্রতিহিংসার আগমন হয়। ক্রোধের আগমন হয়।

এইরকম আরো বহু ধাপ পেরিয়ে বাবা-মা পর্যন্ত এসে আবার থেমে যায় প্রেমের স্রোত। তখন ডানে বামে শোনা যায় -- প্রেম করলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে হয়। এই জায়গায় কানপড়া পাওয়া যায় -- "ভালো কিছু পেতে হলে কিছু তো ত্যাগ হবেই"। অবশেষে এই প্রেম নামের ভালো কিছুর জন্য সারাজীবন সবকিছুতে সাথে থাকা বাবা-মা, ভাই-বোনের যাবতীয় অপছন্দ উপেক্ষা করে, রাগারাগি আর গালাগালির পরে হয়তবা তারা একসাথে হয়। কিন্তু বিয়ের পরের জীবন? সে এক ইতিহাস। সেইটা অন্যরকম আলোচনার বিষয়।

অনেকে আবার *সেই একজন* কে না পেয়ে ভগ্নহৃদয়ে চোখের পানি ঝরাতে থাকে। তাকে পাওয়ার জন্য শুরু হয় প্রার্থনা। হয়ত তাকে চেনাই হয়নি ঠিকমতন, কিন্তু এই মোহগ্রস্ততা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা তারা। ছেলে হোক, মেয়ে হোক -- এমন ঘটনা অজস্র। উপরের কোন ঘটনা জীবনে নেই -- এমন ছেলে বা মেয়ে খুব বেশি না মনে হয়। বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কি আমাদেরই এই সমাজে ছিলো পনের-বিশ বছর আগে? তখন কি আমাদের বড় ভাই-বোনেরা থাকতে পারেননি? আর সমাজের ওই রক্ষণশীলতা ছিলো বলেই এত হাজার রকমের আতংক, ভয়ে নীল হয়ে থাকতে হতো না সমাজের মেয়েদের, মায়েদের, বাবাদের।

আফসোস!! আমাদের জীবন, আমাদের অনুভূতি, আমাদের ভালোলাগা-মন্দলাগা, আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য এখন আমরা ছেড়ে দিয়েছি কিছু মোবাইল অপারেটর আর কর্পোরেট কোম্পানীদের বিজ্ঞাপনের কাছে, মুভি আর সিরিয়ালের কাছে।

বলিউডের কেথ্রিজি, কুচ কুচ হোতা হ্যায়, মোহাব্বাতেইন, জাব উই মেট দেখে প্রেমিক-প্রেমিকা পাবার এবং হবার যেই আকাংখাতে আমার ভাইবোনদের হৃদয় দোলে -- সেই নায়ক-নায়িকা, ক্যামেরাম্যান-প্রস্তুতকারক, প্রযোজক সবাই এ থেকে কেবল মুনাফাই অর্জন করেন। আর সেই ব্যবসা সফলতা থেকেই তাদের এমন সিনেমা বানানোর হিড়িক পড়ে। সেই সিনেমায় সত্য কতখানি, তার প্রভাব কতখানি আমাদের সমাজে -- সেই হিসেব কেইবা রাখে? ভুক্তভোগী যারা, সাবধানতা তাদের থেকেই তো আগে আসা উচিত, তাই নয় কি?

অথচ এই প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে আমরা প্রেমাক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণা দিই আমাদের মা কে। আমাদের দুঃখিনী মা -- ক'বার গিয়েছেন তিনি এদেশেরই মাধবকুন্ড ঝর্ণার কাছে? ক'বার গিয়েছেন তিনি কেএফসি আর ফ্যান্টাসি কিংডমে? তার কী একটা জীবন কেবলই আমাদের জন্য ভাত আর তরকারি রান্নার জন্য? আমাদের শরীরের খবর নেয়ার জন্য? কেন এই কাজ করবেন তারা? ছোটবেলা কত শত রাত আমরা এই মা-কে ঘুমাতে দিইনি -- কেন এই মায়েদের অশান্তি দিয়ে এই ভালোবাসাবাসি? কেন হয়ত আমার কারণে অন্য আরেকটা ছেলে বা মেয়ের মা-বাবাকে অশান্তি দেয়া? পরিবারের শান্তি কেন আমরা নষ্ট করতে চাই?

ভালোবাসা মানে কী তবে? ভোগ করা?

'আমি তোমাকে ভালোবাসি' -- এই কথাটাকে অগ্রাহ্য করলেই কেন ওই মেয়েটা শত্রু হয়ে যায়? তার মানে কি সেই মেয়ের কিছুটা সময়, তার কন্ঠের অনুরণন, তার কিছু দৃষ্টিকে, তার সহজাত সম্পদগুলোকে ভোগ করতে না পেরেই আমি তাকে ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা করতে শুরু করলাম? কী হাস্যকর রকমের সস্তা ব্যাপার, তাইনা? যাকে ভালোবাসি, তাকে না পেলেও তো আমার ভালোবাসা থাকারই কথা তাইনা? এই স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হতে পারলে সেদিন নিজেকে মুক্ত করা যাবে পশুত্ব থেকে।

ক'দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে ক্লাসমেট ছেলেটা তার প্রেমিকাকে ছুরি দিয়ে গেঁথে খুন করে ফেলার ঘটনাতে কি এই ভয়ংকর জিনিসগুলোই পরিষ্কার করে দেয় না? মানবীয় গুণাবলী যেখানে হারিয়ে যায়, তখন প্রেমের নামে এই সাময়িক মোহ কেটে যেতে কেবলই একটা মূহুর্ত লাগে!

প্রিয় ভাইয়ারা, জীবনটাকে জটিল করতে, পাপময় করতে, রাগ-ক্ষোভ-হতাশার স্ফূরণ ঘটাতে কেন তোমরা ফিরে ফিরে রোমিও, মজনু, ফরহাদ হতে চাও? তুমি সেই মেয়েটিকেই খুঁজো, যার মতন একটা কন্যা সন্তান পেলে তুমি খুশি হবে জীবনে। কিংবা এমন মেয়ে খুঁজো যাকে তুমি তোমার সন্তানদের মা হিসেবে চাও! মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট থেকে দূরে রেখে ঘরের আলো নিভিয়ে নিজেকে একটুখানি সময় দাও। তারপর নিজের আত্মাকে জিজ্ঞেস করো তো -- এই একটা দেহ, প্রাণ, সে কি শুধুই কোন নারীর পেছনে ছোটার জন্য? তোমার ভাইবোন, মা-বাবার কষ্টার্জিত জীবন, রাস্তার পাশের কষ্টে থাকা মানুষগুলো কি কখনই তোমাকে ভাবায় না? যেদিন তুমি হবে সুন্দর চরিত্রের উদার প্রাণের ছেলে, দেখবে তোমার চাইতেও চমৎকার একজন তোমারই জন্য অপেক্ষা করবে এই জীবনের বাকিটা সময়, অনন্তকালের অসীম সময়ে সঙ্গ দিতে। চোখকে সংযত করা উচিত, কেননা এই নির্লজ্জ অবাধ্য দৃষ্টি অনেক বোনদেরকে কষ্ট দেয়, অশান্তি দেয়। হতে পারে সে আমাদেরই কারো মা-বোন। আর আখিরাতে আল্লাহর হিসেব তো হবে খুবই কঠিন!

আচ্ছা আপু, এই রূপ-সৌন্দর্য্য-যৌবন কতদিন থাকে জানো তো? সর্বোচ্চ ১৫-২০ বছর। তারপর? এই শরীর ভেঙ্গে যাবে, চামড়া কুঁচকে যাবে। তখন কে দেখবে তোমাকে? তুমি বরং এমন ছেলেকেই খুঁজো, যার মতন ছেলে গর্ভে পেলে তুমি খুশি হবে। কিংবা এমন ছেলে খুঁজো যাকে তুমি তোমার সন্তানদের বাবা হিসেবে চাও। তথাকথিত দারুণ স্মার্ট ছেলের আক্রমণাত্মক, ড্যাম কেয়ার আর "ম্যানলি" আচরণে মুগ্ধ হয়ে, তার প্রতি অনেক মেয়েরা মুগ্ধ বলে তাকে নিজের জীবনে চাইলে -- মনে রেখো আপু, সে যদি তোমার হয়ও কখনো, তখনো সে এমনই থাকবে। সেদিন তার এই আক্রমণের আচরণের খারাপ দিকগুলো তুমি ভোগ করবে প্রতিদিন, প্রতিবেলা। আসলে, কোমল আর ধৈর্য্যশীল ছেলেরা বোধকরি সবচাইতে ভালো ছেলে। সংসার জীবনে প্রাপ্য সম্মান পাওয়াটা ভালোবাসা পাওয়ার চাইতে বেশি প্রয়োজনীয়।

মনে রাখা উচিত, এই জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আবার তার কাছেই আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। পৃথিবীতে এসেছিলাম তখনো একা, যাবোও একা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবসময়েই সাথে আছেন। মন অস্থির হলে, চঞ্চল হলে, একা লাগলে -- আল্লাহকে স্মরণ করতে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "... জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়... " [সুরা আর রা'দঃ ২৮]। এই জগতে কত আত্মার প্রশান্তি আছে! কী অপার ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে আমাদেরই চারপাশে। আমাদের প্রিয়তম জনকে ভালোবাসলে, সবসময়ে স্মরণ করে সমস্ত জীবনটা কতটা সুন্দর হতে পারে -- সেটা যারা চেষ্টা করে তারাই পায়! আল্লাহই আমাদের আপনজন, তিনিই সবকিছুর মালিক।

যারা অবিবাহিত, তাদের প্রয়োজন নিজেদের সংযত করা। দরকার আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দুআ করা, যেই সুন্দর দুআ পবিত্র কুরআনুল কারীমেই আমরা শিখেছি। আল্লাহর কাছে আমাদের এমন একজন জীবনসঙ্গী চাওয়া উচিত, যাকে দেখলে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়, যার সাথে আমরা দুনিয়াতে একসাথে থাকবো, আখিরাতেও আল্লাহর দেয়া জান্নাতে একসাথে থাকতে পারবো, চিরসবুজ, চিরযুবা হয়ে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন আর তার ভালোবাসায় সিক্ত স্নিগ্ধ-শান্ত-মিষ্ট হৃদয় ধারণ করার তাওফিক দান করুন। সেই সুন্দর দু'আ হলো-- "রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াযিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ক্বুররাতা আ'ইয়ুনিন ওয়া জা'আলনা লিল মুত্তাক্বিনা ইমামা"।

অর্থঃ "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর।" [সূরা ফুরক্কানঃ ৭৪]

এর বেশি ভালোবাসা যায়না ও আমার প্রাণপাখি ময়না

29 September 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

ক'দিন আগে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, একটা গান কানে এলো পথের ধার থেকে -- "*এর বেশি ভালোবাসা যায়না, ও আমার প্রাণপাখি ময়না*"। প্রেমিক লোকের চিৎকার করা আর্তনাদ। এই প্রেমিক গায়ক আবার ভালোবাসার একটা স্কেল আবিষ্কার করেছেন, যার সর্বোচ্চ রেটিং-এর ভালোবাসা তিনি বেসেও ফেলেছেন। সম্ভবত এইটা চেক করে দেখার পর তিনি আরো জোরে চিৎকার করছিলেন, এবং তার সমস্ত চিৎকার তার প্রাণপাখি ময়নার উদ্দেশ্যে হলেও ভুলক্রমে আমার সাথে আরও বহু পথচারীর কর্ণকুহর ফুটো করে দেয়ার উপক্রম করছিলো।

আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো এই "ময়না" কি আসলেই শুনবে? ময়নারা কি এইসব গান শুনে গলে যায়, নাকি তব্দা খায়? ফলাফল যা-ই হোক, ময়নাপাখি, জান, জান্টু, মন, প্রাণ, বেবি, হানি টাইপের শব্দ দিয়েই প্রেম হয় এখন। আম্মা-আব্বার নাম আবেগ আর ভালোবাসার কাছে রিনেম হয়ে ওই কয়টা নামেই রুপান্তরিত হয়। দেখতে দেখতে আরেকটা ভ্যালেন্টাইনস ডে চলে এলো। পহেলা ফাল্গুনের পরদিন ভ্যালেন্টাইন। ব্যাপক উপলক্ষ্য পাওয়া গেলো পরপর দুইটা দিন। এইদিনে "হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে" বলে একটা উইশ করা হয়। অথচ ভ্যালেন্টাইনের ইতিহাস পড়ে প্রচন্ড অরুচি লেগেছিলো --সেটা ছিলো বহুগামিতা আর চরিত্রহীনতার একটা ইতিহাস। সেটা জানার আগে পরে কোনদিনই আমি এই উইশটা করি নাই, রিসিভও করিনি।

এই সময়গুলো আসলেই নিজের ছাত্রজীবনটার কথা খুব মনে হয়। কত কাহিনী যে দেখেছিলাম খুব কাছ থেকে!! যাহোক, একটা প্রেম কাহিনীর কথা বলি। ধরি, ছেলেটার নাম আকাশ, মেয়েটার নাম মিথিলা। "দোস, প্রেম করুম, একটা ফোন নাম্বার দে" -- এক বন্ধুর কাছে আকাশের এরকম একটা আবেদন থেকে সেই প্রেমের কুঁড়ি ফোটা বলতে হবে। সেই বন্ধুর প্রেমিকার বান্ধবী মিথিলা। সেই সূত্রে অনেক কিছু জানতে পারে আকাশ। তারপর মিথিলাকে বেলা অবেলায় ফোন করা। নরমালি গাঁইগুঁই করা মিথিলাকে বাগে আনতে আকাশের বেশি সময় লাগেনি। মাত্র এক-দু'দিনের মাথায় নিয়মিত ফোনালাপ, রাত বারোটার পরে। এভাবেই ওরা "আই লাভ ইউ" বলে ফেললো। আকাশের রুমের সবাই সেদিন "ট্রিট" পেলো বার্গার খাওয়ার মাধ্যমে। সম্ভবত সেদিনই প্রেম শুরু। ভ্যালেন্টাইনস ডে তে তাদের প্রথম দেখা। "ভালোবাসার গল্পতে পড়া গল্পের মতন করেই ওরা ফোনে কথা বলে ঠিক করেছিলো মিথিলা লাল পাড়ের শাড়ি আর আকাশ নীল

পাঞ্জাবি পরবে। পরবর্তীতে শোনা গল্পে জানা যায় একসাথে দু'জনে বসে ফুচকা খেয়ে প্রথম 'ডেটিং' করেছিলো। তারা একই রিকসায় উঠে বহুদূর গিয়েছিলো, পথিমধ্যে হয়ত পথচারীরা লজ্জা পেয়েছিলো তাদের দেখে -- কিন্তু সেটা ভ্রুক্ষেপ করার মতন মানসিকতা তাদের কারোই ছিলোনা। আকাশ এমন গল্প তার রুমমেটদের করেছিলো যা থেকে সেটা আঁচ করে নিতে বেগ পেতে হয়না। পারস্পারিক উষ্ণতা আদান-প্রদান ক্রমাগত মাত্রা পেতে থাকলো। কিছুদিন পরে যখন সর্বোচ্চটুকু মাপা হয়ে গেলো, তার কিছুদিন পরেই হঠাৎ ঝগড়া শুরু হলো। আকাশ ভার্সিটির অন্য ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র একটা মেয়ের সাথে ফোনালাপ করেছিলো। মিথিলা সেটা জেনেছিলো আরেক বান্ধবীর কাছে। সেই ফোনালাপকে নিজের সাথে আলাপের সাথে মিলিয়ে ভবিষ্যতে আরও কী কী হবে সেটা ভেবে অনেক বেশি রাগ ঝেড়ে ফেলেছিলো। আকাশ ক্ষেপে গিয়ে মিথিলাকে "ন্যারো মাইন্ডেড" বলে গালি দিয়েছিলো।

ফেসবুকে স্ট্যাটাস আপডেট দেখা গেলো, " মনের মানুষটি চলে যেতে চাইলে তাকে ছেড়ে দাও, সে যদি ফিরে আসে, বুঝবে সে তোমার ছিলো, আর যদি না আসে বুঝবে তো কখনো তোমার ছিলো না"। ওদের ঝগড়া মিটেনি -- ফেসবুকে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস "ইন আ রিলেশনশিপ" থেকে ধুম করে "সিঙ্গেল" হয়ে গেলো। আকাশ তার ভার্সিটির "আনিলার" সাথে কথা বলতে লাগলো। এফএনএফ নাম্বার বদলে গেলো... মিথিলা লিখলো "সমস্ত পুরুষ হলো মিথ্যুক আর সুবিধাভোগী। সেখানে কমেন্ট করলো আশফাক, মিথিলার ক্লাসমেট। আরো দু'জনের এফএনএফ নাম্বার বদলে যেতে লাগলো কয়েকদিন। ভেঙ্গে পড়া হৃদয়ের মিথিলাকে ক'দিন মানসিক সাপোর্ট দিলো আশফাক... তারপর আরো ঘনিষ্টতা, আরো আরো...

অনেকটা এরকমই হয় বাস্তবের ভালোবাসার গল্পগুলো। অথচ ক'দিন আগে কোথা কোথা ঘুরে যেন "ভালোবাসার গল্প" নামের একটা পেজে চলে গিয়েছিলাম। তখন খেয়াল হলো কিছুদিন আগে আমাকে কে যেন এরকম পেইজের থেকে একটা গল্প পড়তে দিয়েছিলো। আমি আগ্রহের সাথে এক নিঃশ্বাসে ৩/৪ টা গল্প পড়ে ফেললাম। কেউ একজনকে দেখে "ফার্স্ট সাইট" নামের "লভ" ফিল করে কেউ। তার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করে, আবার কেউ রাস্তায় ছবি কুড়িয়ে পায়, সেটা আলমারির ড্রয়ারে রেখে দেয়। অনেক বছর পরে এক প্রেম করে বিয়ে করা মেয়ে দেখে সেই ড্রয়ারের ছবিটা তার। প্রথম প্রেম আর পরের প্রেম একই হয়ে যাওয়াতে সেখানে প্রেম গাঢ় হয়। অথচ ওই ছবিটা অন্য মেয়ের হইলে কি হতো সেইটা লেখক আর পাঠক কারোই মাথায় আসেনা। এইসব এই ল্যাদলেদে ইমোশোনের প্রেমকাহিনী পড়ে কেমন যেন বমি করার পরে তিতা তিতা লাগা অনুভূতি হচ্ছিলো বুকে। একটা বিশাল প্রজন্ম প্রেম-প্রেম জিনিস নিয়ে জীবন পার করে দিতে পারছে। অথচ বাস্তব জীবনটা পুরাই আলাদা...

এইসব হিজিবিজি প্রেমের গল্পে পড়ছিলাম -- "প্রতিদিন ছাদে উঠতাম তাকে এক পলক দেখবো বলে", "অনেক ভালোবাসি তবুও কেন যে তাকে বলতে পারিনি", "তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ" -- এরকম অজস্র ফালতু আর অর্থহীন প্রলাপ। এসব পড়ে বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরা প্রেম-প্রেম চোখে ডানে বামে তাকাতে থাকে, যাকে দেখে তাকেই প্রেমিক/প্রেমিকা মনে করে। প্রেম করতেই হবে, এরকম চিন্তা মাথায় নিয়ে বড় হচ্ছে একটা বিশাল প্রজন্ম। গার্ল ফ্রেন্ড না থাকলে অনেক ছেলেই "বোকা"। আবার "বয়ফ্রেন্ড" না থাকলে অনেক মেয়েই "আনস্মার্ট" হয়ে যায় একটা প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে। নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল আর প্রেমের গল্পে ডুবে থাকলে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করতে পারলে ওরা কীভাবে বুঝবে এইসব ছ্যাবলা ইমোশনের আউটকাম সবচাইতে ভালো ক্ষেত্রে পারস্পরের উপরে বোর হয়ে যাওয়া, পরকীয়া করা। আর নাহয় হারিয়ে ফেলা চরিত্র ও শরীরের অমূল্য কিছু জিনিস, ইউটিউবে ভিডিও হয়ে যাওয়া...

রিয়েল লাইফে যখন কাছাকাছি আসা যায়, তখন ব্রাশ করার টাইমিং মেলেনা, খাওয়ার টাইমিং মেলেনা। কারো নাকডাকার শব্দে অন্যজনের ঘুম আসেনা, কারো ছেলেবন্ধু/মেয়েবন্ধু অপরজনের সহ্য হয়না। এরকম আরো কত কী ! তখন আর প্রেমের "প্রথম দেখা ডাগর চোখ" বা "এলোমেলো চুলের দুষ্ট ছেলেটাকে" আর মুগ্ধ লাগেনা। ভেবে ভয় লাগে, এই ভ্যালেন্টাইনস ডে তে না জানি আরো কত বোনের সর্বনাশ হবে। হয়ত সেটা তাদের স্বেচ্ছায় হুতি হবে। অমন অজস্র উষ্ণতাভরা পাপ হবে, অমন শতশত ফুল বিক্রি হবে যখন, তখনও হয়ত রেললাইনের পাশে শুয়ে থাকা অশী্তিপর বৃদ্ধা রাহেলা বানুর একবেলা খাওয়া জুটবে না।

নিজের ভালো তো পাগলেও বুঝে। হুমায়ূন ফরীদি, কবির চৌধুরী, মিশুক মনিররা যেমন চলে গেলো কয়েকদিনের মাথায়। আমাদেরকেও তো যেতে হবে। নিয়ে যাবার সময় কী নিয়ে গেলাম, কী রেখে গেলাম সেটা তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ যেন আমাদের যাবতীয় পাপাচার থেকে, বাবা-মা কে কষ্ট দেয়া থেকে, অন্য কোন ছেলে/মেয়ের ক্ষতি করা থেকে রক্ষা করেন। আসলে আমরা খুব দুর্বল এক সৃষ্টি যারা মরে গেলেই মাটির সাথে মিশে হারিয়ে যাবো। আল্লাহ আমাদের রহম করুন।

অনন্যার অরণ্যপ্রেম [ভালোবাসার অণুগল্প]

15 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

অনন্যা হঠাৎ এতটা বদলে যাবে আশা করিনি। ও সবসময়েই আমাকে পছন্দ করত, আর সেইটা বাড়াবাড়ি টাইপের পছন্দ ছিল। সেই পছন্দের সাথে মুগ্ধতা ছিল বলে মনে হত আমার।

অনন্যাকে নিয়ে আমার অধিকার অনুভব করার ব্যাপার ছিল সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। আমার স্কুল ছুটি হত আগে, সে বাসায় ফেরার সময় আমি মাঝে মাঝে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে যেতাম। সিঁড়িতে দিয়ে উঠার সময় আমার দিকে হাসি দিতো অনন্যা। ও হাসলে গালে টোল পড়ত, আমার সেইটা খুব পছন্দের ছিল।

ক্লাস ফোরে উঠতেই আমাদের বাসা বদলে গেল। ওরা তখনো আগের বাসায় থাকে। অনেকদূর হেঁটে ওদের বাসায় যেতে হত। আমি যেতাম মাঝে মাঝেই। খালাম্মা আগের মতন আদর করত না টের পেতাম। আগে বাসায় গেলেই খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে স্কুলের প্রশ্ন করতেন, আম্মা আর ভাইয়া আপুদের কথা জিজ্ঞেস করতেন, পরে কেমন না দেখার ভান করতেন যেন। বুঝতে পারতাম তাল কেটে গেছে।

বড় হতে হতে সব কিছু বুঝে যাতায়াতও কমিয়ে দিয়েছিলাম। কথাবার্তা কম হতে হতে একদিন ভুলেও গিয়েছিলাম ওর কথা। মাঝে মাঝে মনে হত, যখন কবিতা পড়তাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলাম ক্ষণমিলন — "মূহুর্ত আলোকে কেন হে অন্তরতম, তোমারে হেরিনু চির পরিচিত মম।" এই কবিতা পড়ার পর আমার অনন্যার কথা মনে হত।

বেশ অনেক বছর পর, এসএসসিতে আমি অনেক ভালো করলাম। অনন্যার কথা মনে হতে খোঁজ নিয়ে শুনি ও সাইন্স নিতে পারেনি নাম্বার ভালো ছিলনা। হিউম্যানিটিজে ভর্তি হয়েছিল। রেজাল্টও খুব একটা ভালো হয়নি।

এরপর আরো সময় পর... একদিন অনাকাংখিতভাবে ফেসবুকে ওকে পেলাম খুঁজে হঠাৎ করেই, জানতে পারলাম শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। মেসেজ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "অনন্যা চিনতে পারছ? মনে আছে আমাকে"?

রিপ্লাই দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম, খুব আবেগ দিয়ে উত্তর ছিলো, "সাদ তুমিইই!! তোমাকে অনেক খুঁজেছিলাম আমি, এইচএসসির রেজাল্টে পত্রিকায় তোমার ছবি পেয়ে আম্মুকে দেখিয়েছিলাম আমি। ভালো আছ তো?"

আমি আবেগাপ্লুত হয়েছিলাম খানিকটা, উত্তর দিলাম "আলহামদুলিল্লাহ। তুমি কেমন? ভালো আছ?"

– অনেক ভালো আছি। কিন্তু ভার্সিটি ভালো লাগেনা। ঢাকায় তো থাকতে পারলাম না...

আরো কিছু কথার পর ইনফো ঘেঁটে দেখতে পাওয়া তথ্য থেকে বুঝেই জিজ্ঞাসা করলাম, "অরণ্য কি তোমার ক্লাসমেট?"

ওর উত্তর ছিল, "হ্যাঁ। এইতো অল্প ক'দিন হলো আমাদের অ্যাফেয়ার। ও দারুণ আকর্ষণীয় ছেলে। আর অরণ্য নামটা অনেক সুন্দর না বলো?"

আমি উত্তর দিলাম, হ্যা। অনেক কাব্যিক নাম।

– ও আসলেই কাব্যিক। আমাদের ভার্সিটির আবৃত্তি সংসদে খুব অ্যাকটিভ ও। তুমি একদিন এসো আমাদের ক্যাম্পাসে। আমরা একসাথে ফুচকা খাবো নাহয়। তুমিও অরণ্যের সাথে পরিচিত হতে পারবে।

সেদিনের আগে আমি ঠিক জানতাম না যা কখনই ছিলনা, তাকেও হারানো যায়। আর এই হারানোর যন্ত্রণাটা সামলে ওঠাও কঠিন। । আজকে অনন্যা আমাকে অরণ্যের সাথে পরিচিত হওয়াকেই বেশি বড় করে দেখালো। এত বছর পর আমি যে সেরা প্রতিষ্ঠানে পড়ছি, সেটাকে সে ভ্রুক্ষেপই করল না।

অনন্যাকে সেদিন আর বলিনি আমার কোন অনুভূতি। আমি আর ওকে ফ্রেন্ড বানাইনি ফেসবুকে। কিছুদিন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট ঝুলিয়ে রেখেছিল তাই নিজ থেকে রিকোয়েস্ট রিমুভ করে ফেলেছিলাম। মাঝে মাঝে খেয়াল হতেই দেখতাম, কখনো শাড়ি পরা অনন্যার হাসিমুখ টোলপড়া গাল, কখনো হাতের সোনালী অলংকার, কখনো মেহেদি মাখা আংটিপরা হাতের ছবি বদলে যেত প্রোফাইল পিকচারে। আমিও বুঝতাম, অনন্যা কাব্যিক বয়ফ্রেন্ডের সান্নিধ্যে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ছবিনেশায় আক্রান্ত অনেক মেয়েদের মতন অনন্যাও হয়ত এখন অরণ্যের ডিএসএলআর ক্যামেরার সামনে অনেক সময় কাটায়, ফেসবুকে আপলোড করে বন্ধুদের কমেন্ট পেয়ে আত্মতৃপ্তি নেয় দু'জনেই। জানিনা আমি...

বছরখানেক পর একদিন ওদের বাসার সামনে দিয়ে আসার সময় চলে গেলাম ওদের বাসায়। ভাইয়াদের একজনকে পেলাম, খালাম্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অনন্যা কোথায়?

– "ওর বন্ধু এসেছিল বাবা, তার সাথে টিএসসিতে গেলো, আজকে নাকি ওদের গেটটুগেদার আছে" — খালাম্মার উত্তর শুনে অনন্যাকে ফোন দিলাম, পুরুষালী গলা শুনলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে, অনন্যার উত্তর ছিলো, "শুনতে পাচ্ছিনা সাদ, পরে ফোন করিও"

সেদিনের পর আর কখনো ফোন করিনি। কারো সাথে অযাচিত হয়ে আলাপ করার আমার ইচ্ছে ছিলনা। অনেকদিন পর এলাকায় অনন্যার এক ঘনিষ্ট বান্ধবীর সীমার সাথে দেখা। আমারো ছেলেবেলার ক্লাসমেট ছিল। সেদিন ওকে ১০ বছর পর দেখলাম। কথার প্রসঙ্গে ওর কাছে অনন্যার আপডেট জানতে পারলাম। ক্যাম্পাস থেকে ফেরার পর নাকি অরণ্য বদলে যায়। নৃতত্ববিদ্যা পাশ করে ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে আগ্রহী স্পাইকি চুল, হাতে ব্রেসলেটের প্রোফাইল পিকচারের অরণ্য আর সেই সাদামাটা হাসিমুখ অনন্যার রিলেশন ৩ বছর পর ভেঙ্গে যায়। অনন্যার আরেকটা ছেলের সাথে সম্পর্ক হয়েছে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে একসাথে চাকুরি করে ওরা। সীমা বললো, অনন্যা বলেছে, অরণ্য একটা স্বার্থপর লম্পট।

সেদিন বিকেলে সীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরছিলাম আমার চাকুরিস্থলে। সিলেটের পথে বাস ছুটে চলেছিলো দু'পাশের গাছগাছালির মাঝ দিয়ে। টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছিলো বলে জানালা বন্ধ করিনি। মুখে বৃষ্টির ছাঁট আর বাইরের সবুজ অরণ্য দেখে অনন্যা আর অরণ্যের কথা মনে হলো। অনন্যারা অরণ্যদের কাব্যিক নাম দেখে, ওদের হ্যান্ডসাম লুক দেখে, কবিতা আবৃত্তি শুনে, গিটার হাতে নিয়ে গাওয়া গান শুনে প্রেমে মজে যায়। তারপর একটা সময় অরণ্যরা স্বার্থপর লম্পট নাম পায়, অবধারিত সত্য।

তবু অনন্যারা ভুল করে। সাদামাটা চেহারার এমন কারো দিকে ফিরে চায় না, যারা হয়ত অরণ্যের মতন গহীন ভালোবাসা ধারণ করে বুকে। সেই ভালোবাসার হয়ত জৌলুস দেখা যায়না। অনেক সময় বুক ভরা স্নিগ্ধ ভালোবাসা থাকে, তার হয়ত অরণ্যময় ভালোবাসার প্রকাশ থাকেনা, কিন্তু বুকের ভিতরে তারা তরঙ্গায়িত করে অনুভূতিদের। তারা জীবনসঙ্গী করেই ভালোবাসতে চায়, রঙ্গিন করতে চায়না নিষিদ্ধ জীবনকে, সঙ্গিনীর জীবনকে রাঙ্গাতে চায় সমস্ত অধিকার হাতে নিয়ে তবেই। এদিকে অরণ্যরা প্রেমিকাদের জীবনকে তরঙ্গায়িত করে। এই বিপুল ব্যবধান কিশোরী তরুণী প্রেমিকারা বুঝেনা, তারা ভুল করে বারবার।

শেষ বিকেলে চিন্তাগুলোর সাথে বেরিয়ে এলো দীর্ঘশ্বাস, এক ঝাঁক অস্থিরতা জেগে উঠলো। সম্বিত ফিরে পেয়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে প্লে লিস্ট থেকে মাহের জেইনকে বেছে নিলাম। গাইড মি অল দি ওয়ে প্লে করতেই স্নিগ্ধ আবেগে কানে বেজে উঠলো –

I know that You could easily

Take away every thing You've given me

And I try to remember

Not to take anything for granted

Cause I know that one day

Suddenly this will all come to an end

So my last wish is for you to be pleased with Me

Allah, Ya Allah

Guide me all the way to your Jannah.

…..

Forgive me, cause I cant thank you enough.

Forgive me when I doubt your love.

গানের কথাগুলো শুনে আর অনুভব করে প্রশান্ত হয়ে গেলো মন। যার ভালোবাসায় আমি পূর্ণ হব, তিনি হারিয়ে যাননি এখনো এই সাদামাটা মানুষটার জীবন থেকে — এর চাইতে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?

বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম তখন, অরণ্যের মাঝে সন্ধ্যা নেমে এলো প্রায়, গাড়ি ছুটে চলেছে সবকিছুকে পেছনে ফেলে। বুকের বামদিকে নিঃশব্দে হাত দিয়ে চেপে নিজেকে বললাম,

ভালোবাসা চিনতে ভুল করো না সাদ। এই জীবন একটাই, এই যাত্রা অনন্তের…

ভালবাসার মানুষটিকে কি কাঁদানো যায়?

23 September 2014

লেখকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

ভালবাসা কথাটা প্রত্যেকের মনকেই হালকা একটা নাড়া দিবেই। প্রেমে পড়ে নি এমন মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে। হোক সে বিয়ে পূর্ববর্তী প্রেম, বা বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম। প্রেমে পড়ে যাওয়া খুবই সহজ। কেউ সুন্দর করে আপনার দিকে একবার তাকালো, একটা লাজুক হাসি উপহার দিল, অথবা হলো আপনাদের মাঝে তুমুল ভুল বুঝাবুঝি আর ঝগড়া, যেন কেউ কাউকে দেখতে পারেন না, এই খুনসুটির রেশ ধরে তারপর যথাক্রমে বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা! এই ভালবাসার কতো যে রূপ, আর কতোভাবেই না তা আপনার উপর এসে পড়তে পারে। সত্যি বলতে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকেই ভালোবাসা পেতে চাই, কেউ আমাদের জন্য ‘কেয়ার’ করে

এমনটা দেখতে চাই। আমরা হতে চাই কারো জীবনের *'স্পেশাল'* একজন। প্রকৃতিগত কারণেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এক ধরণের আকর্ষণ অনুভব করি।

প্রেমের সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে। লোকমুখে খুব চলে এমন একটা কথা হলো – *'ভালোবাসায় শুধু দিয়ে যাও, কিছু পাবার আশা করো না'* ; সত্যিকার ভালোবাসা নাকি সেটা যখন নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসা যায়, যখন প্রিয় মানুষটির জন্য সবকিছু উৎসর্গ করে দেয়া যায়, নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা না ভেবে তার সুখের কথাই শুধু চিন্তা করতে হয়। আসলে এটা কি সম্ভব? মানুষের নিজের কিছু চাওয়া-পাওয়া তো থাকবেই, তা যতক্ষণ পূরণ না হচ্ছে সে কীভাবে সুখী হবে?

বর্তমান সমাজে প্রায় প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক আছে। তারা বলে *'প্রেম'* - এই প্রেমে কয়জন সুখে আছে? সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিই দেখা যায় আপনাকে সবচেয়ে বেশি 'হার্ট' করে, কষ্ট দেয়, কখনও বা আপনাকে অবহেলা করে। আপনি কি তার অবহেলার পাত্র? আপনাকে সে ভালবাসে 'নিজের জীবনের চেয়েও বেশি' অথচ আপনার প্রতি তার আচরণ যাচ্ছেতাই। যখন আপনাকে দরকার হয় আপনার কাছে আসে, ভালো ব্যবহার করে, আবার মুহূর্তেই আপনার হৃদয়টাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতেও তার বাধে না। আপনাদের দিনে দুইবার ঝগড়া হয়- তুচ্ছ কারণে। আপনাদের রিলেশনের 'মেইক আপ' আর 'ব্রেইক-আপ' চলতেই থাকে। আপনার খুব কষ্ট হয়। মনে হয় যেন ভালবাসার আরেক নাম বেদনা। অথচ আপনি তারপরেও তার কাছেই আবার ছুটে যান। প্রাণ উজাড় করে ভালবাসেন।

মাঝে মাঝে প্রেমের ঘটনাগুলা এমন হয়, আপনি যাকে এতো ভালবাসেন সে হয়ত আপনাকে পাওয়ার যোগ্য পর্যন্ত নয়। সে হয়ত কোন মাদকাসক্ত, ধূমপায়ী, আপনি সারাজীবন যা অপছন্দ করে এসেছেন, কিন্তু ভালবাসার মানুষটিকে পাবার জন্যে তাও মেনে নেন। হয়ত আপনি প্রেমে পড়েছেন এমন একজনের যে কথায় কথায় আপনার সাথে রাগ করে, আপনাকে ভুল বুঝে, আপনাকে সবকিছুর জন্য দোষারোপ করে তাও আপনি বুকে পাথর বেঁধে মুখে হাসি টেনে তার কাছেই ফিরে যান কিন্তু কেন?

বার বার সম্পর্ক ভেঙ্গে দেবার কথা ভেবেও আপনি পারেন না। আপনি শুধুই তাকেই মিস করেন। আপনি শুধু তাকেই ভালবাসেন এতোকিছুর পরেও।

অনেকে আছে, প্রেম করার দু' বছর পর জানতে পারে, তার প্রিয় মানুষটির জীবনে আরো একজন আছে! আরেক ছেলে/মেয়ের সাথে সম্পর্ক। এরপরেও আপনি ক্ষমা করে দেন। কারণ আপনি তাকে ভালবাসেন।

ব্যাপারটা আসলে 'ভালোবাসা'-র মহৎ প্যাকেজিং এ নিজেকে হাজির করলেও মূলত বিষয়টা অতো মহান নয়। আপনি একজনকে ভালবেসে অবশ্যই কিছু পাচ্ছেন। 'আপনার' নিজের কাছে ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলতে 'ভালো লাগে', আপনার কাছে মনে হয় ঐ মানুষটি ছাড়া 'আপনি' জীবনে চলতে পারবেন না, 'আপনার' বেঁচে থাকা অর্থহীন। তাই নিজের মনের এই তীব্র অনুভূতির জন্য স্বার্থপরের মত আপনি নিজেই মানুষটির পিছনে ধেয়ে যান। সব দুঃখ-কষ্ট, যা মেনে নেয়া যায়না এমন সব ব্যবহার, মনটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় এমন কথা সহ্য করেও অশ্রুভেজা চোখ নিয়ে আপনি তারই কেনা গোলাম হয়ে পড়ে থাকেন, কারণ আপনার কাছে তার সাথে কাটানো সময়গুলো যেন অনন্য মনে হয়, সে আপনাকে দু'টি ভালবাসার কথা বলেছে- এমনটি তো কেউ বলে নি! সে আপনার কথা মন দিয়ে শুনেছে, আপনার হাতে হাত রেখেছে এসব মুহূর্ত আপনাকে বাধ্য করে তার কাছেই ফিরে যেতে। আপনি স্বীকার করুন বা না করুন- মোটের উপর তার সাথে আপনার এমন কিছু আনন্দঘন সময় আছে, যেটা পাবার আশায় আপনি তার অত্যাচারগুলিও সহ্য করে নেন।

কিন্তু একটা সম্পর্ক কি এমন হওয়া উচিত যেখানে বছরের ৩৬৫ দিনেই কষ্ট পেতে হবে। যেখানে সে আপনার কথা ভাবছে না, ভাবছে তার নিজের কথা। সে আপনাকে কষ্ট দিয়েও মজা পাচ্ছে। আপনার পছন্দ-অপছন্দের থোড়াই পাত্তা দেয় সে। এমন একটা বন্ধনে নিজেকে আপনি বেধে রাখছেন শুধু একটু 'ভালোবাসা' পাবার আশায়? দুইদিক থেকেই এখন সম্পর্কটা হয়ে গেল *'নিজের আকাঙ্ক্ষা' 'নিজের ইচ্ছা'* কে গুরুত্ব দিয়ে। তাই আজীবন ভালোবাসার বন্ধনে থেকেও শেষ পর্যন্ত মনে হয় 'আমি কতো একা'... দিনশেষে যেন আপনার কষ্টগুলো বুঝার মত কেউ-ই নেই। কখনো আপনি কাছের বন্ধুকে ফোন করে বুঝানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু এভাবে প্রতিদিন আর কতো? তাই একসময় নিজেই ডিপ্রেসড হয়ে পড়েন। 'ভালোবাসা' যা আপনাকে আনন্দ দেয়ার কথা ছিল, তা হয়ে যায় আপনার জীবনের চরম একটা *'পেইন'* ! কিন্তু এমনটা তো হবার কথা ছিল না!

মানুষের এই ভালোবাসা পাওয়া, ভালোবাসতে চাওয়ার অনুভূতিগুলো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তা কিভাবে সঠিকভাবে পূরণ হবে তা আল্লাহ খুব ভালোভাবে বলে দিয়েছেন। **ইসলামে প্রেমপূর্ণ সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম বিয়ে।** আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন সঙ্গী, আর তাদেরকে বানিয়েছেন পরস্পরের জন্য **'লিবাস'** অর্থাৎ পোশাক যে আপনার দোষ-ত্রুটি গুলো ঢেকে রাখবে, আপনাকে রক্ষা করবে, যে আপনার সাথে থেকে আপনার সৌন্দর্য্য বর্ধন করবে। এমন একজন নয় যে আপনাকে 'ব্যবহার' করবে ইচ্ছামত তারপর দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিবে। আপনি ভালোবাসা পাবার জন্য আকুল হন, বিয়ের আগে প্রেম না থাকলে, কীভাবে বিয়ের পরে তাকে ভালোবাসবেন বুঝতে পারেন না! অথচ আল্লাহ তা'আলার কতো সহজ হিসাব, কতো দয়া। তিনি বলেন, বিয়ে হলে তিনিই আপনার মাঝে সৃষ্টি করে দিবেন দয়া, মমতা আর প্রেম। যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি কি আপনাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারবেন না?

স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ইসলামে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **'তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি সেরা যে তার স্ত্রীর কাছে সেরা (স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করে)'** - এ কথাটি যেই পুরুষ মেনে চলেন তিনি কীভাবে তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন? স্ত্রীর প্রতি তার আচরণ হবে নম্র, ভালবাসায় মেশানো কথা দিয়ে তিনি বউ এর মন জয় করবেন, স্ত্রী কে সম্মানের সাথে দেখেশুনে রাখবেন। তেমনি নারীদের প্রতি বলা হয়েছে, **যদি একজন মুসলিমাহ নামাজ পড়ে, রমযান মাসে রোজা রাখে, পবিত্রতা রক্ষা করে এবং স্বামীর কথা মেনে চলে তাহলে তাকে বলা হবেঃ 'যে দরজা দিয়ে খুশি জান্নাতে প্রবেশ করুন'**.. একজন স্ত্রী যিনি আল্লাহকে ভয় পান আর জান্নাতে যাবার স্বপ্ন দেখেন তিনি কি পারবেন স্বামীকে কষ্ট দিতে? স্বামীর ভালো কথা না শুনতে? তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন কীভাবে স্বামীকে খুশি করা যায়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, যার মাঝে এই আল্লাহর ভয় নেই, কী তাকে আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করা থেকে বাঁধা দিবে? কোন মহৎ কারণে সে আপনার কথা নিজের কামনা-বাসনার চেয়ে বেশি চিন্তা করবে? অনেককে দেখেছি যারা চুটিয়ে প্রেম করে বিয়ে করবার পরেও বিবাহ জীবনে সুখী হয় না। এর কারণ অল্প বয়সের তীব্র আকর্ষণ বেশিদিন টিকে থাকে না। শারীরিক সৌন্দর্য্যের মোহ দিয়ে বেশিদিন কাউকে ভুলিয়ে রাখা যায়না, তাছাড়া চরিত্র আচার-ব্যবহার বাদে টাকা-পয়সা, রূপ-সৌন্দর্য্য এ সবই ক্ষণস্থায়ী। বিয়ের কিছুদিন পর তাই বউ কে মনে হয় *বোরিং*, বউ রেখে অফিসের কলিগটাকেই বেশি সুন্দর লাগে। স্বামীকে মনে হয় *'কই আগের মত তো আর ভালবাসে না'* এর চেয়ে আমার বন্ধুটাই তো আমার ফিলিংস এর বেশি কদর করে। এভাবে সম্পর্কে নানা রকম টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে আজ ভালবাসছে, সে আগামীকাল নিজের শখের বশে অন্য কারো কাছে ছুটে যেতেও দ্বিধা করবে না। নিজের ফ্রিডম থেকে যে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে অবজ্ঞা করতে পারে, সে আপনাকে অবজ্ঞা করতে পারবে না? তার নিজের কি করা উচিত সেটায় সে আর কারো কথা শুনে না। আপনার কথা কেন শুনবে? তার মাঝে দায়িত্ববোধ আসে নিজের পছন্দমত সময়ে, তাই আজ সে আপনার দায়িত্ব নিলেও কাল সংসার তার কাছে বোঝা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দুজন মানুষ আল্লাহর ভয়ে একে অপরকে ভালবসাবে, শ্রদ্ধা করবে, পরিবারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিবে- এই ভালোবাসার মাঝেই আছে প্রেম, মায়া, শান্তি। এছাড়া রাস্তাঘাটের কোনাচিপায় লুকিয়ে যেই দুইদিনের আবেগময় প্রেম চলে তা খুবই সস্তা। খুবই ভঙ্গুর।

কতিপয় হলকায়ে জিকির আর আমাদের এফএম প্রজন্মের ভালোবাসার গল্প

27 September 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

আমার বাসার নীচতলায় পুরো স্পেসটাই ফাঁকা থাকে, বাড়ির মালিক একটি দরবার শরীফের পীরের মুরিদ। আজকে তাদের পাক্ষিক জিকির দিবস। ঘরভর্তি জনাত্রিশেক লোকের 'লা ইলাহা এল্লাল্লাহ' (ইল্লাল্লাহ হওয়া উচিত) চিৎকারে এলাকা প্রকম্পিত হবার অবস্থা। আল্লাহর একত্ববাদকে কেবলমাত্র চিৎকারের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে বসিয়ে দেয়ার ভাবনায় এই আয়োজন কিনা তা কে জানে!! বিগত ঘন্টাখানেক ধরেই এই সশব্দ জিকির চলছে। চলবে অন্তত রাত দশটা অবধি... গমগম শব্দে তৈরি হয়েছে এক ভয়াল পরিবেশ, বুকে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। তাদের এই সশব্দ স্মরণশালায় নেই কোন সৌন্দর্য, মাধুর্য, শুনে আত্মায় কোন প্রশান্তি আসে না...

পরিষ্কার মনে আছে, কয়েক সপ্তাহ আগে এমনই একদিন শুক্রবারে, এই জিকির পার্টি চলে যাবার পরে পাশের বিল্ডিং এর ছাদে কোন এক কিশোর/কিশোরীর উপলক্ষে ব্যাণ্ড কনসার্টের আয়োজন হয়েছিল। সেখানে শোনা গিয়েছিলো -- *"মীরাবাঈ, হেইলা, দুইলা দরবার নাচায়। ঝাকানাকা ঝাকানাকা দেহ দোলানা"* -- জাতীয় আরো কিছু গান। সেই রাতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক -- সমগ্র এলাকাবাসী দুলছিলো, তাদের কর্ণকুহরে কম্পন উঠেছিল, ইট-কাঠের ঘরবাড়িগুলো থরথরিয়ে কেঁপেছিলো হাই ভলিউমের কাঁপাকাঁপি সাউন্ড সিস্টেমের দুলুনিতে। এমন কনসার্ট হয় হরহামেশাই, প্রয়োজন হয় কেবল একটা উপলক্ষের...

আমাদের দেশের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও এমনই...

যখন সুভানাল্লাহ (সুবহান আল্লাহ উচ্চারণও সঠিক জানেননা বেশিরভাগই), আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পড়ে আরাম করে পেটপুরে খেয়ে, দাঁত খিলাল করে, ধর্মপালনের আত্মতুষ্টিতে ভুগে নরম কোমল বিছানাতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে সামর্থ্যবান যোগ্য *মুসলিম ধার্মিক* মানুষগুলো -- তখন তাদের সন্তানদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে 'এফএম রেডিও'-তে রাতের প্রথম প্রহরে আয়োজিত 'ভালোবাসার গল্প' বা 'লাভ গুরু'।

রাতে দেরি করে ঘুমাতে যাওয়া, অল্প বয়সে মোবাইল ফোন হাতে পাওয়া, বয়ঃসন্ধিকালের আবেগের একাকীত্বে ভুগা এই প্রজন্মের লক্ষ লক্ষ সন্তান কৃত্রিম রোমান্সের আলাপে মুগ্ধ হয়ে, ডুবে গিয়ে মানসিক খরায় ডুবে যেতে থাকে। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর নিঃশেষ সিরিয়ালগুলো, বলিউডি মুভিগুলো, বাস্তবতা বিবর্জিত রোমান্টিক নাটকগুলোর সাথে জুড়ে থাকা এফএম প্রজন্মের সন্তানগুলোর চিন্তার প্রায় পুরোভাগে অনিবার্যভাবেই এইসব প্রেম-রোমান্স দখল করে ফেলে। একদিন তারা জড়িয়ে পড়ে নতুন কোন গল্পে, নতুন কোন উচ্ছ্বাসে। মোবাইল ফোন, ফেসবুকে প্রচুর অশান্তির প্রবাহ, অপ্রয়োজনীয় কথা আর অননুমোদিত উষ্ণতার তরঙ্গ -- যার শেষ কেবলই দুঃসহ অশান্তি আর অনন্ত অশ্রুতে...

এখনকার মোবাইলগুলোতে সহজেই এফএম শোনা যায়, নিষ্পাপ বালক-বালিকারাও সহজেই তা টিউন করতে পারে। জীবনে আদর্শিক আর আনন্দময় কাজ না থাকায় আবশ্যিক অবসরে তারা এফএম কানে লাগায়। ক্রমাগত গান, মিউজিক এসব অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য। গানের সমস্ত কথাই এই প্রেম-ভালোবাসা কেন্দ্রিক হওয়ায়, গানের ফাঁকে আরজে-দের দৌড় থাকে ভালোবাসাকেন্দ্রিক আলাপ আলোচনাত। প্রেমের ভালোবাসা ছাড়া জীবন চলেনা -- এমন সব চিন্তা প্রোথিত হয়েই গেছে নতুন প্রজন্মের কাছে এইসব আরজে দের তুচ্ছ নীচ বাতুলতায়। এফএম রেডিও স্টেশনগুলো দিনভর এমন চেতনাকেই ছড়িয়ে দিচ্ছে । প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা তো টিকেই থাকে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে ভোগে পরিণত করে দিতে। তাদের চিন্তাচেতনাকে অন্তরীণ করে দিতে চায় বস্তুকেন্দ্রিকতা, শরীরকেন্দ্রিকতার অনন্ত শেকলে।

আমি পারতপক্ষে কখনই এফ-এম শুনিনা। সেদিন ৫ মিনিট কানে এসেছিলো তখনই একটা গান শুনলাম। গানটার লিরিক ছিলো -- *"মায়াবী মাতোয়ালি, রে চাঁদরূপওয়ালি, হিজাবের আড়ালে কী ঝলক দেখালি"*... এই গানটা শুনে আমার চোখ ভিজে এসেছিল আপনা-আপনিই। আধুনিক মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টে খুব রিসেন্টলি গানটা বানানো হয়েছে। ভয় হয়, না জানি কত হিজাবী বোনকে এই গানের অত্যাচার শুনতে হবে বখাটেদের কাছ থেকে... যেসব মেয়েরা নিজদের শারীরিক সৌন্দর্যকে আড়াল করে, নম্রতা আর ভদ্রতাকে অর্জন করে জীবন ধারণের চেষ্টা করছেন, এই বিধ্বংসী সংস্কৃতি আর তাদের কীটগুলো দেখছি তাদেরকেও ছেড়ে কথা কইবে না!

যারা আত্মিক জ্ঞানে দরিদ্র, অজ্ঞ আর নির্বোধ, যারা আল্লাহর দ্বীনের সৌন্দর্য দেখেনি, স্বাদ পায়নি কখনো -- তাদের কথা বাদ দিলাম; আমরা যারা বুঝি বলে মনে করি, তারা কি আদৌ কোন সংস্কৃতি তৈরি করছি বা করতে পেরেছি আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য? আমরা কি আদৌ আমাদের সৌন্দর্যময়তাকে দিয়ে কোন সংস্কৃতির স্রোত তৈরি করে তাতে আমাদের মুসলিম কিশোর-কিশোরীদের প্রবাহিত করতে পারছি? তারা কী নিয়ে বড় হচ্ছে? তাদের মানসিক যেই প্রয়োজন, অডিও-ভিজুয়াল, ক্রিয়েটিভ সেক্টরে -- তা তো মৌলিক চাহিদা, সঠিকভাবে পূরণ করতে না পারলে অবশ্যই ভুল জায়গা থেকেই তারা নিবে।

এইসব সংস্কৃতিকে যারা সৃষ্টি করছে, যারা তারুণ্যের উন্মাদনাকে ব্যবহার করে নিপুণভাবে ধ্বংস করছে নীতিবোধ আর পারস্পরিক সম্পর্কের সৌন্দর্যকে, ভালোবাসাকে -- তারা তো এর ফল পাবেই। আল্লাহ সবাইকে একটা সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। [১] এরপর, তার হিসাব হবে কঠিন, তার পাকড়াও অত্যন্ত শক্ত। [২]

এফএম রেডিওর মতন সবক্ষেত্রেই চলমান ভ্রষ্ট আর নষ্ট সংস্কৃতির প্রসারে এই দুনিয়াতেই আমাদের পরিবারগুলোতে শান্তি তিরোহিত, সংসারে অশান্তি, চরিত্রহীনতা, বিকৃত চিন্তাধারা বিস্তৃতি -- কোথায় আমাদের সৃষ্টিশীল প্রবাহ? আমরা কবে আমাদের করণীয় কর্তব্য করব? কবে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্য, প্রযুক্তিতে, সংস্কৃতিতে আমাদের পদচারণা হবে নষ্টদের দাস হয়ে নয়, বরং মুসলিমদের নিজেদের মতন করে? সময় এসেছে জেগে ওঠার -- সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজাবার, সাধ্যমতন...

ভ্রষ্ট আর নষ্টদের এই আগ্রাসন তো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যুদ্ধবিমান আর গোলাবারুদের বিধ্বংসী শক্তির তীব্রতার চাইতে কয়েকশতগুণ বেশি শক্তিশালী এই মারণাস্ত্র। বোমা, মেশিনগান, মর্টারে সর্বোচ্চ মারা যাবে একটা প্রজন্ম, একটা এলাকার মানুষদের। এই মারণাস্ত্রে তিলে তিলে ধ্বংস হয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম, ভুলে যায় আপন পরিচয়; ধ্বংস হয় পূর্ণ আকারে।

স্বপ্ন কারখানা, তিলোত্তমা নগরী

১৯ অক্টোবর, ২০১২

রেফারেন্স

- [১] আল কুরআনুল কারীম :: সূরা আন-নাহল : ৬১
- [২] আল কুরআনুল কারীম :: সূরা আল বুরুজ : ১২
- [ভিডিও] ইমাম সুহাইব ওয়েব - Understanding Islam and Moderation
- [ভিডিও] নুমান আলী খান - Take Hold of Your Future

অবাধ মেলামেশা বা নোংরা কাজে উৎসাহিত করছে এফ এম রেডিওগুলো!

27 May 2015 at 12:42

সংকলনে – বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

এক .

আপনার সামনে অন্য কেউ যদি আপনার ছোটবোনকে বা ভাইকে অন্য কারোর সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বা নোংরা কাজে উৎসাহিত করে তখন আপনি কী করবেন!?

কেউ যদি আপনার কোমলমতি ছোট ভাই অথবা বোনকে কীভাবে প্রেম করতে হয় বা আরেকজনকে পটানো যায় তার শিক্ষা দেয় তখন আপনি কী করবেন!?

আপনার বোনের সঙ্গে গভীর রাতে অন্য কোনো ছেলে যদি মোবাইল ফোনে মাতলামি করে তখন আপনি কী করবেন!? জ্ঞানী বন্ধুদের নিকট প্রশ্ন, আপনারা কি চান যে, কেউ আপনাদের সন্তানের সঙ্গে অন্য কারো ভালোবাসার নামে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার দীক্ষা দিক? কিংবা আপনাদের আদরের সন্তানকে কেউ আপনাদের অবাধ্য হবার দীক্ষা দিক!? অথবা আপনাদের সন্তান অন্য কাউকে নিয়ে ডিজে পার্টিতে যাক ! হোটেলে গিয়ে নষ্টামি করুক!?

বিশ্বাস করুন বন্ধু! এই ধরনের জঘন্য কাজ করতেই কৌশলে উদ্বুদ্ধ করছে বর্তমান সময়ের এফএম স্টেশনগুলো !! একটা সময় এমন ছিলো যে, কেউ প্রকাশ্যে প্রেম –ভালোবাসার কথা বলতেই লজ্জা পেতো। আর বর্তমানে এই এফএম চ্যানেলগুলোর কল্যানে কিছু মানুষ কোটি কোটি মানুষের সামনে যিনা –ব্যাভিচার আধুনিক যুগে যাকে রুম ডেটিং বলা হয় (!) এগুলো প্রকাশ করতে সামান্যতম লজ্জাবোধ ও করছেনা! ইহুদী খৃস্টানদের মদদে দেদারছে যা ইচ্ছে তাই প্রচার করছে এফএম স্টেশনগুলো! আপনি মানুন আর নাইবা মানুন! সত্য প্রকাশের নামে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অশ্লীলতা কে ছড়িয়ে দিয়ে যুবসমাজের এক মহা অবক্ষয় ঘটানোর অপচেষ্টা–ই চালিয়ে যাচ্ছে এই এফএম গুলোর হর্তাকর্তারা !! তাই আপনার নিকট হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, নিজে রেডিও এফএম শুনা থেকে বিরত থাকুন! এবং আপনার আশেপাশের সবাইকে এবিষয়ে অবগত করে এফএম শুনা থেকে বিরত রাখুন!! (সত্যি করে বলুনতো! আমি যেই চিত্রটি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি আপনার কী মনে হয়, সেটা কি বাস্তব নাকি অবাস্তব!?)

দুই.

এফ এম'র অধিকাংশ শ্রোতা স্কুল-কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী। রাতে এফ এম গুলোতে মেয়েদের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। ছেলেদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এফএম শুনলেই বোঝা যায়, একজন আরেকজনকে কাছে পেয়ে কতো আনন্দে ছেলে-মেয়েরা রাত পার করে দিচ্ছে। তাদের ফুর্তির সীমা নেই। যেন বাঁধভাঙা উল্লাস। মুঠোফোনের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তায় একজন অন্যজনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে প্রেমকাতর কথাবার্তা। মোবাইলেও কখনো কখনো প্রেমবিষয়ক কথা হয় আরজের সঙ্গে। আরজে শ্রোতার সমস্যা শুনছেন এবং সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন। যেন স্বপ্নে পাওয়া অলৌকিক ক্ষমতা। গভীর রাতে এদেশের রেডিও জকিরা হয়ে যান মুশকিল আসানকারী কবিরাজ।

অমার্জিত অশ্লীল কথার তুফান ছোটে তাদের মুখে। পরিকল্পিত ভাবেই এসব অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। নতুবা ঢাকাএফএম 'নেভার মাইন্ড' ও 'ক্লাব নাইনটি ফোর', এবিসি 'পার্টি নাইট' এবং পিপলসরেডিও 'ড্রিমল্যান্ড এক্সপ্রেস'-এর মতো ফালতু ছ্যাবলা নোংরা উদ্ভট অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করতো না।

নোংরামি আর অশ্লীলতা রাতের শো'গুলোতে মাত্রা হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে প্রভাষক এম. আবদুল্লাহ সরকার লিখেছেন, 'আরজেরা যৌন সুড়সুড়িমূলক গান শোনাতে থাকেন সারা রাত ধরে। রাতভর চলে টিনএজদের প্রেম, অশ্লীল কথাবার্তা। পাঠানো হয় নোংরা ম্যাসেজ। শ্রোতাদের মধ্যে যারা মেয়ে, তারাও ঢালাও প্রেম-পিরিতের কথা এবং নানা ঢংয়ের যৌনতা নিয়ে কথা চালাচালি করে যাচ্ছে অহরহ। যেন এর কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। কারো কাছেই যেন জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই।'

এভাবে যারাও একটু ভালো থাকতে চাইতো, তাদেরকেও অনৈতিক কাজের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে এফএম।

তিন .

কিছুদিন আগে এক বড় ভাই কোন এক কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে আমার পরবর্তী প্রজন্মকে কানের ডাক্তার বানাব ।আমি প্রশ্ন করলাম কেন? হঠাৎ এদিকে উৎসাহিত হবার কারণ কি? তিনি বললেন, কারণ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার বর্তমান তরুন প্রজন্ম চব্বিশ ঘন্টা কানে হেডফোন গোজে এফ.এম শোনায় ব্যস্ত ।যার ফলশ্র"তিতে অদূর ভবিষ্যৎতে তাদের শ্রবন শক্তি হ্রাস পাবে ।

আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে কানের ডাক্তারের পসার ।তরুনদের কানের অসুখের দাওয়াই দেয়া আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য নয় ।বরং আমরা কৌতুহলী এফ.এম. চ্যানেলের সেই সব মোহময় অনুষ্ঠান মালার ব্যাপারে যার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে আমাদের তরুন সমাজ ।

বর্তমান এই এফ.এম এর যুগে এই হেডফোন নামক যন্ত্রটির ব্যবহার বেড়ে গেছে বিশেষ করে বিভাগীয় ও জেলা শহর গুলোতে ।আর এরই সাথে বেড়ে গেছে এফ.এম রেডিও সম্বলিত মোবাইল ফোনের কদর ।যেটা মোবাইল ফোণ এর বিজ্ঞাপনে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ।

রাস্তায় বের হলে যখন দেখা যায় তরুন তরুনী প্রায় সবার কানেই হেডফোন; ঠিক তখনই এফ.এম.ষ্টেশনগুলি ব্যস্ত লাভ গুরু, নিত্যবালা (Girl Everyday) মাস্তি আনলিমিটেড ইত্যাদি চটকদার শিরোনামে নোংরামি ও অশ্লীলতায় ভরপুর অনুষ্ঠান সম্প্রচারে ।তখন RJ রা হয়ে যায় আমাদের তরুনদের প্রেম গুরু ।প্রেম গুরু বলার কারণ হচ্ছে তারা বিভিন্ন রকম সহীহ প্রেমের টিপস্ দেয় এবং মাঝে মাঝে শাসন ও করে, যদি কেউ তার বয়ফ্রেন্ড অথবা গার্ল ফ্রেন্ড এর সাথে খারাপ ব্যবহার করে ।নয়া কিছিমের মাষ্টার আর কি!

এফ.এম. চ্যানেলগুলির কাজঃ এই এফ.এম চ্যানেলগুলির প্রধান কাজই হচ্ছে আমাদের সমাজের তরুন তরুনীদেরকে বিপথগামী করা ।

আর এই বিপদগামী করার কাজ তারা তাদের সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই করে যাচ্ছে।পাঠক বলুনতো, আপনার সামনে অন্য কেউ যদি আপনার ছোট বোনকে/ভাইকে অন্য কারোর সাথে অবাধ মেলামেশা বা নোংরা কাজে উৎসাহিত করে আপনি কি করবেন? কেউ যদি কিভাবে প্রেম করতে হয় বা আরেক জন কে পটানো যায় তার শিক্ষা দেয় আপনি কি করবেন? আপনার বোনের সাথে গভীর রাতে অন্য কোন ছেলে যদি মোবাইল ফোনে মাতলামী করে আপনি কি করবেন? অভিবাবক সমাজের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আপনারা কি চান যে, আপনাদেরকে কেউ আপনাদের সন্তানের সাথে অন্য কারুর ভালবাসার নামে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ককে মেনে নেয়ার দীক্ষা দিক? কিংবা সন্তানকে কেউ আপনাদের অবাধ্য হবার দীক্ষা দিক? অথবা আপনাদের সন্তান অন্য কাউকে নিয়ে DJ পার্টিতে যাক, হোটেলে গিয়ে নষ্টামী করুক? এই ধরনের জঘন্য কাজ করতেই উদ্বুদ্ধ করছে এই এফ.এম. ষ্টেশন গুলি তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রোগামের মাধ্যমে ।বিশেষ করে রেডিও আমার যে কাজটি খুব ভালভাবে করেই তরুন তরুনীদের প্রাণ জয় করে চলছে তাদের সানডে নাইট এবং লাভ গুরু প্রোগ্রামের মাধ্যমে ।

ইদানিং যোগ হয়েছে নিত্যবালা (Girl Everyday) যেটা চলে দিনের বেলা বাকি দুটি সম্প্রচারিত হয় রাতে ।লাভ গুরু প্রোগ্রামে একজন গুরু (নাকি গরু) থাকেন সাথে থাকে আমন্ত্রিত অতিথি ।আমন্ত্রিত অতিথি হয় কোন তরুন বা তরুনী ।তারা তাদের সফল/বিফল প্রেমের কাহিনী শোনান ।এবং পরে গরুটা বিভিন্ন ভুল ধরিয়ে দেন এবং অন্য শ্রোতাদের এ থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা বলেন ।এবং কিভাবে ভালবাসার নামে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ককে আরও পাকাপোক্ত করা যায় তার বিভিন্ন টিপস দেন ।আগে রেডিওতে শুনতাম বিভিন্ন মানুষদেরকে আনা হতো যারা দিনে একবেলা খাবার ও খেতে পারত না। এখন অনেক স্বচ্ছল ।তাদের সফলতার কাহিনী শুনানো হতো অন্য মানুষদেরকে

উৎসাহী করার জন্য ।আর এখন ঋগ চ্যানেলগুলো বিভিন্ন ধরনের কথা শুনিয়ে আমাদের তরুনদের কে উৎসাহী করছে ফ্রি মিক্সিং এ গা ভাসিয়ে দেয়ার জন্য । সম্প্রতি Love Goru পদক্ষেপ নিয়েছে চল্লিশ উর্ধ্ব একজন মানুষকে তার প্রোগ্রামে রাখার এবং রাখছে ও ।যেটার মাধ্যমে অভিবাবক কে রাজী করানো হবে সন্তানদের ভালবাসার নামে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ককে মেনে নেয়ার জন্য ।কত জ্ঞানী মানুষ এই গরুটা সেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে অভিবাবক রাজী তো সব ঠিক ।আর সানডে নাইট প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে ফোন কলের মাধ্যমে তরুন তরুনীদের বিভিন্ন ধরনের আকৃষ্ট করার টিপস শিখানো ।বিশেষ করে তরুনীরা যখন ফোন করে তখন সমাজের নতুন আইডল RJ রা খুব উৎসাহের সাথে কথা বলে এবং কথা দীর্ঘায়িত করে ।শুধু তাই নয় তারা তরুনীদের সাথে অনেক অশ্লীল আবেগ প্রকাশ করে থাকে ।এভাবে চলে গভীর রাত পর্যন্ত ।আর অন্য দিকে অন্যান্য চ্যানেল গুলির এ একই অবস্থা, রাত যত গভীর হয় নষ্টামীর জগৎ তত সম্প্রসারিত হয় ।

সেদিন আবার শুনতে পেলাম একটা প্রোগ্রাম নাম তার প্রেম রোগ! আফসোস ! গভীর রাতে যে জাতির যুবক যুবতীরা এফ এম রেডিওতে ফোন করে " প্রেম রোগ" নামক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় সে জাতির নৈতিকতা কোথায় থাকবে? অশ্লীল কৌতুক, কুরুচীপূর্ণ কথা বার্তা সবই আছে সেখানে! আমার কত ভাই বোনেরা এ সব অনুষ্ঠান শুনছে! আল্লাহ এ জাতির ভবিষ্যত কী হবে?

প্রেম-itz a গেম

24 September 2014

লেখকঃ মুজাহিদ রাসেল

আজকাল আমাদের কাছে প্রেম,ভালবাসা শব্দদ্বয় অতীব সুখকর এবং পরিচিত শব্দ। কোন কোন ছেলেরা এটাকে cool সাজারও একটা অন্যতম উপায় বলে মনে করে। কারো যদি গার্লফ্রেন্ড না থাকে সে তার পুরুষত্ব নিয়েও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে এরকম উদাহরনও নেহায়েত কম নয়। কিছুদিন আগে একজন ফেসবুকে প্রেম করার খায়েস হইছে জানিয়ে স্ট্যাটাস দিল দেখলাম (May be পুরুষত্ব না থাকার অপবাদ ঘোচানোর জন্য), আবার অনেকে আছে একাধিক connection এ connected। একটা সময় নচিকেতার খুব ফ্যান ছিলাম বাদ্যসহ গানবাজনা হারাম বলে এখনও আর ওসকল গান না শুনার চেষ্টা করি। নচিকেতা তার গানে গেয়েছিলেন

"সংকীর্ন মনের মানুষ যারা তারাই তো ভালবাসে একবার

যার মন বড় যত দেখে ভাল অবিয়ত তারাই তো ভালবাসে

বারবার।"

হয়ত অনেকে কয়েকটি প্রেম করে বড় হৃদয়ের চেষ্টায় আছে কিনা আমি জানি না। ফেসবুকে একটা পেজ দেখলাম, "গার্লফ্রেন্ড/বয়ফ্রেন্ড" একটা হলে ভাল হয়, দুটি হলে আর নয়।

অনেকে বড় মনের পরিচয় দেয়ার জন্য প্রেম করে তা নয়। আমার এক পরিচিত লোকের সম্পর্কে শুনলাম দুই তিনটার সাথে লাইন মারছে (দুঃখিত চলতি ভাষা ব্যবহারের জন্য) কারন জিজ্ঞেস করতেই বলল, "আরে মামু Back up রাখলাম আর কি"।

চিত্রগুলো খুব একটা আনকমন না। এখন আবার আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করলাম গার্লফ্রেন্ডকে বউ ডাকা (মেয়েরা বয়ফ্রেন্ডকে কি ডাকে জানি না), আমার এক ফ্রেন্ড প্রেম করে বলেই আমি জানি। একদিন আমরা বসেছিলাম ঐ বন্ধুটি দেখলাম পাশে দিয়ে চলে যাওয়া একটা মেয়ের দিকে তীক্ষন আর লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম কিরে তোর না গার্লফ্রেন্ড আছে? উত্তর দিল আরে তার সাথে যে বিয়ে হবে এমন কোন কথা আছে? সত্যিই সেলুকাস।

আমার দাড়ি টুপির জন্য কিংবা অন্য কোন কারনেই হোক বন্ধুরা আমাকে এসব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে ভালবাসে। একদিন একবন্ধু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দোস্ত প্রেম করা কি জায়েজ? ওখানে আরো অনেকে ছিল।

আমি বললাম হ্যাঁ জায়েজ। সকলে কিছুটা বিস্মিত হল অনেকের চোখে মুখে কিছুটা স্বস্তির ছাপও লক্ষ্য করলাম।

কেউ কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেই আমি সাধারনত এমন ভাবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি যেন সে ভড়কে যায়। একবার কে যেন আমাকে (কি প্রশ্ন করেছিল ঠিক মনে নেই) প্রশ্ন করেছিল , আমি তাকে সরাসরি বলে ফেললাম আরে তুমি তো কাফির। সে দেখলাম কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল। তাকে বললাম আরে এত হতভম্ব হওয়ার কিছু নাই,

আমিও কাফির। এবার দেখলাম সে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি হতভম্ব হয়ে গেল। আমি বলেছিলাম আল্লাহ কোরানে বলেছেন–

যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। বাকারা–২৫৬

এখানে আল্লাহ তা আলা তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য বলেন নি? আল্লাহ যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হল "ইয়াকফুর", আল্লাহ এখানে কুফর করার জন্য বলেছেন। সকল মিথ্যা স্রষ্টা ও তাগুতের বিরুদ্ধে আমরা কুফরী করি বলেই আমরা কাফির । সে দেখলাম কিছুটা আশস্ত হয়ে ঠোটের কিনারায় একটু মৃদু হাসি দিল। যা বলছিলাম এ প্রেম ভালবাসা অবশ্যই জায়েজ স্রষ্টা প্রেম, মানব প্রেম, জীবপ্রেম, পিতৃপ্রেম, মাতৃপ্রেম, দেশপ্রেম, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেম সবই তো জায়েজ ,না জায়েজ কে বললো রে ভাই"।

ও বলল না না এসব প্রেম না আমি বলছি বিয়ের আগে ছেলে মেয়েদের প্রেম । আমি বললাম ও আচ্ছা (ব্যাপারটা আমি আগে বুঝি নাই তা কিন্তু নয়) LBW এর কথা বলছ? Love before wedding এটি ইসলামে হারাম, ইসলাম Love after wedding মানে। ইসলাম LAW মানে কিন্তু LBW মানে না। LAW মানে আইন, শরীয়ত। মানলে ধরা খাওয়ার চান্স নাই। LBW হলে তো পুরাই ধরা।

মানুষের মধ্যে ইদানিং খুব সচেতনতা গ্রো করেছে, কিছু শুনলে রেফারেন্স চায়। অত্যন্ত ভাল আলামত। তাই একজন আমার কাছে দলিলও চেয়ে বসল। আমি বললাম আল্লাহ কি কুরআনে সুরা নূরে ৩০ নং আয়াতে পুরুষদেরকে এবং ৩১ নং আয়াতে নারীদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেন নি? যেখানে চোখ পড়লেই ইসলামে দৃষ্টি সরানোর কথা বলেছেন সেখানে TSC , ধানমন্ডি লেক কিংবা ফুলার রোডের রাস্তার পাশে বসে পুতুপুতু কথা বলা ইসলাম জায়েজ করে এ চিন্তা আসল কোথায় থেকে?

মহানবী (সাঃ) বলেছেন কোন জায়গায় ছেলে ও মেয়ে একা একসাথে থাকলে তৃতীয়জন হচ্ছে শয়তান"।

অনেকে আবার প্রেম পবিত্র, প্রেম শ্বাশ্বত–স্বর্গীয়। এসকল বুলি আওড়ায়। ভাই দলিল কি?

বাংলা সিনেমা: ইলিয়াস কাঞ্চন অন্তজু ঘোষকে বলেছে, Amazing...

আমাদের গানে গানে প্রচার করা হয় "প্রেম করেছেন ইউসুফ নবী, তার প্রেমে জুলেখা বিবি গোওওওওও",হারাম! হারাম! গানে গানে আল্লাহর এক নবীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছে। ইবনে কাসীর থেকে সুরা ইউসুফ এর তাফসীর খানা পড়ে নিন

ইদানিং আবার হালাল প্রেমের জোয়ারে ও দুএকজন গা ভাসিয়েছে, বোরকা পড়ে প্রেম করে হাত ধরাধরি করে হাটলেও নাকি এটা হালাল প্রেম (আল্লাহ রক্ষা কর), আর সত্যিই আজিব এসমাজ ব্যাবস্থা আপনার বিয়ের বয়স হয়েছে আপনাকে বিয়ে দেবে না, অথচ প্রেম করলে কোন দোষ নাই। তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সমস্যা, হ্যানতেনের লিষ্ট দেখায়।

কিছু ছেলে আবার এমনও ধারনা পোষন করে মেয়েরা নাকি সিগারেটের মত টানা শেষে ছুড়ে ফেলে দাও। একবার ব্লগে একজন প্রশ্ন করেছিল আপনি যাকে স্ত্রী হিসেবে চান তার বিয়ের আগে প্রেম করাকে কিভাবে দেখেন? অনেকে অনেক রকম উত্তর দিয়েছিল। তার মধ্যে কিছু উত্তর সত্যিই চিন্তার খোরাক জোগায়।

একজন বলল- আমি সাপোর্ট করি না।

আরেকজন বলল – বিয়ের আগে থাকলে সমস্যা নেই, বিয়ের পড়ে যেন না থাকে।

অপর আরেকজন বলল – প্রেম থাকলে কোন সমস্যা নেই কিন্তু শারীরিক কোন সম্পর্ক থাকতে পারবে না।

আরেকজন বলল দেখলাম – বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক থাকলেও কোন সমস্যা নেই। তবে তার কোন ভিডিও বের হতে পারবে না। (সম্ভবত প্রভা আর চৈতীর ভিডিও দেখে এই আইডিয়া পেয়েছে)

সত্যিই অদ্ভুত মানুষের বিবেক। আজকাল মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন মুক্তমনারাও বিবেক নামক জিনিসের উপকারিতা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাইতো সেই বিবেকের হুইল শয়তানের হাতে দিয়ে সবকিছুর বৈধতা খুব ভালভাবেই দিয়ে যাচ্ছেন।

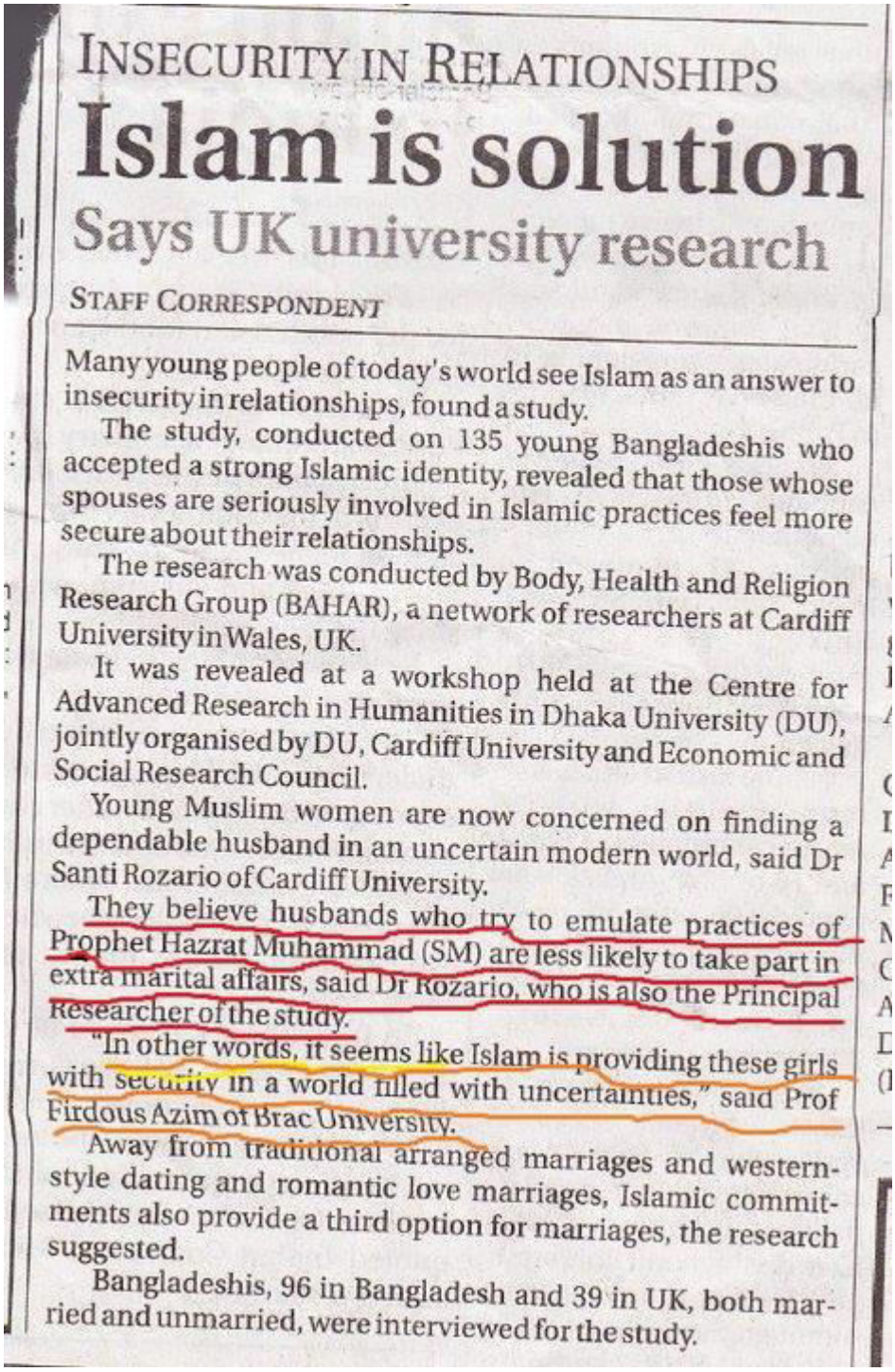
বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান লেখক হুমায়ুন আহমেদ তার এক বইতে বলেছিলেন "প্রত্যেক প্রেমের পিছনেই দেহ কাজ করে", আমি জানি অনেক প্রেমিক প্রেমিকারা এ কথায় কিছুটা রব তোলার চেষ্টা করলেও সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকার সাথে সুসম্পর্কওয়ালা পাবলিকরা এতে দ্বিমত করবে না।

প্রেমিকের হাতে মুন্নী আর ঝরনাদের খুনকে অনেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললেও এসকল ঘটনা যে সমাজের নষ্টচিত্রের প্রতিনিধিত্ব করছে এটা নিশ্চিত।

রুপালী আক্তার কিংবা অর্পনা আক্তারের আত্মহত্যা আমাদের কিসের মেসেজ দিচ্ছে তাও একবার ভেবে দেখা দরকার।

আর ছেলে এবং মেয়েদেরকে বলছি ইসলামী নিষিদ্ধ কর্ম সাধনের পর সুখের আশা করাটা কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ বলেই আমার মনে হয়।

practising মুসলিম ছেলেদের জন্য সুসংবাদঃ ৮ ই জানুয়ারী the daily independent এ একটা খবর এসেছিল "islam is solution"শিরোনামে। খবরে বলা হয় যে মেয়েরা স্বামী হিসেবে এমন ছেলেকে পছন্দ করে সে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)কে অনুসরন করে এবং বিবাহ বহির্ভুত সর্ম্পকে জড়ায় না।



INSECURITY IN RELATIONSHIPS

Islam is solution

Says UK university research

STAFF CORRESPONDENT

Many young people of today's world see Islam as an answer to insecurity in relationships, found a study.

The study, conducted on 135 young Bangladeshis who accepted a strong Islamic identity, revealed that those whose spouses are seriously involved in Islamic practices feel more secure about their relationships.

The research was conducted by Body, Health and Religion Research Group (BAHAR), a network of researchers at Cardiff University in Wales, UK.

It was revealed at a workshop held at the Centre for Advanced Research in Humanities in Dhaka University (DU), jointly organised by DU, Cardiff University and Economic and Social Research Council.

Young Muslim women are now concerned on finding a dependable husband in an uncertain modern world, said Dr Santi Rozario of Cardiff University.

They believe husbands who try to emulate practices of Prophet Hazrat Muhammad (SM) are less likely to take part in extra marital affairs, said Dr Rozario, who is also the Principal Researcher of the study.

"In other words, it seems like Islam is providing these girls with security in a world filled with uncertainties," said Prof Firdous Azim of Brac University.

Away from traditional arranged marriages and western-style dating and romantic love marriages, Islamic commitments also provide a third option for marriages, the research suggested.

Bangladeshis, 96 in Bangladesh and 39 in UK, both married and unmarried, were interviewed for the study.

আমার একটি কঠিন প্রশ্নের উত্তরঃ

বুয়েটের আমার এক সিনিয়র বড় ভাইকে (আমার অত্যন্ত প্রিয় যার তাকওয়ায় আমি মুগ্ধ) একদিন জিজ্ঞেস করলাম ভাই দুনিয়ার যে অবস্থা তাতে pure spouse পাওয়া তো বড়ই কষ্টের। ভাইয়া বললেন "দেখ মুজাহিদ, আল্লাহ চোখকে হেফাজত করতে বলেছেন তাই চোখকে হেফাজত করছি। কি হয় না হয় জানিনা তবে আল্লাহ অবশ্যই ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন বলেই আমার বিশ্বাস", আর আল্লাহর কাছে এ দোয়া কর–

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। সুরা ফুরকান-৭৪

মনে মনে চিন্তা করলাম আহা! আমাদের সাথে তাঁর তাকওয়ার কত difference!!!

মূলত ভাইয়ার এ কথা আমাদের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ন মেসেজ-----

প্রেম করিব তোমার সনে

24 September 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

আজকে ওকে পেয়েছি আমি! ওর একদিন কি আমার একদিন। কি মনে করেছে সে? আমাকে একটা মিথ্যা কথা বলবে আর আমি যাচাই করে দেখবনা? আমাকে ঝেড়ে ফেলা কি এতই সহজ? প্রেম আমি করবই। এত কষ্ট করে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম। চার বছর কি শুধু লেখাপড়া করেই কাটিয়ে দেব? জীবনের রঙ রূপ গন্ধ স্পর্শ কি উপভোগ করে দেখবনা? ইউনিভার্সিটি ভর্তি হবার আগে থেকেই স্বপ্ন দেখতাম ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী আর স্মার্ট মেয়েটাকেই আমার গার্লফ্রেন্ড বানাবো, তাকে নিয়ে পার্কে ঘুরব, চীনাবাদাম খাব, সবাই আমাদের দিকে হিংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে। ভর্তি পেয়েই এই টার্গেট নিয়ে মাঠে নামলাম। নিজেকে আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে- তাই প্রথম দিন থেকেই ভাল ভাল জামাকাপড় পরি, প্রচুর স্টাইল মারি, মেয়েদের কাছেপিছে দেখলেই উচ্চস্বরে কথা বলি যেন তারা ফিরে তাকায়। কত মেয়ে আমার দিকে আড়চোখে তাকায়, কিছু বলতে চায়, অথচ যার জন্য এতকিছু রপ্ত করছি সে কিনা আমাকে পাত্তাই দেয়না! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!

ঐ তো সাদিয়া আসছে! আমাকে দেখেই অন্যদিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

‘তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ, আমি খবর নিয়ে জেনেছি তুমি বিবাহিতা নও’।

সে কিছু বলেনা, শীতল দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে, ‘চল, মাঠে গিয়ে বসি’।

আমার হৃদয়বীনায় ঝঙ্কার ওঠে, যেন মাঠে নয় স্বর্গের উদ্যানে ওর সাথে অনন্তকাল যাপন করার জন্য রওয়ানা হয়েছি আমি!

আমরা মাঠে গিয়ে ঘাসের ওপর মুখোমুখি হয়ে বসি। আহ! কি রোমান্টিক! আবেগে চোখ বন্ধ হয়ে যায় আমার।

চোখ মেলে দেখি সাদিয়ার দু’পাশে ওর দুই বান্ধবী ওর গা ঘেঁষে বসে আছে। হৃদয়ের তানপুরাটায় ছেদ পড়ে।

‘ওরা এখানে কি করছে?’

‘আমাকে যা বলার ওদের সামনেই বলতে হবে’, দৃঢ়ভাবে বলে সাদিয়া।

আমিও দমে যাবার পাত্র নই, বিপদে ডরেনা বীর।

বললাম, ‘তুমি আমাকে মিথ্যা বললে কেন?’

‘তুমি কি জানোনা কেন?’

চুপ করে থাকি।

‘তুমি আসলে কি চাও, বল তো?’

‘তোমাকে ভালোবাসতে চাই’।

‘তারপর?’

‘তারপর আর কি? প্রেম করতে চাই’।

‘তারপর?’

‘তারপর... যদি ইউনিভার্সিটি শেষ করার পর সব ঠিকঠাক থাকে হয়ত আমাদের বিয়ে হবে’।

‘নয়ত?’

‘নয়ত এই স্মৃতিটাই আমাদের জন্য বেদনামধুর হয়ে থাকবে’।

‘আমি এই শর্তে রাজী নই। কারণ এতে প্রাপ্তি আছে দায়বদ্ধতা নেই। তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে তোমার বাবামাকে নিয়ে এসো, আমার বাবামা রাজী হলে শুধু চার বছর কেন সারাজীবন আমি তোমার সাথে থাকব। এর বাইরে একটি মূহূর্তও আমি তোমার সাথে কাটাতে নারাজ’।

‘কিন্তু এখন আমি বিয়ে করব কি করে?! সবে তো মাত্র ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, এখন কি বাবামা বিয়ে দেবেন? আমার কি কোন ইনকাম আছে? আমি তোমায় রাখব কোথায়, খাওয়াব কি?’

‘তাহলে তুমিই বল, আমি যদি তোমাকে প্রস্তাব দিতাম আমি তোমার কোন দায়িত্ব নেবনা কিন্তু তোমার সাহচর্য উপভোগ করব, এই শর্তে তুমি কি আমার সাথে থাকতে রাজী হতে?’

চিন্তায় পড়ে গেলাম। ‘হ্যাঁ’ও বলতে পারিনা, ‘না’ও বলতে পারিনা।

‘তুমি আমাকে কেন পছন্দ কর?’

যাক, বাঁচা গেল। সহজতর প্রসঙ্গে আলাপ করতে পেরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম।

‘তুমি লম্বা, ফর্সা, সুন্দরী, তোমার চোখ দু’টো অদ্ভুত সুন্দর…’

‘তার মানে আমার মেধা, মনন, চরিত্র কোন ব্যাপার না। এখন ভেবে দেখ, তুমি যে জিনিসগুলোর কথা বললে এগুলো কোনটাই আমার অর্জন নয়, সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত উপহার, তিনি যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে নিতে পারেন। আমি যদি অ্যাক্সিডেন্টে পা দু’টো হারিয়ে ফেলি আমার উচ্চতা কমে যাবে, রোদে জ্বলে আমি তামাটে হয়ে যেতে পারি, কয়েকবছরের মধ্যেই এই চামড়া ঝুলে যাবে তারপর কুঁচকে যাবে, আর আমি যদি অন্ধ হয়ে যাই তাহলে আমার চোখ দু’টো আর কাউকে আকর্ষন করতে পারবেনা। তার মানে তখন আর তোমার কাছে আমার কোন মূল্য থাকবেনা। তাইনা? এটাকে কি ভালোবাসা বলা যায়?’

এ কি বিপদে পড়া গেল ভাই! নায়িকারা তো দেখি তাদের সুন্দর বললে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে যায়, যেন সৃষ্টিকর্তা তাদের সামনে মডেল উপস্থাপন করে তাদের পছন্দ করতে দিয়েছিলেন, ‘বল, তুমি কেমন হতে চাও’, তাই সুন্দরী হবার কৃতিত্ব তাদেরই! এই মেয়ে তো বড় জ্বালালো!

‘শোন, আমি এজন্যও তোমাকে পছন্দ করি যে তুমি অন্নেক স্মার্ট’।

‘তাই? স্মার্টের দু’টো ডেফিনেশান আছে। একটা হোল যে দেখতে শুনতে স্মার্ট। সেটা নির্ভর করে তার পোশাক আশাক, কথাবার্তা, পসচার এবং চালচলনের ওপর। তার মানে যদি আমি ভাল জুতোজামা পরতে না পারি, কুঁজো হয়ে যাই কিংবা কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি তাহলেও তোমার কাছে আমার কোন মূল্য থাকবেনা!’

কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করছে আমার!

‘স্মার্টের আরেকটা অর্থ হোল বুদ্ধিমান। আমি মনে করি এই বয়সটা আমার নিজেকে গড়ে তোলার সময়– এখন আমার সবচেয়ে জরুরী কাজ লেখাপড়া করে জ্ঞানার্জন করা, যে বাবামা ভাইবোন আমাকে এতগুলো বছর ছায়াবৃক্ষের মত আগলে রেখেছেন তাদের সম্মানের প্রতি সচেতন হওয়া, সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শেখা, সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করা। তোমার কি মনে হয় আমি যদি এই সময়টা অনর্থক পার্কে ঘুরে, চীনাবাদাম খেয়ে ব্যায় করি সেটা স্মার্টনেসের পরিচায়ক হবে? কেন এতগুলো লক্ষ্য বাদ দিয়ে আমরা একটি লক্ষ্যহীন সম্পর্কের পেছনে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেব, বলতে পারো?’

যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা।

‘শোন, তুমি তো আমাকে ভালোবাস, তাইনা?’

‘হ্যাঁ’।

‘তাই যদি হয় তাহলে আমি কি বন্ধু হিসেবে তোমাকে কিছু কথা বলতে পারি?’

‘অবশ্যই’।

‘তুমি একজন স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান ছেলে। তোমার সামনে আছে অপার সম্ভাবনা। তোমার বাবামা এই সম্ভাবনার কথা ভেবে নিজেদের অনেক আশা আকাঙ্খা, কষ্ট, ত্যাগ তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমাকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে পড়তে পাঠিয়েছেন। অথচ তারা চাইলেই তোমাকে কোন গাড়ীর গ্যারেজে মেকানিক হিসেবে কিংবা কোন অফিসে পিয়নের চাকরী দিয়ে টাকা ইনকাম করতে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন! তাহলে তাদের এই ত্যাগের কথা কি তোমার মাথায় রাখা উচিত নয়? লেখাপড়া করে পৃথিবীটাকে জানার মাধ্যমে, নিজেকে গড়ে তুলে আশেপাশের মানুষগুলোর কষ্টে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তুমি তোমার বাবামায়ের এই কষ্টের মূল্যায়ন করতে পারো, একজন সফল এবং ভাল মানুষ হবার মাধ্যমে তুমি তাদের সম্মান উষ্কিত করতে পারো। এভাবে নিজেকে গড়ার সংকল্প নিয়ে নামলে কয়েকটা বছর কোনদিক দিয়ে কেটে যাবে তা তুমি নিজেই টের পাবেনা। তারপর যেদিন তুমি প্রস্তুত হবে সেদিন তোমার মিতা আপনিই তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে, সে আমি হই বা অন্য কেউ’।

আমি মাথা নত করে ভাবতে থাকি।

‘জানো, তুমি ভাবছ আমি বিবাহিতা নই, তুমি বিবাহিত নও, তাই এই সময়টা আমরা পরস্পরের সাহচর্য উপভোগ করতে পারি। কিন্তু একটু ভেবে দেখ, কেউ একজন পৃথিবীর কোন এক কোণে আমার জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। হয়ত আমাদের দেখা হয়েছে, হয়ত হয়নি। কিন্তু আমরা একদিন পরস্পরের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হব, একে অপরকে অনুপ্রাণিত করব নিজেকে অতিক্রম করে যেতে, বিপদের বন্ধু হব, সুখ দুঃখে একে অপরের সাথী হব, অন্যায় হতে একে অপরকে টেনে ধরব এবং অনন্তকাল একে অপরের পাশাপাশি চলব। সেই বন্ধুটির জন্য আমি নিজেকে সেভাবে সংরক্ষণ করতে চাই, সকল প্রলোভন হতে নিজেকে সংবরণ করতে চাই, সমস্ত প্রেম বাঁচিয়ে রাখতে চাই যেন যেদিন আমাদের দেখা হবে সেদিন সে আমাকে তার সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে, তার সবটুকু আমাকে উজার করে দিয়ে ভালোবাসতে পারে, আমার এই উপহার গ্রহণ করে কৃতার্থ হতে পারে। বল, সেই অদেখা অচেনা অজানা মানুষটির সাথে আমার যে প্রেম তার চেয়ে রোমান্টিক আর কি হতে পারে? এই ভালোবাসাই আমি উপহার দিতে চাই আমার স্বামীকে যেদিন তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হবে। তুমিও কি তাই চাওনা?’

কথাবার্তায় তুখোড় বলে আমার একটা সুপ্ত অহংকার ছিল। কিন্তু সাদিয়ার সামনে আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। ওর প্রতিটি কথাই তো যুক্তিযুক্ত, তাহলে আমি কোথায় আপত্তি করব? মনে মনে আমিও তো চাই আমার নববধূর জীবনে আমিই হব প্রথম পুরুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু যাকে সে তার জীবন দিয়ে বিশ্বাস করতে পারবে, অকুন্ঠচিত্তে নিজের সবটুকু উজার করে দিয়ে ভালবাসতে পারবে। কিন্ত এর জন্য যে আমাকেও তার প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে এটা তো মাথায় ছিলোনা! যা আমি দিতে প্রস্তুত নই তা চাইবার অধিকার যে আমার নেই তা তো ভাবিনি!

সাদিয়া আর ওর বান্ধবীরা চলে যাচ্ছে। মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ওদের প্রতি। ওরা আসলেই অনেক স্মার্ট। যুগের গড্ডালিকা প্রবাহে যেখানে আমি এবং আমরা ভেসে চেলেছি নিজের অজান্তে অচেনা গন্তব্যে, সেখানে ওরাই খুঁজে নিয়েছে আসল শান্তির ঠিকানা।

আপু / ভাই উদ্দাম আনন্দে ভাসার আগে একটু ভেবো কিন্তু !!!

5 November 2014

সংকলনে – বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক।

প্রিয় বোন আমার,

তোমার কন্ঠের আবেগটুকু তোমার সম্পদ, তোমার হাসিখানি তোমার সম্পদ, তোমার আবেগভরা ভালোবাসার প্রকাশ তোমার সম্পদ।

তোমার সমস্ত সৌন্দর্যই তোমার সম্পদ। এই সম্পদটুকু যদি তুমি সংরক্ষণ কর সেই মানুষটার জন্য, যে হয়ত তোমার কথা স্মরণ করেই চোখ নিচু করে শহরের পথে গলি ঘুঁপচিতে চলছে, তোমার জন্য তার মনের আবেগ আর ভালোবাসাগুলোকে সাজিয়ে রাখছে। তোমাকে উপহার দিবে বলে সযত্নে জমিয়ে রেখেছে ভালোবাসার প্রতিটি বর্ণ। তুমি যদি কারো জন্য অপেক্ষা না করো, তুমি কী করে আশা করবে এমন একজন জীবনসঙ্গী যে তোমার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণে চলেছে এই সময়েও?

কখনো গালাগালি করিও না, গালাগালি সুন্দর মনের প্রকাশ না, আল্লাহও পছন্দ করেন না। তোমার সম্পদগুলোকে পথের ধারে, প্রকাশ্যে- অপ্রকাশ্যে সস্তা করে বিকিয়ে দিয়ো না যেখানে সেখানে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে নিজেকে সম্মান করো। আল্লাহ নিশ্চয়ইধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

আপু, যে ছেলেটা ফোন করে বলে তুমি সুন্দর, তোমার কন্ঠ সুন্দর, হাসলে তোমাকে ভালো লাগে; অথচ সে তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলতে চায়না যে তোমাকে বিয়ে করবে, মনে রেখো, সে তোমাকে চায় না, সে চায় তোমার সহজাত সম্পদগুলোকে ভোগ করতে।

তোমার হৃদয় আর তোমার চিন্তাগুলোকে যে পছন্দ করে,সে বাকিটা জীবনের জন্য নিজের আপনজন করে তোমায় বেঁধে রাখতে চাইবে। সমস্ত অধিকার নিয়ে তবেই তোমার যোগ্য মানুষটার কাছে যেয়ো। উদ্দাম আনন্দে ভাসার আগে একটু ভেবো কিন্তু!

সে দিন সময়টা ছিল ইশার পর-

আলো আধারির একটু নির্জন রাস্তায় হাঁটছিলাম একা একা। হঠাৎ সামনে একটা রিকশা এসে থামল। রিকশা থেকে নেমে আসলো এক তরুণ। বেশ সতর্কতার সাথে ডানে বায়ে তাকিয়ে রাস্তায় মানুষের ভিড়ে মিশে গেল। রিকশায় বসে থাকা তরুণী মুখে কাপড় চাপা দেওয়া, হয়ত সাধারণের কাছে নিজের পরিচয় গোপনে চেষ্টারত।

এই তরুণ তরুণীরা যখন বাসায় ফিরে তখন তাদেরকে কি কোন জবাবদিহি করতে হয়? বাবা মায়েরা কি জিজ্ঞেস করে তাঁরা এতক্ষন কোথায় ছিল??

বাড়ীতে থাকলে এধরনের দৃশ্যগুলো রাস্তায় বেরোলে প্রায়ই চোখে পড়ে। বাড়ীর পাশের সাইবার ক্যাফেতে জুটি বেঁধে নিয়মিতই যায় কিছু তরুণ তরুণী। সেখানে একটু আড়ালে তাঁরা কি করে তা ক্যাফের কর্মচারীরা রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে। দুঃখের যায়গাটা হল এই ছেলেমেয়েগুলোর সাথে আমার রাস্তায় কোন না কোন সময় দেখা হয়। স্কুল কলেজের ড্রেস পড়ে কিংবা ভদ্র, শান্ত চেহারার বাবা মায়ের সাথে যখন এদের সাক্ষাৎ মিলে তখন সেসকল বাবা মায়েদের জন্য আমার প্রচণ্ড মায়া হয়। আর তখনি আমি ভাবি এরা হয়ত আমার আদরের ভাইটি নয়, আমার আদরের বোনটি নয় কিন্তু কারো না কারো আদরের ভাই/বোন। তাদের মায়েরা এখনো হয়ত সন্তানকে হাতে তুলে খাইয়ে দেন। এদের বাবা মায়েরা সন্তানের পরীক্ষার রেজাল্টের খবর রাখে, স্কুল কলেজের খবর রাখে, তাদের ক্যারিয়ার কোনদিকে গেলে ভালো হবে সেই খবর রাখে। শুধু খবর রাখেনা ছেলেমেয়ে কোথায় যায়, কি করে!!

আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"

(সূরা তাহরিমঃ ৬)

সন্ধ্যার পরে রস্তায় কোন রিকশা কিংবা সিএনজিতে ভুলে চোখ গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। এসব অকালপক্ক ছেলেমেয়েগুলোর প্রকাশ্য ব্যভিচার 'বয়সের দোষ' হলেও বাবা মায়েদের লজ্জায় মাথা কাটা যায় যখন দাড়িওয়ালা ছেলেটা বিয়ের কথা তোলে! যখন সে রাস্তা ঘাটে, পার্কে, অন্ধকার কফি শপে অশ্লীলতার পসরা সাজিয়ে পথচারীদের বিনা খরচে প্রাপ্তবয়স্ক মুভি দেখার বিনোদন না যুগিয়ে এসব থেকে পবিত্র থাকার আর্তি জানায়, কেবল তখনি বাবা মায়েরা সন্তানের ভবিশ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

ছেলে মেয়েকে দেশের সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে লোকসমাজে নিজেদের স্ট্যাটাস বৃদ্ধির তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে কেউ কেউ। তাদের ছেলেমেয়েদের এসব আধুনিক রঙ্গশালায় এসে ব্যভিচার আর নষ্টামির আমলনামা ঢের দেখেছি! গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঝোপে ঝাড়ে জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করে বন্ধুদের সাথে রসালো বর্ণনা করে আড্ডা জমায় আদরের সন্তানেরা।

মোবাইলের লাউড স্পিকারে বান্ধবির সাথে অশ্লীল কথোপকথন বন্ধুদের নিয়ে উপভোগ করে সভ্য সমাজের ভদ্র বাবা মায়েদের স্মার্ট ছেলেরা! আর তাদের বাবা মায়েরা ঠিকই বলে বেড়ায় " আমার ছেলে/মেয়ে কিন্তু আর দশজনের মত না"!

আমার খুব ইচ্ছে করে এসব বাবা মায়েদের তাদের "আর দশজনের মত না" গর্বের সন্তানের নষ্টামির আখলাখের সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিয়ে বলি, "এই নেন আপনার আখিরাতের সঞ্চয়"!!

একদিন বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে শরীর। ঝুলে পড়বে যত্ন করে রাখা মসৃণ চামড়া। থাকবেনা রাস্তা ঘাঁটে জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার বুনো মাদকতা। এই অশ্লীলতা আর নষ্টামির সময়গুলো নিয়ে আমরা আকাশের ওপারে অনন্ত এক জীবনের দিকে পরিচালিত হব।

খুব বেশী দেরী নেই। খুব শীগ্রই আমরা একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত হতে যাচ্ছি। আমরা মিলিত হতে যাচ্ছি আমাদের রবের সাথে একাকি, সম্পূর্ণ একাকি! আমাদের প্রশ্ন করা হবে, যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোন কাজে ব্যয় করেছ? জীবন কোন পথে ব্যয় করেছ? কি উত্তর জমা করেছি তার জন্য??

৭০০০০ ফেরেশতা ৭০০০০ সেঁকল দিয়েও বেঁধে রাখতে পারছে না জাহান্নামকে। এত তীব্র গর্জন করবে সে জাহান্নামীদের দেখে। নষ্ট, ভ্রষ্ট আর উদ্দাম তারুন্যের এই সময়গুলোকে নিজ হাতে ধ্বংস করার আগে চুলার আগুনে একটু হাত দিয়ে দেখিস তো, আগুন সইবার ক্ষমতা কেমন!!

ভাই !!!

তোমারও বোন আছে, কোন মেয়ের নাম্বার সংগ্রহ করে হায়/হ্যালো বলে দারুন করে, বা তোমার ভাষায় পটানোর মাঝে কোন বীরত্ব নেই। দয়া করে আপুদের নাম্বারে কথা বলা বন্ধ করো।

আর আপুদের বলছি, তুমি ভীষণ মুল্যবান, তুমি তোমার কোমলতাকে এতটা সহজলভ্য করে দিয়ো না। আল্লাহ যাকে তোমার জন্য রেখেছেন তার জন্য অপেক্ষা করো। রাতের ঘুমে যে কল করে তোমার কন্ঠের টেস্ট নেয় তাকে আমার কাছে ফুল বাগানের ভ্রমরের মতই মনে হয়! এ ফুল থেকে সে ফুলে যেয়ে মধু চেকে দেখে আর কি! তুমি যদি মুল্যবানই না হবে তাহলে কেউ তোমার জন্য তিনতলায় উঠতে চায় রাতের আধারে! আল্লাহকে ভয় করো। নিজেকে মূল্যহীন করো না। নিজের ঘুমের সাথে মোবাইল টাকেও ঘুমানোর সুযোগ দাও। বন্ধ করো/সাইলেন্স করো। তুমি তো কোন বিজনেস ম্যান না যে, কল ধরতে মিস হলে ব্যবসায় লাখ টাকা মিস হবে!! আল্লাহ আমাদের বুঝার শক্তি দান করুন। আমীন।

আপু !!!

প্রেম/ভালোবাসার নামে যেই ছেলেটা তোমাকে রিকসায় পাশে তুলে গায়ে হাত দেয়, সে কোনদিনই তোমাকে সম্মান করে না। তোমাকে ক'দিন পরেই সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। নিজেকে সম্মান করো, এইসব নোংরামি থেকে নিজেকে বিরত রাখো। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে একদিন। এই ক্ষণিকের আনন্দ দিয়ে কী হবে? তোমার সম্মান, ইজ্জত কি এতই ঠুনকো?

আস্তাগফিরুল্লাহ !!!

তুমি কি তোমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে রাত কাটিয়ে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছো ?

অথবা তোমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে রাত কাটাবে বলে প্লান করছো ?

অথবা গার্লফ্রেন্ডকে কোন হোটেল বা বাসায় নিয়ে দুজন নির্জনে কিছু রোমাঞ্চকর মুহূর্ত কাটাবে এবং জৈবিক চাহিদা মিটাবে বলে ভাবছো ? তাহলে এই লেখাটি তোমার জন্যই।

অনেকেই দেখি, গার্লফ্রেন্ডের সাথে রাত কাটিয়ে এসে, বন্ধুদের সাথে রাতে কি করছে না করছে তা নিয়ে হাঁসি ঠাট্টা করে। আমি তাদেরকে বলবো, ভাই এত ক্যালায়ে না। তুমি রাতে আর কি মজা পাইছো, তোমার আসল মজাতো মৃত্যুর পরে পাবে । যখন ফেরেস্তারা তোমার লিঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে জাহান্নামের আগুনে ঝুলিয়ে লোহার ডান্ডা দিয়ে পিটাবে, আর তুমি চিৎকার করতে থাকবে.....।। তুমি এই মজার জন্য অপেক্ষা করতে থাকো যদি তওবা না করে থাকো।

ইসলামের যেনার কোনো স্থান নেই। মৃত্যুর পরও যেনাকারী উলংগ অবস্থায় কেয়ামত পযন্ত আগুনে জ্বলবে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন, যেনাকার ও যেনাকারীনি কেয়ামত পর্যন্ত উলঙ্গ অবস্থায় আগুনে জ্বলতে থাকবে। (বুখারী, মিশকাতঃ ৪৬২১)

সুতরাং ভেবে দেখুন, আর সময় থাকতেই সাবধান হয়ে যাও। এসব গার্লফ্রেন্ড মালফ্রেন্ড বাদ দিয়ে, আল্লাহর কাছে তওবা করে, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় শুরু কর । Otherwise মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করে কোন লাভ হবে না। যা কান্নাকাটি করার এখনই করে নাও। আস্তাগফিরুল্লাহ।

"তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।"

(সূরা হা-মীম সেজদাহ, আয়াত ২০)

আস্তাগফিরুল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ, দয়াকরে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমিন।

আপু, সাবধান হয়ে যাও-

আপু/বোনদের উদ্দেশ্যে আর একটি কথা ! প্রিয় বোন সাবধান থেকো, কারণ প্রিয় বান্ধবীই হতে পারে তোমার সর্বনাশের কারণ (সচেতন হোন), মনে কর হঠাৎ তোমার বান্ধবী বলল , এক ফ্রেন্ডের জন্মদিন আছে, একা যাব না , তুই চল । তুমিও রাজি হয়ে গেলে । নির্জন ফ্ল্যাটে তোমাকে কিছু নরপিশাচের হাতে তুলে দেওয়া হল । সম্প্রতি টাঙ্গাইলের ধর্ষণের ঘটনা থেকে দেখা গেল বান্ধবী মেয়েটিকে ফুসলিয়ে ধর্ষণকারীদের হাতে তুলে দেয় । এর আগেও রংপুরের একটা ঘটনা পড়েছিলাম যেখানে বান্ধবী এক ছেলেকে বোরকা পড়িয়ে মেসে মেয়ের রুমে নিয়ে যায় এবং বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেয় । আজকাল ভার্সিটিতে এমন অনেক মেয়েকে দেখি যারা বান্ধবী ছাড়া আর কারো সাথে কথাই বলে না । সুযোগসন্ধানী ছেলেরা বান্ধবীর সাথে ভাব গড়ে তুলে । একসময় হয়ত বলল , আমার এক বন্ধু তো তোমার বান্ধবীকে পছন্দ করে , তুমি একটু বিষয়টা দেখ । বান্ধবী একদিন বলল অমুক জায়গায় আস, তোমার বন্ধুকে দেখা করিয়ে দেব । বান্ধবী নিজের অজান্তেই ফাঁদে পা দিল । ধূর্ত ছেলেটাও একটা নির্জন জায়গায় আসতে বলল অপরদিকে মেয়েটাও বান্ধবীর কথায় বিশ্বাস করে গেল। তারপর যা হবার হল। এখানে কিন্তু তোমার কাছের বন্ধুটিই তোমাকে ধর্ষকদের হাতে তুলে দিল । কেন একটি মেয়ে আরেকটা মেয়ের এমন সর্বনাশ করছে সেটা ভাবার বিষয় । এগুলো এড়াতে হলে আমার পরামর্শ হল-

১। বান্ধবীর সাথে অপরিচিত , নির্জন জায়গায় যাবে না ।

২। যাদেরকে তুমি চিনো , তাদের জন্মদিন বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সতর্ক হও ।

৩। তুমি যেসব ছেলেদের পছন্দ কর না , তাদের সাথে তোমার বান্ধবীর সখ্যতা আছে কিনা খোঁজ নাও । আমি এখানে শুধু বান্ধবীর কথাই বললাম , কারণ একটি মেয়ে আরেকটি মেয়েকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে । তোমার এ বিশ্বাসের সুযোগ যাতে কেউ না নিতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক হও । মেয়েদের পোশাক নিয়ে অনেক কথা হয়,কিন্তু একটি মেয়েকে কিভাবে আরেকটি মেয়ের সর্বনাশের কাজে সুকৌশলে ব্যবহার করা হচ্ছে এব্যাপারে কোন আলোচনা চোখে পড়ে না ।সময় এসেছে এ বিষয়টি ভাবার । আমরা আর কোন ধর্ষণ দেখতে চাইনা । আমি চাই না আমার আদরের বোনকে হারাতে । সবাই সবার নিকট এই বিষয়টি তুলে ধরুন । সচেতন করুন ।

প্রেম-ভালবাসা এবং বিয়ে

13 September 2014

লেখকঃ জিম তানভির

কিছুদিন আগে পেপারে একটা খবর এসেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে একটা মেয়ে লাঞ্ছিত করেছে। কেন এমন ঘটেছে এটা বোঝার জন্য খুব চালাক হওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রেমঘটিত এই ধরনের ইস্যু এখন মোটামুটি "কমন" আকার ধারণ করেছে। ব্যাপারটি একই সাথে কিছুটা (দুর্ভাগ্যজনকভাবে) হাস্যরসের উদ্রেককারী,কিছুটা দুঃখবোধের উদেরককারী এবং অনেকখানি দুশ্চিন্তার উদ্রেককারীও বটে। একটা মানুষের হাতে আরেকজন লাঞ্ছিত হবে এটা নিশ্চয়ই কোন কাম্য হতে পারে না !

আমাদের সমাজে এই ধরণের বিয়ে-পূর্ববর্তী সম্পর্কের ব্যাপারে সমাজ এখন বেশ বিভ্রান্ত। কেউ বলছে করা যায়, কেউ বলছে থাকতেই পারে, কেউ বলছে না থাকাটাই অস্বাভাবিক। নকশা আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে প্রোপোজ করতে হবে ! তবে অনেকে খুব শক্ত কন্ঠে এটাও বলছে এটা একটা অস্বাভাবিক সম্পর্ক, সমাজে এটার কারণে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

যারা প্রেম করে তারা এই ধরণের সম্পর্কের পিছনে একটা কমন যুক্তি দেয়, "বিয়ের আগে জানাশোনা না থাকলে বিয়ের পরে সমস্যা হয়, তাই বিয়ের আগে ভাল ছেলে/মেয়ে খুজে তার গলায় ঝুলে পড়তে হবে না হলে ভাল পার্টনার পাওয়া যাবে না"। ব্যাপারটা কি আসলে এটাই ? আমি মনে করি এটা একটা self-justification, এর বেশি কিছু নয়। মানুষ হিসেব করে প্রেমে পড়ে না, প্রেমে পড়ে তারপর হিসেব করে। কয়জন প্রেমের আগে পয়েন্ট টু পয়েন্ট হিসেব করে "এটা ভাল, ঐটা ভাল" ?? বাস্তবে, আগে ভালবাসা হয়, তারপর সেটাকে justify করার জন্য খুজে খুজে ভাল ভাল দিকগুলো বেশি বেশি চোখে পড়ে, তাহলে নিজের মন একটা প্রবোধ পায়, বাসায় যুক্তি দাড়া করানো যায়। উরা-ধুরা ছেলের সাথে খুব "লক্ষী" মেয়ে প্রেম করে লাইনে এনেছে- এরকম ঘটনা তো আছেই ! আর মানুষ যদি "ভাল" আর

"খারাপ" হিসেব করেই প্রেম করত তাহলে গুটিকয়েক মানুষ প্রেম করত বাকিরা করত না এই অজুহাতে যে "ভাল পার্টনার পাওয়া যাচ্ছে না" !

প্রশ্নটা হচ্ছে, সমস্যা কোথায় ? প্রেমিক-প্রেমিকারা যতই আবেগীকন্ঠে এটার পক্ষে বিভিন্ন রকম যুক্তি দিতে পারে, বাস্তবতা এটার বিপক্ষে যায়। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ মনমরা হয়ে পড়ে থাকে আরেকজনকে না পাওয়ার জন্য, কেউ কেউ আবার "প্রথম প্রেমে" ছ্যাক খেয়ে কড়া লুইচ্চা হয়ে যায়। নকশাতে "সুবন্ধ সমীপেষু" যারা পড়েন তাদের ধারণা আছে এই ধরণের সম্পর্কের জটিলতার লেভেলটা আটলান্টিক মহাসাগর থেকেও গভীরে। গার্লফ্রেন্ড নিয়ে মারামারির ঘটনা একটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে যাচ্ছে।

এই ধরণের সম্পর্কের সমস্যাটা সম্পর্কের সীমারেখায়, "ঠিক কতটুকু সম্পর্ক আসলে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ডদের মধ্যে হওয়া উচিত" সেটা নিয়ে পরিষ্কার, বস্তুনিষ্ঠ এবং স্বাভাবিক কোন চিন্তাভাবনা নেই। আমাকে একবার এক বড়ভাই উপদেশ দিয়েছিল, "দেখ তুমি প্রেম করতে পার, তবে শুধু কথা বলবা এর বেশি কিছু না" ! আবার কিছুদিন আগে এক ফ্রেন্ড থেকে শুনলাম কে যেন তাকে বলেছে, "বিয়ের আগে physical relation" না থাকা নাকি ব্যাকডেটেড ব্যাপার" ! এই ধরণের সম্পর্কের আসলেই কোন সীমারেখা নাই, এটা কখনও প্রবৃত্তি কখনও বা পুজিবাদী সমাজের ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে সংজ্ঞায়িত হয়, নৈতিকতার ভিত্তিতে হয় না।

তবে এর থেকেও বড় যে সমস্যা তা হল এই ধরণের সম্পর্কে দায়িত্ববোধের অভাব, এটা পুরোপুরি দায়িত্বজ্ঞানহীন সম্পর্ক। যত দায়িত্ব পালন করে করে তার পুরোটাই ইমোশন থেকে করে, কবি সাহিত্যিকদের কবিতায় তাই "তোমার জন্য চাঁদ এনে দেব" কথার ছড়াছড়ি যতটা বেশি, বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক ততটাই কম !

একটা সম্পর্ককে শুধু "ভালবাসা" দিয়ে বছরের পর বছর টিকিয়ে রাখা সম্ভব ? ভালবাসা ব্যাপারটা প্রবৃত্তিজাত, এর সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক খুব দুর্বল, প্রবৃত্তি এটা বলেও দেয় না এর দায়িত্ববোধের মাত্রা। তাই আমরা দেখি ৫ বছরে গড়ে ওঠা প্রবল ভালবাসার সম্পর্ক ৫ দিনের মাথায় ভেঙ্গে চুরমার, কেউ কাউকে চিনতেই পারছে না ! দীর্ঘদিন মন দিয়ে প্রেম করে বিয়ের আগে অন্য কোন সুন্দরী মেয়ে বা ধনী ছেলের দেখার পর অনেকের আবেগ কর্পূরের মত উবে যায় ! কেন ? কারণ এর আগে যা ছিল, তা আবেগ ছিল, বিবেক ছিল না।

আবেগকে তাই "দায়িত্ববোধে" reinforce না করলে সেটার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার, আর তাই আমাদের চারপাশের প্রেম-ভালবাসার সম্পর্কগুলো টেকে না, টিকলেও হাজারটা কাহিনী করে টিকে আছে। বাস্তবতা বলে একটা ব্যাপার আছে, আজ হোক, কাল হোক, এক সময় মানুষ সেটা উপলব্ধি করেই, করতে না চাইলেও তাকে করতে হবে। তখন বোঝা যায়, শুধু আবেগ দিয়ে বিশ্ব চলে না। "দায়িত্ব", "কর্তব্য" বলে কিছু ব্যাপার আছে, এগুলো এমনি এমনি আসে নি। একটা বয়ফ্রেন্ড আসলে কখনই গার্লফ্রেন্ডের দায়িত্ব নেয় না, নিতে পারে না, সম্পর্কের নেচারটাই এমন। "বিয়ে-পূর্ববর্তী সম্পর্কে কার দায়িত্ব কি এটা নিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনদিন কোন consensus হয়নি । সেকুলার আদর্শ কখনই এই ব্যাপারটির সমাধান করার চেষ্টা করেনি, বরং বলে দিয়েছে, "যে যা খুশি করবে এটা তাদের ব্যাপার", হোক টিনেজ প্রেগ্নেনেন্সি, হোক গর্ভপাত, কিংবা পিতৃপরিচয়হীন কোন শিশুর জন্ম।

যে সম্পর্ক যখন খুশি তখন করা যায় এবং যখন খুশি বিনা নোটিশে ভেঙ্গে ফেলা যায়, যে সম্পর্কে যা কিছু তা করা যায়,যে সম্পর্কে কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই এবং যে সম্পর্কের কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য নেই- সেই সম্পর্কে আর যাই কিছু থাকুক, দায়িত্ব বলে কিছু নেই। ইসলামে তাই এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন সম্পর্কের অনুমোদনও দেয় না।

এমন কোন সম্পর্কের অনুমোদন ইসলামে দেয় না যে সম্পর্কের ভিত্তি কেবল শরীরি চাওয়া পাওয়া। ইসলাম সম্পর্ক নির্ধারণ করে একই সাথে আবেগ এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমে। দুটি ছেলে-মেয়ে যা খুশি তা করবে, এরপর একদিন সে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে এবং কেউ পূর্ববর্তী কোন ঘটনার জন্য জবাবদিহি থাকবে না-এই ধরণের অস্বাভাবিক সম্পর্কের মানে কি ? একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করবে কিন্তু বিয়ের জন্য বাধ্য থাকবে না বরং পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে চলে যাবে, কিংবা একটা মেয়ে প্রেম করে একটা ছেলেকে নাচাবে বছরের পর বছর আর বিয়ে করতে চলে যাবে অন্য কাউকে-এমন হলে পশুপাখির সাথে মানুষের পার্থক্যটা থাকল কই ?

ইসলাম এসব ব্যাপারে মোটেই উদারতা প্রদর্শন করে না। একটা ছেলের সাথে তাই একটা মেয়ের সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে হবে আর আর বিয়ে এমন একটা সম্পর্ক যেটা শুধু আবেগ নয় বরং দায়িত্ববোধের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী।" [TMQ ২:২২৮]

মুসলিমদের মধ্যে বিয়ের এই চমৎকার প্র্যাকটিসটা আছে বলেই এই সমাজে এখনও মানুষজন পশু হয়ে যায়নি, যদিও পশ্চিমারা প্রতিনিয়ত তাদের নোংরা অভ্যাসগুলো আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। বিয়ে একটা চমৎকার বন্ধুত্ব, এটা প্রেম-ভালবাসার মত কোন খেলা না। এটা একটা স্থায়ী বন্ধন, যা খুশি তা করবে-এমনটা হওয়ার সুযোগ নেই। গার্লফ্রেন্ডকে ভাল না লাগলে বয়ফ্রেন্ড তাকে ত্যাগ করার জন্য কোন সময় নাও নিতে পারে, বিয়ে ব্যাপারটা এমন নয়।

"নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন। "[TMQ ৪:১৯]

শুধু তাই নয়, বিয়ে হল সভ্যতার পরিচায়ক। আল্লাহ বলছেন বিয়ে সেক্সুয়াল ইন্সটিংট থেকেও বেশি কিছু।

আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে TMQ [৩০:২১]

প্রেম ১

3 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

আমার এক ক্যানাডিয়ান সহকর্মী আলাপ করছিল, ওর বাবামার যখন বিয়ে হয় তখন ওর মায়ের বয়স আঠারো আর বাবার বয়স বিশ। বিয়ের তিনমাসের মাথায় ওর বড়বোনের জন্ম। বোঝাই যায় বিয়েটা ছিল সামাজিকতা রক্ষার তাগিদে, সুখের টানে নয়। বিয়ের পর ওর বাবা সংসারের দায়িত্বের চাপে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ব্যার্থ হয়, ওর মা পড়াশোনা করে উকিল হন। এক পর্যায়ে এই শিক্ষিতা, স্মার্ট এবং মোটা টাকা উপার্জনকারী মহিলার এই অশিক্ষিত এবং স্বল্প উপার্জনকারী স্বামীকে নিজের সাথে বড় বেমানান মনে হতে থাকে। বিয়ের একুশ বছর পর স্ত্রী এক পুরুষকে এবং স্বামী আরেক মহিলাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যান। আমার সহকর্মী মেয়েটির বয়স তখন সতেরো। সতেরো বছর বয়সে সে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। এ'সময় থেকে সে অসহায়ত্ব এবং একাকীত্ব থেকে মুক্তি পেতে এক বয়ফ্রেন্ড থেকে আরেক বয়ফ্রেন্ডের আশ্রয় নিতে থাকে। তবে গত বারো বছর যাবত সে একজনের সাথে বসবাস করছে। আমার চাইনিজ বান্ধবী জেইন বলল, 'তুমি তাকে বিয়ে করলেই পারো'। সে বলে, 'পাগল! আমার মায়ের ডিভোর্স হয়ে যাবার পর আমি কিছুদিন জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি পারিবারিক আইন অফিসে কাজ করেছি। সেখানে আমার বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে এমন সব ভীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আমি তখনই সিদ্ধান্ত নেই আমি কোনদিন বিয়ে করবনা'। ওর বড়বোনের বিয়ে হোল মাত্র ক'দিন আগে। বিবাহভীতি কাটিয়ে উঠতে উঠতে তাঁর বেয়াল্লিশ বছর বয়স হয়ে যায়। এখন তিনি বিবাহিত হলেও সন্তানধারনে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। আমার সহকর্মীরও সন্তান নেয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমন উপাখ্যান এখানকার ঘরে ঘরে। সচেতন বাবামায়েরা সন্তানদের চার্চে নিয়ে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করান তারা বিয়ের আগে পর্যন্ত কুমারী থাকবে যেন বুঝেশুনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার অবকাশ থাকে এবং এমন দুঃখজনক পরিণতি এড়ানো যায়। কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যাবস্থা এবং দৃঢ় নৈতিক বন্ধনের অভাবের কারণে অনেকেই এই প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনা। ফলে ভুগতে হয় সারাজীবন।

প্রেম একটি অসাধারন এবং মোহময় অনুভূতি। সেদিন দেখলাম এক বুড়ো দাদা যিনি নিজেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে একহাতে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে শক্ত করে ধরে আরেক হাত মাথার ওপর দিয়ে অতি সাবধানে গাড়ীতে বসিয়ে দিচ্ছেন যেন তিনি পিঠে ব্যাথা না পান, আবার পিঠ সোজা রাখতে গিয়ে মাথায় বাড়ি না খান। একইভাবে আমরা যখন গর্ভবতী স্ত্রীর পাশে চিন্তাক্লিষ্ট স্বামীটিকে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে দেখি কিংবা সুন্দরী হবু স্ত্রীর দিকে তাকাতে গিয়েও যুবকটিকে চোখে নামিয়ে নিতে দেখি তাতে যে ভালোবাসা প্রকাশ পায় তা যেকোন হৃদয়কেই আপ্লুত করে।

কিন্তু প্রেমের সবটুকুই দৃষ্টিনন্দন নয়। এর একটি পাশবিক দিকও আছে যেটি বন্ধ দরজার আড়ালেই পরিতৃপ্ত করা শ্রেয়। যেমন ক'দিন আগে কাজে যাবার পথে দেখি এক ট্রেন মানুষের সামনে, যেখানে কয়েকমাসের শিশু থেকে কয়েক দশকের বৃদ্ধরাও আছেন, দু'জন যুবক যুবতী নিজেদের একটিমাত্র জ্যাকেট দিয়ে ঢেকে শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করছে! ঘটনাটি এতটাই পশুপ্রবৃত্তি প্রকাশক ছিল যে দৃশ্যটি এমনকি কোন নিম্নতর রুচির মানুষের কাছেও উপভোগ্য ছিলোনা বরং সবাই হতভম্ব এবং বিরক্ত হলেও এই ব্যাপারে আইনত কারো কিছু করার নেই বলেই কেউ বাঁধা দিতে পারছিলোনা। ভাবছিলাম, এরা কি করে পারে দাদাদাদীর বয়সী লোকজনের সামনে এত নির্লজ্জ হতে? কিন্তু ব্যাপারটা আসলে সহজবোধ্য।

মানুষের বংশরক্ষার তাগিদেই সৃষ্টিকর্তা এই জৈবিক তাড়না মানুষের মাঝে দিয়ে দিয়েছেন। নইলে কে সেধে স্ত্রীপুত্রকন্যার দায়িত্ব মাথায় নিত? কেইবা বুঝেশুনে সারাজীবন ধরে এতগুলো মানুষের জন্য প্রতিবেলা রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ঘর পরিস্কার করার কাজ করত? এটি ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণার চেয়ে অধিক বা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। তবে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, সমস্ত সৃষ্টিকুল হতে স্বতন্ত্র এবং বিশেষায়িত করে। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারে আমরা এই পার্থক্য দেখতে পাই। যেমন পশুদের মাঝে পুরুষ প্রানী অধিকতর সুন্দর, মানুষের মাঝে নারী; বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন পশুরা বাঁহাতি কিন্তু মানুষকে তাদের প্রভু বলে দিয়েছেন ডানহাতে অধিকাংশ কাজ করতে; পশুরা কাঁচা খাবার খায় আর মানুষ খায় সেদ্ধ করে। একইভাবে পশুরা বাড়ীঘর না থাকায় সর্বসমক্ষে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বাধ্য হলেও মানুষকে বলা হয়েছে এর জন্য বিশেষ পন্থা এবং পদ্ধতি অবলম্বন করতে যেন এর মাধ্যমে যে জীবন পৃথিবীতে আগমন করবে তা বেড়ে ওঠার একটি সুস্থ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ পায়।

এই প্রক্রিয়াকে সহজ এবং স্বাভাবিক করার জন্যই সৃষ্টিকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন নিজেকে সর্বসমক্ষে কামনার বস্তুরূপে উপস্থাপন না করে নিজের আকর্ষনী শক্তিকে আড়াল করে রাখতে। চাহিদার সৃষ্টি দৃষ্টি থেকে। আমরা যদি না জানি বাসায় মিষ্টি আছে, আমাদের মিষ্টি না খেলেও দিব্যি দিন কেটে যায়। কিন্তু টেবিলের ওপর মিষ্টি আছে অথচ আমি খাবনা তা কি হয়? যদি বলেন, 'তোমার ডায়াবেটিস, খেলে ক্ষতি হবে', উত্তর আসবে, 'আরে ডাক্তার কি জানে? আগে তো খেয়ে নেই, তারপর দেখা যাবে যা হবার হবে!' একটি মেয়ের সৌন্দর্য যদি কেউ না দেখে তাহলে কেউ জানবেনা মেয়েটি কতটা আকর্ষনীয় এবং তার সবটুকু আবেদন সংরক্ষিত হবে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিটির জন্য। আবার যে মেয়েটির পুরুষদের সাথে মেলামেশা স্বল্প পরিসরে সে স্বামীর প্রতিটি সদ্গুনকেই অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারবে। কিন্তু যে মেয়েটি বহু পুরুষের সাথে মিশে অভ্যস্ত সে বিয়ের পর প্রতিটি মূহূর্ত মনে মনে তুলনা করবে আমার স্বামী দেখতে অমুকের মত সুন্দর না, তমুকের মত সুন্দর করে কথাবার্তা বলতে জানেনা, অমুকের মত গাইতে জানেনা, তমুকের মত স্মার্ট নয়, অমুকের মত বিত্তশালী নয় কিংবা তমুকের মত শক্তিশালী নয় – তখন মনের আক্ষেপ দূর করে সেই লোককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা কঠিন ব্যাপার বৈকি!

যার আকর্ষনী শক্তি সর্বসাধারনের জন্য উন্মুক্ত সে নিজেও ভুলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। একটি প্রজাপতি উড়ে এলে তার সৌন্দর্য যাচাই বাছাই কিংবা পরখ করে নেয়া যায়, কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল উড়ে এলে আর বাছাই করার সুযোগ থাকেনা। প্রজাপতিকে মানুষ যত্ন করে ঘরের দেয়ালে বসতে দেয় কিন্তু কারো ঘরে পঙ্গপাল প্রবেশ করবে তা মানুষ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনা। নিজেকে প্রদর্শনীতে দিয়ে সাড়া পেলে প্রথম প্রথম সবারই ভাল লাগে। কিন্তু তারপর যখন ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল এসে চারিদিকে ঘিরে ফেলে তখন আর সামাল দিয়ে ওঠা যায়না। তাই এদের জৈবিক তাড়না চরিতার্থ করার কোন নির্দিষ্ট স্থান থাকেনা, কোন বৈধ পন্থাও থাকেনা যেহেতু এরা কেবল ভোগ করতে চায় কিন্তু দায়িত্ব নিতে চায়না। এই চাহিদাপূরনের ফলাফল হিসেবে যে সন্তানের জন্ম হয় তারও কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা গড়ে

ওঠেনা কারণ সে কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়ায় ফলাফল, কাঙ্খিত নয় মোটেই। অথচ এই পৃথিবীতে আসার পেছনে বেচারার না হাত ছিল, না ছিল ইচ্ছা। শুরু হয় আরেকটি কষ্টের উপাখ্যান।

খুব কম মানুষের বোধের আয়নায় এই সত্য প্রতিফলিত হয় যে প্রেম কেবল জৈবিক তাড়নার বহিঃপ্রকাশ নয় বরং একটি পবিত্র মানসিক বন্ধন। এই বন্ধনকে মজবুত করার জন্য একে একটি সামাজিক রূপ দেয়া জরুরী যাতে উভয়পক্ষের সামাজিক নিরাপত্তা এবং অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান হয়। তাই প্রেমের সৃষ্টিকর্তা প্রনীত এবং সবচেয়ে শ্বাশ্বত রূপ বিয়ে। এর অর্থ এই নয় যে বিয়ে করলে কোন সমস্যাই হবেনা। দু'জন মানবমানবী যারা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গনে পৃথক পৃথক পরিবেশে বেড়ে উঠেছে তারা মিলিত হলেও দু'টি নদীর মতই সমান্তরালে বহমান থাকবে, একীভূত হবেনা। কিন্তু একটি বিবাহিত দম্পতিকে তাদের পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব থেকে সম্পূর্ন অপরিচিত লোকজন পর্যন্ত একত্রে বসবাস করতে, নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে সহযোগিতা করে। অপরদিকে একটি অনৈতিক বন্ধনে জড়িত দুই ব্যাক্তি – যাদের সম্পর্কের কোন গন্তব্য নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই শুধু নিজেদের চাহিদা পূরণ করা ব্যাতীত – হাতেগোনা কিছু লোকজন ছাড়া কেউ সাহায্য করেনা। ফলে ঠুনকো সম্পর্কটি জোরদার হবার কোন ভিত্তি খুঁজে পায়না। নাটকে সিনেমায় এমন সম্পর্কগুলোর ট্রাজেডি, কমপ্লিকেশন কিংবা হঠাৎ করে সব মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য হেসে ওঠা দেখতে যতই ভাল লাগুক না কেন বাস্তবে কেউ এমন ঘটনার সম্মুখীন হতে চায়না, বাস্তবে এমন আলৌকিকভাবে সমস্যার সমাধান কমই ঘটে।

সুতরাং, আমরা সাবধান হই। একটিমাত্র জীবন আমাদের। ক্ষণিকের আনন্দের জন্য আমরা যেন আত্মনিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে পাহাড়ের ওপর থেকে গিরিখাদে ধারালো পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে জীবনাবসানকে বেছে না নেই। বরং আমাদের পছন্দগুলোর ভিত্তি হোক মানবিক গুনের সমাহার, বিশ্বাসের একাত্মতা, পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং প্রতিকুলতায় বন্ধুত্বের ছায়া যেন বার্ধক্যের দিনগুলোতে আমরা পরস্পরের হাত ধরে অস্তমিত সূর্যের দিকে হেঁটে যেতে পারি এই প্রগাঢ় বিশ্বাসে যে ওপাড়েও সে আমার হাত ছেড়ে দেবেনা।

প্রেম ২

3 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

‘আপু, একটা বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাচ্ছিলাম’।

‘বল’।

‘হয়েছে কি, আমি একটা মেয়েকে পড়াই। মেয়েটার বাবামা খুব বিশ্বাস করে আমাকে এই দায়িত্বটি দিয়েছেন। মেয়েটির স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত ভাল। আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই’।

‘ছাত্রীদের বিয়ে করা কোন ভাল কথা নয়, এটা আমার ব্যাক্তিগত অভিমত। শিক্ষক যে বয়সেরই হোক না কেন তাঁকে আমি সবসময়ই পিতৃসম সম্মানার্হ মনে করি। শিক্ষকরা যদি ছাত্রীদের দিকে নজর দেয়া শুরু করেন তাহলে তো সমাজে বিশ্বাসের কোন মূল্য থাকবেনা। তবু যদি তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও তাহলে তোমার অবিলম্বে কথা বলা উচিত’।

‘তাহলে কি আমি ওকে প্রপোজ করব?’

‘কাকে?!’

‘মেয়েটিকে’।

এবার সত্যি সত্যি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

‘মেয়েটিকে কেন প্রপোজ করবে? মেয়েটিকে কি প্রপোজ করবে?!’

‘বলব তাকে আমার ভাল লাগে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। এই উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে কিছুদিন ঘুরাঘুরি করে, তার সাথে কথা বলে দেখতে চাই আমাদের কতটুকু বনবে’।

‘বাবারে! এই নিয়ম কোথায় পেলে ভাই? ইসলামের নিয়ম হোল তোমার কাউকে পছন্দ হলে তার বাবা, ভাই বা যিনি অভিভাবক তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ওরা তোমার সাথে কথা বলে, তোমার এবং তোমার পরিবারের সম্পর্কে খোঁজখবর করে বিবেচনা করে অতঃপর মেয়েকে জানাবেন। তারপর মেয়ের পছন্দ হলে বিয়ে হবে। তারপর তোমরা সারাজীবন ঘুরে ঘুরে প্রেম করতে পারো, দিনরাত কথাবার্তা বলতে পারো মনের সুখে। বিয়ের আগেই কেন সব করে ফেলতে চাও?’

‘বিয়ের পর না বনলে?’

‘বিয়ের আগে কারো সাথে যতই ঘোরাফেরা কর না কেন তোমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য থাকবে পরস্পরকে ইমপ্রেস করা। ক’দিন সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরে দামী দামী রেস্টুরেন্টে বসে কটা শানিত বুদ্ধিদীপ্ত কথা বললে কি বোঝা যায় সেই মানুষটা কিভাবে রি-অ্যাক্ট করবে যখন তোমার সাথে সংসার করতে গিয়ে তোমার দামী শার্টের নীচে গেঞ্জির বিশাল ফুটোটা ওর চোখে পড়বে, কিংবা যখন ঘরে চিনি ফুরিয়ে গেলে আবার কেনার জন্য পরবর্তী বেতনের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে, কিংবা সে বুঝতে পারবে তুমি একটা বাল্ব পর্যন্ত মিস্ত্রীর সাহায্য ছাড়া নিজে বদলাতে জানোনা? কিন্তু যে মেয়েটা তোমার বৌ হয়ে আসবে সে তোমার ভালমন্দ সবটুকু গ্রহন করার মানসিকতা নিয়েই আসবে। তাকে ইমপ্রেস করার জন্য তোমার প্রতিনিয়ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবেনা। বরং তোমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তার সন্তুষ্টির কারণ হবে, তোমার বৃহৎ বৃহৎ ভুলগুলোও সে নিজ চেষ্টায় শুধরে নেবে যেহেতু সে তোমাকে জীবনের একমাত্র অপশন মনে করে’।

‘কিন্তু আপু, তারপরও তো অনেকের বিবাহবিচ্ছেদ হয়’।

‘হুমম, তা হয়। হবেনা কেন? দু’জন মানুষ সম্পূর্ন ভিন্ন দু’টি পরিবার এবং পরিবেশ থেকে এসে একসাথে মিলে যাওয়া কি এতই সহজ? দু’জনের মাঝেই প্রয়োজন ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সংবেদনশীলতা এবং অপর ব্যাক্তিটির প্রতি বিশ্বাস ও সহমর্মিতা। আবার ধর, একটি ছেলে বা মেয়ে যে বিয়ের আগেই অনেককে পরখ করে নিয়েছে, সে তার পার্টনারের মাঝে সেই সকল গুন খুঁজবে কিংবা তাকে তাদের সাথে তুলনা করবে অবচেতনেই। তখন বর্তমান পার্টনারের গুনগুলো তার যতটা না চোখে পড়বে বরং তার ঘাটতিগুলোই তার কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। তখন বিচ্ছেদ হবে বৈকি! কিন্তু কি জানো?’

‘কি?’

‘সামাজিকভাবে বিবাহিতা একটি মেয়ের যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় তবে তার পরিবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, আবার বিয়ে দেয় কিংবা প্রয়োজন হলে আজীবন তার দেখাশোনা করে কিংবা অন্তত তার বিপদ আপদে পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু বিয়ের আগে তুমি যদি একটি মেয়ের সঙ্গ উপভোগ করে অতঃপর বনবেনা ভেবে ফিরিয়ে দাও সে পরিবার পরিজন বন্ধুবান্ধব কারো কাছে সহানুভূতি বা সহায়তা পাবেনা, তদুপরি মেয়েটিকে বিয়ে দেয়াও মুশকিল হয়ে যাবে। তুমি যদি কাউকে সত্যিই ভালোবাসো তাহলে তার দায়িত্ব নিতে বা দায়িত্ব নেয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে তোমার আপত্তি কোথায়? এ’ কেমন প্রেম যেখানে শুধু ভোগ আছে অথচ ত্যাগ নেই?’

‘কিন্তু আমি তো তাকে বিয়ে করতে চাই!’

‘কিন্তু করবে কি’না তা নিশ্চিত নও’।

‘আমার উদ্দেশ্যটা তো তাই’।

‘ভাইরে, শোন। প্রবাদে যাই বলুক না কেন, the end does NOT justify the means. এই যে সমাজে প্রেমের নামে এত বিশৃংখলা আর কষ্টের ছড়াছড়ি – নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে ধর্ষন, নিজের চাহিদায় লাগাম দিতে না পেরে অনাকাঙ্খিতভাবে সন্তানধারণ, প্রেমে ব্যার্থ হয়ে আত্মহত্যা, বিয়ের পর প্রাক্তন প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি আবেগ উথলে ওঠার কারণে বর্তমান সম্পর্কের প্রতি অমনোযোগী হয়ে সংসারে অশান্তি – এখানে কোনটার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল ভাই? কিন্তু এখানে end বা means কোনটি justify করা যায়? আমাদের নিজেদের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সম্পর্কেও তো কোন ভুল ধারণা থাকা উচিত না। আমাদের ভেতর থেকে নাফস এবং বাইরে থেকে চিরশত্রু ইবলিস সারাক্ষণ ইন্ধন দিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের সূঁচ পরিমাণ ছাড় দিলে তারা কোদাল দিয়ে আমাদের কবরের মাটি খুঁড়তে থাকে’।

‘এভাবে তো ভাবা হয়নি!’

‘এখন ভাবো। তুমি যে মেয়েটিকে ভালোবাসো সে তো হবে তোমার সম্মানের পাত্রী যার প্রতি তোমার কল্পনাগুলোও হবে পবিত্র এবং সংযত, সেখানে তোমার আচরনে যদি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় তাতে কি ভালোবাসার সম্মান রক্ষা হয় ভাই? বিয়ের পর সে হবে তোমার দূর্গ যেখানে তুমি শয়তানের কবল থেকে আশ্রয় খুঁজে পাবে। কিন্তু সেই দূর্গের দ্বার যদি তুমি আজ নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেল তাহলে সেই দূর্গের ওপর কি তুমি কোনদিন আর আস্থা রাখতে পারবে?’

অনেকক্ষণ ভাবল সে।

‘ঠিক বলেছেন আপু। তখন আমার কেবল মনে হবে আমার আগে সে কার কার সাথে মিশেছে, ওদের সাথে ওর কতটুকু ভাব ছিল, কাউকে ওর আমার চেয়ে বেশি পছন্দ ছিল কিনা। আমি তার জীবনে একমাত্র পুরুষ হতে চাই। কিন্তু সত্যিই যদি আমি তাই হই তবু আমার মনে হবে সে আমার মন ভোলানোর জন্য এমন বলছে, নিশ্চয়ই সে যেমন আমার সাথে মিশেছে তেমনি অন্য কারো সাথেও মিশে থাকবে’।

‘তাহলে কেন জেনেশুনে একটি সহজসরল মেয়েকে এমন পথে পরিচালিত করতে চাও ভাই যেখানে তার জীবনটা সাজাতে গিয়ে জীবনটা শেষও করে ফেলতে পারো তুমি? তার চেয়ে তুমি ওর বাবার সাথে কথা বল। তুমি বলেছ তিনি তোমাকে বিশ্বাস করেন। তিনিও খুশি হবেন যে তুমি তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছ, তিনিই তখন মেয়েটিকে তোমার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। তুমি তোমার লক্ষ্যে উপনীত হবে নির্ঝঞ্ঝাটে এবং মেয়েটিরও সম্মানের কোন ক্ষতি হবেনা’।

‘কিন্তু আপু, ধরেন আমি প্রস্তাব করলাম কিন্তু ওরা রাজী হলেন না?’

‘শোন ভাই, তুমি কি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস কর?’

‘অবশ্যই’।

‘তুমি কি বিশ্বাস কর যে তিনি তোমাকে এবং তোমার লাইফ পার্টনারকে জোড়া মিলিয়ে সৃষ্টি করেছেন?’

‘জ্বী’।

‘তাহলে বিশ্বাস রাখো, এই মেয়েটি যদি তোমার নির্ধারিত লাইফ পার্টনার হয় তাহলে সে তোমার কাছেই আসবে। তা নইলে তোমার সততা এবং উত্তম নিয়াতের জন্য আল্লাহ তোমাকে এর চেয়ে ভাল লাইফ পার্টনার দান করবেন’।

‘আমার যদি অন্য কোন মেয়েকে পছন্দ না হয়?’

‘তুমি যদি একজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখো তাহলে অন্যের দিকে তাকাবে কি করে? তাকে যাচাই করবেই বা কিভাবে? কিন্তু তুমি যদি সাদা মন নিয়ে তার কাছে যাও, তাকে সুযোগ দাও, তাহলে সে তোমার মনের সাদা ক্যানভাসে রঙিন তুলি দিয়ে ছবি আঁকবে, তুমি বুঝতে পারবে তুমি যা চেয়েছিলে তার তুলনায় তুমি কত বেশি পেয়েছ। নইলে তুমি অন্য কারো লাইফ পার্টনারকে নিজের করে নেয়ার প্রচেষ্টায় কি পেয়েছ তা অ্যাপ্রিশিয়েট করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে’।

‘হুমম’।

‘এবার একটু ভেবে দেখ তো তোমার লাইফ পার্টনার নিয়ে অন্য কেউ টানাটানি করছে এমনটা কল্পনা করতে তোমার কেমন লাগছে?’

কিছুক্ষণ ভেবে সে বলল, ‘ভীষণ খারাপ লাগছে আপু। আমি ভাবতেই পারছিনা। কিন্তু আমি কি করে বুঝব যে আসলেই আমার লাইফ পার্টনার আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে আমি তার কাছে পৌঁছনো পর্যন্ত?’

‘একটাই উপায় আছে ভাই। যিনি সর্বস্রষ্টা এবং সর্বদ্রষ্টা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন আমাদের পছন্দের মানুষটি নিজেকে সংরক্ষণ করে কেবল আমাদের জন্যই। সাথে নিজেকেও এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন আমি তাকে গিয়ে বলতে পারি, ‘এই যে দেখ, আমার সবটুকু আমি বাঁচিয়ে রেখেছি কেবল তোমার জন্য। এর কোথাও কখনো তোমার ছাড়া আর কারো অধিকার ছিলোনা, আজ থেকে আমার সবকিছুর ওপর তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোল’। কি, বল? এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারবে তো?’

লাজুক হেসে ভাইটি বলে, ‘জ্বী আপু, এটুকু যে আমাকে পারতেই হবে!’

আসলে আমরা সবাই সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করতে চাই, কিন্তু অনেকসময় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পন্থা মিলাতে পারিনা। এত সীমিত বুদ্ধি এবং ক্ষমতা নিয়ে আমাদের এমন অনিশ্চিত পথে যাত্রা করার চেয়ে যিনি সর্বজ্ঞানী তাঁর জ্ঞানের ওপর ভরসা রেখে তাঁর নির্দেশিত পন্থায় পথ চলাই শ্রেয় নয় কি?

প্রেম – ৩

3 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

বেশ কিছুক্ষণ হোল দিয়া আর নায়লা ডাইনিং রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে, একটু পর পর খিলখিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ছে। মাহিরা বইটা সোফার হাতলে রেখে উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরে যেতে যেতে কিছুক্ষণের জন্য ওকে দেখে স্থির হোল মেয়ে দু’টো। তারপর আবার শুরু হোল খিলখিল ফিসফিস।

মাহিরা ট্রেটা ডাইনিং টেবিলে রেখে ডাক দিলো, ‘নায়লা, দিয়া, খেতে এসো’।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানালা থেকে সরে এলো ওরা। নায়লা ডালপুরির এক কামড় মুখে পুরে কাপে চুমুক দিয়েই চমকে উঠল, ‘ওয়াও আন্টি! চা?!’

দিয়া বলল, ‘হরলিকস কি শেষ আম্মু?’

মাহিরা বলল, ‘নাহ! তোমরা এখন বড় হয়েছ। তাই চা’।

আয়েশ করে চায়ে চুমক দিচ্ছে দু’জনে, মাহিরা খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, ‘পাশের বাসার ছেলেটা মাশাল্লাহ খুব সুন্দর, তাইনা?’

দিয়া নায়লার বিষম খাবার জোগাড়, নায়লা চোখ নামিয়ে বলল, ‘কোন ছেলে আন্টি?’

দিয়া বুঝল মায়ের সাথে চালাকি চলবেনা, বলল, ‘মাশাল্লাহ’।

মাহিরা উঠে দুই মেয়ের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল, নায়লার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘সুন্দরকে সুন্দর বলায় কোন অপরাধ নেই মা’।

নায়লা লজ্জা পেল, আন্টি কিভাবে যেন সবার মনের কথা বুঝে যান! মাহিরা বলে চলল, ‘সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষন সহজাত। একটা বয়সে এসে ছেলেদের প্রতি মেয়েদের এবং মেয়েদের প্রতি ছেলেদের আকর্ষন সৃষ্টি হওয়াটাও স্বাভাবিক ব্যাপার। এর প্রয়োজনও আছে। নইলে আদম (আ) এবং হাওয়া (আ) কেবল বন্ধুত্ব করতেন, বিয়ে করতেন না, পৃথিবীতে মানবগোষ্ঠী প্রথম প্রজন্মেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। তুমি, আমি, দিয়া আজ বসে একসাথে চা খেতে পারতাম না’।

খিল খিল করে ফেলে দু’জনে। একটু পর নায়লা উশখুশ করতে করতে বলেই ফেলল, ‘তাহলে আন্টি ছেলেমেয়ের মেলামেশার ব্যাপারটাকে এত নিরুৎসাহিত করা হয় কেন?’

মাহিরা হেসে বলল, ‘তুমি খুব ভাল প্রশ্ন করেছ মা। দিয়া, তুমি কি জানো ছেলেমেয়ের মেলামেশায় কি সমস্যা?’

দিয়া ভাবনাটাকে মনের ভেতর গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, ‘আমার কি মনে হয় জানো, রংধনু আমাদের মোহিত করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে সবকিছু কি রংধনু রঙে রাঙানো হয়? সবকিছু রংধনু রঙে রঙ্গিন হলে প্রতিটি রঙের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় সৌন্দর্য্য তা কি উদ্ভাসিত হতে পারত কিংবা সৃষ্টজগতের মাঝে কোন বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যেত? আমরা যখন অনেক মানুষের সাথে মিশি তখন প্রত্যেকের কিছু না কিছু গুনাবলী আমাদের আকর্ষন করে। কিন্তু আমরা যখন বিয়ে করতে যাই তখন একই মানুষের মাঝে সব গুনের সমাহার আশা করি। যেমন সিনেমার হিরো একই সাথে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গায়ক, নর্তক, কবি আর কারাতে ব্ল্যাকবেল্ট হয়,’ ফিক করে হেসে ফেলে দিয়া, ‘কিন্তু বাস্তব জীবনে কোন মানুষের মাঝে সকল গুনের সমাহার অসম্ভব ব্যাপার। তখন যে মেয়েটি অনেক ছেলের সাথে মেলামেশা করেছে সে বিয়ে করলে অবচেতন মনে তুলনা করতে থাকে– এই ব্যাক্তি অমুকের মত গান গাইতে পারেনা, তমুকের মত কবিতা লিখতে পারেনা, অমুকের মত সাহসী নয় কিংবা তমুকের মত স্টাইলিশ নয়। কিন্তু যে মেয়েটির জীবনে তার স্বামীই প্রথম পুরুষ সে তার মাঝে যে গুনাবলীই খুঁজে পায় তাই তাকে আনন্দিত করে’।

মেয়ের আলোচনায় চমৎকৃত হলেও নায়লার মন খারাপ হবে বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলনা মাহিরা, বলল, ‘হুমম, তোমার কথায় যুক্তি আছে। এটা একটা ব্যাপার বটে, তবে এটাই একমাত্র ব্যাপার নয়’।

দিয়া বলল, ‘আরেকটু বিস্তারিত বল না আম্মু’।

মাহিরা বলল, ‘শোন, চোখ হোল মনের প্রবেশপথ। কিন্তু চোখ সবসময় মনকে সঠিক ফিডব্যাক দেয়না। যেমন ধর, পাশের বাসার ছেলেটা খুব সুন্দর। কিন্তু আমরা কি জানি সে মানুষ হিসেবে কেমন– সে কি মেধাবী না বোকা, ভাল ছেলে না ড্রাগখোর কিংবা ওর চরিত্র কেমন?’

দিয়া আর নায়লা দু’জনই মাথা ঝাঁকালো।

‘মানুষের চোখ মানুষকে অনেকসময় বিপথগামী করে। তাই দৃষ্টির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। ছেলেমেয়ে সবসময় একসাথে থাকলে মন সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়না যার দ্বারা সে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে দৃষ্টি অনেক বড় দুর্বলতা। মনোবিজ্ঞান বলে ওদের মনের ধরনটাই এমন যে এর ওপর রঙ এবং রূপ প্রচন্ডভাবে ক্রিয়া করে। তখন ওদের কোন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা থাকেনা। তাহলে একটা মেয়ে যদি নিজেকে কোন ছেলের সামনে মোহনীয় করে উপস্থাপন করে তাহলে কি সে ছেলেটিকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করল না তার দুর্বলতার সুযোগ নিল?’

নায়লা বলল, ‘ঠিক তো আন্টি! এভাবে তো ভেবে দেখিনি কখনো!’

মাহিরা বলল, ‘তখন কি হয় জানো মা? ক’দিন পর যখন ছেলেটার চোখ ধাঁধানো ভাব কেটে যায়, তারপর শুরু হয় অন্যান্য গুনাবলীর অভাব নিয়ে অসন্তুষ্টি। সংসারে শুরু হয় অশান্তি। ক্ষতিটা কার হয় বল তো? ঠিক, মেয়েটার। কারণ একটা মেয়ের কাছে সংসার যতখানি গুরুত্বপূর্ণ একটি ছেলের কাছে ততটা নয়’।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয় দিয়া আর নায়লা।

‘আর মেয়েদের ভালোবাসাটা কেমন জানো? সে যেন এক তীব্র স্রোতস্বিনী। একবার বেগ পেলে সে আর দেখেনা সামনে পাহাড় আছে না গহ্বর। সে যেকোন উপায়ে নিজের পথ তৈরী করে নিতে বদ্ধপরিকর। সাগরের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেয়াই যার একমাত্র কাম্য পরিণতি। এই ভালোবাসা মেয়েদের অসাধ্য সাধন করতে শেখায়। এই তেজস্বীতার প্রয়োজন আছে। নইলে কোন মেয়ে পাহাড়সম বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে সংসার করতে পারতনা, পর্বতপ্রমাণ কষ্ট সহ্য করে মা হতে পারতনা, নিজের অসুস্থ সন্তানটাকে সবল এবং সক্ষম সন্তানদের সমান ভালবাসতে পারতনা। কিন্তু মাগো, পানিই জীবন, পানিই মরণ। যে ভালোবাসা দিয়ে একটা মেয়ে সংসারকে সাজায় সে ভালোবাসাই অপরিসীম ধ্বংস ডেকে আনতে পারে যদি তাতে বিবেচনার সংযোগ না ঘটে’।

আঁতকে ওঠে দিয়া, ‘কিভাবে আম্মু?’

নায়লা বলে, ‘আমি বুঝতে পারছি আন্টি, একটা মেয়ে যদি নিজের পরিবার পরিবেশ এবং নিজের সত্বার প্রতি দায়িত্ব ভুলে গিয়ে কেবল মোহের কারণে একটা ছেলের পেছনে ছোটে। কেউ যখন বিবেচনাশূন্য হয়ে কারো প্রতি আকৃষ্ট

হয়, যেমন আপনি বললেন পাশের বাসার ছেলেটার ব্যাপারে আসলেই তো আমরা কিছু জানিনা, তখন সে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজের ভালবাসার অপরিসীম যোগ্যতার কারণে তার পথের সকল বাঁধাকে দুমড়ে মুচড়ে এগিয়ে যায় যার বলি হতে পারে তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, লেখাপড়া থেকে চরিত্র পর্যন্ত! অথচ যার জন্য সে এতটা বাঁধাহীন স্রোত হয়ে ছোটে সে মানুষটা সঠিক না হলে শেষ পর্যন্ত তার নিজের সত্বার প্রতিও সুবিচার করা হয়না কারণ সে হারায় সবকিছুই কিন্তু পায়না কিছুই'।

তিনজনই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, যেন নদীর স্রোতের সাথে পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে এইমাত্র তীরে ভিড়ল তারা।

দিয়া বলল, 'তাহলে তো আম্মু আমাদের অনেক বেশি সাবধান হওয়া প্রয়োজন!'

নায়লা বলল, 'ঠিক আন্টি, এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখেই পথ চলতে হবে এখন থেকে যেন আমাদের অসাবধানতার কারণে আমাদের নিজেদের, আমাদের প্রিয়জনদের কিংবা অপরের ক্ষতি হয়ে না যায় আমাদের দ্বারা'।

মাহিরা হেসে দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর ওদেরকে ওদের মত গল্প করতে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসে প্রিয় বইটার সাথে।

খানিকক্ষণ পর দেখে ওরা নাস্তার ট্রে রান্নাঘরে রেখে দিয়ার রুমে গিয়ে বসে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে দিয়া বলে, 'নিজেদের গড়ে তোলার জন্য অনেক অনেক জ্ঞানার্জন করতে হবে। নইলে পা পিছলে পড়ে যেতে পারি ভুল পথে'।

নায়লা বলে, 'হুমম, আমাদের আন্টির মত হতে হবে যেন আমরা কেবল নিজেরাই সঠিক পথে না চলি বরং অন্যদেরও সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারি মমতার সাথে'।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসি লুকোয় মাহিরা, 'মেয়েগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনেই'।

[ক'দিন আগে আমার কন্যা রাদিয়া আর ওর বান্ধবী নাভেরা কথা বলছিল। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই রাদিয়া বলল, 'আমি সম্পূর্ন ইসলামী পদ্ধতিতে মসজিদে বিয়ে করব ইনশা আল্লাহ্'।

নাভেরা বলল, 'কেন রাদিয়া? তুমি তোমার বাবামায়ের একমাত্র মেয়ে। তুমি তো চাইলে অনুষ্ঠান করে বিয়ে করতে পারো!'

রাদিয়া বলল, 'না পারিনা, কারণ কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'কত মেয়ের টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছিলোনা। তুমি কেন এত শান শওকত করে বিয়ে করলে? কেন তাদের কথা ভাবলেনা?''

আমার মনের ইচ্ছেটা আল্লাহ্ আমার মেয়ের মুখ থেকে প্রকাশ করলেন। সবাই দু'আ করবেন যেন আমার সন্তানদের এই সুন্দর ইচ্ছেগুলো সারাজীবন বজায় থাকে, হারিয়ে না যায় এই সমাজের কদর্যতার ঘুর্ণিপাকের আবর্তে।]

• এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন মেয়েদের ভালবাসার আদল কেমন হয়। তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থেই এই লেখা। তাই এই লেখা তাঁর জন্যই উৎসর্গিত।

আগুন

12 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

মানুষের মন এক অদ্ভুত চিজ। চোখের সামনে এমন অভাবনীয় দৃশ্য ঘটমান, আর আমার মন কি'না আমাকে নিয়ে চলে গেল বেড়াতে, তিন বছর আগে, যখন প্রথম এই ছেলেটিকে দেখেছিলাম।

সেদিন ছিলো আমাদের ছাত্রজীবনের সমাপ্তি দিবস। রায়হান বলল, 'চল, আজ সেলেব্রেট করি। কি করা যায়? কি করা যায়? পেয়েছি! চল, তোকে কাবাব খাওয়াব, পোড়া মাংসের গন্ধে খাবার এসে পৌঁছবার আগেই তোর ঠোঁটের কোণ বেয়ে লোল পড়বে, দেখে দেখে আমি হাসব। সিরিয়াস মজা হবে'।

রায়হান আর আমার বন্ধুত্ব হোল যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ, পরস্পরনির্ভরশীলতাই যার ভিত্তি। সে বিশাল বড়লোকের ছেলে, ওর দাদার দেয়া হাসপাতাল ওদের পারিবারিক সম্পদের একটি অংশ। সুতরাং, মেধা থাক বা না থাক, ওকে ডাক্তার হতেই হবে। আর আমি হলাম গরীবের মেধাবী ছেলে। মেধার জোরে ভর্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। রায়হানের সুবিধা আমি ওকে পড়াশোনায় সাহায্য করি, আমার সুবিধা সে আমার পকেটের অবস্থা বুঝে আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আমার সুবিধা অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখে। সব দিক মিলিয়ে এই বন্ধুত্বে উভয়ের লাভ। আমরা উভয়ই জানি আমরা পাশ করব। কিন্তু রায়হান পাশ করা মাত্র গিয়ে বসবে ওর দাদার হাসপাতালে, কয়েক বছরের ভেতর সে পৌঁছে যাবে এম ডির চেয়ারে; আর আমার চিন্তা আমাকে কোন পাহাড়ে বা কোন অজ পাড়াগাঁয়ে পাঠানো হবে। যাক, এই সুযোগে একবার কাবাব খাওয়া হয়ে যাবে, এটাই লাভ।

দোকানে গিয়ে পোড়া মাংসের গন্ধে আসলেই আমার জিভে জল আসতে লাগল। অপেক্ষার প্রহর যেন আর শেষ হয়না। এমন সময় আজকের এই ছেলেটা একটা মেয়ে নিয়ে প্রবেশ করল। গিয়ে বসল রায়হানের পেছনের টেবিলটায়। ওদের অন্তরঙ্গতা দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওরা স্বামী স্ত্রী। কিন্তু স্বামী স্ত্রী পাবলিক প্লেসে এতটা অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করেনা, কারণ ওদের অন্তরঙ্গ হবার জন্য বাড়ীঘর রয়েছে। মেয়েটা হোল যাকে বলে আগুনে সুন্দরী, হাসিতে মুক্তো ঝরে টাইপের। এত সুন্দর মেয়েটা কেন কারো ঘর আলো না করে এমন একটা ছেলের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে তার মানসম্মানের কোন পরোয়াই করেনা, সেটা বুঝতে পারলাম না। যাক, বড় বড় লোকের বড় বড় কারবার আমার মত গরীবের ছেলেরা বুঝবে তাই বা আশা করি কি করে? নিজের অজান্তেই বার বার চোখ চলে যাচ্ছিল

মেয়েটার দিকে। মন বলল, 'হে ফাইয়াজ, তোমার প্রভু তোমাকে যে চোখ দিয়েছেন তার হিসেব কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভুলে যেয়োনা'। মনের ওপর জোর খাটিয়ে রায়হানকে বললাম, 'নাহ, আজ কাবাব খাবনা। চল, চাইনিজে যাই'। ওর আপত্তি উপেক্ষা করে, অর্ডার ক্যান্সেল করে, দোকানের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহাখাপ্পা হয়েছিলো রায়হান সেদিন, কিন্তু আমি ওকে আজও বলিনি কেন সেদিন এমন অদ্ভুত আচরণ করেছিলাম।

পোড়া মাংসের তীব্র গন্ধ অতীত থেকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। মেয়েটা দু'দিন হোল হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টের শব্দ। কিন্তু এই কষ্ট তার নিজের হাতে সৃষ্ট। চার বছর প্রেম করার পর বয়ফ্রেন্ড বিয়ে করবেনা জানিয়ে দেয়াতে সে নিজের গায়ে আগুন দিয়েছে। পরিবারের সবাই মিলে আগুন নিভাতে নিভাতে ততক্ষণে শরীরের অধিকাংশ পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। মাথার চুল জ্বলে গিয়ে দগদগে লাল পোড়া চামড়া বেরিয়ে পড়েছে, মুখের রঙ কালো আর লালের সংমিশ্রনে ভয়াবহ হয়ে রয়েছে, ঠোঁট গলে গিয়ে কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছেনা। তবু যতবার কাছে যাচ্ছি ওর পাপড়িবিহীন চোখে দু'টো করুণ দৃষ্টিতে বলার চেষ্টা করছে, 'আউয়ি আর ওয়াচতে চাইয়াঁ, আওয়াকে ওয়েরে হ্যালেন'।

আমি বুঝতে পারছি এটা ওর অভিমানের কথা নয়। ওর বাবা সেদিন থেকে এক মূহূর্তের জন্য ওকে ফেলে নড়েননি। মা এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছেন না বলে রুমের বাইরে চেয়ার নিয়ে বসে অবিরাম কেঁদে চলেছেন, আর সাথে সাথে চলছে বিড়বিড় করে দু'আ পড়া। বড় বোনটা মনে হয় ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা বনে গিয়েছে। বোনের বিছানার পাশে খুব সুন্দর ফ্রুট বোলে সাজানো নানারকম ফলফলাদি, ছুরি, কাঁটা চামচ, বাটি সাজিয়ে রেখেছে। অথচ সে তো কিছুই খেতে পারবেনা! ভাইটা আজই এসেছে ঢাকা থেকে। এসে সব শুনে কিচ্ছুটি না বলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটির বর্ণনাতীত কষ্টের সামনে এই স্নেহমায়ার বন্ধন যে বড় ঠুনকো!

ভাইটা এইমাত্র ফিরে এলো তিন বছর আগে দেখা ছেলেটিকে নিয়ে। ওর কলার চেপে ঘাড় ধরে ঠেলতে লাগল মেয়েটির দিকে, 'তুই আজ এখনই ওকে বিয়ে করবি'। ছেলেটি মেয়েটিকে দেখে শিউড়ে উঠে পিছিয়ে আসতে চাইল। ভাইটি ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে দিলো, 'কেন, ওর সাথে চার বছর ঘুরার সময় এত ভালো লেগেছে। এখন আর আমার বোনকে তোর ভালো লাগছেনা, তাইনা? আব্বা, ওকে চোখে চোখে রাখবেন, ও যেন কোনদিকে পালাতে না পারে। আমি এখনই বিয়ে পড়াবার ব্যাবস্থা করছি'।

বাবা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি হতবাক। চোখের সামনে যা ঘটছে তার চেয়েও হতবাক এই ভেবে যে এই সেই আগুনে সুন্দরী! এই মূহূর্তে ওর চেহারা, ওর গন্ধ, ওর কষ্টের শব্দ ডাক্তার হয়েও আমি সহ্য করতে পারছিনা, এই ছেলে তাকে সহ্য করবে কি করে?

খবর পেয়ে রায়হান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। ওহ, বলা হয়নি, আমাকে আর শেষ পর্যন্ত পাহাড়ে জঙ্গলে যেতে হয়নি, রায়হানের বুন্ধুত্ব আমাকে ওর দাদার হাসপাতালেই একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলো। এখন দু'জনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলাম পুলিশ ডাকাই সবচেয়ে নিরাপদ। রায়হান রুমের বাইরে গিয়ে মোবাইলে কল দিলো পুলিশে। ততক্ষণে প্যাসেজে মেয়ের ভাইয়ের হুংকার শুনে বোঝা যাচ্ছে সে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। হঠাৎ ছেলেটা লাফিয়ে উঠল। ফ্রুট বোল থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে বাতাসে পোঁচ দিতে দিতে বলল, 'আমি ওকে বিয়ে করতে পারবনা, আমাকে বাধ্য করার চেষ্টা করলে ভালো হবেনা'। মেয়ের বড়বোনের ওপর মেজাজটা খুব খারাপ হোল। ফ্রুট কাটার জন্য এত বড় সাইজের ছুরি লাগে নাকি? এটা দিয়ে গরু জবাই করা যাবে! ছোট ছুরি হলে চেষ্টা চালিয়ে দেখতাম ওকে নিরস্ত্র করা যায় কি'না। মেয়ের ভাই ঘরে ঢুকে ওর কান্ড দেখে রাগে ঠোঁট কুঁচকে ফেলল, আক্রমনোদ্যত কুকুরের মত

ক্যানাইন দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। তারপরের ঘটনাগুলো অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে ঘটতে লাগল। স্লো মোশানে দেখা গেলে দর্শক দেখতেন, রায়হান আমার মনোভাব বুঝতে পেরে আমাকে শক্ত করে ধরে ফেলল যেন আমি ছুরি হাতে প্রলাপরত ছেলেটির দিকে এগোতে না পারি। মেয়েটির ভাই ছেলেটির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, বুড়ো বাপ বাঁধা দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছেনা। ভেতরে হুটোপুটির শব্দ শুনে বড়বোন কি ঘটছে দেখার জন্য এসে বেহুঁশ হয়ে দরজার পাশেই এলিয়ে পড়েছে। মেয়েকে ধরতে এসে মা ঘরের ভেতর দৃশ্য দেখে দিলেন এক গগনবিদারী চিৎকার। ছুরি হাতে ছেলেটা ওদিকে তাকাতেই মেয়েটির ভাই ওর কাছ থেকে ছুরি ছিনিয়ে নিতে পা বাড়াল। সাথে সাথে ছেলেটা সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে মেয়েটার হৃৎপিণ্ড বরাবর ছুরিটা বসিয়ে দিলো। সাথে সাথে সব স্তব্ধ, মেয়েটার সামান্য একটা দীর্ঘশ্বাস, তারপর ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। রায়হান এবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে ফেলল। ছেলেটা নিজেও বিশ্বাস করতে পারছেনা সে এইমাত্র কি করেছে। সে বার বার বলছে, 'আমি ওকে বিয়ে করতে পারবনা, আমি ওকে বিয়ে করতে পারবনা ...'।

আমি ততক্ষণে ছুটে গিয়েছি মেয়েটার পাশে। না, মনে হচ্ছেনা ওকে বাঁচানো যাবে। ওর শরীর এমনিতেই গত দু'দিন ধরে যুদ্ধ করে ক্লান্ত। ছুরিটা বিঁধেছে ঠিক ওর হৃৎপিন্ড বরাবর, ওর নিঃশ্বাসের শব্দ বলছে ও এবার এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চায়। মেয়েটার বাবা ঘটনার আকস্মিকতায় পাথরবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন যেন। মেয়েটার ভাই দুই হাতে মাথার সমস্ত চুল আঁকড়ে ধরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে, যেন সে পারলে পুরো ঘটনা আবার রিওয়াইন্ড করে এবার ঠিকভাবে করত। দরজার কাছে নার্স মা মেয়ের নিথর দেহগুলোতে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। এর মাঝে মেয়েটার আত্মা ওর দেহ থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে গেল।

মনে মনে ভাবলাম, যাক সে অন্তত এই নরকযন্ত্রনা থেকে তো মুক্তি পেল! পরক্ষণেই মনের আয়নায় ভেসে উঠল, 'যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহন করবে, আর যে হতভাগা সে তা উপেক্ষা করবে, সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে, অতঃপর সেখানে সে মরবেও না জীবিতও থাকবেনা' (সুরা আলাঃ আয়াত ১০-১৩)।

আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এই জীবনে আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি যতই কঠিন হোক, মৃত্যু এক সময় তার সমাপ্তি টেনে আনে, শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়। কিন্তু এর পরবর্তী অধ্যায়ে মৃত্যুর অনুপস্থিতি এক বিরাট পার্থক্যসূচনাকারী ফ্যাক্টর। সেখানে কোন মৃত্যু, চেতনাহীনতা বা দুর্বলতা আমাদের আগুনের তেজ থেকে সাময়িক নিরাপত্তাও প্রদান করতে পারবেনা। তবে কিসের আশায় আমরা এই জীবনটা হেলাফেলায় কাটিয়ে দেই যেখানে এটিই একমাত্র ফলাফলনির্ধারনী পরীক্ষা? হঠাৎ মেয়েটির জন্য করুণা এবং বিষাদে ছেয়ে গেল মন।

বেচারী! ওর প্রভু ওকে উজার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিবেচনার অভাবে সে এদিকেও কিছু পেলোনা, ওদিকেও কিছু পাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। নিজের জন্য আশংকায় কেঁপে উঠলাম, 'হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত কোরোনা, আমাদের তোমার অনুগ্রহ দান কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা'!

প্রেম-বিয়ে সংস্কৃতি এবং অসুস্থ দুষ্টচক্রগুলো এমন কেন ?

24 September 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

প্রেম-ভালোবাসা এবং বিয়ে বিষয়ে আমার সাধ্যমতন কিছু অতি স্বল্প আকারে লেখা লিখেছিলাম একসময়। স্রেফ এতটুকুর কারণেই অনলাইনে এবং বাস্তব জীবনে বিভিন্ন তীর্যক তীক্ষ্ণ ভাষায় কটুক্তি ও সমালোচনা আমি শুনেছি। কিছু কথার কারণে কষ্টও পেয়েছিলাম। সে যাই হোক, আমি জানি, এই বিষয়টাতে আমি কেন বারবার গুরুত্বপূর্ণ বলতে চেয়েছি। কেবল ইচ্ছে হলেই লিখতে বসিনি, অনেক সময় নিয়েই ভেবে কথাগুলো বলতে চেয়েছি কেননা আমার জীবনের বেড়ে ওঠার সময়গুলোর অভিজ্ঞতার আলোকেই কিছু কথা জানাতে চেয়েছি। আমি প্রচুর মানুষের সাথে মিশেছি সবসময় হাইস্কুলের সময় সময় থেকেই — আমার তা ভালো লাগত। আমি ভার্সিটি লাইফে কখনো হলের বাইরে কাটাইনি, মিশেছি, জেনেছি, সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করেছি। আমার এই দীর্ঘ সময়ে উপলব্ধি ছিলো বেশ কিছু যার একটি হলো — তরুণ প্রজন্মের আনপ্রোডাক্টিভিটি, সময় নষ্ট করা, দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া, মেধা কমে যাওয়ার পেছনে যেই জিনিসটাকে আমার খুব বড় মনে হত তা হলো — প্রেম।

কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, চলমান সময়টা বড্ড কঠিন। পূর্বেকার অন্য যেকোন সময়ের চাইতে কঠিন, আগামীতে আরো বেশি ফিতনাময় হবে তা বলাই যায়। এখন যারা দ্বীনের বোধসম্পন্ন মানুষ, তারা অনেক চিন্তিত থাকেন একটা সন্তানের বেড়ে ওঠা নিয়ে নিয়ে এবং আল্লাহর কাছে অনেক বেশি করে দু'আ করে সাহায্য চাইতে থাকেন; এটাই স্বাভাবিক। আমি ক্লাস এইট পেরিয়ে যেসব বিষয় ক্লাসমেটের কাছে শুনে অবিশ্বাস নিয়ে ভয়ে শিউরে উঠে রাতে ঘুমাতে পারিনি, সেসব বিষয়ে এখনকার কিন্ডারগার্টেনের ছেলেমেয়েরাই দিব্যি তা জানে। মনে পড়ে, 'আলিফ লায়লা' দেখবো বলে এশার সলাতে (৮:৩০/৮:৪৫) সালাম ফিরিয়ে দৌড়ে বাসায় ফিরতাম। তখন জুঁই নারিকেল তেলের অ্যাডে বলত, 'তোমার ঘন কালো চুলে হারিয়ে যায় মন' — এমনটা দেখেও লজ্জা পেতাম। একটা ছেলে এরকম বেশরমের মতন কথা বলছে, চিঠি লিখছে তা মানতে পারতাম না, জানতাম এটা ঠিক নয়। আল্লাহর অশেষ রাহমাতে টেলিভিশনের প্রতি ন্যূনতম ভক্তিও উঠে গিয়েছিলো ক্লাস সেভেন-এইটের সময়েই। এই জীবনে দিব্যি টিভির দর্শন ছাড়াই খুব ভালোভাবেই বেঁচে আছি আলহামদুলিল্লাহ। ক'দিন আগে পন্ডসের অ্যাডে দেখলাম বলে "এমন নরম কোমল ত্বক শুধু ছুঁতে চায় মন" — এমন টিভি কমার্শিয়াল ভাতিজি এবং ভাগ্নের সামনে বসে দেখা খুবই অস্বস্তিকর। তাও ভালো, স্যাটেলাইট চ্যানেলে ডিওডোরেন্ট স্প্রে-গুলোর টিভি কমার্শিয়াল দেখার মতন অসভ্য বিষয় দেখতে হয়নি, পানাহ চাই আল্লাহর কাছে।

আমি জানিনা কয়টা পরিবার আদৌ 'ডিশের লাইন' ছাড়া টেলিভিশন কল্পনা করতে পারেন। তবে, আমি জানি, আমি এবং আমাদের ভাই-বোনদের টেলিভিশনের তেমন কোন উপস্থিতি ছাড়াই দিব্যি জীবন কেটে গেছে, এবং তা অবশ্যই চাপিয়ে দেয়া ছিলো না, এগুলোর প্রতি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিরক্তিবোধ থেকেই তা হয়েছিলো। ক্রমাগত লজ্জাহীনতা দেখতে থাকলে, একসময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে, অথচ এসব স্বাভাবিক না। 'টম এন্ড জেরি' কার্টুনে টম কোন বিড়াল পেলেই যেই অঙ্গভঙ্গি করে এগিয়ে যায়, তা বোধকরি হলিউডের বড়দের 'এজ রেটের' ফিল্মগুলোর সাথেই মানায়, এতে মেয়ে বিড়াল অথবা নারী কারোই পোশাক গ্রহণযোগ্য নয়। প্রায় কার্টুনগুলোই এমন। আমাদের কি মনে হয় শিশুরা এসব বুঝেনা বা শিখেনা? তাদের 'অবজার্ভেশন পাওয়ার' অত্যন্ত বেশি সেটা মা-বাবা মাত্রই জানেন। সিনডারেলা, মিনি এবং মিকি মাউসের মূল চরিত্রগুলোতে 'স্ট্যান্ডার্ড' বা শিক্ষণীয় বিষয় কতখানি ভেবে দেখি আমরা? ইসলামের চোখে এই নির্লজ্জ এবং আদবহীন বিষয়গুলোর প্রসার করা তো সম্পূর্ণ

নিষেধ। সন্তানদের কাছে এই পথগুলো খুলে দিলে একসময় তারা 'ডিসেনসিটাইজড' হয়ে যাবে। তাদের সামনে আদর্শের অভাব হয় কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের সেরা চরিত্র তাদের কল্পনায় আর গল্পে জীবন্ত থাকছে না। কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমরা তাদের দিয়ে রাখি কম্পিউটার বা টেলিভিশন পর্দায় চরিত্রহীনতার প্রদর্শনীতে। ওতেই ভয়, কেননা যখন 'খারাপ/অস্বাভাবিক' বিষয়গুলো 'স্বাভাবিক' হিসেবে প্রকাশ পাবে ছোটদের কাছে, তখন তার প্রতি ওদের অপছন্দ ও ঘৃণা তৈরি হবে না। ভবিষ্যত চরিত্রে তার প্রভাব থাকবে। আমাদের দ্বীনে 'হায়া' বা লজ্জা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যা কেবল উপলব্ধিরই নয় বরং সময়ের সাথে সাথে তাকে গড়ে তোলারও।

কলেজ জীবনে এসে খেয়াল করতাম যেই কোচিং সেন্টারে মেয়ে থাকত, সেটাতে অনেকেই পড়তে যেতে চাইত। এখন তো ফেসবুকেই অনেক ফ্রেন্ড বানিয়ে, ইনবক্সের আলাপে, ফটো কমেন্টে কতকিছু হয় যা কেউ ভাবেনি আগে!! সেই সময়ের এই রোমান্সের মূলে ছিলো হিন্দি মুভিগুলো, অথবা হলিউডি মুভি। বন্ধুরা অনেকেই উল্টাপাল্টা প্রেম করতে গেলে যদি দু'কথা বলতাম তখন শাহরুখের 'কাল হো না হো' দেখে শেখা একটা ডায়লোগ দিতো — 'ছাও, মুসকো রাও, কেয়া বাতাও, কাল হো না হো'... এত চিন্তা করে আর কী হবে ক'দিনের এই জীবনে? ভালো কথা, মনে পড়লো যে সেই সময়ের প্রেমিক হৃদয়ের কেউ কেউ বিয়ে করে ডিভোর্সও হয়ে গেছে তাদের বনিবনা হয়নি বলে। চিন্তা করতে শেখার আগেই বড় সিদ্ধান্ত আবেগের বশে নিলে মানিয়ে নেয়া হবে কী করে? এমন কিছু ক্ষতি তো আছেই অপরিণত 'প্রেম করাই লাগবে' রোগের। কলেজে পড়ি তখন, একবার এক বন্ধুর বাসায় ঈদের দিন দাওয়াতে গিয়েছি। বলাই বাহুল্য, উপস্থিত ক্লাসমেটদের প্রায় সবারই 'গার্লফ্রেন্ড' ছিলো। বন্ধুর বড় বোন হঠৎ হাজির হয়ে সবার 'ইয়ের' খোঁজ নিচ্ছিলেন, আমি অস্বস্তিতে মাথা নিচু করে খাচ্ছিলাম। একসময় আমার কাছে প্রশ্ন এলে আমি কিছু না বললেও বন্ধুরাই বললো। আমাকে তিনি বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কোন ফোন ফ্রেন্ডও নাই?!!" সে অনেক বছর আগের কথা। সেদিন উনার অবাক হওয়া দেখে আমি যেন বিষণ্ন হয়ে গেলাম, এই 'ফোন ফ্রেন্ড' জিনিসটা আমি পরে অন্যদের জিজ্ঞাসা করে বুঝেছিলাম। এটা হলো — ফোনে আলাপ হবে, মজা হবে, খোঁজখবর নেয়া হবে... !! কী অদ্ভুত সব আবিষ্কার শয়তানী বুদ্ধির লোকেদের।

ভার্সিটি হলে যখন থাকি, তুমুল প্রেমের বন্যা চারপাশে। ক্লাসের শেষে, বিকালে রিকসায় করে কোথাও অনেকেই ঘুরে। একটু রাত হলেই ফোন কানে নিয়ে ছেলেরা হলের বারান্দার দেয়ালে উঠে কথা বলতে শুরু করে। রাত গভীর হয়, ফোনওয়ালার সংখ্যা ও আনাগোনাও বাড়ে। এই সময়ে নিজেকে প্রতিদিন উত্তর দিতে হত, কেন আমি ওদের মতন হতে চাইনা। এটাই মনে হয় সবার হয়, নিজেকে প্রশ্ন করা, উত্তর পাওয়া নিজের ভিতর থেকেই। এমন নয় যে মনের কথা বলা, আলাপচারিতা আর খুনসুটি করার ইচ্ছা কারো হয় না — এ আবেগ সাধারণ, সবার। বেশিরভাগ পরিবারে বিবাহপূর্ব সম্পর্ক প্রেম গ্রহণীয় থাকে না — সেটা ধর্মীয় কারণেই হোক বা পারিবারিক অন্য কারণেই হোক। অথচ ছেলেমেয়েরা অনেকে লুকিয়ে প্রেম করে শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত করে। ৬-৭ বছর পেরিয়ে যায় অথচ বাবা-মা জানতে পারেন না দিব্যি তারা প্রতিদিন কত যোগাযোগ করে। এভাবেই কেউ সম্পর্ক ভাঙ্গে, নতুন সম্পর্ক গড়ে। আর, বিয়ে? সে ত বহুদূর... প্রশ্ন করলে তাদের অনেকের কাছে উত্তর পাবেন, "এখনো আমরা এতটা ভাবছিনা, আরো কিছুদিন যাক। বিয়ে অনেক খরচ আর দায়িত্বের ব্যাপার"... কী যাবে? কতদূর? কেন? দায়িত্ব কী ভীতিকর? আর দায়িত্বহীন আনন্দ? তা কেন নিচ্ছ??

ভার্সিটির হলগুলোতে বহু কম্পিউটারেই পর্ণগ্রাফি পাওয়া যাবে। অনেকগুলো ভার্সিটির কথা আমি জানি, বন্ধু-ছোটভাই-বড়ভাইদের কাছে শুনেছি। এটাও জানি, হলের নেটওয়ার্কে ঢুঁ দিলে শত গিগাবাইটের পর্ণোগ্রাফির মুভিওয়ালা ছেলেরাও দিব্যি ফেসবুকে বসে বসে 'নারীমুক্তির' গান গায়। নারীর প্রতি এদের ধারণা তারা নারী নিয়ে আলাপ করার সময় যা বলে, তা থেকেই সহজে অনুমেয়। হলের টিভিরুমে 'চিয়ার গার্ল' অথবা 'সুন্দরী মডেল' দেখালে যারা সর্বপ্রথম কিছু রগড়ে মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়, এই 'মুক্তমনারা' সে দলেই পড়ে। সাইবার ক্যাফে তে অনেক আগে যেতাম, যখন নিজের মডেম ছিলো না — সেখানে 'ব্রাউজারের হিস্টরি' ঘাঁটতে হত না, অ্যাড্রেসবারে কিছু চাপলেই ভীতিকর হয়ে বেরিয়ে আসত। প্রকৌশলবিদ্যার ছাত্র হবার কারণেই হয়ত, একটা কম্পিউটারে বসে কয়েক সেকেন্ডের মাঝে অনেক কিছু বুঝে ফেলতে পারি। মনে আছে, আগের অফিসে থাকতে 'প্রভার ভিডিও' বের হবার পরে "সকল বিবাহিতরা" দৌড়ে অপর বিবাহিতের কম্পিউটারে দেখতে গিয়েছিলো। কেউ দেখাচ্ছে, কেউ দেখতে যাচ্ছে। তারাই আবার 'ছি ছি' করলো পরে। এমন নির্লজ্জতা সহ্য করা কঠিন! কিন্তু এমনটাই মনে হয় বাস্তবতা। বছরের পর বছর ধরেই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেক বয়স্করা অফিসের ইন্টারনেট ইউজ করে এসব ডাউনলোড করেন — তারা সন্তানের জনক। জানতে পেলে লজ্জা পাই, উনাদের হয়না। এক বাসায় গিয়ে ল্যাপটপে একটা কাজ করে দিতে ধরতেই দেখলাম এর আগেই কিছু পর্ণ সাইটে ঢুঁ দেয়া হয়েছে। এমন অভিজ্ঞতা অজস্রবার হয়েছে নানান জায়গায়...

এমন একটা ভয়াবহতাময় কঠিন সমাজেই আমাদের বসবাস। এখানে বাস্তবতাগুলো জেনে, বুঝেও এই নোংরা আর ধ্বংসের স্রোতের বিপরীতে যারা জীবনধারণ করতে চান, তারা স্বপ্নবাজ মানুষ। তারা অন্তরে আলো জ্বেলে সেই আলো ছড়িয়ে দিতে চান। তারা সচ্চরিত্র হতে চান, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা মানুষ নন। ইসলামের সবখানেই বিয়েকে সর্বাগ্রে রাখা হয়েছে। যেই ছেলেরা দ্বীনেকে আঁকড়ে ধরতে চায়, চরিত্র রক্ষা করতে চায়, চোখকে সংযত রেখে পথ চলে, জীবনকে সাজায় — সে কি তা বছরের পর বছর ধরে করবে? এখানে পরিবারগুলোর চিন্তা করা প্রয়োজন আন্তরিকভাবে। জীবনকে যাপন মানে নিজেরা পরীক্ষাকে জটিল করে ফেলা নয়, যেখানে সহজ সমাধান শেখায় সুন্নাহ, আমাদের সেরা মানুষদের রেখে যাওয়া জীবনাদর্শ।

আমাদের আগের প্রজন্মের বাবারা খুব অল্পই ৩০ পেরিয়েছিলেন, মায়ের অল্পই ২৫ পেরিয়েছিলেন। সেই অভিভাবকদের অনেকেই অনেক কিছুর দোহাই দিয়ে সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত চান বিধায় বিয়েকে পিছিয়ে পিছিয়ে তিরিশের ওপারে নিয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে তাদের নিয়াত সুন্দর, কিন্তু বোধের সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু এই সন্তানরা কেমন সময় অতিক্রান্ত করছে? সন্তানদের নিয়েও কি তারা এই শহরের প্রায় নগ্ন নারীদের বিলবোর্ড, টেলিভিশন কমার্শিয়াল দেখছেন না? বিষয়টা চিন্তা করার। খুব বড় বিষয়, অবশ্যই ভাবতে হবে বিপদ থেকে বাঁচতে।

আমার এক ছোট ভাই, ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। সুন্দর চরিত্রের এই ছেলেটি নানান রকম ফিতনাহর যন্ত্রণায় জর্জরিত। সামনে কমপক্ষে চার বছরের নীলনদ সাঁতরাতে হবে, এরপর রয়েছে চাকরির বাজারের যুদ্ধ। বাসায় নির্লিপ্ত তো বটেই। শুধু ক্রমাগত রোজা রাখা আর বাসায় আন্তরিকভাবে জানানো ছাড়া সমাধান দিতে পারলাম না। আরো ৬-৭ বছর আগে শারীরিকভাবে যোগ্য হওয়া ছেলেটার হালাল সমাধান যে সুদূরপরাহত সে তো আমি ২৮-২৯

চলতে থাকা মানুষদের দিকে তাকিয়েই জানি! অথচ ইসলাম বলেছে এই সীমানা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই হবে। সে তো অনেক আগেই। যে নিজের মনটাকে পবিত্র রাখতে চাইছে, তার জীবনসঙ্গী/সঙ্গিনী এলে টের পেত এই পবিত্রতা কত সুন্দর আর দারুণ। তারা দু'জনে দু'জনের দুর্গের মতন হয়। পবিত্র জীবনসঙ্গিনী একজন মু'মিনের জন্য দুর্গস্বরূপ, তাকে অশ্লীলতা, অন্যায় থেকে রক্ষা করবে। একজন মুসলিমাহ তার জীবনসঙ্গীকেও অমন করেই পাবেন। তাদের জীবনের কঠিন সময়ে পরস্পরকে সঙ্গী করে পেয়ে তাদের বন্ধন যে আরো সুদৃঢ় হবেই ইনশা আল্লাহ, তা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না। কত সুন্দরই না সমাধান। আর্থিক সমস্যা কখনই অত বেশি মুখ্য নয়, আর সেই সমস্যা কেউ এড়াতেও পারবে না। দু'জনে মিলে সেই জীবনের পথে এগিয়ে গেলেই বরং কল্যাণকর...

পুর্বেকার প্রজন্মের সাথে আমাদের বড় ক্ষতি বিয়ের বয়স পিছিয়ে যাওয়া। এখন তো যারা প্রেম করছে, তারা বিয়ে করবে বলে তা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, তারাও বিয়ের আগে বছরের পর বছর এই হারাম সম্পর্ক এগিয়ে চলেছে। প্রতিদিনই তারা যিনার পাপে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। শেখাবে কে তাদের? আল্লাহর নির্দেশ তো এমন নয়। এখন তো যেন ছেলেরা সবই পারে — ইতরামি, ফাইজলামি, গার্লফ্রেন্ড পালা, ফাস্টফুডে আর পার্কে নষ্টামি, রিকসাথে হুড তুলে বেহায়াপনা; শুধু বুঝি পারে না বউয়ের দায়িত্ব নেয়ার হিম্মত নিতে। এখন তো পারিবারিক পরিবেশগুলোও আলাদা। মেয়েদের পরিবার চায় অনেক টাকাওয়ালা ছেলে, এতে মেয়ের ভবিষ্যত 'নিশ্চিত' হবে। অথচ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনদারীকে সর্বাগ্রে দেখতে বলেছেন, আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছেন চরিত্র রক্ষায় বিয়ে করলে তার অভাবকে তিনি মুক্ত করবেন। অন্যদিকে ছেলেরাও দ্বীনদার মেয়ে ভুলে সুন্দরী চায়। অথচ রূপের চটক আর চমক কারই খুব বেশিদিন থাকে না। কিন্তু দু'জন ছেলে-মেয়ে পারস্পরিক চরিত্র রক্ষায় বিয়ের বন্ধনে জড়ালে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে তারা অপরূপ হয়ে একে অপরের কাছে ধরা দিবেন। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতা আর সেখানে থাকবে না।

এই পৃথিবীতে চরিত্র রক্ষার আশায় পরস্পরের 'চাদরস্বরূপ' হয়ে, অন্যের জন্য হালাল ইবাদাত হয়ে ধরে দিলে ইনশাআল্লাহ আগামী প্রজন্মও আসবে সুন্দর ও সুনিপুণ চরিত্রের।

রিযিকের মালিক তো কেবলই আল্লাহ — তিনি তো যাকে ইচ্ছা বেহিসাব দেন। চরিত্রের জন্য বিয়ে করা দম্পতির রিযিককে তিনি প্রশস্ত করে দিবেন, তা তিনি জানিয়েই দিয়েছেন। ভাইয়েরা যেন একজন দ্বীনদার মেয়েকেই খুঁজেন, টেলিভিশনের নায়িকাদের সাথে তুলনা করে স্ত্রী খুঁজতে না যান। সত্যি কথা হলো, আমরা যদি ইসলামিক উপায়ে দৃষ্টি অবনত করে চলতাম, তাহলে যাকেই জীবনসঙ্গী পেতাম — তাকেই আমাদের অপরূপা মনে হত। একজন মুসলিমাহর জীবন অনর্থক সৌন্দর্যচর্চা করে সময় নষ্টের জন্য নয়। মুসলিম ভাইও স্ত্রীকে পার্লারে গিয়ে তার সময়-অর্থ-মানসিকতাকে নষ্ট করতে দিতে চাইতে পারেন না। মুসলিম হিসেবে আমাদের কাজ অনেক বড়। আমাদের উদ্দেশ্য তো সেই নূরকে ধারণ করে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়া যেই আলো আমাদের রবের ভালোবাসায় প্রজ্বলিত। আমরা তো ক্ষুদ্র দুনিয়াবী, তুচ্ছ, অর্থহীন বিষয়ে ডুবে থাকতে পারিনা কেননা জানি এই দুনিয়ার জীবন অল্প ক'দিনের। আমাদের লক্ষ্য তো সেই রবের সন্তুষ্টি যিনি সাজিয়ে রেখেছেন অনন্তকালের জীবন –তার প্রিয় বান্দাদের জন্য।

পরিবারগুলোতে সচেতনতা প্রয়োজন। এই সময়ের নষ্ট স্রোতে তরুণ ভাই ও বোনদের দরকার নিজেদের ভেসে যেতে না দেয়া, বরং এই স্রোতকে উলটে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়া। আমরা তো জানি আমাদের লক্ষ্য কী! আমরা তো অযথা ভেসে যেতে পৃথিবীতে আসিনি। আমরা সেই আল্লাহর দাসত্ব করি, যিনি সৃষ্টি করেছেন জগতের প্রতিটি বস্তু, বানিয়েছেন আমাদের, তার রাহমাতের বর্ষণে আবিষ্ট রেখেছেন আমাদেরকে। আমরা অসহায় আর দুনিয়ার তুচ্ছতায় ডুবে থাকা মানুষদের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেব — এমনটাই হবে আমাদের স্বপ্ন, হৃদয়ের চাওয়া। আমাদের সামনে আদর্শ তো সেই মানুষটি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যিনি সর্বোত্তম আদর্শ; যিনি এই সৃষ্টিজগতের প্রতি রাহমাতস্বরূপ ছিলেন। তার পথ অনুকরণ করে আমরা হবো সমাজের, পরিবারের জন্য রাহমাত। এই ভ্রষ্ট-নষ্ট প্রবাহ নিয়ে ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের জন্য এই সমাজটাই ঠিক করে রেখেছিলেন, এটাই আমাদের পরীক্ষা, এটাকে বদলাতে হবে, অন্যায়কে সরিয়ে ন্যায়কে, অশ্লীলতার জায়গায় লজ্জাকে, অসুন্দরকে সরিয়ে সুন্দরকে স্থাপন করতে হবে। আমাদের সবর করতে হবে, লেগে থাকতে হবে কাজে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটা সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক-সাংস্কৃতিক শিক্ষার পরিমন্ডল তৈরি করতে হবে। প্রতিটি ভালো কাজের বিনিময় আমরা সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে পেতে থাকবো ইনশাআল্লাহ কবরের অন্ধকারে আলো হিসেবে। সময়টা সচেতনতার, দু'আ করার, আন্তরিকভাবে কাজ করে যাওয়ার। এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মূর্খতা জায়গা করে নিয়েছে। নিজেদেরকে দিয়েই তার পরিবর্তনে কাজ করতে হবে। আল্লাহর জন্য যে প্রাণ কাজ করে, সেইই তো সফল। আমরা এই সমাজে 'গুরাবা', আগন্তুক; আমরা ব্যতিক্রম, ভিন্ন, আমাদের প্রিয় মানুষটি আমাদের কথাই তো বলে গিয়েছিলেন। আমাদের মতন অপর গুরাবাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিন — সাহায্যের, সহমর্মিতার, ভালোবাসার। সাহায্য করুন দুনিয়া নামের বিভ্রমের জায়গায় ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে আর স্বপ্ন জাগিয়ে রেখে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের শক্তি দিন, সবর করার, যোগ্যতা দিন যেন দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নিজ জীবনে, পরিবারে আর আমাদের সমাজে। নিশ্চয়ই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশি করা, তার ইবাদাত করা এবং লক্ষ্য আমাদের জান্নাতের বাগান, যা কেবল শান্তিই শান্তি, যে পরম আনন্দের উদ্যান কেবল মুত্তাকীদের জন্যই। আল্লাহ আমাদের সেখানে যাবার যোগ্য করে দিন।

অশ্লীলতা

22 October 2014

লেখকঃ মো. এনামুল হক

একজন সাধারণ মুসলিমের প্রতিবাদ-

বাংলাভাষায় "চর দখল করা" বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এছাড়াও আমরা দেখি নদীর পাড় দখল, রেল লাইনের দু'পাশের জমি দখল, রাস্তার পাশের "সি এন্ড বি"র [আসলে সড়ক ও জনপথের] জায়গা দখলের খবরাখবর বা কিস্সা-কাহিনী প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ওঠে। রাজনৈতিক পেশী-শক্তির বলে গুন্ডাবাহিনী নিয়ে বুক ফুলিয়ে গিয়ে কোন স্থান বা বাড়ী দখলের ঘটনার খবর প্রায়ই ফলাও করে খবরের কাগজে ওঠে। এছাড়া প্রভাবশালীরা বন-জঙ্গল বা খাস জমি কিভাবে দখল করে থাকেন – বিগত সেনা সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিনড়ব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা তা জানতে পেরেছি। তবে সাধারণ মানুষের সাধারণ দখলগুলো খুব সন্তর্পণে এবং "ট্রায়াল এন্ড এররের" মাধ্যমে ঘটে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কখনো দেখা গেলো যে, কেউ রাস্তার পাশে সরকারের জমিতে গুটি কয়েক ইঁট বিছিয়ে তার উপর চা-বানানোর কিছু সরঞ্জাম ও বিস্কুটের কৌটা নিয়ে চা বিক্রি করতে শুরু করলো। এভাবে কিছুদিন চলার পর, যখন সে আশপাশের মানুষের "চোখ-সওয়া" হয়ে গেল, তখন হয়তো সে ঐ একই স্থানে একটা ছাপড়া ঘর তুলে দিয়ে একটা "অস্থায়ী-দেখতে" চায়ের স্টল চালু করে দিল। আবার বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর, যদি সে একটা পাকা ঘর তুলে বেশ জমজমাট "হোটেল ব্যবসা" চালু করে দেয়, তবু হয়তো মানুষের চোখে আর লাগে না – তারা ভুলেই যায় যে, তার পুরা স্থাপনাটাই অবৈধ। এভাবেই আমাদের দেশের গ্রাম অঞ্চলে জমির সীমানা নির্ধারক "আইল" সন্তর্পণে এবং ধীরে ধীরে স্থানান্তর করে, অন্যের জমি আত্মসাৎ করা হয় – চলিত ভাষায় যেটাকে "আইল ঠেলা" বলা হয়। ভূ-জ্যামিতিক ক্ষেত্র ছাড়াও কিছু অদৃশ্য ক্ষেত্রেও, খুব ধীর গতিতে ও সন্তর্পণে এমন দখলদারি চলে। তার একটি হচ্ছে নৈতিকতার জগত।

আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে, অনৈতিক কাজগুলো কোন সমাজে হঠাৎ একদিনে শুরু হয়ে যায় না। ফিলিপিন্সের দক্ষিণাঞ্চলের মুসলিম প্রধান মিন্দানাও প্রদেশে, একটু প্র্যাক্টিসিং মুসলিম যারা, তাদের লোকালয়ে [বিশেষত গ্রামাঞ্চলে] তারা কোন খৃষ্টানকে এসে বসতি স্থাপন করতে দিতে চান না। কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যে, "তাদের মুসলিম লোকালয়ে এসে বসবাস করতে দিলে, তারা প্রথমেই একটা

গ্রোসারী খুলবে, যেখানে কোমল পানীয়ের পাশাপাশি বিয়ার পাওয়া যাবে। তারপর ব্যাপারটা সয়ে গেলে সেখানে একটা পানশালা বা নাইটক্লাব বা ডিসকোথেক টাইপের ব্যাবস্থা গড়ে উঠবে – যা কিনা অচিরেই একটা আধা-পেশাদার পতিতালয়ে পরিণত হবে। এভাবে তারা তাদের (মুসলিমদের) ছেলেমেয়েদের একেবারে গোল্লায় যাবার ব্যবস্থা করবে।"

আমি একথাগুলো এটা বোঝাতে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে, নৈতিকতার জগতেও এরকম "আইল ঠেলাঠেলি" ধরনের একটা ব্যাপার চলে। আমাদের দেশেও "পাবলিক কতটুকু খায়" অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সহ্য ক্ষমতা বা threshold value কতটুকু তা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলছে। বোলিং, জিম, পুল বা বিলিয়ার্ড ইত্যাদি নানা নামের আড়ালে যে তরুণ-তরুনীদের অবাধ মেলামেশো এবং পার্টিং-এর ব্যবস্থা চালুর মহড়া চলছে তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি চলছে "এনার্জি ড্রিংক"-এর নামে বিয়ার-সদৃশ পানীয় গিলিয়ে মানুষকে বিয়ারের স্বাদে অভ্যস্ত ও আসক্ত করে তোলার মহড়া। আপনারা হয়তো জানেন যে, এসব "এনার্জি ড্রিংক"-এর অনেকগুলোর ব্র্যান্ড-নামে বাইরে বিয়ার বাজারজাত করা হয়। এভাবেই ৮৭% মুসলিম অধ্যুষিত দেশের নৈতিকতার জগত দখল করে নিচ্ছে অনৈতিকতার পৃষ্ঠপোষক বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ও তাদের দেশী দালালরা – বদলে যাচ্ছে দেশের পরিবার ও সমাজের চেহারা সন্তর্পণে – একটু একটু করে। আপনারা বলতে পারেন মানুষ প্রতিবাদ করছে না কেন? এর নানাবিধ কারণ রয়েছেঃ

১) দুর্নীতি তথা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুটপাট করে রাতারাতি "আঙ্গুল ফুলে বটগাছ" হওয়া ধনীদের ইয়াবাসেবী সন্তানদের জন্য এসব কোন সমস্যা হবার কথা নয়, বরং, প্রাচুর্য্য ও অতিরিক্ত সম্পদকে কাজে লাগানোর এক ধরনের সুযোগ।

২) সচেতনতা বা আপডেটিং-এর অভাবে, অনেক গৃহকর্তা বাবাই হয়তো জানেননা যে, তাদের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেটি/মেয়েটি হয়তো লাইব্রেরী ওয়ার্কের নাম করে কোন সাইবার ক্যাফের ঘুপচিতে গার্লফ্রেন্ড/ বয়ফ্রেন্ডের সাথে সারাদিন বসে থেকে জীবনের নিষিদ্ধ রসাস্বাদন করে বাড়ী ফিরছে। আর জিম, বোলিং বা বিলিয়ার্ডের আযোজন করা "মিলনকেন্দ্র" গুলোতে কি চলতে পারে তা হয়তো তার কাল্পনিক দুঃস্বপ্নেরও বাইরে।

৩) আরো যাদের সবচেয়ে বেশী প্রতিবাদ করার কথা, তাদের তো ঐ সব বিনোদন পল্লীতে প্রবেশাধিকারই নেই। "হুজুররা" যেহেতু "নুন এবং পান্তা" এক সাথে যোগাড় করা যায় কিনা, সেই চেষ্টায় প্রাণান্তকর জীবন যুদ্ধে লিপ্ত, সেহেতু তাদের অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবন যাপন করে থাকেন। তাদের জরাজীর্ণ জোব্বা এবং টুপিদাড়িওয়ালা চেহারা একদিকে যেমন কোন সাইবার ক্যাফে বা বিলিয়ার্ড জয়েন্টে তাদের প্রবেশাধিকার কেড়ে নেয় – তেমনি জীবনে ভাববার অবকাশের বিলাসিতাও তাদের কাছে বিরল। সুতরাং খুব বিশাল কোন "ইসলাম অবমাননার" ব্যাপার না ঘটলে, তাদের বোধোদয় হওয়া মুশকিল।

৪) বাকী রইলো আপামর জনসাধারণ। এদের অবস্থা, বিপ্লবের আগের, ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়া চীনের আফিমাসক্ত সাধারণ মানুষের মত। ভারত তথা পশ্চিমা জগতের "শরীরী-বিনোদনসামগ্রীরূপ" ভোগ্যপণ্য ভোগ করতে করতে এরা নেশায় চূর হয়ে ঝিমাচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ ও দরিদ্র দেশের একটি আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমির প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষও এখন চায়ের দোকানে বসে সকাল ১১টায় "ডিশের" সিনেমা দেখতে দেখতে চা খায়। তারা কি বুঝতে পারছে যে, আসলে তাদের চক্ষু তথা অন্ধ জ্ঞান-চক্ষুর আড়ালে সন্তর্পণে কি ঘটে চলছে? নিশ্চয়ই না! তাহলে প্রতিবাদ করবে কারা? কঠিন প্রশ্ন! হয়তো যারা সবকিছুতেই দোষ দেখে, "প্রগতির" যে কোন প্রচেষ্টাতেই যারা অশনিসংকেত দেখতে পায়, যারা আল্লাহকে একমাত্র Paradigm বা বিধানদাতা মনে করে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও যারা নৈতিকতার অর্থ বোঝে, নৈতিকতার অদৃশ্য জগতের "আইল ঠেলা" দেখলে যারা বোঝে যে গোবেচারা শ্রেণীর সরল গণসাধারণের "মস্তিষ্কের" জমিন তথা ফসল, দু'টোকেই একত্রে নষ্ট করে দেবার জন্য তাদের মস্তিষ্কে GM বীজের মত নষ্ট বীজ বপন করা হচ্ছে – এরাই হয়তো প্রতিবাদের কথা ভাবে বা ভাষা খোঁজে, এদেরই হয়তো সংস্কৃতমনারা "মৌলবাদী" বলে গালি দিতে পছন্দ করেন।

এমনই একটা ছেলে আমাকে নৈতিকতার অদৃশ্য জগতের অবৈধ জমি দখলের এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। উত্তরার ৬ নম্বর সেক্টরে, নতুন চালু হওয়া ল্যাব-এইডের সামনে, মেইন রোডর উপর "ড্রেস-লাইন বাংলাদেশ" বলে কোন কোম্পানীর একটা বিলবোর্ড সদ্য স্থাপিত হয়েছে। ছবিটা যেন, "রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করুন" ব্যানার -অথবা- রাজকীয় ইফতার মহফিলে নীতিকথা কপচানো বিগ-শটদের দিকে তাকিয়ে ভেংচিকাটা "মৃত নৈতিকতার কোন কংকাল"। বিলবোর্ডের দুপাশে দু'জন রমণীর ছবি। দুটো ছবিই একাধারে অশ্লীল, অশোভন এবং ঘৃণা উদ্রেককারী – তবে একটা অত্যন্ত আপত্তিকর। যারা নগ্ন নারীদেহকে চারুকলার আদর্শ উপজীব্য মনে করে থাকেন, আমার ধারনা তাদেরও বমি আসবে ছবিটা দেখলে। রবীন্দ্রনাথের "নহ মাতা নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী" – এই বর্ণনার আলোকে আমি ভাবতে চেষ্টা করেছি, ছবিটি দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতা ঠিক কোন শ্রেণীর রমণীকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। কেবল শরীর বিক্রি করে বা শরীরের ছবি বিক্রি করে উপার্জন করা উচ্চ শ্রেণীর প্রমোদবালা [বা courtesan] ছাড়া, আর কারো চিন্তা মাথায় আসলো না। তবে কি "ড্রেস-লাইনের" সকল আয়োজন আমাদের এই ঢাকা মহানগরীর courtesan দের জন্য?

ইয়াবা সমেত কারো বাহু সংলগ্ন অবস্থায়, যাদের ধরা পড়ার ছবি আমরা কালেভদ্রে খবরের কাগজে দেখে থাকি??

এখানেই শেষ নয়। এরই মাঝে আমার পরিবারে আরেক সদস্য বললেন যে, মানিক মিয়া এভিন্যুয়ের মোড়ে, মিরপুর রোডের উপর ঐ একই কোম্পনীর বিজ্ঞাপন দিয়ে এর চেয়েও আরো জঘন্য আর একটি বিলবোর্ড রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশ ঘোরা আমার পরিবারের ঐ সদস্য বললেন যে, জীবনে এর চেয়ে অশ্লীল কিছু তিনি কখনো দেখেন নি। অথচ, এরই নীচ দিয়ে রমযানের ভাব গম্ভীর পরিবেশ চিত্তে ধারণ করে যারা হেঁটে যান তাদের ৮৭%-এর মুসলিম হবার কথা। এরই নীচ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ইফতার করতে বাড়ী ফিরেন কত মুসলিম গৃহকর্তা। তাদের তো জানার

কথা যে, তাদের রাসূলের (সা.) মুখে জীবনে একটি অশ্লীলল বাক্য উচ্চারিত হয়নি; একটা স্থানের নামে অশ্লীল শব্দ থাকায়, তিনি ঐ স্থানের নাম মুখে উচ্চারণ করতেন না; যিনি বলে গেছেন যে, শ্লীলতা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা

এবং শ্লীলতা শুধু মাত্র ভালোরই জন্ম দেয় [অর্থাৎ এর সবটুকুই সুন্দর]:

Muslim: Book 001, Number 0055:

It is narrated on the authority of Abu Huraira that the Prophet (may peace be upon

him) said:

Iman has over seventy branches, and modesty is a branch of Iman.

Muslim: Book 001, Number 0059:

It is narrated on the authority of ‘Imran b. Husain that the Prophet (may peace and

blessings be upon him) said:

Modesty brings forth nothing but goodness……

তাহলে আমাদের কোন বিকার নেই কেন? আমরা কি তাহলে জাবর-কাটা গবাদি পশুতে পরিণত হয়েছি, যার ইঙ্গিত আল্লাহ্ কুর’আনে দিয়েছেন:

Many are the Jinns and men We have made for Hell: they have hearts wherewith they understand not, eyes wherewith they see not, and ears wherewith they hear not. They are like cattle, nay more misguided: for they are heedless (of warning).

(কুর’আন, ৭:১৭৯)

যারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। ঘটনা ঘটে যায় – রাজা আসে রাজা যায়, যারা শুধু কালের সাক্ষী হিসেবে চেয়ে থাকে, চেয়েই থাকে! আমাদের বুঝতে হবে যে বিলবোর্ডের ঐ ছবিগুলো বিচ্ছিন্ন কোন প্রচেষ্টা নয়। বরং সারা বছর ধরেই চলেছে একটু একটু করে বস্ত্রহরণের "ট্রায়াল এন্ড এরর" – বিভিন্ন কোম্পানীর বিলবোর্ডে এবং মডেলিং চিত্রে।

শরীরের শোভা বিক্রি করা যাদের পেশা, তারা দেখেছে একটু একটু করে তারা যে নৈতিকতার চর দখল করে চলেছে, কই, তাতে তো কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ আসছে না! আর এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটলো পণ্য বাজারজাত করার সবচেয়ে মোক্ষম সময়ে – রমযান মাসের "মহা-বাণিজ্যের" মৌসুমে। একজন সাধারণ মুসলিম হিসেবে আমি

এই অশ্লীললতার প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আহ্বান জানাচ্ছি আপনাকেও প্রতিবাদ জানাতে – যার যেখানে প্রতিবাদ জানানোর অবকাশ রয়েছে সেখানে।

সুন্দর ও বিশুদ্ধ বনাম অশ্লীলতা

29 October 2014

লেখকঃ সিফাত মেহযাবিন

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

বাংলা ভাবার্থঃ "বলে দিনঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও"। [৫:১০০]

English Translation: "Say, "Not equal are the evil and the good, although the abundance of evil might impress you." So fear Allah , O you of understanding, that you may be successful". [5:100]

এই আয়াতটি সপ্তম পারার, সুরা মায়িদার একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আয়াতটিতে আল্লাহ্ আজওয়াজাল তার রাসুলকে নির্দেশ করছেন, "বলুনঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়"। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহ্ নিজে বলেন নি যে অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, বরং রাসুলুল্লাহ (সা) এর মারফত কথাটা বলিয়েছেন, 'কুল' (বলুন)। মেসেজটি আল্লাহ্র কিন্তু নির্দেশটি দিচ্ছেন রাসুলুল্লাহ (সা)। কারণ নবী করীম (সা) হচ্ছেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শুধু তিনিই বলতে পারেন কোনটি পবিত্র বা অপবিত্র, কিম্বা কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি বর্জনীয়। তাই মুসলিমদের এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে তিনিই [রাসুলুল্লাহ (সা)] হচ্ছেন চূড়ান্ত মান নির্ণয়কারী। অনেক সময় এই ধরনের আলোচনাতে অনেক মুসলিমও বলে ভালো-মন্দ, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড সমাজ নির্ধারণ করবে। কোন সমাজের কথা আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি? যে সমাজে একসময় বড়দের সামনে সিগারেট খাওয়া ছিল বেয়াদবি, কিন্তু এখন বাবা-ছেলে একসাথে বসে বিয়ার খায়? একযুগ আগে যে সমাজের 'সোশ্যাল বাটারফ্লাই' রা যে পোশাক পরতে লজ্জা পেত, এখন 'আধুনিক' মেয়েরা সেই পোশাকে নিজেকে মনের মত সাজায়? এনটারটেইনমেনট এর জগতে, পাঁচ বছর আগের ১৬+ রেটিং এর সিনেমা এখন PG মুভি (parental guidance) আর PG মুভি প্লেগ্রুপের বাচ্চারা দেখে। ৭০ এর দশকেও যে মানসিক রোগের জন্য শক ট্রিটমেন্ট দেয়া হতো, আজকে সেই বিকৃত মানসিকতার সম্প্রদায় প্রকাশ্যে র‍্যালি বের করে নিজেদের 'অধিকার' চায়? যে সমাজে পরিবারের সবাই একসাথে বসে এক্স রেটের সংলাপ ও দৃশ্য সম্বলিত সিরিয়াল ও সিনেমা দেখে এবং এটাকে বলে 'পারিবারিক বিনোদন'? সে সমাজে দুইযুগ আগেও চাঁদাবাজ, ঘুষখোর, ড্রাগ এডিক্ট এর স্ট্যাটাস ছিল ক্রিমিনাল, এখন তারাই ভিকটিম বনে গিয়ে সম্মানিত জন হয়ে গেছে? যে সমাজের মূল্যবোধের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই, যে সমাজে ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা সময়ের সাথে সাথে সদা পরিবর্তনশীল, এহেন সমাজের কি মান নির্ণয় করার যোগ্যতা আছে?

রাসুলুল্লাহ (সা) গোটা মানবজাতির জন্য রহমত ও আশীর্বাদ হিসেবে দুনিয়াতে এসেছিলেন। [২১ :১০৭] তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বের সমগ্র মানুষের সংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। [৩৪:২৮] মহান আল্লাহ্ নবী করীম (সা) কে ন্যায়-অন্যায়ের নীতি নির্ধারণ করার জন্য অনুমোদন দিয়ে পাঠিয়েছেন। উনার (সা) এর আদর্শ অনুসরণ ও শিক্ষা মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ আরও বলেছেন, "ওয়ালাও আ'জাবাকা কাছরাতুল খাবীছ" [যদিও

অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে]। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, নোংরামি ও অনৈতিক জিনিস সমাজে এতো বেশী থাকবে যে আমাদের সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকবে। একসময় হয়ত এগুলোকেই স্বাভাবিক মনে হবে। এবং একসময়ে স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দিয়ে বলবে, "সবাই এই ভাবেই চলে, আমার বন্ধুবান্ধব সবাই এইভাবেই কথা বলে। তোমার সমস্যা কি? শান্ত হও, তুমি এতো অদ্ভুত কেন"? আমরা এখন ঠিক এমন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যেখানে 'অদ্ভুত' দিন দিন বিরল বা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। তাই বলা হয়েছে যে, নোংরামি এতোটাই বেড়ে যাবে যে সমাজে এটাকে স্বাভাবিকভাবে নেয়া হবে। কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ভালো-মন্দ কক্ষনই এক হতে পারে না। যদি সমাজের সবাই অনৈতিক আচরণকে সমর্থন করে এবং সেই ভাবেই চলতে থাকে খারাপটা ভালো হয়ে যাবে না। মন্দটা সবসময়ই মন্দ হিসেবেই বিবেচিত হবে। তাই "তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর" [ফাত্তাকুল্লা-হা]

কোন ধরনের মানুষ খারাপ ও ভালোর পার্থক্য করতে পারবে? "ইয়া- ঊলিল আলবাব"। সুস্থ মনের মানুষ, বিশুদ্ধ চিন্তার মানুষ, যাদের হৃদয় কলুষতামুক্ত, 'ভেড়াসুলভ' মানসিকতামুক্ত, প্রচলিত কালচার ও প্রোপাগান্ডা থেকে যারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম --- শুধু তারাই ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারবে। ভেড়ার পাল দেখেছেন? একটা ভেড়া ডেকে উঠলে বাকী সবগুলো ভেড়া একসাথে ডাকতে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে আজকের যুগে অধিকাংশ মানুষ ঠিক এই রকম আচরণ করে। তারা না ভেবেই অন্যরা যা করছে সেটা চোখ-কান বন্ধ করে অনুসরন/অনুকরন করতে থাকে। এমন অনেক মুসলিম আছেন যাদের কোন ধারনা নাই, হ্যালোইন/ইসটার/ক্রিসমাস/কার্নিভ্যাল/দেওয়ালি/ভ্যালেন্টাইন ডে/হোলি ---এর পটভূমি কি? কিন্তু তারা অতি আগ্রহভরে এইসব উদযাপন করে। আরেক শ্রেণীর মুসলিম আছে যাদের সামনে 'আর্ট ও কালচারের' মোড়কে মুড়িয়ে যা কিছুই উপস্থাপন করুন না কেন, ভক্তিভরে তাকে আলিঙ্গন করবে। আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, ফজরের ওয়াক্তে আপনি সালাত আদায় না করে রমনা বটমূলে গিয়ে গানে টান দেন কেন"? কিম্বা "মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া না করে নীরবতা পালন করলে কি লাভ" --- তারা আপনাকে কোন অর্থপূর্ণ উত্তর দিতে পারবে না। খুব বেশী হলে তারা বলবে, "সবাই করে তাই আমিও করি"।

এইরকম 'ভেড়াসুলভ' মানসিকতা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। একজন মুসলিমের অন্তর হবে নির্মল, উন্মুক্ত, এবং গভীর বিশ্লেষনে সক্ষম। "যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো" [লা'আল্লাকুম তুফলিহুন] । যারা স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে তারা মনে করে যে এইসব করলেই তারা সফল হবে। এবং যারা তাদেরকে দেখে, তারাও মনে করে এইসব না করলে তারা সমাজের বাইরে চলে যাবে, জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসবে। কিন্তু, এখানে আল্লাহ্‌ বলছেন, সবাই যদি খারাপ কাজ করে তাহলেই খারাপটা ভালো হয়ে যাবে না। এবং এই রাস্তায় সাফল্য আসবে না। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তাহলে আল্লাহ্‌ ও রাসুলের নির্দেশিত পথে চল, তবেই আসল সাফল্য অর্জিত হবে। এ আয়াতটিতে মূল্যবোধের এমন একটি মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে, যা স্থুলদর্শী মানুষের মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্থুলদর্শীর দৃষ্টিতে একশ টাকার তুলনায় একহাজার টাকার দাম অবশ্যি অনেক বেশী। কারণ একদিকে একশ টাকা এবং আরেকদিকে একহাজার টাকা। কিন্তু এ আয়াতটি বলছে, যদি আল্লাহর নাফরমানী করে একহাজার টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা নাপাক ও অপবিত্র। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম পালনের আওতায় যদি একশ টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা পাক ও পবিত্র। আর অপবিত্রের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন তা কোন দিন পবিত্রের সমান হতে পারবে না। আবর্জনার একটি স্তুপের তুলনায় এক ফোঁটা পারফিউমের মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। কাজেই একজন যথার্থ বুদ্ধিমান মুসলিমের অবশ্যি হালাল জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত, আপাত দৃষ্টিতে তার পরিমাণ যতই সামান্য

হোক না কেন এবং হারামের দিকে কোন অবস্থাতেই হাত বাড়ানো উচিত নয়, বাহ্যত তা যতই বিপুল পরিমাণ ও যতই আড়ম্বরপূর্ণ হোক না কেন।

আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। এখানে "লা'আল্লাকুম তাফুজুন" বলা হয় নি বরং বলা হয়েছে "লা'আল্লাকুম তুফলিহুন"। এখানে সাফল্য বোঝাতে গিয়ে অন্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে 'ইফলা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইফলা' অর্থ হচ্ছে যখন আবাদ করে। আবাদ করার সময় জমিকে চাষের উপযোগী করতে হয়, বীজ বুনতে হয়, ঠিকমত পানি-সার দিতে হয়, সময় সময় কীটনাশক দিতে হয়, মাঝে মাঝে আগাছা তুলে ফেলতে হয়, ইত্যাদি --- সবকিছুর পর বছর ঘুরে ফসল ঘরে তোলা হয়। 'তুফলিহুন' ব্যবহার করা হয় যখন কোন সাফল্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আল্লাহ্তালা আমাদেরকে বোঝাতে চাইছেন যে, যখন চতুর্দিক নোংরাতে ভরা, তখন অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করা, সত্য পথে অবিচল থাকা, ন্যায়ের পথে চলতে পারা --- এটি একটি সময় সাপেক্ষ, পরিশ্রমের কাজ হবে। এই পথে সাফল্য লাভের জন্য অনেক বেশী উদ্যমী হতে হবে। সহজে এই সাফল্য অর্জিত হবে না। আপনাকে সৎ ও ভালো বন্ধু খুঁজে বের করতে হবে, সুস্থ বিনোদনের সন্ধান করতে হবে, ভালো বই পড়তে হবে, হালাল পথে রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে, হালাল-হারাম বেছে খেতে হবে। এই সব কঠিন পরিশ্রমের কাজগুলো থেকেই জীবনের আসল সাফল্য আসবে। দিনের শেষে আপনি সত্যিকারের সফলতার মুখ দেখবেন, আপনার এই পরিশ্রম কক্ষনই বৃথা যাবে না। কারণ, আপনি আল্লাহ্র দেয়া নির্দেশকে অন্তরে গেঁথে নিয়েছিলেন। এবং 'উলিল আলবাব'দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, পঙ্কে বসবাস করেও পঙ্কিলতা আপনার হৃদয় ও আত্মাকে কলুষিত করতে পারে নি।

[নোমান আলী খানের কুরানিক জেমস (Quranic Gems) সিরিজের সপ্তম পর্বের বাংলা ভাবার্থ। দ্রুত অনুবাদ করার কারনে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুল আশাকরি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যা কিছু কল্যাণকর তার সম্পূর্ণই আল্লাহ্র তরফ থেকে, আর যা কিছু ভুল সেটি সম্পূর্ণ আমার। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমার সেই ভুলগুলো মার্জনা করুন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। আল্লাহ্তালা আমাদের সকলকে কুরআনের আয়াতসমূহ বুঝে পড়ার তৌফিক দান করুন এবং সঠিক মর্মার্থ বুঝে সেই ভাবে জীবনকে পরিচালিত করার মত হিকমাহ, সাহস ও ধৈর্য দিক।]

(To watch the video go to: https://www.youtube.com/watch?v=tXsMMj7m9tQ)

লূত (আ) এর জাতি ও আমরাঃ কোনো সভ্য সমাজ কি এটা মেনে নিতে পারে?

19 October 2014

লেখকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কাল হো না হো মুভিটা খুব হিট খেয়েছিলো! তখন আমি বেশ ছোট, ইসলামের বুঝ তখনও পাই নি। পুরো ছবিটা দু-একবার দেখেছিলাম। ওখানে কিছু সিন আছে যেখানে শাহরুখ আর সাইফকে একসাথে দেখানো হয়, কাজের লোক বারবার ওদেরকে একত্রে দেখে আর মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যায় (বহু আগে দেখা, ভুল হতে পারে তবে এমন কিছুই দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে)! যা ইঙ্গিত করা হচ্ছিলো তা হলো - ওরা সমকামী।

সে সময় হয়তো ইঙ্গিতের চাইতে বেশি কিছু বলার বা দেখানোর সাহস পায় নি পরিচালক মশাই! কিন্তু হিট খাওয়ার পরে পরিচালদের মনের বল বেড়ে গেলো! দোস্তানা নামের আরেক মুভির কথা মনে আছে, সেটাও হিট

খাওয়া। এটা তারও বেশ কয়েক বছর পরের কথা। এবারে কিন্তু ইঙ্গিত নয়! পুরো মুভিটা বানানোই হয় সমকামিতার কাহিনী নিয়ে। ওখানে দুইমূল চরিত্র (নায়ক) ভান ধরে যে তারা সমকামী (সত্যি সত্যি নয়)। এবং এদের একজনের মা ছেলেকে সমকামী জানতে পেরে পাগলপ্রায় হয়ে গেলেও, একসময় ঠিকই ছেলে ও ছেলের "স্বামী"কে(!) বরণ করে নেয়। পুরো সিনেমা জুড়েই এইসব রংতামাশা চলতে থাকে..। বেশ ক'বছর আগে কিছু ইন্ডিয়ান রিয়েলিটি শো জাতীয় অনুষ্ঠানের কয়েক মিনিট চোখে পড়ে। সেখানে দর্শকসারি তে বসা অনেক যুবককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো তারা সমকামী কি না, আর তারাও খোলামেলা ভাবে বলে যে তারা সমকামী! এবার আর নাটক-সিনেমায় নয়, একেবারে বাস্তব চরিত্র।

মানুষের মাঝে স্বভাবজাত ভাবেই কিছু বোধ থাকে। ভালো, সঠিক আর সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ থাকে। খারাপ, নোংরা আর অপবিত্র বস্তুর প্রতি ঘৃণা থাকে। সেটাকে নষ্ট করতে চাইলে একবারে একদিনে করা সম্ভব না। একটু একটু করে করতে হয়। সমকামিতার কথা এক ধাক্কায় মানুষ গ্রহণ করতে পারবে না জেনেই হালকা হালকা ডোজ দিয়ে ভারতে সমকামিতা কে প্রচলিত করা হয়েছে। পরিচালকরা প্রথমেই কড়া ডোজ দিতে ভয় পেয়েছে। তাই আস্তে আস্তে বিষ ঢেলেছে। অন্তত টিভি শো গুলো দিয়েই বুঝা যায় যে, আগের চাইতে এ ব্যাপারটা এখন কতোটা "সহনীয়" করে তোলা হয়েছে!

যেখানে ১০ বছর আগের মুভিতে একজনকে দেখা গেলো সমকামিতার আভাস পেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে, অথচ মাত্র পাঁচ বছর পরের মুভিতে দেখানো হচ্ছে আপন মা পর্যন্ত মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে ছেলেকে সমকামী হবার লাইসেন্স প্রদান করছে!! আর সমকামিতার মত নোংরা বিষয়টায় মানুষের রিঅ্যাকশন কি হবে সেটাও বদলে দেয়া হলো একটু একটু করে.. যাতে করে মানুষের কাছে ব্যাপারটা সহজ আর হজমযোগ্য হয়ে যায়! এরপর কিছু বাস্তব লোক এনে সেগুলো টিভির পর্দায় দেখানো হলো যাতে সবাই মনে করে এমন আরো অনেকেই আছে, এটা স্বাভাবিক..। এমনি করে সাধারণ মানুষকে একটা নোংরা জিনিসের প্রতি সহনশীল করে তোলা হলো। আর এটাই ছিলো সুশীলদের লং টার্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

আচ্ছা হঠাৎ করে বলিউড মুভির কথা কেন টেনে আনলাম? তার কারণ খেয়াল করে দেখবেন যে হলিউডে যা ৫০বছর আগে এসেছে, বলিউডে তার ২০-৩০ বছর পরে সেগুলোই এক এক করে এসেছে। আর বলিউডের অন্ধ অনুকরণকারী হিসেবে ঢালিউডেও আধা-শতাব্দী পরে একসময় তারই প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সহজ কথায় পশ্চিমা আবর্জনা ভারত হয়ে বাংলাদেশে এসে আছড়ে পড়ে। সমকামিতা নিয়েও যে এটা ঘটবে এমন একটা চিন্তা আগেই মাথায় এসেছিল। ঠিক তাই ঘটেছে। সমকামিতার নোংরা বীজ সমাজে পুঁতে দেওয়ার জন্য দেশের বাজারে প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন ছাড়া হচ্ছে। এরপর কি হবে সেটা বুঝে নেওয়া কঠিন কিছু না। ফারুকীর মত বুদ্ধিবাজের দল শিল্পের নামে এগুলো নতুন প্রজন্মের মগজে গেঁথে দেবে।

প্রথমে ইঙ্গিতপূর্ণ নাটকে, তারপর রঙচঙা কোন টেলিফিল্মে হয়তো সরাসরি বলা হবে "সমকামি হওয়া আমার অধিকার, আমি কোন পাপ করি নি"। স্লো-পয়জনিং এর মতো এভাবেই সমাজের মধ্যে একটা বিকৃত রুচিকে ঠেলে ঢোকানো হবে। একটা সময় তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের যুবক-যুবতীরা সমকামিতায় "ফান" খুঁজে পাওয়া শুরু করবে। কেননা তাদেরকে বোঝানো হবে এটাই ফান। আর যারাই এতে নাক সিঁটকাবে, তারা গোঁড়া, ধর্মান্ধ, বর্বর।

স্লো-পয়জনিং এর ভয়াবহতা হলো আক্রান্ত ব্যক্তির বিষকেই ভালো লাগতে শুরু করে! ধূমপায়ীরা এজন্যই সিগারেট খারাপ জেনেও তা ছাড়তে পারে না! অবশ্য সমকামিতা এতোটাই নোংরা বিষয় যে কোন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের কাছে এটা আকর্ষণীয় হতেই পারে না! কিন্তু তবুও মিডিয়া দিয়ে ব্রেইনওয়াশড পাবলিকরা একটা পর্যায়ে এমনই অন্ধ হয় যে, তারা এটাকেই সঠিক ভাবা শুরু করবে! কারণ তাদের মনের ঘৃণাবোধকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে গেলানো হয়েছে এটাই সঠিক, একে খারাপ লাগা যাবে না, খারাপ লাগলেও মেনে নিতে হবে। তাদেরকে শেখানো হয়েছে যারা এটা সহজভাবে মেনে নেয় না, তারা সমাজে বাসের অযোগ্য। আর এভাবে সুশীলরা খারাপ কাজের লাইসেন্স প্রদান করে। আর সাধারণ মানুষ অনেকটা অজান্তেইএই লং টার্ম প্ল্যানের বলির পাঁঠায় পরিণত হয়। সুশীলদের পরিকল্পনায় ধরাশায়ী হয়ে নিজেও এরকম জঘন্য একটা বিষয়কে "ঠিক" ভাবতে শুরু করে! তাদের চোখে নোংরা অপবিত্র হারাম কাজটাকেই"হালাল" বনে যায়। আর তাই যারাই এর অস্বাভাবিকতা তুলে ধরতে যায়, তাদের দিকেই মানুষ তেড়ে আসে!

ইসলাম থেকে আজ মুসলিমরা বহু বহু দূরে। তাই হয়তো তারা জানেও না যে, একই ঘটনা আগেও ঘটেছিলো। সমকামী লোকেরা আগেও ছিল পৃথিবীতে। কুর'আনে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা সমকামী জাতির ওপর কী ভয়াবহ আযাব আপতিত করেছিলেন। এটি কেবল একটি "হারাম" কাজ নয়, বরং কাজটা আল্লাহর চোখে এতোটাই নিকৃষ্ট যে তিনি এরকারণে পুরো একটি জাতিকে নির্মূল করে দিয়েছিলেন। নবীজি লূত (আ) এর পুরো কওম (নবী লূত ও ঈমানদারেরা বাদে) ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাদের অশ্লীলতার কারণে। তাদের সমাজেই প্রথমবারের মতো এই নোংরা অভ্যাস শিকড় গেঁড়ে বসেছিলো। আর তখন আল্লাহর নবী (আ) বলে ফিরছিলেন,

"তোমরা কি এমন অশ্লীলকাজ করছো যা তোমাদেরপূর্বে সারা বিশ্বেরকেউ করেনি ? তোমরাতো কামাতুর হয়ে পুরুষদেরকাছে আসো, নারীদেরকে ছেড়ে। নিশ্চয়ইতোমরা সীমা অতিক্রমকরেছো।"

[কুর'আনঃ সূরা আ'রাফ ৮০-৮১]

খেয়াল করুন, নবী লূত (আ) সমকামিতা মেনে নেন নি। তিনি ভাবেন নি, ওরা যা খুশি করুক না! তিনি আল্লাহর আদেশ মান্য করেছিলেন। সমকামিতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের জবাব ছিল,

"বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়।"

[কুর'আনঃ সূরা আ'রাফ ৮২]

এই ছিল আল্লাহর নবী(আ) ও তাঁর পথের পথিকদের প্রতি জালেমদের আচরণ! আর এই ছিল সমকামী জাতির পরিণতি। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আজ আমাদের সমাজে এটাই ঘটতে চলেছে! আমাদের সমাজে সেই অস্বাভাবিকতা আবারো প্রসারলাভ করতে যাচ্ছে। বিকৃত রুচিকে স্বাভাবিক বানানোর অপপ্রয়াস চলছে। আল্লাহ তা'আলা এ কাহিনী তুলে ধরেছেন যেন আমরা তা থেকে শিক্ষা নেই। যেন আমরা ভুলে না যাই আমাদের কি করা উচিত। যেন আমাদের স্মরণ থাকে কোন ঠিক এবং কোনটা ভুল। মুসলিমদের জন্য হালাল ও হারামের নির্ধারক হলো আল-কুর'আন, আর রাসূল (সা) এর হাদীস। কোন সুশীল বা মানবাধিকার কর্মীর মতামত হারামকে হালাল করে দিতে পারে না। কিন্তু তবুও কিছু নামধারী মুসলিমেরা গর্দভের মত আল্লাহর হুকুম রেখে বুদ্ধিবাজদের বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত নিয়মকেই ঠিক ভাবতে চায়। লূত নবীর অনুসারী হবার বদলে, সমকামিতায় বাঁধা দেবার বদলে, তারা সেই অবাধ্য জাতির উন্মাদ লোকেদের মতো আচরণ করতে চায়! এভাবে চলতে থাকলে এ জাতির পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে আপনারাই বিচার করে দেখুন!

সমাজে আজ ইসলাম পালন করতে গেলে লোকের কাছে শুনতে হয় আমরা নাকি ব্রেইনওয়াশড। আসলেই, আমরা ব্রেইনওয়াশড। আমাদের ব্রেইনের কালিমাগুলো ইসলাম এসে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। কিন্তু এই মানুষগুলো নিজেরাই যে কিছু নোংরা মানসের অসুস্থ রুচির লোকেদের দ্বারা ক্রমাগত মগজধোলাই হচ্ছে এটা বোঝার মত বোধ ও হারিয়ে ফেলেছে! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই জঘন্য কাজ থেকে, বিকৃত মানসিকতা থেকে, এবং অসুস্থ "সুশীল" সমাজের নোংরা পরিকল্পনার শিকারে পরিণত হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দিক! আধুনিক আর শিল্পমনা সাজতে যেয়ে কোন মুসলিম নিজেকে সমকামী দাবি করবে, আর বাকিরা মাথা নেড়ে নেড়ে তাতে সায় জানাবে - এমন লাঞ্ছনার দিন যেন আমাদের দেখতে না হয়!

শয়তান হইতে সাবধান !!!

24 September 2014

লেখকঃ জুবায়ের হোসেন

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। (সূরা ফাতির-৬)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বনী ইসরাঈলের 'আবেদ বারসীসার কাহিনী আমরা কমবেশি অনেকেই জানি। এই কাহিনীর প্রধান শিক্ষা কী? অনেকে বলেন নারী-ফিতনার ভয়াবহতা, কেউ বলেন 'আবেদ হলেও শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত নয় কেউই ইত্যাদি।

এগুলো অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয়। তবে আমার কাছে এই ঘটনার সবচেয়ে শিক্ষণীয় যে দিকটি মনে হয়েছে, তা হল- শয়তানকে আন্ডারএস্টিমেট করার পরিণাম। আমাদের প্রায় সবার মধ্যেই কমবেশি এই বস্তুটা বিদ্যমান। আমরা যেন এমন একটা ধারনা নিয়ে থাকি যে শয়তান আমাদের ধোঁকা দেওয়ার সময় জানিয়ে দেবে-এটা আমার ধোঁকা। অথচ ব্যাপারটা পুরো উলটা। শয়তান এমনভাবে ধোঁকা দেবে যেন আমরা বুঝতেই না পারি যে এটা তার ফাঁদ। সে গুনাহের কাজগুলো আমাদের কাছে খুব পসিটিভ ভাবে উপস্থাপন করবে। সে আমাদের ধোঁকা দেবে এমন কাজের মাধ্যমে, যা আমাদের কাছে খুবই ভালোকাজ বলে প্রতীয়মান হবে, অথচ এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে ইসলামের ট্র্যাক থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে যাব। সত্যি বলতে কী, শয়তানের মারাত্মক ধোঁকাগুলোর বেশিরভাগ এভাবেই হয়ে থাকে। বস্তুত শয়তান তার ধোঁকা নিয়ে এমনভাবে হাজির হয় যে, আপনি তাতে পা দিতে একরকম বাধ্য হন, এক যদি না আল্লাহ্ হিফাযত করেন।

পথভ্রষ্টতার সূচনাঃ

ধরুন আপনি খুব ভালো ইসলাম পালন করা কোন ছেলে/মেয়ে। গান শোনেন না, মুভি দেখেন না। এখন শয়তান যদি আপনার কাছে এসে বলে-হলিউডের মুভি দেখ, আপনি কস্মিনকালেও এ কাজ করবেন না। সে কীভাবে ধোঁকা দেবে? সে প্রথমে আপনার কোন বন্ধুর মাধ্যমে আপনাকে প্ররোচনা দেবে ভালো কোন মুভি দেখার জন্য। বন্ধু বলবে- "চল দোস্ত ঐ ছবিটা দেখে আসি" আপনি বলবেন-"আমি মুভি দেখি না। হারামে লিপ্ত হওয়াকে আমি ভয় করি।" বন্ধু বলবে-"দোস্ত এই ছবিতে একটা খারাপ সিনও নেই। এমনকি কোন নারী চরিত্র পর্যন্ত নেই। কোন গানও নেই। কিশোরদের জন্য উদ্দীপনামূলক ছবি। চল দেখে আসি।" আপনি বলবেন- "এখন নামাজের টাইম। নামাজ পড়ব।" বন্ধু বলবে-"ওকে। মুভি তো নামাযের টাইমের পরেই।" (বস্তুত শয়তান জানে যে নামাযের টাইমে মুভি হলে আপনি দেখবেন না, তাই সে সেভাবেই উপস্থাপন করল)। যা হোক, নামাযের পর বন্ধুর জোরাজুরিতে আপনি মুভিটা দেখলেন। সত্যিই খুবই ভালো লাগল। এতই ভালো লাগল যে বাসায় এসে আপনি নেটে সার্চ দিলেন এই পরিচালকের আর কী কী শিক্ষামূলক ছবি আছে। দেখা শুরু করলেন। আস্তে আস্তে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের আর কী ছবি হচ্ছে খুঁজতে লাগলেন। দেখতেও থাকলেন।

এক বছর পর দেখা গেল আপনি হলিউডের মুভিতে আসক্ত। সেই ছবিতে অশ্লীল দৃশ্য আসলেও আপনি স্বাভাবিক বস্তু বলে ধরে নেন। এক বছর আগে কেউ আপনাকে যদি বলত আপনি এক বছর পর এমনটা করবেন, আপনি হয়তো বলতেন "আল্লাহ্ মাফ করুন। অমনটা হওয়ার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।" যে আপনি মুভি দেখাকে পাপ গণ্য করে বন্ধুকে রিফিউজ করছিলেন, সেই আপনি আজ হলিউডের মুভি দেখে সেটাকে "অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে" বলে জাস্টিফাই করেন। অথচ এর শুরুটা হয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ এক মুভি দেখার মাধ্যমে।

মুভি দেখা সংক্রান্ত যা বললাম, এগুলো কোন কল্পকাহিনী নয়। আমাদের চারপাশের অনেক ইসলাম পালন করা ছেলেমেয়েই এভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বদলে গেছে। অথচ শুরুটা ছিল হয়তো খুবই সামান্য একটি গুনাহের কাজ দ্বারা। সেই গুনাহের কাজটিকেও হয়তো তিনি 'ভালোকাজ' ভেবেই করেছিলেন।

জিম ভাই গতকাল একটা লেখায় বললেন, মুসলিমদের মধ্যে খেলাধুলার আসক্তি দূষণীয়। নিজেরা খেললেও একটা কথা থাকে, কিন্তু অন্যের খেলা ঘন্টার ঘন্টার পর দেখায় কোন কল্যাণ থাকতে পারে না।

অনেকেই বলবে, কেন? আপত্তি কেন? আমি তো খারাপ কিছু দেখছি না। চিয়ারলিডারদের আইপিএল-বিপিএলও দেখছি না। সাদা পোশাকের টেস্ট ম্যাচ বা লা-লীগাই তো দেখছি মাত্র। সমস্যা কোথায়?

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আপনি হয়তো গাল-বাজনা বা মুভি দেখার মত সরাসরি নিষিদ্ধ কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়ছেন না। কিন্তু আপাত নির্দোষ এ বিনোদনের মধ্যে শয়তানের বহু ফাঁদ জাল বিস্তার করে আছে। যেমন- প্রথমত, ঘন্টার পর ঘন্টা হওয়া খেলাগুলো আল্লাহ্‌র স্বরণ থেকে গাফেল রাখার মোক্ষম হাতিয়ার।

দ্বিতীয়ত, খেলাগুলো দেশকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং নির্দিষ্ট দলের প্রতি সমর্থন থাকায় অন্তরের মধ্যে কুফরী জাতীয়তাবাদ ব্যাপক আকার ধারণ করে। 'মুসলিম' পরিচয়ের চেয়ে জাতীয়তাবাদী পরিচয় তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। অনেক ইসলামপন্থীর মধ্যেও এটা দেখেছি। বাংলাদেশ কোন খেলায় জিতলে নিজেকে "বাংলাদেশী হিসেবে গর্বিত" বলে প্রকাশ করেন। অথচ এই আচরণ ইসলামের মূলনীতির সাথে কোনভাবেই যায় না।

তৃতীয়ত, কোন অমুসলিম খেলোয়াড়ের খেলা ভালো লাগায় ঐ মানুষের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে পারে, যা আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। নিজেকে ইসলামিস্ট বলে পরিচয় দেওয়া অনেককেই দেখেছি মেসি-রোনালদো বলতে অজ্ঞান। উপরন্তু এদের প্রতি আসক্তির কারণে এদের জাহেলিয়াতে পূর্ণ জীবনপ্রণালী দ্বারাও অনেকে প্রভাবিত হয়ে থাকেন। এভাবে শয়তানের প্ররোচনায় কখন যে অন্তরের মধ্যে ইসলামবিরোধী চেতনা লালিত হতে শুরু করবে, আপনি টেরই পাবেন না।

এভাবেই শয়তান ইসলামপন্থীদের পথচ্যুত করতে সাধারণত আপাতনির্দোষ কাজগুলোকেই ব্যবহার করে। "এটা তো গুনাহের কাজ নয়" ভেবে স্ট্রিকটনেস থেকে সামান্য ছাড় দেওয়াই হতে পারে বিরাট ক্ষতির কারণ। আল্লাহ্‌ আমাদের রক্ষা করুন।

রিয়া ও অহংকার জন্মানোঃ

কিছুদিন আগে একটা পোস্টে বলেছিলাম, আমাদের মসজিদের এক বয়স্ক মুসল্লি কিছু কথা বলছিলেন। তা এই যে, যখন একজন মানুষ ইসলাম পালন শুরু করে তখন শয়তান তাকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। প্রথমে শয়তান আমলগুলোকে অগুরুত্বপূর্ণ করে দেখায়। যেমন- "এটা তো খুবই ছোট আমল, এখন না করলেও চলবে"। এই ধোঁকাকে বুঝতে পেরে যখন মানুষ আরো দৃঢ়তার সাথে "আমি এটা এখনই করব" বলে সংকল্প করে, তখন শয়তান অন্যভাবে ধোঁকা

দেয়। বলে, "তুমি তো খুবই ভালো ছেলে/মেয়ে। আশেপাশের ছেলেমেয়েরা কত অন্যায়ে লিপ্ত, অথচ তুমি কত ভালোভাবে ইসলাম পালন করছ।"

এভাবেই শয়তান আমাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে। আমরা যারা ইসলামকে বুঝে পালনের চেষ্টা করি, তারা যেন শয়তানের এ ধোঁকায় পা দিয়ে কোনভাবেই আত্মতুষ্টিতে না ভুগি। আশেপাশের নন-প্রাক্টিসিং মুসলিমদের দেখে কোনভাবেই যেন মনের মধ্যে গরিমা না আসে। কখনোই যেন নিজেকে অন্যদের চেয়ে "উত্তম মুসলিম" না মনে করি। বরং যদি গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারি এটা একমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহ। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আরো বেশি করে তাঁর দাসত্বে মনোনিবেশ করা জরুরি, অথচ অহংকার হল কৃতজ্ঞতার বিপরীত।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ) এর মৃত্যুর পূর্বে শয়তান তাঁকে বলেছিল-"আমি একজন ফেরেশতা। আমি এই বার্তা নিয়ে এসেছি যে, তোমার ইবাদাতে খুশি হয়ে আল্লাহ্ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার জন্য ইবাদাত মাফ করে দিয়েছেন। যত সময় বাঁচবে আল্লাহ্র ইবাদাত না করলেও চলবে।" আব্দুল কাদির শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন। কেননা তিনি স্মরণ করলেন রাসূল (সা) এর কথা, যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নামায ছাড়েন নি। তখন শয়তান তাঁকে বলল-"আব্দুল কাদির, আজ তুমি তোমার জ্ঞানের কারণে আমার ধোঁকা থেকে বেঁচে গেলে।" বস্তুত এ কথাটিও শয়তানের ধোঁকা ছিল। এই কথার মাধ্যমে সে আব্দুল কাদিরের মনে নিজের জ্ঞানের কারণে অহংকার জন্মানোর চেষ্টা করেছিল। আব্দুল কাদির এবারেও বুঝতে পেরে বলেন-"আমি কখনোই আমার জ্ঞানের কারণে শয়তান থেকে রক্ষা পাইনি, আমি পেয়েছি কেবল আল্লাহ্র দয়ার কারণেই।"

আব্দুল কাদির (র) এর মত বুজুর্গ ব্যক্তিকেও শয়তান এভাবে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টারত থাকলে ভেবে দেখুন আমার-আপনার অবস্থা কী হবে !! আমরা প্রতিনিয়তই শয়তানের ধোঁকায় পড়ছি। তবু আমরা উদাসীন, যেন আমরা নিশ্চিত আছি শয়তান আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না !! আমরা আমাদের ঈমান নিয়ে তুষ্ট আছি !! নিজেদের বড় ঈমানদার ভাবছি !! যেখান -সাহাবা (রা) এর অনেকে পর্যন্ত নিজেদের মুনাফিক ভাবতেন সেখানে আমাদের মত দুর্বলতম ঈমানের লোকদের অন্যের চেয়ে নিজেকে "উত্তম মুসলিম" ভাবা কতটা বোকামি, চিন্তা করে দেখছি কী???

শিরকের সূত্রপাতের প্ররোচনাঃ

আদম (আ) এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রচারিত দ্বীনকে মানুষ যখন ভুলে যেতে শুরু করল, শয়তান প্ররোচনা দিল-"হে মানুষেরা, তোমরা অতীতের আবেদদের মূর্তি নির্মাণ কর। তাহলে তাদের মূর্তি দেখলে তোমাদের তাঁদের কথা স্মরণ হবে, তোমরাও ইবাদাত করতে উৎসাহ পারবে।" মানুষেরা তা ই করল। উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ। কিছুদিন পর শয়তান বলল-"এই মৃতদের শ্রদ্ধা জানাতে তাদের উদ্দেশ্যে খাবার, ফুল উৎসর্গ কর।" মানুষেরা তা ই করল। এভাবে একসময় দেখা গেল তারা মূর্তিপূজা আরম্ভ করেছে। অথচ শয়তান যদি প্রথমেই তাদের বলত-"তোমরা মূর্তিপূজা কর", তাহলে কেউই রাজি হত না।

কী ভয়ংকর ব্যাপার, তাই না !! আজকে আমরা দেখি মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো, বর্ষবরণ উৎসব, শহীদকে শ্রদ্ধা জানাতে কবরে ফুল, এসব যেন আমাদের মুসলিমদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। অথচ এই ব্যাপারগুলো শিরকের ভয়াবহতা ডেকে আনার মাধ্যম ব্যতীত কিছুই নয়। যা হোক, এই ব্যাপারগুলোর সাথে কীভাবে শিরক জড়িত তা আমরা চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। তাই এ বিষয়ে আর কথা বাড়াবো না।

এমনিভাবে ইসলামের সংস্কৃতি ছাড়া অন্য সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে পড়লে কতভাবে যে অন্তরে কুফর আর শিরকের বীজ বোনা হয়ে যায়, আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আমাদের করণীয়ঃ

শয়তান থেকে বাঁচার প্রধানতম উপায় হল- আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে আমাদের প্রচেষ্টার অনুপাতে। সেই প্রচেষ্টা হল দ্বীনের প্রতি সর্বোচ্চ ডিভোশন, ইসলামের ব্যাপারে কঠোর স্ট্রিকটনেস বজায় রাখা। যেহেতু শয়তান খুব ছোট কোন ব্যাপার দ্বারা তার ধোঁকার কাজ শুরু করে, কাজেই দ্বীনের ছোটখাট বিষয়ে ছাড় দেওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলামের বিধানের প্রতি পুরোপুরি আপোসহীন মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি কাজের আগে চিন্তা করতে হবে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) এ কাজ করতেন কি না। তাছাড়া তিনি করলেও আমরা যে পদ্ধতিতে করছি ঠিক সেই পদ্ধতিতেই করেছেন কি না, যাচাই করে দেখতে হবে। কেননা হালাল কাজও রাসূল (সা) এর পদ্ধতিতে না করা পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আল্লাহ্‌ আমাদের শয়তানের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখুন এবং দ্বীনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলার তাওফিক দান করুন।

আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও; তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা 'আরাফ-২০০)

অবৈধ গর্ভপাত বাড়ছে ঢাকায় !

9 August 2015 at 17:52

মৌমিতা (ছদ্মনাম)। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্রী। থাকেন ধানমন্ডি শঙ্কর এলাকার একটি বাসায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহপাঠীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথমদিকে সচেতন থাকলেও হঠাৎ তরুণীটি বুঝতে পারেন 'সর্বনাশ' হয়ে গেছে তার। তিনি মা হতে চলেছেন। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ভয়ে কিছুদিন একঘরে হয়ে থাকেন নিজেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষায় যেতেন না।

বিষয়টি তার সেই প্রেমিককে জানালে তিনিও প্রথমে ভয় পান। পরে এক বন্ধুর পরামর্শে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হয় মোহাম্মদপুরের নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে 'বিবাহিত' পরিচয় দিয়ে তিনি গর্ভপাত করান। এজন্য তাকে প্রায় ৩ হাজার টাকাও খরচ করতে হয়। গর্ভপাতের পর কয়েকদিন অসুস্থ থাকলেও বিষয়টি পরিবার বা বন্ধুদের কারো কাছে ফাঁস করেননি।

শিল্পী আক্তার (ছদ্মনাম)। বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় থাকেন। বছর কয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল তার। কয়েক মাস যেতে না যেতেই স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। এরপর আর বিয়ে করেননি। অফিসেরই এক কলিগের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর তারা একসঙ্গে ঘুরতে যান কক্সবাজারে। সেখানেই শারীরিক সম্পর্ক হয় ওই কলিগের সঙ্গে। পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি ভেবেছিলেন তার 'সেইফ পিরিয়ড' চলছে। কিন্তু পরবর্তী পিরিয়ডের সময় বুঝতে পারেন সর্বনাশ হয়ে গেছে। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে চিকিৎসক জানান, তিনি মা হতে চলেছেন। পরে আজিমপুরের সরকারি মাতৃসদনে গিয়ে এক আয়ার মাধ্যমে গর্ভপাত করান তিনি। এজন্য তাকে খরচ করতে হয় ১৫০০ টাকা। তিনিও বিষয়টি পরিবারের কারো সঙ্গে শেয়ার করেননি।

রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রতিদিনই গর্ভপাতের ঘটনা ঘটছে। বেশির ভাগই গর্ভপাত করছে অবিবাহিত মেয়েরা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে গর্ভপাতের এই হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলছে। রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন অলিগলি ও ময়লার ডাম্পিং স্টেশনে প্রায়ই অপরিণত শিশুর ভ্রূণ পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের সাত প্রথম সাত মাসে রাজধানী ঢাকায় অন্তত দুই ডজন অপরিণত নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় মামলাও দায়ের হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তিন মাস বয়সের আগেই ভ্রূণ বিনষ্ট বা গর্ভপাত করা হলে সাধারণত টের পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে ভ্রূণের আকৃতি একটি গোলকার পিণ্ডের মতো থাকে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গর্ভপাত মাতৃত্বজনিত একটি ঘটনা হলেও তা যদি অস্বাভাবিকভাবে হয় তখন এটাকে অনেকে ভিন্ন চোখে দেখে। আর এই সুযোগে বিভিন্ন ক্লিনিক রোগীকে তাদের অর্থ বানানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। একারণে দূরে অবস্থান করলেও ছেলে মেয়েদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে সম্পর্ক । স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে প্রতিটা ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে উঠছে গভীর সম্পর্ক। আর এই সম্পর্কের শেষ পরিনতিতে অবৈধ গর্ভপাতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, সারা বিশ্বে প্রতিবছর ২৬ মিলিয়ন বৈধ ও ২০ মিলিয়ন অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৯৭ ভাগ অনিরাপদ গর্ভপাত ঘটে উন্নয়নশীল দেশে। স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা গাটমেচারের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৬ লাখের বেশি গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। যার বেশির ভাগই অনিরাপদভাবে সংঘঠিত হয়। জনসংখ্যার অনুপাতে যা প্রতি হাজারে ১৮.২ জন।

বাংলাদেশ মানবধিকার নেটওয়ার্কের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর ৭৮ হাজার অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। গর্ভপাতের কারণে এর মধ্যে ৮ হাজার নারী মৃত্যুবরণ করে। অবৈধ এসব গর্ভপাতের বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটে রাজধানী ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায়। আইসিডিডিআরবি'র কয়েক বছর আগের এক গবেষণার তথ্য মতে,

বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ১৮টি অবৈধ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে থাকে। এসব নারীদের বয়স ১৫ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে। এ সবের মধ্যে ৩.৩ শতাংশ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্কের কারণে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশের পেনাল কোডে গর্ভপাত অবৈধ। একারণে চিকিৎসকরা সহজেই গর্ভপাত করাতে রাজী হন না। তবে গর্ভধারিণীর জীবন রক্ষায় গর্ভপাত বৈধ বলে উল্লেখ করা হলেও রয়েছে নানা জটিলতা। প্রকৃত গর্ভধারিণী কোনও জটিল রোগে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই কেবল বৈধভাবে গর্ভপাত ঘটানো সম্ভব।

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে গর্ভধারণ আইনের চোখে অপরাধ তো বটেই সামাজিকভাবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে গর্ভপাতের ঘটনাগুলো অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয়। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী নারীরা প্রেমিক বা বন্ধুদের কাউকে স্বামী সাজিয়ে মেটার্নিটি হাসপাতালে যায়। জানা গেছে, রাজধানী ঢাকায় বেশি অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো হয় সরকারি মাতৃসদনগুলোতে। মাতৃসদনের অভিজ্ঞ আয়ারা নিজেরাই অবৈধ গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকেন। আজিমপুরের সরকারি মাতৃসদন এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত মাতৃ ক্লিনিক ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার প্রাইভেট ক্লিনিকেও অবৈধ গর্ভপাত করানো হয়। ঢাকার বিভিন্ন সরকারি মাতৃসদনগুলোতে দেখা গেছে, প্রতিটি মাতৃসদনে প্রতিদিন গড়ে ১০-১২ টি গর্ভপাত সংক্রান্ত রোগী আসছে। পরিচয় গোপন করে অনেকে তিন মাসের বেশি বয়সের ভ্রূণও গর্ভপাত ঘটাচ্ছে।

প্রসূতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গর্ভপাতের বিষয়টি কিছুটা স্পর্শকাতর। এ সময় পরিবেশ যথেষ্ট স্বাস্থ্য সম্মত না থাকলে সেখান থেকে নানা রকম ইনফেকশন হতে পারে। তা ছাড়া একাধিকবার গর্ভপাতের ফলে ভবিষ্যতে সন্তান ধারণ করতেও জটিলতা দেখা দেয়।

সূত্রঃ মানবজমিন (৮ আগস্ট ২০১৫)

যে কোনো সময় গজব আসতে পারেঃ ধংস হয়ে যেতে পারে দেশ

21 October 2014

লেখকঃ সিরাজাম মুনিরা

তখন ক্লাস থ্রী কি ফোরে পড়ি। আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থাকি। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে কিছুদিনের মধ্যে হলগুলো সব খালি হয়ে যায়, ফলে দেখা যায় রাস্তাঘাট, দোকান-পাট সব খাঁ খাঁ করছে।

তখনো তেমনি একটা মুহূর্ত চলছিলো। কোন কারনে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। স্কুল বাস মিস করেছি, তাই রিকশা করে বাসায় ফিরছিলাম। সোহরাওয়ার্দি হলের সামনে দিয়ে আসার সময় হঠাৎ হলের দোতলার বারান্দার দিকে চোখ যেতেই আমি জমে পুরো পাথর হয়ে গেলাম। সেদিন আমার কচি মন ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু সেই চরম আপত্তিকর দৃশ্যটি আমার মাথায় যেনো খোদাই হয়ে গেলো। আজও চোখে ভাসছে। ওই বয়সে তখনো যেখানে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি, সেখানে দুজন ছেলেকে 'এইরকম' অবস্থায় দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারলামনা। মাথার মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

প্রশ্নগুলো মাথার ভেতর ছোট্ট মগজটাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে লাগলো। আমি কারো সাথে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করিনি, কাউকে বলিনি, আমি কী দেখেছি, কাউকে জিজ্ঞেস করিনি ব্যাপারটি কি আসলে...।

সেদিন ছাত্রদের হলের বারান্দায় আমি যা দেখলাম, সেটা বুঝতে না পারলেও আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলামনা। মানব প্রকৃতি হয়তো চিরকালই যে কোন বিকৃতিকে প্রচন্ডভাবে ঘৃণাই করে। অনেক বছর পর যখন মনের ভেতর সেদিন জেগে ওঠা প্রশ্নগুলোর উত্তর পেলাম, প্রচন্ড ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেলো। 'মানুষ' কি এতো নিকৃষ্ট আর অধমের পর্যায়ে নেমে যেতে পারে?

আমার ছোট বোনের এক বান্ধবীর মুখ থেকে শোনা এবং তার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। ও তখন বাংলাদেশের সেরা একটি গার্লস কলেজে পড়তো। স্কুল জীবনের পুরোন বান্ধবীদের ছেড়ে নতুন একটা পরিবেশে, নতুন মানুষদের মাঝে গিয়ে খাপ খাওয়াতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিলো। এক মেয়ের সাথে তার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়। একদিন চমকে গিয়ে দেখলো ওই মেয়ে তাকে একটি চিরকুট দিয়েছে। তাতে লেখা, 'I Love U'. সে তো ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো। পরে ভাবলো, যাকগা এইটা মনে হয় অতিরিক্ত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

কিছুদিন পর খেয়াল করলো ওই মেয়ে অযাচিত ভাবে তার সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করছে। এরপর মেয়েটি একসময় অস্বাভাবিক আচরণ করা শুরু করলো, যে সমস্ত আচরণ শুধুমাত্র একটি ছেলে একটি মেয়ের সাথে করে। এইবার ব্যাপারটি কিছুটা আঁচ করতে পারলো আমার বোনের বান্ধবীটি। দূরে চলে আসলো মেয়েটির কাছ থেকে, মেলামেশাও বন্ধ করে দিলো। ব্যাস, এরপর শুরু হলো এক মেয়ের দ্বারা আরেক মেয়ের 'ইভ টিজিং' এর স্বীকার হওয়া।

এরপর সে আর কিছু বলেনি আমাদের। এর পরের ঘটনা বেশ কিছুদিন পর শুনেছি আমার এক কাজিনের মুখ থেকে। আমার কাজিনটি ওই দুইজনের সাথে একই কলেজে পড়তো। ও যা বললো তার সারমর্ম মোটামুটি এইরকম... ওই মেয়ে দুটোকে নিয়ে সেইসময় কলেজে এক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিলো এবং ব্যাপারটি প্রিন্সিপাল পর্যন্ত গিয়েছিলো! দুজনের সেকশন আলাদা করে দেয়া হলো এবং সেই ইভ টিজার মেয়েটির কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হলো কিছুদিনের জন্যে। মেয়েটি বারবার দাবী করতে লাগলো, এইটা নাকি 'ট্রু লাভ' এবং সে যদি ওই মেয়েকে (আমার বোনের বান্ধবীকে) না পায় তাহলে নাকি সে সুইসাইড করবে!

মেয়েটির পরিবার বারবার আমার বোনের বান্ধবীকে ফোন করে বলতে লাগলো, 'প্লিজ তুমি কিছুদিনের জন্যে হলেও অন্তত তার সাথে 'ফ্রেণ্ডশীপ টাইপের' রিলেশন রাখো'! ওই মেয়েটির বড়বোন স্বীকার করলো যে তার বোন অনেক আগে থেকেই একটু 'অন্যরকম'।

ছেলেদের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই, তার আকর্ষণ শুধুমাত্র মেয়েদের প্রতি। এবং এর আগেও তাকে নিয়ে এইরকম আরো অনেক সমস্যা হয়েছে। এরপর আমার কাজিন বিষন্ন হেসে বললো, 'তোমরা অবাক হচ্ছো? আমাদের কলেজে অনেক মেয়ে আছে যারা লেসবিয়ান'।

আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, ‘অমুখ মেয়ে যে অমুখ মেয়ের গার্লফ্রেন্ড’ এই ধরনের ব্যাপারগুলো সবাই জানে। সেই গার্লফ্রেন্ডদ্বয়ও কখনো তাদের ‘রিলেশনের’ ব্যাপারটা কারো কাছে লুকানোর চেষ্টা করেনা।

বছরখানেক আগে একদিন কোন একটা অনলাইন নিউজ সাইটে হঠাৎ চোখে একটি খবর পড়লো। পোল্যান্ড অথবা নেদারল্যান্ডে (ঠিক মনে নেই) অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘দ্যা গ্রেটেস্ট গে ফেয়ার অব দ্যা ওয়ার্ল্ড’ যেখানে প্রতি বছর একত্রিত হয় পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কয়েক লাখ সমকামী পুরুষ। শিরোনামটি দেখেই চরম ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় ভরে গেলো মন। নিউজটা ওপেন করে পড়ারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ পেলামনা মনের ভেতর। মনে মনে ভাবলাম, ‘মরুকগা’! যে পাশ্চাত্য সমস্ত নীতি, নৈতিকতা, ধর্ম, স্রষ্টার অস্তিত্ব এই বিষয়গুলোর বিরুদ্ধেই অঘোষিত এবং স্বঘোষিত যুদ্ধ ঘোষনা করেছে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এইসব বিকৃত পশুত্ব অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু গতকাল যখন দেখলাম বিবিসি বাংলায় ‘সমান অধিকারের প্রত্যাশায় বাংলাদেশের সমকামী সমাজ’ নামক একটি কলামে বড় সুকৌশলে সমকামীদের পক্ষে মায়াকান্না করা হয়েছে, তখন আর ‘মরুকগা’ বলে ঘৃণাভরে এড়িয়ে যেতে পারি না। এই দেশ, এই সমাজের সাথে জড়িয়ে আছে আমার বহু স্বার্থ। এই সমাজে, এই সমাজের মানুষগুলোর মাঝেই একদিন বড় হবে আমাদের সন্তানেরা, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম।

এইটা জানার পরও চুপ করে এড়িয়ে যাওয়াটা আজকের যে সমস্ত শিশুরা এই সমাজের আপাত চাকচিক্যময়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিভৎস পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠছে তাদের প্রতি এবং আগামী দিনের অনাগত শিশুদের প্রতি চরম অন্যায়, ভয়ানক অবিচার।

সবচে’ বড় ব্যাপার হলো, আজ থেকে চার হাজার বছর পূর্বে এই বিভৎস অপরাধের দায়েই একটি সমৃদ্ধ জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলা’মীন সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ’লা কোর’আনে বারবার হুশিয়ারি উচ্চারণ করে মানুষকে অতীতের সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। সেই একই জঘন্য অপরাধ যখন আমাদের চারপাশে, আমাদের গোচরে বা অগোচরে ব্যাপক হারে সংগঠিত হতে থাকে তখন আমাদের এই সমাজ, এই সংস্কৃতি, আমাদের এই জীবনধারা এবং এই ‘আমাদের’ নিয়েও বড় বেশী আত্মপর্যালোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে এইখানে, ওইখানে বিকৃত রুচির সমকামী মানুষগুলোর ব্যাপারে টুকটাক খবর পড়তাম, এর ওর কাছে ১টি/২টি ঘটনা শুনতাম। এইসব শুনে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, আর আল্লাহর কাছে দু’আ করেছি এইসব বিকৃত রুচির মানুষগুলোর হেদায়াতের জন্যে। কিন্তু সেদিন বিবিসি বাংলায় সমকামীদের উপর সেই বিশাল কলামটি পড়ার পর কেমন যেনো লাগছিলো, পড়তে পড়তে হাত পায়ে আর মাথার ভেতর প্রচন্ড ঝিম ধরে গেলো। বাংলাদেশে যে বেশ অনেক বছর ধরে ‘বয়েজ অব বাংলাদেশ’ নামে সমকামি পুরুষদের একটি আলাদা সংগঠনও আছে এবং সেই সংগঠন অনলাইনে, অফলাইনে প্রকাশ্যে কাজও করে সেটা পড়ে আমি চূড়ান্তভাবে হতভম্ব হয়ে গেলাম। অনলাইনে তাদের কার্জক্রমগুলো ভয়ঙ্কর। বিভিন্ন ওয়েবসাইট, পেজ, গ্রুপ খুলে এরা সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। একেকটা পেজ ও গ্রুপে তাদের হাজার হাজার মেম্বার ও ফলোয়ার! এই গ্রুপগুলোতে যা হচ্ছে সেটা শুধু ভদ্র ভাষায় এইভাবেই

প্রকাশ করা যায় যে, সেখানে এই বিকৃত রুচির প্রাণীগুলো পরস্পরের সাথে কমিউনিকেট করে পার্টনার খুজে নিচ্ছে; কেউ এক রাতের জন্যে, আর কেউ লং টাইম রিলেশনশিপ গড়ার জন্যে!

পরিস্থিতি যে আসলে কত ভয়াবহ সেটা অনুধাবন করার পর নিজেকে শুধু বারবার স্মরণ করাচ্ছিলাম যে আমি এখন পৃথিবীর দ্বিতীয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশে আছি। আর এই অসুস্থ ও বিকৃত রুচির ছেলে-মেয়েগুলো সব সেই বাংলাদেশেরই, মুসলিম পরিবারেরই সন্তান। হয়ত এদের অধিকাংশেরই জন্মের পরপরই তাদের কানের কাছে আজানের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাদের কাছে কি পৌঁছেনি সডোম শহরের অধিবাসী লূত (আ) এর জাতির সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির কাহিণী? আজওতো কৃষ্ণ সাগরের নিচে সেই চার হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতিটির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

তাদের কানে কি পৌছেনি কোর'আনের সেই ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারী?

"আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম, সে তাঁর জাতিকে বলেছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের আর কেউ কখনো করেনি। তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষের কাছে যাও, তোমরা হচ্ছো বরং এক সীমালংঘনকারী জাতি। তার জাতির লোকেরা তখন এ কথা বলা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলোনা যে, সবাই মিলে তাদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, কেননা এরা হচ্ছে কতিপয় পাক-পবিত্র মানুষ! অতপর যখন আমার আযাব এলো, তখন আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া- সে আযাব কবলিত হয়ে পেছনের লোকদের মধ্যে শামিল থেকে গেলো। আমি তাদের উপর প্রচন্ড আযাবের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। হাঁ, অতঃপর তুমি ভালো করে চেয়ে দেখো, অপরাধী ব্যক্তিদের পরিণাম সেদিন কী ভয়াবহ হয়েছিলো"। (আল-আরাফঃ ৮০-৮৪)

"তাদের (লূত (আ) এর জাতি) ধ্বংস করে আমি পরবর্তী এমন সব মানুষদের জন্যে একটি নিদর্শন সেখানে রেখে এসেছি, যারা আমার কঠিন আযাবকে ভয় করে"। (আয-যারিয়াতঃ ৩৭)

পবিত্র কুর'আনুল কারীমের সুরা হূদ, আল-আরাফ, হিজর, হজ্ব, আম্বিয়া, শুআরা, নামল, আনকাবুত, সাফফাত, ফুরকান, সোয়াদ, হাক্কাহ, ক্বাফ, কামার, আয-যারিয়াতসহ অনেক সূরায় লূত (আ) এর সেই সীমালংঘণকারী জাতি, সমকামিতার জঘন্য ও বিভৎস অপরাধ, এবং সেই অপরাধে তাদের সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনি বারবার বর্ণিত হয়েছে।

কুর'আন কি পূর্বোক্ত নবীদের কাহিনী বর্ণনা করেছে মানুষকে শুধুমাত্র কিচ্ছা-কাহিনি শুনানোর জন্যে? নাহ্, কখনোই নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দ্রষ্টা আল্লাহ সুবহানা তা'লা চেয়েছেন পরবর্তী কালের মানুষেরা শিক্ষা নিক। তারা জানুক সীমালংঘনকারী করে পূর্বোক্ত জাতিগুলো কিভাবে ধংস হয়ে গিয়েছিলো। তারাও যেনো সেই একই পথে পা বাড়িয়ে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত না হয়ে যায়।

আমরা তো সেই কুর'আনেরই ধারক-বাহক মুসলিম জাতি, মুহাম্মদ (সা) এর উম্মাত। আজ আমাদের ঘরের সন্তানেরাই পা বাড়াচ্ছে নানা নোংরা ও বিভৎস অপরাধের দিকে। অথচ এগুলো সমূলে উৎপাটন করে ওহীর আলোয় আলোকিত এক সমাজ গড়ার জন্যেই এই দুনিয়াই মুসলমানদের আগমন হয়েছিলো।

বিবিসি বাংলার সেই কলামটিতে ফিরে যাই। এই কলামের লেখিকার পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের এক শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রচলিত যে সম্পর্ক তার বাইরে এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা কী একটি মানুষের বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয়, না তারা জন্মগতভাবে এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মায়?' এই প্রশ্নের উত্তরটি এসেছিলো এইভাবে করে, 'একটা বয়সের পর যখন তারা দেখে তাদের অন্য বন্ধুরা মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করছে, তখন তাদের ক্ষেত্রে হয় উল্টোটা। তারা ছেলেদের ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে। তবে এটা জন্মগত, না হরমোনাল, না মানসিক সেটা বলা কঠিন'।

মানুষের স্বভাব প্রকৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে যাদের নূন্যতম জ্ঞানও আছে তারাই সহজেই বুঝতে পারবে, এই প্রশ্ন এবং এই উত্তর—দু'টোই কত ভ্রান্ত, কতো অবান্তর। ইসলামের মতে মানুষ তার স্বভাব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহন করে। এ স্বভাব ও প্রকৃতি সরোবরের জলের মতই স্বচ্ছ ও টলটলে থাকে। অতঃপর কোনো দূষিত পদার্থ এসে সেই আয়নার মতোন স্বচ্ছ জলটিকে ঘোলা ও দূষিত করে দেয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা মানুষকে অতি উত্তম আকৃতি, স্বভাব প্রকৃতি, ও মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মানুষ নিজের কর্মের দ্বারাই নিজেকে পশুর চেয়েও নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি প্রানীর ভেতর বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একমাত্র মানুষ ব্যতীত আর কোন প্রানীই আল্লাহর বেঁধে দেওয়া এই নিয়মের বাইরে যায়নি। কেবল মানুষ প্রজাতির একটি অংশই সেই সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। তারা নিজেদের পশুর চেয়েও নিচে নামিয়ে এনেছে।

এই মূহুর্তে মনুষ্য প্রজাতির সেই অংশটি আমার উদ্বেগের বিষয় নয়, আমার উদ্বেগের মূল বিষয় হলো.... 'বাংলাদেশের মতোন একটি মুসলিম প্রধান দেশে সমকামীদের সংখ্যা দিনে দিনে চক্রবৃদ্ধি হারে এত বাড়ছে কীভাবে?' এই উত্তরটি একজন homosexual person এর মুখে শুনলেই মনে হয় ভালো হবে। ভারতের গে ও লেসবিয়ানদের বিখ্যাত ম্যাগাজিন 'PINK' কে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের তানভীর নামে একটি ছেলের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এই উত্তরটি অসাধারণভাবে খুঁজে পেয়েছি! নিচে পুরো question & answer টাই কপি পেস্ট করে দিলাম।

Question: What role does Islam play in shaping societal attitudes towards gays?

Answer: In my view Bangladesh is a secular country and middle class people in Dhaka are not much concerned about the religious leaders any more. Religious practice in Dhaka is more like a ritual that people do because the last generation also did. I don't think Islam can play a major role in shaping social attitudes rather media can play a vital role to sensitize the mass people for their attitude. Nevertheless, due to contradiction with religion and sexuality, some people do suffer from internal homophobia/guilt and tend to seek affirmation from religion.

ওয়াহ্, কি অসাধারণ উত্তর! আমাদের বঙ্গদেশীয় মুসলমানদের 'ইসলামের' অবস্থা আমরা ঠিকমতো না বুঝলেও এই সমকামী ছেলেটি কিন্তু ঠিকই বুঝে নিয়েছে। খড়ের গাদায় যখন ধিকি ধিকি করে আগুন জ্বলে সেই আগুনকে উস্কিয়ে দেওয়ার জন্যে যেমন কিছু একটি লাগে, তেমনি আবার সেই উস্কে দেওয়া আগুনটি চারপাশে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ার জন্যেও লাগে অনুকুল বাতাস। এই সমাজে মানুষের পশুত্বকে উস্কে দেওয়ার জন্যে যেমন উপায়-উপাদানের অভাব নেই, তেমনি পশুত্বের আগুনকে দ্রুতগতিতে চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়ার মতোন অনুকুল পরিবেশেরও কোন অভাব নেই। যাক, বাংলাদেশে উনাদের অগ্রগতি কেমন তা সেই সাক্ষাতকার থেকেই একটু দেখা যাক...

Question: How hopeful are you for change with respect to legal issues as well as societal acceptance? Have you seen any improvement over the last few years?

Answer: Over the last few years it has been seen that more people are aware of the issues and feel confident enough to expose themselves. Now more people are visible in the gay community compared to last 5 years. People think in a more focused way regarding rights and acceptance in the society. From Goethe-Institute we have been arranging week long LGBT festivals for the last 2 years and this festival is so far the biggest public event of the LGBT community. But so far there has been no disturbance in the event and there were positive reviews in some newspapers..

বাহ, কি অসাধারণ অগ্রগতি! তারা ২ বছর যাবৎ সপ্তাহব্যাপী ফেস্টিভল পালন করছেন, সেখানে আবার 'No Disturbance', তার উপর আবার কিছু কিছু পত্রিকায় 'Positive review' ও দেখা গেছে! তাদের acceptance যে এই মুসলিম দেশে ক্রমাগতহারে বাড়ছে এই ব্যাপারে আসলেই কোন সন্দেহ নেই!

আজ আমরা শুধু পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে দেখছি, "বাংলাদেশের সংবিধান সমকামীদের অধিকারের বিপক্ষে নয়"। অথবা নোবেল বিজয়ীকে দেখছি উগান্ডার সমকামীদের অধিকার সংরক্ষনের জন্যে Joint Statement এ সাইন করতে।

এ তো শুধু ঝড়ের পূর্বাভাস; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই যে ঘূর্ণিঝড় অপেক্ষমান এই ব্যাপারে হয়তো তেমন কোন সন্দেহ নেই... ঘূর্নিঝড় সবকিছু ছাড়খার করে নিয়ে যাক, কিন্তু আমরা বঙ্গদেশীয় মুসলিমরা যেমন অচেতন ছিলাম, ঝড়ের পূর্বাভাস দেখেও তেমন অচেতনই হয়তো পড়ে রইবো...।

আমরা যতোই অচেতন হই না কেন কেন, আযাবের ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ হুকুম দিলে তারা কিন্তু অচেতন হয়ে রইবে না এক মুহূর্তও। তারা আমাদের সকলের উপরই আযাব নাজিল করবেন; ধংস করে দিবেন এই জাতিকে। রক্ষা পাওয়া যাবে না, যদি আমরা এক্ষুনি সচেতন না হই, রুখে না দাড়াই, প্রতিহত না করি এই অশুভ শক্তিকে।

ফেসবুকে তরুণ প্রজন্মের মাঝে নির্লজ্জতার প্রসার

15 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

আধুনিক তরুণ প্রজন্মের বিশাল একটা অংশ এখন ফেসবুক ব্যবহার করে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে এই সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে সবারই ব্যাপক পদসঞ্চালন। টুইটার ও ফেসবুকের মাধ্যমে ক্ষণিকের মাঝেই জেনে যাওয়া যায় সারা পৃথিবীর অনেক খবর। আন্তর্জাতিক সাংবাদিকগণ তাদের ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে থাকেন খুবই নিয়মিভাবে। তেমনি সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানও এখানে সংযুক্ত হয়েছে সহজেই মানুষের কাছে পৌছাতে, তাদের কাছে নিজেদের সেবা ও পণ্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া, ভোক্তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেয়া এবং সেই অনুযায়ী ব্যবসার উৎপাদন বৃদ্ধি করার নজীর রয়েছে পর্যন্ত। শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং খেলোয়ার ও অন্যান্য সেলিব্রিটিরাও তাদের ভক্তদের অনেক কাছে চলে যেতে ব্যবহার করে ফেসবুক, টুইটারসহ অন্যান্য সোশাল নেটওয়ার্ক।

এই লেখাতে আমি কেবল ফেসবুকের ভুল ব্যবহারের ফলে উদ্ভুত কিছু সমস্যার ব্যাপারে কথা বলবো, তাও আবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণ তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ব্যবহারের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টা নিয়ে। **লেখাটা পড়ার সময় মাথায় রাখতে হবে, ফেসবুক ব্যবহারের সুস্থ সামাজিক নেটওয়ার্কিং-এর সমস্ত ভালো দিকগুলোকে হিসেবে রেখে কেবলমাত্র উদ্ভুত কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।**

ফেসবুক যখন শুরু ৪/৫ বছর আগে, তখন এই দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী খুব বেশি ছিলনা। মূলত আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং শহরবাসীরাই ছিলো এই ফেসবুকের ব্যবহারকারী। ধীরে ধীরে এই সাইট জনপ্রিয় হতে থাকে সারা বিশের মতন বাংলাদেশেও। হবারই কথা, এখানে সময় কাটানো যায়, পুরোনো বন্ধুদেরকে নিমিষেই কাছে পাওয়া যায়, কথা বলা যায়, ছবি শেয়ার করা যায় — এখন যুক্ত হয়েছে ভিডিও চ্যাট। আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছাকাছি পেতে এরকম ফেসবুক জনপ্রিয় হবারই কথা।

কিন্তু আমাদের দেশের যাবতীয় প্রজন্মের একটা বিস্তীর্ণ অংশ অশিক্ষিত/অল্পশিক্ষিত। তাই ফেসবুকে একাউন্ট না থাকাটা অনেকেই নিজের মান-ইজ্জতের হানিকর ভেবেও একটা একাউন্ট খুলেছেন এমন কথাও জানি।

বছরখানেক আগেও আমার এলাকার স্টুডিওতে ঝুলানো ছিল — "এখানে ফেসবুকের ছবি তোলা হয়"। বলাই বাহুল্য, এটা মূলত গার্মেন্টসে কর্মরত পুরুষ এবং মূলত নারীকর্মীদের সুবিধার্থে একটা ব্যবসায়ীক আয়োজন ছিল। একইভাবে, ওয়াইম্যাক্সের আগমনের পরে সাইবার ক্যাফেগুলো ব্যবসা আগের মতন জমজমাট করতে না পারায় তাদের দোকানেও দেখা যায় "এখানে ফেসবুক ইউজ করা যায়"।

আমি ফেসবুকের একদম প্রথম থেকেই ছিলাম, তখন আমার ইন্টারনেট কানেকশন ছিল। এই দীর্ঘ সময় একটা অভিজ্ঞতা হলো, এখন স্কুলের পিচ্চি পিচ্চি ছেলেমেয়েরাও নিয়মিত ফেসবুক ইউজ করে। আমার এক বন্ধুর ছোটবোন বছর খানেক আগে বেশি নিয়মিত ফেসবুকিং করত যার বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। এরকম আরো অজস্র উদাহরণ আছে। প্রযুক্তির কারণে শিশুরা স্কুলে যাবার আগেই এখন মোবাইলের সমস্ত ফাংশন প্রায় ঘেঁটে ফেলে — এটাও হয়ত অমনই একটা ব্যাপার।

সেদিন একজনের নামের উপরের লিঙ্কে ক্লিক করে তার প্রোফাইলে চলে গেলাম। সামনেই পেলাম তার সদ্য সব পেইজে লাইক দেয়া নামগুলো, একটা আমার পছন্দের পেইজ, তার পাশেই প্রেমপত্র নিয়ে একটা পেজ। সেখানেও ক্লিক করলাম...

আচ্ছা, এরপর?

ভয়াবহ রকমের খ্যাত, ফালতু একেকটা প্রেমের কথা, বীভৎস সব আধা-অশ্লীল, পূর্ণ অশ্লীল (সো কলড রোমান্টিক) ছবি, আর কে কে জেগে আছেন লাইক দিন, ভালো লাগলে শেয়ার করুন, লাইক দিন শেয়ার করুন টাইপের স্বাভাবিক ফেরিওয়ালাগিরি দেখলাম।

আমি আরো বেশি অবাক হলাম যখন দেখি ১০ হাজারের উপরে লাইক পেইজটাতে, তাতে প্রতিটি সুপার খ্যাত পোস্টেই একশর উপরে লাইক দেয়া। অর্থাৎ এদের প্রতিটি পোস্টই ছড়িয়ে গেছে অজস্র ছেলেমেয়ের মাঝে!

ফেসবুকে প্রবল হিট খাওয়া নিম্নমানের বানান ভুল কাব্যের উদাহরণঃ

ভালোবাসি তোমার অভিমানী চোখ

ভালোবাসি তোমার অভিমানী মুখ

ভালোবাসি তোমার মায়াবী চুল

তোমাকে দেখলে ভুলে যায় অনেক ভুল ...

তুমি আমার জিবনের সব

তুমি আমার সুখের করলব

ভাল লাগে তোমার মৃদু মৃদু হাসি

তাইতো তোমায় খুব ভালোবাসি...

[এই কবিতার সাথে অর্ধনগ্ন এক নারীর ছবি ও হাত ধরা ছেলে একটা]

মুগ্ধমাতাল পাঠকদের নিম্নমানের কমেন্টঃ

….”তোমাকে আমি এতটাই ভালোবাসি / এত সুন্দর ক্যানও? / জটিল কথা / খুব সুন্দর / জোওওস হইসে / বালো লাগচে “….

নিম্নমানের ভালোবাসার ফেরিওয়ালাদের নিয়ে কিছু ভাবনাঃ

আমার যেটা ভয় লাগে, সেইটা আমাদের এই তরুণ প্রজন্মকে নিয়েই। সারাদিন যদি এইসব ভুয়া ভালোবাসা আর প্রেমের ট্যাবলেট গিলে বসে থাকে, তবে মেয়েদের মোবাইলে প্রতিদিন অজস্র আজেবাজে ছেলের ফোন আসবেই। প্রতিটা ছেলে মেয়েদেরকে জুলিয়েট মনে করে প্রেম নিবেদন করবে। প্রেম ছাড়া পেটের ভাত হজম হবেনা। ‘বাংলাদেশী গ্ল্যামারাস মডেল’ পেইজে প্রতি ছবিতে শত-সহস্র লাইক পড়বেই। চোখের পাপ, মনের পাপের বিশাল দুয়ার উন্মোচিত।

এই দৃশ্যগুলো আমাদের পুরো দেশের একট রূপ তুলে ধরে। এই সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের ভাবতেই হবে। যদি দিনে একবেলা না খেয়েও থাকতে হয়, তবু এইসব নিয়ে ভাবতে হবে — যদি আমরা ভালো চাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের। সবাইকে বোকা-গাধা বানিয়ে ভোগবাদী সমাজের পণ্য আর ক্রেতা বানিয়ে মুনাফা লাভ করে কিছু ব্যবসায়ী — আবেগ আর কামনাকে পুঁজি করে তাদের এই ব্যবসা।

হায়!! আমি বা আমরা নাহয় বেঁচে গেলাম কোনভাবে। অথচ আমার মতন হাজার হাজার ছেলেরা এই বিভ্রমেই দিনরাত পার করে দিচ্ছে। এই তারুণ্য আর যৌবনের ডাক খুবই অসহনীয় — কীভাবে ওরা আদৌ কোন শান্তির খোঁজ পাবে? ওদের কাছে কীভাবে যাবে মুক্তির পয়গাম?

নানাবিধ ক্ষতিঃ

ফেসবুকে প্রচুর ফেক বা ভুয়া একাউন্ট আছে এখন। একটা ফিচার পড়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল প্রায় ৫০ শতাংশ তরুণ-তরুণীদের একটি আলাদা ইমেইলের সাথে আলাদা ফেক একাউন্ট থাকে। ছেলেরা মূলত তাদের ফেক একাউন্ট থেকে মেয়েদের বন্ধু হয় ভুল ছবি ঝুলিয়ে, আপলোড করে প্রথমে। তারপর প্রেম নিবেদন করে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রেম হয়। কারণ, এই প্রজন্মের প্রেমক্ষুধার্ত তরুণ আর তরুণীরা চায় সময় কাটাতে, বন্ধু পাতাতে।

ফেক একাউন্ট থেকে ধর্ষণ আর ছিনতাইয়ের ঘটনা পত্রিকাতেই পড়েছেন অনেকেই। আমার পরিষ্কার মনে পড়ে বছর খানেক আগে ফেক একাউন্ট থেকে উঠতি এক র‍্যাম্প মডেলের ধর্ষণপূর্বক হত্যার ঘটনা।

মেয়েদের পার্সোনাল অ্যালবামের ছবি এখন দুর্বল প্রাইভেসির কারণে ফ্রেন্ড লিস্টের কেউ লাইক দিলে ছবিটি ছড়িয়ে যায় সেই ফ্রেন্ডের অন্য ফ্রেন্ডদের হোমপেইজে। এরকম অনেক ছবি দিয়ে অনেক হ্যারাস করা হয় অনেক মহলে।

কিছুদিন আগে একটা ওয়েবসাইট চোখে পড়েছিল একটা ফ্লপ হয়ে যাওয়া দৈনিক পত্রিকার ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন থেকে, যেখানে ফেসবুকের মেয়েদের ছবি আপলোড করা হয়। প্রচুর ব্যক্তিগত অ্যালবামের ছবি চোখে পড়েছিল। হতাশাব্যঞ্জক এবং আশংকাজনক বটে!!

১৮+ যৌনউদ্দীপনার সূত্রপাতঃ

একদিন ভুলে ১৮+ পেইজে গিয়েছিলাম। এরকম প্রচুর অশ্লীল পেইজ রয়েছে, যারা যৌনাবেদনময় ছবি প্রচার করে তাদের নাম ফেরি করে। "এই মেয়েটাকে হট লাগলে কয়টা লাইক?" অথবা, "এরকম হট মেয়েদের ছবি পেতে ক্লিক করুন" টাইপের কথা বলে তারা ছড়িয়ে যাচ্ছে নিস্পাপ সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মের কাছে। পর্ণোগ্রাফির পিপাসাকে নিবৃত্ত করতে এরা সাহায্য করছে। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত এদের কাছ থেকেই হাতেখড়ি হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ধ্বংসযজ্ঞ। আমাদের নেই নীতিমালা, নেই পারিবারিক মোটিভেশন, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও পর্ণোগ্রাফি, অশ্লীলতা নিয়ে কোন শিক্ষা নেই। ধর্মীয় চেতনাও হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত নতুন প্রজন্মের কাছে। এক কঠিন সামাজিক ক্ষয়ের দিকে আগাচ্ছে আমাদের গোটা জাতি।

যাদের নিয়ে আমি চিন্তিত — মুসলিমবোধ সম্পন্ন তরুণসমাজের কী অবস্থা? উত্তরণে সর্বপ্রথম কী উপায়?

ফেসবুকে আমি প্রায়ই চমকে গিয়ে ধাক্কা খাই আমি। দেখা গেলো, হয়ত কারো প্রোফাইলে গেলাম, সেখানে কুরআনের আয়াত বা হাদিস লেখা ছবি ঝুলছে (যাচ্ছেতাই ফন্ট ও রঙ সেইসব ছবির) ... তার ঠিক নিচেই বলিউডের নায়িকার অর্ধনগ্ন ছবি, অথবা ছবিতে রোমান্টিক দৃশ্য একটা ছেলে বা মেয়ের, তার নিচে সস্তা ক্যাপশন এই টাইপের — "সম্পর্ক হলো বিশ্বাসের"। এই ক্যাপশনের *সত্যতা* দেখে বিমুগ্ধ হয়ে মুসলিম ভাইটি বা বোনটি তা শেয়ার করে দিলেন। সম্পর্ক নিয়ে এরকম কথা জেনে, প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে টিপিক্যাল কিছু মিষ্টি কথা পড়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে গেলেন আল্লাহর কথা, তার নির্দেশনার কথা। অথবা ওয়েডিং সিরোমোনিতে বসে থাকা কোন এক বউয়ের আকর্ষণীয় ছবি, বন্ধুদের আড্ডাতে ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে বসে থাকা ছবি (বিভিন্ন পেইজে এসব শেয়ার করা হয়), যার অধিকাংশই ভাইদের মাঝে একাকীত্বের অনুভূতি জাগায়, পাপের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, যা পদস্খলনের প্রথম ধাপ।

এইসব প্রসঙ্গে আল্লাহ আমাদের বলেছেনঃ

"...নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য..."[সূরা আনআম - ১৫১]

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে..." [আন নূর :১৯]

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে... " — [সূরা আন নূর :৩০]

"আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি।..." [সূরা ক্বাফ -১৬]

দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূণ্য টিপিক্যাল মডারেট মুসলিমের অন্তরকে ধারণ করে ছিলাম অনেক বছর। আমি জানি, যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেকে অশ্লীল দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে রক্ষা করতে নিয়াত করেছিলাম, কখনই আল্লাহর অনুভবের প্রশান্তি অর্জন করতে পারিনি একটুও। যখনই নির্লজ্জ অপছন্দনীয় কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়ি, অন্তরের শান্তি হারিয়ে যায়, আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাই। এইটা খুব খারাপ জিনিস, খুব খারাপ। আর খুব বেশি সাবধান থাকার মতন একটা বিষয়। নিজের গায়ে একটা ছুরির আঘাত আসাকে অনুমুতি দেয়াও এর চাইতে কম ক্ষতিকর বলে আমার অনুভব হয়।

চোখ হলো মনের দরজা, চোখ দিয়ে দেখি আর অন্তরে আমরা অনুভব করি, তাকে ধারণ করি। যেই চোখ দিয়ে আপনি অশ্লীল ও নোংরা জিনিস দেখছেন, আপনি কীভাবে আশা করেন সেই অন্তরে আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ধারণ করতে পারবেন। আল্লাহ হলেন মহাপবিত্র, মহাসুন্দর, মহামহিম।

একজন মুসলিম কখনই নিজেকে প্রশ্রয় দিবেনা এমন কোন দৃশ্য, মূহুর্ত, ঘটনা সামনে আসতে — যা তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে সরিয়ে দিবে, আল্লাহর নির্দেশকে ভঙ্গ করিয়ে দিবে, ফলশ্রুতিতে তা আমাদের জীবনে অপূরণীয় ক্ষতিই বয়ে আনবে। কোন পাপকেই ছোট মনে করা উচিত নয়।

ভাই আমার ...

12 October 2014

লেখকঃ জিম তানভির

আমার খুব ইচ্ছা করে, তোমাকে কিছু কথা বলি। কথাগুলো মনে হয় তোমার ভাল নাও লাগতে পারে, তবু বলি। কিছুকথা আছে বলতে যেমন সাহস লাগে, শুনতে এবং মানতে তার থেকে বেশি সাহস লাগে। কথাগুলো তেতোঁ এবং অপছন্দনীয়ও হতে পারে, কিন্তু তবু বলি, একটু শোন।

ভাই, তুমি আসলে কিসের পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছ? তোমার এই ছোট্ট জীবনটাতে তোমার সবচেয়ে আরাধ্য বিষয়টা কি ? একটু ভাল থাকতে চাও, একটু আরামে থাকতে চাও, তাই তো ? ভাল খাবে, ভাল পরবে, একটা এসি গাড়ি থাকবে, মানুষ তোমার আর তোমার সম্পদে চোখ রেখে বলবে, "*আরে এরা অনেক হাই ফাই*" – এরকম কিছু ? হ্যা তোমার যদি বয়সটা একটু কম হয়, সেক্ষেত্রে আশা করতে পার, মেয়েরা তোমাকে *cool* বলবে, তোমার একটা স্মার্ট গার্লফ্রেন্ড থাকবে, তাকে নিয়ে তুমি যাবে *KFC* তে খেতে ! তুমি 'ট্যুর' দেবে বান্দরবন, কাঁপিয়ে বেড়াবে সুন্দরবন, অথবা কক্সবাজার দাপিয়ে সেন্টমার্টিন, ফ্রেন্ডসদের নিয়ে ছবি তুলে আপলোড দেবে ফেসবুকে, আর লোকে কমেন্ট দেবে, "*awesome man*"। তোমার ভাল সিজি-ডিগ্রী থাকবে, লোকে তোমাকে সমীহ করে দেখবে, সমাজে তোমার মানুষের কাছে "*বলার মত একটা অবস্থান*" থাকবে, যে "অবস্থান" বলার প্যারামিটার সম্ভবত তোমার চাকরি, তোমার ক্যারিয়ার কিংবা তোমার হিসেব ছাড়া ব্যাংক ব্যালেন্স, তাই না ? হতে পারে তুমি এমন যে তুমি চাও যে তোমার থাকবে অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি, চায়ের দোকানে চা খেয়ে বিল না দিলে তোমাকে কেউ কিচ্ছু বলবে না, চোখ তুলে কেউ

তোমার দিকে নজর দেবে না। তোমার নাম বেঁচে, ছলনা করে, কিংবা তোমার রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ডের জোরে তুমি অনেক কাজ করিয়ে নেয়ার এবং দেয়ার ক্ষমতা রাখবে, যেন তুমি কারো মুখাপেক্ষী নও!

তুমি তোমার লাইফটাকে অনেক color করতে চাও, তাই না? "*Enjoy man, why so serious !*" টাইপের কিছু কি ? তোমার শখ গিটার বাজানো, আলো আধারীর খেলায় সবকিছু ভুলে গিয়ে গান গাইতে কি যেন একটা ব্যাপার কাজ করে, তাই না ? ফটোগ্রাফিটা তোমার প্যাশন হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে? হুম, কমপ্লিমেন্ট পেতে ভালই লাগে। *The Big Bang Theory* থেকে শুরু করে *Spartacus* এর মোড় ঘুরে *Kung Fu Panda 2- লেটেস্ট কিছু* এসেছে আর তুমি দেখ নি, এমনটা কি হয়েছে ? হয়তো না ! ফেসবুকে চ্যাট, মিউজিক, মুভি, সিরিয়াল আর বিপিএল আছে- কে রাস্তার পাশে উলটো হয়ে মরে পড়ে আছে, দূরদেশের কে স্প্লিন্টারের আঘাতে উড়ে গেছে- সেটা ভুলে যেতে একটুও কষ্ট হয় না, দরকার কি এই নোংরা বাস্তবতায় নিজের বাম হাত ঢোকাবার, কর্দমাক্ত রাস্তায় পাজামা উঁচু করেই হাটতে হয়, তাই না?

আচ্ছা, এই তোমার এই যে এতকিছু নিয়ে তোমার এই জীবন, বলতো তোমার জীবনটা কি আসলেই এসবের জন্যই ? তোমার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি এই "আরাম" করা? Enjoy করা? "যা চাই তা যদি পাই তাহলে তো জীবন সার্থক, এর থেকে বেশি ভেবে কাজ নাই" তুমি এমনটা ভাবছ কি ?

শোন, একটা রুঢ় কথা বলি, এই যে তুমি তোমার জীবনকে সাজাবার জন্য শত-সহস্র খেলনার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছ, এই যে কয়টা টাকা আর ক্যারিয়ারের পেছনে তোমার সবটা ঢেলে দিচ্ছ, এই যে সমাজ তোমাকে যেমন দেখতে চাইছে আর তুমি তা হবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছ, একে ওকে নিয়ে এই সীমাহীন ব্যস্ততার রাজ্যে তোমার অন্তহীন ছোটাছুটি – এই যে এত এত কিছু, এগুলোর প্রত্যেকটি যে একেবারেই মূল্যহীন, মরুভূমির মরীচিকাতুল্য হতে পারে, সেটা কি কখনও ভেবে দেখছ?

কথাটা frustrating হয়ে গেল ? হতে পারে, কিন্তু কথাগুলো সত্য। এই জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা কি জান ? এই জীবনের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হচ্ছে এই জীবনে বেঁচে থাকবার জন্য, এই জীবনটাকে spicy করে তোলবার জন্য এই যে আমাদের রঙ্গিন আয়োজন – এগুলোর কোন দাম নেই, যদি না আমরা বুঝতে পারি কেন আমাদের এই জীবন। কখনও কি তুমি ভেবেছ আমরা আসলে কেন বেঁচে থাকি ? আমাদের এই জীবন কি কেবল বেঁচেই থাকার জন্য, এর আর কোনই উদ্দেশ্য নেই? চারপাশে তাকিয়ে দেখ, বেশিরভাগ মানুষ বেঁচে থাকে এমনভাবে যেন বেঁচে থাকাটাই তাদের উদ্দেশ্য !

তুমি কি "*মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত*" বলে এত বড়াই করে বেড়াও, তাহলে দশ-বিশ মাইল দূরে গিয়ে ক্ষেতে চড়ে বেড়ান গরুর বাছুরটাকে খেয়াল কর, তার সাথে আমাদের পার্থক্যটা কোথায় যখন আমরা কেবল চলছি ফিরছি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমাচ্ছি আর পটল তুলছি আর সেও ঠিক তাই ? শুধু আমাদের লাইফটা একটু কমপ্লেক্স আর স্পাইসি, এই তো পার্থক্য !

দেখ তুমি যদি মনে করে থাক তোমার "*ভাল থাকা*"টাই সব, তাহলে তুমি ভুল করছ। তুমি যদি এমনটা ভেবে থাক তাহলে তোমাকে যত কিছুই এনে দিই না কেন তুমি ভাল থাকতে পারবে না, তোমার আরো পেতে ইচ্ছা করবে। এই দুনিয়াটা এমনই অদ্ভূত। বাস্তবতা হচ্ছে, যে টাকাটাকে আজ তুমি মুখে স্বীকার না করলেও সব মনে করছ, তোমাকে যদি বলি তুমি এক সপ্তাহ পর মারা যাবে সেই টাকাটাকেই তোমার খুব অর্থহীন মনে হবে। যাকে ছাড়া তোমার চলবে না বলে তুমি ভাবছ, কিংবা যাকে তুমি chase করছ, ঠিক তাকেই তোমার একসময় মনে হবে একটা লক্ষ্যহীন মনের কিছু অস্থির ভাবনা ছাড়া আর কিছুই সে ছিল না। যে ডিগ্রী কিংবা যে চাকরির জন্য আজ তোমাকে মানুষ বাহবা দেয় সে মানুষগুলো যে তোমাকে চিনতেই পারবে না, সেটা কি তুমি জান না ? *Is these stuffs really your life worth of ?*

তোমার কি মনে আছে ছোট বেলায় টিভি সিরিয়াল টিপু সুলতানের কথা ? ঐ সিরিয়ালটা চলাকালীন সময়ে একটা প্লাস্টিকের তলোয়ার খুব বিক্রি হত, হয়তো সেটা কিনেছ আর বিপুল আনন্দে ঘুরিয়েছ, "*শাঁই শাঁই*"। বছরখানেক আগে রাস্তার ফুটপাতে বিক্রি হত "*লাদেন বোমা*" ! ঐ বয়সটাতে একটা টিপু সুলতানের তলোয়ার কিংবা লাদেন বোমা যখন তুমি পেয়েছিলে, তোমার কি মনে হয় নি যে তুমি পুরো বিশ্বটা হাতে পেয়েছ ! কিন্তু আজ তোমার হাতে টিপু সুলতানের তলোয়ার কিংবা লাদেন বোমা ধরিয়ে দিলে তুমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাববে, "*এই সামান্য জিনিষটার জন্য এত কান্নাকাটি করেছিলাম!*"

বেঁচে থাকতে কি আসলে অনেক টাকার দরকার, অনেক বিত্ত-বৈভব দরকার ? নিজের ছন্নছাড়া পাগলাটে অর্থহীন ইচ্ছেগুলোকে পূরণ করা খুব দরকার, যখন এই জীবনটা খুবই ছোট ? কেমন ছোট ?

ফেরেশতাগণ এবং রুহ আল্লাহ তা'আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। [১]

দেখ ! এই ৫০০০০ হাজার বছর ধরে তোমাকে চেয়ে চেয়ে কেবল অপেক্ষাই করতে হবে, বাকিটা বাদ দিলাম, ৫০০০০ বছরের তুলনায় এই জীবনটা কত ছোট সেটা কি ভেবে দেখেছ ? ৫০-৬০ বছরের এই জীবনের তুলনায় যেন এক বিকেলের চা খাওয়া, এর বেশি তো কোনভাবেই নয় !

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও ..." [২]

এই দুনিয়ার জীবনটা এমনই। আজ যখন তোমার মনে হচ্ছে, এটা ওটা ছাড়া তোমার চলে না, সেই এটা ওটাই তোমার কাছে খুব শীঘ্রই মূল্যহীন হয়ে যাবে, মৃত্যুকে যত কাছে অনুভব করবে তোমার ইচ্ছে হবে যেন অনন্তকাল বেঁচে থাকি। মনে হবে কিসের পেছনে ছুটেছি হোক সেটা কোর আই সেভেন ল্যাপটপ বা আইপড থেকে শুরু করে সী-ভিউ ফ্ল্যাট বা এক্স করোলা, এ সব কিছুই যেন ছোট্ট শিশুর টিপু সুলতানের তলোয়াড় হাতে বাহাদুরি !

“তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছিল” [৩]

তুমি কেন ভাবছ তোমার এই আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দিলেই তুমি বেঁচে গেলে ? তুমি কি ভুলে গেছ এই জীবনটার পরে আরেকটা জীবন আছে? আরাম আয়েশের জন্য তো সে জীবনটা পড়ে আছে, এই জীবন তো আরামে কাটাবার জন্য নয় ! তুমি আজ হয়তো ভাবছ পাশের বাসার সে ছেলেটা একটা loser, কারণ তোমার মত স্মার্ট সে নয়, তোমার মত বাকপটু সে নয়, তোমার মত লোক হাসাতে তো পারে না, তোমার মত জ্ঞান গরিমা তার নেই, বরং দাড়ি আর ankle এর উপরে কাপড় টেনে সে তোমার বন্ধুদের হাসির পাত্রে পরিণত হয়, অথচ আল্লাহ loser দের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে। [৪]

আমরা যখন আল্লাহর সামনে দাড়াব, তুমি কি জান তখন আমাদের হাতে কিছুই থাকবে না। না থাকবে পয়সা, না থাকবে বাড়ি গাড়ি। একদম একা। হাতে ধোয়া ওড়ানো সিগারেট থাকবে না, থাকবে না তোমার ব্র্যান্ডের শার্ট আর জুতো, চোখে থাকবে না রেভেন এর গ্লাস কিংবা পিঠ বেয়ে ঝুলবেনা গিবসন এর গিটার, যেতে হবে তোমাকে ঐ তিন টুকরো সাদা কাপড় জড়িয়েই। ক্বিয়ামাহর দিন তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষটিও তোমাকে দেখে না দেখার ভান করে চলে যাবে। কি, বিশ্বাস হয় না ?

(সেদিন) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পনস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে,তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে,তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। [৫]

সেদিন তোমার কাছে “বলার মত” কি থাকবে সেটা জান? সেটা হচ্ছে এই দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য তুমি কি কি করেছ। যে আল্লাহ তোমাকে ফ্রি ফ্রি এত কিছু দিলেন অথচ সেগুলো তুমি তার কাছে চাও নি ! যে আল্লাহ তোমাকে দৃষ্টি দিলেন, শোনার ক্ষমতা দিলেন, দিলেন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিষ্টি মধুর পানি, হৃদয়ে দিলেন ভালবাসা নামক এক অদ্ভূত অনূভূতি, আবেগ দিলেন, চিন্তাশক্তি দিলেন, দিলেন আরো লিস্ট না করা অবিনিময়যোগ্য কত কি! সেদিন তোমার কত ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল, তোমার গাড়ির মডেল কি Bugatti veron কিংবা Lamborghini ছিল কিনা, তুমি গার্লফ্রেন্ডকে খুশি করতে কি করেছ, তুমি লোক দেখানো কি করেছ, তোমার সিজি কি 3.95 ছিল নাকি 3.98 ছিল, লোকে তোমাকে স্মার্ট বলেছে নাকি cool বলেছে, সেগুলো কোনই কাজে আসবে না ! যদি কোন কাজে না আসে তবে কেন এগুলোকে তুমি জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়েছ ? তুমি কেন নিজেকে ভুলিয়ে রাখছ, তুমি কেন মনে রাখতে চাচ্ছ না, তুমি কেন এই সত্যের

মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছ যে এই জীবনটা হল পথ, গন্তব্য নয় ? দুনিয়ার অতি স্বল্পমূল্যের কিছু স্বার্থের আশায় নিজেকে এই মহাসত্যকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে তুমি কি নিজের সাথে প্রতারণা করছ না ?

এই যে তুমি জীবনের পূজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছ ভাই আমার, তুমি কি জান না এই জীবনটা, এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, এই জীবনে করা তোমার কাজগুলো একসময় তোমার বিপক্ষে দাড়াঁতে পারে ? হাসি ঠাট্টায় ভরপুর তোমার এই ছোট্ট জীবনটা তোমাকে অনন্তকাল ধরে কাঁদাতে পারে, তুমি কি তা জান না ? তুমি কি এও ভুলে গেছ যে তুমি এই জীবনটাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু ছেড়ে দিয়ে যদি সামান্য কষ্ট কর তবে তার বিনিময়ে শতগুণে ফেরত পাওয়া পুরুষ্কার তোমাকে অনন্তকালের জন্য প্রশান্তি দেবে ?

একটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ vital যে জিনিষটি, সেটি হল আল্লাহর প্রতি ঈমান। কারণ এই ঈমান না থাকলে এই দুনিয়াতে আমরা কে কি করেছি সেটা একটা অর্থহীন আলোচনা। একসময় এই পৃথিবীটা ধংস হবে, আমাদের বাড়ি গাড়ি ভাব পার্ট সবই চলে যাবে, যা থাকবে তা হল আমাদের সেইসব কিছু যা কেবল আমরা আল্লাহর জন্য করেছি।

এই মহাসত্যটা হয়তো মেনে নিতে তোমার কষ্ট হতে পারে, কিন্তু তবু এটা সত্য। তুমি শুনতে চাও না কেন আমি জানি না, শুনলেও বুঝতে চাওনা কেন আমি জানি না, আর বুঝলেও মানতে চাওনা কেন আমি জানিনা, সত্য হচ্ছে এটাই যে আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাড়াতে হবে। গান-মুভি আর আড্ডাবাজির মেকি জগতটার কি শেষ নেই? পারবে কি তোমার হোলি খেলার রঙ শেষ বিচারের দিনটাকে মুছে দিতে ?

তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। [৬]

হ্যা প্রতারণা, আর প্রতারণা বলেই মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। তুমি যেই হয়, তুমি যেখানে থেকেই আস, তুমি যা কিছুই করে থাক না কেন, আল্লাহর পথ তোমার জন্য খোলা, যদি তুমি একটু কৃতজ্ঞ হও আল্লাহর অশেষ রাহময়ার প্রতি, যদি একটু সচেতনচিত্তে মেনে নাও নিজের সীমাবদ্ধতা আর আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে। তোমাকে শুধু একটি বার আল্লাহর দিকে তাকাতে হবে, তোমাকে শুধু অন্তর বিশ্বাস করতে থেকে হবে যে তোমার জীবন-মরণ শুধু আল্লাহরই জন্য, আর কারও জন্য নয়। তোমাকে মন থেকে চাইতে হবে, "যা কিছু কঠিন তা আমার জন্য সহজ করে দাও", তোমাকে শুধু একটিবার মন থেকে বলতে হবে, "হে আল্লাহ পথ দেখাও"। তা না হলে কি হবে? আল্লাহ বলছেন,

এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো

চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল,অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। [৭]

আল্লাহ আরো বলেছেন,

“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।“ [৮]

আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আমরা যদি honest mindset নিয়ে একটু চেষ্টা করি, তিনি আমাদের সাথেই আছেন। এমন অমূল্য এক সুযোগের অবারিত দ্বার খোলা পাবার পর যদি আমরা “damn religion” বলে মুখ ফিরিয়ে নিই তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত আমরাই হব।

আর আল্লাহ যদি আমাদের উপর খুশি না হন, তাহলে আর কিছু আসে যায় না ...

কোন কিছুতেই কোন কিছু আসে যায় না ...

** ** ** ** **

[১] সূরা মা’রিজঃ৪

[২] সূরা তাকাসুরঃ১-২

[৩] সূরা আরাফঃ৫১

[৪] সূরা কাহফঃ১০৩-১০৪

[৫] সূরা মা’রিজঃ১১-১৫

[৬] সূরা হাদীদঃ২০

[৭] সূরা ত্ব-হাঃ১২৪-১২৬

[৮] সূরা আনকাবূতঃ৬৯

ব্যাচেলর লাইফ ফ্যাক্টসঃ কাছ থেকে দেখা গুনাহের এক অন্ধকার জগত

28 July 2015

লেখকঃ সাবেত বিন মুক্তার

যখন স্কুল/কলেজে পড়তাম তখন জানতাম গাঁজা খেতে হলে অনেক খারাপ হওয়া লাগে/যারা খায় তারা অনেক খারাপ স্বভাবের হয়! কিন্তু ভার্সিটি লাইফে উঠার পর ব্যাচেলর লাইফে থাকার সুবাধে দেখলাম আশেপাশে অনেকেই এতে অভ্যস্ত! সিগারেটের প্যাকেট চিড়ে তার মধ্যে গাঁজার উপাদান দিয়ে সিগারেট খাওয়ার মতই এই হারাম জিনিস খেতে হয় তাও জানলাম। তাদের অনেকেই আবার পড়াশোনায়ও ভালো,বন্ধুবান্ধবও ভালো হিসেবে চিনে।

আবার অনেকের মাসে কম করে হলেও একবার সিসা না খেলে চলেই না! বিশেষ বিশেষ অকেশনে ড্রিঙ্কস খাওয়া তো আছেই। রেস্টুরেন্টে গিয়ে হাতে বিয়ার নিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে দেয়া তো আছেই।

[যদিও সিগারেট খাওয়া হারামের পর্যায়ে পরে তারপরও গাঁজা এর চেয়েও মারাত্মক গুনাহ কেননা এতে মানুষ নেশাগ্রস্থ হয়ে যায়।

“আর প্রত্যেক নেশার বস্তুই হারাম।”(বুখারীঃহাদিস নং ৫৬৮২, আবূ দাঊদঃ হাদিস নং ৩৬৪৩)

“যা অধিক পরিমাণে পান করলে নেশার সৃষ্টি হয় তা অল্প পরিমানে পান করাও হারাম।”[আবূ দাঊদঃহাদিস নং ৩৬৪০]

খেলায় জুয়া ধরা নতুন দেখা আরেক হারাম কাজ। বিশ্বকাপ হউক বা যেকোন ম্যাচ হউক বিশেষ করে চ্যাম্পিয়নস লিগ/স্প্যানিশ লিগ/ইংলিশ লিগের খেলাগুলোতে জুয়া ধরা এখন ডাল ভাত ব্যাপার। জুয়া ধরার ব্যাপারটা মিছামিছি নয়। সরাসরি টাকা লেনদেনের ব্যাপার চলে এখানে। **একজন মুসলিমের জন্য জুয়া ধরা সম্পূর্ণ হারাম হারাম হারাম।**

রাত জেগে তাস খেলা আর পর্ণোগ্রাফিতে মেতে উঠা তো আছেই। একজন পেনড্রাইভ ভর্তি করে হারাম জিনিস নিয়ে আসে আর বাকিরা তার কাছ থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে ওই হারাম জিনিস গ্রহণ করে। তারপরের কাহিনী নিজ দায়িত্বে বুঝে নেন।

যাদের গার্লফ্রেন্ড আছে তাদের অনেকের ব্যাপার স্যাপার পুরাই আলাদা। দিনের পর দিন ফোনে অশ্লীল কথা বলা তাদের একটি অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি হারাম সম্পর্ক শেষ তো নতুন হারাম সম্পর্কে জড়ানো। অনেকের বাসায় গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসাটা তাদের কাছে খুব স্বাভাবিক একটি কাজ। বসুন্ধরা/ নিকুঞ্জ এলাকায় ঢাকার বাইরে থেকে আসা অনেকেই ভাই-বোন পরিচয় দিয়ে লিভ টুগেদার করে অভ্যস্থ ! অনেকটা ডাল-ভাত খাওয়ার মতই এটি এখন কমন হয়ে গেছে!

(নিকেতন/বনানী/নিকুঞ্জ/বসুন্ধরা এলাকায় পরিচিত অনেক বন্ধু থাকার সুবাধে ব্যাপারগুলো আরও ভালভাবেই জানি.....)

পরিবার জানে না, সমাজ জানে না.....জানে শুধু কাছের কিছু বন্ধু যাদের সাথে শেয়ার করে এই হারামে ডুবে থাকা হয়। আর জানেন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সুবহানু তায়ালা...যার কাছে হাশরের ময়দানে এই দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের হিসাব দেয়া লাগবে। একমাত্র আখিরাত তথা পরকালকে ভুলে যাওয়ার কারণে, আল্লাহ্ সুবহানু তায়ালার কাছে জবাবদিহিতার মনোভাব না থাকার কারণে, জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় না থাকার কারণে.....

সর্বোপরি নিজের পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকার কারণে এবং সন্তানের প্রতি ছোটবেলা থেকে পরিবারের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণে এই খারাপ অভ্যাসে অনেকেই আসক্ত হয়ে পরছে।

মৃত্যু তো আজ হউক,কাল হউক আসবেই। কি নিয়ে কবরে যাবেন ভাই। বর্তমান অবস্থায় যদি মৃত্যু এসে হাজির হয় শত আফসোস করলেও তাওবা করার কোন সুযোগ দেয়া হবে না। সময় থাকতে তাওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসুন, আখিরাতের অনন্তকালের জীবনকে ভয় করুন। যে জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। শাস্তি একবার শুরু হলে চলতেই থাকবে। যে নেককার হবে সে অনন্তকালের সুখের জীবন লাভ করবে। যে আল্লাহ্র হুকুমমতো চলবে না তার শাস্তি মাফ করা/কমানোর কোন সুযোগই থাকবে না।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

“যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্নীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা দোযখেই চিরকাল বসবাস করবে। আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারন করবে। তোমাদের সামনে কি আমার

আয়াত সমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে।তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দূর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম এবং আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত জাতি।হে আমাদের পালনকর্তা! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গোনাহগার হব।আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।

(সূরা আল মু'মিনুনঃ আয়াতঃ ৯৯-১০৮)

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হিদায়াত দান করুন এবং সকলকে এই খারাবি থেকে হিফাজত করুন।আমিন।

IF CHARACTER IS LOST, EVERYTHING IS LOST...

29 September 2014

লেখক অজ্ঞাত

১)

পাশের রিকসাটা যাওয়ার সময় শব্দ শুনে তাকালাম, ছেলেটা বাম হাতে মেয়েটার পিছনে কোমর জড়িয়ে বসা। মেয়েটা সহসা আবেগে-আহলাদে উথলে উঠে সামনের চুলগুলো পাশে সরিয়ে দিলো। ওরা পিচ্চি পিচ্চি ছেলেমেয়ে, কলেজ পাশ করেনি নিশ্চিত।

রিকসা জ্যামে বসে আছি। কৌনিক দুরত্বে রিকসায় এক ছেলে দুই মেয়ে বসে। ছেলেটা উপরে বসে দু'পায়ে প্রসারিত করে মাঝখানে একটা মেয়েকে বসিয়েছে। ওদের রিকসায় বসা ও আলাপের ধরণের গোটা বিষয়টাতে নোংরামি ঠিকরে বের হচ্ছিলো। পাশের মানুষেরা তাদের দিকে তাকালেও কারো ভ্রুক্ষেপ নাই।

সহ্য করা কঠিনই। পকেট থেকে মোবাইল বের করে এটা-ওটা পড়তে লাগলাম। কী আর করা...

"ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত কুলুবানা 'আলা দ্বীনিক"

(২)

একটু ভ্যাতলা ভ্যাতলা মিষ্টি কথা, জন্মতারিখ জানা, আকাইম্মা বিষয় নিয়া আজাইরা প্যাচাল পাড়তে পারা আর ফাস্টফুডের দোকানের বিলটা দিতে পারলেই প্রেমিক হওয়া যায়। পটায়া পটায়া বহুত আকাম করা যায়। চুলগুলা না আঁচড়ালে, একটু 'ক্যাজুয়াল লুক' নিতে পারলে তো পোয়াবারো।

আধযুগ ধরে প্রেম করা পোলারে তাদের বিয়া কবে হবে তা জিজ্ঞাসা করলে কয়, 'মামা অনেক দায়িত্ব মামা। এখন আমি রেডি না, বাসাতেও রেডি না। বিয়ে করলে তো লাইফ পুরা বদলায়া যাবে।'.....

বিয়ের প্ল্যান নাই কিন্তু তারা ঠিকই বছর ধইরা রেগুলার ফেসবুকের কমেন্টে কোলন স্টার মেরে কমেন্টিং করে। এই রোমান্সে রোমাঞ্চিত বন্ধুরা তাতে লাইকায়। ঢাকায় রেস্টুরেন্টে বসে, রিকসার হুড তুলে প্রেম করে। ওয়াহ ওয়াহ!! এসব ড্যুড আর চিক্সদের কাছ থেকে নতুন নতুন ঐশী সিরিজের কাহিনী সৃষ্টির অপেক্ষা কেবল... মুক্তি কই?

(৩)

"ছেলের বয়স মাত্র ২৭। এখনই কীসের বিয়ে?" -- আহাহা! মাত্র সাতাশ বছর। ছেলে তো শিশুই। আজকাল তো ছেলেরা বড় থাকে যখন তার বয়স ১৭। ক্লাস ইলেভেন-টুয়েলভে পড়ে, তখন তারা বড় থাকে, ফুটপাতে, রিকসায়, পার্কে কলেজ ড্রেসপরা মেয়েদের সাথে শরীরের উত্তাপ ভাগাভাগি করে। যে ছেলে এইসব দেখে টেখে আরো ১০ বছর পার করে ফেলসে, সে শিশু না তো কী? সে তো বড়ই হয় নাই। হইলে কি আর এই দশা হইত? এই সমাজ অনেক অনেক শিশুতে ভরে থাকুক।

এখনকার সময়ের প্রবাদ তাই বদলে গেছে :

If money is lost, everything is lost,

If health is lost, something is lost.

IF CHARACTER IS LOST, NOTHING IS LOST.

(৪)

বোন, সেজেগুজে একটা ছেলের চোখের দৃষ্টি পাওয়া কিন্তু নিজেকে অপমান করা। একটা ছেলে চোখ দিয়ে শরীরটাকে স্ক্যান করতে থাকে, টের তো পাও, তাইনা? অসভ্য সমাজে তোমার আপন ভাইও হয়ত কারো শরীরের দিকে এভাবেই তাকায়। তাই বলে পুরুষরা খারাপ বলে গালি দেবে? ভালো ছেলেও কিন্তু অনেক।

কিছু মেয়ে যেমন শরীরটাকে অন্যের কাছে তুলে ধরে কারো কারো ফ্লার্টিং পাওয়ার আশায়, অমন ছেলেরাও ওটাকেই ভালোবাসে। তাই সেই অভ্যাসের বশেই ভালো মেয়েদেরকেও চোখের শিকার বানায়। এখন তারা যেমন নোংরা, আখিরাতেও এই নোংরাদের আল্লাহ আলাদা করেই পাকড়াও করবেন।

বোন, তুমি সংযত হও। আল্লাহকে ভয় করো। এই শরীরটাকে জাহান্নামের আগুণের কারণ করিয়ো না বোন। আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করি, আল্লাহকে স্মরণ করো, শরীরকে আবৃত রাখো। তোমার ওই কমনীয় চামড়া এখন হয়ত পুরুষের চোখ ঝলসে দিচ্ছে, একসময় আগুণ এসে তা ঝলসে দিবে এমন যেন না হয়।

(৫)

ঢাকা শহরে চলার ফাঁকে দেখবেন রিকসার হুড তুলে নোংরামি, ঝোপঝাড় পাওয়াই যায়না তবে পার্কে গাছ পেলে তার নিচে ছেলেমেয়েদের অননুমোদিত অন্তরঙ্গতার দৃশ্য, অথবা অকারণেই মেয়ে বান্ধবীর শরীর ঘুরে স্পর্শ করে যাওয়া ছেলেবন্ধুদের হাতগুলো যেখানে সেখানে-- এগুলো এই সমাজেরই দৃশ্য। এখন আপনি কান পাতলেও যেন শুনতে পাবেন ছেলেবন্ধুদের সাথে ঘুরতে বের হওয়া মেয়েদের মাঝে চাপা কান্না। ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ হওয়া বেশ সাদামাটা ঘটনা হয়ে গেছে!

এসব ঘটনা নানান কারণে ঘটে। সব নিয়ে বলতে চাওয়া, ভাবতে যাওয়া সম্ভব নয় আমার। আমার একটা উপলব্ধি হলো, অজস্র ছেলেই সাধারণত মেয়েদের প্রতি অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ করে। ছেলেদের মাঝে মেয়েদের তুলনায় পর্নগ্রাফির আসক্তি অনেক বেশি। যেসব ছেলেরা গল্প-আড্ডায় মেয়েদের 'মাল' বলে, নায়িকাদের শরীরের আলাপ করে, তাদের চোখে মেয়েরা কমনীয় এক টুকরা মাংসপিন্ড। এরা সচরাচর মেয়েদের 'বন্ধু' হতে চেয়ে তাদের সাথে সময় দেয়।

মেয়েদের মাঝে নোংরা চিন্তাটা সচরাচর কম থাকলেও, সেখানে অন্য এক ঘটনা। নিজেকে আবৃতা রাখা, একটু কনজারভেটিভ থাকাকে পুরোনো মনে করে ছেলেদের কাছে 'ফ্রি' হতে পারা, ঘুরতে বের হওয়া ও ছেলেবন্ধু রাখা অনেকেই 'স্মার্টনেস' মনে করছে -- 'নারী স্বাধীনতা' মার্কা কথা বলা ভোগবাদী প্রচারণা ও নাটক-সিনেমা-সিরিয়ালের ফলে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই কোমলমতি মেয়েদের করছে শরীরকেন্দ্রিক এবং উগ্র। সেই অল্প বন্ধুত্ব-আড্ডা দিয়ে শুরু হয়ে শরীর দিয়ে শেষ করে অনেক অনেক মেয়েই। কষ্টকর কথা হলো, এরা ভুল করে, ভুল করে ভুগে, এরাই চরমমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভুগে তাদের পরিবার। এভাবে কামুক ছেলেদের কাছে 'ইউজড' হওয়াটার পেছনে একটা ছোট্ট ভুল চিন্তাই যেন অনেকক্ষেত্রে সূচনা করে দেয়।

শারীরিক সম্পর্ককে ডালভাত করে ফেলার বিষয়টা সচরাচর অল্পতে শুরু হয়। পাপ করতে করতে একসময় নিজেকে নিজের কাছে যখন অন্যায়কারী মনে হয়, তখন ছেলেমেয়েরা সব ভুলে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, কোথা থেকে কোথায় যায় টের পায়না। অথচ আল্লাহ বান্দা ভুল বুঝে পাহাড় সমান পাপ নিয়ে তাওবা করলেও তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। ছেলেমেয়েদের উচিৎ তারা যে ভুলই করুক না কেন, তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। তিনি মাফ করলে তো পৃথিবীর মানুষদের কথা ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। যারা পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাদের উপায় করে দেন। তবে নিঃসন্দেহে দুনিয়ার চেয়ে আখিরাত উত্তম স্থান। একটু হয়ত কষ্টই হবে পুরোনো জীবন ফেলে আসতে, কিন্তু তাদের ভবিষ্যত অনেক সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা সুন্দর ও পবিত্র সম্পর্কের সমাজের প্রত্যাশায় করি সবসময়...

এই নব্য টাকাওয়ালা ছেলেটার রূপসী-যুবতী বউটা যদি জানতো ঐ ছেলেটা ভার্সিটি লাইফে মেয়েদের নিয়ে কেমন কথা বলত, ছেলেটা ক্যাম্পাসের মেয়েদেরকে কী সব 'সম্মানসূচক' 'শব্দ দিয়ে সম্বোধন করতো যা দেহজীবীদেরকে করা হয়, মোড়ের চায়ের দোকানে বসে সামনে দিয়ে মেয়েদের নিয়ে কোন রিকসা গেলে আরোহীদের শরীরের অঙ্গপরিমাপক শব্দগুলো মুখ দিয়ে বের করে চারপাশের সবাইকে ঝলসে দিতো, রাতের বেলা রতিকলার মেয়েদের চলচ্চিত্র দেখে দিনের বেলা আলাপ করত বন্ধুদের সামনে...

তখনো ছেলেটাকে 'তত্ত্বকথা' শুনিয়েছিলো কিছু মানুষ, কিন্তু তার কাছে সেসব কথার দাম ছিলো না। পরেও কখনো ভালো করে জানা যায়নি রিকসায় চড়ে যাওয়া মেয়েদেরকে তাদের শরীর নিয়ে 'প্রশংসা বাণী' শোনানোর কারণে কখনো ক্ষমা চেয়েছিলো কিনা। বরং, চাকুরিতে এসে মেয়ে কলিগদের পাশে তার দন্ত-বিকশিত হাসিমাখা ছবি অনলাইনে দেখা যেত। গল্পের আড্ডায় কোন মেয়ে 'সেইরকম মাল' সেই বিষয়টা সবাইকে জানিয়ে দিতো।

কয়েক বছর পেরিয়ে গেলো। এখন, নতুন যুবতী বউয়ের স্বামী ছেলেটি এখন মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে। টাকার প্রবাহ বেশ ভালোই। তারা দু'জনে মিলে দাঁত কেলিয়ে ছবি তুলে, এখানে ওখানে ঘুরে নতুন অ্যালবাম করে ছবি ফেবুতে আপলোড করে। মধুচন্দ্রিমার বিশেষ অ্যালবামে স্বল্প পোশাকে সমুদ্রতীরে তোলা ছবিগুলো ফেসবুকে দিয়ে বন্ধুদের 'কিউট কাপল', 'খুব নাইস লাগছে', 'সেইরকম জোস লাগতেছে', 'নাইস কাপল, 'মেড ফর ইচ আদার' টাইপের কমেন্টের ফুলঝুরি পেয়ে 'দাম্পত্য' জীবনকে সফলতায় ভরে দিয়েছে।

অথচ, ছেলেটার মন তো মনে হয় বদলায় নাই, তাইনা? চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি অন্তরের ভিতরেই আছে, আগের মতই... এই মেয়েতে ক'দিন মজে থাকবে ও? মেয়েদের নিয়ে এত এত আপত্তিকর বাক্যগুলো তো এই অন্তর থেকেই বের হয়েছিল, যা এখনো আছে। ক'দিন পর যখন যুবতী বৌয়ের সাথে ঝগড়া লাগবে, তাদের এই প্রেম কেমন থাকবে তখন? ছেলেটি ক্ষেপে গেলে যদি আগের সেই শব্দগুলো ব্যবহার করে, নবপরিণীতা স্ত্রীর সম্ভ্রম আর সম্মান কিছু থাকবে? এই রুচিকেও কি মেয়েটা মেনে নিবে?

বউয়ের ছবি ফেসবুকে আপলোডের লোভ যারা সামলাতে পারে না, তাদের উদ্দেশ্যে!

29 October 2014

সংকলনে - বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

১।

‘আমার হাসবেন্ড আমাকে অনেক আদর করে, যত্ন নেয়... আমার জন্য রান্না করে।’

নিউজফিডে এমন অনেক মন্তব্য বা অন্তরঙ্গ ছবি প্রায়ই দেখতে পাই। মন থেকে তখন বলি, ‘আলহামদুলিল্লাহ্, বারাকাল্লাহ। আল্লাহ্ যেন এমনি রাখেন।’ কিন্তু কতটুকু উচিত নিজেদের এরকম ছবি দেয়া বা একান্ত নিজেদেরকার কথাগুলো সবাইকে বলে বেড়ানো, তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খুব অনন্য, অন্য কিছুর সাথে তার তুলনা চলে না। কিন্তু তা নিজেদের ঘরের দরজার ভিতরেই আবদ্ধ থাকা ভালো।

বেপর্দা স্ত্রী হোক বা পর্দানশীল, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে তোলা অন্তরঙ্গ ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারের অনুমতি দেয়, তার মানে কিন্তু একটাই– তার ভালো লাগে অন্যরা তার স্ত্রীকে কামনার বস্তু মনে করলে, হয়ত কিছুটা গর্ববোধও হয়ে থাকে। শুনতে খারাপ শুনাচ্ছে হয়ত, কিন্তু ছবিগুলোতে বন্ধুদের মন্তব্য পড়লেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায়– ‘ইসস, কবে পাব এরকম একটা বউ।’ অথবা ‘যা লাগতেসে না, হট কাপল।’, বা ‘আমাকেও খুঁজে দে রে এরকম বউ।’ আচ্ছা, আপনার সুন্দর বউটাকে আপনার থাকতে দিন না, সবার সাথে শেয়ার করার কি একান্ত

প্রয়োজন? মনে রাখবেন, যে আপনার বউকে সুন্দর, হট, চরম বিশেষণে প্রশংসা করছে, সে নিশ্চয়ই মনে মনে সব রকম মাপ-জোঁক করে ফেলেছে- আপনার স্ত্রীর কোমরের বাঁক, দীঘল কালো চুল, সুকোমল বাহু- কিছুই তার চোখে বাদ পড়েনি। পর্দার প্রয়োজনীয়তা ঠিক এখানেই।

আমি আমার জীবনে প্রথমবার পর্দার গুরুত্ব বুঝলাম যেদিন আমি যেখানে পড়াতাম সেখানে এক ছাত্র, বেশী বয়স না, ১২-১৩ হবে, আরেকজনের সাথে কথা বলতে বলতেই আরেক ছাত্রর (তারই বন্ধু) মায়ের দিকে হা করে তাকিয়ে ছিল। মহিলা শালীন পোশাকই পরা ছিলেন, আমাদের সমাজে যাকে শালীন বলা হয়, তবে যখন উনি মাটি থেকে কিছু তোলার জন্য ঝুঁকলেন, তখন অতটুকু ছেলেটাও তাকিয়ে থাকল। বন্ধুর মা-র দিকেই যদি চোখ পড়ে, বন্ধুর বউ তো আরও আপন! এটা কিন্তু Natural instinct। আপনি দেখবেন, বাতাসে কারো কামিজ একটু এদিক ওদিক হলে চট করে সবার নজর ওখানে চলে যায়- আমার আপনারও, ছেলেদের দোষ দিয়ে কি লাভ? যেখানে সমাজের এই হীন অবস্থা, সেখানে আপনি নিজের বেডরুমের দরজা জনসম্মুখে উন্মুক্ত করে দিলে কিভাবে হবে?

হাসাদের ভয় তো আছেই ষোলোআনা- নজর লাগা তো কোন রূপকথার গল্প নয়। যে কারো নজরই লাগতে পারে। আমি 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললাম হয়ত, কিন্তু কিঞ্চিত মন খারাপও করলাম, কই আমার স্বামী তো কোনদিন এরকম চাইনিজ জাপানিজ রান্না করল না আমার জন্য! ফলাফল? আমার সংসারেও অশান্তি, আপনারটাও নজর লেগে হয়ত বিষাদময় হয়ে গেল। যদি সত্যি সুখী হয়ে থাকেন, আল্লাহ্‌র কাছে শোকরানা করলেই যথেষ্ট। স্বামী স্ত্রী যখন নামাজ পড়বেন, তখন আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নত করে তার রহমতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন যাতে সারাজীবন এমন সুসম্পর্ক অটুট থাকে।

Save your wife from hungry eyes, Save yourself from Fitna.

২।

ভাইয়েরা আপনারা যারা নিজেদের স্ত্রীদেরকে পরপুরুষের চোখের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করছেন, স্ত্রীদের ছবি ফেসবুকে দিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছেন, স্ত্রীকে সাজিয়ে নিয়ে বাইরে বের হচ্ছেন আর পরপুরুষ ও লম্পটরা চোখকে পরিতৃপ্ত করছে সেসব প্রত্যেক পুরুষের "দাইয়্যুস" টার্মটির ব্যাপারে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। একজন পুরুষ হাদিসের ভাষ্যমতে দাইয়্যুস সাব্যস্ত হবে যদি সে তার বোন, স্ত্রী, কন্যাদের বেপর্দাভাবে চলাফেরা করাকে বন্ধ না করে, তাদেরকে অশ্লীলতা, ব্যভিচার থেকে দূরে না রাখে। যেসব ভাইয়েরা এখনও দাইয়্যুসের কাতারে আছেন আজই তাওবা করুন, নিজের পরিবারের মহিলাদের বুঝান, দাওয়াহ দিন। তারপরও না বুঝলে বাধ্য করুন, কেননা তাদের ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। এমনকি আপনার জান্নাত জাহান্নামও অনেকাংশে তাদের উপর নির্ভর করছে। কারণ তারা আপনার অধিনস্ত।

রাসুলুল্লাহ (□) বলেছেন,

“তিনজন আছেন যাদের দিকে আল্লাহ সুবহানু তায়ালা কিয়ামাতের দিন নজর দেবেন না। যে পিতামাতার অবাধ্য, যে নারী বেশভূষায় পুরুষের অনুকরণ করে এবং দাইয়্যুস ব্যক্তি।”

[সুনান আন নাসাঈ: ২৫৬২, হাদিস সাহীহ]

ইমাম আহমাদের বর্ণনাকৃত অন্য আরেকটি সাহীহ হাদীসে ‘আল্লাহ নজর দেবেন না’ এর সাথে এসেছে দাইয়্যুস ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। [মুসনাদে আহমাদ]

রাসুলুল্লাহ (□) আরও বলেছেন, “আল্লাহ প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্যে তার অংশের অনিবার্য জিনা লিখে রেখেছেন, হোক সে তার ব্যাপারে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত। চোখের জিনা হল দৃষ্টিপাত করা (যে দিকে বা যার দিকে দৃষ্টি দেবার অনুমতি নেই সেদিকে দৃষ্টিপাত করা), জিহ্বার জিনা হল উচ্চারণ করা (যা উচ্চারণ করা বা বলা বৈধ নয়)। আর নফসের ইচ্ছা জাগে (জিনার জন্যে) এবং গুপ্তাংগ তা বাস্তবতায় রূপ দেয় অথবা তা অস্বীকার করে।“ [সাহীহ বুখারীঃ ৬৬১২]

উলামায়ে কিরামের মতে মুখের জিনা, চোখের জিনা, হাতের জিনা, পায়ের জিনা সবই জিনার দরজা আর অনস্বীকার্য অংশ। অতএব যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এইসব জিনা থেকে বাধা দেবে না, সে ব্যক্তিও দাইয়্যুসের কাতারে পরে যাবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দাইয়্যুস হওয়া থেকে হিফাজত করুন এবং মা বোনদের যথাযথভাবে পর্দা করারতাওফিক দান করুন।

৩।

//আমার স্ত্রী সর্বাবস্থায় আমারই স্ত্রী। আমার স্ত্রীর সৌন্দর্য উপভোগ ও অবলোকনের পূর্ণ অধিকার একমাত্র আমারই। যে কোন স্ত্রীর রূপ ও ভূষণ-সজ্জার সৌন্দর্য-দর্শনের একমাত্র হকদার সেই মহিলার স্বামী। এই যদি হয়ে থাকে সর্বজন স্বীকৃত সত্য, তাহলে আমার স্ত্রীর চেহারা দশজনকে আহবান করে দেখাবার কোন প্রয়োজন পড়ে না। পকেটের পয়সা খরচ করে পত্রিকায় এ্যাড ছাপিয়ে পরোক্ষভাবে এ কথা বুঝবার-ও তো দরকার পড়েনা যে, দেখ দেখ দুনিয়ার মানুষ আমি কি একখানা চীজ পেয়েছি।//

(তাহলে ফেসবুকে যে নব দম্পতিদের ছবি আপলোডের হিড়িক বয়ে যায় তার কী হবে!)

//নিজের স্ত্রীকে স্বশরীরে বা তার স্ব-ছবিকে হাজার হাজার লোকের চোখের সামনে তুলে ধরলে অনেকে হা-পিত্তেস করবে, টীকা টিপ্পনী কাটবে। বলুনতো এসব কেমন করে বরদাস্ত করা যায়? মান ইজ্জত ও সৌন্দর্যের নিরাপত্তার জন্য ইসলাম পর্দা প্রথার যে ব্যবস্থা রেখেছে, সেই ব্যবস্থার বাইরে কদম রাখলেই নানা কথা শোনতে হয়, নানা কেলেংকারী ডেকে আনা হয়। নানা অঘটন ঘটে।//

//সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর চেহারা কাগজে ছাপিয়ে/ ফেসবুকে আপলোড করে কি লাভ? তিনিতো দশের মনোরঞ্জনের জন্য আমার স্ত্রী হয়ে আমার ঘরে আসেননি। তাছাড়া তিনি কোন বাজারী পণ্যও নন যে, তাকে বাজারে পরিচিতি করাতে হবে বাজারজাত হওয়ার জন্য। হাঁ, এমন কোন চিন্তা কারো মনে প্রচ্ছন্নে উঁকি দিয়ে থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা, কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে নিজের সুন্দরী বউয়ের এ্যাড ছাপিয়ে বাজারী সওদার মত দশজনের দৃষ্টি আকর্ষনের কি অর্থ থাকতে পারে? পাবলিসিটির নেশা যদি একান্তই না কাটে, তাহলে ছবি ছাড়া বিয়ের সংবাদটা সংবাদ হিসেবে ছাপিয়ে দিলেই তো হয় সুখী দাম্পত্য জীবনের দোয়া চেয়ে।//

//নিজের ভোগের বস্তুকে এত পাবলিসিটি দিলে স্বাদ আর কিছু থাকে না। যার কাছে যে বস্তু যত বেশী দামী, সেই বস্তুর মালিক তত সযতনে তা সংরক্ষণ করে থাকেন। যে মালিক তার প্রিয় দামী বস্তুর কদর বুঝে না, সে এই মূল্যবান বস্তুটি এখানে সেখানে ফেলে রাখে, হাজার জন দেখে, নাড়াচাড়া করে, হাজার কথা বলে। এসব কথার মাঝে অশ্লীল মন্তব্যও থাকে বেশী। পাবলিসিটি আর প্রদর্শনী করলে মস্তানেরা কাছে ভিড়বার সুযোগ পায়। অতএব বিয়ের পরিচ্ছন্ন মানসিকতা নিয়ে যারা বিয়ে করেছেন, তারা নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ করেছেন। এখন সুন্দরমত ঘর সংসার করুন। ঘরে বসে নিরিবিলি নতুন বউয়ের সংগে নতুন সংসার গড়ার আলাপ শুরু করুন। এ নিয়ে বাহিরে ডুগডুগি বাজাবেন না।//

৪।

***ফেসবুকে ও ব্লগে ছবি আপলোডের নেশায় দম্পতিরা**

আপনি জানেন কি? কোথাও গেলেই ছবি তোলার এবং তা ফেসবুকে আপলোডের চিন্তা যদি আপনার মনে জাগে, তাহলে তা একটা মানসিক রোগ। আপনি এই রোগের উচ্চমানের রোগী নন তো? আপনি দু'জনের অন্তরঙ্গতা এখন ফেসবুকে চেনা অচেনা সবাইকে দেখিয়ে লাইক চাচ্ছেন? নাকি চাইছেন আপনার স্ত্রীকে সবাই দেখুক, দেখে মন্তব্য করুক আপনি সুন্দরী পেয়েছেন বউ। এই রূপ-চেহারা আর কয়দিন ভাই? ৫-৭ বছর পরে আর ছবি তুলতেও লজ্জা পাবেন এই চিন্তাগুলা মাথায় থাকলে। আর অল্প কিছু বছর পরেই আপনাদের দু'জনকেই সাদা কাপড়ে তুলে মাটির নিচে রেখে আসবে গন্ধ লাগবে বলে... এমন কিছু করতে যাবেন না, যার খারাপ প্রতিফল সেই কবরে আপনাকে ধাওয়া করবে...

আপনাদের দু'জনার জড়াজড়ি আর গলাগলি ছবি দেখে কেউ সুখী বলে ভেবেছেন? আপনি হয়ত জানেন না শয়তানের কাজ। আপনি হয়ত জানেন না ওয়াসওয়াসা কেমন হয়। আপনার কল্পনাই নেই আপনার খুব কাছের কারো কতটা

হিংসার পাত্র আপনি হয়ে গেলেন। অথচ আপনি নিজেই জানেন, এই ছবি দেখে লোকে যতটা সুখী ভাববে আপনাদের, ততটা সুখী আপনারা নন।

প্রেম জিনিসটা দু'জনের মধ্যেই রাখুন। পারলে ইমাম আহমাদের মতন করে ৩০ বছর পরে গিয়ে বলবেন স্ত্রীর মৃত্যুর পরে যে তার স্ত্রীর সাথে তার কোনদিন ঝগড়া হয়নি। তারা একজন খেপে গেলে আরেকজন চুপ করে থাকতেন। প্রেম বুঝতে চান? তাহলে এই হলো প্রেম, ভালোবাসা।

ছবি প্রদর্শনের মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পাক সদ্য বিবাহিত দম্পতিরা। ভালোবাসা শুরুর দিকে বেশি থাকে, এসময়ের বিষয়গুলোকে মন দিয়ে গেঁথে নিন, তাতে সামনের সময়গুলোতে তা অনুপ্রেরণা দিবে, দু'জনের সম্পর্ক মধুময় হবে। এখন লোককে দেখিয়ে বেড়ালে আপনাদের ভালোবাসার গোপন আকর্ষণ নষ্ট হবে পরস্পরের কাছে। সাবধান হোন সময় থাকতেই।

৫।

কেন রে ভাই, বউয়ের ছবি কেন আপলোড দেয়া লাগবে? আপনার বউকে দেখে আমাদের লাভ কী? উল্টো আপনার আমল নষ্ট হচ্ছে, গুনাহ হচ্ছে, বউ যতই পর্দায় থাকুক না কেন খামাকা আমাদেরকে এইসব ছবি কেন দেখাচ্ছেন, আপনি বিয়ে করেছেন, নতুন বউ পেয়েছেন, মনে আনন্দ লাগছে বুঝতে পারছি, ভাই এটা আপনার ব্যক্তিগত আনন্দ, আপনার এই আনন্দ আল্লাহ্ আরো বাড়িয়ে দিন, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্ আপনাকে আপনার বউ সমেত আনন্দের মধ্যে রাখুন সেই দুয়া করি। কিন্তু আপনার বউকে দেখে আমাদের কোন কাজ নেই ভাই, এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং গুনাহর কাজ।

courtesy : - * ১, -Nabila Noshin Shejuti

২ - Sabet Bin Mukter

* ৩- মরহুম জহুরী,

৪- সাফওয়ান

৫ - Abdullah Russel

online offline it doesn't matter, the evil eye is real !!

29 October 2014

সঙ্কলনেঃ বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব পেইজ

আমার এক বন্ধুর তার পরিচিত এক মেয়েকে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল। তার আগ্রহের কারণ ছিল মেয়ের মা মেয়েকে মাশাআল্লাহ বেশ ইসলামী অনুশাসনে বড় করেছেন। পরিবারটিকে আমিও চিনি। আলহামদুলিল্লাহ ছেলেদের সাথে মিশবে তাই অ্যান্টি মেয়েকে পড়িয়েছেন গার্লস স্কুলে, ওমেন কলেজে। কোচিং এ পড়লে ফিতনায় জড়িয়ে যাবে তাই বাড়িতে মহিলা টিচার রেখে মেয়েকে পড়ান। ইন্টারনেটের পাল্লায় পড়ে খারাপ হয়ে যাবে সেই ভয়ে মেয়েকে ল্যাপটপ ব্যবহার করতে দিতেন না!

(১)

কয়দিন আগে সেই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, বিয়ের কি অবস্থা! সে জানালো, বাদ দিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ একদিন মেয়ের ফেসবুক প্রোফাইল দেখে বন্ধু যারপরনাই হতাশ। মেয়ের ছবি আপলোড আর সেখানে ছেলেদের সাথে লুতুপুতু দেখে বন্ধুর আগ্রহ মরে গেছে।

ওয়াল্লাহি এটা খুবই দুঃখজনক!

নিজেদের মেয়েদেরকে মানুষের সামনে শো করে বেড়ানো জাহেল বাবা মায়েদের কথা বাদই দিলাম। আমাদের ইসলামপন্থী বাবামায়েদের কথা বলছি যারা তাদের মেয়েদেরকে ইসলামের অনুশাসনে বড় করছেন, মেয়েকে পর্দার মধ্যে লালন করছেন, মেয়েকে নন মাহরামের সাথে মিলামিশা থেকে বিরত রাখছেন... আপনারা জানেন তো??

আপনারা জানেন তো আপনাদের বাস্তব জীবনের পাশাপাশি আজ ছেলেমেয়েদের একটি ভার্চুয়াল জগতও আছে? জানেন তো আপনার মেয়েরও ফেসবুক আইডি আছে? আপনার সামনে পর্দানশীন মেয়ে চাইলেই এই ফেসবুকে নিমিশেই বেপর্দা হতে পারে। নন মাহরাম থেকে আগলে রেখছেন যে আদরের মেয়েকে, চাইলেই সেই মেয়ে এই ফেসবুকে নন মাহরামের সাথে কথার ফুলঝুরি ছড়াতে পারে, চলতে পারে ইনবক্সের গোপন আলাপ। বাসায় আপনারা "আমরা আমরাই তো" যে হালাল ছবিগুলো তোলেন সেগুলো এখানে পরপুরুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে হারাম করে দেওয়া যায়। জানেন তো? খবর রাখেন তো আপনার মেয়ের ফেসবুক আইডির?

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এসব অনভিপ্রেত ঘটনার কারণ ছেলেমেয়েকে ইসলামের নৈতিকতা, মূল্যবোধের সঠিক শিক্ষাটুকু না দেওয়া। এটা করবে না, ওটা করবে না, হিজাব কর, ছেলেদের সাথে কথা বলবে না, ওখানে যাবেনা , এধরনের হুকুম কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নয়। আল্লাহর দেওয়া বিধি নিষেধের পাশাপাশি দ্বীন ইসলামের সাথে, এর ভেতরের নির্যাসের সাথে, এই বিধি নিষেধের কারণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়াটাও জরুরি। না হলে ছেলে মেয়েরা ইসলামের এসব নিয়ম নীতিকে বোঝা হিসেবে নিয়ে নেয়। আর ফলিশ্রুতিতে পিতামাতার সামনে দ্বীনদার হলেও বাইরে ঠিকই জাহিলিপনায় জড়িয়ে পড়ে। আর এই কাজটা যেন আজ অনেক বেশী সহজ করে দিয়েছে ফেসবুক নামের যোগাযোগ মাধ্যম।

আজ আমরা সারা দুনিয়ার মানুষকে দাওয়া দিয়ে বেড়াই, সারা দুনিয়াতে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখি কিন্তু নিজেদের পরিবারগুলোর কোন খোঁজ খবর রাখি না। খবর রাখিনা আল্লাহ কি বলেছেন কুর'আনে।

আল্লাহ বলেছেন,

"মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।"

(সূরা তাহরিমঃ ৬)

সারা দুনিয়ার মানুষকে আগুন থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি কিন্তু নিজের পরিবারকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছে।

তাই বাবা মায়েদের উচিত হবে ছেলেমেয়েদের বাস্তবের ইসলামাইজেশনের পাশাপাশি ভার্চুয়াল জগতেরও খবর রাখা। সম্ভব হলে কোন কারণ ছাড়া মেয়েদের ফেসবুক ব্যবহার থেকে বিরত রাখা। গায়ের পর্দা লাগিয়ে নিরাপদ ভাবার কোন কারণ নেই, মনের পর্দাটাও যেন আল্লাহর ভয়ে পাপকাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। বাস্তবে পর্দা, নন মাহরাম মেনে চললেই সব শেষ নয়, ফেসবুকেও তার যথাযথ প্রয়োগ থাকতে হবে। মনে রাখা উচিত, online offline it doesn't matter, the evil eye is real !!

(২)

ওয়েডিং ফটোগ্রাফি !

বোনেরা 'ওয়েডিং ফটোগ্রাফি' টাইপের পেইজগুলোতে যত কম ঘুরঘুর করবেন, আপনাদের মানসিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য ততই ভালো থাকবে। ভাইদের তো ওইসব এলাকায় যাওয়া নিষিদ্ধ, তারপরেও গেলে, বোঝাপড়াটা আল্লাহর সাথেই করবেন !

হে আমার বোন, নিজেকে প্রদর্শিত করার, লোকজনকে নিজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ করাতে যেই আয়োজন তা রীতিমত অন্যায়। আপনার সৌন্দর্য কেবলই আপনার স্বামী জন্যই আয়োজিত হওয়া উচিত।

তাছাড়া, অর্থনৈতিক মন্দা সবখানে। ওয়েডিং ফটোগ্রাফির জন্য যে আয়োজন -- শাড়ি, গহনা, বিউটি-পার্লার, ফটোগ্রাফার এনে আপনার এই আয়োজনটা 'স্মৃতি' ধরে রাখার নামে অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহার নয় কি? আপনি বরং অপচয় না করে এই সমাজের হাজার হাজার অভাবী মানুষের কারো জীবনকে সুন্দর করতে সাদাকাহ করে দিন। আল্লাহ আপনার এবং আপনার দাম্পত্য জীবনকে কল্যাণে ভরে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

courtesy : *১- জনৈক

*২-সাফওয়ান

পর্নোগ্রাফি ও সংসার

4 November 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

একটা খুব প্রয়োজনীয় কথা, একটা সিরিয়াস সতর্কবাণী। অবিবাহিত মুসলিম ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনেকের ধারণা --

"বিয়ের আগের কিছু খারাপ স্বভাব আছে, বিয়ে হলে হয়ত কেটে যাবে, ব্যাপার না।" -- ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুল।

পাশ্চাত্যের দেখাদেখি পর্ণোগ্রাফি আমাদের সমাজেও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ফেসবুকেও অজস্র পর্ণগ্রাফিক ফটোর ছড়াছড়ি। ছেলে এবং মেয়ে কেউ বাদ যায় না এসব ছবি দেখার হাত থেকে। অনেক ছেলেরাই পর্ণগ্রাফি মুভি এবং গল্পসমূহের নেশার শিকার। মনে রাখবেন, পর্ণগ্রাফি কোন অভ্যাস নয় শুধু, এটা একটা নেশা -- নিউরোসায়েন্টিস্টরা বিষয়টাকে ভয়াবহ নেশা হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। একসময় অভ্যাস হয়ে তা মনের ভিতরে প্রোথিত হয়ে যায়। অজস্র সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে কেননা বিয়ের পরে স্ত্রী আবিষ্কার করেন তার স্বামী তাকে আসলে পর্নোগ্রাফি নায়িকার মতন করে চাচ্ছে। ক্রমাগত পর্ন মুভি দেখতে দেখতে অনেকেই মানসিকভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিয়ের পরেও ছাড়তে পারে না।

সময় থাকতেই সাবধান হোন। এই নেশা কাটিয়ে উঠুন। মুখে যত ভালো কথাই বলুন না কেন, সবাই আপনাকে যতই ভালো মানুষ জানুক না কেন, স্ত্রী ঠিকই বুঝতে পারে সেই পুরুষ মূলত কোন পর্যায়ের চরিত্রবান। একজন পুরুষের চরিত্রের ব্যাপারে তার স্ত্রীর সাক্ষ্যই গ্রহণীয়। চলমান সমাজে এরকম সমস্যা অনেকের হয়ত হয়ে গেছে। কিন্তু আজই নিজেকে বদলে ফেলতে উদ্যোগ নিন। তাওবাহ করুন। একাকীত্ব এড়িয়ে চলুন, কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। ফরয নামাযের সাথে নফলের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। আল্লাহকে ভয় করে চোখ ও লজ্জাস্থানকে সংযত করুন। আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা আগামীতে সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার বড় কারণ হতে পারে যদি আজই সতর্ক না হোন। আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন যখন সে ভালো নিয়াত করে। আল্লাহ আমাদের সকল ভাই ও বোনদের সাহায্য করুন এবং সুন্দর চরিত্রবান একটি সমাজের অংশ হিসেবে সবাইকে কবুল করে নিন।

***এক ব্যক্তি একজন শাইখের কাছে এসে বললো,** "শাইখ, আমি কয়েক বছর হলো বিয়ে করেছি, সংসারে আমার সন্তানও আছে । কিন্তু কিছুদিন হলো আমি আবিষ্কার করছি যে আমি আমার স্ত্রীর প্রতি আর আকর্ষণ অনুভব করছি না।"

শাইখ : কেন? উনি কি মোটা হয়ে গেছেন?

লোকটি : না, সে তো আগের মতই আছে।

শাইখ : আপনার স্ত্রী কি কোন দুর্ঘটনায় পড়ে তার আগের শারীরিক গঠন হারিয়ে ফেলেছেন?

লোকটি : না, সে আগের মতই আছে।

শাইখ : তাহলে কি আপনার এমন সময় যাচ্ছে যে আপনার পাশ দিয়ে কোন মহিলা অতিক্রম করলে আপনার চোখ সংযত থাকছে না, কিংবা আপনি কি পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত?

লোকটি : হ্যা !! কিন্তু আপনি তা কীভাবে বুঝলেন?

শাইখ উত্তর দিলেন,

আপনি যখন হারামকে প্রশ্রয় দিবেন, তখন আপনি হারামের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করবেন।

"আপনি যখন হারামের মাঝে খাবেন, ঘুমাবেন, নিঃশ্বাস নিবেন, তখন হালালকে আপনার বিতৃষ্ণা লাগতে থাকবে।"

***হে তরুণ, আপনি পর্নোগ্রাফি বা নিষিদ্ধ সম্পর্কে নেশাগ্রস্ত? আপনার জন্য কিছু টিপস**

সমাজের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনাকাংখিত সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ বা যিনার সাথে জড়িয়ে পড়েন। আল্লাহর রাহমাতে তারা হয়ত ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু পুরোনো খারাপ কাজ আর পিছু ছাড়ে না, স্মৃতিতে আসতে থাকে, আবারো সেই পাপে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ভুল মানুষ করতেই পারে, সেটাই মানবিক। কিন্তু ভুলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানের কাজ। তাই ভুল স্বীকার করে জীবনকে সুন্দর করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।

নুমান আলী খান একটি ভিডিওতে পাওয়া কিছু টিপসের সাথে আরো কিছু জিনিস যোগ করে দিলাম। আশা করি উপকার হবে। আল্লাহ মুসলিম সমাজের সবাইকে হেফাজত করুন।

-- সবার আগে সেই খারাপ কাজ ছেড়ে সরে আসতে হবে।

-- আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে [তাওবা ও ইস্তিগফার করা]

-- ক্রমাগত ভালো কাজ করতে হবে, কেননা ভালো কাজ মন্দ কাজকে ঢেকে দেয়।

-- সঙ্গীসাথী বদলে ফেলতে হবে। আগেকার সম্পূর্ণ ফ্রেন্ড সার্কেলকে এভয়েড করতে হবে।

-- একাকীত্ব থেকে দূরে থাকতে হবে, প্রয়োজনে ভালো সঙ্গীর কারণে গিয়ে ভালো বিষয়ে আলোচনা করতে দূরে কোথাও যাওয়াও উচিত হবে।

-- কমিউনিকেশন ডিভাইস থেকে দুরত্ব রাখতে হবে, বিশেষ করে একাকীত্বের সময়ে যেন আবার কোন নতুন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা না থাকে।

-- আল্লাহর স্মরণ করতে হবে সবসময়।

-- নামাজে নিয়মিত হতে হবে, ইসলামি জ্ঞানার্জনে নিজেকে লাগিয়ে দিতে হবে।

-- নিজেকে স্মরণ করাতে হবে, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতে আল্লাহ এই জীবনের সবকিছুর হিসেব নিবেন।

-- বিবাহপূর্ব বা বিবাহবহির্ভূত সকল সম্পর্ক এড়িয়ে চলুন।

-- মোবাইল ফোন, ফেসবুক, মেসেঞ্জারেও যেকোন কমিউনিকেশন থেকে দূরে থাকুন। নইলে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় জীবন আবার জটিল হয়ে যাবে।

অনুপ্রেরণা -

১) নুমান আলি খান - সেক্সুয়াল ডিজায়ারস http://www.youtube.com/watch?v=rJY7SoREkOk

২) টাইম টু কিক পর্ন আউট অফ দি সিস্টেম http://muslimmatters.org/2011/08/15/ramadan-time-to-kick-porn-addiction-out-of-your-system/

পর্নোগ্রাফির থাবা এই সমাজে অনেক গভীরে ঢুকে গেছে

28 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

পর্নোগ্রাফির থাবা এই সমাজে কত গভীরে ঢুকে গেছে তা কল্পনাতীত। একদিকে নামাজি ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুবই নগন্য, অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিজাব ব্যান করেছে; অন্যদিকে 'শাহবাগী মুসলিমদের' মতন নামকাওয়াস্তে মুসলিমে ছেয়ে গেছে। এরা থাবাবাবার মতন নিকৃষ্টের জানাজা পড়েছে, রাসূলের (সা) পরিবারকে নিয়ে লেখা কুরুচিময় বিকৃত ব্লগগুলোকে তারা স্বাভাবিক চোখে(!) দেখে-- আসলে এদের বোধ মরে গেছে । এমন বিকৃত রুচি আর অসুস্থ মানসিকতায় গড়ে উঠছে 'সেক্যুলার' শিক্ষায় সেকুলার কালচারের বাংলাদেশ। আমাদের সমাজে শরীরস্বর্বস্ব ছেলেমেয়েদের তাই এখন বাম্পার ফলন।

ছোট ছেলেমেয়েরা মোবাইল ফোন, টাবলেট আর কম্পিউটারে কী করে? গেম খেলে? কতক্ষণ? বাবামায়েরা খোঁজ রাখে কি? সেদিন দেখলাম একটা রিকসায় ঘোমটা পরা সাধারণ বাঙালি মায়ের পাশে বসে স্কুলগামী ছেলে মোবাইলে ফেসবুক চালাচ্ছে, দূর থেকেও তার মোবাইল স্ক্রিণে স্বল্পবসনা মেয়েদের ছবি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। মা তার পুত্র সন্তানকে পাশে নিয়ে বসে আছেন যখন তার ছেলে চোখ দিয়ে মেয়েদের গিলে খাচ্ছে... ক'দিন পর তার তৃষ্ণা বেড়ে যাবে, তখন কি আর শুধু বান্ধবীদের ফটোতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে? তার নেই শিক্ষা, নেই সঠিক নিয়াতে বিয়ের সম্ভাবনা, তাহলে পাপাচারের ভবিষ্যত ছাড়া আর কিছু রইলো কি? থাকেও না, এরা কিছুদিন পরেই প্রেম-ডেটিং ইত্যাদিতে আনন্দ খুঁজে নেয়। বল্গাহীন জীবনের সীমাহীন যন্ত্রণা যার জীবনের সমাপ্তি।

সাইবার ক্যাফেতে গেলে প্রায় সবসময় ব্রাউজার হিস্টরিতে দেখতে পাওয়া যায় পর্নোগ্রাফি সাইটের নাম। গুগলে বাংলায় কিছু চাপতে গেলে ভেসে ওঠে নোংরা সব সার্চ কী-ওয়ার্ড। এগুলো বলেই দেয় এই দেশের উঠতি এবং বয়স্ক গোষ্ঠীর চিন্তার মাঝে কী পরিমাণ কদর্যতা মিশে গেছে। শহরে হাইস্কুলে পড়া মেয়েদের মাঝে খুব কমই বয়ফ্রেন্ড না থাকাতেই মুক্তি খুঁজে পায়। পর্নোগ্রাফি এদের মোবাইলে খুব সহজেই ঢুকে পড়ে। অভিভাবকরা হয়ত জানে না, জানলেও কিছু বলে না। অদ্ভুত বিচিত্রতায় ভরপুর এই সমাজ এখন।

প্রেম নামক সম্পর্কটা আগেও হারাম ছিলো, এখনো আছে। এখন ছেলেমেয়েরা প্রেম করলেই তাতে শরীর জড়িয়ে নেয়। প্রেম করে 'ছ্যাকা খেয়ে কেউ কান্নাকাটি করে, অন্যেরা 'শরীরের পাপ' ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যায় নতুন পাপে, আবার কেউ কেউ গলায় দড়ি দিয়ে পটল তুলে নেয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ফোনে অপরিচিতদের সাথে আলাপে মাস্তি করে। নাটক আর টেলিভিশন বলে দিচ্ছে তাদের প্রেম করতে হবে, প্রতিটি বিলবোর্ড বলে দিচ্ছে তাদের প্রেম করতে হবে।

এগুলো শেষ করা সম্ভব নয় রাতারাতি। নোংরামি, পাপাচার, ধর্মহীন, ইসলাম বিদ্বেষের এই কুৎসিত সমাজে একমাত্র আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এনে দিতে পারে নতুন প্রাণ, নতুন সতেজতা, নতুন এক সুন্দর পৃথিবী..

সুখ কোথায়?

30 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

একদম সুনসান নিরবতা মনে হয় ঢাকা শহরে হয়ে ওঠে না। তিলোত্তমা নগরীতে সবসময়েই অনেক লোকের আনাগোনা চলতেই থাকে। একটু জায়গা পেলেই যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠে ডেভেলপার কোম্পানির নতুন প্রজেক্ট। নতুন অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে নতুন কিছু সংসার --নতুন দম্পতি, পুরোনো দম্পতি, ব্যাচেলর। যেকোন এক নির্ঘুম রাতে জেগে উঠে আলো-আঁধারির মাঝে জানালা দিয়ে, বারান্দা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলেই অন্য কাউকে পাওয়া যায় দূরে কোথাও -- এক টুকরো মোবাইলের আলোতে জেগে থাকা কিশোর, কিশোরী। অথবা হয়ত কোন তরুণ বা তরুণী। এভাবেই অপচয় হয় কৈশোরের, তারুণ্যের।

যে রাতকে তিঁনি বিশ্রামের জন্য রাহমাত হিসেবে দিয়েছেন, সেই রাতে মোবাইল প্রজন্ম জেগে থাকে নিতান্ত অশান্তিতে। সাথে থাকে নিজেকে নেটওয়ার্ক কানেক্টেড রাখার এক অদম্য প্রয়াস, হয়ত চেনা-অচেনা কোন বিপরীত লিঙ্গের কাউকে কাছে না পাওয়ার এক বুক তৃষ্ণা। খানিক আগেই হয়ত সে টেলিভিশন বন্ধ করে বারান্দায় এলো, কিংবা ঘরের জানালার পাশে... এতক্ষণ টিভিতে গান দেখছিলো, নায়ক-নায়িকার অন্তরঙ্গ রোমান্স, নাচানাচি, গাছ-পালা-সমুদ্র-পাহাড়ে গান গাওয়া... অথচ ওদের তুলনায় নিজের জীবনটা কেমন একঘেয়ে, বাড়ি আর কলেজ/ভার্সিটির এক বৃত্ত-- এমনটা ভেবে আবার অস্থির হয় সেই তরুণ বা তরুণী। এমন সময় মোবাইল অপারেটর এসএমএস দেয়, বন্ধু হতে চাইলে/পেতে চাইলে অমুক-তমুক ডিজিট চাপুন... সেই তারুণ্য আরো অস্থিরতায় ডুবে যায়। অপেরা, মজিলা কিংবা গুগল ক্রোমে ফেসবুক ডট কমে লগিন করে নিউজ ফিডে দেখতে পায় বন্ধুরা আজ সন্ধায় 'হ্যাং আউটে' ছিলো, কিংবা একটা কাপলের আপলোড করা সেলফি, আজ তারা কেএফসি/পিজ্জা হাটে গিয়েছিলো! দু'জনের হাসিমুখ ছবি দেখে তারুণ্যে একাকীত্বের জোয়ার আসে... কাউকে পাওয়ার তৃষ্ণা জাগে আরো... শয়তান তার বুকে জ্বালা দিতে থাকে, আরও আরো জ্বালা... আরো আরো একাকী ফিলিংস। তার একবার হয়ত মনে হলো, অপরাধ অনেক করেছি, অনুতপ্ত

হয়ে একটু নামাজ পড়ি, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে যদি তাও বুকটা হালকা হয়! পরক্ষণেই শয়তান মনে করিয়ে দেয়, সারাদিন কোন নামাজই পড়েনি, এখন এই তাহাজ্জুদে দাড়ালে আর কী এমন হবে, আল্লাহ তো আমার দোয়া কবুল করবে না! অথচ, আরেকটু হলেই হয়ত তার অন্তরে প্রশান্তির স্রোত বয়ে যেত, এক অন্য আনন্দের স্বাদ আস্বাদন করতো তার হৃদয়। আরেকটু হলেই এই জীবনের অর্থটা সার্থক করার এক অনুভূতির দিকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত...

সমাজের কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন এমনি নাগরিক জীবনে বহুমুখী অস্থিরতায় জ্বলে চলেছে। প্রতিটি বুকে অনেক জ্বালা। মেয়েবন্ধু/ছেলেবন্ধুর জ্বালা, একাকীত্বের জ্বালা, অভিভাবকের অমতের জ্বালা, ইন্টারনেটে ফটো ও ভিডিও আপলোড হওয়া অন্তরঙ্গ মূহুর্তগুলোর জ্বালা... জ্বালামুক্তির সেই সহজতম উপায়টি থেকে শয়তান আরো আরো দূরে সরায়। পাপের সমুদ্রে পাপাচারী আত্মাগুলো আরো ডুব দেয়... গহন ডুব। রাতে ইউটিউবে গিয়ে ভিডিও চালানো, কিংবা কোন মেয়ের ইনবক্সে গিয়ে মেসেজিং... আরো আরো গহীনে পাপাচার...

এমন সময় হয়ত এমন এক তরুণ/তরুণীর ঘুম ভাঙ্গলো যে ওযূ সেরে বারান্দায় তোয়ালেতে মুখ মুছতে গিয়ে দেখলো দূরে কোথাও মোবাইল ফোনের আলো, কেউ জেগে আছে। কিবলামুখী হয়ে হাত বেঁধে স্থির দাঁড়ানো অশ্রুসিক্ত মানুষের সলাতের প্রশান্তিটা কেউ বুঝতেও পারবে না। একই জগতে বসবাস, অথচ কত যেন ব্যবধান! একই অ্যাপার্টমেন্টে থেকেও কী ভীষণ পার্থক্য দুই স্রোতের দুই জগতের। যখন ইনভলভ হতে হতে, ঝামেলায় অস্থির হয়ে কেউ নির্ঘুম রাত কাটায় শরীর-মনের প্রশান্তিহীনতায়, তখন সারা পৃথিবীকে পেছনে ফেলে প্রকৃত শান্তির অবগাহনে সিক্ত হয়ে আল্লাহর বান্দা তার আত্মাকে আরো উচ্চ মাকামে নিয়ে যাওয়ার পথে ব্যস্ত... প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত মুক্তি, প্রকৃত সুখ তো সেই হৃদয়েই... হ্যাং-আউট, বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ডসদের মাঝে ডুবে থাকা প্রাণেরা কী আদৌ টের পায় জগতে কত শান্তি আছে কত সহজে?

রাত্রির প্রথম প্রহর

০৪ আগস্ট, ২০১৪

ভাইয়া, পথে ঘাটে সুন্দরী-রূপসী নারীদের দেখে আকর্ষণ হয়, তাইনা?

29 October 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

আচ্ছা ভাইয়া, আসুন একটুখানি কথা বলি। পথে ঘাটে সুন্দরী-রূপসী নারীদের দেখে আকর্ষণ হয়, তাইনা? আপনি অবিবাহিত, ঠিক দ্রুত তেমন সম্ভাবনাও নেই বিয়ে হবার, তাই মন আরো উদাস হয়?
পথে/স্কুলে/কলেজে/ভার্সিটিতে/ক্লাসরুমে আকর্ষণীয়া মেয়েদের দেখে বুকে দীর্ঘশ্বাস হয়? আশেপাশে সবাই যখন জোড়া বেঁধে ঘুরে, ফোনে ইটিশ-পিটিশ করে তখন নিজেকে একলা একলা লাগে?

জানেন তো, যে জিনিস সহজে পাওয়া যায়, তার ফলাফল কেমন হয়? 'সস্তার তিন অবস্থা' পড়েননি? যে মেয়েটাকে সহজেই আপনি পাবেন, সে কিন্তু আপনার হাত থেকেও *সহজেই* অন্য কারো হাতে চলে যাবে। যে মেয়েটার সৌন্দর্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দেখে মুগ্ধও হচ্ছেন, সে তার সৌন্দর্য আরো অনেক লোকের কাছেই দেখিয়ে বেড়াবে। মানুষ এমনই, তাকে জোর করে বদলানো যায় না, চাপ প্রয়োগে মানুষ আরো বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এই প্রক্রিয়াতেও আপনি তাকে 'ঠিক' করতে পারবেন না।

কী পারবেন জানেন? নিজেকে ঠিক করতে। আল্লাহকে ভয় করার সুযোগ আছে, তাওবা করলে তিনি মাফ করবেন আপনাকে। বিনিময়ে অল্প কয়েকদিনের দুনিয়াতে তো শান্তি আছেই, আখিরাতে মুক্তিও আছে।

এই সমাজেই অজস্র বোন আছে, যারা তাদেরকে পবিত্র রেখেছে, যারা তাদের শরীর ও মনকে এমন মানুষের জন্যই রেখে দিয়েছে যে তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দিয়ে ঘরের কর্ত্রী করে, জীবনের সঙ্গিনী করে নিয়ে আসবে। আপনি কি এমন দ্বীনদার কোন নারীকে পেতে চান না? আপনি কি চান না আপনার সন্তানের মা এমন কেউ হোক, যিনি পবিত্র চরিত্রের, যিনি সন্তানদেরকেও তার মা ও তার বাবার মতন চরিত্রকে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করার শিক্ষা দিবেন?

আসুন ভাই, সস্তা না হই, সস্তা এইসব তুচ্ছ/নোংরা/জঘন্য সংস্কৃতিতে হারিয়ে না যাই। নিজেকে যোগ্য করুন, দেখবেন আল্লাহ আপনার জন্য কোথা থেকে যে এক অসাধারণ নারীকে হাজির করেছেন যার দ্বীনদারী দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

আপনার কিন্তু বাজারের সব চকচকে পোশাক দেখে লাভ নেই, যে পোশাক আপনার দেহের সাথে সাইজে ভালো হয়, ফিটিং হয়-- সেটাই আপনি কিনে নেন। তেমনি, সস্তা সব পণ্যের মতন নারীদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না, বরং এমন এক মানুষের জন্যই অপেক্ষা করুন যে আপনার জীবনের জন্য, আপনার পারিবারিক জীবনের জন্য অসাধারণ হবে, আপনারা দু'জনে মিলে জান্নাতে যাওয়ার পথে জ্ঞানার্জন ও আমল করতে পারবেন।

'মেয়েবাজি' করা ছেলেদের জীবন কখনই সুখের হয় না

15 October 2014

লেখকঃ আগন্তুক (ছদ্মনাম)

কত মানুষ দেখলাম, একসময় হয়ত আহামরি 'ভালা ইশটুডেন' আছিলো না, অথবা তার 'ভালা চাক্রি' আছিলো না, কিন্তু চরিত্র ভালোই ছিলো। কলেজ-ভার্সিটিতে কিছু নারীদেহ নিয়া অশ্লীল শব্দ শিখলো, এরপর শিখলো শ্লীল-অশ্লীল মুভি দ্যাখা। রাস্তায় মেয়েদের কিছু শব্দ ছুঁড়ে দেয়, ক্লাসমেট মেয়েদের যেচে পড়ে 'ফ্লার্টিং করে' --যা তার অভ্যাস হয়ে গেলো। ফোনে আর ফেসবুকে পিরিতি করে চরিত্রটা দুর্গন্ধময় হয়। মোবাইলে অনেকগুলা মেয়েরে সময়ে অসময়ে ফোন দিয়া আলাপ করতো, মজা-টজা করতো, ওদের কয়েকটার সাথে পিরিতিও করলো।

একসময় সময় পেরিয়ে গেলো ৫-৬ বছর। ছেলের ভালো চাকরি হলো, টাকা হলো। তবু স্বভাবটা আগের মতই 'মেয়েবাজ'। বিয়েও হলো, মেয়েটার ক্যারিয়ার বেশ ভালো, সরকারি মেডিকেলের ছাত্রী। শুধু মাঝে মাঝে একটু বেশি গল্প করে এখানে ওখানে। পারিবারিক অশান্তির কারণে দু'জন দু'জনের কুৎসা ছড়িয়ে বেড়ালো ফ্রেন্ড সার্কেলে। স্ত্রীর 'সমস্যার' কথা বলে মেয়েটির বান্ধবীদের কারো কারো সাথে সহানুভূতি নিতে গিয়ে ছেলেটি 'মেয়েবাজি' করতে চেয়েছে এমন গল্পও ওদের 'সার্কেলে' প্রচলিত হয়ে যায়। মেয়েটিও তার হাজব্যান্ড নিয়ে অশান্তির কথা ছড়িয়েছে চারপাশে। ফ্রেন্ডরা তাদের কোন্দল উপভোগ করতে করতে এই যুগলকে মুখরোচক গল্পে পরিণত করেছিলো বলেই মনে হচ্ছিলো। একসময় ভেঙ্গে গেলো বিয়ে। আজো ওরা ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয় এলোমেলো। এই ধাক্কা সুস্থভাবে সামলাতে পারে না কেউ আল্লাহর স্মরণ হৃদয়ে না রেখে, ওরাও এমনই। ফেসবুকে ওদের টাইমলাইনে ঘুরতে গেলে ঘাম দিয়ে অশান্তি লাগে। কীসের-সাথে-কী, কী-না-কী বলতেই থাকে...

একটা সুন্দর চরিত্রের মতন দামী কিছু নেই। সুন্দর চরিত্রের পেছনে কাজ করে সবর বা ধৈর্য। যে ছেলেটির আলাপ করছিলাম সে একজন ইঞ্জিনিয়ার। স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পড়ার সময় জগতের আর অর্ধেক পুরুষের মতই আবেগ সামলাতে কষ্টবোধ করছিলো। কিন্তু তার সবই 'আউটপুট' ছিলো নোঙরামি। সঠিক পথে না গিয়ে যতই বাজে পথে গিয়েছে, তার জীবন ততই বেশি জটিল হয়েছে। একপর্যায়ে তার ইজ্জত-সম্মান জিল্লতিতে ভরে যায়, সংসার ভেঙ্গে যায়। আগামীতে হয়ত সে এভাবেই এলোমেলো আচরণেই বেঁচে থাকবে। নিজে যেমন খারাপ কাজ করতো, নিজেকে যেমন প্রশ্রয় দিতো, আল্লাহ তাকে তার জীবনসঙ্গীটাও তেমন জুটিয়েছিলো। পারিবারিক অশান্তি তার ব্যক্তিত্ব ও সম্মানকেও নষ্ট করে দিয়েছে। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে ছেলেমেয়েরা তাদের আবেগকে যদি একটু বাঁধ দিয়ে রাখে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়, আল্লাহ তাদের কল্পনাতীত উপায়ে সুন্দর সঙ্গী এনে দিবেন যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

সুন্দর চরিত্র অর্জন করার কষ্টকর, কিন্তু আল্লাহর খুব পছন্দের জিনিস সেটা। প্রচলিত ছেলেদের মেয়ে ফ্রেন্ডস আর মেয়েদের ছেলে ফ্রেন্ডস থাকার এই নষ্ট সংস্কৃতিতে ডুবে যায় সবাই অল্প-কয়েকটা বছর। অথচ এটাই তাদের কাল হয়, তাদের অশান্তি আর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফ্রেন্ডস থেকে ক্রাশ, রিলেশন, ব্রেকাপ, এনিমি সাইকেলে ঘুরতে থাকে সবকিছু।

আমাদের চারপাশে বিষয়গুলো আমাদের জন্য শিক্ষা বহন করে। চোখে ভয়াবহ উদাহরণ দেখলে বুঝবেন এটাকে এড়িয়ে যেতে আল্লাহ আপনাকে শেখাচ্ছেন। মানব জীবনের এক অসীম নিয়ামত হচ্ছে সবর বা ধৈর্য। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সবর করার তাওফিক দান করেন। দেরি হলেও একসময় প্রতীক্ষিত জিনিসটা অর্জন হয়, ছেলেদের ক্ষেত্রে উত্তম রিযিকও তেমনি। কিন্তু যখন অর্জন হলো তখন ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে জীবনের সৌন্দর্য নষ্ট হয় অনেক বোকা ছেলেদের। বোকা হওয়া এইসব হতভাগাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ আমাদের ভাইবোনদের হেফাজত করুন।

লজ্জাস্থানের ও দৃষ্টির-মুখের-কানের হেফাজত করে যেন মুসলিম সমাজের সবাই জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে পারে, আল্লাহর কাছে এই দু'আ করি। আল্লাহকে ফাঁকি দেয়ার কোন সুযোগ আমাদের নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাশীলতাকে পছন্দ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন, দেখেন, শোনেন। আল্লাহর কাছে করা দোয়া বিফল হয় না, কখনই না।

নারীকে ব্যবহার করে শয়তানের তৈরি একটি ফাঁদ এবং একটি সত্য কাহিনী এবং কিছু শিক্ষা

28 July 2015

বারসিসা বনী-ইসরাইলের একজন সুখ্যাত উপাসক, ধর্মযাজক ও ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল। সে ঈসা (আঃ) এর উম্মাত ছিল। সে উপাসনালয়ে একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আল্লাহর উপসনায় নিয়োজিত রাখত। তার সময়ে বনী-ইসরাইল জাতির মধ্যে তিন ভাই সিদ্ধান্ত নিল যে তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। কিন্তু তাদের একটি বোন ছিল এবং তারা ভেবে পাচ্ছিলো না যে বোনটিকে তারা কার নিকট রেখে যাবে। লোকজন বলল যে বারসিসা খুব ভালো এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, সে এই দায়িত্ব বিশ্বাসের সাথে খুব ভালোভাবে পালন করতে পারবে। সুতরাং লোকজনদের পরামর্শ অনুযায়ী সেই তিন ভাই বারসিসার নিকট গেল। তারা গিয়ে বারসিসাকে বলল যে তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যেতে চায়, এখন তাদের বোনটিকে কি সে দেখে রাখতে পারবে, মন্দ লোকের থেকে আর তার যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে কি না। এর উত্তরে বারসিসা বলল যে সে তাদের কাছে থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং তারা যেন তার কাছে থেকে চলে যায়।

কিছু সময় পর তার মনে হল, মূলত শয়তান এসে তাকে বলল যে (বাস্তবে নয় মনে কুমন্ত্রণা) "তুমি এত সৎ ব্যক্তি, তুমি যেহেতু মেয়েটিকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিলে না, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো মন্দ ব্যক্তি মেয়েটির দায়িত্ব নেবে আর এর পরের ব্যাপারটি কি হবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো, এই অসহায় মেয়েটিকে আশ্রয় দেয়ার মত ভালো কাজ তুমি ছেড়ে দিতে পারো না।"

এর কিছু সময় পর বারসিসা সেই তিন ভাইকে ডেকে বলল যে তাদের কথা সে রাখতে পারে তবে তাদের বোন তার ধারেকাছেও থাকতে পারবে না, উপাসনালয়ের কাছেও না; অদূরেই তার একটি পুরোনো বাড়ি আছে সেখানে রাখতে যদি তাদের কোনো আপত্তি না থাকে তবে। ভাইয়েরা শর্তে রাজি হয়ে বোনকে বারসিসার দায়িত্বে রেখে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে চলে গেল। আর মেয়েটি সেই পুরোনো বাড়িতে আশ্রয় নিলো।

বারসিসা প্রতিদিন তার উপাসনালয়ের দরজার সামনে মেয়েটির জন্য খাবার রেখে দিত। সে মেয়েটিকে খাবার পর্যন্ত দিয়ে আসত না। মেয়েটিকে প্রতিদিন কিছুদূর পথ পেরিয়ে উপাসনালয়ের দরজার সামনে থেকে খাবার নিয়ে যেতে হত। বারসিসা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখত না। এরকম কিছুদিন যাওয়ার পর তার মনে হল, মূলত শয়তান এসে তাকে বলল যে (বাস্তবে নয় মনে কুমন্ত্রণা) এতটুকু হেঁটে আসতে এই অসহায় মেয়েটির অবশ্যই কষ্ট হয়, তাছাড়া দুষ্ট লোকের নজর তার দিকে পড়ে। সুতরাং তার উচিত হবে মেয়েটির খাবার তার আশ্রয়স্থলে গিয়ে দিয়ে আসা। এরপর থেকে বারসিসা মেয়েটির আশ্রয়স্থলে গিয়ে প্রতিদিন দরজার সামনে খাবার রেখে আসত।

কিছুদিন পর শয়তান এসে আবার বারসিসাকে বলল, মূলত তার মনে হল যে দরজা থেকে খাবার নেয়ার সময় মন্দ লোকের নজর মেয়েটির উপর পড়তে পারে, তাই তার উচিত হবে খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে আসা। এরপর থেকে বারসিসা মেয়েটির ঘরে খাবার দিয়ে আসত এবং এক মূহুর্তও অপেক্ষা করত না। এভাবে কিছুদিন গেল। আর এইদিকে সেই তিন ভাই জিহাদে ব্যস্ত থাকায় তাদের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছিল। এমতবাস্থায় শয়তান আবার বারসিসার কাছে, মূলত তার চিন্তায় এসে বলল যে সে যে মেয়েটি একা একা রাখছে এতে মেয়েটির হয়ত খারাপ লাগছে, তার তো আপন কেউ কাছে নেই, সে কোথাও বেরও হতে পারে না, কারো সাথে কথাও বলতে পারে না, ঠিক যেন জেলখানায় বন্দী হয়ে আছে। কথা বলার জন্য একটা মানুষ পর্যন্ত নেই, সে কোনো মেয়েটির এই দায়িত্বটি নিচ্ছে না; একটু সামাজিকতা, সুখ-দুঃখের কথা বলা। আর তা না হলে হয়ত পরে দেখা যাবে মেয়েটি বিরক্ত হয়ে ভুল পথে চলে যেতে পারে, পর কোনো পুরুষের সংস্পর্শে চলে আসতে পারে। সেই সময় শয়তান বারসিসার মনে উপস্থিত হল। সে ভাবলো খাবার যখন দিয়েই আসছি, কিছু সৌজন্যমূলক কথা-বার্তা বলাই যেতে পারে তবে তা ঘরের ভিতরে না হয়ে ঘরের বহিরে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। এরপর তারা এভাবে চিৎকার করে সামান্য কিছু কুশল বিনিময় করা শুরু করল। এভাবে কিছুদিন চলল। এরপর শয়তান আবার তার মনে উদয় হল এবং বলল যে এত কঠিন করে কি বা দরকার, শুধু শুধু কষ্ট করে চিৎকার করে করে, ব্যাপারটি সহজ করে নিলেই তো হয়। ঘরে বসেই তো মেয়েটির সাথে কথা বলা যায়, কথা যখন বলা হচ্ছেই।

এরপর থেকে সেই সুখ্যাত, ধার্মিক ব্যক্তি বারসিসা সেই মেয়েটি সাথে একটি ঘরে কথা-বার্তা বলে সময় ব্যয় করতে থাকল। দিন দিন মেয়েটি সাথে তার সময়ক্ষেপনের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকল। একটা সময় বারসিসা মেয়েটির সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতে লাগল আর ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে থাকল। বারসিসা মূলত সেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। এমন একটা সময় উপস্থিত হল যে সেই সৎ, ধার্মিক বারসিসা মেয়েটির সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হল, ফলে মেয়েটি অন্তঃসত্বা হয়ে পড়ল।

মেয়েটি একটি সন্তানের জন্ম দিল। আবার সেই শয়তান বারসিসার মনে উদয় হল। কি সর্বনাশ! এ কি করেছে বারসিসা! এত সৎ, ধার্মিক, বিশ্বাসী একজন লোক সে। মানুষজন কত ভালো মানুষ হিসেবে জানে তাকে। মেয়েটির ভাইয়েরা ফিরে আসলে তার কি হবে, তারা তার কি অবস্থাই না করবে। তারা তাকে হত্যা করবে, এমন কি সে যদি কাজটি অস্বীকারও কারে, তবুও দায়িত্বে তো সে ই ছিল। আর তখন তাকেই সব কিছুর দায়ভার গ্রহণ করতে হবে। শয়তান তখন তাকে ওয়াসওয়াসা দিল যে উপায় একটাই, এই বাচ্চাটিকে মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। তখন বারসিসার মনে হল যে শুধু বাচ্চাটিকে মেরে ফেললেই কি হবে, মেয়েটি অর্থাৎ বাচ্চাটির মা কি বলে দেবে না সন্তান হত্যা সহ বাকি সব। শয়তান তখন বারসিসাকে বলল যে সে কোনো যে এত বোকা! মেয়েটি অবশ্যই ব্যাপারটি গোপন রাখবে না, সে সবাইকে বলে দেবে। বারসিসা দিশেহারা হয়ে পড়ল, সে এখন কি করবে! শয়তান তখন তকে কুমন্ত্রণা দিল যা এতদিন ধরে ধরাবাহিকভাবে মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে দিয়ে আসছিল যে বারসিসার উচিত তাদের দু'জনকেই অর্থাৎ সন্তান সহ মা কে হত্যা করে তাদের মাটির নিচে পুঁতে ফেলা। বারসিসা ঠিক সেই কাজটিই করল এবং তাদের দু'জনকে সেই বাড়ির নিচে মাটিতে পুঁতে ফেলল।

কিছুদিন পর মেয়েটির তিন ভাই জিহাদ থেকে ফিরে আসল। তারা বারসিসার কাছে তাদের বোনকে নিতে আসল। বারসিসা তাদের বলল যে 'আল্লাহর কাছ থেকেই আসে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়!' তোমাদের বোন তো অসুখে মৃত্যু বরণ করেছে। তারপর সে তিন ভাইকে মনগড়া একটি স্থান দেখিয়ে বলল যে সেখানে তাদের বোনকে কবর দেয়া হয়েছে। তখন ওই তিন ভাইও বলল যে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসে আবার আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়'। তারা তাদের বোনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তাদের ঘরে ফিরে গেল।

রাতের বেলা তিন ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই স্বপ্ন দেখলো। মূলত স্বপ্নে তার কাছে এসেছিল সেই কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তান। শয়তন স্বপ্নে তাকে বলল যে সে কি বারসিসার কথা বিশ্বাস করে, বারসিসা তো মিথ্যা বলেছে। বারসিসা তাদের বোনের সাথে অসৎ কাজ করেছে, সন্তান সহ তাকে হত্যা করে, সেই আশ্রিত ঘরের মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছে।

পরদিন সকালে সেই ভাইটি স্বপ্নের কথা বাকি দুই ভাইকে জানালো। তারা বলল যে তারাও না কি ঠিক একই স্বপ্ন দেখেছে! নিশ্চয়ই এখানে একটা কিন্তু আছে, তিন ভাইয়েরা ভাবলো। তারা গিয়ে বারসিসার দেখানে সেই মিথ্যা কবরটি খুঁড়ল কিন্তু কিছুই পেল না। এরপর তারা সেই আশ্রিত বাড়িতে গিয়ে মাটি খুঁড়ল এবং তারা দেখলো যে তাদের বোনের পঁচে যাওয়া মৃত দেহ এবং তার পাশে একটা শিশু!

তারা বারসিসাকে গিয়ে ধরলো। তার বলল যে মিথ্যুক, প্রতারক, ভন্ড! কেনো সে এমন করল আর কি দোষে তাদের বোনকে হত্যা করা হল। তারা বারসিসাকে টেনে-হিঁচড়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। বরসিসাকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়া হল।

এবার আবারও শয়তান আসলো বারসিসার কাছে। এবার কিন্তু সে মনের ওয়াসওয়াসা হিসেবে আসে নি। এবার সে সরাসরিই এসেছে আরো অনেক বড় ধোঁকা দিতে, পূর্ণ শক্তি নিয়ে। চূড়ান্ত এবং চরম ধোঁকা দিতে শয়তান মানুষের রূপে বারসিসার নিকট এসে বলল যে সে কি জানে সে কে, সে হল স্বয়ং শয়তান যে কি না তাকে এত ঝামেলার মধ্যে ফেলেছে। সুতরাং সমস্যা সৃষ্টি করেছে সে, তাই সমাধানও একমাত্র সে ই জানে! এখন বারসিসার সিদ্ধান্ত যে সে কি মৃত্যুদন্ড পেতে চায় না কি শয়তানের সমাধান অনুযায়ী বাঁচতে চায় কেননা এই চরমতম মূহুর্তে শয়তানই পারে তাকে সমাধান দিতে। বারসিসা শয়তানকে বলল যে তাকে বাঁচাতে! শয়তান বারসিসাকে বলল যে সিজদাহ কর যে তোমাকে হুকুম দিচ্ছে এখন। বারসিসা শয়তানকে সিজদাহ করল!

এরপর শয়তান বারসিসাকে বলল, *"তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ! তোমার সাথে দেখা হয়ে আমার খুব ভালো লাগলো, আমি একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা লাভ করলাম।"*

এরপর আর কখনওই বারসিসা শয়তানকে দেখতে পেল না আর এটাই ছিল বারসিসার জীবনের শেষ কাজ। কারণ এর কিছুক্ষণ পরই বারসিসার মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছিল। অর্থাৎ তার জীবনের শেষ কাজটি ছিল একটি শিরক। শয়তানকে সিজদাহ করাটা ছিল শিরক। জীবন বাঁচানোর তাগিদে, পৃথিবীর মায়ায় সে শয়তনকে অন্তিম মূহুর্তেও বিশ্বাস করে তাকে সিজদাহ করেছিল কিন্তু শয়তান তো তাকে বাঁচায় নি। অথচ সে ছিল একজন সরল পথের হিদায়াহ্ প্রাপ্ত সৎ একজন উপাসক! যেহেতু সে একটা সময় ভেবেছিল যে কিছু জিনিস দ্বীন তথা জীবন-ব্যবস্থা তথা আদর্শ থেকে বাদ দিলে কি এমন ক্ষতি হয় এবং সে শয়তানের ছোট ছোট ধোঁকাগুলোকে এড়িয়ে চলতে পারে নি বরং প্রশ্রয় দিয়েছিল। একটা একটা ধাপ সে পেরিয়ে যাচ্ছিল। শয়তান তার প্রতি ধোঁকার মাত্রাটা দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছিল আর তাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। সে যেহেতু নিজের ভাবনাকেই প্রাধান্য দিচ্ছিল এবং সে যে এক আল্লাহর উপাসনা করত, তার কথার সাথে নিজের ভাবনা মিলিয়ে দেখে নি, দেখার চিন্তা করে নি আর সেই সুযোগটা শয়তান নিয়েছিল। সে শয়তানের কাছ থেকেই সমাধান নিত, পরমর্শ নিত অথচ তার মনে হত এটাই তো যৌক্তিক আর এটাই তো বিবেক, এটাই তো ভালো কাজ আর এটাই তো মানবতা! সে ক্রমেই শয়তানের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছিল। তার ফেরার সুযোগ ছিল তার আত্মবিশ্লেষণ করে, তার চিন্তাকে তার এক আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলার মাধ্যমে।

বারসিসা মূলত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। সে ভাবতো সে তো হিদায়াহ্ প্রাপ্ত, সে তো সৎ। সে কখনোই চিন্তা করে নি যে শয়তান তাকে ধোঁকা দিতে পারবে। তবুও তার পরিস্থিতিকে পুঁজি করে শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়েছে। শয়তান প্রথমেই এসে তাকে বলে নি যে, ***'সিজদাহ কর আমাকে!'*** শয়তান মূলত তার ভালো কাজ করার মানসিকতাকেই কাজে লাগিয়েছে। একটি অসহায় মেয়েকে আশ্রয় দেয়ার মত ভালো কাজ করার মন্ত্রণা শয়তানই দিয়েছিল। মেয়েটির কষ্ট লাঘবের জন্য তার ঘরে গিয়ে খাবার দিয়ে আসার মত ভালো কাজে তো শয়তানই উৎসাহ দিচ্ছিল। সে পরে তার কার্যক্রম নিয়ে পর্যালোচনা করত না যে তার আল্লাহ এ ব্যাপারে কি আদেশ দেয়। সে ভাবতো যে সে তো সৎ আর সৎই থাকবে।

আর এই ছাড় দেয়ার বিষয়গুলো হয়েছিল তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে। তার মনের প্রবৃত্তিগুলো, নারীর প্রতি আকর্ষণগুলো তার কাছে ভালো কাজ বলেই তো মনে হচ্ছিল, মূলত শয়তানই নারীর প্রতি প্রবৃত্তিগুলোকে ভালো কাজের মোড়কে প্রক্রিয়া করে তার কাছে উপস্থাপন করছিল আর সে ভাবছিল যে আরে এটাই তো যৌক্তিক আর এটাই তো শিক্ষা অসহায় মানুষকে সেবা করার! শয়তান তাকে মেয়েটির যথাসম্ভব কাছে নিয়ে গিয়েছিল আর সে নিজেকে রক্ষা করা জন্য কোনো ব্যবস্থাই নেয় নি অর্থাৎ আল্লাহ যে ভাবে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন, তা সে করে নি কিন্তু অনেকটা এরকম পরিস্থিতইতে ইউসুফ (আ) আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

আল্লাহর সৃষ্টি নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণকে, প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে শয়তান এত দিনের ছোট-ছোট ধোঁকার ফলাফলে বারসিসাকে ব্যাভিচারের মত অনেক বড় গুনাহে লিপ্ত করে ফেলল। এরপরও বারসিসার পথ ছিল। সে তার আল্লাহর বিধানে ফিরে যেতে পারত। বৈধভাবে গ্রহণের পথ তখনও ছিল অথচ সে তা করল না। সে এতদিন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছিল আর এই বড় গুনাহের পরে সে লোক-লজ্জার ভয় করতে থাকল, জীবনের ভয় করতে থাকল। ঈমানের চেয়ে তখন তার লোক-লজ্জা আর জীবনই বড় হয়ে গেল। আর এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে শয়তান তাকে দিয়ে আরো বড় বড় দুইটি গুনাহ করিয়ে নিলো। সন্তান ও অসহায় নারীকে হত্যার মত বড় গুনাহ করিয়ে নিলো। এরপরও তার ঈমান বাঁচানোর পথ ছিল, আল্লাহর বিধানে ফিরে যাওয়ার পথ ছিল অথচ সে তার জীবনকেই সব থেকে বেশি মূল্য দিচ্ছিল। কারণ সে তার আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, সে তা থেকে সমাধান খোঁজে নি!

অন্তিম মূহুর্তে শয়তান তার আসল এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নের জন্য আসলো। সে তার ঈমানকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে আসলো। শয়তান নিজেকে সিজদাহ করতে আহবানের মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি ঈমানহারা অবিশ্বাসী তথা কাফির বানাতে আসলো। অথচ তখনও বারসিসার সুযোগ ছিল পরামর্শদাতা হিসেবে শয়তানকে অবিশ্বাস করা এবং তার আল্লাহর বিধান কে গ্রহণ করা যেই এক আল্লাহর উপাসনা সে করত। অথচ জীবনের মায়ায়, আপাত বাস্তবতার তাগিদে সে শেষ বারের মতও শয়তানের মত প্রকাশ্য শত্রু এবং অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করে বসলো এবং শয়তানকে সিজদাহ করে শেষ বারের মত ঈমানের পরীক্ষায় ঈমান শয়তানের নিকট খুঁইয়ে বসলো। একজন অবিশ্বাসী কাফির অবস্থায় শিরকের মত গুনাহ করে বারসিসার মৃত্যুবরণ করে নিতে হল। আর আমরা জানি যে ঈমানহারা তথা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার মানে হল, অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি হওয়া।

শয়তান বারসিসার সাথে যেই নীতিটি অনুসরণ করলো তা হল, বারসিসসার ঈমানের ত্রুটিটিকে পুঁজি করে তাকে ভালো কাজে উৎসাহ দিতে থাকলো। এভাবে সে বারসিসাকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল এবং একটা সময় সে পিছন থেকে তাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিল। বারসিসার এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অথবা অভিজ্ঞতা ছিল না। আল্লাহই মূলত তার ঈমানকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। বারসিসা কিন্তু প্রথম অবস্থায় মেয়েটির দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল, কেননা তার এই জ্ঞান ছিল যে এই দায়িত্বভার এবং নারী তাকে ফিতনায় ফেলে দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তার ঈমানকে অবশ্যই পরীক্ষা করলেন। সে ফিতনায় পড়ে গেল অথচ আল্লাহ নিকট সাহায্য আর চাইলো না, সাহায্য চাইলো অভিশপ্ত শয়তানের কাছে এবং এতেই সে আল্লাহর নেয়া ঈমানের পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে অকৃতকার্য হয়ে গেল।

অনুবাদঃ সংগৃহীত Sajid Ibn Sayed Mazhar ভাই

ঘটনা থেকে শিক্ষা:

১) শয়তান কখনোই আপনাকে সরাসরি এসে পাপ করতে বলবে না। সে সব সময়ই আপনাকে ভালো ভালো কারণ দেখিয়ে ধোঁকায় ফেলবে, এবং শয়তান আমাদের যে কারো চাইতেই বেশী ধৈর্য্যশীল। কাজেই আমরা সবসময়ই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবো শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

২) কখনোই ভাববেন না যে আপনার অনেক জ্ঞান আছে, বিচার-বুদ্ধি আছে, শয়তান কিছুতেই আপনাকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না। বরং, প্রকৃত জ্ঞানীরা শয়তানের ফাঁদে পড়ার ভয় সবচাইতে বেশী করে। এই কারণেই আপনি দেখবেন আলেমদের তাকওয়া (আল্লাহভীতি) সবচাইতে বেশী।

৩) কাহিনীটা নিয়ে চিন্তা করুন। শয়তান যদি প্রথমেই এসে বারসিসাকে বলত – 'আমাকে সিজদা কর' – বারসিসা কখনোই তা করতো না। কিন্তু শয়তান তার পরিকল্পনা মাফিক ধীরে ধীরে একটার পর একটা ছোট ছোট ধাপে বারসিসাকে দিয়ে ভুল করিয়ে অবশেষে তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে জীবন রক্ষার তাগিদে সে অবশেষে শিরক করে ফেলে, যে পাপ আল্লাহ কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

৪) শেষ কথা, আল্লাহ যা করতে আমাদের নিষেধ করেছেন, তা থেকে আমরা বিরত থাকবো। নিজে থেকে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করব না যে – এটা করলে কি হয়? এ আর এমন কি? আল্লাহ নিষেধ করলে কি হবে দেখতে তো মনে হয় এটা একটা ভালো কাজ! এটা তো ছোট্ট একটা পাপ!

না, আল্লাহর যে কোন অবাধ্যতাই পাপের পথে নিয়ে যায়, আপাতদৃষ্টিতে পাপটা যত ছোটই হোক না কেন, ছোট পাপই বড় পাপের দিকে টানে, বড় পাপ টানে কুফরীর দিকে।

বর্তমানের তরুণ-তরুণীদের তথাকথিত "রিলেশনশিপ" শয়তানের এই কাজকে আরও সহজ করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ সকলকে শয়তানের ধোঁকা থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

[মূলঃ শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি(রহিমাহুল্লাহ) এর লেকচার থেকে]

রেফারেন্স:

পবিত্র কুরআনের বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর ইবনে কাসিরে সূরা হাশরের ১৬-১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

বনি ইসরায়েলের বারসিসা এবং আমাদের গল্প...

এই ইসলামটুকু আমরা কবে বুঝব? কবে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করব??

21 October 2014

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যার হাতে আমার প্রাণ। সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর। আল্লাহ এই লেখায় আমার ইখলাসকে শুদ্ধ করে দিন। বিতাড়িত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সবার উপলব্ধিতে বরকত দান করুন।

বারসিসার এই কাহিনী হয়ত অনেকেই শুনেছেন। বারসিসাছিল বনী ঈসরাইলের একজন সুখ্যাত উপাসক, ধর্মযাজক,'আবিদ'। তার নিজেরমন্দির ছিল আর সেখানে সে একাগ্রভাবে নিজেকে উপাসনায় নিয়োগ করত। বনী ঈসরাইলের তিনজনপুরুষ জিহাদে যেতে চাচ্ছিল, তাদের একমাত্র বোনকে কোথায় রেখে যাবে বুঝতে পারছিল না। তারা সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'কোথায় আমরা আমাদের বোনকে রেখে যেতে পারি? তাকে তোআমরা একা ফেলে যেতে পারিনা। কোথায় তাকে রেখে যাওয়া যায়?' তখন তারা তাদেরকে বলল, 'তাকেরেখে যাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হবে তাকে ঐ উপাসকের কাছে রেখে যাওয়া, সেই-ই সবচেয়েধার্মিক ব্যক্তি, আর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। তোমাদের বোনকে তার কাছে রেখে যাও, সে তারখেয়াল রাখবে'।তারা আবিদের নিকট গেল। তাকে সব বর্ণনা করে বলল, 'এই হল অবস্থা

– আমরা জিহাদে যেতে চাই,আপনি কি কষ্ট করে আমাদের বোনকে দেখে রাখতে পারবেন?' সে বলল, 'আমি তোমাদের থেকে আল্লাহরকাছে আশ্রয় চাই। আমার কাছ থেকে চলে যাও'। তখন শয়তান তাকে প্রলুব্ধ করল, 'তুমিতাকে কার কাছে রেখে আসবে? তুমি যদি তার খেয়াল না রাখো তাহলে হয়ত কোন দুষ্ট লোক তারখেয়াল রাখবে, আর তারপর তো তুমি জানোই কী ঘটবে! তুমি কি করে এই ভাল কাজটা তোমার হাতছাড়াকরে দিতে পার?'

দেখুন ! শয়তান তাকে ভাল কাজে উৎসাহিত করছে! তোসে তাদেরকে আবার ডেকে এনে বলল, 'ঠিক আছে, আমি তার খেয়াল রাখব, কিন্তু সে আমার সাথেআমার মন্দিরে থাকতে পারবে না, আমার আরেকটা বাড়ি আছে সে সেই ঘরে থাকবে'। সে মেয়েটিকেবলল, 'তুমি ওখানে থাক, আমি আমার মন্দিরে থাকব'। তো মেয়েটাসেই বাড়িতে একটা ঘরে থাকত, আর সেই ধর্মযাজক তার জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে এসে তার নিজেরদরজার বাইরে রেখে দিত। সে মেয়েটির বাড়িতে পর্যন্ত যেত না, নিজের দরজার বাইরেই খাবাররেখে দিত আর মেয়েটিকে ঘর থেকে বের হয়ে এসে খাবার নিয়ে যেতে হত; সে মেয়েটির দিতে তাকিয়েদেখতে পর্যন্ত ও চাইত না। তখন শয়তান আবার তার কাছে এসে বলল, 'তুমি করছটা কি? তুমি কিজানো না মেয়েটা যখন তার ঘর থেকে বের হবে আর তোমার মন্দির পর্যন্ত আসবে লোকে তাকে দেখতেপাবে? তোমার উচিত তার দরজায় যেয়ে খাবারটা রেখে আসা।' সে বলল,'হ্যাঁ, আসলেই'।

শয়তান কিন্তু তার সাথে সামনা–সামনি কথা বলছেনা,তাকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। ধর্মযাজক 'আবিদ তাই এবার খাবার নিয়ে মেয়েটিরদরজা পর্যন্ত রেখে আসতে শুরু করল। এভাবে কিছুদিন চলল, এরপর শয়তান তাকে বলল, 'মেয়েটাএখনও তার দরজা খুলছে আর বাইরে বের হয়ে আসছে প্লেট নেয়ার জন্য, কেউ তাকে দেখে ফেলতেপারে, তোমার উচিত প্লেটটা তার ঘরে গিয়ে দিয়ে আসা'। শয়তান কিনাতাকে বলছে আরো ভাল কাজ করতে! তাই সে খাবারের প্লেটটা ঘরে রাখা আরম্ভ করল, সেখানে রেখেইসে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত। এভাবে আরো কিছুদিন পার হলো। আর ওদিকে জিহাদ চলতে থাকায় ভাইদেরফিরে আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। শয়তান আবারো তার কাছে আসল, বলল, 'আচ্ছা, তুমি তাকে এভাবেএকা ছেড়ে দিবে, কেউ তো নেই যে তার দিকে একটু খেয়াল রাখবে, একটু কথা বলবে। সে যেন জেলখানায়আবদ্ধ হয়ে আছে, কথা বলার কেউ নেই। তুমি কেন ওর দায়িত্ব নিচ্ছ না? ওর সাথে একটু সামাজিকতাবজায় রেখে তো চলতে পার, যেয়ে একটু কথা বলো যাতে করে তুমি তার খোঁজখবর রাখতে পারো। তানাহলে দেখা যাবে সে বাইরে যেয়ে কোন পরপুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়বে'। তাই সে মেয়েটিরসাথে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করল, মেয়েটা ঘরের মধ্য থেকেই কথা বলত; দুজনকেপ্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হতো যেন তারা একজন অন্য জনকে শুনতে পায়।

শয়তান এবার তাকে বলল, 'তুমি এরকম দূর থেকে একজনআরেকজনের উপর চিৎকার না করে কেন ব্যাপারটাকে নিজের জন্য আরেকটু সুবিধাজনক করে নিচ্ছনা? কেন তার সাথে একই ঘরে বসে কথা বলছ না?' তো এবার সে মেয়েটার সাথে একই ঘরে বসে কিছুসময় ব্যয় করতে শুরু করল। তারপর ধীরে ধীরে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা একসাথে কাটাতে লাগল,আর আস্তে আস্তে তারা পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসতে লাগল। এক সময় এমন হল

যখন সেই আবিদ,ধর্মযাজক,উপাসক সেই মেয়ের সাথে যিনায় (ব্যাভিচার) লিপ্ত হল। ফলে মেয়েটা অন্তসত্ত্বাহয়ে পড়ল।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। মেয়েটি একটি সন্তানেরজন্ম দিল। শয়তান ধর্মযাজকের কাছে এসে বলল, 'একি করেছ তুমি! তুমি কি জানো যখন ওর ভাইরাফিরে আসবে তখন কি হবে? তারা তোমাকে মেরে ফেলবে, এমনকি তুমি যদি এটাও বলো যে –"এটাআমার বাচ্চা না",তারা তোমাকে বলবে যে "তোমার বাচ্চা না হলেও তুমি তার দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলে, তাইএটা এখন তোমারই দায়ভার। বাচ্চার বাবা কে আমরা তার পরোয়া করি না, তুমিই এর জন্য দায়ী"। সুতরাং এখনএকটাই উপায়, তুমি বাচ্চাটাকে মেরে তাকে পুঁতে ফেল'। বারসিসাবলল, 'এটা কি গোপন থাকবে আমি তার ছেলেকে মেরে ফেলার পরে?' শয়তান বলল, 'তোমার কি মনেহয় ও এটাকে গোপনে রাখবে? তুমি যদি এরকম ভাব, তাহলে তুমি মস্ত বড় বোকা'। সে জিজ্ঞেসকরল, 'তাহলে আমি কি করব?'। শয়তান জবাব দিল, 'তোমার ঐ মেয়েটাকেও মেরে ফেলা উচিত'। তাই সে মেয়েটাকেআর বাচ্চাকে মেরে ফেলল, এরপর দুজনকে একই ঘরের নিচে কবর দিয়ে দিল।

ভাইয়েরা একসময় ফিরে আসল, তারপর জানতে চাইল,'আমাদের বোন কোথায়?', সে উত্তরে বলল, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, সেঅসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর মারা যায়, তাকে ওখানে কবর দেয়া হয়েছে' এই বলে সেমনগড়া একটা কবর দেখিয়ে দিল তাদেরকে। তারা বলে উঠল, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহিরাজি'উন', তারা বোনেরজন্য দু'আকরল, আর নিজেদের বাসায় ফিরে গেল।

রাতের বেলা, তিনজনের মাঝে এক ভাই একটা স্বপ্নদেখল, কে তার সেই স্বপ্নে এসেছিল? শয়তান, সে তাকে বলল, 'তুমি বারসিসা কে বিশ্বাস করো?তুমি কি তাকে বিশ্বাস করো? সে মিথ্যা বলেছে। সে তোমার বোনের সাথে ব্যাভিচার করেছে,তারপর তাকে আর তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আর এই কথার প্রমাণ হল সে তোমাদেরকে যেখানে সেকবর দেখিয়েছে তোমাদের বোন সেখানে নেই, আছে তার ঘরের পাথরের নিচে'। তার ঘুমভেঙ্গে গেল আর সে তার বাকি ভাইদেরকে স্বপ্নের কথা জানাল। তারা বলল, 'আমরাও তো একই স্বপ্নইদেখেছি, তাহলে এটা নিশ্চয়ই সত্যি'। পরদিন তারা সেই মিথ্যা কবরটা খুড়ল কিন্তুকিছুই পেল না, এরপর তারা তাদের বোনের ঘরে যেয়ে মাটি সরাল তখন দেখতে পেল তার বোনের মৃতদেহসাথে একটা শিশু। তারা যেয়ে বারসিসাকে ধরল, 'মিথ্যুক! এইসব করেছ তুমি?' তারা তাকে ধরেটেনে হিঁচড়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। এমন সময় শয়তান আসল বারসিসার কাছে, এবারে কিন্তু সেমনের ওয়াসওয়াসা হিসেবে আসেনি, সে আসল মানুষের রূপ ধরে। তাকে বলল, 'বারসিসা, তুমি কিজানো আমি কে? আমি শয়তান, আমিই সে, যে তোমাকে এতো ঝামেলার মধ্যে ফেলেছি। আর আমিই সেএকজন, যে তোমাকে এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারব। আমিই এসব ঘটনা ঘটিয়েছি আর আমারকাছেই আছে এসবের সমাধান। এখন তোমার উপর নির্ভর করে, তুমি যদি মরতে চাও তো ঠিক আছে।তুমি যদি চাও আমি তোমাকে রক্ষা করি, তাহলে আমি করতে পারি'। বারসিসাবলল, 'দয়া করে আমাকে বাঁচাও'। শয়তান বলল, "আমাকে সিজদাহ করো'। বারসিসাশয়তানের

প্রতি সিজদাহ করল। কিন্তু শয়তান কি বলল? সে বলল, ‘তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তোমারসাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল’এরপর সে তাকে আর কোনদিন দেখতে পেল না। বারসিসা শয়তানের উদ্দেশ্যে সিজদাহ করল, আর এটাইছিল তার জীবনে করা শেষ কাজ, কারণ এর কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। সুতরাং তার জীবনের শেষ কাজটা তাহলে ছিল- শয়তানকে সিজদাহ করা, সে ছিল সেই উপাসক যে কিনাছিল সরল পথের উপর, কিন্তু যেহেতু সে সেপথ থেকে বাঁক নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যদিওখুব খুব ছোট্ট একটা বাঁক, প্রথমদিকে যেটাকে একেবারেই তুচ্ছ মনে হচ্ছিল, একটু সুবিধারনামে, দ্বীনের মাসলাহার নামেই সে এগুলো করেছিল। সরলপথ থেকে তার বিচ্যুতির পরিমাপটাছিল একদমই নগণ্য কিন্তু দেখুন তার শেষ পরিণতি! নিজের ইচ্ছাকে অনুসরণ করার বিপত্তিটাএখানেই; আমরা আমাদের জ্ঞান, কুরআনের যতখানি জানি, আমাদের ইবাদত ইত্যাদি নিয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসীহয়ে যাই। সুবহান আল্লাহ! আমাদের তো সব সময় উচিত নিজেদের নিয়ে শঙ্কায় থাকা, আমরা কখনইঅতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হব না বরং আমাদের সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, আর এটাই হল আল্লাহ-ভীতি,এটাই সত্যিকার অর্থে ‘জ্ঞান’। আল্লাহ বলেন,

“আল্লাহরবান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে” (ফাতির ৩৫:২৮)।

আসুন এবার আমরা দেখি বারসিসার এই কাহিনী থেকেআমাদের জন্য কি কি রয়েছে।

১। ইমাম আওলাকি (রহঃ) তার hereafter সিরিজে মৃত্যুফিতনারকথা বলতে গিয়ে এই কাহিনী বর্ণনা করেন। খেয়াল করে দেখুন শয়তান বারসিসার সাথে কোন নীতিগ্রহণ করেছিল? যদি শয়তান বারসিসার কাছে এসে সরাসরি বলত, ‘আমাকে সিজদাহ করো’ বারসিসা কিকখনো তা করত? না, করত না। শয়তান step by step ‘ধাপে ধাপে’ মানুষকে দীনথেকে বিমুখ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। শয়তানেরকাজই হল এটা যে সে সারাজীবন আপনার আমার পেছনে লেগে থাকবে এবং তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যমানুষকে বিভ্রান্ত করা, ঈমান থেকে বিচ্যুত করে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত করা। সুবাহানাল্লাহ বারসিসার করুণ পরিণতি থেকে আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারি! এখানে ইমামআহমেদের মৃত্যুর সময়টার কথা বলা যেতে পারে। আবদুল্লাহ ইবন ইমাম আহমেদ বলেন, তার পিতাযখন অবচেতন পর্যায়ে পৌঁছে যান আর বলতে থাকেন, ‘লা বা’আদ, লা বা’আদ’ – ‘না এখনওনয়, না এখনও নয়’।একথা শুনে আবদুল্লাহ প্রচন্ড চিন্তিত বোধ করলেন! চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি আপনারবাবাকে তার মৃত্যুকালীন সময়ে বলতে শুনেন, ‘না এখনও না, না এখনও না’, আপনি কিভাবেএটাকে ব্যাখ্যা করবেন? এটার অর্থ কী বলে আপনার কাছে মনে হবে? ‘না এখনও না, আমি এখনওমরতে চাইনা’এমনই মনে হওয়ার কথা, তাইনা?

তো ইমাম আহমেদ জেগে উঠলে, আবদুল্লাহ উদ্বিগ্নহয়ে পিতাকে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আমার পিতা, কেন আপনি বলছিলেন – “এখনও না, এখনও না” ?’ ইমাম আহমেদবললেন, “শয়তান আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে তার অঙ্গুলি কামড়ে বলছিল, “হে আহমেদ, তুমিতো আমার হাত ফসকে বের হয়ে গেলে, হে আহমেদ, তুমি তো আমার হাত ফসকে বের হয়ে গেলে” !’ তাই আমিতাকে বলছিলাম, ‘না, এখনও না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি মারা যাচ্ছি। তোমার আর আমার যুদ্ধএখনও চলছে, যখন আমি মারা যাব, একমাত্র তখনই আমি তোমার হাত থেকে রক্ষা পাব।”

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, ‘এরকম হওয়ার কারণটাহলো এই যে, শয়তান বুঝতে পারে আপনার সাথে এটাই তার শেষ সুযোগ, যদি এবার আপনি তার হাতথেকে ছুটে যান তো আপনি চিরকালের জন্যই তার কাছ থেকে পার পেয়ে গেলেন। শেষ সময়ে আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে না পারার অর্থ সেআপনাকে আর ধরতে পারল না। এজন্যই শয়তান আপনার জীবনের শেষ সময়ের দিকে বিশেষ নজর দেয় আরআপনার বিরুদ্ধে তার কাজকে আরো জোরদার করে তুলে।’ সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদের উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুণ যে শয়তান আমাদের পেছনে কি পরিমাণ পরিশ্রমকরে যাচ্ছে শুধু আমাদের পথভ্রষ্ট করে মৃত্যুমুখে পতিত করার জন্য। আল্লাহ আমাদের উপররহম করুণ, আমীন।

২। খালি চোখে বারসিসার কাহিনী থেকে যে শিক্ষাটাআমাদের প্রথমে মনে আসে সেটা হল **“নারী ফিতনা”।** নারী ফিতনারপ্রকটতা বুঝতে হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কেন রাসুল (সঃ) বলে গেছেন, “আমি আমার উম্মতেরজন্য নারীর চেয়ে অধিক বড় কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না”। রাসুল (সঃ) বলেছেন, ‘যখন দুইজন নারী পুরুষ একাকী অবস্থান করে তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবেশয়তান অবস্থান করে”।শুধু তাই নয় স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **“মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে(নারীদের প্রতি)”। [সূরা নিসাঃ ২৮]** যখন এখানে নারীদের প্রতি দুর্বলতার কথা বলা হয়েছেএটা বলা হয় তখন নলেজেবল ভাই বোনেরাও অবাক হন! কিন্তু তাফসীরে নারীর প্রতি দুর্বলতারকথাই বলা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহর রাহে যুদ্ধকরা থেকে যেসব বিষয় মানুষকে বিরত রেখেছে তার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, **“মানবকূলকেমোহগ্রস্ত করেছে নারী...”। [সূরা আলে ইমরানঃ১৪]।** সুবাহানাল্লাহ! আমরা যারা নিজেদের ইসলামপন্থী বলে পরিচয় দিই, ইসলামের খাতিরে ফেসবুক,ব্লগ কিংবা ভার্চুয়াল জগতে দাওয়া দিয়ে বেড়ায় খুবই দুঃখজনক সত্যি এই যে নারী ফিতনারএই হাদিস আর কুরানের আয়াতগুলো কখনো আমাদের মনে থাকেনা কিংবা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমরাজানিই না! দেদারছে ছেলে মেয়ে মাখামাখি, হাসি তামাশা, রসালো কমেন্ট বিনিময় করেই যাচ্ছি।আর ইনবক্সের কি অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন। আমি আমার দুই বছরের ভার্সিটি লাইফে কোন মেয়েরসাথে নিজ থেকে কথা বলতে গেছি এরকম কিছু আমার মনে নেই। সারাদিন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরাফেরাকরা ক্লাসের জাহেল মেয়েগুলোও নিজ থেকে আমার সাথে কথা বলার সাহস করেনি। এখন সবার সামনেআমি এত সাধু কিন্তু একটু চিন্তা করেন তো কেমন লাগবে যদি দেখেন আমি একটা নন মাহরাম মেয়েকেচোখ মারছি, ভেংচি কাটছি, মুচকি হাসি- অট্ট হাসি দিচ্ছি কিংবা কাগজে করে একটা লাল রঙেরহার্টের চিহ্য একে দিলাম!! কি ভণ্ড মনে হবে না আমাকে? Exactly আমি একজন ভণ্ড বলে বিবেচিতহব। সুবাহানাল্লাহ এই ভণ্ডামিটাই কোন রাখ ঢাক না রেখে করে যাচ্ছে আমাদের মুসলিম ভাইবোনেরা যারা নাকি আবার দাওয়াও দেন। আঙ্গুলের একটা খোঁচা দিলেই ফেসবুকের স্ট্যাটাসে,ছবিতে কমেন্ট চলে যাচ্ছে ভেংচি কাটা, চোখ মারা, অট্টহাসি, মুখ বাঁকানো ইমুশন! সুবাহানাল্লাহ! নেট জগত বলে কি নন মাহরাম আপনার জন্য মাহরাম হয়ে গেল dear muslims? নাকি নিজেকে সবফিতনা থেকে নিরাপধ ভাবেন? নাকি জান্নাতের টিকেটপকেটে নিয়ে ঘুরছেন? আল্লাহু আকবর! মৃত্যু খুব নিকটেই ভাই, খুব নিকটেই! নিজের ঈমান নিয়েসচেতন হন। এত এত ইসলামিক জ্ঞান, দাওয়া, ইবাদাত নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেন বারসিসার মত করেমরতে না হয়! আল্লাহ রহম করুন।

৩। বারসিসার এই কাহিনী থেকে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়সেটা হল **“good intention”।** আমি তো ভালোর জন্যই কাজটা করছি এই সান্ত্বনা দিয়ে শয়তানআমাদের ফাঁদে ফেলে। একটু লক্ষ্য করলেই আমরাদেখব শয়তান বারবার বারসিসাকে মেয়েটির ভালোর জন্য ওয়াসওয়াসা দিয়েছে। তুমি এমন না করলেমেয়েটির এই হবে, তুমি তেমন না করলে

মেয়েটির সেই হবে এই ওয়াসওয়াসা। এবং বারসিসা প্রতিবারসেই ফাঁদে পা দিয়েছে আর তার ফল সে পেয়েছে অবশেষে! এই বিষয়টা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদেরলক্ষ্য করা উচিত। আমাদের মধ্যে একটা কমন tendency থাকে আমরা ইসলাম পালনের চেয়ে এক ধাক্কায়দাঈ হয়ে যেতে চাই। একটু আধটু জেনে মানুষজনকে ধুমাইয়া দাওয়া করে বেড়াই। সেখানে শয়তানের এসব ওয়াসওয়াসা আর নারী ফিতনার বিষয়ে কোন ধারণা না থাকায় এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে হারাম সম্পর্কেজড়িয়ে পড়ার। এক মেয়ে স্ট্যাটাস দিল, "ইশ! কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে!"। ছেলে গিয়ে সেখানেচান্দের ফজিলত বর্ণনা করে বিশাল দাওয়া প্রগ্রাম শুরু করে দিল! শয়তানের ওয়াসওয়াসা কি?"আমি তো দাওয়া দিচ্ছি"।মেয়ে স্ট্যাটাস দিল 'আমার মন খুব খারাপ"। ছেলে গিয়েislamqa এর ফতোয়ায় কমেন্ট বক্স ভরিয়ে ফেলল, মন খারাপ হলে কি করতে হবে, হতাশ হওয়া চলবেনা, জীবনে আসলে এসব ঘটেই তারপরও মুসলিমদের এই করতে হবে সেই করতে হবে! বিশাল এক শায়খ (only for girls)!! মেয়ে তো মহা খুশি! 'ভাইয়াআপনি এত কিছু জানেন, সব প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছে পাওয়া যায়, আপনি একটা জিনিয়াস ব্লাব্লা ব্লা'।এখন শয়তান এই আলাপ যে ইনবক্সে নিয়ে যায়নি তার গ্যারান্টি কি!! সুবাহানাল্লাহ! আমরাযেটা মাথায় রাখব দাওয়ার কিছু rules and regulations আছে। নিজে জানার এবং মানার বিষয়আছে। শয়তানের ফাঁদ নিয়ে উপলব্ধির বিষয় আছে। অনেক ভাই বোনদের আমি দেখেছি তাদের ফেসবুকপোষ্টের কমেন্ট অপশন পাবলিক থাকলেও সেখানে কোন নন মাহরাম কমেন্ট করেনা। কেন?? কেন তারাসেই সুযোগটা কখনো দেন না! আপনি একটা ফান পোস্ট দিলেন। আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে নন মাহরামনা থাকলেও কমেন্ট অপশন পাবলিক থাকার কারনে নন মাহরামরা সেখানে ফান কমেন্ট করা শুরুকরল! জাহেলরা যে কায়দায় কথাবার্তা বলে অবিকল সেই কায়দায় লুতুপুতু আর ইমুশনের জোয়ার! এখানে শয়তানের সাথে আপনার বোঝাপড়া! সেই নন মাহরাম ছেলে কিংবা মেয়ে একবার কমেন্ট করবে,দুইবার কমেন্ট করবে কিন্তু যখন দেখবে আপনি তাতে কোন রেসপন্সই দিচ্ছেন না তখন সে বুঝেযাবে এবং কেটে পড়বে। কিন্তু আপনি যদি তার সমান তালে রেস্পন্স করা শুরু করেন তাহলে ঘটনাগড়াতে থাকবে এবং শয়তান আপনাদের নিয়ে খেলতে থাকবে। ফেসবুক দিয়ে উদাহরন দিলাম মাত্র এবারএটাকে বাস্তব জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন ফলাফল এক ও অভিন্ন! আপনাকে মনে রাখতেহবে শয়তান স্বভাবতই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করবে তাই শয়তান যার দিকে আপনাকেআকৃষ্ট করছে তার দিকে "দাওয়ার" অজুহাত নিয়ে এগিয়ে যাবেন না! সবাইকেদাওয়া দেওয়ার জন্য আপনি responsible নয়। এটামনে করার কোন কারন নেই যে আপনি দাওয়া না নিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বরং সর্বনাশটা হবেআপনি শয়তানের ফাঁদে পা দিলে। সর্বনাশ হবে আপনি ফিতনাই জড়িয়ে গেলে! শয়তানের হাতে নিজের প্রবৃত্তিকে সঁপে দেওয়ার আগেতাই খুব গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা উচিত। সামনে তো বারসিসার কাহিনী আছেই reminder হিসেবে!

৪। সর্বশেষ একটা lesson আমরা বারসিসার কাহিনীথেকে নিতে পারি সেটা হল বৈরাগ্য বা একাকীত্বের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে। একটুচিন্তা করুন মেয়েটি যদি বারসিসার স্ত্রী হত, কিংবা বারসিসার যদি পরিবার থাকত তাহলেহয়ত শয়তান এত সুযোগ পেত না তাকে পথভ্রষ্ট করার। একটি কথা আমার খুব ভাল লাগে__ আপনিএকা থাকলে যা করেন সেটাই আপনার চরিত্র! একাকীত্ব শয়তানকে খুব বেশী সুযোগ করে দেয় তারপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার। যে কারনে দ্বীনের পথে থাকতে চাওয়া ভাই বোনদের সবসময় একটা motivation এর মধ্যে থাকা উচিত। বারসিসার ক্ষেত্রেশয়তান এই সুযোগটা নিয়েছিল! তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়েছিল যা বারসিসা এড়িয়ে চলতে পারেনি। একাকিত্বেরসময়ের শয়তানী ওয়াসওয়াসা মানুষের তাক্বওয়ার লেভেলকেও নিচে নামিয়ে দেয় খুব সহজে। আল্লাহক্ষমা করুন আমাদের। আমাদের উপর রহম করুন।

শেষকথাঃ এই লেখাটা যেহেতু সবাই ফেসবুকেই পড়বেনতাই ফেসবুকের বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে বুঝার সুবিধার্থে! **একটা বিষয় ইদানীংআমাকে খুব ভাবায় সেটা হল ইসলামের ব্যাপারটা আসলে পুরোটা উপলব্ধির! যে কারনে অনেক নলেজেবলভাই বোনকেও দেখবেন ইসলামের অনেক কিছু জানা সত্বেও আমল করার ব্যাপারে তারা উদাসীন। সেসবভাই বোনদের জন্য আমরা দোয়া করি যাদের অর্জিত জ্ঞান তাদের জীবনবোধের কোন পরিবর্তন করতেপারেনি। যারা কুরআন অধ্যয়ন করেছে, ইসলামের অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে আর এই জ্ঞান জাহিরকরে বেড়িয়েছে কিন্তু নিজের জীবনে তার কোন reflection পড়েনি। আল্লাহর কাছে এমন ভণ্ডামিআর মুনাফেকি থেকে পানাহ চাই। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ আমাদের ভুলগুলো শুধরেসত্যকে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুন।**

বারসিসার যে কাহিনীটা বর্ণনা করলাম এটা হয়ত অনেকেইজানেন। কিন্তু হয়ত এভাবে ভেবে দেখেননি। এখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাটুকু আমাদের দৈনন্দিনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশগুলোকে purify করার কাজে লাগতে পারে ইনশাআল্লাহ। ভুলকে মেনে নিয়েতার জন্য অনুতপ্ত হয় মানুষ আর ভুলের উপর অবিচল থেকে তার জন্য অজুহাত দেখায় শয়তান। আমরাআশরাফুল মাখলুকাত আমরা আমাদের ভুলের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব ইনশাআল্লাহ।আল্লাহ । এই লেখায় উপলব্ধি করার মত কিছু থাকলে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তা উপলব্ধি করারতৌফিক দেন। যেন আমাদের পাপগুলো মুছে দেন। বিগতদিনের ভুলগুলো যেন আজকের দিনের শুদ্ধতার অনুপ্রেরণা হয় ইনশাআল্লাহ! ইসলামের শিক্ষাআর উপলব্ধি যেন আমাদের জান্নাতের পথের পথিক হতে সাহায্য করে। শয়তান যেন দুর্ভাগা বারসিসারমত আমাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের কঠিন আগুনে নিয়ে না যায়। সর্বাবস্থায় আল্লাহরসাহায্য চাই। আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহ ক্ষমা করুন। ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিম, আমীন।

[একজন মুসলিম ভাইয়ের থেকে সংগৃহীত]

courtesy : Anika Warda Tuba (JihadPrincessTuba)

কী আমাকে তওবা করা থেকে ফিরিয়ে রেখেছে?

26 May 2015

লেখকঃ সানজিদা শারমিন

তওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ – ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাগমন করা ইত্যাদি। বিশেষ পদে অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা। মুহাম্মদ হামিদ সাদিক বলেন: 'তাবা' (تاب) ক্রিয়া হতে তাওবা হলো মূল শব্দ। যার অর্থ পাপ থেকে ফিরে আসা। কৃতপাপের অনুশোচনা করা। পুনরায় না করার দৃঢ়সংকল্প করা।' এক কথায় পাপ-কর্ম থেকে ফিরে এসে সৎকাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

তওবার সূচনা

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আ.)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর উপরে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ ইবলিশ ও ফিরিশতাদেরকে আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। কিন্তু ইবলীস ব্যতীত সবাই আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। সে অহংকারবশত নির্দেশ অমান্য করল এবং চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে গেল। অথচ ইতিপূর্বে সে ছিল খুবই অনুগত ও ইবাদতকারী দাস। সে তার ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা করেনি। বরং সে আল্লাহর কাছে প্রাথনা করেছে,

'হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন' (হিজর, ৩৬, ছোয়াদ, ৭৯)। তার উদ্দেশ্য ছিল সেই মানবজাতিকে ধ্বংসের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া যাদের জন্য সে অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত।' (হিজর, ৩৪-৪০; ছোয়াদ, ৭৯-৮৩)। আল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই' (আ'রাফ, ১৩)।

ইবলিশের প্ররোচনায় পড়েই একসময় আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) আল্লাহর নিষিদ্ধ গাছ থেকে ফল খান। এতে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। আদম (আ.) নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ তওবা করেন। তাই দয়াময় রব তাকে ক্ষমা করে দেন। কুরআনে বিষয়টি এভাবে এসেছে,

'অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন: আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তারা উভয়ে বলল: হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি জুলম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।' (আরাফ, ২২-২৩)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, শয়তান পাপ করেছিল আর আদম (আ.)ও আল্লাহ তায়ালার নিষেধ অমান্য করেছেন। আদম (আ.) তাঁর ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু শয়তান হয়নি। সে অহংকার করেছে। তাই সে হয়েছে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত। যদিও আল্লাহ তায়ালা এই অপরাধের পর আদম (আ.) ও তাঁর সঙ্গিনী হাওয়া (আ.)কে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছিলেন। তবে, তা তাদের শাস্তিস্বরূপ ছিল না। বরং এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। কেননা, তিনি মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালার নাম ও সিফাত

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার রয়েছে নিরানব্বইটি নাম, একশো থেকে একটি কম, যে এই নামগুলি মনে রাখবে, বুঝবে এবং উপলব্ধি করবে, সে জান্নাতে যাবে।' (বুখারি, মুসলিম, আত-তিরমিযী) আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেকটি

নামই একেকটি গুণাবলীকে নির্দেশ করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আল-গাফফারু (বড়ই ক্ষমাশীল), আত-তাওয়্যাবু (তওবা গ্রহণকারী), আল-গাফুরু (বড় ক্ষমাশীল)।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম-করুনাময় এবং অসীম দয়ালু। তিনি মানুষকে ভুল-ত্রুটি করার প্রবণতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভালো করেই জানেন যে, তার এই বান্দারা ভুল করবে। তিনি তার পাপী বান্দাদের ক্ষমা করতে ভালোবাসেন যদি তারা ভুল করে তওবা করে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা যদি গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। অতঃপর এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ করতো অতঃপর তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করতেন।' (সহীহ মুসলিম)

পাপ যত বড়ই হোক না কেন, কোনো ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করে এবং ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করার সময় করুণাকে আল্লাহ নিজের ওপর আবশ্যক করে বলেন: "আমার অনুগ্রহ আমার রাগের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।' (মুসলিম)

তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন

আল্লাহ তায়ালা কেবল তওবাকারীর তওবা কবুলই করেন না, বরং কেউ তওবা করলে তিনি অত্যধিক খুশি হন। তিনি কি পরিমাণ খুশি হন সে সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীস এসেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তার বান্দার তাওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যার উট খাদ্য ও পানীয়সহ জনমানবহীন মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। এ কারণে সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে কোনো এক গাছের নীচে শুয়ে পড়ল। এমন নৈরাশ্য জনক অবস্থায় হঠাৎ তার কাছে উটটিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে এর লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে ফেলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। অর্থাৎ সে এ ভুলটি করেছে আনন্দের আধিক্যের কারণে।' (মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সা.)এর তওবা

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, 'আমি রাসূলুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি: 'আমি দিনের মধ্যে সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তাওবা করি। (বুখারী)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে রাসুল (সা.) দিনে একশো বারের বেশি ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করতেন। (মুসলিম)

অথচ আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সকল পাপ থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তারপরও তিনি কেন ইস্তেগফার ও তওবা করেছেন। এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে:

১. তিনি উম্মতকে ইস্তেগফার ও তাওবার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য।

২. পাপ না থাকলেও তাওবা ইস্তেগফার করা যায়। এই অবস্থায় তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

৩. ইস্তেগফার ও তওবা হল ইবাদত।

৪. কেউ যদি তার জানামতে কোনো পাপ নাও করে থাকে, তবুও অজান্তে তাঁর দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে অথবা কোনো পাপ করে সে ভুলে যেতে পারে। তাই সর্বাবস্থায় তওবা ও ইস্তিগফার করা উচিত।

ইস্তেগফার ও তওবা আমলটি সর্বদা অব্যাহত রাখা রাসূলুল্লাহ (সা.) সুন্নত।

তওবার শর্ত

তওবার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো:

(১) ইখলাস থাকা অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তওবা করা।

(২) পাপ কাজটি পরিহার করা।

(৩) পাপটিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া।

(৪) ভবিষ্যতে আর এ পাপ করব না বলে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা।

আর যদি পাপকর্মটি অন্যকারও হকের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে অতিরিক্ত আরেকটি শর্ত রয়েছে সেটি হলো:

(৫) পাপের কারণে যে মানুষটির অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার পাওনা পরিশোধ করা বা যথাযথ ক্ষতিপুরণ দিয়ে তার সাথে মিটমাট করে নেওয়া অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে দাবী ছাড়িয়ে নেওয়া।

তওবার সময়সীমা

- তওবা দ্রুত করা উচিত। যখন কেউ তার ভুল বুঝতে পারে সাথে সাথেই তওবা করা উচিত। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: 'নিশ্চয় পাপকারী মুসলিম বান্দা থেকে বামপাশের ফেরেশতা কলম উঠিয়ে রাখে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত। বান্দা যদি অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তাহলে তা মাফ করে দেওয়া হয়, নতুবা একটি গুনাহ লিখা হয়।' (তাবারানী, বায়হাকী, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন)

- তাওবার একটি শর্ত হল, তাওবা করতে হবে মৃত্যুর আলামত প্রকাশের পূর্বে। মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেতে শুরু করলে তাওবা কবুল হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'তাদের জন্য তাওবা নেই, যারা ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে, যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করলাম।' (সূরা আন-নিসা, ১৮) এ সম্পর্কিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা মৃত্যুকালীন কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবুল করে থাকেন।' (তিরমিযী)

সুস্থ জীবন তওবার উপযুক্ত সময়। জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার পর তওবার উপযুক্ত সময় আর থাকে না। এমনিভাবে পাপ করার সামর্থ থাকাকালীন সময়টা হল তওবার উপযুক্ত সময়। পাপ করার ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেলে তওবা করা যথোপযুক্ত নয়। তবুও সর্বাবস্থায়ই তওবা করা উচিত।

- তওবার আরেকটি শর্ত হলো কিয়ামতের লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তওবা করতে হবে। পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ রাতে তাঁর কুদরতী হাত প্রসারিত করে রাখেন। যেন দিনে যে ব্যক্তি নাফরমানী করেছে সে যেন রাতে তাঁর নিকট তওবা করতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহ দিনে তার কুদরতী হাত প্রসারিত করে দেন যেন রাত্রে যদি কোন ব্যক্তি পাপকাজ করে থাকে সে যেন দিনে তাঁর নিকট তওবা করতে পারে। আর এ অবস্থা পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।' (মুসলিম)

তওবার পথে বাঁধা

১. নিজের পাপকে নগণ্য বলে মনে করা।

অনেকে নিজের পাপকে খুবই নগণ্য মনে করে। তারা মনে করে যে, এই সামান্য পাপের জন্য তওবা করতে হবে না। আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, 'তোমরা এমন সব (পাপ) কাজ করো যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহর যুগে এগুলোকে মনে করতাম ধ্বংসকারী (মহাপাপ)।' (বুখারী)

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বড় পাপ সেটিই, যে পাপকে ব্যক্তি ছোট বলে মনে করে।' তিনি আরও বলেন যে, 'পাপকে ছোট হিসেবে গণ্য করার একটি লক্ষণ হলো পাপের উপর অটল থাকা।' (বায়হাকী)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'একজন মুমিন গুনাহকে এভাবে দেখে থাকে যে, সে যেন এক (বিশাল) পাহাড়ের নিচে বসে আছে যা তার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়বে। পক্ষান্তরে পাপী তার গুনাহকে তার নাকের ডগায় বসা মাছির মতো দেখে হাত দিয়েই তাড়িয়ে দেওয়া যায়। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন; 'তোমরা নগণ্য ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান হও! ... নিশ্চয় নগণ্য ছোট ছোট গুনাহতে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদেরকে যখন সেই নগণ্য গুনাহগুলো গ্রাস করবে (পাকড়াও করবে) তখন তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, 'তোমরা নগণ্য ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান হও; কেননা সেগুলো মানুষের কাঁধে জমা হতে থাকে অতঃপর তাকে ধ্বংস করে দেয়।' (আহমদ, সহীহ আল-জামে' ২৬৮৬-২৬৮৭)

কেন মানুষ নিজের পাপকে ছোট মনে করে?

- নিম্নোক্ত কারণে মানুষ নিজের পাপকে ছোট বলে গণ্য করে:
- আল্লাহর ক্ষমতা ও তার প্রভুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের সল্পতা
- আল্লাহ ও তার শাস্তি সম্পর্কে অমনোযোগী হওয়া
- দুর্বল ঈমান ও তাকওয়ার অভাব
- অন্তর কলুষিত ও রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়া
- নিজের পাপের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাওয়া এবং তওবা না করা।

২. খুব বেশি আশা-আকাঙ্ক্ষা

ইয়াহিয়া ইবন মু'আয বলেন: অত্যধিক আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে তওবা করা থেকে দূরে রাখে। শয়তান সবসময় তাকে এই ওয়াসওয়াসা দেয় যে, এখনো তো অনেল সময় পড়ে আছে এত তাড়াতাড়ি তওবা করার প্রয়োজন নেই। এভাবে শয়তান তাকে বিলম্ব করাতে থাকে এবং এক সময় সে তওবা না করেই মারা যায়। (তালবিসুল ইবলিশ, ইবনুল কাইয়্যিম)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, 'মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করে রেখেছে।' (আল কুরআন,)

৩. আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার উপর বেশি নির্ভর করা

আবু আলী রুসাবানি বলেন, শুধুমাত্র আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীলতা অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করার একটি কারণ। আর এর কারণে তারা তওবা করা থেকে পিছিয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা সবসময়ই তাদেরকে ক্ষমা করবেন। (The dispraise desire by Ibn Qayyim)

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শয়তান আল্লাহর একটি মাত্র হুকুম অমান্য করার কারণে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তার পাপী বান্দাদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। হাদীস থেকে জানা যায়, অনেক মুসলিমও জাহান্নামে যাবে। সবাইকে ক্ষমা করলে জাহান্নামে যাবে কে? তাই শুধুমাত্র আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করা হলো শয়তানের একটি প্রতারণা।

৪. অমনোযোগী হওয়া

পাপ করার একটি প্রধানতম কারণ হলো কেয়ারলেস হওয়া। আল্লাহ তায়ালা ও তার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়ার কারণে ব্যক্তি ধ্বংসের মুখে পতিত হয় এবং দুর্দশার জীবন যাপন করে।

এর থেকে বাঁচার উপায় হলো পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, নসিহাহ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'উপদেশ দিতে থাকো, কেননা, উপদেশ মুমিনের উপকারে আসে।' (আয-যারিয়্যাত, ৫৫)

৫. আল্লাহ তওবা কবুল করবেন না এমন ভ্রান্ত চিন্তা

শয়তান আরেকভাবে মানুষকে প্রতারিত করে। সে মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেয় যে, তুমি জীবনে এত পাপ করেছ। আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন না। এমনকি সে পাপের আধিক্যের কারণে আল্লাহর কাছে তওবা করতেও লজ্জা বোধ করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বলো, হে আমার বান্দাগণ তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (আয-যুমার, ৫৩) অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।' (ইউসূফ:৮৭)

৬. সৎকর্মের জন্য নাজাত পেয়ে যাবে এমন ভ্রান্ত চিন্তা

অনেক মানুষ এমন ভ্রান্ত চিন্তাও করে যে, সে জীবনে অনেক সোয়াবের কাজ করেছে। তাই যেই পাপই করুক না কেন, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। সে তাঁর স্বপক্ষে আল্লাহ তায়ালার এই বাণীকে নিয়ে আসে, 'নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপসমূহকে দূর করে দেয়।' (হুদ, ১১৪) এভাবে সে তওবা করা বন্ধ করে দেয়। এটাও শয়তানের প্রতারণা।

ইবন 'আওন বলেছেন: নিজের নেক কাজের উপর নির্ভর করো না। কেননা, তুমি জানো না যে, আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে গ্রহণ করবেন কিনা। আর তুমি শুধু তওবা করেই নিজেকে নিরাপদ ভাবা শুরু করো না। কেননা, আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করবেন কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই? কেননা, তোমার আমলসমূহ তোমার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। তুমি জানো না, যে আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে কি করবেন।

পাপ মোচন বা প্রায়শ্চিত্তের উপায়:

১. তওবা করা: বান্দার তওবার কারণে আল্লাহ তায়ালা পাপ ক্ষমা করে দেন। আর তওবা কবুল হওয়া নির্ভর করবে বান্দার সিন্সিয়ারিটি বা ইখলাসের উপর।

২. ক্ষমা প্রার্থনা করা: ইস্তিগফার করলে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মাফ করে দেন। হাদীসে এসেছে, 'যখন পাপ করে বান্দা বলে, 'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করে দিন'। আল্লাহ তায়ালা বলেন: 'আমার দাস জানে যে তার একজন প্রভু আছে যিনি ক্ষমা করতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। আমি আমার দাসকে ক্ষমা করে দিলাম...' (বুখারী ও মুসলিম)

৩. এমন ধরনের নেক কাজ বেশি বেশি করা যেগুলো পাপকে মুছে দেয়

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিভিন্ন হাদীসে এমন সব নেক আমলের কথা বলা হয়েছে যেগুলো পাপকে মোচন করে। যেমন, রাসুল (সা.) বলেন, 'দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুময়া এবং রমাদান এক বছর থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত সমস্ত সগিরাহ গুনাহকে মুছে দেয়।' (মুসলিম)

৪. আপতিত বিপদ-আপদ

মুমিনের উপর আপতিত বিপদে তার গুনাহ মাফ হয়। রাসুলুল্লাহ বলেন, 'মুসলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নটা ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকি কোন কাঁটা বিঁধলেও, তার কারনে আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫. মুমিনের জন্য মুমিনের দুআ: যেমন, জানাজার নামাজের সময় যে দুআ পাঠ করা হয়।

৬. মৃতের পক্ষ থেকে কৃত নেক কাজ। যেমন; মৃতের পক্ষ হয়ে দান-সাদাকাহ করা, হজ্ব করা ইত্যাদি।

৭. কবরের শাস্তির ফলে গুনাহ মোচন হবে।

৮. নবী (সা.) এর শাফায়াৎ: নবী (সা.) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবিরা গুনাহ করেছে, তাদের জন্য আমি শাফায়াৎ করব।' (সহীহ সুনান আবি দাউদ, ৩৯৬৫)

৯. বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার দয়া

(মাজমু ফতওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা-৪৮৭-৫০১)

তওবার কবুলের ঘটনা

আল্লাহ তায়ালা অনেক বড় পাপী বান্দার তওবাও কবুল করেন যদি তাতে ইখলাস থাকে। নিচে এসম্পর্কিত দুটি ঘটনা বর্ণিত হলো।

প্রথম ঘটনা

আবু সাঈদ সাদ ইবনে মালেক ইবনু সিনান আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন: 'তোমাদের পূর্বের এক যুগে এক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করল। এরপর সে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আলেমের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাকে এক পাদ্রীকে দেখিয়ে দেয়া হল। সে তার কাছে গিয়ে বলল, সে নিরানব্বই জন মানুষকে খুন করেছে তার তাওবার কোন উপায় আছে কি না? পাদ্রী উত্তর দিল, নেই। এতে লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে পাদ্রীকে হত্যা করে একশত সংখ্যা পুরণ করল। এরপর আবার সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম সম্পর্কে জানতে চাইল। তাকে এক আলেমেকে দেখিয়ে দেয়া হল। সে আলেমের কাছে গিয়ে বলল, সে একশত মানুষকে খুন করেছে, তার তাওবা করার কোন সুযোগ আছে কিনা? আলেম বললেন, হ্যাঁ, তাওবার সুযোগ আছে। ব্যক্তি আর তাওবার মধ্যে কি বাধা থাকতে পারে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করছে। তুমি তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকো। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। সেটা খারাপ স্থান। লোকটি নির্দেশিত স্থানের দিকে পথ চলতে শুরু করল। যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল তখন তার মৃত্যুর সময় এসে গেল। এরপর তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশ্তা ও শাস্তির ফেরেশ্তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হল। রহমতের ফেরেশ্তাগণ

বললেন, এ লোকটি আন্তরিকভাবে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে। আর শাস্তির ফেরেশ্তাগণ বললেন, লোকটি কখনো কোনো ভাল কাজ করেনি। তখন এক ফেরেশ্তা মানুষের আকৃতিতে তাদের কাছে এল। উভয় দল তাকে ফয়সালাকারী হিসাবে মেনে নিল। সে বলল, তোমরা উভয় দিকে স্থানের দূরত্ব মেপে দেখ। যে দুরত্বটি কম হবে তাকে সে দিকের লোক বলে ধরা হবে। দূরত্ব পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। এ কারণে রহমতের ফেরেশ্তাগণই তার জান কবজ করল। (বুখারী ও মুসলিম)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, সে ভাল মানুষদের স্থানের দিকে মাত্র অর্ধহাত বেশী পথ অতিক্রম করেছিল, তাই তাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত বলে ধরা হয়েছে। বুখারীর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ যমীনকে নির্দেশ দিলেন, যেন ভাল দিকের অংশটা নিকটতর করে দেয়। আর খারাপ দিকের অংশটার দুরত্ব বাড়িয়ে দেয়। পরে সে বলল, এখন তোমরা উভয় দূরত্ব পরিমাপ করো। দেখা গেল সে মাত্র অর্ধ হাত পথ বেশি অতিক্রম করেছে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

হাদীসে এসেছে, গামেদিয়া (গামেদিয়া গোত্রের জনৈকা মহিলা) এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করেছি, আপনি আমাকে পবিত্র করুন! তখন রাসূল তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আপনি আমাকে ফেরত পাঠালেন? আল্লাহর শপথ! আমি গর্ভবতী। তখন তিনি তাকে বললেন, যখন সন্তান প্রসব করবে, তারপর আসবে। সন্তান জন্ম নেবার পর বাচ্চাটিকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে তিনি রাসূলের নিকট হাজির হলেন। তিনি তাকে বললেন, যাও যখন সে খাবার খেতে পারবে তখন আসবে। এরপর যখন বাচ্চা খাবার খেতে শুরু করে তখন মহিলা তার সন্তানকে নিয়ে এসে হাজির হয়, তখন বাচ্চার হাতে এক টুকরা রুটি ধরা ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বাচ্চা এখন খাবার খাচ্ছে। অতঃপর তার বাচ্চাটাকে একজন মুসলমানের জিম্মায় দেয়া হলো। এরপর তার বুক পর্যন্ত গর্ত খুড়তে নির্দেশ দেয়া হলো। এরপর লোকদের নির্দেশ দেয়া হলো তাকে যেন পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়...। (মুসলিম)

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত উমার (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করলেন এরপর তার আবার জানাযা পড়বেন? তখন তিনি বললেন, সে এমন তাওবা করেছে তা যদি মদীনার সত্তর জন লোকের মাঝে বন্টন করে দেয়া হতো তাহলেও তা যথেষ্ট হতো। তুমি কি এর চেয়ে আর কাউকে উত্তম দেখেছো যে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে? (মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক ৭/৩২৫)

তথ্যসূত্র

1. আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান, তওবা: কেন ও কিভাবে, ২০০৯, Islamhouse.com
2. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, Obstacles that Prevent One from Making Repentance, অনুবাদক: তালিব ইবন তাইসন, SalafiManhaj.com
3. http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/05/blog-post_7620.html
4. http://islamqa.info/en/13693

যুবক, যিনা, যৌনতা : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ও ব্যভিচার হতে তওবা

26 September 2014

সংকলনেঃ বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

একদা এক মজলিসে এক যুবক এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ,আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন।'একথা শুনে উপস্থিত সবাই চমকে উঠলেন এবং তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (আদরের সহিত) আমার কাছে এসো, সে কাছে এল। বললেন, বসো, সে বসলো।

এরপর (তার উরুতে হাত রেখে) বললেন, 'তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এটা পছন্দ করবে?'

সে বলল, না ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গিত করুন।

কোনো মানুষই তার মায়ের জন্য এটা পছন্দ করবে না।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তোমার মেয়ের জন্য?'

যুবকটি বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার প্রতি উৎসর্গিত।

কোনো মানুষই তার মেয়ের জন্য এটা পছন্দ করবে না।'

নবীজী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তোমার বোনের জন্য?'

যুবক বলল, 'না ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার প্রতি উৎসর্গিত। কোনো মানুষই তার বোনের জন্য এটা পছন্দ করবে না।'

নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে তোমার ফুফুর জন্য?'

যুবক বলল,'না ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার প্রতি উৎসর্গিত।

কোনো মানুষই তার ফুফুর জন্য এটা পছন্দ করবে না।'

নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তোমার খালার জন্য?'

যুবক বলল, না কক্ষনো না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন।

কোনো মানুষই তার খালার জন্য এটা পছন্দ করবে না।'

এরপর নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শরীরে হাত রাখলেন এবং দুআ করলেন- ইয়া আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করুন, তার অন্তর পবিত্র করুন এবং তার চরিত্র রক্ষা করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার ফলাফল এই হল যে, পরবর্তী জীবনে সে (রাস্তায় চললে) কোন দিকে চোখ তুলেও তাকাত না।

- [মুসনাদে আহমদ ৫/২৫৬-২৫৭]

* **এই হাদীস থেকে শিক্ষা দেয় যে**, একজন পুরুষ যার সাথে যেনা করবে সে নিশ্চই অন্য একজনের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু কিংবা খালা... তাই সে যেমন নিজ মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালাদের কে সম্মানের চোখে দেখে তেমন যদি অপরের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু, খালাদেরকেও সম্মানের সাথে দেখে তাহলে সে এই অপরাধ করতে পারবেনা !

-দেখুন কেমন ছিল বিশ্ব মানবতার দূত নাবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি অয়াসাল্ললাম এর শিক্ষাদানের পদ্ধতি !

***

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "রাসুল (সঃ) জিজ্ঞেস করা হল যে, 'কোন আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।' আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, 'মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ উভয় দ্বারা সঙ্ঘটিত পাপ সমূহ।)"

[তিরমিজী:২০০৪]

আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) বলেন...হাশরের মাঠে যখন কোন ছায়া থাকবে না। তখন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে সেই ব্যক্তি তিনি এমন প্রস্তাব পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (সহিহ বুখারীঃ ৬২৭)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; "কোন ব্যভিচার ব্যভিচারের সময়ে মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। কোন চোর চুরির সময় মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন মদখোর মদ খাওয়ার সময় মুমিন অবস্থায় মদ পান করে না, কোন লুন্ঠনকারী লুন্ঠন করার সময় মুমিন অবস্থায় লুন্ঠন করে না"। [বুখারি,মুসলিম ও আবু দাউদ]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার পর অবৈধভাবে কোন মহিলার সাথে সহবাস করার মত বড় পাপ আর নাই"।[আহমদ, তাবারানী]

"মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের জিনা,ফুঁসলানো কন্ঠের জিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের জিনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের জিনা, কোনো অবৈধ উদ্দেশ্যে পথ চলা পায়ের জিনা, এভাবে ব্যভিচারের যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয়, তখন লজ্জাস্থান তার পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে" -বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ) "

" নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য কারো মাথায় লোহার পেরেক ঠুকে দেওয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো, যে তার জন্য হালাল নয়।" - ত্বাবারানী ২০/২১২

"আমি মেয়েদের সাথে মুছাফাহা করিনা।" - আহমাদ৬/৩৫৮

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, " তোমাদের কারো মাথায় যদি লোহা দিয়ে আঘাত করা হয়, তবু এটা তার জন্যে ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে উত্তম - যে তার জন্যে বৈধ নয়। " (তাবরানি, সহীহুল জামে-৪৯২১)

"আমি মেয়েদের হাত স্পর্শ করিনা।" - সহীহুল জামে হাদীস নং ৭০৫৪ ।

এ প্রসংগে মা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, রসুল (সঃ) এর হাত কখনোই কোন বেগানা নারীর হাত স্পর্শ করেনি। তিনি কথার মাধ্যমে তাদেরকে বায়'আত করাতেন।" - মুসলিম ৩/১৪৭৯

***

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদকরেন:“তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেওনা। নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ ও অসৎপন্থা।”(সূরা বনী ইসরাঈল: ৩২)“কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেওনা তা প্রকাশ্যে হোকবা গোপনে হোক।”(সূরা আল-আনআম: ১৫১)

“যেদিন তাদের কৃতকর্মের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও পা সাক্ষী দিবে”। [সূরা আন নূর-২৪]

"যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ।" (Al-Ankaboot: 4)

"আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" (Yaseen: 65)

"কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ গোনাহগারদের সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।" (Al-Baqara: 95)

"তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু।" (An-Nisaa: 16)

"আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।"

(Al-Hujuraat: 18)

*****ব্যভিচার হতে তওবা*****

প্রশ্ন: আমি জানি না আমার ঠিক কি করা উচিত? আমি বড় একটা গুনাহ করে ফেলেছি। আমি জানি, আমাদের সুন্দর ধর্মে "ধর্মগুরুর কাছে স্বীকারোক্তি" এ রকম কিছু নেই। কিন্তু আমি যেনা করে ফেলেছি। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করতে চাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই। আমি সূরা নূরের মধ্যে পেয়েছি যে, আমার মত ব্যক্তি কোন পুতপবিত্রা নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। এখন আমার কী করা উচিত? আমি আশা করব আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাআলা আমার জন্য জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করেন।

এক:

আপনি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবেন না। আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি অধ্যয়ন করুন"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"।[সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

দুই:

আপনি নিষ্কলুষভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করুন। হারামের সকল পথ বন্ধ করে দিন। এই পাপে পুনরায় পতিত হওয়ার সকল উপায় উপকরণ কর্তন করুন। এছাড়া বেশি বেশি নেক কাজ করুন। কারণ নেককাজ বদকাজকে দূরীভূত করে দেয়।

তিন:

আপনি যদি আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ তওবা করে নেন তখন"ব্যভিচারী"বিশেষণ হতে আপনি রেহাই পাবেন। সেক্ষেত্রে পুতপবিত্র নারীকে বিয়ে করা আপনার জন্য জায়েয হবে।

চার:

আল্লাহর কাছে দোয়া করার ক্ষেত্রে মুমিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত। 'আমার জন্য জাহান্নামের শাস্তি লাঘব করুন'মুমিন এই দোয়া না করে বরং দোয়া করবে'হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নাজাত দিন। হে আল্লাহ, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন'। সাথে সাথে মুমিন নেক আমল করে যাবে এবং বদ আমল হতে তওবা করে নিবে। (সূত্র - islamqa.info/bn/624।।

.....

ভাবতে পারো !

ভাবতে কি পারো তোমার মাকে তোমার বাবা ব্যাতিত অন্য পুরুষ ভোগ করেছে ???

... কি রক্ত গর্জে উঠলো ??

কি ইচ্ছে করছে ??

তাকে ছিড়ে ফেলতে ?? তোমার মাকেও ঘৃণা করতে ইচ্ছে হচ্ছে ??

.

তোমাকে নয় তুমি আজ ডেটিং এর নামে আজ যে মেয়েটিকে ভোগ করছ , তার অনাগত শিশু কে এই প্রশ্ন ??...

কয় জনের ভালবাসা আছে যা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় ?

আজ আছে কাল এই সম্পর্ক থাকে না , দুই তিন মিনিটের এ অনন্দ সারা জীবনের জন্য আপনাকে অপবিত্র করে দেয় । জীবনেও কখনো আপনি নিজেকে পবিত্র ভাবতে পারবেন না !!!

যিনাহ ও এর প্রভাব আর ইসলাম কি বলে

19 October 2014

লেখকঃ মুসলিমাহ কিংডম

** আ'উজুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজিম, বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম **

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যার হাতে আমার প্রাণ। সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর। আল্লাহ! এই লেখায় আমার ইখলাসকে শুদ্ধ করে দিন। বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তানের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সবার উপলব্ধিতে বরকত দান করুন।

যিনাহ কি? আমরা কম বেশী সবাই জানি তারপরেও যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি এটি একটি illegal বা অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক যা একটি ছেলে এবং মেয়ের ভেতর গড়ে ওঠে বিয়ের কোন বন্ধন ছাড়া।

আমাদের সমাজে এখন মানুষ যিনাহ করার জন্য বিভিন্ন বাহানা দেখায় এটা কে হালাল করার জন্য। বাংলাদেশে এটি এখনো সামাজিকভাবে স্বীকৃতি না পেলেও এর প্রভাব বলা বাহুল্য। কিছু কিছু মডারেট মুসলিমরা বলবে ইসলামে যিনাহ এত কড়া ভাবে কেন নিষেধ করেছে? যিনাহ তো কারো ক্ষতি করছে না? একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে ভালবেসে এই কাজটি করছে এতে তো কারো ক্ষতি হচ্ছে না, ওরা করলে আমাদের নাক গলানোর কি দরকার? এখানে ইসলামের এই জিনিসটা আমি মানতে পারতেছি না। ইসলাম আসলেই সেকেলে ধর্ম না হলে আজকাল কেউ আবার এইসবে মাইন্ড করে নাকি? এইরকম আরো অনেক কথাই শোনা যায় আজকাল। আসলেই কি যিনার কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই? যদি নাই হয় তাহলে কেন শিরক, অন্যায়ভাবে মানুষ খুনের পরেই যিনার স্থান মস্ত বড় পাপ হিসেবে ৩ নম্বরে পরে? আসুন দেখি...।

যিনাহ তে যখন কেউ লিপ্ত হয় তখন একটি মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন তার আর পশুর মধ্যে কোন তফাৎথাকেনা। কেন এই কথা বলছি? একজন মানুষ আর একটা পশুর মধ্যে পার্থক্য কি আপনি বলতে পারবেন? পার্থক্য হলোমানুষকে আল্লাহ্ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, নিজের মনের কামনা বাসনা উপেক্ষা করে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটা আল্লাহ্ আমাদের করতে বলেছেন আর কোনটা নিষেধ করেছেন এসব বিচার করার এক অপরূপ গুণ দান করেছেন সুব হান আল্লাহ্!! যা পশুদের মধ্যে নেই, ওদের যখন খেতে ইচ্ছে হয়, ওরা খাবারের সন্ধানে বের হয়; যখন দৈহিক মিলনের বাসনা জাগে, তখন ওরা তা করে ফেলে, ওরা আড়ালে কিছু করে না, কারণ ওদের কোন চক্ষুলজ্জা নেই। কিন্তু মানুষ রোজার সময় অনেক ক্ষুধা থাকা সত্বেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ as in Control করতে পারে। একইভাবে যখন সমাজের সব জায়গায় যিনাহকে encourage করা হচ্ছে, ঐখানে মুসলিমরা কেন বা কিভাবে এর থেকে নিজেদের বিরত রাখছে? কারণ- তারা আল্লাহ্র আদেশ কে শ্রদ্ধা করে এবং তারা পুরোপুরি ভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের কাছে সমর্পণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু যে যিনায় লিপ্ত হলো, তার এই বিচার-বিবেক কোনটাই নাই; বরং তার এই পাপ কে পাপ না বানানোর জন্য থাকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এটা কখনো "ইসলামকে সেকেলে ধর্ম" বলে, কিংবা অনেক সময় হুজুর বা আলেম যারা আছেন, তাদেরকে অপমান করে, অনেক সময় "এটা ওতো খারাপ না" এসব বলে নানা রকম উপায়ে যিনাহকে মানুষের কাছে ভাল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আর এরা যখন যা করতে ইচ্ছা করে, তাই করতে থাকে আর বলে *"দুনিয়া তো দুই দিনের, enjoy করো! মনের বাসনাকে পুষে রেখো না! পাপ পুণ্যের হিসেব করলে দুনিয়া চলবে না!"*

আল্লাহ্ যিনাহ কে দুনিয়ার অনেক বড় একটি ফিতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এটি আল্লাহ্র পরিকল্পনার-ই অংশ যাতে করে মুসলিম আর মানুষ রূপী পশুর মধ্যে তফাৎ থাকে। আল্লাহ্ বলেছেনঃ

সূরা আন-নাজিয়াত (৭৯: ৪০-৪১)- "যে বেক্তি তার আল্লাহ্ কে ভয় করেছে এবং নাফস ও কামনা বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছে অবশ্যই জান্নাত হবে তার চিরন্তন ঠিকানা"

আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন, *তোমাদের পুরুষদের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা হল নারী।*

এর মানে কি? মানে হলো অবৈধভাবে নারীদের সঙ্গ থেকে নিজেকে বিরত রাখো। কিন্তু আমাদের সমাজে কি দেখি?

“না, না, সে আমার ভাইয়ের মত, আমার বোনের মত, বন্ধুর মত। আমাদের মনে কোন পাপ নেই আমাদের মন ঠিক আছে”। আমরা কি সাহাবীদের থেকেও বেশী ভাল হয়ে গেছি নাকি? যেইখানে তারা নিজেদেরকে নন-মাহাররাম নারীদের সঙ্গ থেকে বিরত রাখতো সেইখানে আমরা কি? অনেক সময় মুসলিমদের মধ্যেও দেখা যায়- একজন পুরুষ একজন নারীকে দাওয়া করছে এবং বলছে “আমরা তো খারাপ কিছু করছি না, আমি তাকে দাওয়া দিচ্ছি”। এক্সকিউজ মি ভাইয়া, এইটা আপনার কাজ না, এইটা বোনদের কাজ। আর আপুদের বলছি, প্লীজ মুসলিমাহদের সাথে যথাসম্ভব বিনয়ী ব্যবহার করুন। হয়তো আপনার বিনয়ী মনোভাব, আপনার একটুখানি উদারতা, একটা মেয়েকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে।

যিনাহর প্রভাব গুলো দেখি-

· পিতৃ-পরিচয়হীন ভাবে গড়ে ওঠা শিশু। বাংলাদেশে অবশ্য আরও ভয়ংকর! তারা Abortion করে ফেলে সমাজ ও লোক লজ্জার ভয়ে, যা তাদেরকে সারাজীবনের জন্য বন্ধ্যা করে দেয় বেশীরভাগ সময়, এর পর মানসিক যন্ত্রণার কথা বাদই দিলাম। আর আল্লাহর চোখে সন্তান-হত্যার কথা কি তা কারোই অজানা নেই। অনেক সময় ডাস্টবিন, ঝোপ ঝাড়ে অনেক বাচ্চা পরে থাকতে দেখা যায়। এদের কেউ গ্রহণ করে না, বেড়ে ওঠে অনাদরে-অবহেলায়, অনেক সময় এই শিশুরাই বড় হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। ইসলাম পরিবারকে অনেক মূল্য দেয় কারণ একটি ভাল পরিবার পরিবেশই একজন সুস্থ মনের মানুষ হিসেবে একটি শিশুকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। এর জন্য পিতামাতার সাথে ভাল ব্যাবহার, স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার ইবাদত হিসেবে বা পুণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

· যিনাহর কারনে বিভিন্ন মরণ ব্যাধি যেমন এইডস এর মত মারাত্মক রোগ মহামারী আকারে ধারণ করেছে আর বাংলাদেশও এখন এর মরণ-থাবার বাইরে নয়।

· একটি যিনাহ আরও যিনাহ বাড়ায়, অ্যামেরিকার বিশ্লেষণ অনুযায়ী যারা যিনাহ করে ৮২% সময় তারা জারজ সন্তান হয়ে থাকে, অবশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা নাও হতে পারে। কিন্তু যারা যিনাহ করছে তাদের সন্তানরা অবশ্যই যিনাহ করবে, বাবা-মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এটাই স্বাভাবিক।

· যিনাহ যেসব দেশে বেশী ওইসব দেশে দেখা যায় ধর্ষণ বেশী হয়ে থাকে, আর বেশীরভাগ সময় তারা পার পেয়ে যায় এটা বলে যে, “এইটা দুইজনের ইচ্ছায় হয়েছিল, মেয়ে তাকে ফাঁসানোর জন্য এসব বলছে”, এই বলে পার পেয়ে যায়। কিন্তু ইসলামিক কোর্টে যিনাহ-ধর্ষণ উভয়ই ভয়ানক অপরাধ।

" ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। আন-নুর [২৪ ; ২] "

· পড়ালেখার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব রয়েছে ক্যানাডার গবেষণায় দেখা যায় বেশীরভাগ সময় যাদের বিয়ের আগে বাচ্চা হয়, তারা পড়ালেখায় মন দিতে পারে না, depression, stress এ ভোগে।

ইসলাম কিভাবে এর প্রতিরোধ করতে বলে?

· অন্য ধর্ম যেমন খ্রিষ্টীয় ধর্ম অনুযায়ী হাত ধরা, কথা বলা এসবে কোন বাধা নেই কিন্তু যিনাহ করা যাবে না। কিন্তুকয়জন খ্রিষ্টীয় ধর্ম অনুসারীরা নিজেদের এর থেকে বিরত রাখতে পেরেছে? জানেন কি? কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য্য হল তা আমাদের এই পাপের কাছে যাওয়া থেকেই বিরত রাখে একেবারে গোঁড়া থেকে। যিনাহর শুরু কোথা থেকে কেউ কি বলতে পারবেন? জ্বী, ঠিক ধরেছেন – "প্রথম দেখা" – the first look, পরে আরেকটু দেখে কাছে আসা, ভালবাসা, এরপর কি হয় তা সবারই জানা। তো ইসলামে ছেলেদেরকে এবং মেয়েদেরকে বলা হয়েছে তাদের নজর কে সংযত রাখতে। কেন বলেছে? একটা গান হয়তো সবারই জানা কম বেশী *"এক পলকে একটু দেখা আরেকটু বেশী হলে ক্ষতি কি? যদি কাটে প্রহর পাশে বসে মনের দুটি কথা হলে ক্ষতি কি?"* তো সব কিছুর মূলেই হল চক্ষু আর এইটা কেই সংযত করে রাখতে বলা হয়েছে।

" আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। [১৭: ৩২] আল-ইসরা "

· ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা ইসলামে নিষিদ্ধ। ছেলে মেয়ে একা কথা বলা নিষেধ। জ্বী, চ্যাট, ম্যাসেজ এইসবের ক্ষেত্রেও এ নিয়মগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য, কারণ এইসব জায়গায় হায়া বা লজ্জা থাকে না, অনেক সময় দাওয়ার কথা শুরু করে এমন সব কথা হয়ে যাবে যা বাস্তবে কল্পনাও করা যায় না।

· ইসলাম অল্প বয়সে বিয়ে করাকে অনেক অনেক গুরুত্ব দিয়েছে আর বলেছে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে। সামর্থ্য বলতে এইখানে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন তা এবং লজ্জা ঢাকার জন্য যতটুকু কাপড় প্রয়োজন তা আর মাথার উপরে একটা ছায়া বা থাকার মত জায়গাকে বুঝানো হয়েছে যার প্রমাণ আমরা রাসূল (সাঃ) এর সময়কার অনেক নমুনাতে দেখি সাহাবীদের মধ্যে। কিন্তু এখনকার সময় এটা কতখানি বাস্তব? আপনি কি একটা মেয়ের বাবাকে বলতে পারবেন "আঙ্কেল আমি আপনার মেয়েকে বিবাহ করতে চাই, আল-আমিন হোটেলে প্রতি রাতে তাদের বাড়তি যেই খাবার আছে তা দিয়ে আপনার আর আমার মেয়ের ভাল মতই চলে যাবে কোন মতে পাইপের মধ্যে বা ব্রিজের নীচে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করতে পারবো, আর একজন প্রতি মাসে কাপড় গরীবদের মাঝে বিলায় এতে আপনার মেয়ের খাওয়া পড়া থাকা কোনটারই সমস্যা হবে না। আপনার কি মনে হয় মেয়ের বাবার রিঅ্যাকশন কি হবে? বিলকিসের মা, লাঠি নিয়ে আসো, আমাদের বাসায় বিশেষ অথিতি এসেছে। এটা হাসির হলেও বাস্তবে সামর্থ্য মানে এখন ছেলের একটা ভাল চাকরী ভাল বেতন বিয়েতে লাখ লাখ টাকার গয়না, শাড়ি আরও অনেক কিছু অনেক বলে গন্য করা হয়। তাই অনেক যুবকের কাছে বিয়ে এখন স্বপ্ন মাত্র! অনেক ইচ্ছা থাকা সত্বেও সমাজের বানানো নিয়মের কাছে হার মেনে যায়। অথচ উভয় পরিবারের একটু সাহায্য-সহযোগিতা আর আন্তরিকতা থাকলেই একটি বিয়ে অনেক সহজ হয়ে যায়।

" তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আন-নুর [২৪:৩২] "

· ইসলাম আরও বলেছে যাদের পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না, তারা যেন রোজা রাখে এবং নিজেদের নাফসকে সংযত রাখে। কিন্তু আমারা কয়জন এটা মানি? সাহাবীদের আমরা দেখেছি রোজা রাখতে অনেক মুসলিমই আছে যারা অবিবাহিত, এক দিন পর পর রোজা রাখছে নিজেদের সংযত রাখার জন্য, আমরা কি সেই জায়গায় সপ্তাহে একদিন রোজা রাখতে পারি না?

· মেয়েদের হিজাবও যিনাহ থেকে বিরত রাখে। যেসব দেশের মেয়েরা যত অশ্লীল জামা-কাপড় পরে, ঐসব দেশে যিনাহর হার তত বেশী। হিজাব শুধু মাত্র একটা পোশাক না, পুরো প্যাকেজ। একটি মেয়ে কিভাবে নন-মাহাররামের সাথে কথা বলবে, কিভাবে চলবে সবই দেয়া আছে এই প্যাকেজে। এর জন্য দেখা যায় যেসব মেয়েরা হিজাবের এই পুরো প্যাকেজ মেনে চলে, ছেলেরা তাদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে দেখে না এবং তাদের থেকে দূরে থাকে যার ফলে যিনাহর প্রভাব এবং আশঙ্কা এইসব মেয়েদের উপর অনেক অনেক কম।

আর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান এনেছে এবং যিনাহ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে তাদের জন্য রয়েছে শীতল ছায়া – ওইসময় যখন কোনও ছায়া থাকবে না – শুধু মাত্র যারা ঈমান এনেছে আর নিজেদের নাফসের প্রভাব থেকে বিরত রেখেছে তারাই পাবে।

আসুন ইসলামকে সঠিক ভাবে জানি, বুঝি মেনে চলি এবং অন্যদের মেনে চলতে সাহায্য করি আমীন।

সুযোগ পাওয়ার পরও যে যুবক ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে তার মর্যাদা

3 November 2014

লেখক অজ্ঞাত

প্রাণপ্রিয় ভাই, আমরা জানি, বর্তমানে বিভিন্ন কারণে যুব সমাজ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। অনেক যুবক বিভিন্ন পংকিল অন্ধকারের পথে নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেনা-ব্যাভিচার হয়ে দাঁড়িয়েছে খুব সাধারণ ব্যাপার। অথচ ইসলামে এ কাজটি কঠিনভবে নিষিদ্ধ। এর জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি এ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারে তার জন্য রয়েছে বিরাট পূরস্কার। আজকের এই পোষ্টে কোন ব্যক্তি সুযোগ পাওয়ার পরেও যদি এ ঘৃণিত অপকর্ম থেকে বিরত থাকে তাহলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা কী পূরস্কার ঘোষণা করেছেন তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاه

ঁ"যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা সে দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। তারা হলেনঃ (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) যে যুবক তাঁর প্রভুর এবাদতের মাঝে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে একে অপরকে ভালবাসে। আল্লাহর জন্য তারা পরস্পরে একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) এমন পুরুষ যাকে একজন সুন্দরী ও সম্ভ্রান- বংশের মহিলা নিজের দিকে আহবান করে, আর সে পুরুষ বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি। (তাই তোমার ডাকে সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। (৬) যে দানশীল ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, ডান হাত দিয়ে যা দান করে, বাম হাত তা অবগত হতে পারেনা। অর্থাৎ

তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই দান করেন। তাই মানুষকে শুনানো বা দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি প্রবাহিত করে"। (সহীহ বুখারী)

আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার মর্যাদা লাভঃ

ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মহান মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ঘটনায় যুবকদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে। ঘটনাটি আল্লাহ্ তাআলা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে বলেনঃ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظالمون الظَّالِمُونَ

"আর সে ইউসুফ (আ) যে মহিলার ঘরে ছিল ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল: শুন, তোমাকে বলছি, এদিকে আস! সে বলল: আল্লাহ্ রক্ষা করুন; (তোমার স্বামী) আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারীগণ সফল হয় না"। (সূরা ইউসুফঃ ২৩) কে এই মহিলা? তিনি হচ্ছেন মিশরের শাসক আযীযের স্ত্রী। কুরআনের ভাষা অনুযায়ী বুঝা যায় ইউসূফ (আ এর অন্তরে বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং তিনি তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি এ কাজ থেকে বিরত থাকেন। আল্লাহ্ তার অন্তর থেকে অশ্লীল কাজের চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর খালেস বান্দা। এভাবেই আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

" নিশ্চয় মহিলা তাঁর বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সে ইউসুফ (আ) ও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনিভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। (সূরা ইউসুফঃ ২৪)

যে যুবক তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

“যে ব্যক্তি তার মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে আমি তার জন্যে বেহেশতের জিম্মাদার হবো”। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

"আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। " (আয়াত নং-৩২, সূরা নং- ১৭, বনী-ইসরাইল)

ব্যভিচার পরিত্যাগ করার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু’আ করলে তা কবুল হয় এবং আল্লাহ বিপদ থেকে রক্ষা করেনঃ সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত বিখ্যাত তিন ব্যক্তির ঘটনাটি পড়ুন এবং দেখুন, আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাদেরকে কঠিন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, “অতীত কালে তিনজন লোক পথ চলছিল। পথিমধ্যে রাত্রি যাপন কারার জন্য তারা একটি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। উপর থেকে বিশাল আকারের একটি পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জন্য বের হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইলনা। তাদের একজন অপরজনকে বলতে লাগল, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সৎআমল আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে তার উসীলা দিয়ে দু’আ করা ব্যতীত এই পাথর থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই।

তাদের একজন বললঃ হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল। আমি তাদের পূর্বে আমার পরিবার-পরিজন কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন ঘাসের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। তারা ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি ফেরত আসতে পারলাম না। আমি তাদের জন্য দুধ দহন করলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার পাশে দাড়িয়ে রইলাম। আমি তাদের পূর্বে স্ত্রী-পরিবার এবং দাস-দাসীকে দুধ পান করানো অপছন্দ করলাম। দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায়। এভাবে সারা রাত কেটে গিয়ে ফজর উদীত হলে আমার পিতা-মাতা ঘুম থেকে জেগে দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! আমি একাজটি একমাত্র আপনার সন’ষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করেছি। সুতরাং আমরা এই পাথরটির কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু’আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল,কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ! আমার একজন চাচতো বোন ছিল। তাকে আমি খুব ভালবাসতাম। আমি তার কাছে আমার মনোবাসনা পেশ করলাম। সে অস্বীকার করল। অবশেষে এক বছর খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন সে খাদ্যাভাবে পড়ে সাহায্যের জন্য আমার নিকট আসল। আমি তাকে একশত বিশ দিরহাম দিলাম এই শর্তে যে, সে আমার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করবে। সে এতে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম এবং তার দুই উরুর মাঝখানে বসে পড়লাম তখন সে বলতে লাগলঃ হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে

মোহর ভঙ্গ করো না অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তুমি আমার সতীত্ব হরণ করতে করো না। ফলে আমি তার সাথে সহবাস করাকে পাপের কাজ মনে করলাম। সুতরাং সে আমার সবচেয়ে কাছে হওয়া সত্বেও আমি তার কাছ থেকে চলে আসলাম। আর আমি তাকে যে একশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি একাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করে থাকি তাহলে আমরা এই পাথরটির কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত আবস্থা হয়নি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ **তৃতীয়জন বললঃ** হে আল্লাহ! নির্ধারিত মজুরীর বিনিময়ে আমি কয়েকটি শ্রমিক নিয়োগ করলাম। কাজ শেষে আমি তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করলাম। কিন্তু একজন লোক মজুরী গ্রহণ না করেই চলে গেল। আমি তার প্রাপ্য টাকা বাড়াতে থাকলাম। একপর্যায়ে তা প্রচুর সম্পদে পরিণত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললামঃ এসব উট, গরু, ছাগল এবং গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তা সবই তোমার। সে বললঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং আমার সাথে বিদ্রুপ করোনা। আমি বললামঃ আমি তোমার সাথে বিদ্রুপ করছিনা; বরং এগুলো তোমারই। অতঃপর সে সমস- সম্পদ নিয়ে চলে গেল। একটিও রেখে যায়নি। হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য একাজটি করেছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। তারা নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এল।" (সহীহ বুখারী)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে পবিত্রতার সাথে জীবন যাপন করে আল্লাহ তার সকল সমস্যা দূর কর দেন,তার অর্থ-সম্পত্তিতে বরকত দান করেন এ ছাড়াও তার জন্য রয়ছে অসংখ্য পুরস্কার। সর্বপরি আল্লাহ পরকালে তার জন্য প্রস্তুত করে রেখছেন চিরসুখের নিবাস জান্নাত। আসুন, মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার প্রতিশ্রুত জান্নাত থেকে বঞ্চিত করনা। আমাদেরকে কুলশমুক্ত পবিত্র জীবনগঠনের তাওফীক দাও। সেই সাথে আমাদের যুব সমাজকে অধ:পতনের হাত থেকে রক্ষা কর আর তাদেরকে বানাও আলোকিত পথের রাহবার। তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী।

এই ব্যভিচারের গুনাহটা কি আমার ?

কিন্তু আমি তো কোন প্রেম-ট্রেম করিনি দুনিয়ায় ?

1 July 2015

লেখকঃ আবু পুতুল (তারেক হাসান)

আচ্ছা, আপনি নিজে কোন হারাম রিলেশনশিপে নেই তো? তাই? আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু আপনি করলেন কী, আপনার এক ছেলে বন্ধুর সাথে আপনার অন্য কোন মেয়ে বন্ধুর 'রিলেশান' করিয়ে দিলেন, অথবা ভাইস-ভার্সা। সোজা কথায়, আপনি একটা প্রেমের সম্পর্ক গড়ে দিলেন, একটা হারাম কাজে সহায়তা করলেন, আল্লাহ যেখানে কুরআনে আপনাকে আদেশ করেছেন সীমালঙ্ঘন হয় এমন কাজে সহায়তা না করতে।

"...পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা..."

[সূরা আল মাইয়েদা, ৫:২]

আপনি জানেন কিনা জানিনা, ওই দুজন এরপর থেকে একটা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি যেই গুনাহ গুলো কামাচ্ছে না, তার একটা ভাগ কিন্তু আপনার আমলনামায় এসেও যোগ হচ্ছে।

আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করবে তবে তার অনুসরণকারী সকলের নেকীর সমান নেকী তারও হবে। এতে তাদের নেকীর মধ্যে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। যে ব্যক্তি কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে অর্থাৎ কোন খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করবে তবে যারা তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের গুনাহের সমান গুনাহ্ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ্ থেকে কিছু হ্রাস পাবে না'।

[আত তিরমিজি, অধ্যায় ৪১, হাদীস নং. ২৬৭৪ (হাদীসের মানঃ হাসান)]

হাশরের ময়দানে নিজের আমলনামায় এত এত গুনাহ দেখবেন যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে - আসলেই কি এটা আমার আমলনামা? এই ব্যভিচারের গুনাহটা কি আমার? কিন্তু আমি তো কোন প্রেম-ট্রেম করিনি দুনিয়ায়? তাহলে?

ওই 'তাহলের' উত্তরটাই আপনাকে দিয়ে দিলাম দুনিয়ায় থাকতে।

অতীতে যা করে ফেলেছেন তার জন্য তওবা করুন। শির্কের গুনাহ ছাড়া আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করে – এই বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চান ।

আকর্ষণ

লেখকঃ মোহাম্মদ আনোয়ার শাহ

আল্লাহ তায়ালা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা করেছেন সৃষ্টির দরকারে। শয়তান একে কাজে লাগায় ফিতনায় ফেলতে। আল্লাহ শয়তানকে এই ছাড় দিয়ে রেখেছেন কিয়ামত তক। সুতরাং শয়তানের চালগুলো আল্লাহরই পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কীভাবে পাশ করতে হবে তাও আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন নবী রাসূলদের মাধ্যমে। সর্বশেষ নবী সা: এই বিষয়ে সুন্দরতম শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সতর্কও করে গেছেন, উম্মতের পুরুষদের জন্য তিনি নারীদের ফিতনার চাইতে বড় আর কিছু দেখছেন না (ভাবার্থ)।

সুতরাং নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র হবে আলাদা। গায়রে মাহরাম নারী পুরুষের দৃষ্টিসীমায় (দৃষ্টিসীমায় না আসলে চিন্তাতেও আসবে না) বার বার আসবে না, এমন কর্মক্ষেত্রই শরিয়ার চাওয়া। নারীদের জন্যও একই কথা। এটা আরো বড় ফিতনা যখন বিপরীত লিঙ্গের একই ব্যক্তিই বার বার সামনে আসে।

যেখানেই এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে সেখানেই শয়তান সুযোগ নিয়েছে। পদস্খলন করে ছেড়েছে আদম সন্তানের। কারো ক্ষেত্রে এটা শুধু এটুকু যে সে চিন্তায় অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির ভাবনা আর মনে তাকে স্থান দিতে শুরু করে, আর কারো ক্ষেত্রে এটা সকল সীমা ছাড়িয়েই যায়। আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর ভাষায় কেউ মূল গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে সত্যতা দিক বা না দিক, ছোট থেকে বড় সবটুকুই অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। যার পরিণতিতে আখিরাতের শাস্তি তো

আছেই, দুনিয়াতেই হরেক রকমের আযাব শুরু হয়ে যায়।

তাই শয়তানের জাল থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় হলো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার সুযোগই না দেয়া। সালাফগণ এক্ষেত্রে কেমন সতর্ক থাকতেন তা অনুসরণকারীর জন্য নির্দেশনার কাজ করবে।

রিয়েল লাইফে যেমন এই সতর্কতা অবলম্বন দরকার, তেমনি অনলাইনেও দরকার। আইডির নাম মেয়েলি দেখলেই তার ফ্রেন্ড, ফলোয়ার লিস্ট কানাই কানাই ভরে উঠে; আর নাম যদি একটু মিষ্টি হয়, মডার্ণ হয় তাহলে তো কথাই নেই! এটুকুই চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। সুতরাং অনলাইনে বিচরণ এমন হওয়া উচিত যেন গায়রে মাহরাম কারো দিকে চিন্তাই না যায়। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দিকে মনযোগ যাওয়াকে রেড এলার্ট ধরে নেয়া উচিত। হালকা বা আধা-পরিচিতদের থেকে বেশিই দূরে থাকা উচিত।

ফ্রেন্ড লিস্টে গায়রে মাহরামদের জায়গা দিয়ে চেষ্টা করাটা কঠিন। লিস্টে এসে গেলেও তাদের আনফলো করে দেয়া উচিত। আনফলো না করলেও কারো পোস্টে নিয়মিত লাইক, কমেন্ট না করা উচিত। এসব ক্ষেত্রে শয়তান বার্তাবাহকের কাজ করে থাকে। ম্যাসেজের বেলায়ও একই কথা।

এসব বিষয়কে হালকা করে দেখায় দ্বীনি কমিউনিটিতেই অতীতে কী কী হয়েছে তা আমি বরং কমই জানি। টুকটাক যা শুনতে পাওয়া যায় তাতে অল্পবিস্তর অনুমান করা অসম্ভব না।

এসব বিষয় কারো কাছে গুরুতর আর কারো কাছে হাস্যকর, বড্ড সেকেলে। আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রকারের মনে হলে সযত্নে এড়িয়ে যান।

এই বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারা অনেক কঠিন। এজন্যই আল্লাহ সূরে নূরের আয়াতগুলো শেষে তাওবার দিকে আহবান করেছেন। শুধুমাত্র মুখলিস ব্যক্তিই সুন্দরতম উপায়ে আল্লাহর সীমার মধ্যে থাকতে পারেন। কারণ তাদেরকে আল্লাহই রক্ষা করেন –

"এভাবেই আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও নিলজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মুখলিস (নিষ্ঠাবান) বান্দাদের একজন।" [সুরা ইউসুফ/২৪]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাপাচারীকে চিকিৎসকের দৃষ্টিতে দেখতেন

14 October 2014

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাপাচারীকে চিকিতসকের দৃষ্টিতে দেখতেন যেমন রোগীকে দেখা হয়। পুলিশের মতন তিনি অপরাধীকে দেখতেন না। ইনশা আল্লাহ নিচের ঘটনাটি থেকে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবেঃ

একজন কুরাইশ যুবক একদিন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে এসে ব্যভিচারের অনুমুতি চাইলো। সাহাবীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি যুবকটিকে তার আরো কাছে আসতে বললেন।

তারপর বললেন, "তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এটা (ব্যভিচার) মেনে নেবে?"

যুবকটি জবাব দিলো, "না।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "(অন্য) লোকেরাও তাদের মায়ের জন্যে এটা অনুমোদন করবে না।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে তার কন্যা, বোন ও চাচীর জন্য এটা অনুমোদন করবে কিনা? প্রতিবারই যুবক বললো, "না।"

তারপর তিনি যুবকটির হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ তার (তরুণের) পাপ মার্জনা করুন, তার অন্তর পবিত্র করুন এবং তাকে সহিষ্ণু করুন (তার এই কামনার বিরুদ্ধে)।" [আহমদ, তাবারানী]

এই সহৃদয় অনুভূতি সুস্পষ্ট সদিচ্ছা ও মানুষের জন্মগত সুমতির প্রতি আস্থার পরিচায়ক যা মানুষের খারাপ বৃত্তিগুলোকে বিদূরিত করতে সক্ষম। আর খারাপ প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং, তিনি ধৈর্যের ও যুক্তির সাথে তার সাথে আলাপ করে তার ভুল চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।"

* * * * *

[সূত্রঃ ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা : ড ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ি, পৃষ্ঠা ১৩৫]

হায়রে বিয়ে! হায়রে লজ্জা! (পর্ব – ১)

13 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ানা জেরিন

ক্লাসে একদিন মুদ্রাস্ফীতি পড়াতে পড়াতে কাগুজে টাকা ও স্বর্ণের প্রসঙ্গ আসলো । ম্যাম মজা করে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলেন বলতো – স্বর্ণের দাম বাঁড়ায় তোমাদের কি ক্ষতি হয়েছে। ছেলেরা কেউ মুচকি মুচকি হাসছিল, কেউ বা বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছিল । ম্যাম বললেন- স্বর্ণের দাম বেড়ে গেলে তোমাদের বিয়ে শাদী করতে দেরী হবে। তখন মেয়েরা হি হি করে হাঁসা শুরু করলো । ক্লাসে হাসির রোল পড়ে গেলো। ম্যাম এবার মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন- তোমরা হাসছ কেন? ছেলেদের বিয়ে করতে দেরী হলে তোমাদের বিয়ের বয়স ও গড়ে ২ বছর বাড়ল এটা বুঝনা?মেয়েদের হাসি থেমে গেলো। ম্যাম এরপর ছেলেদের বললেন- তোমরা যারা তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে চাও তাদের একটা সিক্রেট বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আফ্রিকার জোহানেসবারগ এ চলে যাবে। ওখানে ১০ ক্যারেট এর স্বর্ণ পাওয়া যায় , একদম কম দাম। ২০ ভরি স্বর্ণ দিবে বউকে একটু ও কষ্ট হবেনা।

উপরের গল্পটা নিছক মজার একটা ঘটনা হলেও এখান থেকে আমাদের সমাজের আসল চিত্র টা ফুটে ওঠে । এই সমাজে বিয়ের মতো হালাল সম্পর্কে জড়াতে বুড়া কাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তে থাকা যায় , অন্তত টাকা পয়সার ব্যাপারে এমন বরের চাহিদা ই বেশি। আর চামড়ার ব্যবসা তো আছেই। সাদা চামড়া কালো চামড়া ভেদে দরদাম ঠিক করা হয় পাত্রীর , আর পাত্রের ক্ষেত্রে চামড়া মুখ্য নয়। পাত্রের একটা ই যোগ্যতা – গয়না গাটি দেওয়ার ক্ষমতা । পাত্রীর ক্ষেত্রে শুধু মাত্র সুন্দর হওয়াই যেমন মেয়েটির যোগ্যতার একমাত্র মানদণ্ড হওয়া উচিত নয়, তেমনি ছেলের ক্ষেত্রেও বাড়ি গাড়ি স্মার্ট হওয়া আর কাড়ি কাড়ি টাকার মালিক হওয়া শর্ত হওয়া উচিত নয়। এসব কারনে আজকে আমাদের সমাজে বিয়ে নিয়ে এতো অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম হচ্ছে।

ঘটনা –১

আদিল বহু বছর বাহিরে ছিল। তরুণ ইঞ্জিনিয়ার , দেখতে লম্বা , ফর্সা সাদামাটা একটা ছেলে। বিদেশ থাকার কারনে করি করি করেও বিয়ে করা হয়ে উঠেনি। বয়স টাও ওদিকে ৩০ ছাড়িয়ে গেলো গেলো। বড় বুবু আজ মেয়ে দেখতে যাবে আদিল কে নিয়ে। আদিলের মন আজ তাই খুব ফুরফুরা। একা একা আর ভাললাগেনা তার , এবার বউ আসলে তার হাতে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। প্রবাসে নিজের রান্না নিজের করতে হয়, জ্বরের ঘোরে পড়ে

থাকলে ও মমতাময়ী কেউ মাথায় পট্টি দিয়ে দেয়না, বাজার করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হয়, আর যাইহোক অন্তত একজন সাথী তো হবে। ভাবতে ভাবতে আদিল শিহরিত হয়।

পাত্রী দেখে এক নজরেই মুগ্ধ হয়ে যায় আদিল ও বুবু। মেয়ের টানা টানা চোখ , দুধে আলতা রং , পরী বললেও ভুল হবেনা। এই মেয়েকে এতদিন কেউ বিয়ে করেনি এটা ভেবেও আদিল অবাক হয়। দেখতে যাওয়ার দিন সে মেয়েকে ২/১ টা প্রশ্ন করলেও মেয়ে কোন উত্তর দেয়না। সবাই ভাবে লজ্জায় কথা বলেনি। আদিলের বুবু একবার আশেপাশে খোঁজ খবর নিলেন না , মেয়ের আচার ব্যাবহার কেমন! বিয়ে পাকাপাকি হয়ে যায়। এমন বউয়ের জন্য কি যা তা শাড়ি গহনা কিনা যায়! সবাই মিলে হৈ হুল্লোড় করে বিদেশে যায় শপিং করতে। পরিবারে এক অনাবিল খুশির বন্যা বয়ে যায়।

প্রায় ৫ লাখ টাকার শুধু মার্কেটিং ই করা হয় কনের জন্য। আরও আনুসাঙ্গিক মিলিয়ে ১০/১৫ লাখ টাকা বাজেট আদিলের নিজের বিয়ের জন্য। হাজার হোক বিয়ে তো মানুষ জীবনে একবার ই করে তাইনা!

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন চলে আসে। কনে পক্ষ কিন্তু বর পক্ষের ঠিক উল্টা । তারা বরকে একজোড়া স্যুট আর জুতা ছাড়া তেমন কিছুই দেয়নি। কিন্তু মেয়ের রুপের কাছে এসব কথা পাত্তা পায়না। সবাই এসে আদিল কে বলে তোমার বউ তো লাখে একটা।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ।

সবাই বাসায় চলে আসে। বাসর ঘর সাজানো হয়েছে অনেক রকমের কাঁচা ফুল দিয়ে। খাটের পাশে সাইড টেবিলে পানি, ফল, ছুরি রাখা আছে। আর বউ বসে আছে খাটে । আদিল একবার ঘরের পরিবেশ দেখে নেয়। সারাদিনের ব্যাস্ততায় সে ও কিছুটা ক্লান্ত। খাটে যেয়ে নব বধুর পাশে বসে। বউকে বলে- আপনার কি ক্লান্ত লাগছে? ক্লান্ত লাগলে ঘুমিয়ে পড়ুন । কিন্তু একি! বউ দেখি চোখ রাঙিয়ে তাকায়। রাগ রাগ কন্ঠে বলে- আপনি আমার সাথে কথা বলবেন না। আদিল তো পুরাই ভ্যাবাচ্যাকা ! বউকে সে একবার ছুয়ে ও কথা বলেনি, কোন উল্টা পাল্টা কথাও তো বলেনি! বউ তাহলে এতো রাগ কেন? আদিল বউকে আবার বলে- কি হয়েছে আপনার? আমি কি কোন অপরাধ করেছি! ?

এই কথা শুনে বউ আরও ক্ষেপে গেলো। একটানে বাসর সাজানো কাঁচা ফুলের মালাগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো । আদিল তো হতভম্ব। সে বলল – আরে আরে করেন কি! এসব ছিঁড়ছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?

বউয়ের মেজাজ এক ধাপ চড়ে গেলো। সাইড টেবিলে রাখা ফল কাঁটার ছুরি নিয়ে আদিলের গলায় চেপে ধরতে ধরতে বলল- আমার ওষুধ কই! আমার ওষুধ কই!

আদিল অবাক হয়ে বলল- কিসের ওষুধ? মেয়ে বলল- মা আমাকে বলতে নিষেধ করেছে যে আমি পাগল! আপনি আমার ওষুধ দেন তাড়াতাড়ি। খেলেই ঘুমায় যাব । বাড়ির বিচ্ছুগুলো বাসর ঘরের দরজার আশেপাশে ঘুরছিল। ধ্বস্তাধস্তির আওয়াজ শুনে তারাও সজাগ হয়ে গেলো। এদিকে আদিল বউয়ের হাত থেকে ছুরি নিয়ে তাকে নিরস্ত্র করে রুম থেকে বেড়িয়ে গেলো। দুঃখে কষ্টে রাগে আর অপমানে আদিলের সারারাত ঘুম হয়নি। পরের দিন ছেলে পক্ষের দাওয়াত । সব মেহমান সব আয়োজন ঠিক। যথাসময়ে সবাই আসলো, আত্মীয় স্বজন অনুষ্ঠান সব ই হোল কিন্তু হোল না শুধু ২ জীবনের মিল। সমস্ত অনুষ্ঠানটাই একটা সাজানো নাটক মনে হোল তার কাছে। অনুষ্ঠান শেষ

হলে , বউকে তার বাপ মার সাথে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোল। পাগলের সাথে সংসার করার কোন মানেই হয়না, খামোখা একটা বাচ্চা ও যদি হয়, তাহলে এই মেয়ের সংসার কে দেখবে! বিয়েতে মেয়ে পক্ষের নির্লিপ্ততার কারন আর ইচ্ছাকৃত হঠকারিতা স্পষ্ট হয়ে গেলো।

আদিলের তালাক হয়ে গেলো কোর্টে । জরিমানা স্বরূপ গুনতে হোল কয়েক লাখ টাকা।

জীবনটা তার পুরো এলোমেলো হয়ে গেছে। অর্থ আর শান্তি সব খুইয়ে সে এখন উদাস একজন মানুষ । মাঝে মাঝে ভাবে, গায়ের রং দেখে পাগল না হয়ে একবার যদি খোঁজ মেয়ে কেমন , তার আচরণ কেমন! এরপর থেকে অনেকে অনেক চেষ্টা করে বিয়ে দিতে। কিন্তু তার আর ভাললাগেনা মেয়ে দেখতে। এবার সে বুবুকে বলে দিয়েছে, শুধু গায়ের রং না দেখে মেয়ের আচার ব্যাবহার, মেয়ে নামাজী কিনা এসব আগে খোঁজ নিতে, শ্যামলা হলেও চলবে, কালো হলেও সই।

এর ১ বছর পরে আদিলের আরেক টি মেয়ের সাথে বিয়ে হয়ে যায়। মেয়ে টি শ্যামলা । কিন্তু আচার আচরণ ভালো, নামাজী । আদিলের দগদগে ব্যাথার ক্ষত একটু একটু করে ভরে যাচ্ছে সুখী দাম্পত্য জীবনের ছোঁয়ায় ।

এটি একটি সত্যি ঘটনা। সব কিছুর মুলেই হোল নিয়তের পরিশুদ্ধতা । যে ব্যক্তি সুন্দর পাওয়ার নিয়ত করে সে শুধু সুন্দর ই পায় , কিন্তু যে ব্যক্তি বিয়ের ক্ষেত্রে কন্যার দ্বীনদারিতা ও আল্লাহ ভীতি কে প্রাধান্য দেয় সে সৌন্দর্য না পেলেও অনেক কিছু পায়। এই অংকে দ্বীনদারীর মান ১, আর বাকি সব কিছুর মান শূন্য । সামনে ওই এক থাকলে যতো শূন্য যোগ হবে ওই অংকের মান ততোই বাড়বে, আর সামনে ওই ১ না থাকলে আর বাকি যতো শূন্য ই যোগ করা হোক না কেন ওটার মান শূন্য ই থেকে যায়।

আর তাছাড়া কালো সাদার পার্থক্য যদি আমরা করি , তাহলে আল্লাহর সৃষ্টিকে অপমান করা হয়। একজন মানুষের সুন্দর কালো হওয়ার পিছনে তার কি কোন অবদান আছে?

কাজেই মানুষের মূল্যায়ন হওয়া দরকার মানুষের কাজে আর আচার ব্যাবহারে , উপরের চর্ম ও তার রং দিয়ে নয়। পাত্রী দেখার বেলায় ও এমন টা মেনে চললে ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা কম। বহু ছেলে ও ছেলের মাকে দেখেছি , মুখ বড় করে ফর্সা মেয়ে বিয়ে করিয়েও কি নৈতিক শিক্ষার অভাবের শিকার হয়েছেন, আর কপাল থাবড়েছেন , আর এমন অনেক ঘর ও দেখেছি , যেখানে কালো বা শ্যামলা একজন মমতাময়ী মহিলা স্বামী সংসার সন্তান নিয়ে পরিবারকে জান্নাতের বাগিচার মতো সাজিয়ে নিয়েছেন খোদা ভীরুতার রঙে। মনে রাখবেন , আপনার সহধর্মিণী শুধু আপনার অবসরের সাথী নন, তিনি হবেন আপনার সন্তানদের মমতাময়ী মা। আর মায়ের স্বভাব ই ছড়িয়ে যাবে আপনার সন্তানদের মধ্যে। যার মাঝেই নিহিত আপনার পারিবারিক সুখ। আর ভালো মা সমাজকে উপহার দিবেন ভালো চরিত্রের কিছু মানুষকে, যারা সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুলের সেই হাদিসটি আমরা বারবার ভুলে যাই । হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের থেকে বর্ণিত , রাসুল (সা।) বলেছেন-" তোমরা কেবল সৌন্দর্যের জন্য নারীদেরকে বিয়ে করোনা । কেননা , এই সৌন্দর্য তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কেবল ধন সম্পদের জন্য বিয়ে করোনা , কেননা তাদের ধন সম্পদ তাদেরকে অহংকারী বানিয়ে দিতে পারে। বরঞ্চ তাদের দ্বীনদারীর ভিত্তিতে তাদেরকে বিয়ে করো। মনে রেখো – একটি কালো বাদী ও যদি দ্বীনদার হয়, তবে সে আল্লাহর চোখে সুন্দরী সম্ভ্রান্ত অধার্মিক নারীর চেয়ে উত্তম।।

আল্লাহর রাসুলের এই কথা টা আমাদের সমাজের কয়জন যুবক মানে?

এখনো যখন আশেপাশে দেখি ভালো চরিত্রের আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ে হচ্ছেনা , শুধু চামড়ার রঙের জন্য তখন খুব দুঃখ লাগে। এটা আমাদের সমাজের যুবকদের বড় ব্যর্থতা যে, সুন্দর আর অসুন্দরের ক্যাচালে পড়ে চরিত্রবান খাঁটি হীরাগুলো কে চিনতে ভুল করে।

হায়রে বিয়ে! হায়রে লজ্জা ! (পর্ব- ২)

13 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ানা জেরিন

ঝুমানাদের ক্লাসে দুজন নতুন নতুন প্রেমে পড়েছে। দুজনই মাশাল্লাহ দেখতে শুনতে সেরকম। সবাই জানে তাদের খবর। তো সেদিন ইফতার পার্টির আয়োজন নিয়ে কথা হচ্ছিলো সবার সাথে। খাবারের আইটেম আর পরিমাণ দেখে একজন বলছিল – এতো রকম খাবার! এটা তো পুরা বিয়ের আয়োজন মনে হচ্ছে! তার সামনেই সেই জুটির মেয়েটি দাড়িয়ে ছিল। তার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল, ঝুমানা বলল – তাহলে এক কাজ করি! ওদের ২ জনের বিয়ে দিয়ে দেই। এভাবে প্রেম করে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বিয়ে করে যা খুশি করুক, কি বলিস তোরা? হায়! হায়! ঝুমানার প্রস্তাব দেখি কেউ সমর্থন করেনা। একজন তো মুখ বাঁকিয়ে বলেই বসলো – হ! খাইয়া কাম নাই! এই বয়সে বিয়ে করবে! জীবনটাই নষ্ট।

এটা আমাদের সমাজের খুব সাধারণ একটা চিত্র। এটা এমন এক সমাজ যেখানে বিয়েকে সবচেয়ে কঠিন একটা সামাজিক প্রথায় পরিণত করা হয়েছে আচার আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে। আর এমন সমাজেই প্রেম করা বিয়ে করার চেয়ে ১০১ গুন বেশি সহজ বলে পরিগনিত হওয়াটাই কি স্বাভাবিক নয়?

গত পর্বে ছেলেদের সুন্দরের প্রতি অন্ধ ভালবাসার কাহিনী ও কুফল বলেছিলাম। এ পর্বে মেয়েদের কিছু বলবো।

মেয়েরা জন্মগতভাবেই নিজেদের নিয়ে সবসময় অনিশ্চয়তা বোধ করে। সেটা সামাজিক, পারিবারিক, শারীরিক, বিভিন্ন কারনেই হতে পারে। তাই, নিজের সঙ্গী হিসেবে নিজের থেকে বেশি যোগ্য ব্যক্তিকেই বেছে নেয়। এই যোগ্য ব্যক্তি বাছাইয়ের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি যে বৈশিষ্ট্যটা ছেলেদের যোগ্যতা মাপতে ব্যাবহার হয় তা হল ব্যাংকে কত আছে? কত বড় চাকরী করে? নামের শুরুতে কিংবা শেষে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পদবী লাগানো আছে কিনা? কিংবা ছেলের বাপের কত বিশাল বাড়ি আছে। আরও একটা শর্তও ইদানিং কন্যাকুল খুব গুরুত্ব দেয়, সেটা হল – ছেলের দাড়ি নেই তো আবার! হুজুর বিয়ে করবে কে? খ্যাত! গাইয়া ইত্যাদি ।

একবার এক ডাক্তার আপুকে দেখতে এলো ছেলে পক্ষ। আপু আবার শর্ত দিয়েছিলো উনি দাড়িওয়ালা কাউকে বিয়ে করবেননা। কিন্তু কথায় আছে না – যে যা নিন্দে, তার গায়ে তা বিন্দে!

আপুকে যে ভাইয়া দেখতে এলো তিনি আবার দাড়িওয়ালা। ছেলেমেয়েকে একান্তে কথা বলার সুযোগ দিয়ে মুরব্বীরা চলে গেলো।** দুজনের কথোপকথন শুরু হওয়ার আগেই আপু ভাইয়ার দিকে এক নজর দেখেই মুখ ফোঁসকে বলে ফেললেন– গবেট!

হায় হায়! সেই দিন তো মহা গ্যাঞ্জাম! ভাইয়া মনের দুঃখে শেষ! তাকে গবেট বলায়। যদিও পরবর্তীতে এই গবেট এর মালায় ই গলা দিতে হয়েছিলো।

যাই হোক, আজকের ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক ।

ঘটনা – ২

কৈশোর থেকেই নোমান কিছুটা ইঁচড়ে পাকা স্বভাবের। মা অনেক চোখে চোখে রাখলেও এতো দুরন্ত ছেলেকে সামলে রাখা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ক্লাসে ছেলের চেয়ে মেয়ে বন্ধুই তার বেশি। চার্মিং ইমেজের জন্য মেয়েদের কাছে সে বেশ পপুলার। আজ ওই পাশের বাসার মেয়ে ডাক দেয় তো কাল ছাত্রী পারফিউম গিফট করে, পরশু এলাকার ছোট বোন প্রপোজ করে। মোট কথা, কৈশোর থেকে যৌবনে আসতে তার জীবন কখনোই শূন্য ছিলনা। কিন্তু কারো প্রতি ই সে ওইরকম টান বোধ করতনা। সবই ছিল সময় কাটানোর ছল।

অবশেষে এমন একজন তার জীবনে এসেই গেলো। পরিচয় ফেসবুকে, মেয়েটার ছবি দেখেই নোমান কাত হয়ে গেছে। মেয়েটার নাম ইশিতা। এরপর প্রায় ই তারা ঘুরতে যায়, একসাথে খাওয়া, সিনেমা দেখা আরও কতো কি! এখন আর সে আগের মতো ১০০ টা মেয়ের পিছু ঘোরে না। নোমানের জগত ইশিতাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই নোমান ইশিতা বিয়ে করে ফেলে কাউকে না জানিয়ে।

কিছুদিন পর নোমানের মা মারা যায়। বাবা বিয়ে করে নতুন সংসার পাতে। নোমানেরও পড়া শেষ হয়ে চাকরী করার পালা। ছন্নছাড়া সংসারে নিজের জীবন গুছিয়ে নেওয়ার কোন উপায় নেই। ইশিতাকে খাওয়ানোর সামর্থ্যও তার নেই। কোনমতে একটা চাকরী জুটে যায় নোমানের। প্রাইভেট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে যেমন বেতন পাওয়া যায়, বেতন তেমনই। এই বেতন দিয়ে বাসা ভাড়া খাওয়া দাওয়া আর মাঝে মাঝে ছোট ভাই বোনদেরকে কিছু হাত খরচই দেওয়া যায়, বউ পালা যায়না।

ওদিকে ইশিতার বাবা সুপ্রিম কোর্টের বড় উকিল। কীভাবে যেন তিনি সব জেনেছেন। তিনি এমন চালচুলাহীন ছেলের সাথে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দিবেন না। ইশিতার মা ইশিতাকে অনেক বুঝায়। এমন ছেলেকে বিয়ে করে সে ভালো থাকতে পারবে না, এমন আয়েসি জীবন যাপন করতে পারবেনা।

বুঝাতে বুঝাতে ইশিতার চোখে একদিন বাস্তবতা ধরা দেয়। যেদিন দেখে ঘুরতে যাওয়ার সময় নোমানের পকেটে সামান্য সি এন জি ভাড়াও নেই। নোমান ইশিতাকে বলে মাসের শেষে তার হাতে একটু টানাটানিই থাকে। এভাবে বেশ কিছুদিন ঘোরার পর ইশিতার আর ভাল লাগে না। এমন জীবনে সে অভ্যস্ত নয়। আর নোমান আগে এমন ছিল না। আগে সে দু হাত ভরে খরচ করতো ইশিতার জন্য। আর এখন কেমন যেন কিপটে হয়ে গেছে। আর তাছাড়া নোমানদের ভাঙ্গা বাড়িটাও তার কাছে নিজে থাকার জন্য বড় বেমানান ঠেকে ।

ইশিতার খালাতো ভাই শুভ থাকে আমেরিকায়। সে দেশে এসেছে বিয়ে করতে। ইশিতার বাবার খুব পছন্দ শুভকে। শুভর সাথে ইশিতার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। ওদিকে নোমানও তালাক দেয় না ইশিতাকে। কিন্তু যে চলে যেতে চায়, তাকেই বা কীভাবে ধরে রাখা যায়। তাই নোমান স্ব উদ্যোগে ইশিতাকে তালাক দিয়ে দেয়। ইশিতার বিয়ে হয়ে যায়। আর নোমান পড়ে রয় পিছনে নিঃসঙ্গ বালুকায়।

ঘটনা – ৩

ইয়াসমিন আপুর বিয়ে ঠিক হয়েছিলো এ মাসের ২৬ তারিখ। কিন্তু বিচিত্র কারনে তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন। ৩৩ বছর বয়সে ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া মূর্খতাই বটে। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু তার এক কথা – ছেলে নাকি তার যোগ্য নয়। ভাইয়ার একটা ছোট ফটোকপির দোকান আছে, এক কথায় বলা যায় ঢাকা শহরে পরিচয় দেওয়ার মতো বড় কোন পরিচয় নেই। ইয়াসমিন আপুও যে খুব আহামরি সুন্দরী তাও নয়। কালো শুকনা তাল গাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আগে কেউ করেনি। সবাই ভেবেছে – পড়ালেখা করছে আস্তে ধীরে বিয়ে দেবে। কিন্তু সেই আস্তে ধীরে করতে করতে যে তার বিয়ের বয়স আর বিয়ের আগ্রহ দুটোই হারিয়ে গেছে সে খবর আর কেউ রাখে নি । এখন সে একেকবার একেক বাহানা করে বিয়ে থেকে বাঁচতে চায়।

নাইম ভাইয়া খুব ভালো একজন মানুষ। যেমন নামাজী তেমন সৎ। তাই হয়তো বাটপারি করে জীবনে বড় হওয়া শিখেন নি। এমনকি জীবনের সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট সিদ্ধান্ত নিতে যেয়েও বাহ্যিকতাকে প্রাধান্য দেন নি। ছেলের গুনে ঘটক এতোটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে তিনি যে কোন মূল্যে ইয়াসমিনের সাথে বিয়ে দিয়েই ছাড়বেন।

ভাইয়ার কাছে কালো সাদা কোন ব্যাপার না, তিনি বলেছেন – কালো মেয়েও সে বিয়ে করতে রাজি যদি মেয়ে পর্দা করে এবং নামাজী হয়। দেখতে দেখতে আপুকে তার পছন্দ হয়ে গেলো। কিন্তু ভাইয়াকে আপুর একটুও নাকি ভাল লাগে নি। ভাইয়ার একটাই দোষ! বেচারা খুব গরীব। এতো গরীব ছেলে উনি কীভাবে বিয়ে করবেন!

বিয়ের সব কিছু ঠিকঠাক। আমার খালামনি এটার ঘটকালি করেছেন। ভাইয়া বিয়ের শাড়ি কিনার জন্য টাকা দিয়েছেন, সেই টাকা দিয়ে শাড়িও কেনা শেষ। কিন্তু বিয়ের এক সপ্তাহ আগে আপু বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন, গরীব পাত্র বিয়ে করবেন না বলে। ভাইয়াকে বিয়ের জন্য কেনা শাড়ি ফেরত দেওয়া হোল। বউ তো পেল না, বউয়ের শাড়ি ধরে কিছুক্ষন কেঁদেও যদি সুখ হয়।

উপরের ২ টি ঘটনাই বর্তমানে সমাজে খুব সচরাচর দেখা যায়। এই সমাজে যেমন ভদ্র নামাজী পাত্রী খোঁজা হয় না, ঠিক তেমনি পাত্রের যোগ্যতায়ও এই ২ টি শব্দ অনুপস্থিত। একটা ২ পেইজের জীবনবৃত্তান্তে কি কোথাও লেখা থাকে ছেলের জীবন দর্শন কি? ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা কি? সে কতটুকু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে? তবুও ওই ২ পেইজের জীবন বৃত্তান্ত দেখেই একটা মেয়ে একটা ছেলের ২ জীবনের সঙ্গী হয়ে যেতে প্রস্তুত হয়। খুব স্বাভাবিক একটা সত্য

কথা হল – সৎ মানুষ নিশ্চয়ই রাতারাতি বিল গেটস বনে যাবে না! তার বড় হতে কিছু সময়ের দরকার হয়। আর সেই কিছু সময় পর্যন্ত বসে থাকলে সারাজীবনের অর্ধেকের বেশি সময় পার হয়ে যাবে, এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

তাহলে আমরা কেন এমনটা আশা করি যে, এমন একজন মানুষকেই জীবনসঙ্গী করতে হবে, যার অলরেডি কাড়ি কাড়ি টাকা আছে? বরঞ্চ এমনটা কি ভাবা যায়না যে পাশাপাশি থেকে ভদ্র ভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজনকে সাথী করে জীবনে যুদ্ধ করে টিকে থাকার চেষ্টা করাই জীবনের সার্থকতা?

এসব কারনেই দেখা যায়, অনেক বড়লোকের সাথে বিয়ে হয়েও অনেক নারীর প্রাণ ধুকে ধুকে কেঁদে যায়। পাশের বাসার বাড়িওয়ালা ডাক্তার তার নববধুকে যৌতুকের জন্য মেরে ফেললো। তার ৫ তালা বাড়িতে কিসের অভাব ছিল? টাকা পয়সার অভাবের চেয়েও একটা বড় অভাব আছে এই সমাজে। সেটা হোল নৈতিকতা। সেই অভাব যে ছেলের মধ্যে থাকবে, তার যত টাকাই থাকুক, সে ঘরে দুঃখ কোন না কোন বাহানায় ঠিকই জায়গা করে নেয়। এই জন্যই বলছি - কে কত টাকা দেনমোহর দিতে পারলো, কতো বেশি জাঁকজমক করে বিয়ে করতে পারলো, ওদিকে খেয়াল না দিয়ে একবার রক্ত–মাংসের মানুষটিকে বিবেচনা করুন, তার মাঝে লুকিয়ে থাকা নৈতিকতা বোধকে মূল্যায়ন করুন, সুখ অবশ্যই ধরা দিবে আপনাদের মণিকোঠায়।

হায়রে বিয়ে! হায়রে লজ্জা ! (পর্ব – ৩)

13 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ানা জেরিন

বিয়ের পরে আজকালকের সমাজে সবচেয়ে বেশি যে জিনিষটা নিয়ে সমস্যা হয় সেটা হোল চাকরি। অনেক ছেলেরা নিজের বউয়ের বাহিরে যাওয়া মেনে নিতে পারেনা, আবার অনেকে বউ চাকরি করবেনা এটা মেনে নিতে পারেনা। আসলে এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে? তাত্বিক কথায় না যেয়ে সহজ ভাষায় বললে বলা যায়,

ইসলাম নারীকে চাকরি করতে বাঁধা ও দেয়না, এবং বাধ্য করায় ও বিশ্বাসী নয়। নারী যদি নিজের পর্দা ও শরীয়ত ঠিক রেখে চাকরী করতে পারে ইসলামের এতে আপত্তি নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে কথা থেকে যায়। ইসলাম নারীর এতো কঠিন জীবন চায়না। কারন এতে নারীর শারীরিক ও মানসিক চাপ বাড়ে।

তাই প্রয়োজন ও সুযোগ বুঝে চাকরী করাই উত্তম। যাই হোক , সেদিকে যাচ্ছিনা আর।আজকের ঘটনায় চলে যাচ্ছি ।

ঘটনা – ৪

হৃদিতা বাবা মার বড় মেয়ে। পড়ুয়া আর খুব চটপটে মেয়ে। দেখতে খুব আহামরি সুন্দরী নয়, তবে স্বাস্থ্য ভালো । ভিকারুন্নিসায় যখন পড়তো তখনি পরিচয় হয় রিফাতের সাথে। তখন রিফাত তেজগাঁ কলেজের অনার্সের ছাত্র। দেখতে শুনতে কোন দিক দিয়েই রিফাত হৃদিতার যোগ্য নয় হয়তো, কিন্তু প্রতিদিন হৃদিতার জন্য কলেজের সামনে যেয়ে দাড়িয়ে থাকতো রিফাত। এই জন্য মায়া থেকেই রিফাত কে ভালোবেসে ফেলে হৃদিটা।

আর ১০ টা ভালো ছাত্রীর মতোই বাবা মার অতিরিক্ত যত্ন পেতো সে। তাই কলেজ শেষ হলেই বাসায় যেতে হতো। ওই বাসায় যাওয়ার পথ টুকু ই রিফাত হৃদিটার সাথে থাকতো।

এভাবে দেখতে দেখতে হৃদিতার ইন্টার পরীক্ষা চলে আসলো। রেজাল্ট কিছুটা খারাপ হলো তার। কি করবে! প্রেমের মরা যে রেজাল্টেই প্রতীয়মান হয়।

হৃদিতার বাবা প্রচণ্ড বদ রাগী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মেয়েকে আচ্ছা মতো শাসালেন । রিফাত ও হৃদিতাকে মেডিকেলের জন্য খুব চাপ দিতে থাকে। মেডিকেলে ভর্তি না হতে পারলে সে নাকি হৃদিটার সাথে কোন সম্পর্কই রাখবেনা।

আসলে রিফাত একেবারেই অজ পাড়া গায়ের ছেলে। সে কিছুটা লোভী , এসব ব্যাপারে। হৃদিতাকে ভালবাসার পিছনে তার অনেক স্বার্থ আছে। সে স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটলে তার রাগ পশুত্বকে ও হার মানায়।

অতিরিক্ত মানসিক চাপে হৃদিতা মেডিকেল ও মিস করলো। ঠাই পেলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ।

রিফাত এতে খুব নারাজ, যদিও রিফাত নিজে পরে তেজগাঁ কলেজে তবুও হৃদি তা কে সে পাত্তা দেয়না। কথায় কথায় বকে, আর চাপ দেয় তাকে ক্লাসে ফাস্ট হতে হবে, আবার মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে হবে। মেডিকেল আর ভার্সিটির পড়া লিখা একসাথে সামলে দিশেহারা। এছাড়া রিফাত ও কেমন হয়ে গেছে জানি। হৃদিতা র চেহারা, ফিগার এসব নিয়ে প্রায় ই উল্টা পাল্টা কথা বলে। কোক খেতে দেয়না সে হৃদিতা কে।বলে– তোমার বডি এমনি ই তো কদাকার! এর উপর আরও কোক খেয়ে মোটা হবে নাকি?

পাশ দিয়ে কোন সুন্দর মেয়ে গেলে রিফাত পিপাসু নয়নে চেয়ে থাকে। তার হায় আফসোস হৃদিটা পড়ে ফেলে তার চোখের ভাষায়। আর মনে মনে ভাবে, ও ভালো না বাসলে আমার যে কি হতো? বেচারা! আমার মতো অসুন্দর একটা মেয়েকে ভালো বাসল। থাক ! এসব সহ্য করে নেই।

দেখতে দেখতে হৃদিতার মেডিকেল পরীক্ষা চলে আসলো। কিন্তু খুব আশানুরূপ হোল না। ও দিকে ভার্সিটিতেও যাওয়া হয়না বহুদিন।

মেডিকেলের রেজাল্ট বের হোল। হৃদিটা এবারও মিস করলো। খবর টা রিফাত কে জানানোর পর সে তার ফোন কেটে দিলো। হৃদিতা কতো বার কল করলো। কিন্তু তার যে ধরার নাম নেই!

হৃদিটা ঠিক করলো রিফাতের মেসে যাবে। মেসের সামনে যেয়ে দাড়িয়ে কল দিলো রিফাত কে, দোকান থেকে।

এবার শে ফোন ধরল । হৃদিতা বলল- আমি তোমার বাসার সামনে, প্লিয আমাকে মাফ করে দাও?

- তুই আসছিস ক্যান? তোরে এখানে কে আসতে বলছে হতচ্ছারি?

- তুমি আমার সাথে এমন করছ কেন? তুই তকারি করছ কেন?

- তোর মতো *****জাদির সাথে সম্পর্ক না রাখলে আমার কিচ্ছু যায় আসেনা, মেডিকেলে chance পাসনি আবার কথা বলতে আসছিস! আমার সাথে দেখা করতে আসছিস! তোর সাহস তো কম না!

- ঠিক আছে। আমি বাসায় চলে গেলাম। তুমি ভালো থাকো।

হৃদিতা বাসায় যেয়ে হাপুস নয়নে কাঁদে । দেওয়ালে মাথা ঠুকে , যা পায় তাই দিয়ে নিজেকে আঘাত করে । রিফাতের ব্যাবহার মেনে নিতে পারেনা। অনেক কষ্টে একটা রাত তার পার হয়।

সকালে ভার্সিটি তে যেয়ে রিক্সা থেকে নামার সময় দেখে রিফাত দাড়িয়ে আছে। হৃদিতা কথা বলেনা। খুব রাগ হয় তার। রিফাত বলে -i am sorry, কাল মেজাজ খারাপ ছিল, তোমাকে কতবার বলেছি মেজাজ যখন খারাপ থাকে আমার সাথে কথা বলবে না।

ওদের রাগারাগি ভেঙ্গে যায়। দিন কাটতে থাকে।

একদিন হৃদিতা রিফাতের জন্য পোলাও রান্না করে আনে। রিফাত খুব রাগ হয়।

- তোমাকে রান্না করতে কে বলছে?

-রান্না না করলে রান্না শিখবো কীভাবে বলো ?

- তুমি কি চুলা ঠেলবা নাকি? তুমি করবা চাকরী , তোমাকে রান্না শিখতে হবেনা। ভালো করে পড়ো । বড় চাকরী করতে হবে তোমাকে।

হৃদিতা মাথা নাড়ে।

অনার্স পাশ করার পর , সে বিভিন্ন যায়গায় চাকরী খুঁজতে থাকে। রিফাত তার ২ বছর আগেই বের হলেও এখনো বেকার। একটা টিউশনি ও সে করেনা। তার হাত খরচ দিতে দিতে হৃদিতার জান তেজপাতা। রিফাত ইদানিং হৃদটতা র সাথে অমানুষের মতো আচরণ করে। চাকরী কেন পায়না হৃদিতা এই তার রাগ।

অবশেষে একটা ব্যাংকে চাকরী পায় সে। বাবা মা কিছুতেই রিফাত কে মেনে নেয়না। তাই বাধ্য হয়েই হৃদিতার চলে যেতে হয় রিফাতের সাথে। রিফাত আর হৃদিতা বিয়ে করে ফেলে।

কয়েকদিন বেশ ভালোই চলছিলো সংসার ওদের। কিন্তু একজনের সামান্য ইনকামে সংসার চলেনা। হৃদিতার ও খুব কষ্ট হয়। চাকরী ঘর দুটোই সে দেখে। আর রিফাত আছে বন্ধু বান্ধব নিয়ে তাস খেলা ঘোরা ফেরা এসবের তালে। হৃদিতার খুব কষ্ট লাগে। কিছু বলতেও পারেনা। রিফাত মারতে আসে । কোন কোন দিন হাত ও তুলে সে। শুধু শুধু ভালোবাসার দিকে চেয়ে হৃদিতা আড়াল করে বুকের দীর্ঘশ্বাস ।

এই সমাজে যেমন চাকরী করা বউ খুঁজা হয় , তেমনি এর উল্টা টাও কিন্তু করা হয়। কিন্তু ব্যাপার হোল যে ২ টাই অতিরিক্ত পর্যায়ে চলে যায়। কারো চাকরী করা দরকার ও হতে পারে, সেক্ষেত্রে মানা যায়। কিন্তু যখন একজন নারী সংসারের সমস্ত কাজের সাথে অর্থনৈতিক দ্বায় দায়িত্ব ও একা নিজের কাঁধে তুলে নেয়, ব্যাপারটা তার জন্য অমানুষিক হয়ে যায়। নারীকে ইসলাম বাধ্য করেনি বাহিরে উপার্জনের জন্য। এই দায়িত্ব পুরোটাই পুরুষের । এর জবাবদিহিতাও পুরুষকেই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনমতেই বউকে force করা যাবেনা যে , তাকে চাকরী করতেই হবে।

তবে ইদানিং কিছু লোভী মানুষ বিয়ে করার সময় বেছে বেছে ভালো চাকুরীজীবী মেয়েদের বিয়ে করতে চায়। এই নজীর ও সমাজে কম নয়। এক আপুকে চিনি, যিনি ডক্টর , আমেরিকায় থাকেন, ভালো চাকরী করেন, কিন্তু বাবার বাড়িতে এক টাকা ও পাঠাতে পারেন না, কেননা, ওনার স্বামী ওনার বেতন পাওয়ার সাথে সাথে পাই পাই হিসাব করে ফেলেন, এবং নিজের কুক্ষিগত করে ফেলেন। এটা নিশ্চয়ই নারী স্বাধীনতা নয় তাইনা?

ইসলাম নারীকে নিজের উপার্জিত অর্থের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আর এছাড়া লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে যেসব বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কেন জানি সেসব সম্পর্কে কিছু না কিছু ছন্দ পতন দেখাই যায়। ছেলেদের অবশ্যই এই নিয়তে বিয়ে করা উচিৎ নয় যে তার জীবন সঙ্গিনী সংসার ও বাহির ২ টাই সামলাবে । তবে এর বিপরীত চিত্র ও আছে, পরের পর্বে বলবো ইনশাল্লাহ । আল্লাহ আমাদের এই ধরনের লোভকাতরতার সম্পর্ক থেকে রক্ষা করুন।

হায়রে বিয়ে! হায়রে লজ্জা! – (শেষ পর্ব)

13 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ানা জেরিন

টম অ্যান্ড জেরির খুব জনপ্রিয় একটি পর্ব আছে , I am ugly.

কার্টুন টা আমার খুব প্রিয়। আধা ঘন্টার একটা কার্টুন। এটায় সেই পিচ্চি লুতুপুতু হলুদ হাঁসখানা আছে, যে নিজেকে অসুন্দর ভাবে এবং মনের দুঃখে বারবার টমের কাছে নিজেকে সঁপে দেয় যাতে টম তাকে খেয়ে ফেলে। সে আর বাঁচতে চায়না, কিন্তু বিপত্তি ঘটায় জেরি। সে বারবার তাকে বাঁচায় এবং নানা ভাবে তাকে সাজিয়ে দেখায় যে তাকে সুন্দর লাগছে। কিন্তু এতে তার মন গলেনা , সে তবুও নিজেকে অসুন্দর মনে করে ।সে বারবার আত্মহত্যা করতে চায়। অবশেষে এই হাঁসকুলেরই একজন রমণী কে দেখে সে নিজে কতোটা সুন্দর বুঝতে পারে, এবং ২ জন একসাথে মিলে যায়।

এই কার্টুন টা আসলে শিখায় , নিজেকে নিজের কাছে সব সময় ই অসুন্দর মনে হয় , কিন্তু নিজের প্রকৃত গুরুত্ব ও মর্যাদা তখনি বুঝা যায় যখন তার সাথে মানসিকতা আর সব কিছুর মিল আছে এমন কেউ সঙ্গী হয়। তাই তো ইসলামে জীবনসঙ্গীকে একে অপরের লেবাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই লেবাসের মাপ টা হওয়া চাই একি রকম , এতে মানসিকতা , সামাজিক অবস্থান , আদর্শগত বিশ্বাসের যদি গড়মিল হয়ে যায় তাহলে মাপটাও যেমন বড় ছোট হয়ে যায় , ঠিক তেমনি জীবন চলার পথে ২ জন ২জনের সহমর্মী , সহকর্মী হওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যায়।

কখনো কখনো জীবন বিধান ও আদর্শকে ২ জন মানুষ ২ দৃষ্টিতে দেখে। কারো কাছে যেটা স্বাভাবিক অপরের কাছে তাই হয়ে যায় অস্বাভাবিক । বিয়ের আগে ও পরে ছেলে মেয়ের মাঝে যেসব জিনিষ নিয়ে মনোমালিন্য হয় তার বড় একটি অধ্যায় জুড়ে আছে বউ কি চাকরী করবে নাকি করবেনা!

এক্ষেত্রে সমাজে ২ রকম চিত্র দেখা যায়

১- চাকরী বাধ্যতামূলক করতেই হবে

২- যতো মেধা বা যোগ্যতা বা দরকারই থাকনা কেন চাকরী করা যাবেনা।

এসব বিষয় নিয়ে তর্কে বিতর্কে বহু বিয়ে হওয়ার আগেই ভেঙ্গে যেতে দেখেছি, আবার অনেকেই বিয়ের পর ও এসব মনোমালিন্য নিয়ে একই ছাদের নিচে অসন্তুষ্ট হয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ঘটনা – ৬

তানিয়া জীবনের প্রতি কিছুটা ত্যাক্ত হয়ে গেছে। কম বয়সে ডাক্তারি পড়ুয়া পাত্র পেয়ে বাবা মা বিয়ে দিয়ে দিলো। কিন্তু তানিয়া তখন সবে মাত্র উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী । তার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। আর মুসা ও তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে সংসার পরে করা হবে বলে তানিয়া বাবার বাড়ি ই রয়ে গেলো।

তানিয়া ভালো ছাত্রী, তাই জীবনে কিছু করার খুব আগ্রহ তার। ভর্তি হোল গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায়। ওদিকে মুসা ও বেশ ভালো ভাবে ডাক্তারি পড়তে লাগলো। দিন গুলো ভালোই কাটছিল ওদের। সংসারের তাড়না নেই, কিন্তু ২ জন ২ জনের ভালো বন্ধু হয়ে পথ চলা। কিন্তু বাঁধ সাধল মুসার হটাত আকস্মিক পরিবর্তন ।

আচমকা একদিন জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টি ভঙ্গি বদলে গেলো। তানিয়ার পড়ালেখা তার অর্থহীন মনে হতে লাগলো । মেয়ে মানুষ এতো পড়ে কি করবে? তানিয়ার আবার নিজেকে নিয়ে খুব আশা সে ভালো কলামিস্ট হবে, তার পড়ালেখা ধ্যান ধারনাই যে এসব নিয়ে! কিন্তু মুসা অন্য জগতের মানুষ। দেশের পরিস্থিতি , রাজনৈতিক অবস্থা কিছুই যে তাকে আকৃষ্ট করেনা। সে শুধু ৫ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়তে পারলেই খুশি। যখন তানিয়া সমাজের দুঃস্থ অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার কথা ভাবে, তখন মুসা ভাবে আল্লাহ ই এদের অভিভাবক আল্লাহ ই দেখবেন। যখন রাসুলের অবমাননায় তানিয়া পত্রিকায় কলাম লেখে , মুসা তা দেখার পর আচ্ছা মতো বকে দেয় ওকে। বলে যে- তোমাকে কে বলেছে এসবের প্রতিবাদ করতে? আল্লাহ্‌র রাসুল কি কখনো নিজের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তার জবাব দিয়েছেন?

এরকম প্রতি পদে পদে মুসা আর তানিয়ার মনোমালিন্য হতে থাকে। মুসা তানিয়াকে হাত মোজা পা মোজা পড়তে বলে, বলে বিয়ের পর অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া যাবেনা। কিন্তু, তানিয়া সেসব মানতে চায়না। এমন কি , কোনদিন ওর লিখা ছাপা হলে সেদিন মুসার চেহারার দিকে তাকানো যায়না। মুখটা সে প্যাঁচার মতো করে রাখে। তানিয়া কোন কলিগের সাথে বা কোন বন্ধুর সাথে কথা বললে মুসার পিত্তি জ্বলে যায়।

মুসা বলে তার সংসারে টি ভি থাকবেনা , খবর দেখা যাবেনা। এসব ঘরে থাকলেই অশান্তি হবে, তানিয়া দেশ আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে। তানিয়ার কাজ শুধু বাচ্চা জন্ম দেওয়া , আর মানুষ করা। এর মধ্যে মুসার ডাক্তারি পড়া শেষ হয়ে গেলো। শত রাগারাগির মধ্যেও তারা ছোট একটা ফ্ল্যাটে তাদের সংসার শুরু করলো।

এভাবেই দিন যেতে থাকে। মুসা ভীষণ ঘারতেরা একটা ছেলে। রাগারাগি হলে সে কোনদিন আগ বাড়িয়ে রাগ ভাঙ্গায় না। এমন কি কথায় কথায় তালাক প্রসঙ্গ টেনে আনে। রাত বিরাতে তানিয়াকে বাসা থেকে কিংবা মুসার জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। মোট কথা তাদের রাগারাগি সব সময় ই বিপদ সীমা অতিক্রম করে করে দশা ।

বছর ২ পরে তানিয়া পি এইচ ডির স্কলারশিপ পেলো কানাডায়। কিন্তু মুসা এতে কিঞ্চিৎ খুশি কিংবা আগ্রহী না। অনার্স পাশ করেছে এই তো বেশি আবার পি এইচ ডি করতে হবে কেন! এমনি মেয়ে মানুষের এতো অতিরিক্ত জ্ঞান তার অসহ্য লাগে। তাদের জন্য রান্না শেখা আর বাচ্চা পালাটাই জরুরী। মুসার প্রবল আপত্তিতে ওর আর পি এইচ ডি করা হয়না।

তানিয়ার একটা জাতীয় দৈনিকে চাকরী হয়ে যায়। যেখানে পর্দা ঠিক রেখেও কাজ করা যাবে। কিন্তু মুসা এতে কিছুতেই রাজি হয়না। সে তানিয়াকে শর্ত দেয় হয় সে চাকরী করবে না হয় মুসাকে বেঁছে নিবে। তানিয়া কিছুটা দিশেহারা হয়ে যায়। তার জীবনের চাওয়া পাওয়া কিছুই যে তার জীবন সঙ্গীর সাথে মিলেনা, মিলেনা কোন আদর্শ ও। তাহলে এই একসাথে বেঁচে থাকার অর্থ কি! মুসা তানিয়ার চাওয়া পাওয়া গুলোকে বুঝতে পারেনা, তেমনি তানিয়াও অনেক চেষ্টা করেও মুসার বোঝাসম শর্ত গুলো মেনে নিতে পারেনা। ফলশ্রুতিতে যা হওয়ার তাই হয়। তানিয়া মুসার জীবন থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি সংসার গড়ার আগেই মিসমার হয়ে যায় নিজেদের আদর্শগত অমিলের কারনে।

আমাদের আশেপাশে শিক্ষিত ভদ্র পরিবার গুলোতেই এই গল্পের মতো হাজারও গল্প শুনতে পাওয়া যাবে। যাদের সংসারে এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে নিত্য অশান্তি লেগেই থাকে। অনেকটা বেগম রোকেয়ার সেই প্রবন্ধটার মতো, যেখানে বলা হয়েছিলো স্বামী যখন ঋণ ভারে জর্জরিত তখন স্ত্রী ভাবছে কীভাবে বালিশের আরেকটা কুশন বানানো যায়। সাহিত্তের পাতায় পাতায় জীবন সঙ্গীর সাথে মানসিকতার অমিলকে একটা অভিশাপ হিসেবেই দেখা হয়েছে। রক্তাক্ত প্রান্তরে ইব্রাহিম কারদির সাথে জোহরা বানুর মিলের প্রধান অন্তরায় ছিল আদর্শিক দ্বন্দ্ব। এবং সেই দ্বন্দ্ব তারা জীবনভর চেষ্টা করেও শোধরাতে পারেন নি।

তাই আপনি যখন আপনার জীবনসঙ্গী বেঁছে নিবেন তখন অবশ্যই আদর্শগত মিল খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে বিয়ের এই সম্পর্কটা আপনাকে দিবে আপনার মনের কথা গুলোকে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ, আপনার স্বপ্নে আপনার সঙ্গী কেও সঙ্গিনী করে নেওয়ার সুযোগ। অন্যথায় জীবন হয়ে যাবে নরকের মতোই , কারন এসব ক্ষেত্রে সেক্রিফাইছ কিংবা কম্প্রমাইজ করাটা খুব কঠিন হয়ে দাড়ায় ।

৪ পর্বের এই ধারাবাহিকের এটাই শেষ পর্ব।

শেষ করছি ইউটিউবের একটা ভিডিওর কথা বলে, ভিডিওটির নাম caring husband.

ভিডিওটি হয়তো অনেকেই দেখে থাকবেন। ২ দম্পত্তির স্বামী স্ত্রী একসাথে যাচ্ছিলেন। আচমকা একজনের হাত অপরজনের স্ত্রীর গায়ে লাগলো। এর পর ২ জন পুরুষ মিলে একে অপরের বউকে মারা শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি যত্নের ফসল। পরিশেষে ২ দম্পত্তির ২ জন মহিলাই গুরতর আহত হোল। এর থেকে বুঝা যায়,excess of anything is very bad.আমরা যে কোন কিছুই তা যদি অতিরিক্ত করি তা কখনোই ভালো ফল বয়ে আনেনা। হোক তা দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত , হোক তা নিজের আদর্শ , হোক তা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা , কিংবা সাদা কালো রং। আমরা মানুষ, আমাদের কারো পক্ষেই ১০০% পারফেক্ট হওয়া সম্ভব নয়। আপনার জীবন সঙ্গীর ও কোন না কোন অভাব থাকবেই ,এটাই স্বাভাবিক। সেসব মেনে নিয়ে কম্প্রোমাইজ করে, অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে পাশাপাশি কল্যাণময় জীবন কাটিয়ে দিতে পারার মতো ধৈর্য আর সহনশীল চরিত্রই খুব বেশি দরকার আমাদের সমাজে।

সবাইকে আবারো অনেক অনেক ধন্যবাদ , ধৈর্য ধরে এই বোরিং নোট খানা পড়ার জন্য ।

খাদিজা (রাঃ) এর সাথে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বিয়ে

14 October 2014

বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মহিলা। তিনি লোকজনকে নির্দিষ্ট বেতনে ও লভ্যাংশের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে নিয়োগ করতেন। ব্যবসায়ী গোত্র হিসেবে কুরাইশদের নাম-ডাক ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্বের কথা জানতে পেরে তিনি তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে বললেন যে, এজন্য তিনি যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে উত্তম সম্মানী তাঁকে দেবেন। মাইসারাহ নামক এক কিশোরকেও তার সাহায্যের জন্য সঙ্গে দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদিজার পণ্য সামগ্রী ও দাস মাইসারাকে সাথে নিয়ে সিরিয়ায় রওনা হলেন। অনতিবিলম্বে তিনি সিরিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন।

সিরিয়ায় পৌঁছে তিনি জনৈক ধর্মযাজকের গীর্জার নিকটবর্তী এক গাছের নীচে বিশ্রাম করলেন। ধর্মযাজক মাইসারাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গাছটির নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি কে?" মাইসারাহ বললেন, "তিনি হারামের অধিবাসী জনৈক কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তি।" ধর্মযাজক বললেন, "এই গাছের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ কখনো বিশ্রাম নেয়নি!"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আনীত পণ্য বিক্রি করে দিলেন এবং নতুন কিছু জিনিস ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হলেন। পথে যেখানেই দুপুর হয় এবং প্রচন্ড রৌদ্র ওঠে, মাইসারাহ দেখতে পায় যে, দু'জন ফিরিশতা মুহাম্মাদকে ছায়া দিয়ে রৌদ্র থেকে রক্ষা করছে এবং তিনি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে এগিয়ে চলেছেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি খাদিজাকে তার ক্রয় করা পণ্যদ্রব্য বুঝিয়ে দিলেন। খাদিজা ঐ মাল বিক্রি করে প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা লাভ করলেন।

মাইসারাহ খাদিজাকে যাজকের বক্তব্য ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুই ফেরেশতার ছায়াদানের বিষয় অবহিত করলেন। খাদীজা ছিলেন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুদ্ধিমতি ও সম্ভ্রান্ত মহিলা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহত্ব ও সততার সাথে পরিচিত হওয়া তার জন্য একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্যরূপে বিবেচিত হল, যা নিছক আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই তিনি লাভ করলেন। মাইসারাহ কাছে উক্ত অলৌকিক ঘটনার কথা শুনে খাদিজা লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, "ভাই, আপনাদের গোত্রের মধ্যে আপনার যে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, যে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সর্বোপরি আপনার বিশ্বস্ততা, চরিত্রমাধুর্য ও সত্যবাদিতার সুনাম রয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত।" এই কথা বলে খাদিজা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কুরাইশদের মধ্যে খাদিজা ছিলেন সর্বাপেক্ষা অভিজাত বংশীয়া, সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

সম্ভ্রান্ত এবং অতিশয় ধনাঢ্য মহিলা। এ কারণে সম্ভব হলে তার গোত্রের সকলেই তাকে বিয়ে করার অভিলাষ পোষণ করতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিজার এ প্রস্তাব চাচাদেরকে জানালেন। চাচা হামযা খাদিজার পিতা খুয়াইলিদ ইবনে আসাদের (ইবনে আবদুল উযযা ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই) সাথে দেখা করে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিলেন এবং বিয়ে সম্পন্ন হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোহরানা হিসেবে খাদিজাকে ২০ টি উট দিয়েছিলেন। তিনি তার প্রথম স্ত্রী এবং তার জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিয়ে করেননি।

খাদিজার গর্ভে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একমাত্র ইবরাহিম ছাড়া সব সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। খাদিজার গর্ভ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কয়টি সন্তান জন্মে তারা হলেনঃ কাসিম, তাহির তাইয়েব, যয়নাব, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। কাসিমের নামানুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল কাসিম নামেও খ্যাত হন। কাসিম ও তাহির জাহেলিয়াতের যুগেই মারা যান। কিন্তু মেয়েরা সবাই ইসলামের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে পিতার সাথে হিজরাত করেন।

* * * *

- বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তাহির ও তাইয়েব দুই ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এ দুটোই আবদুল্লাহর উপনাম। তাকে এই দুই নামেই ডাকা হতো।
- **সূত্রঃ** সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থ **'সীরাতে ইবনে হিশাম'** থেকে হুবহু উদ্ধৃত।

এক স্বামীর গল্প যিনি তার স্ত্রীর দিকে তাকাতেও লজ্জা পেতেন

4 July 2014

অনুবাদঃ ***Collected Notes And Discussion***

[এ গল্পটি বলেছিলেন কার্ডিওভাসকুলার সার্জন প্রফেসর খালিদ আল জুবাইর, তারই এক লেকচারে।]

একবার আমি আড়াই বছরের এক বাচ্চার চিকিৎসা করি। এটা ছিল এক মঙ্গলবার এবং বুধবারে বাচ্চাটির স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ১১.১৫ এর দিকে ... আমি কখনই ঐ সময়টার কথা ভুলতে পারবো না তখনকার প্রচন্ড আলোড়নের কারনে। এক নার্স আমাকে এসে জানালো যে একটি বাচ্চার হৃদযন্ত্র এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি বাচ্চাটির কাছে গেলাম এবং প্রায় ৪৫ মিনিটের মত *কার্ডিয়াক মাসাজ* করলাম। এই পুরো সময়টা জুড়ে হৃদপিন্ড কাজ করে নি।

তারপর, আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরায় হৃদপিন্ড তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করলো এবং আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। আমি শিশুটির পরিবারকে তার অবস্থা সম্পর্কে জানাতে গেলাম। আপনারা হয়ত জানেন যে, রোগীর পরিবারকে তার খারাপ অবস্থা সম্পর্কে জানানোর বিষয়টা কতটা বিব্রতকর। একজন চিকিৎসকের জন্য এটা সবচাইতে কষ্টসাধ্য কাজগুলোর একটি যদিও এর দরকার আছে। তাই আমি বাচ্চার বাবাকে খুজতে লাগলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না। তখন আমি বাচ্চাটির মাকে দেখতে পেলাম। আমি তাকে জানালাম যে রোগীর গলায় প্রচুর রক্তক্ষরন হৃদপিন্ডের এই হঠাৎ অচলাবস্থার কারন; আমরা রক্তক্ষরনের সঠিক কারন বলতে পারছি না এবং আশংকা করছি তার মস্তিষ্ক মরে গেছে। ... আপনাদের কি মনে হয়? এ কথা শুনে বাচ্চাটির মায়ের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? সে কি কান্না শুরু করেছিল? আমাকে দোষারোপ করছিলো? না। এমন কিছুই হয় নি। বরং তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতা'আলার)" এবং চলে গেলেন।

প্রায় ১০ দিন পর, বাচ্চাটি নড়তে শুরু করলো। আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম এবং খুব আনন্দিত হলাম এ কারনে যে তার মস্তিষ্কের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। ১২ দিন পর বাচ্চাটির হৃদযন্ত্র আবার বন্ধ হয়ে গেল সেই একই জায়গায় রক্তক্ষরনের ফলে। আমরা ৪৫ মিনিটের মত আরেকটা *কার্ডিয়াক মাসাজ* করলাম কিন্তু এবারে আর কাজ হল না, হৃদপিন্ড চালু হলো না। আমি বাচ্চার মাকে জানালাম যে, আর কোন আশা নেই। তখন সে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহ, যদি ওর সুস্থতায় কোন মঙ্গল থেকে থাকে তবে ওকে সুস্থ করে দাও, হে আমার প্রভু!"

আল্লাহর অশেষ রহমতে একটু পরে বাচ্চার হৃদপিন্ড আবার সচল হলো। একজন অভিজ্ঞ *ট্রাকিয়া* বিশেষজ্ঞ রক্তক্ষরন বন্ধ করতে সক্ষম হওয়ার পর হৃদপিন্ডের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত এই ছেলেটি আরো ৬ বার এরকম হৃদপিন্ডের অচলাবস্থার স্বীকার হয়েছিল। ইতোমধ্যে সাড়ে তিন মাসের মত হয়ে গেছে এবং বাচ্চাটি সুস্থ হচ্ছিল বটে কিন্তু চলাফেরা করতে পারছিল না। তারপর যখনই সে একটু করে চলতে আরম্ভ করলো, এর চাইতেও অদ্ভুত এবং বিরাট আরেক মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দিল তার, যা আমি কখনও এর আগে দেখি নি। আমি তার মাকে এই মারাত্মক ঝামেলার কথা জানালাম এবং তিনি কেবল বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ!" এবং চলে গেলেন।

আমরা অনতিবিলম্বে বাচ্চাটিকে অন্য একটি *সার্জিকাল ইউনিটের* হাতে তুলে দিলাম যারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে কাজ করে এবং তারা বাচ্চাটির চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলো। তিন সপ্তাহ পর বাচ্চাটি মস্তিষ্কের জটিলতা কাটিয়ে উঠলেও নড়াচড়া করতে পারছিল না। আরো দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল এবং এখন অদ্ভুত এক রক্তদুষনের স্বীকার হলো এবং শরীরের তাপমাত্রা প্রায় ৪১.২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে (১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট) উঠলো। আমি পুনরায় বাচ্চার মাকে এই ভীষন নাজুক পরিস্থিতির বিষয়ে অবহিত করলাম এবং তিনি বরাবরে মতনই ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সাথে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহ, যদি ওর সুস্থতায় কোন মঙ্গল থেকে থাকে, তবে ওকে সুস্থ করে দাও।"

৫ নং বেডের বাচ্চার পাশে বসে থাকা এই মায়ের সাথে কথা শেষে আমি গেলাম ৬ নং বেডের আরেক শিশুর কাছে। এই শিশুটির মা কাঁদছিল এবং চিৎকার করছিল, "ডাক্তার! ডাক্তার! কিছু একটা করেন। আমার ছেলের শরীরের তাপমাত্রা ৩৭.৬ ডিগ্রী সেঃ (৯৯.৬৮ ডিগ্রী ফাঃ) সে মারা যাচ্ছে! সে মারা যাচ্ছে!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "ঐ ৫ নম্বর বেডের মায়ের দিকে তাকান। তার সন্তানের ৪১ ডিগ্রী সেঃ (১০৬ ডিগ্রী ফাঃ) এর ওপরে জ্বর। এরপরেও উনি শান্ত রয়েছেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করছেন।" সে বললো, "ঐ মহিলার কোন বোধশক্তি নেই এবং কি হচ্ছে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই।" ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটা হাদিসের কথা ... "আগন্তুকদের জন্য সুসংবাদ!" কেবল দুইটি শব্দ ... কিন্তু এই শব্দ দুটো নিঃসন্দেহে একটা পুরো জাতিকে

আলোড়িত করবার ক্ষমতা রাখে। আমার দীর্ঘ ২৩ বছরের চিকিৎসা জগতের জীবনে এই বোনটির মত ধৈর্য্যশীল আর কাউকে দেখি নি।

আমরা বাচ্চাটির যত্ন চালিয়ে যেতে লাগলাম এবং ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় মাস কেটে গেছে এবং বাচ্চাটি অবশেষে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বেরিয়েছে *রিকভারি ইউনিট* থেকে। হাটতে পারে না, দেখতে পায় না, শুনতে পাচ্ছে না, নড়তে পারছে না, হাসছে না ... এবং এমন নগ্ন বুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে যেন হৃদপিন্ডের স্পন্দনগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শিশুটির মা নিয়মিত পোশাক পরিবর্তন করানো ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ধৈর্য্যশীল থাকলেন আর ছিলেন আশাবাদী। আপনারা কি জানেন পরবর্তীতে এর কি হয়েছিল? আপনাদেরকে সে বিষয়ে বলবার আগে বলুন, এই শিশুটির সম্পর্কে আপনারা কি ধারনা করেন যে কিনা এত এত কঠিন রোগ-শোক, বিপদের মুখোমুখি হয়ে এসেছে? এবং এই মৃত্যুপথযাত্রী শিশুর সহনশীল মায়ের কাছে আপনারা কি আশা করেন যার কেবল মাত্রা আল্লাহতা'আলার কাছে দু'আ আর সাহায্যের প্রত্যাশা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না? আপনারা জানেন আড়াই বছর পর কি হয়েছিল? এই শিশুটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে ছিল আল্লাহতা'আলার অশেষ রহমত এবং এই পরহেযগার মায়ের পুরষ্কার হিসেবে। সে এখন তার মায়ের সাথে দৌড়ে বেড়ায় যেন কোন দিনই তার কিছুই হয় নি এবং সে সুঠাম স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে যেমনটি আগেও ছিল।

গল্প এখানেই শেষ নয়। এটা সে জিনিস নয় যা আমাকে আলোড়িত করেছিল এবং আমার চোখে পানি নিয়ে এসেছিল। যে জিনিসটি আমায় কাদিয়েছিল তা হচ্ছে,

বাচ্চাটি হাসপাতাল থেকে বের হবার প্রায় বছর দেড়েক পর অপারেশন ইউনিটের একজন আমাকে জানালো যে একলোক, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ আমার সাথে দেখা করতে চায়। আমি তাদের পরিচয় জানতে চাইলে সে বলল সে চেনে না। তো আমি তাদের দেখার জন্য গেলাম এবং দেখলাম এরা সেই ছেলেটির মা-বাবা আমি যার চিকিৎসা করেছিলাম। ছেলেটির তখন পাঁচ বছর এবং একটি ফুটফুটে ফুলের মতন স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে এরই মাঝে যেন তার কখনই কিছু হয় নি। তাদের কোলে চার মাস বয়সী আরেকটি ছোট বাচ্চা ছিল সেদিন। আমি তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালাম এবং কৌতুক করে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম এই কোলের বাচ্চাটি কি তাদের ১৩ তম নাকি ১৪ তম সন্তান। তিনি আমার দিকে চমৎকার এক হাসির সাথে তাকালেন যেন আমার জন্য তার করুণা হচ্ছে। তিনি বললেন, "সদ্য ভূমিষ্ট এই শিশুটি আমাদের দ্বিতীয় সন্তান, আর আপনি যার চিকিৎসা করেছিলেন সে ছিল আমাদের প্রথম সন্তান যাকে আমরা পেয়েছিলাম ১৭ বছরের অনুর্বরতার পর। এই শিশুটিকে পাবার পর, সে এমন সব বিপদের সম্মুখীন হয়েছে যা আপনি নিজেই দেখেছেন।"

একথা শুনে, আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না এবং এরই মাঝে আমার চোখ দুটো কান্নায় ভিজে উঠেছে। আমি তারপর হালকাভাবে লোকটির হাত ধরে টেনে আমার রুমে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তার স্ত্রীর সম্পর্কে। "কে আপনার এই স্ত্রী যিনি ১৭ বছরের বন্ধাত্বের পর পাওয়া পুত্রের এত মারাত্মক সব বিপর্যয়ের মূহুর্তগুলোতেও প্রচন্ড ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন? তার অন্তর বন্ধা হতে পারে না। অবশ্যই সেটা বিশাল ইমানের দ্বারা উর্বর।" আপনারা জানেন তিনি কি উত্তর করেছিলেন? ভালো করে শুনে রাখুন হে আমার প্রানপ্রিয় ভাই ও বোনেরা। তিনি বলেছিলেন, "আমার সাথে এই মহিলার বিয়ে হয়েছিল ১৯ বছর ধরে এবং এই দীর্ঘ সময়ে আমি কখনও তাকে কোন সংগত কারন ছাড়া তাহাজ্জুদ সালাত ছেড়ে দিতে দেখি নি। আমি দেখিনি তাকে কখনও পরনিন্দা করতে, অযথা গল্প-গুজবে মত্ত হতে কিংবা মিথ্যা বলতে। যখনই আমি বাড়ি থেকে বের হয় বা ফিরে আসি সে নিজে দরজা খুলে দেয়, আমার জন্য দু'আ কর এবং আমাকে আপ্যায়ন করে। এবং সে যা কিছু করে সে সর্বোচ্চ ভালবাসা, যত্ন, সৌজন্য এবং মমত্বের পরিচয় রাখে।" লোকটি শেষ করলো এভাবে, "নিশ্চয়ই, ডাক্তার সাহেব, সে যে সমস্ত আদর্শ আচরন ও

মমত্ববোধের সাথে আমার সাথে আচরন করে, আমি এমনকি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জাবোধ করি।" তাই আমি তাকে বললাম, "সত্যিই। ঠিক এমনটিই সে আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য।"

এখানেই শেষ।

আল্লাহ বলেন,

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।।" (সুরা আল বাকারাহ ১৫৫-১৫৬)

বেঁছে বেঁছে বাদাম খাওয়া

লেখকঃ সাজিদ ইসলাম

প্লেট থেকে চানাচুর খেতে গেলে দেখবেন সবাই বেঁছে বেঁছে বাদাম খাওয়া শুরু করে। এটা একটা সহজাত প্রবৃত্তি। আপনি আমি সবাই একই__বেঁছেবেঁছে বাদাম খাওয়া শুরু করি!

আমার এক বন্ধু একবার ঢাকায় আসলো। আমার হলে এসে আমার সাথে দেখা করল। জানালো তার এক আত্মীয় ঢাকা ভার্সিটির টিচার। আমাদের হলের পাশে টিচার্স কোয়ার্টারে থাকে। এই সেই কথা বলতে বলতে বলল, তার ঐ আত্মীয়ের নাকি একটা মেয়ে আছে খুব ভালো। বেশ ইসলামী মাইন্ডের, পর্দা করে। তার নাকি ওকে বিয়ে করার ইচ্ছে। মেয়ে পর্দা করে, ইসলামী মাইন্ডের, মেয়ে এই, মেয়ে সেই..... জিজ্ঞেস করলাম, what about you??আজ নামাজ পরেছিস?
না!

তুই তো জীবনটাই কাটিয়ে দিলি মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে! এখন ফোন চেক করলে গোটা পঞ্চাশেক মেয়ের ফোন নাম্বার পাওয়াযাবে। ইসলাম তো প্র্যাকটিস করিস না! আমি তো জানি তুই কেমন। আর সেই তুই বিয়ের জন্য খুঁজছিস একটি সতী, ভালো, পর্দাশীল, ইসলামী মাইন্ডের মেয়ে.....

রাস্তার ফকির থেকে কোট টাই এর সাহেব সবারই চানাচুরের প্লেট থেকে বাদাম খাওয়ার স্বভাব। সবাই নিজের জন্য ভালো, উত্তম বিষয়টা চায়। কিন্তু একটিবারও চিন্তা করেনা সে ওটা deserve করে কিনা! সারাজীবন মেয়েদের পেছনে ঘুরে ঘুরে, গার্লফ্রেন্ডের পর গার্লফ্রেন্ড মেইনটেইন করে, অন্ধকার ঝোপ ঝাড়ের যাবতীয় সুযোগ কাজে লাগিয়ে, নিজের ক্যারেক্টার ঠিক না রেখে বিয়ে করার সময় ঠিকই খুজবে ভদ্র, নম্র, পর্দাশীল, নামাজ দোয়া পড়া, কোনদিন ছেলেদের সাথে মিশেইনি এমন সৎ মেয়ে! !

যোগ্যটা বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এজন্যই যে এটা অর্জন করতে হয়! প্রেম প্রেম খেলা করে বেড়ানোর জন্য হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেটাই কাজে লাগাতে পারে কিন্তু বিয়ে করতে গেলে পিউর জিনিস লাগবে?? যে মেয়েটিকে আশা করছেন তার জন্য নিজেকে পিউর করেছেন কি?? ভালো মানুষসাজতে ১২ টাকা লাগে। ৭ টাকার আতর, পাঁচ টাকার টুপি। কিন্তু সত্যিকারের ভালো মানুষ হতে এক টাকাও লাগেনা। মনের পরিশিদ্ধি, চিন্তার পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র প্রতি সততা, তাকওয়া, ইখলাস এসবের পেছনে কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করা লাগেনা। বিয়ের মত একটি বিষয়ে সততার পরিচয় দেওয়া উচিত। পাশের মানুষটিকে পিউর হিসেবে পেতে গেলে আগে মানুষটির পাশে নিজেকে পিউর হিসেবে উপস্থাপন জরুরী! সরবত মিষ্টি হয় চিনির গুণে। কিন্তু চিনির সাথে বালি মিশিয়ে দিলে সেই সরবতটাই খাওয়া যায়না। নিজের মনে ধূলা বালির আবর্জনা রেখে যত চিনিই ঢালেন না কেন কোনদিন সরবত বানাতে পারবেন না। বিষয়টা মাথায় রাখা জরুরী, খুবই জরুরী!

বিয়ে : একটি উত্তম বন্ধুত্ব

20 October 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

নব্বইয়ের দশকে বিটিভিতে ‘ওশিন’ নামে একটি জনপ্রিয় জাপানী সিরিয়াল প্রচারিত হয়। আমরা তখন সম্ভবত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। বান্ধবীরা প্রায়ই এর বিভিন্ন এপিসোড নিয়ে কথা বলতাম। একবার দেখানো হোল ওশিন এমন এক নির্জন জায়গায় গিয়ে চাষবাস করতে শুরু করল যেখানে স্কুলশিক্ষক ছাড়া আর কোন উপযুক্ত পুরুষ নেই মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য। সে আর কোন উপায় না দেখে মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্কুলশিক্ষকের কাছে বিয়ে দিয়ে দিল। একটা সন্তান হওয়ার পর মেয়েটির এমন একজনের সাথে পরিচয় হয় যাকে তার মন থেকে পছন্দ হয়। বেশ কিছুদিন চিন্তাভাবনা করার পর সে সিদ্ধান্ত নেয় যে শিক্ষক স্বামীকে ছেড়ে সে ঐ লোকের সাথে সংসার করবে। ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মধ্যে এমনভাবে তোলপাড় সৃষ্টি হোল যেন আমাদের পরিচিত কেউ এমনটা করে বসেছে!

আমার কোন বোন নেই। ভাইদের সাথে বড় হওয়াতেই কি’না জানিনা, আমার রান্নাবাড়া, সাজগোজ, প্রেম বিবাহ বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ ছিলনা কখনো। বাস্তব জীবনের চেয়ে বইপত্রের সাথে সম্পর্ক ছিল বেশী। তাই বিবাহ বিষয়ে ধারণা ছিল সিন্ডারেলা মার্কা গল্পে যা লেখা থাকে তেমন, কোনপ্রকারে একবার বিয়ে হয়ে গেলেই “happily ever after”. আমাদের অধিকাংশ মেয়েদের মধ্যেই এই ধরণের ভুল ধারণা কাজ করে। কারণ রূপকথার বইগুলো আমাদের কোনভাবেই জীবনের বাস্তবতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেনা। তাই বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুষড়ে পড়েছিলাম আমি। এমনটা তো হওয়ার কথা না!

তখন আমার ফিলসফার বান্ধবী শিমু আমাকে খুব ভালো একটা ব্যাখ্যা দিল। সে বল্ল, “ইসলামে বিয়ের বিধানের ওপর এত গুরুত্ব দেয়ার একটা অন্যতম কারণ হোল চরিত্র সংরক্ষণ এবং সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা। আমাদের

সমাজে আমরা ইসলামের বিধানের চেয়েও আঞ্চলিকভাবে যা চলে এসেছে তাকে বেশী গুরুত্ব দেই, মানুষ কি বলবে তা ভেবে বেশী চিন্তিত হই। তাই দেখা যায় লোকে কি বলবে ভেবে অনেকে বছরের পর বছর এমন একজনের সাথে আপাতদৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখে যেখানে একজনের সাথে আরেকজনের আদৌ কোন সম্পর্ক থাকেনা। দু'জন মানুষ একই বাড়ীতে থাকে, একসাথে খায়, ঘোরে কিন্তু একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারেনা। কেউ কেউ সন্তানদের কথা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করে, চালিয়ে যায় সুখে থাকার নাটক। যারা অতটা দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন নয়, তারা ডুবে যায় ব্যাভিচার বা অনৈতিক কার্যকলাপের আবর্তে। সেক্ষেত্রে তো বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে! তার চেয়ে কি এটা ভালো নয় যে তারা যেভাবে নিজেদের চরিত্র সংরক্ষণ করতে পারবে সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেবে? তার মানে এই নয় যে তারা যে বৈবাহিক সম্পর্ক আছে তাকে সহজভাবে নেবে। এর মানে হোল তারা সর্বোত চেষ্টা করে দেখবে এই সম্পর্ক কার্যকর করা যার কি'না আর তারপর ব্যার্থ হলেই কেবল আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে।

"এটা অবশ্যই খুব দুঃখজনক অবস্থা যদি কোন ব্যাক্তি সঠিক মানুষটিকে খুঁজে পান তাঁর বিয়ের পর। এজন্যই হয়ত পর্দার ওপর এতখানি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, এই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য। কিন্তু একইসাথে বিবাহিত ব্যাক্তির জন্য ব্যাভিচারের শাস্তি নির্ধারন করা হয়েছে মৃত্যুদন্ড যেখানে অবিবাহিত ব্যাক্তির জন্য শাস্তি অপেক্ষাকৃত কম। যেহেতু অবিবাহিত নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সংযমের অভাবের কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু বিবাহিত নারীপুরুষদের ক্ষেত্রে সীমালংঘনই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে যদিও আল্লাহ বলেছেন এক বিয়েই তাঁর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং একাধিক বিয়ের শর্ত এত কঠিন করে দেয়া হয়েছে যে চিন্তাশীল ব্যাক্তি মাত্রেই ভয় পাবে। কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য এই যে, যদি এই দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে ব্যাভিচারের পরিবর্তে সঠিক পথটিই যেন মানুষ বেছে নেয়।

"সুতরাং, আমাদের সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ আমাদের এমন সঙ্গী মিলিয়ে দেন যার সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য- ঐ সাত ব্যাক্তির একজনের মত যারা কেয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া পাবে যখন বারোটি সূর্য ঠিক মাথার ওপর অবস্থান করবে। আল্লাহ যেন আমাদের জন্য বৈবাহিক জীবন এবং দায়িত্ব সহজ এবং আনন্দময় করে দেন যাতে ইসলামের ওপর অবস্থান করা এবং চরিত্র সংরক্ষণ করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়"।

শিমুর কথায় আমার যে শুধু এই ব্যাপারে ধারণা স্পষ্ট হোল তাই নয়, আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা অনেক ফালতু ব্যাপারে দোয়া করতে করতে অস্থির হয়ে যাই, অথচ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে আল্লাহর সাহায্য চাইতে ভুলে যাই। মজার ব্যাপার হোল, আমি যখন আমার ছাত্রীদের বলতাম সঠিক বিয়ের জন্য দোয়া করতে, তারা খুব লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলত, "এটা কি বললেন ম্যাডাম? এ'রকম লজ্জাজনক বিষয়ে কি আল্লাহকে বলা যায়?" অথচ ভুরি ভুরি ছেলেমেয়ে দেখেছি যারা বাবামাকে লুকিয়ে প্রেম করে আর সেই প্রেমে সাফল্য আসার জন্য আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে মহাবিশ্ব ফেঁড়ে ফেলার জোগাড়!

তাদের একজনকে বলেছিলাম, "তুমি আল্লাহকে বল যেটা তোমার জন্য ভালো হবে, আল্লাহ যেন সেটাই তোমাকে দেন। তুমি নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়োনা তুমি কি চাও। কারণ আমরা কেউ জানিনা আমরা যা চাই তাতে ভালো আছে না মন্দ"। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। শেষমেশ বহুবছর পর, বহু নিশীথ রজনী অশ্রুব্যাকুল হয়ে দোয়া করার পর আচমকা কিভাবে যেন সব বাঁধা পরিষ্কার হয়ে গেল। তার বিয়ে হয়ে গেল নিজের পছন্দমত। সে এখনো প্রতিরাতে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, "আমি নাহয় ভুল করে তাই চেয়েছি যা আমার জন্য ভালো নয়, কিন্তু তুমি কেন আমায় তা দিলে আল্লাহ?" আপনারাই বলুন, আল্লাহ এখন কি করবেন?!

আরেকবার এক ভাইয়ের বৌ মারা গেলেন হঠাৎ করে। বাচ্চাদের নিয়ে বেচারা হিমশিম খাচ্ছেন। ভাইয়ের বয়স খুব বেশী না। আমরা বললাম, কত বিধবা মেয়ে আছে যাদের কোন অভিভাবক নেই, তাদের একজনকে যদি উনি বিয়ে করেন তাহলে দু'জনেরই উপকার হতে পারে। স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে অন্যজনের সব প্রয়োজন বা চাহিদা তো আর অদৃশ্য হয়ে যায়না! সংসার চালাতে হবে, সন্তানদের দেখাশোনা করতে হবে, কোনটা বাদ দেয়ার মত? একজনের জীবনাবসান হয়েছে বলে তো আরেকজন জীবিত মানুষের জীবনের ইতি টেনে দেয়া যায়না। এর মানে এই নয় যে তাদের সম্পর্কে কোন ঘাটতি ছিল। বরং কেউ যদি কারো ব্যাপারে সত্যিই ভাবে তাহলে সে চাইবে সে মারা গেলে যেন তার সঙ্গী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হয়ে সুখী হয়। কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা অনেকসময় ইসলামের তোয়াক্কা না করে চলতি প্রথা অনুসারে চিন্তা করেন। বিধবা বা মৃতদার বিয়ে করবেন এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। আমার এক বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, "তারা (আত্মীয়স্বজনরা) বরং এ'টাই ভালো মনে করে যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী মারা গেছেন তারা অবৈধ কিছু করুক, ওটা হয়ত লোকে দেখতে পাবেনা। কিন্তু বৈধ উপায়ে বিয়ে করলে যে লোকে ছি ছি করবে সেটা তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী না"।

আমাদের সমাজে হয়ত অভাব, হয়ত লোভ থেকে এখন আরেকটা প্রথা প্রচলিত হয়েছে। বিয়ে করে বৌ রেখে বছরের পর বছর বিদেশ থাকা। কেউ টাকার জন্য, কেউ সিটিজেনশিপের জন্য, কেউ একটা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য, কেউ পরিবারের প্রয়োজনে। আবার অনেকে বাড়ীতে বৌ রেখে শহরে পড়ে থাকেন মাসের পর মাস। অথচ আল্লাহ বলেছেন স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনের পরিচ্ছদস্বরূপ। পোশাক যেভাবে আমাদের শীতগ্রীষ্ম, রোদবৃষ্টি, পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে; আমাদের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, অসৌন্দর্য ঢেকে রাখে– স্বামী স্ত্রী সেভাবেই একজন আরেকজনকে সাহায্য সহযোগিতা, আলাপ পরামর্শ, সাহস বা সান্তনা দিয়ে পরস্পরকে পরিপূরণ করবে। কিন্তু দু'জন যদি বছরের পর বছর পরস্পরকে না'ই দেখে, শুধু ফোনে কথা বলে আর আকাশপাতাল কল্পনা করে কি চরিত্র সংরক্ষণ করা যায়? এর ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে পরকীয়াসহ নানাধরণের বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছে। মানুষ তাদের প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যার্থ হচ্ছে, আবার এই অবৈধ কার্যকলাপ ঢাকতে গিয়ে আরো বড় পাপের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিদেশেও যে ভাইরা সবসময় নিরাপদ থাকেন, ব্যাপারটা তেমনও নয়। বিদেশের মাটিতে মানুষের মন প্রায়ই খারাপ থাকে, তখন প্রলোভন থেকে নিজেকে বিরত রাখা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকেই পা পিছলে পড়ে যান পংকিলতার পিচ্ছিল পথে।

উমার (রা) মুসলিম সৈনিকদের জন্য প্রতি চারমাসে বাড়ী ফিরে আসা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন এই ধরণের সামাজিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য। আমাদের ভাইদের ক'জন প্রতি চারমাস অন্তর স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে আসেন বা আসতে পারেন? পরিবারের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকেই নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাধ আহ্লাদ কোরবানী করে দেন বছরের পর বছর। কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজন মনে করেন, বিদেশে তো টাকা আকাশে বাতাসে ওড়ে, তার কাছে নিশ্চয়ই আরো টাকা আছে কিন্তু সে আমাদের দিচ্ছেনা। এই পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসা কঠিন বৈকি! আর দেশে যারা দূরে থেকে কাজ করেন তাদের স্ত্রীদের অনেক সময় বাবামা আসতে দেন না, হয়ত এই মনে করে যে তাহলে ছেলে আর বাড়ীতে টাকা পাঠাবে না! তাই দেশে থেকেও তারা চরিত্র সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত!

পারিবারিক বা সামাজিক প্রয়োজনে আজকাল আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মহিলা সংসারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক কাঠামো এখনো তাদের এই উভয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। কাজের লোকের সাহায্য ছাড়া সংসার চালানোর মত গৃহ, রান্নাঘর, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, পানির ব্যাবস্থা, পারিবারিক কাঠামো, বাচ্চাদের জন্য সুব্যাবস্থা এখনো সুদূরপরাহত। অনেক মহিলারাই কাজ করেন পুরুষপরিবেষ্টিত পরিমন্ডলে যেখানে নারী বলেই তাদের প্রতি সৎমাসুলভ আচরণ করা হয়। অনেকেই সারাদিন এ'ধরণের কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে একটু শান্তির আশায় ঘরে ফেরেন। কিন্তু অধিকাংশ মহিলা যৌথ পরিবারে থাকেন বিধায় ঘরে ফিরেও পারিবারিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি মিলেনা। শ্বাশুড়ীকেন্দ্রিক পরিবারে শ্বাশুড়ী বিবেকবতী না হলে মহিলাদের ২৪ ঘন্টাই কাটে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে। তদুপরি স্বামীও যদি তাদের সময় বা সাহচর্য না দেন, যেটা যৌথ পরিবারে অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠেনা, তখন তাদের দিক হারানোর সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। এটা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, যে পুরুষ সারাদিন চাকরী করে বাড়ী ফিরে দেখেন বৌ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবায় নিয়োজিত সম্পূর্ণ সময়, তাঁর সাথে দু'দন্ড বসে কথা বলার সময় নেই স্ত্রীর, তিনিও একই ভাবে পথ হারাতে পারেন।

একবার ইউনিভার্সিটিতে এক ক্লাসে ছাত্রী কথাপ্রসঙ্গে বলছিল, "ম্যাডাম, আমি ইউনিভার্সিটি আসি বলে সবদিন সকালে বাসার সবার জন্য নাস্তা বানাতে পারিনা। তাই শ্বাশুড়ী আমাকে নাস্তা খেতে দেননা। আমি এখন পাঁচমাসের প্রেগ্ন্যান্ট। প্রতিদিন খালিপেটে ক্লাসে এসে বমি করি। বাসায় গিয়ে রান্না করতে পারলে খাবার জোটে নতুবা নয়। আমার শ্বাশুড়ীর যদি ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকত তাহলে কি উনি এ'রকম করতে পারতেন?" সে প্রথমে যে বর্ণনা দিল তাতে আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে শুরু করল- যে মহিলা তার হবু নাতি বা নাতনীর মায়ের সাথে এমন আচরণ করছেন, তিনি কি ভাবছেন তিনি এই মেয়েটাকে প্রতিদিন কি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন? নূন্যতম মানবতাবঞ্চিত এই মেয়েটা যদি কারো কাছ থেকে ন্যূনতম মানবিক ব্যাবহার পায়, তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে বা তার সাথে পালায়, তাকে কি খুব দোষ দেয়া যাবে? কি নিশ্চয়তা আছে যে এ'রকম মানসিক তোলপাড়ের মধ্যে সে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? তার স্বামী কি ধরেই নিয়েছেন যে একটুকরা কাগজে দু'জনে সই করেছে বলে তিনি এবং তাঁর পরিবারের সকলে এই মেয়েটাই সাথে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারেবন অথচ সে তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকতে বাধ্য?!

এক বন্ধুকে একবার বলেছিলাম, "ভাই আপনি এত ভালো মানুষ, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশনে চাকরী করেন, অথচ একটা মেয়েকে নিয়ে আপনাকে ঘুরতে দেখেছে অনেকেই। আপনি তাকে বিয়ে করুন বা বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কিন্তু আপনি যা করছেন তা আপনিও জানেন অন্যায়, কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা আপনার মত একজন অসাধারন মানুষ যখন এই কাজটা করছেন তখন অন্যদের আমরা আর কিছু বলতে পারছিনা যাদের বলা প্রয়োজন"। উনি কিছুক্ষণ কিভাবে বুঝিয়ে বলবেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "আমাদের বাড়ীতে সব ভাইবোন পালিয়ে বিয়ে করেছে কারণ আমাদের বাবামা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা নানাধরনের বাহানা দিয়ে আমাদের সময়মত বিয়ের ব্যাবস্থা করেন না। আমি একটু আধটু ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। তাতে লাভ হয়েছে এই যে আমি পালাইনি, বাবামা'র সব আকাঙ্ক্ষা পূরন করেছি, বাড়ী বানিয়ে দিয়েছি, বোনদের বিয়ে দিয়েছি, টাকাপয়সা দিচ্ছি প্রতিমাসে– কিন্তু তারা আমাকে বিয়ে করতে দিতে রাজী নন। যদি বিয়ের পর এভাবে ওদের জন্য খরচ করতে না পারি! আমার চল্লিশ হতে খুব একটা দেরী নেই। আর চল্লিশের পর আমার আর বিয়ে করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু বাবামাকে কে বোঝাবে? আমি এখন আমার 'ভুলের' মাসুল দিচ্ছি। দুনিয়াতেও গুনাহ কামাচ্ছি, আখেরাতেও এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

"এ' তো গেল বাবামা'র কথা। যে মেয়ের আমাকে পছন্দ তাকে বললাম, চল আমরা ছোটখাট করে বিয়ে করে ফেলি। সে তখন বেঁকে বসল। কমপক্ষে দশভরি গহনা আর বড় অনুষ্ঠান না করলে সে বিয়েই করবেনা। আপনি তো গোল্ডের দাম জানেন নিশ্চয়ই। বলেন তো আরো কত বছর চাকরী করলে আমার দশ ভরি গোল্ড কেনার সামর্থ্য হবে?" ওনাকে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য ছিলনা। তাই চুপ করে রইলাম।

ছোটবেলায় এক ভদ্রমহিলার কথা শুনেছিলাম যিনি বোনকে তালাক দিইয়ে বোনের স্বামীকে বিয়ে করেছিলেন। বাংলাদেশে ফেরার পর এক পরিবারের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে। পরে জানতে পারলাম এই সেই পরিবার যার কথা আবুধাবীতে বসে শুনেছিলাম। একদিন ওনার বাবার সাথে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বড় বোন স্বামীকে দিয়ে ছোটবোনের আনানেয়া থেকে শুরু করে সব কাজ করাতেন। অথচ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে এই সম্পর্কগুলো থেকে ততটাই সাবধানতা অবলম্বন করতে যেভাবে আগুন থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে পর্দা বজায় রাখা অনেক কঠিন, এখানে সাবধানতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যাবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় শ্যালিকা বা দেবরদের সাথে দুলাভাই ভাবীদের আজেবাজে দুষ্টুমী করতে, পাশে বসতে বা গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে! এই বিষয়ে কেউ কিছু বললে আমরা খুব রেগে যাই বা অপমানিত বোধ করি। আমরা মনে করি এই বিষয়ে এভাবে ভাবাটা নোংরা মানসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু এই কথাটা আমাদের মাথায় খেলেনা যে আমরা সবাই মানুষ, তাই কেউ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নই। আপনজনদের নিরাপত্তার জন্য এক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরন করাটাই শ্রেয় কারণ সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন সৃষ্টবস্তুর গুনাগুন সম্পর্কে।

বিয়ে কেবল একটা মৌখিক সম্মতি, একটুকরো কাগজ, একটা সামাজিক অনুষ্ঠান– যতক্ষণ না উভয় ব্যাক্তি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং এই সম্পর্ককে স্থায়ী করার জন্য বুঝেশুনে অগ্রসর হয়। নাটক সিনেমা দেখে আমাদের একটা ধারণা হয়ে যায় যে বিয়ে হোল সব সমস্যার শেষ আর সুখের শুরু। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। ব্যাপারটা এমনও নয় যে দেখতে ভালো হলে, সুন্দর জামাকাপর গহনা মেকাপ পরে সেজেগুজে থাকলেই বিয়ে

সুখের হয়। দু'জন মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা দুই পরিবেশ, দু'টো পৃথক পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে এসে "happily ever after" টিকে যাওয়া এতটা সহজ নয়। এর জন্য দু'জনকেই প্রতিদিন প্রতিটা মূহূর্ত চেষ্টা করতে হবে একে অপরকে বোঝার, পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা রুচি পছন্দ জানার এবং তাকে সম্মান করার, পরস্পরের পরিবারকে আপন করে নেয়ার। দু'জনকেই সাহায্য করতে হবে একে অপরকে আলাপ আলোচনা সহযোগিতা করে। সবচেয়ে বড় কথা প্রেম সম্পর্কে নাটক সিনেমার বানোয়াট ধারণা ঝেড়ে ফেলে বুঝতে হবে সবার আগে এটা একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব- যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সম্প্রীতি আর সম্মানের মজবুত ভিত্তির ওপর, যা পাকা চুল আর ঝুলে পড়া চামড়ায় পরিবর্তিত হয়ে যায়না।

'হাশরের ময়দানে দেখা হবে' বলে বাসর রাতে স্ত্রী থেকে বিদায় নেবার গল্প

19 October 2014

লেখকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

সাহাবাদের (রা) কাহিনী পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকি... কী ছিল তাদের ভালোবাসা আল্লাহর রাসূল (সা) আর ইসলামের জন্যে! আর কোথায় আমরা? নিজের শরীরটাকে দুঃখে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছা করে! ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের মত করে আত্মত্যাগ করার তওফিক দাও, আমীন!

সা'দ আল আসওয়াদ আস-সুলুমী (রা)-এর কথা কি আপনারা জানেন?

নামটাও হয়তো অনেকে শুনে নি কোনদিন। তাঁর সমাজে হাই-স্ট্যাটাস ছিল না, তিনি ছিলেন গরীব, গায়ের রঙ কালো। কেউ তাঁর কাছে নিজের মেয়েও বিয়ে দিতে চাইতো না।

সা'দ (রা) একদিন আল্লাহর রাসূল (সা) এর কাছে দুঃখ করে বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও কি জান্নাতে যাবো?"

"আমি তো নীচু মাপের ঈমানদার হিসেবে বিবেচিত হই"

"কেউ আমাকে নিজের মেয়ে দিতে রাজি হয় না"

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের দুঃখ বুঝতেন নিজের আপন ভাইয়ের মত করে, নিজের সন্তানের মত করে। তিনি তাদেরকে অনুভব করতেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। তিনি এই সা'দকে পাঠিয়েছিলেন ইবন আল-ওয়াহহাবের কাছে। সাধারণ কোন ব্যক্তি ছিলেন না ইবন ওয়াহহাব। তিনি হলেন মদীনার নেতাদের একজন; কিছুদিন যাবৎ মুসলিম হয়েছেন। তাঁর মেয়ে অপরূপা সুন্দরী রমণী, রূপের জন্য বিখ্যাত। সেই ইবন ওয়াহহাবের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দকে পাঠালেন।

নেতার মেয়ে বিয়ে করবে সা'দের মতো একজনকে? যে তার সৌন্দর্য্যের জন্য এতো প্রসিদ্ধ, সে হবে সা'দের বউ?? স্বাভাবিকভাবেই ইবন ওয়াহহাবের প্রতিক্রিয়া ছিল "আকাশ-কুসুম কল্পনা ছেড়ে বাড়ি যাও"... কিন্তু তাঁর মেয়ে ততক্ষণে শুনে ফেলেছে। সে বলে উঠলো, "বাবা! আল্লাহর রাসূল (সা) অনুরোধ করেছে তাকে বিয়ে করার জন্যে, তুমি কিভাবে উনাকে ফিরিয়ে দিতে পারো?

রাসূলের উৎকন্ঠা থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে আমাদের অবস্থানটা কি হবে?" এরপর সা'দের দিকে ফিরে বললো, "রাসূলুল্লাহ (সা) কে যেয়ে বলে দিন, আমি আপনাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তুত"

সা'দের মন সেদিন আনন্দে পুলকিত... সে যেন খুশিতে টগবগ করে ফুটছে... রাসূলুল্লাহ (সা) ৪০০ দিনার মোহরানায় তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সুবহান আল্লাহ!

সা'দ বললেন, হে রাসূল, আমি তো জীবনে কোনদিন চারশ দিনার দেখিই নি! আমি এই টাকা কীভাবে শোধ করবো? নবীজি (সা) তাকে বললেন, আলী আল-নু'মান ইবন আউফ আর উসমান (রা) এর কাছ থেকে দুইশ দুইশ করে মোট চারশ দিনার নিয়ে নিতে। দুজনেই উনাকে দুইশর-ও বেশি করে দিনার দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! টাকার জোগাড় ও হয়ে গেলো। এখন নতুন বউ এর কাছে যাবেন সা'দ (রা)...

মার্কেটে যেয়ে সুন্দরী বউ এর জন্যে টুকিটাকি কিছু উপহার কেনার কথা চিন্তা করলেন তিনি। মার্কেটে পৌঁছে গেছেন, হঠাৎ তাঁর কানে আসলো জিহাদের ডাক। "যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও" ... সা'দ যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকালেন একবার, বললেন- "হে আল্লাহ! আমি এই টাকা দিয়ে এমনকিছু কিনবো যা তোমাকে খুশি করবে।" নতুন বউ এর জন্য গিফট কেনার বদলে তিনি কিনলেন একটি তরবারি আর একটি ঘোড়া। এরপর ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন জিহাদের ময়দানে, নিজের চেহারাটা কাপড় দিয়ে মুড়ে নিলেন, যেন আল্লাহর রাসূল (সা) তাকে দেখে চিনে ফেলতে না পারেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখলেই তো বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন! সে যে সদ্য-বিবাহিত! সাহাবারা (রা) বলাবলি করছিলেন, যুদ্ধ করতে আসা এই মুখ-ঢাকা লোকটি কে? আলী (রা) বললেন, "বাদ দাও, সে যুদ্ধ করতে এসেছে।" ক্ষিপ্ততার সাথে সা'দ যুদ্ধ করতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়ায় আঘাত

হানা হলো, ঘোড়া পড়ে গেলো। সা'দ উঠে দাঁড়ালেন। ঐ সময় নবীজি (সা) তার কালো চামড়া দেখে ফেললেন, "ইয়া সা'দ এ কি তুমি?!" রাসূল (সা) এর প্রশ্নের জবাবে তিনি (রা) বললেন "আমার মা-বাবা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক ইয়া আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমি সা'দ"

মুহাম্মাদ (সা) বললেন, "হে সা'দ, জান্নাত ছাড়া তোমার জন্য আর কোন আবাস নেই।" সা'দ (রা) আবারো জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু সময় পর কয়েকজন বললো সা'দ আহত হয়েছে। রাসূল (সা) ছুটে গেলেন ময়দানে। সা'দকে খুঁজতে লাগলেন। সা'দের মাথা খানা নিজের কোলের উপর রেখে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে সা'দের মুখের উপর এসে পড়ছিলো। তাঁর (সা) চোখ বেয়ে নেমে আসছিলো অঝোর ধারা। একটু পর রাসূলুল্লাহ (সা) হাসতে শুরু করলেন, আর তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আবু লুবাবা (রা) নামের একজন সাহাবা উনাকে দেখে বিস্ময়ে বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ (সা) আমি আপনাকে এমনটি কখনো করতে দেখি নি"... আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "আমি কাঁদছিলাম কারণ আমার প্রিয় সঙ্গী আজ চলে গেলো! আমি দেখেছি সে আমার জন্য কী ত্যাগ করলো আর সে আমাকে কতো ভালোবাসতো... কিন্তু এরপর আমি দেখতে পেলাম তার কী ভাগ্য, আল্লাহর কসম, সে ইতিমধ্যে হাউদে পৌঁছে গেছে।" আবু লুবাবা জিজ্ঞেস করলেন "হাউদ কি?" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "এটি হলো এমন এক ঝর্ণা যা থেকে কেউ একবার পান করলে জীবনে আর কোনদিন পিপাসার্ত হবে না, এর স্বাদ মধুর চেয়েও মিষ্টি, এর রঙ দুধের চেয়েও সাদা! আর যখন আমি তাঁর এইরূপ মর্যাদা দেখলাম, আল্লাহর কসম, আমি হাসতে শুরু করলাম।"

"তারপর আমি দেখতে পেলাম সা'দের দিকে তাঁর জান্নাতের স্ত্রীগণ এমন উৎফুল্ল ভাবে ছুটে আসছে, যে তাদের পা গুলো বের হয়ে পড়ছে, তাই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।"

নবীজি অতঃপর সাহাবাদের কাছে এসে বললেন সা'দের ঘোড়া আর তরবারি নিয়ে আসতে, সেগুলো যেন সা'দের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে যেন বলা হয় এগুলো তার বংশধর। তিনি (সা) বললেন, তাকে জানিয়ে দিও আল্লাহ তা'আলা সা'দকে জান্নাতে স্ত্রী দান করেছেন, তারা তার চাইতেও অনেক সুন্দর। এই হলো সা'দ, যিনি কিছুক্ষণ আগেও অনিশ্চিত ছিলেন যে সে জান্নাতে যেতে পারবে কী না। সমাজে তার কোন মর্যাদা ছিল না, কোন স্ট্যাটাস ছিল না, কিন্তু আল্লাহর চোখে এই হলো তাঁর স্ট্যাটাস। কারণ তাঁর জীবন এবং মরণ ছিলো শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে...।

"নিঃসন্দেহ আমার নামায ও আমার কুরবানি, আর আমার জীবন ও আমার মরণ - আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক" [সূরাহ আন'আমঃ আয়াত ১৬২]

"নিঃসন্দেহ আল্লাহ্‌ মুমিনদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য

প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক সত্যনিষ্ঠ? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে। আর এটিই হচ্ছে মহা সাফল্য। [সূরাহ আত-তাওবাঃ আয়াত ১১১]

সা'দের জীবনকাহিনী শুনে এ দু'টি আয়াতই মনে পড়ে যায়... আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কবুল করে নাও! আমীন...।

Ref: http://letssharestories.tumblr.com/post/23468273335/story-of-sa-ad-al-aswad-as

অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা ও এক হাজার দিনার

29 September 2014

হযরত উসমান (রা) এর শাসনকাল । নীল ভূমধ্যসাগর তীরের তারাবেলাস নগরী । পরাক্রমশালী রাজা জার্জিসের প্রধান নগরী এটা । এই পরাক্রমশালী রাজা ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে আবদুল্লাহ ইবন সা'দের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন । স্বয়ং রাজা জার্জিস তার বাহিনীর পরিচালনা করছেন । পাশে রয়েছে তার মেয়ে । অপরূপ সুন্দরী তার সে মেয়ে ।

যুদ্ধ শুরু হল । জার্জিস মনে করেছিলেন তার দুর্ধর্ষ বাহিনী এবার মুসলিম বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দেবে । কিন্তু তা হল না । মুসলিম বাহিনীর পাল্টা আঘাতে জার্জিস বাহিনীর ব্যুহ ভেঙ্গে পড়ল । উপায়ান্তর না দেখে তিনি সেনা ও সেনানীদের উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা করলেন, "যে বীর পুরুষ মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহর ছিন্ন শির এনে দিতে পারবে, আমার কুমারী কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ করবো ।"

জার্জিসের এই ঘোষণা তার সেনাবাহিনীর মধ্যে উৎসাহের এক তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করল । তাদের আক্রমণ ও সমাবেশে নতুন উদ্যোগ ও নতুন প্রাণাবেগ পরিলক্ষিত হলো । জার্জিসের সুন্দরী কন্যা লাভের উদগ্র কামনায় তারা যেন মরিয়া হয়ে উঠল। তাদের উন্মাদ আক্রমণে মুসলিম রক্ষা ব্যুহে ফাটল দেখা দিল । মহানবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের একজন- হযরত যুবাইর (রা) ও সে যুদ্ধে শরীক ছিলেন । তিনি সেনাপতি সা'দকে পরামর্শ দিলেন, "আপনিও ঘোষণা করুন, যে তারাবেলাসের শাসনকর্তা জার্জিসের ছিন্নমুন্ড এনে দিতে পারবে, তাকে সুন্দরী জার্জিস দুহিতাসহ এক হাজার দিনার বখশিশ দেয়া হবে ।" যুবাইরের পরামর্শ অনুসারে সেনাপতি সা'দ এই কথাই ঘোষণা করে দিলেন ।

তারাবেলাসের প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো । যুদ্ধে জার্জিস পরাজিত হলেন । তার কর্তিত শিরসহ জার্জিস কন্যাকে বন্দী করে মুসলিম শিবিরে নিয়ে আসা হলো । কিন্তু এই অসীম সাহসিকতার কাজ কে করলো? এই বীরত্বের কাজ কার দ্বারা সাধিত হলো? যুদ্ধের পর মুসলিম শিবিরে সভা আহূত হলো । হাজির করা হলো জার্জিস-দুহিতাকে । সেনাপতি সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি জার্জিসকে নিহত করেছেন, তিনি আসুন । আমার প্রতিশ্রুত উপহার তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছি ।"

কিন্তু গোটা মুসলিম বাহিনী নীরব নিস্তব্ধ । কেউ কথা বললো না, কেউ দাবী নিয়ে এগুলোনা । সেনাপতি সা'দ বারবার আহ্বান জানিয়েও ব্যর্থ হলেন। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলেন জার্জিস দুহিতা। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার পিতৃহন্তাকে । কিন্তু তিনি দাবী নিয়ে আসছেন না কেন? টাকার লোভ, সুন্দরী কুমারীর মোহ তিনি উপেক্ষা করছেন? এত বড় স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে জগতের ইতিহাসে এমন জিতেন্দ্রীয় যোদ্ধা-জাতির নাম তো কখনও শুনেননি তিনি । পিতৃহত্যার প্রতি তার যে ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল, তা যেন মুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল । অপরিচিত এক অনুরাগ এসে সেখানে স্থান করে নিল ।

অবশেষে সেনাপতির আদেশে জার্জিস দুহিতাই যুবাইরকে দেখিয়ে দিলেন । বললেন, "ইনিই আমার পিতৃহন্তা, ইনিই আপনার জিজ্ঞাসিত মহান বীর পুরুষ ।" সেনাপতি সা'দ যুবাইরকে অনুরোধ করলেন তাঁর ঘোষিত উপহার গ্রহণ করার জন্য ।

যুবাইর উঠে দাঁড়িয়ে অবনত মস্তকে বললেন, "জাগতিক কোন লাভের আশায় আমি যুদ্ধ করিনি । যদি কোন পুরষ্কার আমার প্রাপ্য হয় তাহলে আমাকে পুরষ্কৃত করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ।"

মূল : আমরা সেই সে জাতি - আবুল আসাদ

স্বামী কি স্ত্রী'র পাশে বন্ধু হতে পারে?

24 September 2014

লেখকঃ নূর আয়েশা সিদ্দিকা

আমি তখন সবেমাত্র কলেজে উঠেছি। একদিন পত্রিকার পাতায় একটি আর্টিকেল চোখে পড়লো। স্বামী কি স্ত্রী'র পাশে বন্ধু হতে পারে।? দু'চোখে উৎসুক নিয়ে পড়ে দেখি বিপক্ষে অবস্থানকারীদের সংখ্যাই বেশী। চুপি চুপি বলি পাঠক, আমার কলেজের বিশেষ একজন অধ্যাপিকা ম্যাডাম ও দেখি সেই দলে। আর সমর্থন করেছেন যারা তাদের সংখ্যা ২/১ জন শুধু। স্বামীরা যে বস সুলভ আচরণ করেন, স্ত্রী'র ক্যারিয়ারকে মেনে নিতে পারেন না, নিজের ডিসিশনকেই বেশী প্রাধান্য দেন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তারা তুলে ধরেছেন। পুরো আর্টিকেলটি পড়ে মনে হল স্বামী শব্দটির সাথে স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা,স্বৈরাচারী এধরণের শব্দগুলোর গোপন এক আঁতাত আছে।

বন্ধুদের মাঝ হতে আমার বিয়েটা বেশ তাড়াতাড়িই হয়েছিলো। আমি যখন অনার্স ফাস্ট ইয়ারে পড়ি তখন। আমি মনে মনে ভাবলাম ইয়া আল্লাহ সত্যিই এবার বিপদে পড়েছি। আমি যদিও পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান কিন্তু তাই বলে যখন তখন ২৪ ঘন্টা কেউ আমার উপর হম্বি তম্বি করুক সেটা আমার একদম পছন্দ নয়। তাই শুরু হল আমার ওয়াচিং এর পালা।

বিয়ের কয়েক দিনের মাঝেই খেয়াল করলাম আমার 'স্বামী' বাইরে বের হলেই ফুল কিনে আনে। আজ এত বছরে ও সেই অভ্যাসের নড়চড় হয়নি। আমার প্রবাসী জীবনে তো বটেই। ১ মাসের জন্য বাংলাদেশে গেলেও ও ফুল কিনতে ভুল হয় না ওর। একদিন কথা প্রসঙ্গে বড় আপু বলেছিলো আমি যে ফুল খুব পছন্দ করি সেটা আপুর কাছ হতে ও শুনেছিলো। গত ২/১ বছর আগের ঘটনা। জরুরী প্রয়োজনে আমার স্বামীকে ২ সপ্তাহের জন্য একাই দেশে যেতে হল। আমার এর আগে কখনো এরকম একা থাকার অভিজ্ঞতা নেই। তাই প্রথম প্রথম খুব ভয় পেলাম। পরে ভয়টা অভিমানে রুপ নিলো। ঠিক করলাম ও জেদ্দায় ফিরলে কথা বলা বন্ধ করে দেব। এয়ারপোর্ট হতে যখন বাসায় ফিরলো আমি দরজা খুলে সালাম দিলাম। রজনীগন্ধার একঝলক সৌরভ এসে আমার নাকে লাগলো। ফুলপ্রেমী আমার নাক রজনী গন্ধাকে ভুলে যাবে এ হতেই পারে না। কিন্তু ব্যপারখানা কি? হঠাৎ দেখি ও মুচকি হেসে পেছনে লুকিয়ে রাখা হাতটা বের করে আনলো। ওমা প্রায় ৫০টার মত রজনী গন্ধা। অভিমান কি আর থাকে পাঠক। আমার মেঘ বিদূরিত মুখ লুকাতে গলায় প্রাণপণে গাম্ভীর্য ধরে বললাম– আহা ফুল গুলো তাড়াতাড়ি দাও। বেচারারা এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে। নিশ্চয় ওদের পানির তেষ্টা পেয়েছে।

আমার বিয়ের আগে রান্নার অভিজ্ঞতা শুধু দু'দিন চা বানানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। বিয়ের পর যখন প্রবাসী জীবন শুরু হল তখন তো কিছুই রাঁধতে পারিনা। কাকে দিয়ে যে কাকে রাঁধে সে জিনিসটাই আমি বুঝতাম না। আমার 'স্বামী'র কাছ হতে জানলাম ১ কাপ চালে ২ কাপ পানি দিতে হয়। আর যে কোন তরকারি রাঁধতে হলে তেল, পেঁয়াজ , লবণ, মশলা অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। ব্যস শুরু হল রান্নায় হাতখড়ি। প্রথম প্রথম ভাত, ডাল আর ডিম ভাজতাম শুধু। এমনও অনেক বার হয়েছে আমার নিজের রান্না আমি নিজেই খেতে পারিনি। কিন্তুসেই শুরু হতে এত বছর জীবনে আমার স্বামী কখনো বলেনি তোমার ওই রান্নাটা ভালো হয়নি। সব সময় হাসি মুখে খেয়ে উঠেছে।

আমি ছোট বেলায় খুব খাবার বাছাবাছি করতাম। ২/৪ রকম মাছ ছাড়া তেমন কোন মাছই খেতাম না। একদিন ছোট ভাইয়া ইংল্যন্ড হতে ফোন করে আমার হ্যজব্যন্ডকে বলল- ও তো খাবার নিয়ে আপনাকে খুব বিরক্ত করে তাই না? ছোট বেলা দেখতাম আম্মুকে খুব জ্বালাতো। আমার স্বামী দেখি এদিক হতে জবাব দিলো – ও যেটা পছন্দ করে না আমি সেটা বাসায়ই আনিনা। আসলেও তাই প্রথম প্রথম আমি মাছ খাইনা বলে ও তেমন মাছ আনতো না। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম- আহা বেচারা মাছ খেতে এত পছন্দ করে। তখন হতে আমি ও একটু একটু খেতে শুরু করলাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক মাছই খেতে পারি।

জীবনের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে কখনো প্রিয় স্বদেশ ছাড়তে হবে এটা আমার কল্পনার ও অতীত ছিলো। তাই বিয়ের সময় এ নিয়ে খুব মন খারাপ ছিলো। তাছাড়া তখনো আমার পড়ালিখাটা শেষ হয়নি। তাই ভেবেছিলাম বিয়ের পর লিখাপড়ার সাথে জনমের মত ছেদ পড়ে গেল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার স্বামী আমার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাকে পড়ার পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রথম ভিসাটাই ক্যানসেল হয়ে গেল। পরে ও মাষ্টার্সের সময় সেশন জটের কারণে আমাকে বছরে ২/৩ বার ও দেশে যেতে হয়েছে। ততদিনে আমার প্রথম দুটো সন্তানের ও জন্ম হয়। কিন্তু আমার স্বামী কখনো আমাকে বাধা দেয়নি। বিয়ের সময় যেসব নিন্দুকেরা বাঁকা ভাবে বলেছিলো- গেলো অত মেধাবী মেয়েটার পড়া এবার বারোটা বেজে গেল। তারাই দেখতাম পরবর্তীতে বলতো- তোমার স্বামী তো দেখি জেদ্দা আর বাংলাদেশকে বাড়ি আর উঠোন বানিয়ে ফেলেছে।

মনে পড়ে আমার মাষ্টার্স কমপ্লিট হবার পর একদিন এক ভাবী ফোন করে বললেন- ভাবী আপনি শপথ করে বলেন তো আপনার স্বামী আপনাকে চাকরী করতে লিখাপড়া করায়নি। আমি বললাম- প্রশ্নই উঠেনা। তখন মহিলা কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন- ভাবী অনার্সে আমার এত ভালো রেজাল্টের পর ও আমার স্বামী আমাকে মাষ্টাসটা কমপ্লিট করতে দিচ্ছেনা। অথচ ওর সামর্থ আছে। আমি যখন আপনার কথা বললাম তখন বলল- দেখ গিয়ে উনাকে দিয়ে উনার হ্যজব্যন্ড চাকরি করাতে চান।

আমি একবার চাকরি নেব কিনা ওর মতামত চাইলে ও বললো- তোমার ইচ্ছে। আমি জোর খাটিয়ে কিছু বলবো না। তবে তুমি এখন তোমার অবসরটা কিছু সৃষ্টিশীল কাজে লাগাতে পারছো। তাই বলবো তোমার অবসরটা কারো কাছে বেঁচে দিও না। আমার ওর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম।

আমি মাঝে মাঝে কিছু হাতের তৈরী শোপিস বানাই। আমার স্বামী সব সময় আমার এই কাজের সহযোগী। একদিন তো একটি গাছের চ্যাপ্টা গুঁড়ির উপর আর একটি মরা গাছের কান্ড লাগিয়ে একটি পাহাড়ী গ্রাম বানাচ্ছি। সব কিছু ঠিকমত হল। কিন্তু আলাদা কান্ডটা কিছুতেই লাগাতে পারছিনা। আমি অভিমান করে বললাম- ঘরে কি কেউ নেই আমাকে একটু সাহায্য করবে? সঙ্গে সঙ্গে ও এসে লেগে গেল। দু'জন মিলে এই কাজ শেষ করে ঘুমুতে গেলাম প্রায় রাতের ১টা।

আমি আমার পরিবারে ছোট ছিলাম বলে আমার যে কোন ডিসিশনে বড়দের ভূমিকাই বেশী ছিলো। বিয়ের পর দেখি যে কোন ব্যপারে আমার স্বামী আমার সাথে পরামর্শ করে। সত্যি বলছি পাঠক আমি অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতাম সব ব্যপারে আমাকে এত জিজ্ঞেস করার কি আছে। আমাদের বাসায় তো আমাকে এভাবে গুরুত্ব দেয়া হত না। পরে পরে বুঝেছি আসলে দু'জনের যৌথ জীবন যাপনে এই দিক গুলোর ঘাটতি অনেক পরিবারে মনোমালিন্যের কারণও ঘটায়।

আমি মাছের ডিম খেতে খুব পছন্দ করি সেটা বড় মাছ হোক আর ছোট একটি পুটি মাছের ডিমই হোক। আমার বিয়ের পর হতেই দেখি যখনই খেতে বসি আমার স্বামী মাছের ডিম পেলেই সেটা প্লেটের একপাশে সরিয়ে রাখে। পরে কেউ না দেখে অমনি করে আমার প্লেটে চালান করে দেয়। আমি মনে করি অতটুকু মাছের ডিম আসলে কোন বিষয় না । কিন্তু ও যে আমার ছোট খাটো পছন্দের ও খেয়াল রাখে সেটা ভেবেই বেশী ভালো লাগে। আর এখন তো আমরা এক সাথে খেতে বসলে ও যখন মাছের ডিমটা আমার প্লেটে চালান করে দেয় তখন বাকী তিনজন হৈ হৈ করে বলে- আব্বু, তুমি আম্মুর প্লেটে কি দিলে? তখন কি আর করা আমি সেই কড়ে আঙ্গুলের অর্ধেকের মত ডিমটিকে ৫ভাগ করে সবার প্লেটে একটু একটু ডিস্টিবিউট করি। খাদ্য হিসেবে যদিও জিনিসটি তেমন কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের ৫ সদ্যসের মাঝে ভালোবাসার উষ্ণতা ছড়াতে সত্যিই কিন্তু অনেক কিছু।

আসলে আমি মনে করি স্বামী স্ত্রী'র মাঝে বন্ধুত্বের একটি বন্ধন তৈরী করতে অনেক বেশী পরিশ্রমের দরকার হয়না। একজন অন্যজনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অন্যের পছন্দের গুরুত্ব দেয়া,পারস্পরিক পরামর্শ, একে অন্যকে বুঝতে পারাএ ধরণের বিষয়গুলোকে খেয়াল করলেই চলে। আজকাল অনেক উচ্চশিক্ষিত স্বামী-স্ত্রী'র মাঝে যে অহরহ পরিবার ভাঙ্গার ঘটনা ঘটে আমি মনে করি এর মূলে বড় কোন ব্যপার দায়ী নয়। শুরুর কথায় আসি আমি কিন্তু আমার পারিবারিক জীবনে পথ চলায় স্বামী শব্দটির অর্থ পাই- সহমর্মী, সহানুভূতিশীল সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে।

আমার স্বামীর এক কলিগ একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলো- আপনাদের মধ্যে তো কখনো ঝগড়া হয় না তাই না? আমি বলবো খুনসুটি ছাড়া সম্পর্ক গুলো বড় বেশী ফরমাল মনে হয়। তবে আমরা সেই খুনসুটিকে কখনো বাড়তে দিইনা। আর আমার পিচ্চি মেয়েটি তো আছে আমাদের দু'জনের হাতটা মিলিয়ে দিয়ে বলবে – এখন তোমরা ফ্রেন্ড হও।

তাই বলবো স্বামী -স্ত্রী আসলে একে অন্যের বন্ধু হতে পারেন কিনা এটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। আসুন আমরা এখন হতেই এই সম্পর্কের প্রতি যত্নবান হই।

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমারো প্রাণ কোন সে বাঁধনে

14 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে আমাদের প্রজন্ম। আমাদের সময়, আমাদের পরিবার, আমাদের বন্ধন আর আমাদের চারপাশ! তথ্য প্রযুক্তিতে থ্রি-জি, ফোর-জি এর জেনারেশন বদলের চাইতেও দ্রুত বদলে যাচ্ছে আমাদের জেনারেশন, তার "ইন্টারনাল টেকনোলজি" আর ইভোলিউশন হচ্ছে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে।

আগে একটা সময়ে আমাদের প্রজন্মের আব্বা-আম্মারা তাদের মধ্যে কথাবার্তা 'মেলামেশা' ছাড়াই বিয়ে-শাদী করেছিলেন। সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেখলে গলার কণ্ঠ নামিয়ে তর্ক-ঝগড়া করতেন। কথায় কথায় মায়েরা বাপের বাড়ি 'যাও', 'যাবো' বলতে পারতেন না, বলতেন না... একাট্টা হয়ে দু'জনে মিলে যুদ্ধ করে সংসার নামের নৌকাটার হাল ধরতেন সংসার জীবনের চরম দুর্দিনেও... পারস্পরিক সম্মান, অগাধ বিশ্বাস আর দু'জনের মিলিত "কমিটমেন্টের" মাধ্যমে তারা পাড়ি দিয়েছেন বিশাল পথ। ভালোবাসা শব্দটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখিইনা আমরা তাদেরকে!

অথচ আজ আমরা বিয়ের আগে 'দেখাদেখি' 'মিলামিলি' আর 'মিশামিশি' ছাড়া কল্পনাই করতে পারিনা বিয়েশাদী। আধুনিকা মেয়েরা অচেনা ছেলেদের সাথে বিয়ে করাকে "শুয়ে পড়া" বলে 'ডিনোট' করতে পছন্দ করেন। এক বান্ধবীকে ক্লাসরুমে বিয়ে নিয়ে বলতে শুনেছিলাম -- "আব্বা-আম্মার পছন্দের ছেলেটার সাথে ধুম করে শুয়ে পড়তে পারবো না।" আর নিজ শব্দটা, ভাবের প্রকাশটা ধাক্কার মত লেগেছিলো আমার। বাবা-মা পছন্দ করতে গেলেই সেটাতে "শুয়ে পড়া" প্রধান হয়। অথচ নিজেদের পছন্দ কেবল সমাজের নিত্য-নতুন অবিন্যস্ততা বা কঠিন ভাষায় অরাজকতাই এনে দিচ্ছে। আধুনিক আমাদের পোলাপানরা ফেসবুকে দিনে রাতে স্ট্যাটাস বদলে "সিঙ্গেল" থেকে "ইন আ রিলেশনশিপ" আর "ইটস কম্পলিকেটেড" বানায়.....সম্পর্কগুলো কতনা সস্তা হয়ে যাচ্ছে!

আমাদের মায়েরা "ক্ষ্যাত" ছিলো! সারাজীবন আমাদের কোলেপিঠে মানুষ করত, মাথার চুলটা আঁচড়ানোর সময় থুতনি সমেত গাল দুইটা ধরত, স্কুলের টিফিনটা বেঁধে দিতো নইলে পানির বোতলটা ভরে দিতো। তাদের বান্ধবীদের সাথে হিন্দি সিরিয়ালের আলাপ জুড়তো না ঘন্টার পর ঘন্টা। সময় বদলে এখন কাজের মেয়ে 'আনিসা'রা আমাদেরকে স্কুলে পাঠায়। আম্মু সকালে অফিসে যাবার আগে খালি বলে যান--"সুমন, খাবারটা খেয়ে নিয়ো, বাসায় ফিরে পড়াশোনা করিও... "। সুমনরা বাসায় ফিরে নেটে চ্যাট করে, লাল সাইটগুলোতে বসে চোখ লাগায়, মোবাইল কানে ধরে বিছানায় গড়াগড়ি খায়। এভাবেই বেড়ে উঠতে থাকে আগামী যুগের কর্ণধারেরা, তাদের হাতেই আমাদের আগামী সময়ের নেতৃত্ব...

আমরা তিন চারটা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড না থাকলে 'স্মার্ট' হইনা। বিএফসি আর কেএফসি তে না খেলে 'ইশমার্ট' হইনা। একবার আমাদের এক বন্ধুকে অপর বন্ধু 'টেক্সমার্ট' না চেনার অপরাধে তাচ্ছিল্য করেছিলো -- সেই ভাষাটা ভুলে যাবার মতন ছিলো না। আমাদের সময়ের টিভির মডেল আপুদের দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হই। জীবনে 'মুক্ত' হইতে পছন্দ করি। "কেমন ছেলে পছন্দ?" এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে শোনা যায়-- "কেয়ারিং শেয়ারিং..... ইত্যাদি ইত্যাদি"-- যার গূঢ়তম অর্থ কী -- বক্তার দল কোনদিনও ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। কারণ তারা জানেনই না! তারা জানেন এগুলো কিছু বাক্য যেগুলো স্মার্ট হলে বলতে হয়--ভাবতে হয়। তার জাগতিক অবস্থান আছে কিনা সেগুলো চিন্তার অধিক ব্যাপার-স্যাপার।

"আমি একটু 'স্বাধীনচেতা'" মর্মে আমাদের নব্য আধুনিকা আপুরা ঘোষণা দেন। অথচ তারা জানেনই না এইটার মানে কি! স্বাধীন হতে হতে অদ্ভূত একটা পরাধীনতার শিকলে আটকা পড়ছেন সেটা টের পাচ্ছেন না। নিজেকে "আকর্ষণীয়" করে উপস্থাপন না করলে, 'খুল' আর 'হট' না হলে পুরুষদের কাছে তারা 'ইভ্যালুয়েটেড' হবেন না বলে পার্লারের সাথে, ফেসিয়াল, আই-ব্রো প্লাক, চুল স্ট্রেইটিং, মেনিকিউর, পেডিকিউর এর সাথে আজীবন বন্ধন করে ফেলছেন। অথচ এই ভরা

সৌন্দর্য আর সহজাত যৌবন চলে যাবার পর তারা কী দিয়ে "পুরুষ"দের "বেঁধে" রাখবেন -- সেই চিন্তাটা মোটেই ভাবেননি তারা -- হলফ করে বলা যায়। এই "বাঁধন" খুবই অবিবেচক, খুবই দুর্বল বাঁধন রে বোন -- এভাবে হয়না! অর্জন করতে না পারো, নিজেকে লেলিয়ে দিয়ে পাশবিক অনুভূতির পুরুষ দ্বারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করিও না! সেদিন একটা ফিচারে পড়ছিলাম -- পশ্চিমা বিশ্বে নাকি ৫০ শতাংশ ছেলেপিলে তাদের বাবার পরিচয় জানে না! তথ্যের অথেনটিকেশন জানিনা, তবে ঘটনা যেমন জানি সেই হিসেবে নামলে অবস্থা এর চাইতে খারাপ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের গন্তব্য কি অমনই কোন ঠিকানায়?

এই জগতের কোন নারী কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না যে তারা একটা পুরুষের জন্য মনের অনেক অনেক স্বপ্ন সযত্নে সাজিয়ে রাখেন। সেই মানুষটা এসে তার প্রতি আন্তরিক হবে, কথা শুনবে আর একসাথে বন্ধু হয়ে জীবনটা কাটাবে-- বেশিরভাগই এমন চিন্তা করেন। যেইসব 'ছেলেদের' সাথে আপুরা এখন সন্ধ্যাতে, গোধূলিবেলায় ঘুরে বেড়ান-- তারা তাদের 'স্বপ্নপূরণে' সচেষ্ট হউক-- প্রার্থনা করি। আহারে, তাও যদি হতো!! শরীরের যাবতীয় "পাপ" নাকি ঝেড়ে ফেলা যায়। একটা সময় প্রচলিত ছিলো মেয়েরা কেবল "ভুক্তভোগী"। একজন শিক্ষিত তরুণীকে বলতে শুনেছিলাম -- ছেলেরা "ঝেড়ে" ফেলতে পারলে মেয়েরাও পারে, এইটা ব্যাপার না! আমি মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম -- "যদি পারতা"! নিজেদের অজান্তে নিজেদের প্রশ্রয় দিয়ে, ছেলেদের প্রশ্রয় দিয়ে অনিশ্চিত জটিল একটা ভবিষ্যতের আঞ্জাম দিচ্ছো বোন -- সে যদি অনুভব করতে পারতে!

আন্ডারগ্র্যাডে পড়ার সময় এক বান্ধবী বলছিলো বন্ধুদের-- "মেয়েরা এখন ছেলেদের ক্ষতির ভয় পায়না, বুঝসিস?" আমি টাশকি খেয়ে তখন প্রভাপু, চৈতিপু এবং অন্যান্য অনেক মেয়েদের নামে শোনা ঘটনা দিয়ে ভাবনাটাকে মেলানোর চেষ্টা করতেছিলাম। পরেক্ষণেই সে আবার বলে দিলো-- "মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলাতে সিম্প্যাথি পায়-- তাই পরে আরো ভয় করে না। মেয়েরা কম যায়না মনে রাখিস....." আমি পুনর্বার ভ্যাবাচ্যাকে খেয়েছিলাম! সত্য মিথ্যা জানিনা, যে বলেছিলো সে অন্য অনেকের চাইতে গভীর চিন্তাশীল বলেই জানতাম, মন্তব্যগুলোকে উড়িয়ে না দিয়ে বিব্রত হয়েছিলাম।

এখন জীবনের বেশিরভাগ (পড়ুনঃ সমস্ত) ইমোশোন বিয়ের আগেই শেষ। ফোনে, রেস্টুরেন্টে, ধানমন্ডি লেকে গিয়েই মনের, দেহের সব 'চাওয়া'গুলা পূর্ণ হয়ে যায়। টিএসসিতে, পার্কগুলো, রেস্টুরেন্টগুলোতে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে বসে দেহের উষ্ণতা নেয়াটাই আমাদের 'স্বাভাবিকতা'। এই রামাদান মাসেও রিকসার মাঝে অদ্ভূত সন্নিবিষ্টতার উদ্দাম তারুণ্যকে দেখেছেন -- এমন মানুষও কম নেই। অথচ এমন করেই একদিন মিউচুয়াল "ব্রেক আপ" হয়ে যান' আমাদের আপু আর ভাইয়ারা... আবার শুরু হয় নতুন কারো খোঁজ... অন্তহীন অক্লান্ত খোঁজাখুজি। ফেসবুকে অনবরত প্রোফাইলে ভ্রমণ করে, বন্ধুদেরকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে অনুরোধ করে, এয়ারটেলে কল করে হাবীবের গান "বলে ওঠো আজ না বলা কথা" শুনে গিয়ে নতুন ছেলে-মেয়েদের মাঝে বন্ধু খোঁজা, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড খোঁজা আমাদের ভালোবাসা। তারপর, আবার সেই পুরোনো লুপ। শেষ কোথায় হয় --কেইবা জানে!!

এখন বন্ধুদের মাঝে স্বাভাবিক আড্ডাচ্ছলে প্রশ্ন হয়--"ওর কয়টা অ্যাফেয়ার ছিলো?" উত্তরে দুই বা ততোধিক শোনা বিচিত্র না। বরং এটাই এই প্রজন্মের কাছে "স্বাভাবিক" হিসেবে পরিগণিত। "ধার্মিক" বলে দাবী করা একজন বোনের

মুখে অপর ভাইয়ের "আগের গার্লফ্রেন্ডটাই এখনো আছে কিনা" টাইপের প্রশ্ন শোনার পর নিদারুণ হতাশায় একটা দিন কেটেছিলো আজো মনে আছে। বিবাহপূর্ব সম্পর্কের জোয়ারে ভেসে যায় তরুণ সমাজ, বন্ধনহীন সংসার যেটাকে বলা হয়... আআহ! আমাদের ভালোবাসারা!

সেদিন শুনলাম আমার ইংলিশ মিডিয়ামে ক্লাস সেভেনে পড়া কাজিন (বোন) বলতেসিলো তাদের মাঝে "ক্রেজি" নামক খেলা আছে। কে কত বেশি 'ক্রেজি' কাজ করতে পারবে। নির্দিষ্ট কয়েক ধাপের পর যে 'সিলেক্ট' হবে, মোস্ট ক্রেজি কাজ হচ্ছে বড় ভাইয়াকে গিয়ে একটা 'অফার' দিতে হবে। শুনেই কান গরম হয়ে গিয়েছিলো আমার! এটাই নাকি সিম্পল, এটাই নাকি গেম! কী জানি বাপু, ১০ বছর আগে ফেলে আসা বয়েসের খেলাধূলা তো এমন ছিলোনা! আসলে, আমরা তো আধুনিক হচ্ছি। তাই, অমন সহজেই কান উষ্ণ হওয়াটাও আমাদের কানের আধুনিকতা।

আরো অনেক কিছুই আছে, বলতেও আর আগ্রহ পাচ্ছিনা। পারলে অন্যসময় বলবো। তবে একটা কথা না বললেই না -- আমাদের এই তারুণ্যে, এই যৌবনে, এই সমাজে আজ কিছু ক্ষত দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষততে ঘা হয়েছে। ভয় হয়, এই ঘা যখন গ্যাংগ্রিনে পরিণত হবে -- তখন আমরা কোথায় যাবো। গোড়া থেকে কেটে ফেলে কতটুকু কী রক্ষা করতে পারবো জানিনা! সেদিনের আগেই যদি সচেতনতা না আসে, সেদিনের আগেই যদি আমরা না বুঝি আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক যেই গাইডলাইন দেয়া হয়েছিলো -- তার মাঝেই "আলটিমেইট" মুক্তি, তাহলে অনাগত ভয়াবহ দিনের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আসে না।

এই সৃষ্টিজগতের জটিলতম সৃষ্টি মানুষ, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে কীভাবে চলতে হবে, কী করে চললে তার পারফরমেন্স হবে সবচাইতে ভালো, সুস্থ আর সুন্দর তার যাবতীয় নির্দেশনা দিয়েছেন সেই মহান শিল্পী, মহান স্রষ্টা। তাই দুনিয়া আর আখিরাত -- উভয় জগতের অনন্ত ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে তার প্রদর্শিত পথে ফিরে যাবার মাঝেই আছে সফলতা। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

.....

দ্রষ্টব্য ১ : লেখায় ব্যবহৃত ডাবল কোটেশন (" ") চিহ্নগুলো উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে শব্দে ব্যবহার হয়েছে বিশেষ অর্থে বোঝানোর আবেদন স্বরুপ।

দ্রষ্টব্য ২ : প্রায় ১ বছর আগে প্রকাশিত একটা লেখাকে উপজীব্য করে নতুন করে পোস্ট করলাম। সময়ের দাবীতে নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টা।

গাছা ও গাছি

2 September 2015

লেখকঃ কানিজ ফাতেমা

নদীর ধারে একটু নির্জন বাঁকে আপনা থেকেই জন্ম নিয়েছে দু'টি গাছ। পাশাপাশি, কাছাকাছি। তাদের পাতার সতেজ নবীন আভাই বলে দেয় খুব বেশী দিন হয়নি ওরা জন্মেছে। কতইবা বয়স হতে পারে ? গাছার হয়তো পনের আর গাছির দশ-বারো। শাখায়-পাতায় জাড়াজড়ি করেই বেড়ে উঠেছে ওরা। একই বাতাসে দোলখায় তারা। একই সঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজে, রোদে পোড়ে। দূর-দূরান্ত থেকে পখিরা এসে বসে ওদের ডালে। একটু জিরোয়, ফুরুত করে এডাল থেকে ওডালে ওড়ে, নাচানাচি করে, আপন মনে ডাকে আর তারপর পাখনা মেলে পাড়ি জমায় নিজ ঠিকানায়। কখনও কখনও একঝাঁক পাখি এসে কিচির মিচির মেলা বসায়। এ সবই উপভোগ করতে করতে দিনে দিনে ওরা বেড়ে উঠেছে।

জন্মের পর প্রথম ক'টি বছর গাছা খুবই নি:সঙ্গ ছিল। নির্জন বাঁকে মাঝে মাঝে পাখিদের গান অথবা দূর নদীতে দু' একটি নৌকার ছলাৎ শব্দ এই ছিল তার সারা দিনের বৈচিত্র। তাই গছি যখন মাটির উপরে মাথা তুলে প্রথম পৃথিবীর আলোতে পাতা মেলেছিল, বাতাসে থির থির কেঁপেছিল তখন গাছার মনেও আনন্দের বন্যা বয়েছিল। সে পরম যত্নে গাছির মাথার উপরে নিজের পাতা মেলে দিয়েছিল। গাছিও গাছার পাতার কোমল ছায়ায় ধীরে ধীরে বাড়ালো। সেদিন থেকেই ওদের এ শখ্যতা।

কয়েক বছরের মধ্যেই গাছা তার ডাল পালা মেলে মাটির নীচে শেকড়ের জাল বুনে মোটামুটি এক বিশাল দেহে আবির্ভূত হল, যেন শক্ত সমর্থ এক বীর মূর্তি।

গাছি বললো,

- আমিও ডাল মেলি?

- কি দরকার? আমি তো আছি। আমার ডালপালাই তোমাকে ঝড় থেকে বাচাঁবে।

গাছি বললো,

- শেকড় মেলে একটু শক্ত হই

- কি দরকার? আমার শেকড়ের জালই মাটি শক্ত করে ধরে রেখেছে। আমাদের দু'জনের জন্য

এই যথেষ্ট। বুক পেতে আমি তোমায় ঝড় থেকে বাঁচাবো।

গাছা তার ডাল সরিয়ে গাছিকে ডালপালা মেলার জাগয়া করে দিলনা। গাছার শেকড়ের ফাঁকে গাছি তার শেকড় ছড়ানোর সুযোগ পেলনা। ফলে গাছি দুর্বল আর গাছা-নির্ভর হয়ে রইলো।

একদিন হঠাৎ দশদিক দাপিয়ে ঝড় শুরু হল। ঝড়ের সেকি তান্ডব - বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নদী পানিও যেন দুকুল ছাপাতে চাইছে। উপরে বাতাস আর নীচে নদীর জোয়ারের তোড়-গাছা একা আর সামলে উঠতে পারলোনা। বাতাস গাছার শক্ত ডাল এক এক করে ভেঙ্গে ফেলল। নদীর জোয়াড়ে গাছার শেকড়ের বুণনকে আলগা আলাদা করে দিল। গাছি তার দুর্বল শরীর দিয়ে গাছাকে সাহয্য করতে চাইলো। চাইলেই কি আর সব হয়? সামর্থ থাকাতো চাই। ঝড়ের সাথে যুঝতে যুঝতে দুর্বল গাছা বললো - "গাছি, যদি তোমার শাখাকে বাড়তে দিতাম তবে আজ 'আমরা একসাথে' পাগলা হাওয়া রুখতে পারতাম, তোমার শেকড় যদি মজবুত হতে দিতাম তবে আজ দু'জনে মিলে মাটি আকড়ে রাখতে পারতাম। হায়! তোমার বশ্যতা পাবার লোভের আজ এ পরিনতি। **শ্রেষ্ঠত্বের আহংকার আর বশ্যতার নিস্ক্রিয়তায় ভালবাসা নেই; পারস্পারিক সম্মানের ভারসাম্যেই ভালবাসা।**"

বাতাসের শোঁ শোঁ গোঙ্গানী ছাপিয়ে মড়-মড়াৎ শব্দ হল। পরের দিন পাখির ঝাঁক এসে তাদের চিরপরিচিত বসার জায়গা আর খুঁজে পেলনা। তারা দেখল নদীর চরে শিকড় উপড়ে পাশা পাশি পড়ে আছে দু'টি গাছ।

স্বামীর পরশে বদলে গেল স্ত্রীর জীবন !

26 August 2015

কুরআনের আলো ডট কম

নাম তার আব্দুল ওয়াহহাব। আমেরিকান এক মুসলমান। কয়েকদিন পূর্বে বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলেছেন এক ষোড়শী যুবতীকে। যুবতীর নাম রাইহানা। যুবতী বেশ সুন্দরী। অনিন্দ্য সুন্দরী। ওর বাইরের রূপটা যে কোনো পুরুষকে মুগ্ধ করলেও ভিতরটা তার ঘোর অন্ধকারে ঢাকা। কারণ ইসলামের আলো এখনো তার অন্তর জগতে প্রবেশ করেনি। কালেমায়ে শাহদাত পড়ে মুসলমান হয়নি। ধর্মে ছিল সে খৃস্টান। আর এ অবস্থায়ই নববধূ হয়ে চলে আসে জনাব আব্দুল ওয়াহহাবের স্ত্রী হয়ে।

রাইহানা ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আব্দুল ওয়াহহাব সাহেবকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মোকাবেলা করতে হয়েছে মারাত্মক পরিস্থিতির। পাঠকবৃন্দ! চলুন, জনাব আব্দুল ওয়াহহাব সাহেবের মুখ থেকেই তাদের কাহিনীটা হৃদয়ঙ্গম করি। সেই সাথে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করে তদানুযায়ী নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করি।

জনাব আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব বলেন, রাইহানাকে বিয়ে করার সময় আমি ছিলাম নামে মুসলমান। ইসলামী বিধি-বিধান পালনের কোনো গুরুত্ব আমার মধ্যে ছিল না। তাই সেগুলো রীতিমত পালনও করতাম না। এমনকি কোনো খৃস্টান মেয়ের সাথে কোনো মুসলমান ছেলের বিয়ে সহীহ হয় না একথাটিও আমার জানা ছিল না। রাইহানার অবস্থাও ছিল আমার মতো। সেও তার ধর্মের প্রতি আন্তরিক ছিল না। বরং বলা যায়, ধর্ম কিংবা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে তার কোনো মনোযোগই ছিল না। আমি অবশ্য মাঝে মধ্যে মসজিদে যেতাম। নামাজ পড়তাম। কিন্তু সে কখনো চার্চে যেতো না।

কিছুদিন পর আমাদের একটা সন্তান হলো। তখন আমি সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তায় বিভোর হলাম। ভাবলাম, আমি ও আমার স্ত্রী যদি একই ধর্মের অনুসারী না হতে পারি, তবে সন্তান বড় হয়ে কোন্ ধর্মের অনুসারী হবে। তাই আমি রাইহানাকে মসজিদে যাওয়ার দাওয়াত দিলাম। কিন্তু আমার দাওয়াত সে স্পষ্ট ভাষায় কেবল অস্বীকারই করল না, উল্টো চার্চে যেতে শুরু করল। এমনকি এটি একটি অলিখিত নিয়মই হয়ে গেল যে, তাকে আমি যখনই মসজিদে যাওয়ার কথা বলি তখনই সে চার্চে ছুটে যায়।

এবার আমার বোধদোয় হলো। আমি ভাবলাম, আমি মুসলমান, আমার স্ত্রী খৃস্টান। হায়, এ আমাদের কেমন জিন্দেগী? মুসলমানের ঘরে খৃস্টান বউ! তাছাড়া এতদিন তো অবস্থাটা এমন ছিল যে, সে চার্চে যেত না। কিন্তু এখন? এখন তো সে চার্চেও যায়!

আমি বিষয়টি নিয়ে খুব ফিকির করলাম। তাকে মুসলমান বানানোর জন্য কী কৌশল অবলম্বন করা যায়, এ নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলাম। অবশেষে তাকে এই প্রস্তাব দিলাম যে, চলো এক রবিবারে আমরা উভয়ে চার্চে যাবো, আর আরেক রবিবারে যাব মসজিদে। সে খানিকটা চিন্তা করে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। এই প্রস্তাব দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমি চাছিলাম যে কোনোভাবে ইসলামের পরিচয় তার সামনে প্রকাশিত হোক। সে ইসলামের কাছে আসুক।

আমি যখন আমার স্ত্রীকে মুসলমান বানানোর ফিকির করছিলাম তখন আমার মাঝেও আত্ম সচেতনতা সৃষ্টি হলো। আমি মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, আমি কেমন ঈমানদার যে, মুসলমান হয়েও ইসলামী বিধি-বিধান ঠিকমত পালন করি না? ইসলামের রঙে রঙিন হই না? তাছাড়া আমি নিজে ইসলাম পালন না করে, আরেকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তা কতটুকুই বা কার্যকর হবে? না, আমাকে আর এভাবে চললে হবে না। আমাকে পুরোপুরি মুসলমান হতে হবে। আমলদার হতে হবে। ইসলামের যাবতীয় বিধান একশ ভাগ পালন করতে হবে। তখন হয়তো আমার স্ত্রীকে আর ইসলাম গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে হবে না। কারণ সে যখন তার স্বামীর মধ্যে ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করবে, অতি সহজে তখন ইসলামের প্রকৃতরূপ তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে। ফলে তখন সে নিজেই ইসলামের প্রতি আগ্রহী হবে এবং আল্লাহ চাহেত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়ও নিবে।

যে কথা সে কাজ। সেদিন থেকে আমি আমার জীবন বদলাতে শুরু করলাম। আলেম-উলামাদের সান্নিধ্যে যেতে লাগলাম। একান্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে লাগলাম, ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান। প্রত্যেক কথা ও কাজে অনুসরণ করতে লাগলাম, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নত। ঘরে বাইরে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে লাগলাম। মোট কথা ইসলামী আচার-আচরণে রাঙিয়ে তুললাম আমার জীবনের প্রতিটি অঙ্গন।

আমি যখন ধর্মের প্রতিটি বিধান একান্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম, তখন আমি মনের মধ্যে এমন এক প্রশান্তি অনুভব করলাম, যা কেবল অনুভব করা যায়, অন্যকে বলে বুঝানো যায় না। আর সে প্রশান্তি ছুঁয়ে গেল রাইহানার কোমল হৃদয়কেও। দেখা গেল, কিছুদিনের মধ্যেই সে ইসলামী আচার-আচরণ ও সভ্যতার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে। দুর্বল হয়ে পড়ে ইসলামের প্রতি। তাছাড়া ঘরে ইসলামী পরিবেশ, আর মসজিদ থেকে ইসলাম সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা শ্রবন এ দুই বস্তু ইসলামের প্রতি তার দুর্বলতা ও আগ্রহকে বহুমাত্রায় বাড়িয়ে তুলে। ফলে বেশিদিন আমাকে অপো করতে হয়নি। ইসলামের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে একদিন সে কালিমায়ে শাহাদত পড়ে মুসলমান যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

আরো খুশি ও শুকরিয়ার ব্যাপার হলো, ইসলাম গ্রহণের পর রাইহানা আশ্চর্য রকমভাবে বদলে যায়। মুসলমান হয়ে ইসলামকে সে গ্রহণ করে প্রাণখুলে, পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভালোবাসার সাথে। সে তার জীবনের প্রতিটি কাজকে ইসলামের রঙে রঙিন করে তুলতে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। পর্দা করতে শুরু করে। তাও আবার অসম্পূর্ণ পর্দা নয়। অর্থাৎ মুখ কিংবা চোখ বের করা 'ফ্যাশনী পর্দা' নয়। রাইহানা প্রায়ই বলে, মুসলমানের ঘরে জন্ম হওয়া সত্বেও মুসলিম নারীরা কেন পর্দা করে না? আর করলেও কেন পুরোপুরি করে না? কেন তারা ইসলামী কায়দায় মাথা ঢাকে না?। কেন তারা শরীরটা ঢেকে সৌন্দর্যের উৎস 'মুখখানা' খোলা রাখে? তাদের কি কোনো অনুভূতি নেই? তারা কি বুঝে না যে, মুখ

কিংবা চোখ খোলা রেখে পর্দা করলে পর্দার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় না? তবে কি তারা আল্লাহকে ভয় করে না? তাদের কি চিন্তা নেই যে, উত্তমরূপে পর্দার বিধান পালন না করলে মৃত্যুর পর কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে তাদেরকে? এমনকি দুনিয়াতেও সম্মুখীন হতে পারে নানাবিধ পেরেশানীর? তাছাড়া ইসলামী পোষাক তো নারীর ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তোলে। তার মর্যাদাকে বিকশিত করে। আহা! ওরা না বুঝেই অন্যদের রঙ চড়াতে চাচ্ছে নিজেদের গায়ে!

ইসলামের প্রতি রাইহানার বিশ্বাস ছিল পরম শাণিত। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী শিক্ষার প্রতি তার ঝোঁক অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। সে এখন অন্য ধর্মের কোনো বই-পুস্তক পড়ে না। বরং ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বই-পুস্তক এনে দেওয়ার জন্য আমাকে সে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে। আমিও সানন্দে দেশের বিভিন্ন নামকরা লাইব্রেরীগুলো খোঁজে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে নামকরা লেখকদের লেখা বই-পুস্তক কিনে ওর হাতে তুলে দেই। এসব বই হাতে পেয়ে রাইহানা যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি দারুণ পুলকিত হই আমিও। কারণ, আমি তো এমনটিই চাচ্ছিলাম। বড় কথা হলো, ইসলাম সম্পর্কে রাইহানা যা-ই জানতো, যা-ই শিখতো তার উপরই সে আমল শুরু করে দিত। আর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতো আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনার পরশ পেয়েই আমি এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। আল্লাহ পাক আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সন্তানের ব্যাপারে রাইহানার বক্তব্য ছিল অসম্ভব স্বচ্ছ। সে তার সন্তানকে ইসলামী স্কুলেই পড়াবে এ যেন তার কঠিন প্রতিজ্ঞা। তার কথা হলো ইসলামী শিক্ষা ছাড়া কেউ পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারে না। সে প্রায়ই বলত, পার্থিব শিায় কোনো ঘাটতি থাকলে সেটা পরবর্তিকালে পুষিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু ধর্মীয় শিায় কোনো ঘাটতি থাকলে সেটা আর পুষিয়ে নেওয়া যায় না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব ও রাইহানার দাম্পত্য জীবন আজ পরম আনন্দের, পরম সুখের। ইসলামের স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় তারা লাভ করে অপূর্ব প্রশান্তি। ইসলাম ধর্ম জানা ও মানার মধ্যে যে এত শান্তি আছে, এত সুখ আছে তা যদি তারা আরো আগে জানতো, আরো আগে বুঝতো, তবে শান্তি-সুখের এই সুন্দরতম জীবনকে আরো আগেই তারা গ্রহণ করত।

হে আল্লাহ! ওরা যে কথাটি বুঝতে পেরেছিল, দাম্পত্য জীবনের কয়েকটি বসন্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর সে কথাটি আমাদেরকে বুঝার এবং সে অনুপাতে জীবন যাপন করার তাওফীক দাও আজই এখন থেকেই। আমীন।

source : http://www.quraneralo.com/story-of-a-husband-and-wife/

বিয়ে হলো দু'জনের ভালোবাসার মিলবন্ধন, কোন লড়াই নয়

30 October 2014

অনুবাদকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

এক.

*** বিয়ে আপনার জীবনের সমস্যাগুলোকে অলৌকিকভাবে সমাধান করে দিবে না**

"বিয়ে আপনার জীবনের সমস্যাগুলোকে অলৌকিকভাবে সমাধান করে দিবে না। বিয়ে কিন্তু সবসময় আপনার একাকীত্ব থেকে মুক্তির কিংবা বর্তমান অবস্থাটা থেকে বের হবার কোন পথ নয়। ভাই ও বোনদের উচিত বিয়ে জীবনটাকে যাদুমন্ত্র দিয়ে বদলে দিবে এমন আশা না করে ব্যক্তিগত ও আত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা।

বিয়ে ব্যক্তিগত উন্নয়নের একটি বিশাল মাধ্যম হতে পারে, হতে পারে আমাদেরকে উত্তম মানুষ হয়ে বদলে যাওয়ার জন্য সাহায্যকারী, ইন শা আল্লাহ। একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নি'আমাতগুলোর একটি হলো সুখী-সুন্দর বিয়ে; এবং এর ফলে একটি পরিবারের সৃষ্টি, সেই পরিবারের সেবা-যত্ন করা -- যা সেরা ইবাদাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য এখনই তেমন কোন কাজ করতে পারছে না, কীভাবে আশা করা যায় যে আরেকজন মানুষের আরো কিছু দায়দায়িত্ব ও মালপত্র কাঁধে নিয়ে সেই কাজটি তার জন্য সহজ হবে, এমনকি যখন সেই মানুষটিও নিখুঁত নন?

আপনি নিজেই কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হতেন? যদি না হন, তাহলে সেই আকাঙ্খিত অবস্থায় যেতে আপনার আরো কী কী করতে হবে? যদি হয়ে থাকেন, তাহলে কি ভেবেছেন আপনার ভালো গুণাবলীকে আরো বৃদ্ধি করতে আপনি কী করতে পারেন।"

-- মারিয়াম আমির ইব্রাহিমি

(মিশরীয় বোনটির ফেসবুক পোস্ট থেকে অনূদিত)

দুই.

***বিয়ে হলো দু'জনের ভালোবাসার মিলবন্ধন, কোন লড়াই নয়**

"যখন আমি শুনি কেউ হয়ত আগামীতে বিয়ে করতে যাচ্ছে এবং আলাপ করছে যে তারা তাদের সম্ভাব্য স্বামী বা স্ত্রীর ব্যাপারে কী কী "মেনে নিবে না/সহ্য করবে না", তখন আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। কারো এমন চিন্তা নিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া উচিত নয় যেন তারা লড়াইয়ে যাচ্ছে অন্যকে আঘাত করার জন্য যুদ্ধাস্ত্র হাতে প্রস্তুত রেখে এবং নিজেকে রক্ষা করতে বর্ম আচ্ছাদিত হয়ে।

বিয়ে হলো দু'জনের ভালোবাসার মেলবন্ধন, কোন লড়াই নয়। সেখানে শুধুমাত্র নিজের ভেতরকার দুর্বলতাগুলো এবং নফসের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া কোন যুদ্ধ নেই এবং অস্ত্র বলতে আছে শুধুই দু'আ, তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপরে পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা) এবং স্বামী কিংবা স্ত্রী হিসেবে সফল হবার জন্য দৃঢ় একটি সংকল্প -- যা এই দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্যেও।"

-- উম্মু যাকিয়্যাহ

('দি জার্নাল অফ উম্মু যাকিয়্যাহ' থেকে অনূদিত)

তিন.

***যে মানুষটাকে ভালোবাসি তাকে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে**

"যে মানুষটাকে ভালোবাসি, তাকে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। আমাদের ভালোবাসা যদি হয় কেবল কাউকে দখল করে রাখার কোন চাওয়া, তাহলে তা ভালোবাসা নয়। আমরা যদি শুধু আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করি, শুধু আমাদের প্রয়োজনগুলোই বুঝি এবং অন্যদের প্রয়োজনকে এড়িয়ে যাই, তাহলে আমরা কখনই ভালোবাসতে পারবো না। যাদের ভালোবাসি তাদের প্রয়োজন, চাওয়া, ভালোলাগা এবং কষ্টগুলো আমাদেরকে অবশ্যই গভীরভাবে খেয়াল করতে। এটাই প্রকৃত ভালোবাসার পথ। আপনি যখন কাউকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবেন, তখন তাকে ক্রমাগত ভালোবেসে যাওয়া থেকে আপনি নিজেকে ঠেকাতে পারবেন না।"

(যে গ্রন্থ থেকে অনুবাদ : Peace Is Every Step: The Path of Mindfulness in Everyday Life)

দ্বিতীয় বিয়ে: একটি আবেগ, ভালোবাসা, আর প্রয়োজনের গল্প

14 June 2014

অনুবাদকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

ভাবছি দ্বিতীয় স্ত্রী বিষয়টা কেমন?

“কেন? আমি কি খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? না, না, না! আমি কখনোই দ্বিতীয় একজন স্ত্রীকে মেনে নিতে পারি না। যদি তুমি আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করতে চাও, তো করো; কিন্তু মনে রেখো ফিরে এসে তুমি আমাকে আর এখানে দেখতে পাবে না।”

এইতো ক’ বছর আগে ঠিক এ কথাগুলোই আমি বলেছিলাম, যখন আমার স্বামীর মুখে শুনলাম যে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে আগ্রহী। যাকে বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন, তিনি ছিলেন সদ্য-তালাকপ্রাপ্ত,৪ সন্তানের মা। খুব কষ্টেসৃষ্টে নাকি দিন কাটছিলো উনাদের। আমার স্বামী বললো, তাদের অবস্থা এতোটাই শোচনীয় যে দুপুর হলে তার বাচ্চাদের জন্য কোথা থেকে খাবার আসবে সেটাও নাকি তার জানা নেই। আমি বললাম, কেন? ওদের বাবা কোথায়? সে কি নিজের বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারছে না? তুমি একজন বাইরের মানুষ হয়ে কেন অন্য এক লোকের বোঝা টেনে বেড়াতে যাবে? নিশ্চয়ই উনাকে সাহায্য করার আরও অনেক উপায় আছে। তুমি চাইলে তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারো, বিয়ে করার কী প্রয়োজন!

বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না! আমার স্বামীকে আরেকজন নারীর সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। তার ভালোবাসা, হাসি, রসিকতা এগুলো আমি ছাড়াও আরেকজন নারী উপভোগ করবে? সে আমাকে ছাড়াও আরেকজন নারীকে স্পর্শ করবে, আর তাকে ভালোবাসার কথা শোনাবে! অসম্ভব। এটা মেনে নেওয়া যায় না। চরম ক্ষোভ, দুঃখ, আর অপমানের জ্বালায় আমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি ওর জন্যে কী না হইনি? একজন স্ত্রী, প্রেমিকা, মা, ডাক্তার, গৃহিণী। আমি ওর তিনটা বাচ্চার মা! কীভাবে পারলো ও আমাকে এতোটা অপমান করতে? মনে হচ্ছিলো আমি হয়তো বেশি ভালো না বা বেশি সুন্দরী না কিংবা অল্পবয়সী না। কিংবা শুধু আমি যেন ওর জন্য যথেষ্ট ই না! এজন্যই দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলছে..

নাহ্। আমি মেনে নিতে পারলাম না, তখনই ওকে আমার সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলাম, যদি কোনো দ্বিতীয় স্ত্রী এই বাড়িতে ঢোকে, তাহলে আমি বেরিয়ে যাব। যদি ও অন্য এক নারীর জন্য আমাদের বিয়ে, সন্তান, আর জীবনের ঝুঁকি নিতে চায়, তো নিক। কিন্তু আমি এসব সহ্য করবো না।

মনে হচ্ছে যেন কতোকাল আগের কথা বলছি! এমন এক সময়ের কথা যখন আমি ভেবেছিলাম এ জীবনটা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, যেন কোনোদিনও শেষ হবে না..। যেন কখনও কিচ্ছু বদলে যাবে না, বদলাতে পারে না। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সবকিছুই বদলে গেলো।

আমার স্বামী অবশ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি। আমার অতো শত হুমকি আর ওকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলার পরে বহুবিবাহের কথা আর ধোপে টেকে নি। আমি জানিনা সেই মহিলা ও তার বাচ্চাগুলোর শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিলো। বোধহয় ওরা সবাই অন্য কোনো এক শহরে চলে যায়।

এরপর আমার স্বামী আর কখনোই দ্বিতীয় স্ত্রী কথাটি উচ্চারণ করেন নি, যার কারণে আমিও খুব খুশি। নিজের স্বামীকে ধরে রাখতে পেরেছি সেই আনন্দে আত্মহারা! কিন্তু তখনও জানতাম না আমাদের সময় খুব শীঘ্রই ফুরিয়ে আসছে..।

ওর জীবনের শেষ কথাগুলো ছিলো – ওর খুব মাথা ধরেছে, ইশার সালাহর আগ পর্যন্ত নাকি শুয়ে থাকবে। হায়! ওর আর সে রাতে ইশার সালাহ আদায় করা হয় নি, কারণ ওর সে ঘুম আর ভাঙেনি। সে রাতেই উনি মারা যান। ওর আচমকা মৃত্যুকে আমি পুরো হতবিহ্বল হয়ে পরি! যে মানুষটার সাথে আমি আমার সারাটা জীবন কাটিয়েছি, তাকে এক মুহূর্তের মাঝে আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো! এরপর কতোকাল ধরে যে ওর জন্য কেঁদেছি তা কেউ জানেনা.. হয়তো বা এক মহাকাল জুড়ে ...

সে সময় কোনোকিছু দেখাশোনা করে রাখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। অযত্নে অবহেলাতে একে একে সব হারাতে শুরু করলাম। প্রথমে আমাদের গাড়ি, এরপর দোকান, এরপর বাড়ি।

শেষমেষ আমার তিন সন্তান আর আমি – আমরা সবাই আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হঠাৎ এতোগুলো মানুষের উপস্থিতিতে ওদের বাড়িটা গিজগিজ করতো। আমার ভাবীও দিনে দিনে অতীষ্ট হয়ে উঠছিলেন। খুব ইচ্ছে হতো ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। সে সময় আমার দরকার ছিল একটি চাকরি, কিন্তু আমার কোনো দক্ষতা ছিল না। বয়সও হয়ে গিয়েছে। কিছু শিখে চাকরি করতে পারার মতো বয়স ছিল না। কিন্তু মানুষের দয়ায় এভাবে কতোদিন মাথা গুঁজে পড়ে থাকা যায়? নিজেদের জন্য একটি আলাদা বাসার প্রয়োজন খুব বেশি করে অনুভব করছিলাম।

যখন আমার স্বামী বেঁচে ছিলেন, আমরা কতো আরামে ছিলাম! ঘরের বাইরে যেয়ে কাজ করার প্রয়োজনই ছিল না, তাই নিজেকে কোনো বিষয়ে পারদর্শী করে তোলাও জরুরি মনে হয় নি। কিন্তু উনি চলে যাওয়ার পরে জীবন এতো কঠিন হয়ে গিয়েছিলো! আমি প্রতিটা দিন উনার অভাব বোধ করতাম, হৃদয়ের প্রতিটা অংশ দিয়ে উনাকে খুঁজে ফিরতাম। কী করে মানুষের জীবন এতো ভয়ানকভাবে পাল্টে যায়?

এভাবেই দিন কাটছিলো। হঠাৎ একদিন আমার ভাই আমাকে ডেকে তার পরিচিত এক ভাইয়ের কথা বললেন। সেই ভাই নাকি বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। ভালো মানুষ, চমৎকার আচার ব্যবহার, আর অনেক দ্বীনদার। আমার জন্যে নাকি খুব মানাবে! কিন্তু উনি চান আমি উনার দ্বিতীয় স্ত্রী হই।

আমার জীবনে দ্বিতীয় বারের মতো দ্বিতীয় স্ত্রী কথাটি শুনলাম, কিন্তু এবারে পরিস্থিতি কতো ভিন্ন!

উনি আমাকে দেখতে একদিন আমার ভাইয়ের বাসায় এলেন। ক্ষণিকের মাঝেই যেন আমাদের মধ্যে কী একটা হয়ে গেলো! অবিশ্বাস্য ভাবে আমার উনাকে খুব পছন্দ হয়ে গেলো, উনার প্রতিটা ব্যাপারই খুব ভালো লাগছিলো। উনি আমাকে বললেন, তার প্রথম স্ত্রী জানেন যে তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী, আর স্পষ্টতই সে এর বিপক্ষে। তিনি এটাও বললেন যে, দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে একজনকে খুঁজে পেয়েছেন জানলে উনার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটা তার জানা নেই; তবে উনার স্ত্রীর বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ওপরই এখন উনার চূড়ান্ত জবাব নির্ভর করছে।

সে রাতে আমি ইস্তিখারা সালাত আদায় করলাম। আমি পাগলের মতো চাইছিলাম যেন বিয়েটা ঠিকঠাক হয়ে যায়! আমার মনে পড়লো, অনেক বছর আগে আরেকজন নারীর জীবনও ঠিক এরকম করেই আমার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছিলো। মনে পড়ে গেলো, আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে অনুতাপে পুড়ে যাওয়ার মতো একটা উপলব্ধি হলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি আমার জীবনে আরেকজন নারীকে স্থান দিইনি, তাহলে আল্লাহ কেন আমাকে আরেকজন নারীর জীবনে স্থান নেওয়ার সুযোগ দেবেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাস্তি দেবেন। আমি ক্ষমা চাইতে থাকলাম। অবাক লাগছিলো! জীবনে একবারও আমার মনে হলো না যে আমি যে কাজটি করছি তা কতোটা ভুল? আমি সবসময় ভেবে এসেছি যে এমন করাটাই সঠিক কাজ ছিল। আমি আমার সম্পদকে, আমার জিনিসকে আগলে রাখছি – এতে সমস্যা কোথায়? কিন্তু এখন যখন আমার অবস্থান পাল্টে গেছে, প্রয়োজনটা যখন এবার আমার, তখন আমি বুঝতে পারলাম কতোটা ভুল–ই না আমি ছিলাম! আমি আরেকজন নারীর স্বামী পাবার অধিকারকে অস্বীকার করছিলাম।

আমি দু'আ করতে থাকলাম যেন উনার স্ত্রী আমাকে মেনে নেন..।

কয়েকদিন পর উনি আমাকে ফোন করলেন। বললেন, উনার স্ত্রীর এটা মেনে নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, তবুও তিনি আমার সাথে দেখা করতে আগ্রহী।

দেখা করতে গেলাম। খুব চিন্তা হচ্ছিলো। সেদিন আল্লাহর কাছে অনেক দু'আ করলাম আর বললাম – হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করো! যখন তাকে দেখলাম, বুঝতে পারলাম, সে ঠিক আমার মতোই একজন। আমার মতোই একজন নারী। একজন স্ত্রী যে তার স্বামীকে খুব ভালোবাসে, যে তার স্বামীকে হারাতে ভয় পায়!

তার চোখগুলোয় বেদনা ছলছল করছিলো। সে আমার হাত দুটো ধরে বললো: "বোন, আমার জন্য এটা মেনে নেওয়া কী যে কঠিন! তাও দু'আ করি যেন আমরা দুজন বোনের মতো থাকতে পারি।"

উনার কথায় আমার হৃদয় ভেঙে গেলো! আমার এই কঠিন সময়ে শুধু এটুকুই লাগতো– একটি সখ্যতার হাত যে আমাকে বুকে টেনে নেবে, আমাকে আশা দেবে, বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা ফিরিয়ে আনবে। উনার স্ত্রীর জন্য সেটুকু পেলাম।

উনার স্ত্রী আমার জীবনে এমন একজন নারীর দৃষ্টান্ত, যেমন নারী আমি নিজে কখনো হতে পারিনি। আমি উনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। একসময় ভাবতাম কেউ কারো স্বামীকে নিশ্চয়ই আমার মতো করে এতো বেশি ভালোবাসতে পারেনি। কিন্তু উনার স্ত্রীকে দেখে ধারণাটি বদলে গেলো। এই মানুষটির কাছ থেকেই শিখতে পারলাম নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আসল পরিচয়।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ২০ টিপস

29 October 2014

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় টিপস জেনে নিন–

১) একে অপরকে জানিয়ে দিন যে আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসেন।

২) একই সময়ে দু'জন একসাথে রেগে যাবেন না।

৩) সমালোচনা যদি করতেই হয়, ভালোবাসা দিয়ে বলুন।

৪) পুরোনো ভুলগুলোকে তুলে আনবেন না।

৫) কোন তর্ক জিইয়ে রেখে ঘুমাতে যাবেন না, সমাধান করে নিন আগেই।

৬) একে অপরকে উপেক্ষা করার পরিবর্তে বরং গোটা দুনিয়াকে আগে উপেক্ষা করুন।

৭) দিনে কমপক্ষে একবার একসাথে সালাত আদায় করুন।

৮) মনে রাখবেন, সকল সফল স্বামী বা স্ত্রীর পেছনে একজন শ্রান্ত পরিশ্রমী জীবনসঙ্গী থাকে যে সবকিছু ভুলে একটানা কাজ করে যায় অপরজনকে সচল ও সতেজ রাখতে।

৯) মনে রাখবেন, ঝগড়া করতে দুই জনের প্রয়োজন হয়।

১০) আপনি যখন কোন ভুল করে ফেলবেন, তা স্বীকার করে নিন।

১১) দিনে অন্তত একবার আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর প্রশংসা করুন কিংবা তাকে ভালোবেসে দয়ামাখা গলায় কথা বলুন।

১২) আপনার স্বামী/স্ত্রী বিছানায় যাওয়ার পর আপনি বিছানায় যেতে ১০ মিনিটের বেশি বিলম্ব করবেন না।

১৩) আপনার জীবনসঙ্গী যখন কিছু বলে, তা মন দিয়ে শুনুন।

১৪) মনে রাখবেন, আপনার স্বামী/স্ত্রী কিন্তু একটা ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচ, মুভি, সিরিয়াল, ইউটিউব ভিডিওর চেয়ে বেশি মূল্যবান।

১৫) আপনার সঙ্গিনী/সঙ্গী যখন নতুন কোন পোশাক পরে তথবা তার চুল ভিন্নভাবে আঁচড়ায় তখন খেয়াল করুন।

১৬) আপনাদের বিবাহবার্ষিকী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোকে স্মরণ রাখতে চেষ্টা করুন। উপহার দিন একে অপরকে ইসলামী বই।

১৭) আপনাদের পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গী কাউকে কোন উপহার দিলে বা কোন কাজ করে দিলে আপনার পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ দিন।

১৮) যিনি দেরিতে ঘুম থেকে উঠবেন, বিছানা গুছিয়ে রাখুন।

১৯) আপনার স্বামী/স্ত্রীকে যদি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখায় তবে তা লক্ষ্য করুন এবং তার জন্য কিছু করুন।

২০) আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীকে কখনো সমালোচনা করে আহত করবেন না এবং জনসমক্ষে কখনো তাকে অপমান করবেন না।

(রুকাইয়া ওয়ারিস মাকসুদের 'The Muslim Marriage Guide' বইটির ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠার আলোচনার আলোকে রচিত)

courtesy : dampotto.blogspot.com

পুরুষেরা আসলে কি চায়?

10 March 2015

মূল: উম্মে যাকিয়্যাহ । অনুবাদ: মুনির মুহাম্মাদ

যখন একজন মুসলিম পুরুষ বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজেন তখন কোন জিনিস গুলো তার মনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়?

একটা কঠিন প্রশ্ন। কারণ যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা সেটা হল রাসুলুল্লাহ (স) যেটা শিখিয়ে দিয়েছেন, যেমন একজন ধার্মিক নারী।

কিন্তু এ সমাজে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমরা মিডিয়াতে যেভাবে নারীকে উপস্থাপিত হতে দেখি, সেটা আমাদের জীবন সঙ্গী সংক্রান্ত চিন্তাগুলোকে প্রভাবিত করে। সুতরাং বাস্তবে প্রায় সব পুরুষই যখন তার জন্য একজন জীবন সঙ্গীকে খুঁজতে যান, তখন প্রথম যে জিনিসটি তাদের মাথায় আসে সেটা রাসুলুল্লাহ (স) যেটা আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা অবশ্যই নয়। সুতরাং অবশ্যই আপনি যখন পার্টনার খোঁজেন তখন শারীরিক ভাবে একজন আকর্ষণীয় নারীকেই খোঁজেন। এটাই প্রথম যা আপনার মনে স্থান পায়।

আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে অন্য সবাই আকর্ষণীয় হিসেবে ভাবতে নাও পারে। কিন্তু আপনার চোখে তাঁকে শারীরিক ভাবে আকর্ষণীয় হিসেবে উপযুক্ত হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত পুরুষরা যা ই বলেন না কেন প্রায় সবাই সব কিছুর আগে শারীরিক সৌন্দর্যের দিকেই ঝুঁকে থাকেন।

কিন্তু আমি এটাকে খারাপ বলে মনে করি না। বরং আপনাকে অন্য বিষয়গুলোর প্রতিও গুরুত্বারোপ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একজন পুরুষ যদি দশজন আকর্ষণীয় নারীকে দেখেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে তাঁকে রাসুলুল্লাহ (স) এর শিক্ষা অনুযায়ী উপযুক্ত জনকে বেছে নিতে হবে।

তার মানে, মূলত যদি কেউ সুন্দর হয় কেবল তখনই শুধু আপনি তার ধর্মীয় গুনাবলীর দিকে গুরুত্ব দিবেন?

(হাসি!) হ্যাঁ! পাগলামিই বটে তাই না!

না! আমি মনে করিনা যে এটা পাগলামি। আমি মনে করি এটাই স্বাভাবিক। অবশ্যই আপনি কিছু ধার্মিক নারীর মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দরী একজন কে বেছে নিতে পারেন।

তবে সেটা কিন্তু ঘটে না, সাধারণত আমরা (মেয়েরা) চাই সবাইই (ছেলেরা) ধার্মিক হোক। কিন্তু অনেক ছেলেদের ক্ষেত্রে কি ঘটে? যখন তারা একজন সুন্দরী নারীকে দেখে তারা জাস্ট আশা করে যে মেয়েটি ধার্মিক হবে। যদি সে ধার্মিকতাকেই প্রাধান্য দেয়ার প্রতি মনস্থ করে, তবুও সুন্দরী নারীর সাক্ষাৎ তাকে তার স্ট্যান্ডার্ডটাকে (ধার্মিকতার দিক থেকে) কমিয়ে দেয়, সে ধার্মিকতার দিকটায় ছাড় দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে যে সে মেয়েটিকে রিলিজিয়াস বানিয়ে নিতে পারবে।

সুতরাং ধার্মিকতাটা যেহেতু এক ধরণের অদৃশ্যমান ব্যাপার সেহেতু আপনি কি এটা নিয়ে বড়জোর আশাই করতে পারেন?

না! কারণ ধার্মিকতাটা অদৃশ্য কোনও ব্যাপার নয়। আমি মনে করি এক দিক দিয়ে এটা অদৃশ্যমান ব্যাপারও বটে, যেমন একজন মানুষের হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, এটা কিন্তু অদৃশ্য ব্যাপার। কিন্তু অনেক পুরুষই যেটা করতে চেষ্টা করেন সেটা হল, তারা ভাবেন যে একজন সুন্দরী নারী মোটামুটি ধার্মিক হলেই বিয়ের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু তাদের জীবন অবশেষে একধরনের শূন্যতায় ভরে থাকে। তারা নিজদেরেকে বুঝায় "মেয়েটির মধ্যে সম্ভাবনা আছে" কিন্তু বাস্তবে সেটা আর ঘটে না, তখনি থমকে যান তারা পরিণত হন অতি কচলানো লেবুর মতো।

আসলে এটা হতে বাধ্য, কারণ তারা ধার্মিকতার ব্যাপারে আপোষ করেছেন এবং সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন তাদেরকে সেটার উপরই কাজ করতে হবে। অতি-কচলানো লেবুর সাথে চিনি মিশিয়ে তাকে সুমিষ্ট বানানোর প্রচেষ্টা। পুরুষের পুরুষত্ব বাচক অহংবোধ নিজের ভুল গুলো স্বীকার করার চাইতে তাকে নিজের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করবে।

কিন্তু আমরা যদি মুল প্রশ্নে ফিরে যাই, যে পুরুষরা আসলে কি চায়? সাধারণত আপনারা এমন নারী কে চান যে স্বাস্থ্য সচেতন এবং সে তার নিজের টেক কেয়ার করতে পারবে, যে তার শারীরিক অবয়বের প্রতি যত্নশীল হবে। আপনারা এমন কাউকে পছন্দ করবেন না যে দৃশ্যত কেয়ারই করে না কিছু। মানুষ তথা পুরুষ ও নারী উভয়েই স্বভাবতই দীর্ঘায়ুর প্রতি আসক্ত যাতে তারা সন্তান নিতে পারে এবং সুখী ও স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন করতে পারে।

নিচের প্রশ্নোত্তর গুলোতে পুরুষরা কি চায় তা ফুটে উঠেছে...

আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলুন? আপনি একজন ধার্মিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে কি কি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

একজন সাথী... এমন একজন যিনি সংসারকে রাসুলুল্লাহর (স) সুন্নাহর সাথে টিকিয়ে রাখবেন। কিন্তু সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সম-মনষ্ক হওয়া ও ইমানের মৌলিক ভিত্তিটায় মিল থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনার বিয়ে এবং ভবিষ্যতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মকে আপনি সেই ভিত্তিটার উপরেই সাজাবেন।

এখন এমন একটা প্রশ্ন করবো যা সম্পর্কে অধিকাংশ নারীরাই সচেতন: শারীরিক অন্তরঙ্গতা ও উপভোগ্যতার পাশাপাশি কোন জিনিসটিকে আপনি বিয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে অভূতপূর্ব যে জিনিসটি একজন পুরুষ চাইতে পারে তা হল স্ত্রীর সহচর্য, সুন্দর চরিত্র, এবং সঠিক ভাবে সন্তানাদিকে প্রতিপালন করা। একজন পুরুষ হিসেবে আপনি বাইরে কাজে যাবেন পরিবার চালানোর জন্য। সুতরাং যখন আপনি কাজের জন্য বাইরে থাকেন তখন ঘরে এমন এক নারী থাকা যে কিনা আপনার সন্তানাদিকে শিক্ষা দিচ্ছে এবং প্রতিপালন করছে এটা সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া গুলোর মধ্য অন্যতম।

সহচর্য বলতে আপনি কি বুঝেন?

এটা এমন, যে যখন আপনার একজন ভাই কিংবা বোন থাকে, যার সাথে আপনি বেড়ে উঠেন। এমনই একটা কিছু। যে সব সময় পাশে থাকে। আপনি যা কিছু করেন সে সবই পছন্দ করবে এমন না, কিন্তু আপনি যা করেন তা সে উপভোগ করে, কারণ একটাই, সেটা হল যে আপনি এটা করছেন। যেমন আমার স্ত্রী কিছু খাবার খেতে শুরু করার আগে আমি সেগুলো পছন্দ করতাম না। তাঁকে দেখে আমি সেগুলো পছন্দ করতে শুরু করি, আমি চিন্তা করলাম ট্রাই করে দেখিনা কেন? এটাই সত্যিকার সহচর্যের সবচেয়ে উপভোগ্য দিক। এমন কিছু জিনিস কে পছন্দ করা, কারণ আপনার প্রিয়জন সেটা পছন্দ করে। যখন আপনি আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে কিছু করেন তখন কিছু কাজ যেমন একসাথে খাওয়া এমনকি একসাথে রান্না করাটাও অনেক উপভোগ্য হয়ে উঠে।

তাহলে নারীর ব্যক্তিগত অর্জনের ব্যাপারটা কেমন? এটা কি পুরুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

এই ব্যাপারটিতে পুরুষদের মধ্যে সব রকমের মতামতই পাওয়া যায়। কেউ চায় এমন নারী যার অর্জন (শিক্ষা, প্রফেশনাল এচিভমেন্ট ইত্যাদি) খুব ভালো। কেউ এমন নারী চায় যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কেউ চায় এমন নারী যার কোনও উচ্চাভিলাষ (ambitions) নেই। এটা হচ্ছে পুরুষের দুর্বলতা, কারণ রাসুলুল্লাহ (স) পরিবারে নিয়ন্ত্রক ছিলেন না এবং তার স্ত্রীগন ছিলেন খুবই উচ্চাভিলাষী (ambitious)। যদি আমরা হযরত আয়িশা (রা) ও খাদিজা (রা) এর দিকে তাকাই আমরা তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষের অভাব দেখি না। তারা খুবই বুদ্ধিমতী ও সুদক্ষ ছিলেন।

কিন্তু কেন পুরুষরা উচ্চাভিলাষহীন স্ত্রী চাইবে?

সম্ভবত তারা এটা করে নিজেকে শক্তিশালী ভাবতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই মানসিকতাটা বুঝতে পারি না। আমার বেলায়, আমি চাই যখন আমি ঘরে ফিরি তখন আমার স্ত্রী ঘরে থাকবে আমাকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য। সে আমার দেখ-ভাল করে এটা আমি ভালবাসি এবং এটা পুরুষের অন্তরাত্মায় প্রশান্তি এনে দেয়। এটা আমাকে শক্তি যোগায় যে আমার স্ত্রী আমাকে সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সেটা প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে ব্যক্ত করছে। এটা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সৃষ্টি করে।

আপনি কি মনে করেন যে আপনার স্ত্রী তার অর্জনের/সফলতা/ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কি করলো বা না করলো সেটায় আসলে তেমন কিছুই আসে যায় না? তবে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল সে আপনার জন্য কি করছে সেটা?

না, সবার জন্য ব্যাপারটা সমান না। অনেকে তার স্ত্রীর সফলতা বা অর্জন দেখে খুশি হয় এবং তারা খুব হেল্পিং হয়। বিশেষ করে তার স্ত্রী যেটা করছে সেটা যদি মুসলিম কমিউনিটির জন্য ভালো কিছু হয়।

আপনি যখন অফিস বা কাজ শেষে ফিরেন এবং ঘরে প্রবেশ করার জন্য দরজা খোলার মুহূর্তে কোন জিনিসটির জন্য আপনি মুখিয়ে থাকেন?

পুরুষেরা সাধারণত উত্তর দেয় যে "ঘরে ফিরে আমি হাসিমুখে সম্ভাষণ পেতে পছন্দ করি। আমি এসে ঘরটা গোছালো ও সুন্দর ঘ্রানময় দেখতে পছন্দ করি। আমি দেখতে চাই আমার স্ত্রীকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, আমি তার মধ্যে সুন্দর পারফিউমের গন্ধ পেতে চাই। আমি ঘরে ফিরে রিল্যাক্সে থাকতে চাই। আমি ঘরে ফিরে আমার স্ত্রীকে কুরআন পাঠরত দেখতে পছন্দ করি। ঘরে ফিরে আমার স্ত্রীকে তার পছন্দের কাজে নিমগ্ন দেখতে পছন্দ করি।"

নারীর ভূমিকার ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?

অনেকেই এটা বলতে বুঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এবং রান্না-বান্নাকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, নারীর ভূমিকা বলতে আমি কখনও এমনটি ভাবিনি। তবে অবশ্যই একজন ভালো নারী রান্নাটা ভাল করবে। আপনাকে সুখী করতে সে স্বাস্থ্যকর খাবার রান্না করবে। কিন্তু আমি মনে করি না যে নারীর ভূমিকার জায়গাটা এটাই। আমি নারীকে সঙ্গী হিসেবেই দেখি। ব্যক্তিগতভাবে আমি রান্না করা পছন্দ করি। আমি এটা খুবই উপভোগ করি তাই আমিও রান্না করি।

আপনার মতে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীদের সবচেয়ে বড় ভুলটি কি বলে আপনি মনে করেন?

আসলে আমি মনে করি এটা এভাবে বলা গুরুত্বপূর্ণ যে "মানুষ (শুধু নারী নয়) সবচেয়ে বড় যে ভুলটি করে", এর মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত। আমি মনে করি ভুলটা হল আমরা অপরজনকে এমন ভাবে দেখি যেন সে একই জেন্ডারের মানুষ।

এ ব্যাপারে পুরুষদের ভুলের উদাহরণ কি হতে পারে?

পুরুষরা নারীদেরকে নিজেদের মতো করে ভাবতে আশা করে। পুরুষদের মধ্যে সোজাসাপ্টা মুল কথায় আসার একটা প্রবণতা কাজ করে অন্যদিকে মেয়েরা চায় তার কথাগুলো কেউ শুনুক। এটা সবারই জানা। ছেলেরা সবসময় মেয়েরা কথা বলার সময় মন্তব্য করে বসে, যেখানে তাদের শুধু শুনে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু তারা সবকিছুর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করে এবং প্রত্যেকটি সমস্যাকেই আক্রমণ করে থাকে।

নারীদের ভুল সম্পর্কে কি বলবেন?

জাস্ট পুরুষের বিপরীতটা। নারীরা অন্যান্য নারীদের ব্যাপারে যেভাবে চিন্তা করে পুরুষদের সম্পর্কেও সেভাবেই চিন্তা করে। আর পুরুষরাও যেভাবে অন্যান্য পুরুষদের ব্যাপারে চিন্তা করে সেভাবেই নারীদের ব্যাপারে চিন্তা করে। কারণ আমরা শুধু আমাদের ব্যাপারেই অভিজ্ঞ, যেমন মেয়েরা মেয়েদের ব্যাপারেই শুধু অভিজ্ঞ। আসলে মেয়েদের উচিৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলেদের জায়গা হতে চিন্তা করা আর মেয়েদের উচিত ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলেদের জায়গা থেকে চিন্তা করা।

সোর্সঃ onislam.net

পরিবার সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দর জীবন যাপনে স্ত্রীর ভূমিকা

4 November 2014

লেখকঃ আব্দুল্লাহ

মুসলিম নারীর জেনে রাখা উচিত যে, সৌভাগ্য, ভালোবাসা ও অনুকম্পা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে, যখন সে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার হবে; সে তার নিজের জন্য উপকারী ইতিবাচক দিকগুলো জেনে নিবে; যাতে সে তার সীমা অতিক্রম ও লঙ্ঘন না করে; সে তার স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিবে; কারণ, তাকে পরিচালনার ব্যাপারে স্বামীর উপর দায়িত্ব রয়েছে, স্বামী তাকে হেফাযত করবে, সংরক্ষণ করবে এবং তার জন্য ব্যয় করবে; সুতরাং স্ত্রীর উপর আবশ্যক হলো, স্বামীর আনুগত্য করা, স্বামীর জন্য সে তার নিজকে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করা এবং স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা; আর স্ত্রী তার নিজের কাজ-কর্ম সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিবে ও তা যথাযথভাবে পালন করবে এবং সে তার নিজের ও সংসারের প্রতি যত্নবান হবে; সে হবে পবিত্রা স্ত্রী, মমতাময়ী মাতা, তার স্বামীর সংসারের রক্ষণাবেক্ষণকারিনী দায়িত্বশীলা, যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। সে তার স্বামীর ভালো ও সৌন্দর্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দিবে, তার অবদান ও উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন-যাপনের বিষয়টিকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করবে না; এই ধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অস্বীকার করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন, তিনি বলেছেন:

“আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়; (তখন আমি দেখি) তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক, যারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল: তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেন: “তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান (সদ্ব্যবহার) অস্বীকার করে; তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারও প্রতি ইহসান করে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, আমি কখনও তোমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাইনি।”

[বুখারী, আল-জামে‘উস সহীহ (৫১৯৭)]

সুতরাং আবশ্যক হল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করা এবং অপরাধ বা ভুল-ভ্রান্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা ... স্বামী উপস্থিত থাকলে তার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না, আর স্বামী অনুপস্থিত থাকলে, স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

এর মাধ্যমেই পারস্পরিক সন্তুষ্টি অর্জিত হবে, সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব স্থায়ী হবে এবং আন্তরিকতা, ভালবাসা ও সহমর্মিতা প্রাধান্য বিস্তার করবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়:

“যে নারীই তার প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় মারা যাবে, সে নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

[তিরমিযী (১১৬১); ইবনু মাজাহ (১৮৫৪); হাকেম, ৪/১৭৩]

সুতরাং হে মুসলিম জাতি! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও একতা অর্জন করার মাধ্যমে সৌভাগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করবে, শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ তৈরি হবে এবং তরুণ সমাজ বেড়ে উঠবে এমন এক মর্যাদাবান ঘরে, যা ভালাবাসার দ্বারা পরিপূর্ণ, পারস্পরিক বুঝাপড়ার দ্বারা সমৃদ্ধ ... মাতৃত্বের সহানুভূতিশীলতা ও পিতৃত্বের করুণার মাঝে (বিদ্যমান) ... তারা অবস্থান করবে অনেক দূরে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিতর্কের শোরগোল এবং একে অন্যের সাথে বাড়াবাড়ি থেকে; যাতে করে সেখানে থাকবে না কোনো প্রকার অনৈক্য, মতবিরোধ ও দুর্ব্যবহার, কাছে কিংবা দূরে। আল-কুরআনের ভাষায়:

"হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন, যারা হবে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো। আর আপনি আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।"

- (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪)।

উপসংহার

পরিশেষে- আমার মুসলিম ভাই ও বোন! নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী ও তাদের মধ্যকার মজবুত সম্পর্ক এবং পিতা-মাতা ও তাদের কোলে বেড়ে উঠা সন্তান-সন্ততি- এ বিষয় দু'টি বর্তমান জাতি ও ভবিষ্যৎ জাতি হিসেবে বিবেচ্য। তাই এটা বলা যায় যে, শয়তান যখন পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে সফল হবে, তখন এর মাধ্যমে সে কেবল একটি সংসারকেই ধ্বংস করবে না, কোনো সীমাবদ্ধ অনিষ্টতাই সংঘটিত করবে না বরং তা গোটা জাতিকে বড় ধরনের ক্ষতি ও দ্রুততর অনিষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করবে। আর বর্তমান বাস্তবতা তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সুতরাং আল্লাহ ঐ পুরুষ ব্যক্তিকে রহম করুন, যিনি প্রশংসনীয় চরিত্র ও উৎকৃষ্ট মনের অধিকারী, উদার, কোমল, দয়ালু, তার পরিবারের প্রতি স্নেহপরায়ণ এবং তার কাজের ব্যাপারে বিচক্ষণ; যিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, কঠোরতা আরোপ করে যুলুম করেন না এবং দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দেন না।

আর আল্লাহ ঐ নারীর প্রতি রহম করুন, যিনি ভুল-ত্রুটি খোঁজে বেড়ান না, বেশি শোরগোল করেন না, সততাপরায়ণা, আনুগত্যপরায়ণা এবং অদৃশ্য অংশের হেফাজতকারিনী, যেভাবে আল্লাহ হেফাজত করেছেন।

সুতরাং হে স্বামী ও স্ত্রীগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; আর হে মুসলিমগণ! তোমরাও আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দিবেন।

(আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি; আরও রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা তাঁদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করবে তাদের প্রতি)

যে ৮ টি বিষয় আপনার দাম্পত্য জীবনকে অশান্তিময়, দুর্বল এবং অকার্যকর করতে থাকে

29 October 2014

লেখাঃ dampotto.blogspot.com

যে ৮ টি বিষয় আপনার দাম্পত্য জীবনকে অশান্তিময়, দুর্বল এবং অকার্যকর করতে থাকে--

১) খারাপ ব্যবহার করা : তাকে এমন কিছু নিয়ে ঠাট্টা করা যাতে সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এমন ধমক দেয়া যা অন্যদের সামনে তার অসম্মান হয়ে যায়। তাকে অপমান করা আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধকে কমিয়ে দিবে।

২) উপেক্ষা করা : তার পছন্দ, ভালোলাগা কিংবা তার কথাবার্তাকে গোণায় না ধরা বা পাত্তা না দেয়া। হয়ত সে সালাম দিয়েছেন আপনাকে, আপনি উত্তর দিলেন না। বেশ কিছুদিন যাবৎ খুব আগ্রহ নিয়ে হয়ত সে কিছু বলছে কিন্তু আপনি বিশেষ কারণ ছাড়াই তার কথার পাত্তা দিচ্ছেন না।

৩) মিথ্যা বলা : কিছুতেই মিথ্যা বলা সঠিক নয়। আল্লাহ মিথ্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের এই ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করুন। মিথ্যা আপনাদের পারস্পারিক বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে।

৪) কথা দিয়ে কথা না রাখা : কথা দিয়ে কথা রাখা বা ওয়াদা রক্ষা করা একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৫) এড়িয়ে চলা : অনেকদিন পর দেখা হলে বন্ধুদেরকে বা ভাইদের আমরা জড়িয়ে ধরি, কোলাকুলি করি। আপনার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরতে পারেন না? পারবেন, অস্বস্তি লাগলেও তা ভেঙ্গে ফেলুন। ভালোবাসার প্রকাশ থাকা খুবই প্রয়োজন।

৬) সন্দেহ ও গীবত করা : কখনো সন্দেহ করতে যাবেন না। সন্দেহ সম্পর্ককে ধ্বংস করে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার খুব কাছের মানুষ এটা সত্যি। কিন্তু খুঁতখুঁত করে যদি তার বিষয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেন, আপনি নিঃসন্দেহে হতাশ হবেন। মানুষ কখনো নিখুঁত নয়। আর মনে রাখবেন, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ হিসাব দিবে। তাই সন্দেহ দূর করুন। স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের চাদরস্বরূপ, ছোট-খাটো ভুলত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে অন্যদের কাছে বলে বেড়াবেন না, গীবত করবেন না।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেছেন :

"হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" -- [আল হুজুরাত, ৪৯ : ১২]

৭) খুব বেশি ব্যস্ততা : অপরজনের জন্য কিছু সময় রাখবেন। পারস্পরিক কথাবার্তা আর সময়গুলো সম্পর্ককে প্রগাঢ় করে। তার প্রতি আপনার কর্তব্য রয়েছে, আপনার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিছুটা সময় তিনি পাওয়ার অধিকার রাখেন। এই বিষয়টি খেয়াল রাখুন।

৮) নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদাত না করা : যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত না করে, নামাজ না পড়ে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে না চলে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট নন। নিয়মিত নামাজ না পড়া, অশ্লীল কাজ, হারাম উপার্জনগুলো থেকে সরে না আসার কারণে অনেক সংসার ভেঙ্গে গেছে। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে অলসতা-উপেক্ষা করার কারণে মুসলিম সংসারে অত্যন্ত দ্রুত ভাঙ্গন ধরে যায়।

আল্লাহ আমাদেরকে ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমাদের পরিবারগুলোতে রাহমাত এবং বারাকাহ দান করুন।

স্ত্রীর যেসব গুণাবলীর কারণে স্বামীরা তাদের ভালোবাসেন

29 October 2014

লেখাঃ dampotto.blogspot.com

জীবনসঙ্গিনী একজন পুরুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তম স্ত্রী যিনি জীবনে পান, তিনি একজন ভাগ্যবান পুরুষ। তেমনি একজন স্ত্রীর কাছে যিনি ভালো স্বামী তিনিই প্রকৃত উত্তম চরিত্রের মানুষ। একজন সফল ব্যক্তির পাশে থাকেন তার সুযোগ্য সহযোদ্ধা, সহযাত্রী, বন্ধু হিসেবে তার স্ত্রী। সৎ এবং চরিত্রবান স্ত্রী একজন পুরুষের জন্য এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন অসাধারণ জীবনসঙ্গিনীর অনেক উত্তম গুণাবলী হতে পারে, তার মধ্যে কয়েকটি হলো --

১) স্বামী বাইরে থেকে ফিরলে সম্ভব হলে দরজাটা নিজেই খুলে দেন, একটি হাসি উপহার দিয়ে দু'জনের মাঝে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ চেয়ে তাকে বলেন, "আসসালামু আলাইকুম।"

২) তার জীবনসঙ্গী কাজ শেষে বাসায় ফেরার পর তাকে ফ্রেশ হয়ে নিতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এগিয়ে দিন। একটু কষ্ট করে তার জন্য সময়মত খাবারটি পরিবেশন করেন। সুসংবাদটি তাড়াতাড়ি জানান এবং খারাপ সংবাদ থাকলে একটু সময় নিয়ে তারপর বলেন।

৩) স্বামীর নির্দেশনাগুলো শোনেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেন যেন তাকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। কোন বিষয় নিয়ে স্বামীকে কখনো চাপে রাখেন না বরং তার মনে শান্তি দেয়ার চেষ্টা করেন।

৪) যদি তার জীবনসঙ্গী মানুষটা কখনো তাকে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে ফেলে, তিনি নিজেকে শান্ত রাখেন। খেপে যান না কেননা তিনি ধরেই নেন হয়ত তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দিতে চাননি, অসতর্কতায় এমনটি হয়ে গেছে।

৫) জীবনসঙ্গীর ছোট ছোট ভুলগুলো তিনি এড়িয়ে যান এবং তার ভালো কাজগুলোকে উৎসাহিত করেন। তার পরিশ্রমের কাজগুলোর ব্যাপারে প্রশংসা করেন।

৬) নিজেকে পরিপাটি ও সুন্দর করে উপস্থাপন করেন স্বামীর সামনে যা তিনি অন্য কারো সামনে, কারো জন্য করেন না। সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করেন।

৭) সৌহার্দ্যপূর্ণ ভালোবাসার গলায় জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলেন। এই কোমল সুরে তিনি অন্য কোন পুরুষের সাথে কখনো কথা বলেন না। যাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ নয় এমন পুরুষদের সাথে যথাসম্ভব কোমলতাহীন কন্ঠে এবং সাধ্যমতন সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলাই ইসলামের শিক্ষা।

৮) তার স্বামীর আয় থেকে অতিরিক্ত ব্যয় করেন না, অবর্তমানে তিনি তার সংসারের সবকিছু এমনভাবে দেখভাল করেন যেন স্বামীর অপছন্দের কিছু না ঘটে।

৯) জীবনসঙ্গী যখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, তিনি তার পাশে থাকেন, ধৈর্যধারণ আর সদুপদেশ দিয়ে তাকে ধীরস্থির হয়ে সময় কাটিয়ে ওঠার পথে সাহায্য করেন।

১০) স্বামী তার প্রতি সঠিক আচরণ না করলেও ধৈর্য ধরেন, চেষ্টা করেন তাকে উত্তম উপায়ে তার প্রত্যুত্তর দিতে।

১১) শালীনতা রেখে উত্তম পোশাক পরেন যাতে কেননা পোশাকে রুচিবোধ ফুটে ওঠে। ঈমানের সাথে লজ্জার সম্পর্ক খুবই গভীর। যিনি যত বেশি ঈমানের অধিকারী/অধিকারিণী তার লজ্জাবোধ তত বেশি। একজন উত্তম মুসলিমাহ এসব বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি রাখেন।

১২) সন্তানদের ইসলামিক জ্ঞানে বড় করে তুলতে সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু করেন। নিজেও আন্তরিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে শেখেন এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে জীবনে ইসলামকে মেনে চলেন। বাবা-মায়ের আচরণ সন্তানদের প্রভাবিত করে, তাই বাবা-মায়েরা নিজেরাও সচেতন থাকেন নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র, স্বভাব এবং আচরণ নিয়ে।

***আপনার জীবনসঙ্গী ঘরে ফিরলে তাকে সুন্দর করে গ্রহণ করুন**

হে আমার বিবাহিতা বোন, আপনার জীবনসঙ্গী ঘরে ফিরলে তাকে সুন্দর করে গ্রহণ করুন, অভ্যর্থনা জানান।

অফিসে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া, বাইরে ভ্রমণে যাওয়া বা অন্য যা-ই আপনাদের দু'জনকে আলাদা করেছিলো, সেটা শেষ হয়ে যাবার পরে তাকে আন্তরিক ও সুন্দর একটি অভ্যর্থনা দিন যা তার মন ভালো করে দিবে, আপনাদের বন্ধনকে আরো গাঢ় করবে...

- দরজাটা নিজে খুলুন, আপনার মিষ্টি হাসিটি তাকে উপহার দিন।

- দু'জনের মাঝে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ চেয়ে তাকে বলুন, "আসসালামু আলাইকুম।"

- সুগন্ধী বা পারফিউম ব্যবহার করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে নিতে পারেন।

- আপনার জীবনসঙ্গীকে সুসংবাদটি তাড়াতাড়ি দিন এবং খারাপ সংবাদ থাকলে দেরি করে জানান।

- সৌহার্দপূর্ণ ভালোবাসার গলায় তার সাথে কথা বলুন।

- ফ্রেশ হয়ে নিতে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এগিয়ে দিন।

- একটু কষ্ট করে তার জন্য সময়মত খাবারটি পরিবেশন করুন।

- আপনাদের দু'জনের আবার দেখা করিয়ে দেয়ায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করুন দু'জন মিলে, আলহামদুলিল্লাহ। যারা কৃতজ্ঞ হয় আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ তাদের প্রতি তার দানকে আরো বাড়িয়ে দেন।

স্বামীর যেসব গুণাবলীর কারণে স্ত্রীরা তাদের ভালোবাসেন

29 October 2014

লেখাঃ দাম্পত্য ডট ব্লগস্পট ডট কম

আমরা জানি,আমাদের মাঝে সে ব্যক্তি ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। একজন পুরুষ ভালো জীবনসঙ্গী হিসেবে তার স্ত্রীর কাছে ভালো স্বামী হতে পারেন নানান উপায়ে। স্ত্রীর কাছে স্বামীরা যেসব গুণাবলীর কারণে ভালো হয় তার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ হলো --

১) স্ত্রীর প্রতি তিনি সুন্দর ব্যবহার করেন। উত্তম শব্দ ব্যবহার করে কথা বলেন। তার প্রতি তিনি নম্র ও দয়ার্দ্র থাকেন।

২) জীবনসঙ্গিনীর অধিকারের বিষয়গুলো তিনি অবহেলা করেন না, তা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে চেষ্টা করেন।

৩) বাইরে নানান কাজে থাকলেও অন্য কোন মহিলার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হন না। দৃষ্টিকে সংযত রাখেন, হৃদয়েকেও অত্যন্ত সচেতনভাবে সতর্ক রাখেন।

৪) নিজে ইসলাম শিখেন নিয়মিত, স্ত্রীকে নিয়ে শিখেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন। দু'জনে মিলে ইসলামকে পালনের চেষ্টা করেন।

৫) জীবনসঙ্গিনী যখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, তিনি শক্ত অবলম্বন হয়ে তার পাশে থাকেন।

৬) যদি তার স্ত্রী কখনো তাকে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে ফেলে, তিনি নিজেকে শান্ত রাখেন। খেপে যান না কেননা তিনি ধরেই নেন স্ত্রী হয়ত তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দিতে চাননি, অসতর্কতায় এমনটি হয়ে গেছে।

৭) জীবনসঙ্গিনীর ছোট ছোট ভুলগুলো তিনি এড়িয়ে যান এবং তার ভালো কাজগুলোকে উৎসাহিত করেন। তার পরিশ্রমের কাজগুলোর ব্যাপারে প্রশংসা করেন।

৮) ঘরের কাজগুলোতে স্ত্রীকে সাধ্যমতন সাহায্য করেন। তার জন্য কাজ ফেলে রেখে দেন না।

৯) সন্তানদেরকে ইসলামিক জ্ঞানে এবং আচরণে বড় করার ব্যাপারে সচেতন থাকেন। সন্তানদের ইসলামিকভাবে বড় করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আলাপ করে স্ত্রীর সাথে। বাবা-মায়ের আচরণ সন্তানদের প্রভাবিত করে, তাই বাবা-মায়েরা নিজেরাও সচেতন থাকেন নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র, স্বভাব এবং আচরণ নিয়ে।

১০) কোন কারণে মনোমালিন্য হলেও ঘরের বাইরে কখনো দু'জনে আলাদা হন না, স্ত্রী বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে সবসময় তাকে সঙ্গ দেন। মাঝে-মাঝেই দু'জনে মিলে ঘুরতে যান যেন স্ত্রী কিছুটা সময় তার সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত হয় যা তাদের সম্পর্ককে প্রগাঢ় করবে।

স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীলতা

17 ovember 2014

– নুমান আলী খান

"আজ সারাদিন কাজের বেশ চাপ ছিল, এখন কথা বলতে পারব না।" –

দিনশেষে ঘরে ফিরে এটাই হয় আপনার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপনার প্রথম কথা। আপনি আসলে কি করছেন আপনি জানেন? আপনি আপনার দাম্পত্য জীবনকে নিজ হাতে ধ্বংস করছেন।

এখন আমি কিছু প্রশ্ন করবো আমার ভাইদের উদ্দেশ্যে। আমার প্রশ্নগুলো বোনদের পক্ষ থেকে নয় বরং একজন সাংসারিক পুরুষ হিসেবে অপর পুরুষদের উদ্দেশ্যে।

-- আপনি শেষ কবে আপনার স্ত্রীর জন্য উপহার হাতে ঘরে ঢুকেছিলেন তাকে চমকে দেবার জন্য?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য অন্তত কিছু একটা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন, একদম নিজ থেকেই, তার কোন আবদার ছাড়াই?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের পাশের বাজারটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে আপনার স্ত্রী কেনাকাটার জিনিস বাছাই করতে করতে আপনার মতামত চাইছিল আর আপনি বলছিলেন, "এটা না, হুম ওটা নাও..."?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে বিনা আবদারে বাহিরে কোথাও ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশের দোকান থেকে কিছু একটা কিনে দিয়েছিলেন – অন্তত একটা আইসক্রিম?

একটু মনে করুন.....।

আসলে সত্য কথাটা কী জানেন? আপনার স্ত্রী আপনার থেকে বেশি কিছু চান না, আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর আবদারগুলো খুবই সীমিত। আপনার কাছে আপনার স্ত্রী যা চান তা হলো – আপনার সময়, তার প্রতি আপনার আর একটু বেশি মনোযোগ। খুব কি বেশি এই চাওয়াটুকু?

স্ত্রীর ডায়েটিং এ স্বামীর ভূমিকাঃ স্বাস্থ্য সচেতনতা বনাম স্বার্থপরতা

17 June 2015

লেখকঃ শেখ সাফওয়ানা জেরিন

সুন্দর নারী, শব্দটি শুনলেই মনে ঐশ্বরিয়া রায় কিংবা অ্যাঞ্জলিনা জলি কিংবা এমনই কোন মেদহীন সুন্দরী নায়িকার ছবিই মানসপটে ভেসে ওঠে। অনেক আগের কালের মুরুব্বিদের বিশেষ করে দাদী নানী শ্রেণীর মানুষরা যখন টিভি দেখেন, সুস্মিতা বা অন্য কোন হিন্দি ছবির নায়িকাকে দেখে অবাক নয়নে তাকিয়ে থেকে বলতে শুনেছি- এই মেয়ের দেখি পেটই নেই রে!

মানে, মাঝে মাঝে হয়তো স্বর্গের অপ্সরা ও মনে হয় এদেরকে।

কিন্তু বাস্তবতা কঠিন। সচরাচর শতকরা ১০০ ভাগ নারীর মধ্যে এমন অপ্সরা বেশী হলে ২০-৩০ ভাগ হবে। কিন্তু এখানে ব্যতিক্রমদেরই রোল মডেল হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে আমাদের সামনে, যার প্রধান নিয়ামক পুঁজিবাদী মিডিয়া। যারা এক প্রকার নারী নিয়ে ধান্দাবাজির ব্যবসায়ই নেমেছে।

সে যাই হোক! প্রশ্ন হলো তাহলে কি মেদহীন দেহের দরকার নেই? খেয়ে খেয়ে কি ভুসভুসে পেট বানাবো!

না সেটা অবশ্যই বলছিনা। কিন্তু এই ডায়েট যেন হয় শুধুই স্বাস্থ্য সচেতনতার উদ্দেশ্যে। এই ডায়েট যেন শো অফের মানসিকতা, বা ঐ ২০ ভাগ নারী পণ্যের মতো হয়ে ওঠার জন্য না হয়!

আসলে ডায়েট কি দেয় আর কি নেয়, তা নিয়ে হিসাব কিতাব আমরা হয়তো করিই না। কিছু বাস্তব ঘটনা দেখেছি চোখের সামনে। এই চিকন হওয়া, মেদহীন নায়িকাময় দেহের জন্য ডায়েট এর বলি হতে দেখেছি অনেককে। একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা ঠিক আছে। কিন্তু সৌন্দর্য যখন স্বাস্থ্যের চেয়েও বড় হয়ে যায়, তখন ব্যক্তি কিন্তু মানসিক এবং শারীরিক ২ ধরনের চাপেরই সম্মুখীন হয়।

চলুন দেখা যাক আজকের লেখার কেস স্টাডি গুলো।

কেস স্টাডি -১

মাইশা ক্লাস সিক্সে পড়ে। স্বাস্থ্য নেই বললেই চলে। কিন্তু ইদানিং বান্ধুবিদের কাছে শুনে শুনে বেশ ভয় ঢুকেছে মনে। বয়স বাড়তে থাকলে নাকি মেয়েরা এমনিই মোটা হয়ে যায়। তাই এখন থেকেই কঠোর ডায়েট এর কোন বিকল্প নেই। আর মা! মাকে দেখেই মাইশা বুঝেছে কি বিশ্রী দেখায় মোটা হলে। তাই এখন থেকেই কনট্রোলের তীব্র সাধ তার।

তো শুরু হলো তার ডায়েট। ডায়েট করতে যেয়ে সকালে আধাখান রুটি, দুপুরে একটা আপেল, আর রাতে না খেয়েই দিন কাটে মাইশার। একদিন ২ দিন ৩দিন! ৪ দিনের দিন কোচিং এ মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে!

বান্ধুবিরা ধরাধরি করে বাসায় নিয়ে আসে। গ্যাসের ব্যাথায় মাইশা এখন বিধ্বস্ত।

কেস স্টাডি – ২

সদ্য বিবাহিতা মুনিয়ার দেহের গড়ন আগে থেকেই মাঝারি। কিন্তু স্বামী তাওসিফের চাহিদা একবারে ঐশ্বরিয়া। যদিও বাচ্চা হওয়ার পর ঐশ্বরিয়ার ও গাল ঝুলে পড়েছে। কিন্তু তাও কথায় কথায় এক তুলনা। এক চামচ ভাত খেতে হবে দিনে এই শর্ত সে নেট ঘেঁটে ঘেঁটে জুড়ে দেয়।

নতুন ঘরের দেয়ালে ভালোবাসার কথা লেখা না থাকলেও ডায়েট রিমাইন্ডার দিয়ে ভর্তি। নিজ দায়িত্বে তাওসিফ লিখে দিয়েছে। একটা জিরো ফিগার শো পিস তার চাইই চাই।

অফিস থেকে তওসিফ বাসায় ফিরে মুনিয়ার প্রিয় ফ্রাইড চিকেন নিয়ে। সারাদিনের ডায়েটে সারাক্ষণ ক্ষুধা ক্ষুধা একটা ভাব থাকেই। তওসিফ প্যাকেটটা তার হাতে দেয়, মুনিয়া আনন্দে খুলে দেখে, একটি মাত্র ফ্রাই। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় তওসিফের দিকে।

-তোমার জন্য আনিনি। তুমি না অন ডায়েট!

রাগে কটমট করে মুনিয়া। ভালোবাসার মানুষটি এতো স্বার্থপর কীভাবে হয়?

কেস স্টাডি- ৩

দুই দুইবার সিজারে পেটে দাগ পরে গেছে তুলির। কিছুই করার নেই। পৃথিবীতে নতুন একটা প্রানের আগমনে কতোটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা একজন মা ছাড়া কেই বা বুঝবে?

অনেকদিন বিশ্রামে থাকায় মেদ ও বেড়েছে তার। স্বামী বলে এবার বিছানা ছেড়ে ওঠো। এরপর আছে ডায়েট করা ফ্রি উপদেশ। কানের কাছে এক গান শুনতে আর কতোই বা ভালো লাগে। তাই একদিন ঘোষণা দিয়েই ডায়েট শুরু করে তুলি।

এরপর একসাথে খেতে বসলে এক চামচের যায়গায় ২ চামচ ভাত নিলেই স্বামী বাঁকা চোখে তাকায়।

-এহ হে! এই না সেদিন ডায়েট শুরু করলে? এতো খাচ্ছ যে?

সদ্য মা হওয়া তুলির এখন প্রচুর খাবারের চাহিদা। কিন্তু স্বামীকে তা বুঝানো সম্ভব নয়। মেয়ে মানুষের শরীর থেকে কি পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়, আর কেমন কষ্ট লাগে সেটা একটা মেয়ে ছাড়া কেউ অনুধাবন করতে পারবে না। তুলি ডায়েট চালু রাখে। মা না খাওয়ায় বাচ্চার স্বাস্থ্য ও দিন দিন অবনতির দিকে যায়।

তুলিও খুব ভেঙ্গে পরে। প্রায় সময়ই তুলির বুকের ২ পাশ চাপ দিয়ে আসে। কেন এমন লাগে বুঝে উঠে না সে । আসলে যে গ্লুকোজের অভাবে এসিড জমে জমে ঘটনাটা হার্ট ফেইলিউর এর দিকে যাচ্ছে তুলি তা আঁচ করতে পারেনা। একদিন অতিরিক্ত ডায়েটের ফলে সত্যিই হার্ট অ্যাটাক হয় তুলির, সদ্যজাত সন্তানকে রেখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে সে।

প্রিয় পাঠক, ডায়েট কন্ট্রোল বা পরিমিত আহার খুব স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া সুস্থ থাকার। বেশীরভাগ সময়ই বিবাহিত মেয়েরা হুট করেই হয়তো একটু মোটা হয়ে যায়। এর পিছনে অনেকগুলো সামাজিক কারন বিদ্যমান। বাংলাদেশের সমাজে বেশীরভাগ মেয়েই মাঝারি গড়নের হয়। আর ভার্জিন বোতলের শেইপ তো সবাই দেখেছেন নিশ্চয়ই। মেয়েদের এমন আকৃতিতে বানানো হয়েছে যে অল্পতেই অনেক মোটা হয়ে যেতে পারে। তার মধ্যে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও একটা বিষয়।

আর সত্যি কথা বলতে যে অনেকের মতে – সংসারে কোন কাজই নেই।

তারমানে কাজের কোন সীমা পরিসীমা নেই বলেই অনেক ছেলে ঢালাও বলে ফেলে- সারাদিন বাসায় কি করো! খাও আর ঘুমাও!

কিন্তু আসলে সংসার এক অজস্র কাজের সমুদ্রের নাম। যেখানে কোন কাজই কাজ বলে গণ্য হয়না। আবার এইসব কাজ শেষে নিজের জন্য আলাদা সময় বের করা ও মুশকিল।

তাই ঐভাবে নায়িকাদের মতো শরীর গড়ার সময় আমাদের দেশের গৃহিণীরা পায় ও না।

ডায়েট ততোটুকুই করা উচিৎ যতোটুকু করলে একজন মানুষ রাস্তাঘাটে ফিট হয়ে যাবে না, হার্ট ফেইলিউর করবে না।

অতিরিক্ত ডায়েটের ফলে অ্যানিমিক হার্ট ফেইলিউর হতে পারে। আর এই অতিরিক্ত ডায়েট করার প্রবণতাকে ANORESIA NERVOSA বলা হয়।

যে রোগে পশ্চিমা নারীরা বেশ ভুক্তভুগি।

এই মাত্রাতিরিক্ত ডায়েটের ফলে যে কেউ যে কোন সময় অ্যানিমিক হার্ট ফেইলিউর এর শিকার হতেই পারেন।

আমি অবশ্য ডাক্তারি বিষয়গুলোকে হাইলাইট করতে চাচ্ছি না।

ডায়েটের মানবিক দিকগুলো বিবেচনাই লেখার উদ্দেশ্য। অনেক স্বামীই ভাবেন- আমার বউ আমার চোখে সুন্দর দেখার জন্য ২/ ৪ বেলা না খেয়ে থাকতেই পারে!

অনেকে বউকে শো পিস ভাবেন। পার্টি, কিংবা বিয়ের অনুষ্ঠানে শো করার জন্য। তাই বউয়ের জিরো ফিগার একটা বিগ ফ্যাক্ট।

অথচ, বিয়ের যে উদ্দেশ্য শুধুই জিরো ফিগারের ভোগবাদ নয়, বরং সন্তান জন্মদান এবং তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সেটা অনেকেই ভুলে যান। আর সন্তান জন্মদানের শারীরিক যাবতীয় ধকল একটি মেয়ের উপর দিয়েই যায়। এবং এই এক ধকলের পরে সে চাইলেও পারেনা বিপাশা বসুর মতো ডায়েট চার্ট ফলো করতে, কিংবা কোমরে পরা সিজারের দাগগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে। পৃথিবীকে নতুন প্রাণ উপহার দেওয়ার বিনিময়ে প্রকৃতি নারীর অনেক কিছুই বদলে দিয়ে যায়। যা পুরুষের অনুধাবনের ঊর্ধ্বে।

গবেষণায় জানা গেছে – প্রতি ৫ জনে ১জন মহিলা সন্তান জন্মদানের পর তার স্বামীর কাছ থেকে ওজন কমানোর জন্য চাপ পেয়ে থাকেন।

ওয়েস্ট বারমিংহামের এক হসপিটালের ডাক্তার বলেন–" সদ্য মা হওয়া নারীরা একদম অদরকারী চাপে ভুগে এমন একটা সময় যখন তাদের শারীরিক এবং আবেগজনিত বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে, এবং এই সময়টা ওজন কমানোর চেয়ে বাচ্চার সুস্বাস্থ্যের দিকেই নজর দেওয়া বেশী দরকার। "

গবেষণায় এও দেখা গেছে যে- শতকরা ১ ভাগ পুরুষই বুঝে পায় না কেন বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথেই মেয়েদের শরীর আগের আকৃতি ফিরে পায়না!

কেট মিডল্টন মা হবার পর পশ্চিমা মিডিয়া যেভাবে তার বডি শেইপ নিয়ে লিখেছিল তা যে কোন সভ্য সমাজেই এক অবাক বিস্ময়ের বিষয় বটে।

তাই দেখা যায়, স্বামী যতোই ডায়েট নিয়ে মানসিক চাপ দেক, কিংবা মেয়েরা যতোই ডায়েট করুক, তার দেহ ঠিক নায়িকাদের মতো কখনোই হয়ে উঠে না, যেটাই মিডিয়ার মাধ্যমে আদর্শ নারী অবয়ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

এক্ষেত্রে অনেকে অজুহাত দেখান যে তিনি স্ত্রীর ব্যাপারে স্বাস্থ্য সচেতন তাই ডায়েট নিয়ে প্রেশার দেন। অথচ, সচেতন হওয়া আর স্বার্থপরতা এক জিনিষ নয়।

সচেতন হলে সবার আগে প্রাধান্য দিবে সুস্থতার উপরে, আর স্বার্থপর হলে সুস্থ অসুস্থ আহারি অনাহারি কোন বিষয় নয়, কোমরের মাপটাই বিষয়।

শারীরিক সৌন্দর্যের ধারনা যেন আমাদের স্বার্থপর করে না দেয় আমাদেরই সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির বিষয়ে। ততোটুকুই রক্ষণশীল হই, যতোটুকু জীবনসঙ্গীর জন্য কল্যাণকর। স্বার্থপর হয়ে শো পিস বানানোর আকাঙ্ক্ষায় আমরা যেন মানবিকতার সীমা লঙ্ঘন না করি।

শেষ করছি **Bertrand Russell এর বিখ্যাত একটি উক্তি দিয়ে**–

Diet, injections and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be

will become psychologically impossible. Even if all are miserable, all will believe themselves happy, because the government will tell them that they are so. (The Impact of Science on Society 1953)

বিয়ে ও পরিবার সমকালীন জিজ্ঞাসা (ডাবল স্ট্যানডার্ড-১)

23 October 2014

লেখকঃ কানিজ ফাতেমা

ক'দিন আগে আমার এক পরিচিতা আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিল। একই রকম প্রশ্ন ৭/৮ বছর আগে কুমিল্লার এক গ্রামের স্কুলের গন্ডি পার না হওয়া এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বধুও করেছিল। গ্রামের বধুটির প্রশ্ন আর আধুনিক বিশ্বে বসবাসরত পরিচিতার প্রশ্নের সমধর্মিতা আমাকে আশ্চর্য্য করেছে। আসলে এ প্রশ্নটি শুধু তাদের না, এটি আমাদের সমাজের অনেক স্ত্রীরই প্রশ্ন।

ঘটনাটি এরকম যে বিয়ের পরে স্বামী স্ত্রীকে তার (স্বামীর) বাড়ীতে রেখে বিদেশ চলে যায়। এরপর দেশে ফোন করলে স্বামীর মা ও বোন স্ত্রী সম্পর্কে তার কাছে বিভিন্ন নালিশ করতে থাকে:

"তোর বউ কথা শোনে না।"

"তোর বউ যখন তখন বাপের বাড়ী চলে যায়।"

"ভাইয়া, ভাবী মায়ের ঠিকমত দেখা শোনা করে না।" ইত্যাদি

স্বাভাবিক ভাবেই স্বামী তার মা ও বোনের কথাকে ধ্রুব সত্য মনে করে। তাদের কথা যাচাই করা বা তাদের দাবী আদৌ যৌক্তিক কিনা তা নিয়ে ভাবার প্রয়োজনও বোধ করেনা। মা ও বোন কখনওই ভুল বলতে পারে না; বাড়িয়ে বলতে পারেনা, বিয়ের পরে এমন বিশ্বাস আমাদের অনেক পুরুষেরই থাকে। নববিবাহিতা ও মাত্র কয়েকদিনের পরিচিত স্ত্রী-ই দোষী, এটি ভাবা অনেক বেশী সহজ। ফলে প্রথম থেকেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তা পায় না। মা এবং বোন কেন এটা করেন? কারণ তারা নিজেদেরকে স্বামীর অভিভাবক ও শুভাকাক্সক্ষী মনে করেন। নববিবাহিতা মেয়েটি যাতে 'ছেলের' বা 'ভাইয়ের' কোন ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য তারা বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং তার সব ত্রুটি (এমনকি যা ত্রুটি না তাও ত্রুটির সুরে) স্বামীকে জানানো নিজের দায়িত্ব মনে করেন। তাদের এ উদ্দেশ্যে কিছুটে ভাল দিক থাকলেও পরিনাম খুব একটা ভাল হয়না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের শিথিলতা বাড়তে বাড়তে তা বিতৃষ্ণায় রূপ নেয়, একসময় দু'জন দু'জনকে তার সহ্য করতে পারে না, পরিণামে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের জীবনই তিক্ত

হয়ে ওঠে। মা ও বোন ছেলের বা ভাইয়ের 'ভালোর জন্য' যা করেছিলেন তা তাদের কারণেই তাদের ছেলের বা ভাইয়ের জীবনকে বিষময় করে তোলে। দুঃখজনক হল এ সময়ও তাদের বোধোদয় হয়না। তারা তাদের ছেলের বা ভাইয়ের জীবনকে রাহুমুক্ত করার জন্য আরও উঠে পড়ে লাগে। এবং তাদের এই 'বেশী ভালো চাওয়ার' ফলে সৃষ্ট সমস্যার জন্য দায়ী করে স্ত্রীকেই। 'ঐ স্ত্রীরই তাদের ভাই বা ছেলের জীবনকে নষ্ট করেছে।' ফলে তাদের এ প্রচেষ্টা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নের পরিবর্তে বরং আরও অবনতি ঘটায়। পরিণামে তাদের প্রিয় ভাইটি বা ছেলেটি চরম এক অসুখী জীবন যাপন করে।

যাই হোক, ঘটনার ফিরে আমি। এর তিন চার বছর পরে স্ত্রী স্বামীর নানা রকম নির্যাতন এমনকি দৈহিক আঘাত সহ্য করেও সংসার করে যাচ্ছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সে তার কষ্টের কথা নিজের কাছের মানুষদেরকে বলতে শুরু করে। ফলে সে এখন 'স্বামীর নামে বদনামকারী স্ত্রী হিসাবে স্বামীর ভর্ত্সনা পেতে থাকে। ঘটনা ক্রমে স্বামীটি একদিন মসজিদে খুতবাতে 'গীবত' এর উপর আলোচনা শুনে এসে স্ত্রীকে উপদেশ দেয়:

'গীবতকারীরা ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই নিকৃষ্ট। আশা করি তুমি আমার নামে তোমার বাবা-মার কাছে আর গীবত করবে না.... স্ত্রীটি আমাকে প্রশ্ন করেছে:

১. আজ আমাকে মারলে তা আমার বাবা-মাকে জানালে সেটা গীবত হচ্ছে। তিন-চার বছর আগে তার মা ও বোনে আমার নামে যা বলতো তা কি গীবত হতো না?

২. সে যে উপদেশ আমাকে দিয়েছে সে কি তার মা-বোনকে গীবতকারী হিসেবে একই উপদেশ দিবে?

খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, এ পরিস্থিতিতে যে কোন স্ত্রী এই একই প্রশ্ন করবে এবং তার স্বামীর ইসলামী জ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দে¡ পড়বে। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি আমরা এ ঘটনার বিচার কবি তবে যা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় তা হল

১. স্বামী Double standard করছে। স্ত্রীর আচরণকে সে একটি standard এ দেখছে এবং নিজ মা-বোনকে অন্য Standard এ।

২. একজন নির্যাতিতা স্ত্রী তার নির্যাতনের কথা তার পরিবার বা যাদের কাছ থেকে উপদেশ ও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে তাদেরকে জানাতে পারে কিনা? এটা ইসলামের দৃষ্টিতে গীবতের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা?

প্রথমে আসা যাক Double standard প্রসঙ্গে। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি যে সে নিজের জন্য সব সময় ভালোটা ও সহজটা পছন্দ করে অন্যের জন্য থাকে শক্তটা। নিজের মেয়ে অন্যায় করলে ‘ও বেঝেনি তাই করেছে'; অন্যের মেয়ে করলে, ‘ও ভাল না, বেআদব তাই করেছে’। নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে, ‘বেশীদিন শশুড়বাড়ী থেকো না, তোমাকে না দেখলে ভাল লাগেনা’। ছেলের বউয়ের ক্ষেত্রে, ‘বেশীদিন বাবার বাড়ী থেকোনা তুমি না থাকলে সংসার দেখবে কে…’। মেয়ে জামাইয়ের ক্ষেত্রে ‘জামাইটা ভাল না, মেয়েটার কথা শোনে না'; ছেলের ক্ষেত্রে, ‘ছেলেটা ভাল না, বউয়ের কথা শোনে।’ বোনের জামাইয়ের ক্ষেত্রে, ‘ ও ভাল না, সারাক্ষণ মা-বোনের কথামত বোনটাকে কষ্ট দেয়’। নিজের স্ত্রীর ক্ষেত্রে, ‘স্ত্রী ভাল না, আমার মা-বোনের কথামত চলে না।’ নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে ‘ওর শশুরবাড়ীর লোকরা ভাল না, ওকে দিয়ে কত কাজ করায়। কত আদরে বড় করেছি ওকে, ভাতটাও মুখে তুলে খাইয়ে দিতাম।’ ছেলের বউয়ের ক্ষেত্রে ‘এত বড় হয়েছো, বিয়ে হয়েছে তবুও ঘর-সংসারের কাজ শেখনি। বাবা-মা কিছু শিখায়নি?’ নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে, ‘মা, লেকা পড়া করো, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে’, ছেলের বউয়ের ক্ষেত্রে, অনেক লেখাপড়া হয়েছে। এবার সংসারে মন দাও; ছেলে-পুলে বড় কর; স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ীর দেখাশুনা কর।’ ছেলের বাড়ী বেড়াতে গেলে ‘বউ এটা দাও ওটা দাও… বাতের ব্যথায় নড়তে পারি না’ মেয়ের বাড়ী বেড়াতে গেলে, আহা, কাজ করতে করতে একেবারে রোগা হয়ে গেছিস, তুই গিয়ে একটু বিশ্রাম নে…’ মেয়ে অফিস থেকে এলে, ‘সারাদিন অফিস করে এলি, এবার একটু শুয়ে থাক…’ ছেলের বউ অফিস থেকে আসলে ‘সারাদিন তো বাইরে কাটিয়ে এলে এবার জলদি করে ঘরের কাজে হাত দাও….’। নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে, ‘ওর শুশুর বাড়ীর লোকজন খারাপ তাই ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকে না’ ছেলের বউয়ের ক্ষেত্রে, ‘বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী থাকবে এটাই নিয়ম।’ অথবা ‘বউটা খারাপ তাই আমাদের সঙ্গে থাকে না।’ এমন হাজারো Double standard আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলে? এ সম্পর্কিত আলোচনা থাকবে পরবর্তী পর্বে।

শীলা বিয়ের পর থেকে শ্বশুর বাড়ীতে থাকে

23 October 2014

লেখকঃ কানিজ ফাতেমা

শীলা বিয়ের পর থেকে শ্বশুর বাড়ীতে থাকে । শীলার শ্বাশুড়ী জাহানারা বেগম । শীলা বা জাহানারা বেগম কেউই খারাপ মানুষ না । কিন্তু তাদের সম্পর্ক খুব একটা মধুর না । জাহানারা বেগম গোছানো স্বভাবের । সবকিছু, বিশেষ করে রান্না ঘরের জিনিস পত্র তার গোছানো থাকা চাই । রান্না ঘরের প্রত্যেকটি জিনিস যত্ন করে জায়গামত রাখা, সবকিছু ঝকঝকে তকতকে করে রাখার ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন। কেউ এগুলো তার মত গুছিয়ে ব্যবহার করতে না পারলে তিনি খুবই বিরক্ত বোধ করেন এবং অভিযোগ করেন। অন্যদিকে শীলা স্বভাবে ঠিক উল্টো। সে দ্রুত কাজ করে, একেবারেই গোছালো না এবং তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে জিনিসপত্রের খুব একটা যত্ন নিতে পারে না। ফলে রান্নাঘর ব্যবহার করে সে প্রায়ই এটাকে এলোমেলো করে রাখে। তার এ স্বভাব নিয়ে জাহানারা বেগম প্রায়ই অভিযোগ তোলেন । শীলা চেষ্টা করে কিছুটা গুছিয়ে কাজ করতে। কিন্তু সে খুব একটা সফল হয়না। তাছাড়া শীলা চাকুরী করে বলে তার পক্ষে রান্না ঘরে খুব বেশী সময় দেয়া সম্ভব না ।ফলে বউ-শ্বাশুড়ী সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। জাহানারা বেগমের অভিযোগ, "বউ একেবারেই কাজের না । খুবই অগোছালো, এলোমেলো ।পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না ।" শীলার অভিযোগ, " শাশুড়ী সকাল-বিকাল তার পিছনে লেগেই থাকে, সবকিছু নিয়ে খ্যাচ খ্যাচ করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেই থাকে।" এর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয় শীলার মা ও ননদ। শীলার মা দুঃখ করে বলে, " শ্বাশুড়ী টা আমার মেয়েটাকে শুধু জ্বালায়"। ননদ বলে, "শীলা আমার মায়ের বদনাম করে বেড়ায়।"

এ ঘটনায় আমরা যা দেখতে পাই তাহলো, শীলা ও জাহানারা বেগম দু'জনের কারো চাওয়াই (expectation) অযৌক্তিক না এবং দু'জনের অভিযোগই সত্যি। শ্বাশুড়ী চাচ্ছেন বউ তার মত গুছিয়ে কাজ করুক। অন্যদিকে, বউ চাচ্ছে শ্বাশুড়ী তার বিরুদ্ধে সকাল বিকাল অভিযোগ করা বন্ধ করুক । এক্ষেত্রে দু'জনই ঠিক । তাহলে সমস্যা কোথায় ? সমাধানই বা কি?

সমস্যাটা হলো দু'জনের দু'জনকে বোঝায়। জাহানারা বেগম ও শীলা দু'জন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাদের Personality type ভিন্ন । তারা একজন আরেকজনের মত হতে পারবে না । জাহানারা বেগম যদি মনে করেন শীলাকে তার মত হতে হবে তবে তিনি ভুল করছেন। মানুষ তার Personality type পুরোপুরি বদলাতে পারে না । তাই জাহানারা বেগমকে শীলার অগোছালো স্বভাবকে মেনে নিতে হবে এবং এ নিয়ে অভিযোগ করা বন্ধ করতে হবে । অভিযোগ বন্ধ করে শীলাকে ধীরে ধীরে কাজের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলে long term এ শীলার এ যোগ্যতা কিছুটা বাড়বে (skill development)। কিন্তু অভিযোগ (বা nag) সম্পর্কের অবনতি ছাড়া আর কিছুই ঘটাবে না ।

একই সাথে শীলাকেও স্বীকার করতে হবে তার শ্বাশুড়ীর একটি ভালো গুন বা (Skill) আছে। যতটা সম্ভব এ গুনটির অনুকরণ করা তার নিজের জন্যই ভালো । সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের দু'জনকেই বুঝতে হবে অন্যজন 'খারাপ মানুষ' না, সে তার থেকে 'ভিন্ন প্রকৃতির' মানুষ। আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির করে সৃষ্টি করেছেন।

এর পরও যদি দু'জন দু'জনের এই ভিন্নতা মেনে নিতে না পারে তবে আলাদা থাকাই তাদের জন্য ভালো। একসাথে থেকে পরস্পর সম্পর্কে বিরক্ত হওয়ার থেকে ভিন্ন থেকে পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা কল্যানকর ।

শ্বশুরবাড়ি বনাম বউ, বোঝা না বন্ধন ?

2 November 2014

লেখকঃ মেহযাবিন রহমান প্রীতি

একথা অনস্বীকার্য নারী ও পুরুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন স্ব স্ব ভিন্নতায় আর বৈশিষ্ট্যে । কিন্তু নারী-পুরুষের মাঝে তিনি কোন বৈষম্য করেন নি। সর্বোচ্চ পুরস্কার জান্নাহ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিটি মানুষকে যারা সৎ কর্ম করবে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে এবং সর্বোপরি ঈমানে বলীয়ান থাকবে। কুর'আনে আল্লাহ কোথাও বলেন নি, মেয়েদের যেহেতু আমি ভিন্নভাবে বানিয়েছি তাদের পুরস্কার কম দিব। কিন্তু আফসোস, আমাদের সমাজ এতটা উদার ও ন্যায়বান হতে পারে নি। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্র্যাকটিসিং ও নন-প্র্যাকটিসিং সব ধরনের

পরিবারে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য করা হয় নানাভাবে। আমি এমন কিছু অতি সহজ-সরল প্রচণ্ড রকমের ধার্মিক আপুর কথা শুনেছি যে শ্বশুরবাড়িতে তাদেরকে কীভাবে মানসিক দাসত্ব বরণ করে থাকতে হয়। খুব দুঃখের বিষয় হল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কট্টর ইসলামিক, উদারপন্থী কোন রকমের পরিবারই বাদ নেই। আমি হতবাক হয়ে যাই আসলেই, আমরা কি আদৌ ইসলামকে জানি ? নাকি জানতে চাই না তা আমাদের ইচ্ছার বিরুপ হবে বলে ? ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সমাজে এই আধুনিক যুগে এসে শিক্ষিত পরিবারে শারীরিক ও মানসিকভাবে নারী নির্যাতন হয়ে চলেছে। ভারতের শিক্ষিত পরিবারে কী ভয়ংকর সেই রূপ তা বুঝেছিলাম একটা রিয়েলিটি শো থেকে। আমি অশিক্ষিত গ্রাম্য পরিবারের কথা বাদ দিচ্ছি, বিপদের কথা হল উচ্চশিক্ষিত উদার ও কট্টর ধার্মিক সব রকমের পরিবারে এই পরিস্থিতির চলছে এবং চলছেই।

তাই একজন মানুষ হিসেবে এবং একজন নারী হিসেবে, আমার ঈমানের দাবি হিসেবে আজ লিখতে বসেছি। অধিকাংশ আপু যেটা ভুল করেন তা হল তারা ধৈর্যের পথ বেছে নেন যা আল্লাহর খুব পছন্দের একটি কাজ। কিন্তু ধৈর্য অবলম্বনের কিছু ক্রাইটেরিয়া, কিছু ক্ষেত্র আছে। ধৈর্য অবলম্বন করার অর্থ এই না যে আমি অন্যায়কে মেনে নিতেই থাকব। এটা ভুললে চলবে না যে আল্লাহ বারবার বলেছেন, তোমরা অন্যায়ের প্রতিরোধ কর আর ন্যায়ের শাসন কায়েম কর।

তাই সবার আগে আমরা যারা কমবেশি ইসলামসচেতন, তাদেরকে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে জানতে হবে ইসলাম কী বলে। আমাদেরকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই ব্যাপারে আমরা বাপ-দাদার আমল থেকে দেখে আসা প্রথাকেই গুরুত্ব দেব নাকি আল্লাহর নিয়মকে গুরুত্ব দেব।

শেইখ আব্দুল রহমান খানকে একজন প্রশ্ন করেছেন, শ্বশুরবাড়িতে একজন মেয়ের কী কী দায়িত্ব আছে ?

উত্তরে তিনি যা বলেছেন তার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্কের ব্যাপারটা আসলে নতুন কোন বিষয় নয়। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই এই সম্পর্ক চলে এসেছে। কুর'আন এবং সুন্নাহ থেকে আমরা বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের সীমা-পরিসীমা, দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে জ্ঞান পাই। একটা বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ আর তা হল এই সম্পর্কের দায়িত্বগুলো কখনও একপক্ষীয় হলে চলে না। একজন সন্তানের যেমন তার পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয় তেমনি পিতামাতারও সন্তানের জন্য অনেক কিছু করতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হয় আমরা কেবল নিজের অধিকার আর পাওনাগুলো নিয়েই ভাবি, কর্তব্য নিয়ে ভাবতে চাই না।

আরেকটা বিষয় হল আমরা আমাদের সমাজে চলে আসা রীতিনীতি আর প্রথাগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকি এমন করে যে ইসলামকে বেমালুম ভুলে যাই। এমন অনেক প্রথা আছে যার মূল সূত্রপাত অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসে। কিছু রীতিনীতি এমন যে শ্বশুরবাড়িতে একজন মেয়েকে দাসীর মত করে ব্যবহার করা হয়। কিছু পরিবারে শাশুড়িরা ছেলে এবং ছেলের বউয়ের প্রতিটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং সিদ্ধান্ত দেন, তার অমতে একটা কাজ করতে দেন না। এমনকি খোদ আমেরিকাতেও এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে শাশুড়িরা এমন আচরণ করেন। আবার একইসাথে, এমন অনেক পরিবার আছে যেখানে পুত্রবধূ ও শাশুড়ির মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের এক সুন্দর মিষ্টি সম্পর্ক দেখা যায়।

ইসলাম অনুযায়ী একজন নারী বড়-ছোট কোন বিষয়েই শ্বশুরবাড়ির কাউকে মেনে চলতে কোনভাবেই বাধ্য নয়, তা শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, ননাস, দেবর যে-ই হোক না কেন। তবে এটা শিথিল হবে কেবলমাত্র সেইক্ষেত্রে যদি ঐ নারীর

কোন কাজ ইসলামিক শরীয়াতের ফরয কোন কাজ পালনের বা না পালনের ক্ষেত্রে হয়। এবার আসা যাক, স্বামীর প্রসংগে। একজন নারীকে তার স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা প্রয়োজন; তবে স্বামী যদি এমন কোন কাজ করতে বলেন যা শরীয়াত বহির্ভূত, অন্যায় ও অন্য কোন নেতিবাচক কাজ তাহলে তা পালন করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে একটি কুর'আনের আয়াত,

"Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard." (4:34)

শ্বশুরবাড়ির কারও বিনা অনুমতিতে শোবার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি ইসলামে নেই। এক্ষেত্রে অমাহরাম কোন পুরুষকে যদি ঢুকতেই হয় তবে ঘরে একজন মাহরামের উপস্থিতি প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মেয়েদের ঘরে প্রবেশের আগে সাবধান থেকো"। তখন আনসারদের একজন বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, যদি সে তার স্বামীর ভাই অথবা ভাগ্নে/ভাতিজা হয় তবু?" তখন নবীজী (স) বললেন, "শ্বশুরবাড়ির সকল অমাহরাম মেয়েটির জন্য মৃত্যুর মত বিপজ্জনক"। এই হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম আন-নববী (র) বলেছেন, "আল লায়ত ইবন সা'দের মতে, এখানে স্বামীর ভাই, চাচাত-মামাত ভাই, চাচা-মামা এবং অন্য সকল যারা মাহরাম নয় তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এইজন্য এদের সকলের ক্ষেত্রে হিজাব প্রযোজ্য হবে, অবশ্য স্বামীর বাবা, দাদা, কিংবা সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না।"

এবারে অন্য একটি প্রসঙ্গে আসা যাক। ইসলাম অনুযায়ী শ্বশুরবাড়ির কেউ জোর করে বউকে রান্নাবান্না বা ঘরের অন্যান্য কাজ করাতে বাধ্য করতে পারবে না। এই বিষয়ে কোনরকম প্রত্যাশা এবং দাবি রাখা যাবে না। একজন নারী কেবল স্বেচ্ছায় দয়ার্দ্র মনে এই কাজগুলো চাইলে করতে পারে। একইভাবে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বে শ্বশুরবাড়ির কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এতে সুবিধা হবার বদলে বরং দ্বন্দ্ব-কলহ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

একজন নারীর তার আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাবার জন্য শ্বশুরবাড়ি থেকে অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, স্বামীর সম্মতিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কোন বিষয় নিয়ে জানার চেষ্টা করার কোন অধিকারও তাদের নেই। একজন পুরুষকে অবশ্যই তার পিতামাতার প্রতি অনুগত হতে হবে এবং এই ব্যাপারে স্ত্রী তাকে সর্বদা সহায়তা করবে। এটা অনস্বীকার্য যে শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নমনীয় হওয়া উচিত।

সামাজিক প্রথা নয়, বরং শরীয়াতের এই নিয়মগুলো মেনে শ্বশুরবাড়িতে থাকার মত ব্যবস্থা করা হলে একসাথে থাকার মাঝে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি আলাদাও থাকা হয়, সেক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়িতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া ও খোঁজখবর নিতে হবে।

শেষ করার আগে, জীবনে সম্পর্কগুলোকে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে শরীয়াতকে অনুসরণ করে চলা উচিত। এর অন্যথা হলে, শুরু থেকেই সংসারে খিটিমিটি লেগে থাকবে আর বিচার দিবসেও আল্লাহর প্রশ্ন থেকে কেউ উদ্ধার

করতে পারবে না। একজন নারীকে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের প্রতি ধৈর্য ও নমনীয়তা দেখাতে হবে, ঠিক যেমনটা সে নিজে আশা করে তাদের কাছে।

কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে আমি সবসময় একটা কথাই বলি,

যদি আপনার ছেলেকে বিয়ে দিচ্ছেন তো মনে করবেন আল্লাহ আপনাকে একটি কন্যা উপহার দিচ্ছেন। আর যদি মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন তো আল্লাহ আপনার পরিবারে একটি পুত্র উপহার দিচ্ছেন।

আল্লাহ আমাদের একে অপরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সাহায্য করুন।

সূত্রসমূহ: http://icnaconvention.org/sheikh-abdool-rehman-khan/

http://messageinternational.org/wife-responsibilities-with-in-laws/

আমার ভাগ্য কী আমার হাতে

24 September 2014

লেখকঃ শরীফ আবু হায়াত অপু

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

The lamb thy riot dooms to bleed today,

Had he thy reason, would he skip and play?

Pleas'd to the last, he crops the flow'ry food,

And licks the hand just rais'd to shed his blood.

Oh blindness to the future! kindly giv'n,

That each may fill the circle mark'd by Heav'n:

কবি আলেকজান্ডার পোপের এই চিত্রকল্পটি যখন প্রথম পড়েছিলাম তখনও আমি ইসলাম বোঝা শুরু করিনি। কিন্তু ব্যাপারটা আসলেই খুব মনে ধরেছিল। একটা ভেড়া যদি জানত আজ তার জীবনের শেষ দিন, সে কি লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে পারত? সেকি তার এতদিনের পালক কিন্তু ভবিষ্যত হন্তারকের হাত থেকে খাবার খেতে পারত? আসলে আল্লাহ অনেক দয়া করে ভাগ্যকে আমাদের সামনে অজানা রেখেছেন নয়ত আমরা একটি দিনও চলতে পারতামনা।

জ্ঞান প্রকাশ্যের আকাঙ্খা যাদের মধ্যে প্রবল তাদের বিতর্কের একটা প্রিয় বিষয় হচ্ছে ভাগ্য। অবশ্য শুধু পন্ডিত নয়, ভাগ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সাধারণ মুসলিমরাও বিপদে পড়ে যায় প্রায়ই। ভাগ্য অদৃশ্য জগতের ব্যাপার। অতীতকে আমরা দেখি কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে তা কেউ জানে না। হস্ত-বিশারদ নামের কিছু বদ্ধ উন্মাদ ভবিষ্যত জানার দাবী করে কিন্তু এদের একটা কথা মেলে তো দশটা মেলে না। আরে ভবিষ্যত জানলে তো লটারীর টিকিট বা সস্তা শেয়ার কিনে বড়লোক হওয়া উচিত, মানুষের হাত ধরে ধাপ্পাবাজী কেন করা? মানুষ আসলে ভবিষ্যত জানে না, ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে আছে, আর কারো কাছে নেই। ইসলামে ভাগ্য সম্পর্কে শিক্ষাটা খুব স্পষ্ট যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অর্জন করা দরকারী, এতটাই জরুরী যে একে ঈমানের স্তম্ভ বলা হয়েছে। প্রায়োগিক জীবনে এ শিক্ষার সুফল - এতে জীবন সহজ হয়, খুব কষ্টের মুহূর্তগুলোকেও ইসলামের পরশপাথর দিয়ে বদলে দেয়া যায়।

আরবিতে ভাগ্যকে ক্বদর বলা হয়। মুসলিম হিসেবে এর ভালো ও খারাপ ফলাফলে বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। ক্বদরের চারটি স্তর আছে -

১. জ্ঞান: আল্লাহর জ্ঞান অসীম। তিনি সৃষ্টি করার আগে থেকেই সব কিছু জানেন। পৃথিবী শুরু থেকে ধ্বংস অবধি কি হবে আর কি হবে না, কিভাবে হবে, কেন হবে সব তিনি জানেন।

২. কিতাব: আল্লাহ কিয়ামাত পর্যন্ত যা ঘটবে তার সব কিছু 'লাওহে মাহফুয' নামের একটি কিতাবে লিখে রেখেছেন।

৩. ইচ্ছে: আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয়। কোন কিছুই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হয় না। আবার তিনি যা ইচ্ছে করেন না তা হয় না।

৪. সৃষ্টি: আল্লাহ আমাদের যেমন সৃষ্টি করেছেন তেমন আমাদের সব কাজ, সব কথাও তিনিই সৃষ্টি করেছেন।১

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পাশাপাশি সে জীবনে কী করবে, কত দিন বাঁচবে, কী খাবে, কোথায় জন্মাবে, কোথায় মারা যাবে ইত্যাদি সব কিছু ঠিক করে রেখেছেন। আল্লাহ যা ঠিক করে রেখেছেন তার বাইরে কিছুই হবে না। আল্লাহ যা

চান সেটা হবেই, কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না। আর আল্লাহ যা চান না সেটা কোনভাবেই হবে না, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ একসাথে চেষ্টা করলেও সেটা হবে না।২

আল্লাহ মানুষ ও জ্বীনকে এমন কিছু দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, সেটা হল ইচ্ছেশক্তি।

অতএব যার ইচ্ছা, সে এটা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।৩

আল্লাহ ইচ্ছেশক্তি দেয়ার সাথে সাথে দু'ধরণের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন – সৎ ও মন্দ। আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন সে যেন ভাল পথে চলে আর খারাপ পথে না চলে। কিন্তু মানুষ কোন পথে চলবে সেটা আল্লাহ মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষকে দুই পথেই চলার ক্ষমতা দিয়েছেন, ভালো কাজ করার শক্তি দিয়েছেন তেমনি খারাপ কাজ করারও শক্তি দিয়েছেন। কিন্ত তিনি মানুষকে তার পছন্দ-অপছন্দের কথা জানিয়ে দিয়েছেন - যে ভালো পথ বেছে নেবে, ভালো কাজ করবে তাকে আল্লাহ পুরষ্কার দেবেন। আর যে খারাপ কাজ করবে, খারাপ পথে চলবে তাকে তিনি সেজন্য শাস্তি দেবেন। আল্লাহ যদিও পছন্দ করেন না যে মানুষ খারাপ কাজ করুক, তবুও যেহেতু তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি দিয়েছেন তাই তিনি সেই অপছন্দনীয় কাজটি করার সামর্থ্য এবং প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছেন। আল্লাহ জানেন মানুষ কী করবে, কিন্তু মানুষ নিজের ইচ্ছেতেই সেটা করবে।

একটা ছাত্র একেবারেই পড়াশোনা করে না। তার শিক্ষক তার পড়াশোনার অবস্থা দেখে বললেন যে, এই ছেলে পরীক্ষায় খারাপ করবে। ফল বের হবার পর দেখা গেল সত্যি সত্যি সে পরীক্ষায় ফেল করেছে। তাহলে পরীক্ষায় খারাপ করার জন্য কি সেই শিক্ষক দায়ী না সেই ছাত্র দায়ী? অবশ্যই সে ছাত্র দায়ী। ঠিক সেরকম আল্লাহ জানেন যে কে ভাল কাজ করবে আর কে খারাপ কাজ করবে। কিন্তু যেহেতু তার জ্ঞান কাউকে বাধ্য করেননি তাই যে যার নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকবে।

একজন মানুষ কামারের কাছ থেকে একটা বটি কিনে আনল। এই বটি দিয়ে সে একদিন রাগের বশে তার স্ত্রীকে আঘাত করে মেরে ফেলল। এই ঘটনায় বটি তৈরীর কারণে কি কামারকে অভিযুক্ত করা যাবে? ছুরি-বটি ছাড়া রান্নাঘর চলেনা – তার বেশীরভাগ ব্যবহারই উপকারী। কিন্তু এটা দিয়ে যদি কেউ মানুষ মারে তাহলে বুঝতে হবে দোষটা উপকরণের নয়, ব্যবহারকারীর। ঠিক তেমন আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি-বিবেক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী করে দিলেন, খাবারের মাধ্যমে শক্তি দিলেন এবং কোন একটা প্রেক্ষাপটে এনে উপস্থিত করলেন। তিনি আমাদের কাজের স্রষ্টা হলেও আমরা কি করব সেটা আমরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মানুষ যেহেতু ভবিষ্যত জানে না, তাই তার কর্তব্য যখন আল্লাহ তাকে কোন পরিস্থিতিতে ফেলেন তখন কুর'আন এবং সুন্নাহের মোতাবেক আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী কাজ করা, আপন প্রবৃত্তিকে তোষণ না করা। যেমন, একটা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আমি দেখলাম সুন্দরী বাছাই প্রতিযোগীতা চলছে। আবার ঘরের কোণে কুরআনুল কারীমের একটা অনুবাদও পেলাম। আল্লাহ মানুষকে দিয়ে টেলিভিশন তৈরি করিয়েছেন, এর অনুষ্ঠানগুলো তৈরি করিয়েছেন এবং এর

চলার জন্য দরকারী শক্তি বিদ্যুতের উৎসও সৃষ্টি করেছেন। আবার কুর'আনের বাণী আল্লাহর নিজের, তিনি আলিমদের দিয়ে এর অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন, বিজ্ঞানীদের দিয়ে ছাপাখানা তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। এখন আমি কী করব সেটাই আল্লাহ পরীক্ষা করে পুরষ্কার অথবা শাস্তি দেবেন। আমি যদি টিভিতে মেয়েদের নিলামে তোলার আয়োজন দেখি তাহলে শাস্তি পেতে হবে। যদি আমি ঐ সময় কুরআন পড়ে সময়টা পার করি তাহলে আল্লাহ আমাকে সেজন্য পুরষ্কার দেবেন।

কিছু প্রশ্ন ও ভুল ধারণা:

১. যদি আল্লাহ সবই জানেন তাহলে তিনি সবকিছু সৃষ্টি করতে গেলেন কেন?

জান্নাতে যাওয়া যাদের নিশ্চিত তাদের জান্নাতে দিলে তারা যে কিছু ভাল কাজ করে, কিছু ত্যাগের বিনিময়ে, প্রচেষ্টার বিনিময়ে জান্নাত পেয়েছে সেটা থাকত না। কিন্তু দুনিয়ার জীবন পার হয়ে যখন মানুষকে জান্নাতে দেয়া হবে, তার বুঝতে পারবে তারা কতটুকু কষ্ট করেছে আর তার বদলে কত বড় পুরষ্কার পেয়েছে। আর জাহান্নামীদের সরাসরি জাহান্নামে দিলে তারা আপত্তি তুলত, আল্লাহ অন্যায় বিচার করেছেন। দুনিয়াতে সময় কাটানোর ফলে তারা নিজেদের অন্যায়টা তারা বুঝতে পারবে। কেন সত্যের খোঁজ করেনি, সত্যটা পেয়েও মানেনি – এমর্মে আফসোস করতে থাকবে। আমরা জাহান্নামের শারীরিক শাস্তির বর্ণনা পড়ে ভয় পাই, কিন্তু সেখানে কি পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা আছে তা কী ভেবে দেখেছি? 'কেন ঐ খারাপ কাজটা করেছিলাম' 'কেন ঐ ভাল কাজটা করিনি' – এই পরিতাপের মানসিক যন্ত্রণা এত ভয়াবহ যে মানুষ সারা জীবনে করা একটা ভুলের হিসেব না মেটাতে পারে আত্মহত্যা করে। কিন্তু সারাটা জীবন যখন মিথ্যা হয়ে যায়, সারাটা জীবন যখন পরিতাপের কারণ হয়ে যায় তখন অনুভূতিটা কি ভীষণ ভয়াবহ ভাবা যায়?

২. আল্লাহ খারাপ কাজ/কথা সৃষ্টি করলেন কেন? ভাল একজন স্রষ্টা কি খারাপ কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা হয় – 'পুরোপুরি ভালো' অথবা 'অল্প খারাপ বেশি ভালো'; এর মানে আল্লাহ খারাপ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার কিছুর কোন খারাপ দিক থাকতে পারে কিন্তু সেটারও ভালো দিক অনেক বেশি। একটা হাদিসে আমরা এই প্রমাণ পাই।

রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে তার সাহাবাদের নিয়ে বসতেন সেখানে একটা ছোট ছেলে খেলা করত। ছেলেটার বাবা রসুলের সাহাবাদের সাথে বসে রসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা শুনতেন। বেশ কয়েকদিন ধরে তিনি দেখলেন যে সেই লোক আর সেই বাচ্চা কেউই আসে না। তিনি সাহাবাদের জিজ্ঞেস করে জানলেন যে ঐ বাচ্চাটা মারা গেছে আর সেজন্য ঐ লোকটা এত কষ্ট পেয়েছে যে সে আসছে না। রসুল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন ঐ লোকটার সাথে কথা বললেন। তিনি লোকটাকে জানালেন যে যদি রসুল (সাল্লালাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করেন তবে ঐ বাচ্চাটাকে আল্লাহ আবার জীবন ফিরিয়ে দেবেন। তবে লোকটি যদি ধৈর্য ধরে তবে ঐ বাচ্চাটি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।৪

মৃত্যু একটা কষ্টকর ব্যাপার তা ঠিক কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার আনন্দের তুলনায় মৃত্যু কিছুই নয়। তাই আমাদের কাছে কোন জিনিস খারাপ মনে হলেও আসলে সেটা খারাপ না, তার ভালো কোন দিক আছে। কিন্তু আমরা মানুষেরা সময়ের খুব ছোট একটা অংশ দেখতে পাই বলে আমরা কখনই আল্লাহর সব কাজের কারণ বুঝতে পারবো না। শয়তানকে যদি সৃষ্টি না করা হত, তাহলে মানুষ দুনিয়াতে পরীক্ষাও দিতে পারত না, জান্নাতের মত অকল্পনীয় একটা পুরষ্কারও পেত না। তাই শয়তান আপাত দৃষ্টিতে 'খারাপ' হলেও আদতে সে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার একটা পরীক্ষা মাত্র।

৩. আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তর তালাবদ্ধ করে রেখেছেন বলে তারা সত্যটা বুঝতে পারছে না।

বরং ব্যাপারটা উলটো; কুর'আনের যত জায়গায় অন্তর তালাবাদ্ধ করার কথা এসেছে সবখানেই কোন অপরাধে আল্লাহ মোহর মেরেছেন তা বলে দিয়েছেন। যেমন সুরা বাকারার শুরুতে আল্লাহ 'আল্লাযিনা কাফারু' অর্থাৎ যারা অবিশ্বাস করেছে – একথা বলে তাদের অপরাধ স্পষ্ট করে নিয়েছেন। তারপর তিনি আপন রসুলকে এই বলে সান্তনা দিচ্ছেন যে, এমন মানুষদের সাবধান করা আর না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ তারা তাদের অবিশ্বাসের উপর এতটাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আল্লাহ তাদের অন্তরে তালা মেরে দিয়েছেন; শ্রবণ–দৃষ্টিশক্তিতে পর্দা দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং এ ধরণের মানুষের সাথে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, তাদের প্রত্যাখ্যানে ব্যাথিত হবারও কিছু নেই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে একজন অবিশ্বাসী যখন দাবী করে তার অন্তরে মোহর আছে সুতরাং তার কোন দোষ নেই তখন আসলে সে নিজেই নিজের অন্তরে মোহর মেরে নিল। মোহর তো আর ভারতীয় গরুর গায়ের সিল না যে সেটা বাইরে থেকে দেখা যাবে। আর অবিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহ ওয়াহীর মাধ্যমে কোন তালিকাও পাঠিয়ে দেননি যেখানে সে তার নামটা খুজে পেয়েছে। আল্লাহ যাকে খুশী বিভ্রান্ত করেন এই আয়াতের মাধ্যমে যারা বিভ্রান্ত হতে চায় তারা বিভ্রান্তদের দলে যোগ দেয়। অথচ একই আয়াতে যে আল্লাহ যাকে খুশী হিদায়াত করেন বলে উল্লেখ করেছেন সেটা অবিশ্বাসীদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাসীরা যখন এই আয়াত পড়ে তখন তারা আশায় বুক বাঁধে – এই পৃথিবীর নানা মতবাদের ডামাডোলে আল্লাহ আমাকে সত্য পথটা নিশ্চয়ই দেখাবেন।

৪. আল্লাহর ইচ্ছেতেই যদি সবকিছু হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছের দাম কী?

আল্লাহর চাওয়া বা ইচ্ছেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – শারঈ বা বিধানগত, কাওনি বা সৃষ্টিগত।

শারঈ বা বিধানগত ইচ্ছে হল যা আল্লাহ ভালবাসেন কিন্তু এই ইচ্ছেটা আল্লাহ মানুষের ইচ্ছের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন, তিনি মানুষকে এটা মানতে বাধ্য করেননি। একজন মুসলিম তার নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর শারঈ ইচ্ছের অধীন করে দেয়। আল্লাহর কাওনি বা সৃষ্টিগত ইচ্ছের মধ্যে যা আল্লাহ ভালবাসেন এবং যা আল্লাহ ভালবাসেন না, দুটোই পড়ে। আল্লাহর কাওনি ইচ্ছে জীব-জড়, পশু-পাখি, মুসলিম-অমুসলিম, সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, এবং কেউই এক অগ্রাহ্য করতে পারবে না। যখন আল্লাহ আল কুর'আনে বলেন যে তিনি ইচ্ছে করলে সবাইকে হিদায়াত করতে পারতেন তখন তিনি তার 'কাওনি' ইচ্ছের কথা বোঝান। কিন্তু তার সাথে সাথেই তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি সবাইকে জোর করে হিদায়াত করবেন না, কারণ সত্য তো এই যে যারা স্বেচ্ছায় তার অবাধ্য হবে তাদের দ্বারা তিনি জাহান্নাম পূর্ণ করবেন, সেটা মানুষ হোক আর জ্বীন।৫ এখানে অন্য কোন সৃষ্টির কথা আসেনি কারণ কেবলমাত্র এ দু'টো সৃষ্টিরই স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি দেয়া হয়েছে। আল-কুরানে আল্লাহ বলেন, মানুষ ইচ্ছে করতে পারবে না যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছে করেন৬ – এখানেও আল্লাহর 'সৃষ্টিগত' ইচ্ছে বুঝিয়েছে কারণ তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি এবং বিবেচনাবোধ দিয়েছেন বলেই সে আল্লাহর পথ বেছে নিতে পারে।

মহান আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছে কিন্তু নেহায়েত খামখেয়ালি নয় বরং তার ভিত্তি আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রজ্ঞা। কুর'আনে সৃষ্টিগত ইচ্ছের কথা বার বার উল্লেখিত হওয়ার কিছু কারণ আছে –

প্রথমত, যাতে বিশ্বাসী মুসলিমরা আত্মশ্লাঘাতে না ভোগে, তাদের যেন সবসময় মাথার মধ্যে থাকে যে তারা যে সুপথ পেয়েছে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। মুমিনের মনে অহংকার এসে বাসা বাঁধার সুযোগ যেন তৈরী না হয়।

দ্বিতীয়ত, যাতে ইসলামের পথে আহবানকারীরা এটুকু মনে রাখেন যে, তাদের দায়িত্ব শুধু আহবান জানান। কে মানবে, কে মানবেনা - এটা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছে যেখানে আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেন না। সেখানে কাউকে জোর করে মুসলিম বানানোর যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইসলামের দাওয়াত গৃহীত না হলে হতাশ হবারও কিছু নেই। মানুষ তার সাধ্যমত দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ সেই চেষ্টার বিচার করবেন, ফলাফলের নয়।

তৃতীয়ত, যে মানুষটা একবার বুঝে গেছে যে আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া তার কোন ক্ষতি হবে না এবং হলেও ততটুকুই হবে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন, তাকে পৃথিবীর কোন শক্তির ভয় দেখিয়ে সত্য প্রচারে থামান যাবে না। যে মানুষটা বুঝে গেছে যে আল্লাহর ইচ্ছে ছাড়া তার কোন উপকার কেউ করতে পারবে না এবং পারলেও ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ চেয়েছেন, তাকে পৃথিবীর কোন কিছুর লোভ দেখিয়ে অন্যায় কাজে লিপ্ত করা যাবে না। এটা ঈমানের সর্বোচ্চ শিখর, যেখানে উঠতে পেরেছিলেন বলে সাহাবারা অর্ধশতাব্দীর কম সময়েই অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামের বাণী পৌছে দিতে পেরেছিলেন।

চতুর্থত, পার্থিব জীবনে সুখী থাকা। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন –

আদম সন্তানের সুখ নির্ভর করে তার প্রাপ্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার উপরে। আদম সন্তানের দুঃখ ইস্তিখারা না করাতে, প্রাপ্তি নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকাতে।৭

মানুষকে মেনে নিতে হবে যে তার ভাগ্যে যা আছে তা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাকে তাই যেকোন অবস্থাতেই আল্লাহর উপর খুশি থাকতে হবে। তার মানে এই না যে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। আমাদের দায়িত্ব পার্থিব এবং পরকালীন সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা। সর্বোচ্চ চেষ্টার পরেও যদি পার্থিব কোন ব্যাপারে আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা রেখেছেন সেটাই মঙ্গলকর এ বিশ্বাস করতে হবে। তা খুশি মনে মেনে নিতে হবে। আর যেহেতু আল্লাহ আমাদের পরকালে কি হবে জানিয়ে দেননি সেহেতু আমৃত্যু ভাল কাজ করে যেতে হবে; আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে যেন তিনি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, জান্নাতে স্থান দেন।

কোন বিপদে মন খারাপ না করে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে হয়, তার প্রশংসা করতে হয় কারণ এর চেয়ে বড় বিপদ তিনি দিতে পারতেন। আল্লাহ যখন কোন মানুষের জীবনে কোন বিপদ বা দুঃখ-কষ্ট দেন তখন তার তিনটি ভাল দিক থাকে -

১. যদি সেই মানুষটি খারাপ কাজ করতে থাকে তবে সে যেন বিরত হয় এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

২. সেই মানুষটি যেসব অন্যায় কাজ করেছে, পাপ করেছে তার প্রতিফল হিসেবে বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পৃথিবীতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে দেয়া।

৩. বিপদে মানুষটি ধৈর্য ধরে কিনা তা পরীক্ষা করা এবং সে ধৈর্য ধরলে তার অনেক বড় পুরষ্কার দেয়া।

তাই বিপদে পড়লে আমাদের উচিত পাপ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহ যেন আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন সে জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা কারণ একমাত্র দু'আতে আল্লাহ ভাগ্য পরিবর্তন করেন।৮ অতঃপর কর্তব্য ঐ পরিস্থিতিতে আল্লাহর অনুমোদিত পথে যা করলে বিপদ কাটবে তা করা।

বিশাল এ পৃথিবীতে সময় কিংবা স্থানের বিচারে আমরা আসলে অতি ক্ষুদ্র অস্তিত্ব। আমরা অনেক বড় বড় কথা বলতে পারি, অনেকের সমালোচনা করতে পারি কিন্তু দিন শেষে আমাদের প্রভাব বলয় অতি সীমিত। অহেতুক কথা না বলে, অনর্থক কাজ না করে আমাদের উচিত যে পরিস্থিতিতে আল্লাহ আমাদের রেখেছেন সে পরিস্থিতিতে সাধ্যমত সর্বোৎকৃষ্ট কাজটা করা। শেষ বিচারের দিনে আসলে বিচার হবে এটারই – আমার বেছে নেয়া ইচ্ছেগুলো কী ছিল। অন্যদের ইচ্ছেগুলো আমার জীবন প্রভাবিত করে সত্যি, কিন্তু আসলে তো আমি সেগুলো চাইলেই বদলে ফেলতে পারব না। তাই আমি যেখানে আমার ইচ্ছেশক্তি খাটাতে পারব - আমার আপন ব্যক্তিসত্বার উপরে, সেখান থেকেই শুরু হোক পথ চলা, পরকালের অসীম মুক্তির পথে। আল্লাহ যেন তার যাবতীয় ইচ্ছে মেনে, আমাদের ইচ্ছেটাকে তার ইচ্ছেমত পরিচালিত করার ক্ষমতা দেন। আমিন।

২১শে যুল-ক্বদা ১৪৩৩ হিজরি

---

১ সুরা আস-সফফাত (৩৭), আয়াত ৯৬

২ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিরমিযি

৩ সুরা মুদদাস্‌সির (৭৪), আয়াত ৫৫

৪ সুনানে নাসাঈ

৫ সুরা আস-সাজদা (৩২), আয়াত ১৩

৬ সুরা আল-ইনসান (৭৬), আয়াত ৩০

৭ হাকিমের মতে সহীহ, ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে হাসান হিসেবে রায় দিয়েছেন

৮ তিরমিযি, ইবনে মাযাহ

আধিপত্য বিস্তার- শাশুড়ি vs বউ

14 September 2015

লেখকঃ ফাতেমা মাহফুয

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের সমাজে 'শাশুড়ি' একটি নেতিবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে কিংবা নেতিবাচক করে দেয়া হয়েছে। তাই 'নারী অধিকার' শব্দটি আমরা ব্যবহার করি বটে, কিন্তু সমাজে 'শাশুড়ি' চরিত্রে যিনি বসে থাকেন, তিনি যেন 'অধিকারের খাতার out of the boundary. ব্যক্তিগতভাবে "অধিকার" বলতে আমি নির্দিষ্ট সেই জাতি বা সেই মানুষটিকে শুধু তার প্রাপ্যতা বুঝিয়ে দেয়াই মনে করি না, বরং সেই মানুষের সমাজের প্রতি কি দেয়ার বা তার নিজের প্রতি তার কি অধিকার সেটাকেও তাকে বুঝিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব মনে করি। তো সেই হিসাবে পরিবারে একটা শাশুড়ির কি করণীয় কিংবা শাশুড়ির প্রতি বউ এর দায়িত্ব-সর্বোপরি "শাশুড়ি অধিকার" নিয়ে কাউকে কিছু বলতে দেখা যায় না। ফলে আমাদের অসচেতনতার কারণে শাশুড়িরা কখনো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেন, সংসারে একক কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন আবার কখনো মানসিকভাবে নির্যাতীত কিংবা অবহেলিত হয়ে পড়েন। তাই সংসারে শাশুড়ি ও বউ এর অধিকার ও আচরণ নিয়ে একতরফা নয়- বরং উভয় পাশ আলোচনার জন্য কিছু ধারাবাহিক উপস্থাপন-

case no-1: আধিপত্য বিস্তারঃ অধিকাংশ শাশুড়ি মূলত এই ভুলটাই করে থাকেন। তারা বলেন- "আমি এখনো জীবিত আছি, আমার সংসারে আমার মতোই চলতে হবে"। এদিকে শাশুড়ি বউকে বিভিন্ন কাজ সামলানোর দায়িত্ব দিলেও এমনটিই আশা রাখেন যে "সেই সব কাজটি আমি যেভাবে করি, সেভাবেই সে করুক/করতে হবে"। এই জিনিসটাই হচ্ছে মারাত্মক একটা সমস্যা সৃষ্টি করে। কারণ একজনের লাইফ-স্ট্যাইলের সাথে, কাজের ধরণের সাথে আরেকজনের ১০০% মিল খাবে তা কিন্তু না। পরিবার টিকে থাকে সমঝোতার ওপর। আপনি যদি মানুষকে স্বাধীনতা দিবেন তখন দেখা যাবে সন্তুষ্টচিত্তে অপরপক্ষ কাজটি করে যাচ্ছে- সেই কাজটি কারো প্রতি দায়িত্ব হোক বা পরিবারের সবার জন্যই হোক না কেনো? ধরে নেই- কারো কাজের ধরণে আপনার সমস্যা আছে। ধরে নেই- শাশুড়ি খুব পরিপাটি টাইপ মানুষ। কিন্তু বউটা একটু অগোছালো। রান্না ঘরে যখন যায়- সব এলোমেলো করে দিয়ে আসে। কাপড়-চোপড় যেখানে সেখানে পড়ে আছে, ঝুটা চায়ের কাপ সেই কবে থেকে টেবিলে পড়া-ইত্যাদি ইত্যাদি (ধরে নিই)। আর এসব শাশুড়ির চোখে খারাপ লাগে। এক্ষেত্রে শাশুড়ি যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে হাসিমুখে বলে- বউ মা... ঘরটা গুছিয়ে রাখলে তো লোকে তোমাকেই ভালো বলবে বা একটু মজা করে না হয় বললেন- যাতে অপরপক্ষ আপনার কথায় গুরুত্ব দেয়। (আনন্দের মাঝে একটা মেসেজ ছেড়ে দিলে সেটা অন্যের ব্রেনে সেট হয়)। যদিও আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখি- মানুষ বড়ই ঝগড়াটে। তারা অপরপক্ষকে ট্রেনিং দিতে গিয়েও ভালো কৌশল খাটাতে ব্যর্থ হয়। হুট করে বলে ফেলে- "মায়ের বাসা থকে কিছু শিখে আসো নি? হতে পারে কিছু শিখায় নি, এজন্যই তো এমন! দেখো বউ! নিজের বাড়িতে যা করসো, আমাদের এখানে ওসব চলবে না। যেভাবে বলি সেভাবে করো!" এসব কথাগুলো স্বাভাবিকভাবেই একটা মানুষের কাছে মনে হবে কানের মধ্যে পিনের খোঁচার মতো। ফলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র apply শুরু। কথা কাটাকাটি start, সাংসারিক সুখ The End. বউ এর মধ্যে এই প্রশ্ন জাগবে- "আমাকে এতো কথা শুনাবে কেনো? আমি বাড়ির বউ না কাজের বুয়া? সবসময় 'তার সংসার', 'তার সংসার' বলে কেনো? এটা কি আমার সংসার নয়? আমার কোনো কথাই চলবে না! আজব!" আর এসব কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে স্বামীর কানে পৌঁছাবে। সেক্ষেত্রে তার কিছু বলাটা জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কারণ- বুঝার মানসিকতা কোনো পক্ষেরই থাকে না। কোনো সিদ্ধান্ত বউ এর সমর্থনে চলে গেলে মা উঠে বলে-"আজকে বউ এর জন্য তুই আমাকে কথা শুনাচ্ছিস"? আর কোনো কথা মা এর সমর্থনে গেলে বউ বলবে-"আপনার জীবনে আমার কোনো গুরুত্বই নাই, তাহলে বিয়ে করলেন কেনো"? ঠেলা সামলানোর মতো অবস্থা শুরু!

এদিকে এটা স্বাভাবিক যে- বউ হিসাবে একটা মেয়ের স্বপ্ন থাকে তার ঘরটাকে নিজের মতো করে সাজাবে (আর এক্ষেত্রে যদি স্বামীর কোনো অভিযোগ না থাকে বরং সেও স্ত্রীর আইডিয়াগুলো পছন্দ করে)- তো সেক্ষেত্রে অন্যের

নাক গলানো (বিশেষ করে শাশুড়ির-কারণ অনেকেই আছেন যারা খুঁটিনাটি জিনিসেও নিজের মত উপরে রাখতে ছাড়েন না, সোফা ওভাবে রাখো, পিলো এভাবে রাখো, ঐ ওয়ালমেট ভালো না, এই চাদরটা বিছাও ইত্যাদি ইত্যাদি) পছন্দ করা যায় না। সুতরাং, শাশুড়িদের উদ্দেশ্যে বলতে- বয়সের কারণে অভিজ্ঞ হলেও সব সময় নিজের সিদ্ধান্তই যে অন্যের চেয়ে উত্তম হবে- এমনটি ভাবা উচিত নয়, বরং অন্যের মতকে গুরুত্ব দেয়ার মানসিকতা আমাদের তৈরি করা উচিত। ভালো মনে হলে সেটা মেনে নিতে কার্পণ্য করা ঠিক নয়। এতে অন্যেরা উৎসাহিত হবে। তবে হ্যা, একান্তই কোনো কাজ যদি আপনার দৃষ্টিতে ঠিকভাবে হচ্ছে না বা আপনার কাছে ভালো কোনো অপশান আছে তাহলে এভাবে বলুন- "আমার মনে হয় এভাবে না করে ওভাবে করলে ভালো হয়...."। সেক্ষেত্রে বউ কথা রাখলে রাখলো না রাখলে নাই। কারণ আমরা তো কাউকে নিজের মতের ওপর বাধ্য করতে পারি না। এবার যদি দেখা যায় যে- প্রায়ই বউয়ের কিছু শাশুড়ী মেনেই নিতে পারছেন না তাহলে ঝগড়াঝাটি না করে সন্তুষ্ট চিত্তে আলাদা হয়ে যাওয়া উত্তম। আমাদের মূলত সবসময় চিন্তা করতে হবে- আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রেখে, মনোমালিণ্য সৃষ্টি না করা। আমরা যখন কারো সুবিধা করে দিবো ইনশাআল্লাহ আমরাও অনেক সুবিধা পেয়ে যাবো।

হ্যা, বউ নিয়ে আলাদা থাকাটা অনেক পরিবার মেনে নিতে পারেন না বা ভালো চোখে দেখেন না। না, দেখার পিছনে কারণ হলো- আমাদের সমাজে অধিকাংশ পরিবারের ছেলেরা বউ নিয়ে আলাদা হয়- মায়ের সাথে ঝগড়া করে, তাই দেখা যায় আলাদা হওয়ার পর মায়ের আর খোঁজ রাখে না। আবার এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে শাশুড়ী দেখতেই পারছেন যে, বউ তার কিছুই শুনছে না বা তাকে সম্মান করছে না-আবার বিপরীতভাবে বউও সব সময় শাশুড়ির সব কথা মানতে পারছে না, অসুবিধা হতেই পারে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও আমি দেখি- অনেক পরিবার (বিশেষ করে শাশুড়ি) ঐতিহ্যের ঠুনকো জেদ ধরে আলাদা হতে চান না। যদিও বলে রাখি- আলাদা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে, ১/ ছেলে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হয় বা ছেলে শহরে কাজ করে তাই তাকে স্বাভাবিকভাবে বউ নিয়ে আলাদা থাকতেই হয়, সেটা মেনে নিতে মায়ের সমস্যা হওয়ার কথা না, আর কখনোই স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা জায়গায় রাখা ঠিক না। সেটা প্রবাস জীবনে হোক বা শহর-গ্রাম ব্যবধানে। যদিও এই ব্যাপারটা অনেকেই বুঝতে চান না। কিছু মা-বাবার যুক্তি থাকে-আমাকে দেখবে কে, ঘরের কাজ করবে কে ইত্যাদি। তাই বলতে-মা-বাবার দেখাশোনার ব্যবস্থা করা ছেলের দায়িত্ব, একান্ত কেউ না থাকলে নিজের কাছে মা-বাবাকে রাখা উচিত। এদিকে সংসারের সবার কাজ করার জন্য মূলত একটা মেয়ে বিয়ে করে না। একটা মানুষ নিজের কাজ করার প্রতি প্রস্তুত থাকে, তাকে নিজের কাজ নিজ হাতে করার জন্যই মূলত সচেতন করা যায়, কিন্তু তার ওপর জোর করে কারো দায়িত্ব চেপে দেয়া উচিত নয়। সে সন্তুষ্টচিত্তে করে দিলে সেটা আলাদা, কিন্তু **"বউ আনছি কাজ করানোর জন্য"**- এমন মানসিকতা শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বয়ং স্বামী কিংবা তার পরিবারের কারো রাখা ঠিক নয়। মা-বাবা বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। বেঁচে থাকলে আমরাও একদিন বৃদ্ধ হবো-কিন্তু তাই বলে আমাদের সব কাজ আমাদের সন্তানদের জীবনসঙ্গীর হাত দিয়ে করাবো এমন তো হয় না! বরং, নিজের ফুট-ফরমায়েশের জন্য আমরা প্রয়োজনে কাজের মেয়ে রাখতে পারি। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সেও মানুষ একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চায়- যাতে তার সময় ভালো কাটে। সেক্ষেত্রে সন্তানের উচিত নিজের মা-বাবার জন্য তেমন ব্যবস্থা করা। হতে পারে তাদেরকে তাদের পছন্দ মতো বই কিনে দেয়া বা ভিন্ন কিছু- যা তারা ভালো মনে করে। এদিকে অবশ্য একটা কথা বলে রাখি- আমাদের মধ্যে এমনও কিছু মেয়ে আছেন- যারা সারাদিন ঘরের ভিতরে থাকেন, কিংবা বাইরে জব করেন-তারা শ্বশুড়-শাশুড়ির সাথে একটু গল্প করার সময় পর্যন্ত বের করেন না, বা একটু "কেমন আছেন" পর্যন্ত জিজ্ঞাস করার প্রয়োজন অনুভব করেন না। যেটা নূন্যতম শিষ্ঠাচার বহির্ভূত কাজ। আবার আমি যেমনটি বলেছি- বউ সবার কাজ করতে আসে না- তাই বলে কোনো দিন যদি শাশুড়ি বলে- " একটু রুটি বানিয়ে দাও তো..."। আর ওমনি যদি বউ বলে উঠে-"আমি সবার কাজ করতে আসি নি"- এমন কথাটা বলা যেমন সমীচীন নয়, তেমনি সবসময় বউকে কাজের ওপর রাখার মানসিকতাও ঠিক নয়।

২/ অধিকাংশ যৌথ পরিবারে রান্না ঘরের ব্যবস্থাপনা নিয়েই মূলত ঝগড়া লাগে। সেক্ষেত্রে একসাথে থেকে 'রান্না ঘর' আলাদা করে দিলেও হয়। এটা করলে একদিক দিয়ে শাশুড়ি'র কষ্ট করে রান্নাও করতে হয় না আর দুটো মানুষের (শ্বশুর-শাশুড়ি) জন্য বউ এর রান্না করতে নিশ্চয়ই সমস্যা হওয়ার কথা না।

৩/ বউ-শাশুড়ি যখন একে-অপরকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেন না- তখন পুরোপুরি আলাদা হয়ে যান। আলাদা বাড়ি, আলাদা সব কিছু। তবে এক্ষেত্রে যা হয় তাহল 'মা' তথা শাশুড়ি অনেক কষ্ট পান। ছেলেকে কাছে না পেয়ে। এ বিষয়টা বউয়েরও বুঝা উচিত-একসাথে থাকতে না পারলেও সে আগ্রহী হয়ে পারস্পারিক ঝগড়াটা মিটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে পারেন- এক্ষেত্রে শাশুড়ি'র আন্তরিকতার প্রয়োজন, যাতে একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকে। আর ছেলের উচিত রীতিমত মায়ের খোঁজ-খবর নেয়া, তার সাথে সাক্ষাত করে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা। মায়ের কোনো কষ্টের জন্য যাতে পরকালে জবাবদিহি করতে না হয়।

কৃতজ্ঞতা Starts From Here.....

5 July 2014

লেখকঃ সাজিদ ইসলাম

জানিনা এই লেখাটি কে কে পড়বে। লেখাটা এখন না লিখলেও হতো। তারপরও লিখলাম হয়ত আর কোন দিন লেখা হবেনা ভেবে। কার কেমন লাগবে জানিনা তবে লেখাটা লিখে আমার ভাল লেগেছে। কেমন একটা হালকা হালকা লাগছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

একবার এক সাহাবী খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে কিছু সাহাবী উনাকে দেখতে গেলেন। তার শয্যাপাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেমন আছেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ্"। তার উত্তর শুনে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে

একজন বললেন, "আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি কারো কাছে সে কেমন আছে জানতে চাইলে সে যদি উত্তরে বলে আলহামদুলিল্লাহ্ তবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়"। (হাদিসের মূল থিমটা বলেছি। এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। খুব সম্ভবত ছুগিরা গুনার কথা বলা হয়েছে। আর এটা কাদের জন্য প্রযোজ্য এটাও একটা প্রশ্ন। সারাদিন আকাম কুকাম করে দিন শেষে কেউ কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে দিয়ে সব গুনাহ সাফ করে দেব এই নিয়্যতধারিদের জন্য ইনশাআল্লাহ এই সুসংবাদ প্রযোজ্য হবে না। Allah knows the best.)

স্কুলের পরীক্ষার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। টেনশনে পৃথিবীটা পানসে হয়ে যেত। স্কুলের বেশীরভাগ পরীক্ষাই আমি দিতাম গায়ে জ্বর নিয়ে। এস এস সি পরীক্ষার সময় প্রতিটা পরীক্ষার দিন সকালে নিয়ম করে বমি করতাম। পরীক্ষার সীমাহীন টেনশনে কিছুদিনের জন্য মুমিন বান্দা হয়ে যেতাম। আল্লাহ্‌র কাছে কত করে চাইতাম পরীক্ষাটা যেন ভাল হয়, প্রশ্ন যেন কমন পড়ে! আমার পরীক্ষা ভাল হত, রেজাল্টও। এরপর স্বার্থপর মন সব ভুলে যেত। আমার মত হয়ত সব স্টুডেন্টই ভুলে যায় পরীক্ষার জন্য তারা আল্লাহ্‌র কাছে কত কাকুতি মিনতি করে। আমার নোট বুকে কুরআনের একটা আয়াত লিখে মার্ক করে রাখা আছে। সূরা ইউনুসের এই আয়াতটা দেখে আমার স্কুলের পরীক্ষার কথা মনে পড়ে আর প্রচণ্ড রকম লজ্জা লাগে। আর ভাবি আমার মত অকৃতজ্ঞদের আল্লাহ আয়াতটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন,

"মানুষকে যখন দুঃখ ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার দুঃখ ক্লেশ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে যায়, মনে হয় যেন তাকে দুখ-ক্লেশ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে কখনো ডাকেইনি।....." [সূরা ইউনুসঃ ১২]

কয়েকদিন থেকে উত্তরায় আছি। বাসার পাশের মসজিদে নামাজ পড়ি। নামাজে দাঁড়িয়েই প্রথমে পাশের জনের পায়ের সাথে মিলিয়ে কাতার সোজা করে নিই। একদিন পা মিলাতে গিয়ে দেখি আমার ডান পায়ের পাশে কোন পা নেই। অবাক হয়ে দেখি আমার পাশের ভদ্রলোক এক পা নিয়ে জামাতে দাঁড়িয়েছেন। তার বাম পা কোমর থেকে কাটা। সুবাহানাল্লাহ! আল্লাহু আকবর। জামাতে সামনের কাতারে অনেকেই বয়সের ভারে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে আর ইনি এক পা নিয়েও দাঁড়িয়ে আছেন। পুরো নামাজে দেখছি কত কষ্ট করে এই মানুষটি নামাজ পড়ছে। তার তাকওয়া দেখে, এই ভয়ংকর অঙ্গহানির পরও মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধ দেখে মনটা এতটুকু হয়ে গেল। আরেকদিন হলের মসজিদে নামাজ পড়ছি দেখি আমার পাশের জন কেমন জানি বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাতার থেকে একরকম বেরিয়ে গিয়ে নামাজ পড়ছে। খুব বিরক্ত লাগছিল দেখে। কিন্তু সালাম ফিরিয়ে দেখলাম ছেলেটা অন্ধ। কৃতজ্ঞতায় মনটা ছোট হয়ে গেল। এই মানুষগুলো আমাদের মত সুস্থ নয়। আল্লাহ এদেরকে অনেক কিছু দেননি যা আমাদের দিয়েছেন। কারো হাত নেই, পা নেই, কারো চোখ নেই। আল্লাহ্‌র বিচারকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার মত অনেক যুক্তি এদের কাছে আছে। কিন্তু অভিযোগ না করে সেই মহান রবের প্রশংসায় সিজদাবনত হতে দেখে এত ভাল লাগে। আলহামদুলিল্লাহ্ আমার দুইটা পা আছে। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি দুই পায়ে ভর দিয়ে নামাজে দাঁড়াতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমার এক জোড়া জুতা। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি দোকান থেকে পছন্দ করে বেছে বেছে পায়ের মাপে স্যান্ডেল কিনতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি দুই পা ভাঁজ করে আরামে বসতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্ আমার দুইটা চোখ আছে। আমার আছে সাতটা রং। আমি কিছু দেখে আবেগে আপ্লুত হতে পারি। আমি সুন্দর দেখতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্।

আপনি কেন মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন না? একবার নিজের শরীরের দিকে তাকান। শরীরের প্রতিটা অঙ্গের কথা চিন্তা করুন। চোখের পাপড়ি দেখে কি মনে হয়।? শরীরের ওজনের তুলনায় .০০০০০০০০০ something হবে এর ওজন। এগুলা না থাকলেই কি!! কিন্তু কেটে ফেলে দিয়ে দেখুন তো?? এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকবেন। ঘুমাতে পারবেন না, চোখ বন্ধ করতে পারবেন না। কারণ অতি নগন্য এই জিনিসটা চোখের দুই পাতার মধ্যে চেইনের মত

কাজ করে। চোখ বন্ধ করলে এরা মাঝখানে চেইনের মত দুই পাতাকে আঁকড়ে ধরে। চিন্তা করুন মহান আল্লাহ আপাতদৃষ্টিতে অতি নগন্য মনে হওয়া এই জিনিসটিও আপনার জন্য যত্ন করে বানিয়েছেন। দুইটা সুস্থ সবল হাত, হাতের দশটা আঙ্গুলই ঠিক। কিন্তু ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলটা স্কচ টেপ দিয়ে আটকে রাখুন তো!! শার্টের বোতামটাও লাগাতে পারবেন না। বউকে ডাকতে হবে বোতাম লাগানোর জন্য। কৃতজ্ঞতা starts from here my dear brothers. এখান থেকে কৃতজ্ঞতায় আপনার বুকটা ভরে যাওয়া উচিত। সিজদায় পড়ে চোখের পানি ছেড়ে দেওয়া উচিত। কৃতজ্ঞতা starts from here. Just here_____

আলহামদুলিল্লাহ্ শব্দের অর্থ " সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার"। দ্বীন ইসলামের খুঁটি শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্য যে কয়টা বিষয় অত্যাবশ্যকীয় তার একটি "কৃতজ্ঞতা"। কৃতজ্ঞতা ছাড়া আপনি একজন ঈমানদার হতে পারবেন না, মুমিন হতে পারবেন না। কখনোই না। কেন পারবেন না তা একটা ছোট্ট সিকুয়েন্স দিয়ে বলি। অন্তরের কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে আনুগত্য আসে, আর আনুগত্য থেকে আসে সমর্পণ। এটাই তো ইসলাম! বান্দা তার রবের প্রতি অনুগগত থেকে নিজের ইচ্ছাকে তার নিকট সমর্পণ করবে। so that's the reason একজন মুসলিমকে কৃতজ্ঞ হতে হয়। একজন মুমিনকে কৃতজ্ঞ হতে হয়। জান্নাতের স্বপ্ন দেখা প্রতিটি ঈমানদারকে কৃতজ্ঞ হতে হয় মহান আল্লাহ্র কাছে। অন্তর থেকে আসতে হয় "আলহামদুলিল্লাহ্ for everything"

আপনি! যে মুসলিম ভাই এই লেখাটা পড়ছেন আপনি জানেন না আপনি কত ভাগ্যবান। আল্লাহ আপনাকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এর অনুসারী বানিয়েছেন। শুধু শুধুমাত্র দয়া করে। যে মানুষটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারে, যে মানুষটি প্রতিটা মুহূর্তে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে, বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, সে মানুষটি কি জানে সে কত ভাগ্যবান? আল্লাহ কত কত দুর্ভাগা মানুষের মাঝ খান থেকে এই মানুষটিকে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাদের সাথে শামিল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। আপনি যে ভাগ্যবান এটা বুঝতে পারাটাও একটা রহমত। সেই রহমতের জন্যও আপনার বলা উচিত আলহাদুলিল্লাহ। আমরা তিনবেলা ভাল খেতে না পেরে আক্ষেপ করি আর রসুল (সাঃ) সহ তার সাহাবীরা পেটে পাথর বেঁধে থাকতেন। আপনার খুব দামি ব্র্যান্ডের জুতা নেই কিন্তু আপনার জুতা পরার দুইটা পা আছে, কারো হয়ত সেটাও নেই। আপনার খুব ভাল, দামি কাপড় নেই কিন্তু স্মরণ করুন আবু যার গিফারির (রাঃ) সাহাবী, হজরত হামযা (রাঃ) এর মত বীর শহীদ দের কবরস্থ করার সময় এক টুকরো কাফনের কাপড়ও ছিল না! আপনার হয়ত খুব সুন্দর একটা ফ্ল্যাট বাড়ী নেই কিন্তু হজরত আলী (রা) এর মত মানুষও মাঝে মাঝে শুধু মাটির উপর শুতেন। আর এই দেখে একদিন রাসুল (সাঃ) তাকে সম্বোধন করেন, "ইয়া আবা তুরাব____ ওহে মাটির অধিবাসী প্রাকৃতজন"।

খুব সুন্দরী বউয়ের শখ ছিল, তাইনা?? আপনার বউটা হয়ত অত সুন্দরী নয় কিংবা দেখতেও হয়ত ভাল নয় কিন্তু সে একজন মুমেনা! সে পর্দা করে, আল্লাহ্র দ্বীন পালন করে, আপনাকে আল্লাহ্র জন্য অনেক অনেক ভালবাসে। ফজরের সময় আপনাকে ডেকে দেয়। আপনার সন্তানকে সে দ্বীন শিক্ষা দেয়___ হা করে বসে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখে না! সংসারের শত অভাব অনটনের সময়ও সে ধৈর্য হারায় না। দামি গয়না গাটির বায়না ধরেনা। সে জান্নাতের স্বপ্ন দেখে আর আপনাকেও স্বপ্ন দেখায়। কত্ত বড় রহমত আপনার প্রতি আপনি কি কখনো অনুভব করেছেন?? কখনো কি এই বিশাল রহমতের জন্য মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছেন?? আমার কাজিনের একটা বাচ্চা হয়েছে সদ্য! কি যে আদর লাগে মাশাআল্লাহ! ছোট বাচ্চা এই প্রশ্রাব করে, এই পায়খানা করে আর তার মা তা প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করে। এতে যেন এক ধরনের আনন্দ তার। আপনারও ছোট ছোট বাচ্চা আছে___তাইনা?? আপনার স্ত্রীও এক বুক মমতা নিয়ে বাচ্চার পায়খানা-প্রশ্রাব পরিষ্কার করতে পারে, আপনি বাচ্চার জন্য খেলনা কিনে কিনে ঘর ভর্তি করে ফেলতে পারেন, তার তুলতুলে গালে গাল ঘষে আদর করতে পারেন, অসুস্থ হলে টেনশনে ছোটাছুটি করতে পারেন, বারান্দায় হেঁটে হেঁটে গুন গুন করে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ্ আপনার আশেপাশেই অনেক মানুষ দেখতে

পাবেন আল্লাহ এদের কোন সন্তান দেননি। আপনাকে দিয়েছেন। শুধুমাত্র দয়া করে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ হয়েছেন মহান আল্লাহর কাছে?? চোখের পানি ফেলেছেন কোনদিন?

এদেশের অবস্থা খুব খারাপ?? এদেশে কেন জন্ম নিলেন?? আক্ষেপ হয় কি?? তাহলে কিছু মানুষের গল্প শুনুন। সোমালিয়ার মানুষ খেতে না পেয়ে মারা যায়। ফিলিস্তিনের মানুষগুলোর কাছে এতটুকুও নিশ্চয়তা নেই যে তাদের স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়েরা সুস্থ অবস্থায় ঘরে ফিরবে। আফগানিস্থানের মানুষ বছরের পর বছর আমেরিকানদের বন্ধুকের তলায় মাথা নিচু করে জীবন পার করে দিচ্ছে। ইরাকের মা বোনদের ঘর থেকে ধরে নিয়ে পালাক্রমে গণধর্ষণ করা হয়। আপনি ভাল আছেন আলহামদুলিল্লাহ্। তিন বেলা খেয়ে এখনো পর্যন্ত আরাম করে ঘুমাতে পারেন।

মাঝে মাঝে ভাবি একটা কম্পিউটার থাকলে পুরা কুপাই ফেলতাম। লেকচার, ইসলামি বই, সাইট ঘেটে ঘেটে একেবারে শায়খ হয়ে যেতাম। আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ আমার জন্য এটাই চেয়েছেন। কম্পিউটার থাকলে হয়ত দ্বীন থেকে বিচ্যুত হতাম। জাহিলিয়াতে ডুবে যেতাম। হলে উঠে গনরুমে থাকতাম। কি কষ্ট!! ঘুমানোর কষ্ট। ভাল করে পিটটা রাখার ও জায়গা নেই। আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ আমার জন্য এটাই চেয়েছেন। আমার চারপাশের বন্ধুগুলো জাহিলিয়াতে ডুবে আছে, তাদের মত নই বলে আমি গোঁড়া, অনেকের কাছে আনস্মার্ট, গায়ে এক তোলা মাংশ নেই, দেখতে ভাল নই, চারপাশে তিন চারটা মেয়ে নিয়ে ক্যাম্পাসে হাঁটতে পারিনা। আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ আমার জন্য এটাই ফয়সালা করেছেন। আমি স্বপ্ন দেখতে পারি, আমি চিন্তা করতে পারি, কোনটা ভাল কোনটা খারাপ বুঝতে পারি, আবেগের বশে ভুলটা করে ফেললে ক্ষমা চাইতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্__ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর।

আমরা আমাদের বাবা মায়েদের কাছে কৃতজ্ঞ। সেটা নতুন করে বলার কিছু নেই। সেই বিষয়টা এখানে নয় অন্য কোন দিন আলাদা একটা লেখায় লিখব ইনশাআল্লাহ। আমার এক ফুফাত ভাই ডাক্তার। আমাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে আমাদের খুব একটা যাওয়া আসা নেই। কেবল কোন কারণ দেখা দিলেই যাওয়া আসা হয়। আর আমার ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমরা যে দুই ভাই এক বোন এটা আমার সব আত্মীয় স্বজন জানে কিনা। আমার এক ঘরে স্বভাবের জন্য অনেকে আমাকে চিনেই না। কিন্তু এক আশ্চর্য কারণে আমার ফুফাত ভাইয়ের স্ত্রী আমাকে অত্যধিক পছন্দ করেন। আমার এই ছোট্ট জীবনে আমি যে কয়জন মানুষের কাছে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞ তার একজন এই মহিলা। স্কুল জীবনে আমার খাতা কলমের সবকিছু উনিই দিয়েছেন। কলেজে উঠার আগ পর্যন্ত আমার পরনের প্রায় কাপড়ই উনার দেওয়া। আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলে উনি আমার জন্য হরলিক্স, কেক, বিস্কিট এসব আলাদা করে পাঠাতেন আর বলতেন, খবরদার আর কাউকে দিবি না শুধু তুই খাবি!! আমার হাত ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি, এমনকি চায়ের মগটা পর্যন্ত উনি আমার জন্য পাঠাতেন। যতবার উনার সাথে দেখা হয় আমার হাতে পাঁচশো এক হাজার টাকা গুঁজে দেন। আমার কোন পরীক্ষার রেজাল্ট দিলে সবার আগে উনি ফোন করেন। এই লেখাটা হয়ত উনি কোনদিনও দেখতে পাবেন না। কিন্তু আমাদের অভাবের সংসারে উনি আমার খরচের অনেকটাই বহন করেছেন এটার জন্য নয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে উনি সেই ছোটবেলা থেকে আমার জন্য যে ভালবাসা দেখিয়েছেন, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, আমার সাফল্যে আনন্দিত হয়েছেন, ভুল করলে বকা দিয়েছেন এই জন্যই আমি উনাকে কত্ত পছন্দ করি। এই মহিলার দিকে আমি কোনদিন চোখ তুলে তাকিয়ে কথা বলিনি। আমার মায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ আমার আছে উনার প্রতি সেটা কোন অংশে কম নয়। কেন?? কারণ কৃতজ্ঞতা! আমার অন্তর তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে শ্রদ্ধাবোধ এসেছে, ভালবাসা এসেছে। আল্লাহর কাছে চোখ বন্ধ করে দুই হাত তুললে

যে কয়জনের কথা চোখে ভাসে উনি তার একজন। মানুষ যখন কৃতজ্ঞ হয় সেই কৃতজ্ঞতা থেকে আরও অনেক সুন্দর কিছু উতসরিত হয়।

আমার গ্রামে পাড়ার এক বড় চাচি আছেন তার বাড়ীতে যদি কোনদিন গরুর মাংশ রান্না হত উনি নিজে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। যতক্ষণ আমার খাওয়া না হয় আমার পাশে বসে থাকতেন। ছোটবেলায় সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসার কিছুই বুঝিনি। আজ কৃতজ্ঞতা নিয়ে লিখতে বসে উনার কথা মনে পড়ছে। এই মহিলাকে একদিন নিজের টাকায় গরুর মাংস খাওয়ানোর ইচ্ছা। কিংবা আল্লাহ যদি আমাদের দুইজনকে জান্নাতে মিলিয়ে দেন তবে আমার ঘরে উনাকে গরুর মাংসের দাওয়াত দেব। জান্নাতের সেই দাওয়াত নিশ্চয় এই পৃথিবীতে আমার প্রতি উনার নিঃস্বার্থ ভালবাসার অসাধারণ প্রতিদান হবে। আমি ঢাকায় এসে যে পরিবারটির ভালবাসা পেয়েছি সেখান থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতা আসে। আমার সেই চাচা আমাকে নিজের সন্তানের মত দেখেছেন। ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তির টাকা দিয়েছেন। যখন যে কোন মুহূর্তে, যে কোন বিপদে উনারা আমার পাশে থাকেন। এখন যেমন আছেন। এই যে ফেসবুকে আরাম করে নোট লিখছি, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ অনেক মানুষের ভালবাসা আমাকে দিয়েছেন। সেই ভালবাসা ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই এখন যখন একটু দ্বীন বুঝেছি মহান রবের কাছেই প্রতিদিন দোয়া করি তিনি যেন তাদের উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমি সবার কাছেই কৃতজ্ঞ আর সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ মহান আল্লাহ্‌র কাছে যিনি এই কৃতজ্ঞতার উত্তম প্রিতিদান দিতে সক্ষম।

আপনি যে মুসলিম বিশ্বাস করেন মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব। যে বিশ্বাস করেন সবকিছুর ফয়সালাদানকারি মহান আল্লাহ আপনি তার উপর আস্থা রাখবেন, বিপদে ধৈর্য ধারণ করবেন। ভাল কিছু না পেলে ধরে নেবেন এর চেয়ে ভাল কিছুর জন্যই আল্লাহ আপনাকে আখিরাতে উপস্থিত করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। যার পরীক্ষা যত কঠিন তার পুরষ্কারও তত বেশী, তত উত্তম। মহান রবের দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন, আখিরাতের দিকেই আমাদের দৃষ্টি। অনন্ত জান্নাতের আশা বুকে লালন করেই আমাদের বেঁচে থাকা। থাকুক না এপারের অপূর্ণটা, ব্যর্থতা, আক্ষেপ। ওপারে আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নেব। আবু যার গিফারি (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী। একদিন এক ব্যক্তি আবু যারের নিকট এল। সে তার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল। গৃহস্থালির কোন সামগ্রী দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো,

___'আবু যার, আপনার সামান পত্র কোথায়?'

আবু যার উত্তর দিলেন, ____ 'আখিরাতে আমার একটি বাড়ী আছে। আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিই'।

আলহামদুলিল্লাহ্। আমি ভাল আছি, সুখে আছি। অন্য অনেকের চেয়ে আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। অনেক ভাল রেখেছেন। অনেকের মধ্য থেকে আমাকে এই বুঝ দিয়েছেন আমরা মুসলিমরা আখিরাতের জন্য বাঁচি। আলহামদুলিল্লাহ্।

সেমিস্টারের সি জি পি এ খুব একটা ভাল না। আল্লাহ আমার জন্য এটাই চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ্। কি খাব, কিম পরবো, কি চাকরী করব, কত বেতন পাব এসব ভাবি না। আল্লাহ আমার জন্য যা দেবেন সেটাই। যদি কিছু নাই দেন তারপরও আলহামদুলিল্লাহ্, আখিরাতে চেয়ে নেব। সবাই আমাকে ভালবাসবে না। কেউ ঘৃণা করবে, কেউ পাত্তা দেবে না, কেউ অপমান করবে, কেউ ভুল বুঝবে। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন কিন্তু আমি সবাইকে আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসাব আল্লাহ্‌র জন্যই ঘৃণা করব। আমি ওপারের জন্য বাঁচি। আকাশের ওপারে আমার একটি বাড়ী আছে। লাল নীল হিরার বাড়ী। আকাশের ওপারে আমার সাথী আছে, জানতেও চাইনা সে কেমন, আল্লাহ ভাল

জানেন। আকাশের ওপারে আমার রব আছে। তার জন্যই আমার এই অশ্রুসিক্ত অপেক্ষা। আলহামদুলিল্লাহ্। আলহামদুলিল্লাহ্ for everything……

বিনীত

অবুঝ বালক

সম্পর্কের বেড়াজালে আমরা

September 2014

Courtesy : Sister Kitty Paws

যখন ক্লাস সেভেন-এইটে পড়তাম, দেখতাম স্কুলের বেশিরভাগ মেয়েদের মধ্যে 'ছেলে' নামক একটা কৌতুহল কাজ করত। তাদের সাথে ফ্রেন্ডশীপ করা, কথাবলা যেন বিশাল ব্যাপার ছিল। এটা এজন্য আমার চারপাশে বেশি দেখা যেত কেননা আমি শুধুমাত্র মেয়েদের স্কুলে পড়ালেখা করেছি । তখন সেই কৌতুহলটাকে অনেকেই 'বন্ধুত্ব' নামের আড়ালে রাখত; প্রেম-ভালোবাসাতে এগিয়ে আনত না কেননা স্কুল পড়ুয়া মেয়েগুলো যে তখনও অনেক ছোট-তাদের মধ্যে বাবা-মার প্রতি ভয় তখনও বিদ্যমান ছিল।

কলেজে ওঠার পর মোটামুটি সবার কাছেই মোবাইল ফোন এসে পড়েছে। তাই তখন 'অই দোস্ত' থেকে 'এই তুমি' হতে বেশি বেগ পেতে হত না কাউকে। ছেলেরাই বলা যায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। বিশেষত বিভিন্ন স্কুলের সুন্দরী মেয়েদের তালিকা এবং তাদের ফোন নম্বর মোটামুটি সবার ফোন-লিস্টেই থাকত। 'নিশিথে কল কোইরো আমার ফোনে' গানটা খুব করে জাগিয়ে দিয়েছিল এই কচি প্রাণগুলোকে। unknown number থেকে কল করে কিছু এলোমেলো কথা আর তারপর অপ্রয়োজনীয় আলাপকে প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্ছনীয় করে তোলা শুরু হতে থাকে। বেশিদিন লাগে না 'ছেলে-মেয়েগুলো'র এই অস্বচ্ছ বন্ধুত্ব তৈরী হতে। এভাবে খুব জলদি তা প্রেমে গড়িয়ে পড়ে।

কচি প্রাণের ব্যাপার বলে কথা। আজ একে ভাললাগে তো কাল অন্যজনকে। এভাবে নিত্যদিনের আবেগ গড়িয়ে গড়িয়ে কখনো কান্নায় রূপ নেয়, কখনো আত্মহত্যায়। প্রেমে পড়ে ভোগেনি, এমন মানুষ দুর্লভ।

যাই হোক, ইসলাম এসব ঝামেলাপূর্ণ দোটানা সম্পর্ক থেকে একেবারেই দূরে। এজন্য টিটকারীমূলক হলেও, নাটকে যে দেখায় 'গ্রামের মোল্লারা ছেলে-মেয়েদের ইটিশ-পিটিশ দেখলে শালিস বসায়' তা ষোলআনাই সঠিক। নতুন প্রজন্মের কাছে 'দাড়িওয়ালা হুজুরদের' কট্টরপন্থি সেকেলে বলে উপস্থাপন করা হলেও এই হুজুরগুলো কিন্তু ইসলামের নিষেধাজ্ঞাকেই তুলে ধরে।

হ্যাঁ, ইসলাম ছেলেমেদের অস্বচ্ছ সকল প্রকার সম্পর্ককেই নিষেধ করে।

হে বনী-আদম আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতেরঅন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। [সুরা আরাফ (৭), ২৬]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। [সুরা নূর (২৪), ২১]

তাই যদিও বা আমরা বোরকা পরি কিংবা দাড়ি-টুপি লাগিয়ে টাখনুর উপর প্যান্ট পরি, তাতে কিন্তু ইসলামের এই বিধান বদলে যাবে না। ছেলে-মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক-এর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র ইসলামিক বেশ-ভূষা বিহীন মানুষদের জন্যই নয়, সকলের জন্যই নিষিদ্ধ। আপাতঃ দৃষ্টিতে খুব স্বাভাবিক লাগলেও এটি সত্যি যে যখন একজন বোরকা পরিহিত বোন আরেকজন ছেলের সাথে হাসি ঠাট্টায় মত্ত হয়ে উঠে, তখন তা একদম সেই সাধারণ ছেলে-মেয়েগুলোর মতই ব্যাপার হয়ে যায়।

আমরা যারা ইসলামে আসি, তখন প্রায়ই শয়তানের ওয়াস-ওয়াসায় ইসলামটাকে 'modernize' করে ফেলতে চেষ্টা করি। ব্যাপারটা আসলে modernization নয়, ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হালকা করে নেয়া যার ফলে হাজার ফিৎনার দরজা খুলে যায়।

যেমন করে দুজন ছেলে-মেয়ের closeness বন্ধুত্ব কিংবা প্রেমে গড়ায়, তেমনি করেই দুজন ইসলামিক mind এর মানুষের মধ্যে এরকম closeness তাদের একজনকে আরেকজনের প্রতি আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের ধরণ খানিকটা ভিন্ন হয় কেবলমাত্র। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন, "শয়তান একজন দাড়িওয়ালা ছেলেরকাছে বোরকা পরা মেয়ে সেজেই আসে, আর একজন বোরকা পরা মেয়ের কাছে একজন দাড়িওয়ালা ছেলে সেজেই আসে"।

আজকাল young generation এর ছেলেমেয়েগুলোর interaction অনেকটাই এরকম পর্যায়ের হয়ে গিয়েছে। ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে একই মঞ্চে কাজ করার জন্য যেন তারা আর অন্য কোন option খুঁজে পাচ্ছে না। একজন দ্বীনি ভাই এর বুঝি মন নেই? সে বুঝি মানুষ নয়? আর একজন দ্বীনি বোনের বুঝি মন নেই? সে বুঝি মানুষ নয়? এভাবে দিনের পর দিন একই সাথে কাজ করতে করতে কি কারো দুর্বলতা জন্মায় না ? ইসলাম চর্চা করা মানে এই নয় যে একজন মানুষ তার মনের দুর্বলতাকে বিলীন করে ফেলবে, বরং ইসলামে আসা মানুষেরা সেই দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকতে এধরনের সন্দেহপূর্ণ সম্পর্ককেই এড়িয়ে যায়।

অনেকেই এই কথাগুলোকে নিয়ে বিশাল তর্ক জুড়ে দিতেই পারে। তাতে সমস্যা নেই। তবে শুধু এটাই বলব,নারী-পুরুষের সম্পর্ক যদি এতটাই হালকা হত, তাহলে ইসলামে নন-মাহরামদের সাথে অপ্রয়োজনীয় বার্তালাপে নিষেধাজ্ঞা কেন? কেন পর-পুরুষের সাথে ঘুরে বেড়ানো-একাকি থাকা নিষিদ্ধ?

আমার ভার্সিটির একজন 'বন্ধু'র আমার সাথে ক্যান্টিনে আড্ডা দেয়াটা কি ইসলামের বিপক্ষে নয়? তাহলে কিভাবে আমি একজন 'দ্বীনি ভাই/বোন' এর সাথে একই জায়গায়/কামরায় কিংবা ফোনে আলাপ চালিয়ে যেতে পারি?

সাধারণ ছেলে-মেয়েগুলো হয়তো কোন নায়িকা/নায়ক/সিনেমা/হালের ফ্যাশন ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে- আর আমাদের দ্বীনি ভাইবোনেরা হয়তো অমুক সাহাবী/অমুক লেকচার/অমুক webinar নিয়ে কথা বলে। তাই কথাবার্তার topic এ পরিবর্তন আনলেই চলবে না, আমাদের মধ্যে 'দ্বীনি ভাইবোন'দের অবাধ মেলামেশাটাও বন্ধ করতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আমাদের মধ্যে crush খাওয়ার একটা বদ-অভ্যাস প্রচলিত আছে। ছেলেরা তাদের কলেজ-ভার্সিটির mam দের উপর crushখায়, আর মেয়েরা খায় sir দের উপর। কিন্তু আমাদের দ্বীনি ভাই-বোনেরা ? তারা crush খায় দাঈ'দের উপর! তারা সেই দাঈদের লেকচার শুনে আর কল্পনা করে এরকম পাত্র যদি পেতাম, এরকম পাত্রী যদি পেতাম! এগুলো কোনভাবেই সুস্থ ইসলামিক কালচার হতে পারে না। কেননা একজন শেইখ বা দাঈ তো বিশাল সম্মানের পাত্র। আমরা যদি আমাদের শিক্ষক নিয়ে এরকম জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দেই, তাহলে পড়ালেখার কী হবে? ঠিক তেমনি, ইসলামকে এমনভাবেই আকড়ে ধরতে হবে, যেন আমরা সম্পর্কগুলোর মধ্যে গুলিয়ে না ফেলি, সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি।

পরিশেষে বলতে চাই, শয়তান তার কাজে আমাদের থেকেও বেশি অধ্যবসায়ী। আমরা যত সহজে হাল ছেড়ে দেই, শয়তান তা করে না। সে ভালো কাজের মধ্যে মন্দ দেখিয়ে থামিয়ে দিতে চায় আর মন্দের মধ্যে ভালো দেখিয়ে তা চালু রাখতে চায়। তাই 'ছেলে-মেয়ে'র জটিল সম্পর্ক নিয়ে যেন আমরা আরেকটু ভাবি। ইসলামে আমাদের পদার্পণ যেন কেবলমাত্র পোষাকেই সীমাবদ্ধ না থাকে, আমরা যেন আমাদের বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সাথে 'সখ্যতা' গড়ে না ফেলি। কারণ আজকের এই সখ্যতা ডেকে আনতে পারে বড় বড় ফিৎনা- নিজের আবেগের উপর ১০০% confidence থাকলেও।

শুষ্ক নিয়মের বেড়াজালে : কিছু অর্থহীন সামাজিক রীতি

21 October 2014

লেখকঃ নায়লা নুযহাত

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বইয়ে অনেক পড়েছি সেকথা। আর জীবন থেকেও দেখেছি আমরা সবাই। সমাজটা মানুষ দিয়েই তৈরি। তবু এই সমাজের "হয়" আর "নয়"গুলো কেমন যেন মানুষেরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মানুষের সমাজে মানুষের দ্বারা তৈরি নিয়ম কানুনগুলো অনেকসময় মানুষেরই গলায় ফাঁস হয়ে চেপে বসে। যেমন কিনা মেয়ের বিয়ে দেয়ার সময়ের "হয়-নয়" গুলো। আবার ঈদ- অনুষ্ঠান ইত্যাদির "না করলে তো চলে না"গুলো! আর কিছু কিছু সৌজন্য আছে যা এককালে অনেক মমতার থেকে সৃষ্টি হলেও এখন অনেক ক্ষেত্রেই শুষ্ক নিয়মে পরিণত হয়েছে। এগুলো নিয়ে কেউ তেমন একটা ভাবে না কারণ মেয়ের বিয়ে দেয়ার মত শিরদাঁড়া ভাঙ্গা চাপ এগুলো সৃষ্টি করে না! আবার, অনেকের ক্ষেত্রে, করেও!

১। মানুষের বাসায় গেলেই কিছু একটা নিয়ে যেতেই হবে-

সারাজীবন দেখেছি মানুষের বাসায় দাওয়াতে যাওয়ার সময় কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হয়। কোনদিন সেটাকে বোঝা মনে হয়নি। তারপরও একবার হঠাতই টের পেলাম, অনেকেই আগে আমাদের বাসায় আসতেন, এখন আর আসেন না! আর তার কিছুদিন পর আমার বাবা মা কে আলোচনা করতে শুনলাম যে "এসব আসলেই বন্ধ করা উচিৎ।" কিসের কথা বলছেন? না, মানুষের বাসায় গেলেই কিছু একটা নিয়ে যেতেই হবে, এই নিয়মের কথা। ছোট ছিলাম, খুব লজ্জা লাগত এভাবে কারুর বাসায় যেতে! সবাই হয়ত হাসতই মনে মনে, যখন আমার বাবা বুঝিয়ে বলতেন যে কেন আমরা খালি হাতে গিয়েছি, আর আমরা চাই অন্যেরাও খালি হাতে আসুক! কিন্তু, তার অল্প কদিন পর, সেই হঠাৎ আমাদের বাসায় আসা বন্ধ করা মানুষগুলো আবার আসা শুরু করলেন! অবস্থা পড়ে যাওয়াতে তাঁরা আর সামাজিকতা বজায় রাখতে পারছিলেন না। যখন দেখেছেন সেই নিয়ম পালনটা আমরাই ছেড়ে দিয়েছি, তখন তাঁরা নিশ্চিন্তে আসা যাওয়া শুরু করলেন!

ব্যাপারটা কতখানি পীড়াদায়ক হতে পারে আমি বুঝেছিলাম প্রথমবার সৌদি আরবে এসে! প্রায় প্রতিদিনই দাওয়াত! সবার বাসায় হাতে করে কিছু নিয়ে যাওয়া তো তখনকার অবস্থায় সম্ভব ছিল না! শুনলাম ওখানে নাকি অলিখিত নিয়ম আছে-- স্টুডেন্টরা কারুর বাসার দাওয়াতে যাওয়ার সময় হাতে করে কিছু নিবে না! ফ্যাকাল্টি যারা ছিলেন, সবাই একসময় কষ্ট করে স্টুডেন্ট লাইফ পার করেছেন। তাঁরা তাই বুঝতেন। তখন বুঝেছিলাম ব্যাপারটা কেবল আমাদের না, প্রতিটা স্টুডেন্টের পরিবারের জন্যই অনেক সবস্তির ছিল। হ্যাঁ, তারপরও আমরা নিয়ে যেতাম কিছু কিছু সময়ে, কিন্তু কোনও দায় বদ্ধতা ছিল না! আর মিষ্টিই নিতে হবে এমন কোনও ব্যাপারও ছিল না-- কারুর জন্য ভালবাসা দেখানোর জন্য এক বয়াম আচার, অথবা শুঁটকি ভর্তাই যথেষ্ট ছিল!!

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরছি। রাস্তা পার হওয়ার সময় আমার বাবার একজন বন্ধুর স্ত্রীর সাথে দেখা! তিনি ফিরছিলেন স্কুলে পড়িয়ে। আমি বললাম, "বাসায় চলুন!" এই চাচী আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। আমার অনুরোধ উপেক্ষা করাটা তাঁর জন্য মুশকিল। তবুও বল্লেন,"আজকে না যাই?" আমি কিছুতেই যখন তাঁকে ছাড়ছি না, তখন বললেন, "তোর ছোট ভাতিজাটা হয়েছে, আমি তাঁকে দেখতেও আসিনি, এখন খালি হাতে যাবো...?!" আমিও যেন আকাশ থেকে পড়লাম! সামাজিক ব্যবধান বুঝি এভাবেই তৈরি হয়! একসময় এই চাচীই কত এসেছেন আমাদের বাসায়, রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে বসে কত গল্প করেছেন আমার মায়ের সাথে। আমি তাঁদের আর্থিক সমস্যার কথা জানি, আজকে তাঁর অস্বস্তি লাগছে খালি হাতে নতুন বাচ্চা দেখতে, তাই তিনি বাসায় আসতে সঙ্কোচ বোধ করছেন!! আমি জোর করে সেদিন তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মা তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "যখন মনে চায় আসবে, কিছু আনতে হবে তোমার আমার বাসায়?? আমিও কি খালি হাতে যাই না??" সেদিন মনে হয়েছিলো ভাগ্যিস আমরাও ওসব "করতে হবে" ব্যাপারগুলো জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছি, তাই অমন করে একজনকে আশ্বস্ত করতে পারছি!

২। খালি বাটি ফেরত দেয়া

কারুর বাসা থেকে কিছু খাবার আসলে বাটিটা আমরা ভরে ফেরত দেই। একজন ছিলেন, সবাইকে অনুরোধ করতেন এমনটা না করার। কারণ তিনি খুব ডিপ্রেশানে ভোগেন। তাঁর অসুখটা বাইরে থেকে মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু

তাঁর কিছু করতে খুব কষ্ট হয়। হ্যাঁ, তিনিও করেন, যখন সুবিধা, তখন করেন। কিন্তু মানুষের বাটি ভরে ফেরত দিতেই হবে, এই বোঝা বহন করা তাঁর মানসিক অবস্থায় সম্ভব না! আমিও তখন ভেবেছি, সতিই তো-- শুধু ডিপ্রেশান কেন, অনেক কারণেই কেউ না পারতে পারেন। এসব যখন নিয়ম হয়ে যায়, তখন তো মুশকিল! ঠিক কতখানি মুশকিল তা আমি বুঝেছিলাম একজনের কথায়। তিনি বলছিলেন, এসব ফ্যামিলি থেকে আসতে হয়। ফ্যামিলিতে যদি কেউ দেখে যে বাবা মায়েরা এসব করছেন, তাহলেই না করতে শিখবে! আমি আঁতকে উঠেছিলাম। আমিও তো পরিবারে অনেক কিছুই দেখেছি। কিন্তু আমি কোনও সামাজিকতা রক্ষায় ভুল করলেই কি বংশের দোষ উঠে আসবে??

তখন আমি শুরু করেছিলাম disposable জিনিসে মানুষের বাসায় খাবার দেয়া। বাটি ফেরত দেয়ার দায়বদ্ধতা নেই! যখন মনে চাইবে, তখন কিছু দিলে সে ভিন্ন কথা। আর হ্যাঁ, লজ্জা লাগলেও, আমিও খালি বাটিই ফেরত দেই। লজ্জাটা তো আসে অভ্যাস থেকে। আসলে তো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই! আমার যখন মনে চাইবে, আমিও নিশ্চয়ই দিবো!

৩। উপহার দেয়ার মাঝে স্ট্যাটাস

মেয়ের মায়ের সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী মেয়ের বিয়েতে আসবেন না। অথচ তিনি আজীবন মেয়েটিকে ভালবেসেছেন নিজের মেয়ের মত করেই। তাঁদের দুই বান্ধবীর দুই মেয়ে সমবয়সী এবং ফ্রেন্ড! বান্ধবীকে প্রশ্ন করাতে তিনি বুঝিয়ে বললেন, "আমি কী দিবো তোর মেয়েকে? আমি জানি তুই কিছুই মনে করবি না, তবু এত মানুষ আসবে, আমি কিছুই দিত পারবো না, কিভাবে যাই?" তাঁকে বার বার আশ্বস্ত করা হল যে বিয়েতে গিফট আনতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি সেই বিয়েতে যান এবং পরবর্তীতে বলেন যে জীবনে প্রথম একটি বিয়েতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে গিয়েছেন, তাঁর ভাবতে হয়নি যে কী নিতে হবে!

আরেকটি বিয়েবাড়ি। বিয়ের পরের দিন সকাল বেলা বর উঠে দেখেন ড্রয়িং রুমে কিসের যেন লিস্ট পড়ে আছে! দেখে তিনি রাগে তা কুটি কুটি করে ছিঁড়লেন! কী ছিল ওতে? কে বিয়েতে কী গিফট দিয়েছে তার লিস্ট! কেন? কারণ যে যা দিয়েছেন, তার সমমূল্যের জিনিস তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিয়েতেও দিতে হবে যে! সাধ্য থাকুক, সাধ্য না থাকুক, দিতেই হবে! আর এই চক্র চলতেই থাকবে!

একবার একজন আমাকে রুপার একজোড়া কানের দুল গিফট করেছিলেন। খুব সুন্দর দুল। আমি ঠিক করেছিলাম সেটা আমার একজন খুব কাছের বান্ধবীর বিয়েতে গিফট করবো। কেবল যে সে খুব কাছের তা না, তার বরও বহু বছরের পরিচিত! একজন আমাকে বললেন, "একজনের বিয়েতে সামান্য একজোড়া রুপার দুল উপহার দিবে, স্ট্যাটাস নাই?" তিনি বয়সে বড় হলেও সেদিন আমি উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি যা, সেটাই আমার স্ট্যাটাস। তাছাড়া, ধার করে সোনার দুল উপহার দেয়ার মাঝে আমি তো কোনও স্ট্যাটাস দেখছি না!

বলতে থাকলে, এমন টুক টাক অনেক কিছু বলা যাবে, যা আমরা প্রতিনিয়তই করি, অন্যের ওপর তার কী প্রভাব পড়ে তা না ভেবেই! ধরুন কারুর সামর্থ্য আছে যে ২০০০ টাকার মিষ্টি নিয়ে যাবে কারুর বাসায় দাওয়াত খেতে। যার বাসায় যাচ্ছেন, তার জন্য হয়ত ৫০০ টাকার মিষ্টি কোথাও নেয়াটা সাধ্যের অতিরিক্ত! যিনি নিলেন ২০০০ টাকার মিষ্টি, তার উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করা না, নিজের লেভেল অনুযায়ী presentable কিছু নেয়া। কিন্তু যার জন্য নিলেন, তাঁকে যদি দাওয়াত করেন ভবিষ্যতে, তিনি হয়ত "যোগ্য" কিছু হাতে করে নিতে হবে সেই দুশ্চিন্তাতেই দাওয়াতে যাবেন না! সবাই চায় ভালো কিছু নিতে, নিজের সম্মান বজায় রাখতে। কিন্তু সম্মান যখন সাধ্যের বাইরে মূল্যবান হয়ে ওঠে, তখন কী করবে?

খেয়াল করে দেখলেই দেখা যাবে, এভাবে অনেক কাছের মানুষই দূরে চলে যায়! অন্যের কথা বাদ দেই, "নিতেই হবে" ব্যাপারটা কি আমাদের নিজেদের কখনোই বোঝা মনে হয় না? আজকাল তো ৫০০ টাকার কমে মিষ্টিই নেয়া যায় না কোথাও! খুব ভালোবেসে নিলে ভিন্ন কথা, কিন্তু নিতেই হবে ভেবে নিলে চাপ কি পড়ে না? একটা ছেলে যখন বিয়ে করে, স্বাভাবিক ভাবেই জীবনের শুরুতে হাতে একগাদা টাকা থাকে না। তখন প্রতি দাওয়াতে তাকে দই মিষ্টি নিতে হবে--- এটা যে তার ওপর কত বড় বোঝা--সেকথা কি কারুর মনে আসে? বরং কোথাও স্ট্যান্ডার্ড মত কিছু না নিলে আড়ালে কত কথা হবে!

হ্যাঁ, হয়ত বলবেন ভালোবেসে কেউ কারুর জন্য কিছু নিলে কী সমস্যা? নাহ, কোনও সমস্যা নেই। কেবল ভালবাসার সংজ্ঞাটা যে কিছু নিবে, তার ওপর ছেড়ে দেয়াই কি ভালো না? সেটা কি করা হয়? সমাজ ঠিক করে কার বাড়িতে কী নেয়াটা স্ট্যান্ডার্ড! সমাজ! ফলে, একসময় "তোমার সমাজে তুমি থাকো, আমার সমাজে আমি" -- এই বিভক্তিটা তৈরি হয়! যাদের সামর্থ্য আছে, তারা কিন্তু এই নিয়মটা ভাংতে পারে খুব সহজে! কারণ, দুনিয়ার হিসাবে তারাই সমাজের মাথা!

আজকে সামর্থ্য থাকার পরও যদি কেউ খালি হাতে দাওয়াতে যান, তো সেটা হয়ে থাকবে এক অসাধারণ উদাহরণ! সমালোচনা করবে লোকে। করুক। কিন্তু কালকে তাঁর দাওয়াতে স্বল্প আয়ের একটি পরিবার যেতে পারবে মাথা উঁচু করে!! আজকে সুস্থ থেকেও যদি আমি মানুষের বাটি খালিই ফেরত দেই, কালকে আরেকজন অসুস্থ ভাবী আমাকে বলতে পারবেন, ভাই আমি তোমার বাটিটা খালিই পাঠালাম, আমার শরীরটা ভালো নেই! আজকে সামর্থ্য থাকার পরও যদি আমরা বিয়ে বাড়িতে খালি হাতে যাই, কাল আমাদের ছেলে মেয়েদের বিয়েতে একজন হয়ত হাল্কা মন নিয়ে আসবেন!

আবারও, আমি বলছি না আমরা উপহারের আদান প্রদান বন্ধ করে দিবো! মনে চাইলেও কারুর জন্য কিছু করবো না! একশো বার করবো! কিন্তু, কোনকিছুকে বাঁধা ধরা নিয়ম বানিয়ে করবো না! প্রথা বানিয়ে ফেলবো না! আমাদের কাজ যেন অন্যের জীবনটা জটিল করে না দেয়, সেদিকে একটু খেয়াল রাখবো! নিয়ম না বানিয়েও ভালবাসার আদান প্রদান সম্ভব! আমরা সেটার জন্য চেষ্টা করতে পারি!

হয়ত কথাগুলো খুব ছোট মানসিকতা তুলে ধরল। জানি না। কিন্তু আমি দেখেছি মানুষকে নিয়ম রক্ষা করতে যেয়ে কষ্ট করতে, কষ্ট পেতে। দেখেছি কিভাবে আত্মীয় আত্মিয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যায় ভালবাসার মূল্য পরিশোধ

করার সামর্থ্য না থাকার কারণে! তাই মনে হয়েছে, দিন বদলের সময় এসেছে! জীবনটা সুন্দর! নিজের জন্যে হোক বা অন্যের জন্য, অযথা সবকিছু কঠিন করে দেয়ার তো কোনও প্রয়োজন নেই! নিয়ম-প্রথা এসবের চেয়ে ভালবাসার মানুষগুলো যে অনেক, অনেক দামী! অনেক দামী সেই সম্পর্কগুলো! ইনশাআল্লাহ আমরা সম্পর্ক সুন্দর রাখতে মানুষের জন্য করবো-- শুষ্ক নিয়ম বজায় রাখতে না!! আর না!

আত্মহত্যা !!

18 May 2015

লেখকঃ আরমান ইবনে সোলাইমান

.....বাসে যাচ্ছি,পাশের সিটে দু'জন প্রায় আমারই বয়সী ছেলে বসা। একজন কাদছে আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছে তার পাশের ছেলেটিকে। ব্যপার বোঝার জন্য কান খাড়া করে গভীর মনযোগ দিয়ে কথা বোঝার চেষ্টা চালালাম। রহস্য উদঘাটন হল কিছুক্ষনের মধ্যেই। তার কোন এক বন্ধু আত্মহত্যা করেছে কোন এক মেয়ের কারনে। কিছুক্ষনের মাঝে আরও জানা গেল মেয়ের চরিত্রও নাকি বিশেষ সুবিধার না! ঝামেলা আছে চরিত্রে। যাই হোক, সেদিনের পর থেকে আমার মাথায় বেশ কিছু ব্যপার ছুটোছুটি করছে। মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ থাকলে তাদের ব্যপারগুলো জিজ্ঞেস করে দেখা যেত,

আচ্ছা ভাই,আপনার কি মনে পড়ে? আপনার বাবা প্রতিদিন সকাল ৮ টায় বাড়ি থেকে বের হয়ে রাত ১০ টায় বাসে ঝুলে ঘামে ভেজা চপচপা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে ফিরতেন?কোন ঈদে কি দেখেছেন আপনার বাবা নিজেই জামা-কাপড় কিনে বসে আছেন,আপনাদের জন্য কিছু নেই? আপনার মাকে কি কখনো দেখেছিলেন আপনার পরিক্ষার আগের রাতে অযথা গভীর উদ্বেগ নিয়ে আপনার পড়ার টেবিলের সামনে বসে থাকতে,আর কিছুক্ষন পর পর জিজ্ঞেস করতে, কলম-এডমিট কার্ড সবকিছু নিয়েছিস তো ঠিকমত ?

যখন আপনি বিছানায় মুত্র বিসর্জন করতেন তখন আপনার ভেজা কাথাটা এই পৃথিবীর অন্য কোন মানুষ কি কোনদিন পেচিয়ে শুয়ে ছিল?

শুনুন ভাই,এই যে আপনার এক ফুট উচ্চতার শরীরটা আজ ৬ ফুটের কাছাকাছি চলে এসেছে। শরীরে বইছে ৫ লিটার রক্ত, সেটা কিন্তু আপনার চেস্টায় তৈরি হয়নি। আপনার বাবা-মায়ের দিন রাত ঘাম ঝড়ানো পরিশ্রম আর আপনার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়ই সেটা তৈরি হয়েছে। সুতরাং, আপনি যে আত্মহত্যা করলেন,আপনার বাবা-মার অনুমতি নেয়া হয়েছে ?

এই শরীরটাতে আপনার চাইতে বেশি অধিকার তাদের। শরীরের প্রতিটি রক্তকনা আপনার বাবার কেনা টাকার ভাত খেয়ে তৈরি হয়েছে। সুতরাং, আপনার শরীরটাতে একটা আচড় দেবার আগে আপনার বাবা-মায়ের কাছে একটিবার জিজ্ঞেস করে দেখুন বাবা আমি আমার হাতটা একটু কাটব তুমি কি রাজি?অনুমতি নিয়ে এরপর কাজে ঝাপিয়ে পড়লে ভালো হয়।

যে নারীর জন্য আপনি আজ মারা গেলেন সে নারীকে শুধু মাত্র একটি রাত আপনার পেশাব করা কাথা দিয়ে দেখতেন, তিনি সেটা জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে পারেন কিনা। তাহলেই হয়তো বুঝতে পারতেন আপনাকে যে নারী জন্ম দিয়েছেন তার এবং আপনি যে নারীকে ভালবাসেন বলে দাবি করছেন তার ভালবাসার মধ্যকার পার্থক্য। যে মানুষ নিজের বাবা-মাকে ভালবাসতে পারেনি,তার বাবা মায়ের ভালবাসা বুঝতে পারেনি সে কোনদিন কোন,অবস্থাতেই অন্য কাউকে ভালবাসতে পারেনা। এটা কোনভাবেই ভালবাসা নয়।

বছর ২ পরিচিত একটি মেয়ের জন্য আপনার ২৫ বছরের পরিচিত মা- বাবাকে কষ্ট দিতে পারেন আবার বলেন আমি মহান প্রেমিক ? ভালবেসে দুনিয়া উলটাইয়া ফেলাইসি? শুনে রাখুন আপনি একজন ব্যর্থ মানুষ এই পৃথিবীতেও যেমনি ব্যর্থ, পরের জীবনেও তেমনি ব্যর্থ। ব্যর্থ! ব্যর্থ !ব্যর্থ! আপনি একজন Coward ছাড়া আর কিছুই না।

সম্পর্ক কেন ভেঙে যায়? – ইয়াসমিন মোজাহেদ

15 October 2014

অনুবাদকঃ মাসুদ শরীফ

আমার বয়স যখন ১৭, তখন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখছিলাম, আমি একটা মাসজিদের ভেতর বসে আছি। ছোট্ট এক মেয়ে কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলো তো, মানুষ কেন একজন আরেকজনকে ছেড়ে যায়?" প্রশ্নটা শুনে ভাবলাম, আরেহ! এটা তো আমারই প্রশ্ন; আমাকেই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে! পরে বুঝতে পেরেছিলাম প্রশ্নটা কেন আমাকে করা হয়েছিল।

মানুষের সাথে আমি খুব বেশি মিশে যেতাম। সম্পর্কগুলোর মায়ায় জড়িয়ে যেতাম।

ছোটবেলা থেকেই আমার মনমেজাজ ছিল অন্যরকম। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে তাদের বাবা-মা'রা যখন চলে যেত, ছেলেমেয়গুলো সহজেই সেটা সামলে উঠতে পারত। কিন্তু আমি কেন যেন পারতাম না। একবার চোখের পানির ফোয়ারা শুরু হলে সেটা যেন আর বাধ মানতে চাইত না। বড় হতে হতে চারপাশের সবকিছুর মায়ায় নিজেকে জড়িয়ে নিতে লাগলাম। ক্লাস ওয়ান থেকেই আমার মনে হচ্ছিল আমার একজন বান্ধবী দরকার। আরেকটু বড় হলাম। বান্ধবীদের সাথে এটা ওটা নিয়ে মাঝে মধ্যে ঝগড়া হতো, খুব খারাপ লাগত আমার। সবকিছুর মায়াতেই জড়িয়ে যেতাম: মানুষ, নতুন জায়গা, স্মরণীয় ঘটনা, ছবি, মুহূর্ত—এমনকি কোনো কাজের ফলাফলের সাথেও জড়িয়ে পড়তাম আমি। আমি যেভাবে চাইতাম, বা যেভাবে কল্পনা করতাম সেভাবে যদি না হতো, তাহলে কেমন যেন লাগত। হতাশায় ভেঙে পড়তাম। একবার পড়ে গেলে আর উঠে দাঁড়াতে পারতাম না। ভুলতে পারতাম না, ক্ষত আর শুকাত না। যেন একটা কাঁচের ফুলদানি। টেবিলের এক কোণায় রাখা। একবার ভেঙেছে তো আর জোড়া লাগার কোনো উপায় নেই।

কাঁচের তৈরি ফুলদানি, সে তো ভাঙবেই। একবার কেন বারবারই ভাঙবে। কিন্তু সমস্যা তো ফুলদানির নয়। এতবার ভাঙার পরও আমি যে বারবার ফুলদানিটা টেবিলের কোণায় রাখতাম, আসল সমস্যা তো এটাই। আমার চাওয়া-পাওয়া পূরণের জন্য অন্য মানুষগুলোর উপর, তাদের সাথে আমার সম্পর্কের উপর খুব বেশি নির্ভর করতাম। আমিই এসব সম্পর্ককে সুযোগ করে দিয়েছিলাম আমার সুখ-দুঃখকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। আমার চাহিদা, শূন্যতা পূরণ করার জন্য। আমাকে নিরাপত্তা আর আত্মমর্যাদাবোধ দেওয়ার জন্য। টেবিলের কোণায় ফুলদানি রেখে ওটা ভাঙার ব্যবস্থা যেভাবে আমি নিজের হাতে করে দিয়েছিলাম, ঠিক সেভাবে এসব সম্পর্কের উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করে আমি

নিজেই আমার হতাশার কবর খুঁড়েছি। ভাঙার জন্য আমি নিজেই আমাকে ঠেলে দিয়েছি। আর এসবের কী সুন্দর প্রতিদানই–না আমি পেয়েছি: একটা হতাশার পর আরেকটা হতাশা, একবার ভেঙে পড়ার পর আবার ভেঙে পড়া।

সম্পর্কগুলো ভেঙে পড়ার জন্য আমি মোটেও সেই মানুষগুলোকে, সেই সম্পর্কগুলোকে দায়ী করব না। কোণায় রাখলে ফুলদানি তো ভাঙবেই, এখানে ফুলদানির কী দোষ! গাছের ছোট ডালের উপর ভর করলেই হলো? ওটা কি আর আমার মতো কাউকে ধরে রাখতে পারে?

যদি সত্যিকার অর্থেই কেউ আমাদের আশ্রয় দিতে পারেন, তবে সেটা আল্লাহ ছাড়া আর কে। তিনি বলেছেন (ভাবার্থ), **"যারা মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহকে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বাস করেছে তারা এমন এক বিশ্বস্ত হাত ধরেছে, যেটা কখনো ভাঙবার নয়। আল্লাহ তো সব শোনেন, সব জানেন।"** (কুরআন ২:২৫৬) খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা আছে এই আয়াতে: কেবল একটি হাতলই আছে যেটা কক্ষনো ভাঙে না। কেবল একটি জায়গায়ই আছে যেখানে আমরা আমাদের সব নির্ভরতাকে ছেড়ে দিতে পারি। কেবল একটি সম্পর্কই আছে যেটা বলে দিতে পারে আমাদের প্রকৃত আত্ম–মর্যাদাবোধ কীসে। কেবল সেই সম্পর্ক থেকেই আমরা আমাদের জীবনের চূড়ান্ত সুখ, পূর্ণতা ও নিরাপত্তা পেতে পারি। কোন সেই সম্পর্ক? সেই সম্পর্ক হচ্ছে মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক।

আর আমরা কিনা সেগুলো খুঁজে ফিরি এই দুনিয়াতে। কেউ খোঁজে তার ক্যারিয়ারের মধ্যে, কেউ খোঁজে সম্পদের মধ্যে, কেউ–বা আবার সামাজিক মর্যাদার মধ্যে। আবার আমার মতো কেউ হয়তো খোঁজে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে। এলিজাবেথ গিলবার্ট তার খাও, প্রার্থনা করো, ভালোবাসো বইতে লিখেছিলেন তিনি কীভাবে তাঁর সুখ খুঁজতেন। এক সম্পর্ক ছেড়ে আরেক সম্পর্ক গড়ে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি তার জীবনে পরিপূর্ণতা খুঁজতেন। বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে এমনকি খাওয়া–দাওয়ার মধ্যেও তিনি তার চাওয়া–পাওয়া খুঁজে ফিরেছেন। কিন্তু দিনশেষে সবজায়গা থেকেই ফিরেছেন ব্যর্থ হয়ে।

আমিও ঠিক একই কাজ করেছি। নিজের ভেতরের শূন্যতা এগুলোর মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করেছি। ছোট্ট সেই মেয়েটি যে তাই এই প্রশ্নটাই করবে ওটাই তো স্বাভাবিক। এই প্রশ্ন ছিল না পাওয়ার বেদনা থেকে, হতাশা থেকে। এই প্রশ্ন নিজের ভেঙে পড়ার প্রশ্ন, কোনো কিছু খুঁজে শেষে খালি হাতে ফেরার প্রশ্ন। এটা যেন অনেকটা খালি হাতে ইটের দালান খোঁড়ার মতো: খালি হাতে তো ফিরবেনই, নিজের আঙুলেরও বারটা বাজাবেন। আর এগুলো আমাকে কোনো বই কিংবা কোনো জ্ঞানী লোকের কথা শেখায়নি। আমাকে শিখিয়েছে আমার হতাশা, আমার বেদনা।

ছোট্ট সেই মেয়েটির প্রশ্ন আসলে আমারই প্রশ্ন...আমি নিজেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছি।

প্রশ্নটা আসলে এই দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী কিছু মুহূর্ত আর ক্ষণিকের কিছু সম্পর্ক নিয়ে। এই দুনিয়াতে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো আজ আছে তো কাল নেই। হয় দূরে কোথাও চলে যায়, কিংবা মারা যায়। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের কষ্ট দেয়, কারণ এটা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। মানুষ হিসেবে আমাদের স্বভাবই হলো এমন, যা

কিছু নিখুঁত ও দীর্ঘস্থায়ী সেগুলোকে চাওয়া, সেগুলোকে ভালোবাসা কিংবা সেগুলো পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। চিরস্থায়ী কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরাই আমাদের স্বভাব। আমরা চিরস্থায়ী কিছু খুঁজে ফিরি কারণ, দুনিয়ার জীবনের জন্য তো আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি; আমাদের প্রথম ও প্রকৃত বাড়ি তো জান্নাতে: ওটা যেমন নিখুঁত তেমনি চিরস্থায়ী। কাজেই এমন জীবনের স্বাদ খোঁজা আসলে আমাদের মানবপ্রকৃতিরই একটি অংশ। সমস্যা হচ্ছে আমরা সেটা এই দুনিয়াতে খুঁজি। আর তাই বুঝি আমরা বয়সকে ধরে রাখার জন্য চামড়ায় যেন বলিরেখা না-পড়ে সেজন্য ক্রিম কিনি। কসমেটিক সার্জারি করি। আমরা দুনিয়াকে জান্নাত বানাতে চাই; সেটা কি হয় কখনো?

মনকে যখনই দুনিয়ার মায়ায় বেশি জড়িয়ে ফেলি তখন সেটা ভেঙে যায়। দুনিয়া আমাদের কষ্ট দেয়। কারণ, দুনিয়া মানেই হলো যেটা ক্ষণস্থায়ী, ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের মনের মাঝে যে-আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ পুরে দিয়েছেন সেটা কেবল কোনো চিরস্থায়ী নিখুঁত জিনিস দিয়েই পরিপূর্ণ হতে পারে। ক্ষণিকের কোনো কিছু দিয়ে সেটা পূরণ করতে যাওয়ার মানে হলো মরিচীকার পানি দিয়ে তেষ্টা মেটানো। খালি হাতে দালান ভাঙা। প্রকৃতিগতভাবে যেটা ক্ষণস্থায়ী সেটাকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা অনেকটা আগুন থেকে পানি বের করার মতো। আগুনের ধর্মই জ্বালিয়ে দেওয়া। ওটা থেকে কি তৃষ্ণা মেটানো যায়! যখনই দুনিয়ার আশা আমরা ছেড়ে দেব একমাত্র তখনই আমরা এই পার্থিব জীবনে মন ভাঙার মতো কঠিন যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারব। দুনিয়া জান্নাহ নয়, সেটা কখনো হবেও না।

আমাদের বুঝতে হবে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু হয় না। কিছুই না। মন ভাঙার পেছনে কারণ আছে। কষ্ট পাওয়ার পেছনেও কারণ আছে। এই ভাঙা হৃদয় আর কষ্টের মধ্যেই আমাদের জন্য শিক্ষা ও আল্লাহর প্রজ্ঞার নিদর্শন আছে। কিছু একটা যে ভুল হচ্ছে, আমাদের যে বদলাতে হবে এগুলো তারই সতর্কবার্তা। আগুনে হাত পুড়ে যেতে থাকলে আমরা তো এই সতর্কবার্তাই পাই যে আমাদের হাত সরাতে হবে। তেমনি মানসিক দুঃখকষ্টগুলোও আমাদের এই কথাই বলে যে, আমাদের ভেতরটাকে বদলাতে হবে। কিছু একটা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। যন্ত্রণা আমাদের বাধ্য করে বিচ্ছিন্ন হতে। ভালোবাসার কোনো মানুষ যখন বারবার আমাদের কষ্ট দেয় তখন যেমন আমরা তার থেকে দূরে সরে যাই, ঠিক তেমনি এই দুনিয়া যত বেশি আমাদের কষ্ট দেয় তত বেশি আমরা অনিবার্যভাবে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

কোনো কিছু থেকে কষ্ট পেলে বোঝা যায় কীসের মায়ায় আমরা বেশি জড়িয়ে আছি। যে-জিনিসটা আমাদের কাঁদায়, বেশি কষ্ট দেয় বুঝতে হবে সে জিনিসের সাথেই আমাদের মায়া জড়িয়ে আছে। অথচ আমাদের দরকার আল্লাহর মায়ায় জড়ানো। আর যে-জিনিসগুলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে বাধা দেয় সেগুলো থেকে দূরে থাকা। এসব যন্ত্রণাই আমাদের জীবনের মিথ্যে মায়াকে স্পষ্ট করে তোলে। দুঃখ-কষ্ট আমাদের জীবনে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে। আমরা এই জটিল অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজি। নিজেদের বদলানোর ব্যাপারে আমাদের যদি যথেষ্ট মানসিক শক্তি না থাকে তাহলে কুরআনের এই কথাই যথেষ্ট (ভাবার্থ): **"আল্লাহ কখনো কারও অবস্থা বদলাবেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"** (কুরআন ১৩:১১)

বছরের পর বছর ধরে মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেতে পেতে একসময় ধরতে পারলাম আমার মূল সমস্যা কোথায়। সবসময় ভেবে এসেছি দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা মানে হলো দুনিয়াবি বিভিন্ন জিনিসের মায়ায় জড়িয়ে থাকা। আমি ভাবতাম, দুনিয়ার প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই। আমি তো শুধু কিছু মানুষের মায়ায় পড়ে আছি। কিছু ঘটনা, কিছু মুহূর্ত, কিছু আবেগ—এগুলোও কি দুনিয়াবি? তো আমি ভাবতাম আমি দুনিয়ার মায়ায় জড়িয়ে নেই। কিন্তু আমি

আসলে বুঝিনি যে এই মানুষগুলো, কিছু মুহূর্ত, আবেগ এগুলো সবই দুনিয়ার অংশ। আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি যে, আমার জীবনে আমি যে-অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এগুলোর পেছনে কারণ একটাই, শুধু একটাই: দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা।

যখন বুঝতে পারলাম তখন মনে হলো আমার চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। মূল সমস্যা কোথায় সেটা নিজের চোখে দেখতে পারলাম: আমি চাচ্ছিলাম দুনিয়ার জীবনকে কষ্টহীন নিখুঁত করতে; কিন্তু তা তো কখনো হওয়ার নয়। কিন্তু ঐ যে একবার ওভাবে জীবনটাকে ভেবে নিয়েছিলাম, তাই জীবনটাকে কষ্টহীন করার জন্য, নিখুঁত করার জন্য আমি আমার রক্ত, ঘাম, চোখের জল জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম দুনিয়াকে জান্নাহ বানানোর জন্য।

সম্পর্কগুলো থেকে আমার প্রত্যাশা ছিল আমার আশেপাশের মানুষগুলো একদম ভালো হবে। আমার সম্পর্কগুলো খুব সুন্দর হবে। আমার জীবন ও আমার আশেপাশ থেকে কতকিছুই না আশা করেছিলাম। কত আশা, কত সাধ, কত স্বপ্ন। জীবনে অসুখী হওয়ার পেছনে যদি একটিমাত্র কোনো রেসিপি থাকে তাহলে সেটা হলো: আশা। আমার জীবনের চরম ভুল ওটাই। হ্যাঁ আশা করাটা ভুল না; কারণ মানুষ হিসেবে আমাদের কখনোই নিরাশ হওয়া উচিত না। তবে ভুলটা ছিল আমি "কোথায়" আশা-ভরসা করেছিলাম? দিনশেষে আমার আশা-ভরসা আল্লাহর উপর ছিল না। আমার আশা-ভরসা ছিল মানুষের উপর, মানুষের সম্পর্কের উপর। আমার ভরসা ছিল দুনিয়ার উপর, আল্লাহর উপর না। এভাবেই একসময় আমি কঠিন একটা সত্য বুঝতে পারলাম। কুরআনের একটা আয়াত বারবার আমার মাথায় ঘুরতে লাগল। আয়াতটা আগেও অনেকবার শুনেছি, তবে প্রথমবারের মতো আমি বুঝতে পারলাম এ আয়াতটি যেন আমাকে নিয়েই: **"যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না বরং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট আছে এবং যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ নিয়ে গাফেল হয়ে আছে, তাদের কৃতকর্মের জন্যই তাদের স্থান হবে জাহন্নামে।"** (কুরআন ১০:৭)

দুনিয়াতেই সব পাবো—এমন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আমি আসলে আল্লাহর উপর ভরসা করিনি। আমার ভরসা ছিল এই দুনিয়ার উপর। দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহর উপর ভরসা করার মানে কী?

এর মানে হলো, দুনিয়াতে আপনার যত বন্ধুই থাকুক না কেন, কখনো ভাববেন না যে আপনার বন্ধুরা আপনার শূন্যতা দূর করবে। যখন বিয়ে করবেন, তখন আশা করবেন না যে, আপনার সব প্রয়োজন আপনার সঙ্গী মেটাবে। যখন কোনো কাজ করবেন, ফলাফলের উপর আশা করবেন না। কোনো সমস্যায় পড়লে ভাববেন না, আমি একাই এর সমাধান করে ফেলতে পারব। অন্যের উপরও নির্ভর করবেন না। কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

মানুষের সাহায্য নিন—তবে মনে রাখবেন কোনো লোক (কিংবা আপনি নিজেও) আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন না। কেবল আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন। আল্লাহই এই মানুষগুলোকে আপনার সাহায্যের জন্য পাঠান। কিন্তু এরা আপনার সাহায্যের উৎস নয়, আপনার পরিত্রাণের উৎস নয়। একমাত্র আল্লাহই আপনাকে সাহায্য করেন, আপনাকে রক্ষা করেন। মানুষ তো এমনকি একটা মাছির পাখাও সৃষ্টি করতে পারে না (২২:৭৩); আপনার কী উপকার করবে! পরস্পরের সঙ্গে যখন কথা বলবেন, তখনও আল্লাহর দিকে নিজের মনকে ফিরিয়ে রাখুন। নাবী

ইব্রাহিম আলায়হিস-সালাম কি সুন্দরভাবেই না বলেছেন, **"মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টিকারী সেই মহান আল্লাহর দিকেই আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফেরালাম। এবং আমি কক্ষনো তাঁর সাথে কোনো শরীক করব না।"** (কুরআন ৬:৭৯)

নাবী ইব্রাহিম আলায়হিস-সালাম কীভাবে এমন মানসিক অবস্থানে পৌঁছালেন? তিনি গভীরভাবে চাঁদ, সুর্য ও তারকার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি দেখেছেন, এরা কেউই ত্রুটিমুক্ত না। এরা অস্ত যায়, আমাদের ছেড়ে চলে যায়। এভাবে ভেবেচিন্তেই তিনি আল্লাহর দিকে নিজের মুখ ফিরিয়েছেন।

আমাদেরও এভাবেই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। নির্ভর করতে হবে। আস্থা রাখতে হবে। যেদিন সেটা করতে পারব, সেদিন বুঝতে পারব অন্তরের প্রশান্তি আর স্থিরতা কাকে বলে। যে উঁচুনিচু গিরিপথ আমাদের জীবনকে তাল-বেতাল করে দিচ্ছিল সেই পথে আমাদের আর চলতে হবে না। কেননা আমাদের হৃদয় যদি এমন কিছুর উপর নির্ভর করে, এমন এক সত্বার উপর নির্ভর করে যিনি অবিচল, তাহলে আমাদের হৃদয়ও হবে অবিচল। আর আমরা যদি এমন কিছুর উপর নির্ভর করি যেটা নিজেই সবসময় বদলে যাচ্ছে, যেটা ক্ষণস্থায়ী তাহলে আমারাও হবো অস্থির, উত্তেজিত। অর্থাৎ এই হয়তো আমরা কোনো কিছু নিয়ে খুশি হলাম, কিন্তু যেই-না আমাদের খুশির কারণ বদলে গেল, অমনি আমাদের খুশি ছুটে গেল। আমরা আবার মনমরা হয়ে পড়লাম। একবার এদিকে দুলি কি আরেকবার ওদিকে। বুঝতেও পারি না কেন এমন হচ্ছে।

যতদিন না আমরা চিরস্থায়ী ও অবিচল কোনো সত্বার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছি ততদিন আমরা নিজেরা স্থির হতে পারব না। এমন তাল-বেতাল হতেই থাকবে। আমরা কীভাবে আশা করি যে, যেটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, যেটা নিজেই অস্থির তার উপর ভরসা করলে আমাদের মন শান্ত হবে? সাহাবা আবু বাক্‌রের একটা কথার মধ্যে এ ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়।

নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা গেলেন, লোকজন তখন এতটাই শোকাহত যে, তারা কোনোভাবেই খবরটা মেনে নিতে পারছিলেন না। নাবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কেউ যদি খুব বেশি ভালোবেসে থাকেন, তাহলে সেটা আবু বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুম। যার ভালোবাসা বেশি তার কষ্টটাও বেশি। নাবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এত ভালোবাসা থাকার পরও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সত্যিকার অর্থে কার উপর আমাদের ভরসা করা উচিত। তিনি বললেন, "আপনারা যদি মুহাম্মাদের উপাসনা করে থাকেন, তাহলে মন দিয়ে শুনুন তিনি মারা গেছেন। আর আপনারা যদি সত্যিই আল্লাহর ইবাদাহ করে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ কক্ষনো মারা যান না।"

মানসিক প্রশান্তির এই স্তরে পৌঁছাতে হলে আপনাদের যা করা দরকার: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ককে আপনাদের কোনো অভাব পূরণের উৎস হতে দেওয়া যাবে না। আমাদের জীবনের সাফল্য, ব্যর্থতা কিংবা আত্ম-মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া আর কারও সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। যদি এটা করতে পারেন তাহলে আর কখনোই আপনি ভেঙে পড়বেন না। কারণ আপনি যাঁর হাত ধরেছেন, তাঁর হাত কক্ষনো ভাঙার নয়। আপনাকে আর কেউ হারাতে পারবে

না। কীভাবে হারাবে? কারণ আপনি যাঁর উপর নির্ভর করেছেন তাকে কি কেউ হারাতে পারে? আপনি কক্ষনো শূন্যতা অনুভব করবেন না। কীভাবে করবেন? কারণ আপনার পরিতৃপ্তির উৎস কখনোই ফুরাবে না, কমবে না।

আজ আমি যখন আমার সেই ১৭বছরে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে করি, তখন ভাবি সেই ছোট্ট মেয়েটি কি আমিই ছিলাম! এমনটা ভাবার কারণ হলো, জীবনের পরবর্তী যন্ত্রণাকাতর বছরগুলোতে ঠেকে ঠেকে যেই নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, সেই সময়টায় এই উত্তরটা আমার জন্য ছিল একটা টনিকের মতো। মানুষ কেনে ছেড়ে চলে যায় এ প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে বলেছিলাম: "কারণ দুনিয়ার জীবন তো জান্নাত নয়। যদি হতো তাহলে পরকালের জীবনকে কী বলা হতো?"

এতো কষ্ট কেন বেঁচে থাকায়?

27 September 2014

লেখকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

জীবন নিয়ে আমাদের কমবেশি কমপ্লেইন আছে প্রায় সবারই। আমাদের দুঃখের তালিকা যেন আর শেষ হয় না! স্বামী-স্ত্রীর মাঝে না-পাবার গল্প, মায়ের মুখে সন্তান শোনে কতো আক্ষেপ আর বেদনার হাহাকার, দু' বন্ধুর কথা শুনুন, সেখানেও দুঃখেরই প্রলাপ!

আমরা সবাই (অন্তত যারা এই নোটটা পড়ছেন), খাচ্ছি-দাচ্ছি, আমাদের মাথার উপর ছাদ আছে, গায়ে কাপড় আছে, সামনে একটা পিসি/ হাতে মোবাইল সেট! এই হয়তো এক্ষণ আপনার কথায় এক কাপ চা এনে সামনে রাখা হলো, বা আপনি পড়াশুনার (বা আড্ডার উদ্দেশ্যে) কলেজ/ ভার্সিটির দিকে যাচ্ছেন... এতোকিছু পেয়ে তবুও আমাদের মনে না পাবার দুঃখ। আমাদের সবসময় মনে হয় এটা পেলাম না, ওটা পেলাম না... বাড়ি নাই, গাড়ি নাই, ডিজাইনার কামিজ নাই, ডি.এস.এল.আর ক্যামেরা নাই, দামী মোবাইল সেট নাই, সুন্দর একটা ব্যাগ নাই, ভালোবাসার মানুষ নাই, বন্ধু নাই!! আরো কতো কী...!

কার সাথে তুলনা করছি আমরা? আমাদের সামনে দু' ধরনের এক্সাম্পল রয়েছে। এক, দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন, যেখানে তিনি মদীনায় যাবার পর পরপর তিন দিন কোনদিন পেট পুরে খেতে পারেন নি। ক্ষুধার কষ্ট জানেন তো? কখনো রমজানের রোজা রেখে থাকলে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবেন, অবশ্য সন্ধ্যায় বাহারি ইফতার হয়তো আপনার সামনে ঠিকই প্রস্তুত থাকবে। তিন দিন না খেয়ে থাকার কষ্ট তাই আমাদের কল্পনাতীত! আমাদের যখন লাগে, বলতে অন্তত পারি "ডিম এনো, সবজি এনো, মাংস কিনো"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না খেয়ে থাকতেন, সেটা ভেবে দেখার আমাদের সময় কোথায়?

মুস'আব ইবন উমাইর (রা) এর কথা আমরা ক'জন জানি? তিনি রাসূল (সা) এর একজন সাহাবী। তাঁর পরনে থাকতো সবচেয়ে সুন্দর পোশাক, গায়ে দামী পারফিউমের গন্ধ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে রাস্তার মানুষেরা তার দিকে একবার হলেও ফিরে তাকাতো। অনেকটা আমাদের যুগের 'সেলিব্রিটি'দের মত! তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মা অনেক অত্যাচার করে, তিনি ইসলাম ত্যাগ না করলে সে ক্ষান্ত হবে না! কিন্তু ইসলামের সাথে আপোস করবে মুস'আব? তা হয় না। একসময় মা বাড়ি থেকে তাকে বের করে দিল। ছেলে পালিয়ে বিয়ে করেছে দেখে ত্যাজ্য পুত্র করতে দেখেছি আমি অনেককে। তবু তো গায়ের জামাটা খুলে রাখে না! মুস'আব ঘর থেকে বের হয়েছিলেন চটের একটা বস্তা পরে! কিন্তু ইসলাম ছাড়েন নি।

আমরা এই মুস'আবের সাথে নিজেদের তুলনা করি? উঁহু! আমরা তুলনা করার সময় টেনে আনি পাশের বাড়ির মেয়েটার কথা যে গাড়িতে করে কলেজে যায়, অথচ আমি পারি না! সেই বন্ধুর কথা যার হাতে আইফোন বা ব্ল্যাকবেরী, বগলে গার্লফ্রেন্ড! আমাদের তুলনা তার সাথে যে আঙ্কেল-আন্টি সুদের টাকায় ব্যাংকের লোন নিয়ে বাড়ি বানায়, গাড়ি চালায়, হারাম টাকার উপর হজ্জ করে! কেন? কেন আমরা এদের তুলনা হিসেবে বেছে নিব? কারা এরা? মুসলিম? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নাই, ছেলেমেয়ের হিজাব নাই! জুম্মার নামাজ পড়া মুসলিম? সুদের টাকায় যাকাত দিয়ে মুসলিম? যারা মুসলিম কিনা তা নিয়েই সন্দেহ তাদের সাথে করি আমরা নিজেদের তুলনা! বাহ!

আমাদের সামনে দুই রকমের উদাহরণই উপস্থিত। আমরা কয়বার তাদের সাথে নিজদের তুলনা করি যারা আমাদের সামনে ঈমানের দৃঢ় পরিচয় রেখেছেন! কয়জন সাহাবার নাম জানেন আপনি? আর দেখুন তো কতোজন bollywood-hollywood actor-actress এর নাম গড়গড় করে বলে দিচ্ছেন, সাথে হয়তো তাদের life-এর আদ্যোপান্ত কাহিনী মুখস্থ!

এই আমরাই আবার আল্লাহর বিরুদ্ধে নালিশ করি (নাউযুবিল্লাহ)! মুসলিমদের বলতে শুনি, *"দুআ করে লাভ কি? যেটা হবার সেটাই তো হবে"... "আল্লাহর ইচ্ছাতেই যদি সব হয় তাহলে দুআ চাওয়ার দরকার কি?"* এটা নিয়ে বহুদিন আগে পড়া একটা কথোপকথনই তুলে দিচ্ছি। হয়তো এটা অনেকেরই পড়া –

ইবরাহীম ইবন আযম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুক) ছিলেন একজন শিক্ষক এবং সুফিয়ান আস-সাওরির একজন সঙ্গী। তাকে একটা আয়াত নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।" (সূরাহ গাফির ৪০:৬০)

মানুষগুলো বললো, আমরা দুআ করি কিন্তু আমাদের দুআ কবুল হয় না কেন? ... তিনি তাদেরকে বললেনঃ

তোমরা আল্লাহকে চিনো, তারপরও তাকে মেনে চলো না

তোমরা কুরআন পরো,অথচ সে অনুযায়ী পালন করো না

তোমরা শয়তানকে জানো, তবুও তার কথাই মেনে নাও!

তোমরা বলো মুহাম্মাদ (সা) কে ভালোবাস, কিন্তু তাঁর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করো না

তোমরা বলো জান্নাতে যাতে চাও, কিন্তু তা পাবার জন্য কাজ করো না

তোমরা বলো জাহান্নামের আগুনকে ভয় পাও, অথচ তোমরা নিজেদেরকে গুনাহ থেকে দূরে রাখো না

তোমরা বলো নিশ্চয়ই মৃত্যু সত্য, কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে তার জন্য প্রস্তুত করো না

তোমরা অন্যের ভুল খুঁজে বের করো, তবে নিজের ভুলের দিকে দৃষ্টি দিতে ভুলে যাও

তোমরা আল্লাহর দান করা খাবার খাও, অথচ তোমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করো না।

সুতরাং আপনি আল্লাহর সাথে দায়িত্ব পূরণ করুন, আল্লাহ আপনার খেয়াল রাখবে। আপনি কি আপনার দায়িত্ব পালন করছেন? আপনি কি বলবেন – 'এসব আগের যুগের মানুষের কথা, এখন এরকম ইসলাম পালন সম্ভব না'?... তাহলে শুনুন, আপনি সেই যুগেই বাস করছেন যখন আফিয়া সিদ্দিকী ইসলামের কাজ করার জন্য প্রতিদিন ধর্ষিত হয়। আপনার সাথে/ আপনার মা-বোনের সাথে কেউ একটু খারাপ ব্যবহার করলে কেমন লাগে? তাদের গায়ে হাত দিলে? চিন্তা করুন, এরকম অসংখ্য মা-বোনের দেহ-মন নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে এই দ্বীন পালনের জন্য, তবু তারা পিছপা হয় না। হাজারো ভাইকে ধরে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইসলাম পালনের জন্য। এদের সামনে আপনার 'ঈমান কম' এই অজুহাত অত্যন্ত দুর্বল। এটা হলো আপনার 'দুঃখ থেকে দূরে' থাকার অজুহাত মাত্র।

এই অল্পদিনের আরাম-আয়েশের কথা ভেবে ইসলামের জন্য কি করলেন আপনি? আল্লাহ আপনাকে ইসলাম দিল, মুসলিম হবার তওফিক দান করলো। আপনি এ সুযোগ হেলায় দূরে ঠেলে দিলেন। ছিঃ... দুনিয়ার একটু সুখ-শান্তির জন্য জন্য কি করলেন? আখিরাত ভুলে গেলেন। আপনার জীবনের লক্ষ্যই হয়ে গেছে এ জীবনে সব পাওয়া! তাই দুঃখ আপনার সহ্য হয় না। এ জীবনের ভোগ-বিলাস পাবার আশায় কতো অল্প মূল্যেই না ইসলামকে বিকিয়ে দিচ্ছেন...

আল্লাহ বলেন, **"এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব।"** সূরাহ বাক্বারার ১৭৫ নম্বর আয়াত। মুসলিমদেরকে নিয়ে কথাটা বলা হয়নি। কিন্তু মনে পড়লে ভয় লাগে! গোমরাহি মানে ভুল পথ। ইসলামকে পেয়েও আমরা তা নিয়ে চিন্তিত নই! আমরা এখন টাকা-পয়সা-শক্তি-সমর্থ-সময়-মন সবকিছু দিয়ে নিশ্চিত করছি কীভাবে এই দুনিয়াটাতে আরাম পাওয়া যায়, সফল হওয়া যায়, মৌজ-মাস্তি করা যায়! আর এসব করতে যায়ে ভুলে যাচ্ছি নিজের দ্বীনকে, ভুলে যাচ্ছি আমাদের অস্তিত্বকে, ভুলে যাচ্ছি আমি মুসলিম।

মনে রেখেন, যত চেষ্টা-চরিত্রই করুন না কেন, সেই *"সুখ-পাখি"* আপনাকে ধরা দিবে না! কারণ এই দুনিয়ায় কখনো পুরা সুখ পাওয়া সম্ভব না। দুঃখ-বেদনা-কষ্টে জর্জরিত হয়ে আপনি আল্লাহর সাথে অভিমান করতে পারেন, কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি কি আল্লাহর সাথে আপনার ওয়াদা পালন করেছেন? আল্লাহ আমাদের কী পরীক্ষা নিচ্ছেন, এই কমপ্লেইন না করে একবার ভাবুন আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনি কতোবার চিন্তা করেছেন...? আপনার সুখের দৃষ্টান্ত যেন শুধু এই দুনিয়া না হয়ে যায়। 'কারো এটা আছে-আমার ওটা নেই' এই তুলনা করার আগে মনে রাখবেন, আজো শত শত ফাতিমা, আফিয়া, তারেক মেহান্না, বাবর আহমেদ ইসলাম বুকে নিয়ে চলছে। তুলনা যদি করতেই হয়, তো সেরা জনের সাথেই করুন।

"প্লিজ তুমি আমাকে বিয়ে করো, নাহলে আমার বিষ খাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবেনা।"

25 April 2015

লেখকঃ শেখ সাফওয়ানা জেরিন

সুন্দরী মেয়েটা ছেলেটার পায়ে ধরে বসে পড়লো মাটিতে- প্লিজ তুমি আমাকে বিয়ে করো, নাহলে আমার বিষ খাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবেনা।

সোহরাওয়ারদি উদ্যানের আপামর জনতা বসে বসে মজা লুটছিল। আর মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা যাওয়ার দশা। ছেলেটাও দেখতে সিগারেট খোর ঠেকছে। পাবলিক ভাবছে- কোন কপালে এই সুন্দরী এই ছেলেকে ভালো বেসেছিল।

যুগটাই আসলে এমন। ভালোবাসা নামক সম্পর্কগুলো এখন খুব সস্তা, যত্রতত্র প্রথম দেখা, মিষ্টি হাসি দেখেই ভালোবাসা তৈরি হয়। যদিও পরে মানসিকতার দ্বন্দ্ব, সামাজিক , পারিবারিক প্রেক্ষাপটের অশান্তি, অর্থনৈতিক সমস্যায় ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালায়। আর বিয়ের আগে সব উজাড় করে দেওয়া নারী সম্প্রদায় ও জানে না আদৌ সে ছেলেটির সাথেই সংসার পাততে পারবে কিনা, কিংবা এই ছেলেটাই পরে তাকে গ্রহন করবে কিনা।

শুধু পার্কেই নয়, সুফিয়া কামাল হলের সামনেও উচ্চ শিক্ষিত মেয়েদেরও এই ধরনের অকাল কুষ্মাণ্ডদের সামনে দাড়িয়ে অরণ্যে রোদন করতে দেখেছি। অবাক লেগেছে। কিন্তু , বাস্তবতা এটাই যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত সব নির্বিশেষে মেয়েরা এখনো এক যায়গায়ই দাড়িয়ে আছে। তা হলো নিজের সম্মান বা মর্যাদাকে নিজেরাই ভুলন্থিত করে ।

শুধু ছেলেদের শ্রেণী ভেদ কিংবা সামাজিক মর্যাদা এক্ষেত্রে হয়তো পার্থক্য করে।

তাই এই ধরনের সাময়িক সম্পর্কগুলো থেকে মেয়েরা আসলে নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা এবং অধিকারই বঞ্চিত হয়, এবং হয়ে আসছে অনাদি কাল থেকেই।

নিকাহ আরবি শব্দ এর একটা অর্থ হয় ইহসান করা, আরেকটা অর্থ হয় সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ। বিয়ে সেই দুর্গ বলেই হয়তো ইসলামে বিয়ের আরবি প্রতি শব্দটা নিকাহ। আর এই ইহসান থেকেই সূচনা হয় অধিকারবোধ এবং অধিকার আদায়ের।

আর যে সম্পর্কে ইহসান নয়, সামাজিক সম্মান নয়, শুধু নারী দেহ ভোগই মুখ্য, সেই সম্পর্কে অধিকার বোধ আসার প্রশ্নই আসেনা।

আর ম্যানেজম্যান্টের ভাষায় বললে- ডিমান্ড সাইড যতো শক্তিশালী হয়, সাপ্লাই সাইড সেই অনুযায়ী সাপ্লাই করতে বাধ্য হয়। পুরোটা না দিতে না পারলেও কিছু তো দেওয়ার চেষ্টা করবে।

যেখানে মেয়েদের চাওয়াই নেই নিজের সম্মানের, মর্যাদার, সেখানে এইসব সুবিধাবাদী, ভোগবাদী পুরুষ সমাজের কোন প্রয়োজন কি আছে সেধে সেধে অধিকার দিতে যাওয়ার?

হাজার হোক, মুফতে পেলে তো বাঙ্গালী আলকাতরা ও গায়ে মাখে, তাই না? আর নারী তো এরচেয়ে হাজার গুণ লভনীয় জিনিষ। যাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে জগতের সব চাওয়া পাওয়ার বৃত্তগুলো। তাদের যদি এতো সহজে পাওয়া যায় নিকাহ নামের ইহসানের দুর্গ তৈরি করবে ভোগবাদী স্বার্থপর পুরুষরা, এটা ভাবাই তো সময় নষ্ট। আর যে নারী নিজেও জানে সে নির্যাতিত সম্প্রদায়ের অধিকারী, বলে কয়ে ঢাক ঢোল পেটানো সামাজিক বৈবাহিক সম্পর্কেই যেখানে সে প্রাপ্যগুলো বুঝে নিতে পারেনা, ১০ জন মুরুব্বী কিংবা নিজের বাবার মীমাংসা সত্ত্বেও সেখানে নিজে নিজে সবার আড়ালে একটা অপকর্ম করে তার অধিকার চাইতে গেলেই অধিকার পাওয়া যাবে এই ধারনাটাই তো যুক্তিহীন অসাড়। হাজার হোক, যে নিজেই নিজের সম্মান করতে জানে না,অন্যরা তাকে সম্মান কীভাবে করবে?

পরিণতি

25 April 2015

লেখকঃ **রেহনুমা বিনত আনিস**

শোভনের রিংটোন শুনে কান খাড়া হয়ে যায় শান্তার। মোবাইলের স্ক্রিনে শোভনের হাসিমাখা চেহারাটা দেখে মূহূর্তেই উবে যায় সমস্ত রাগ, অভিমান। মোবাইলটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে একটু ঝাঁঝ আর অনেক ভালোবাসা মিশিয়ে বলে, 'কি? তুমি না বলেছিলে আজ ফোন করতে পারবেনা? তোমার এমন কাজ, তেমন ব্যাস্ততা! কই? পারলে আমাকে ছাড়া থাকতে?'

ওপাশে কেবল নীরবতা।

বিরক্ত হয় শান্তা, 'কি ব্যাপার শোভন? সারাদিন পরে একবার মাত্র ফোন করলে, তাও কোন কথা বলছনা। ব্যাপার কি?'

ওপাশে ফোঁপানোর শব্দ।

সচকিত হয়ে ওঠে শান্তা, 'কে? কে ওখানে?'

জবাবে দ্বিধা আর অশ্রুমেশানো নারীকন্ঠের আওয়াজ ভেসে আসে, 'আমি শোভনের স্ত্রী। আমার একটা ছোট্ট সন্তান আছে ...'

হঠাৎ হুটোপুটির শব্দ, ধুপধাপ আঘাতের আওয়াজ, আর্তনাদ ... ফোনের লাইনটা কেটে গেল।

মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে শান্তার। এইমাত্র কি ঘটে গেল সে কিছুই বুঝতে পারেনা। হৃৎপিন্ড এত দ্রতলয়ে স্পন্দিত হচ্ছে , মনে হচ্ছে যেন এখনই ফেটে যাবে। সে দ্রুত কল দেয় শোভনের নাম্বারে – একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, পাঁচবার ... কেউ ফোন ধরেনা। এবার ওর মনে পড়ে শোভন বলেছিলো ওর পরিবার খুব রক্ষণশীল। ওর মা যদি জানতে পারেন ছেলে প্রেম করছে তাহলে তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে ফেলবেন। তাই শোভনই সবসময় ওকে ফোন করে, এই প্রথম ওর শোভনের নাম্বারে ফোন করা। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত, রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যায়, কিন্তু সেই নারীকন্ঠের আওয়াজ ওকে তাড়া করে ফেরে, 'আমি শোভনের স্ত্রী। আমার একটা ছোট্ট সন্তান আছে ...'। মেয়েটা কে? কেনই বা ওকে ফোন করল? কেন ওকে এসব বানোয়াট কথা বলল? শোভন ওকে ভালবাসে, সে ওকে বিয়ে করবে। কিন্তু শোভনের মোবাইল মেয়েটা পেলো কোথায়? অনেক প্রশ্নই মাথায় ঘুরপাক খায় ওর, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছাড়া, 'মেয়েটি যদি সত্য বলে থাকে?' যতবারই এই প্রশ্ন মনের ভেতর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চায় ততবারই শান্তা শোভনের

সাথে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি, ওর সাথে ঘুরতে গিয়ে আনন্দময় মূহূর্তগুলো, ওর কথার মায়াজালে আবিষ্ট হবার অনুভূতির কথা মনে করে

সেটিকে মাটিচাপা দেয়।

ঘুম ভাঙ্গে শোভনের রিংটোনে। সাথে সাথে ঝাঁ করে গত সন্ধ্যার দুঃস্বপ্নময় স্মৃতি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। ফোন ধরব, ধরব না করেও না ধরে থাকতে পারেনা শান্তা। 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে শোভনের চনমনে গলার আওয়াজ, 'কি গো রাজকন্যা? ঘুম ভাঙ্গলো?' মনের ভেতর মুখিয়ে থাকা একরাশ প্রশ্নের সাথে এই স্বতঃস্ফূর্ত কন্ঠের কোন সঙ্গতি খুঁজে পায়না শান্তা। শোভন আবার বলে, 'ওঠ গো রাজকন্যা! দেখ তোমার দুয়ারে কে এসেছে!' এক মূহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেলেও তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দরজার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায় সে। দরজার বাইরে শোভনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সব ভুলে চিৎকার করে ওঠে, 'তুমি! এখানে?'

সাথে সাথে ওদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রতিবেশীদের কয়েক জোড়া চোখ। ঢাকায় পড়াশোনা কিংবা চাকরী করতে আসা অনেক মেয়ের মতই শান্তা একা থাকে। মা নেই।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবা ফিরে গিয়েছেন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সংসারে। কালক্রমে বাবা মেয়ের সম্পর্ক শিথিল হয়ে এসেছে, যদিও তিনি প্রতি মাসের শুরুতে মনে করে বিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। শান্তা নিজেই ভাল আয় করে, এই টাকা ওর প্রয়োজন নেই, সব ব্যাঙ্কেই জমছে। এর চেয়ে সে অনেক খুশি হত যদি বাবা মাসে একবার এসে ওকে দেখে যেতেন। সৎ মায়ের সাথে শান্তার সম্পর্ক ভালো না। সৎ ভাইবোনরা ওর অনেক বড়, সবাই নিজের নিজের ব্যাবসা বাণিজ্য সংসার নিয়ে ব্যাস্ত, কারো সময় নেই ওর খবর রাখার।

প্রতিবেশীরা জানে এই ছেলেটি এই মেয়েটির একাকীত্বের সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু ঢাকার জীবন ব্যাস্ত জীবন। ওদের কারো সময় নেই শুভাকাঙ্খী হয়ে ওকে দু'টো উপদেশ দেয়ার। তবে ব্যাস্ততার মাঝেও এমন রসময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য অবশ্য কারো সময়ের অভাব হয়না।

শান্তা চায়না প্রতিবেশীদের রসাত্মক আলোচনার খোরাক হতে। এদের সবাইকে সে ঘৃণা করে। এরা অন্যের মন্দ নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পায়, কিন্তু অন্যের ভাল দেখলে এরা সহ্য করতে পারেনা। গ্রামের মেয়ে শহরে এসে যতই আধুনিকা হোক, ছোটবেলা থেকে নিজের মাঝে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের শেকড়টাকে নিমেষে উপড়ে ফেলতে পারেনা সে।

গ্রামের ফজিলত দাদী বলতেন, **ছেলেরা মেয়েদের কাছে যা চায় তা বিয়ের আগে পেয়ে গেলে আর বিয়ে করতে চায়না, বিয়ে অনেক বড় দায়িত্ব, কে চায় সেধে এই দায়িত্ব কাঁধে নিতে?**

তাই সে শোভনকে নিয়ে পাবলিক প্লেসে বেড়াতে গেলেও কোনদিন ঘরে প্রবেশ করতে দেয়নি। কিন্তু প্রতিবেশীদের উৎসুক দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার্থে সে শোভনকে ঘরে ঢুকতে বলে। অনেক প্রশ্ন ওর মনে। এই সম্পর্ক টিকতে হলে ওর প্রশ্নের জবাব চাই।

নাস্তার টেবিলে বসে শান্তা কোন ভনিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, 'মেয়েটা কে?'

শোভন আকাশ থেকে পড়ে, 'কোন মেয়েটা?'

গত সন্ধ্যার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে শান্তা। সব শুনে শোভন খুব অবাক হয়, 'তোমাকে তো বলেই ছিলাম গতকাল আমি খুব ব্যাস্ত থাকব। অফিসে এত কাজ ছিলো যে ফোন কোথায় ছিলো খবর ছিলোনা। সেই ফাঁকে হয়ত অফিসের কোন মেয়ের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপে। টেবিলের ওপর ফ্রি মোবাইল পেয়ে কল করে দেয়'।

'সে আমার নাম্বার পেলো কোথায়?'

'তুমি তো জানোই আমার মোবাইলে সবসময় লাস্ট কল তুমি। লাস্ট কল টিপে দিয়েছে আর কি!'

শান্তাকে চিন্তিত দেখে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করে শোভন, 'কি নিয়ে এত ভাবছ বল তো! তুমি কি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করনা?'

এবার শান্তা বিব্রত হয়ে পড়ে। নাহ, কে না কে ফোন করেছে সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি করার কোন অর্থ হয়না। তাছাড়া দু'জনেরই অফিসের সময় হয়ে এসেছে। শোভন বার বার তাড়া দিচ্ছে ওর অফিসে যেতে হবে। জরুরী কাজে নাইটকোচেই চলে আসতে হয়েছে ওকে। এত কষ্ট করার পর যদি কাজটা উদ্ধার না হয় তাহলে অফিসে কি বলবে? শান্তা দ্রুত প্লেটগুলো গুছিয়ে গিয়ে অফিসের জন্য রেডী হয়ে আসে। এবার শোভন বাথরুমে ঢোকে। ডাইনিং রুমে টেবিলের ওপর শোভনের মোবাইলটা পড়ে থাকতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনা শান্তা। একবার বাথরুমের দরজার দিকে চকিতে নজর দিয়ে মোবাইলটা তুলে নেয়, কল হিস্ট্রি চেক করে। একটু আগে শান্তাকে করা কল ছাড়া পুরো কল হিস্ট্রি ফাঁকা। কি মনে করে কন্ট্যাক্ট লিস্টও চেক করে সে, নাহ, কোথাও ওর নাম বা নাম্বার নেই। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শান্তা। কাজ থেকে ফিরে শোভনের সাথে কথা বলতে হবে।

সন্ধ্যায় রেস্টুরেন্টে বসে শান্তাকে খাবার খুটতে দেখে শোভন খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার? খাচ্ছ না যে!'

শান্তা আবদারের সুরে বলে, 'শোন, এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতে আমার আর ভাল লাগছেনা। আমি আমাদের প্রেমের স্বীকৃতি চাই। চল, আমরা বিয়ে করি। এবার তুমি বাড়ী ফিরে যাবার সময় আমি তোমার সাথে যাব'।

শোভন খেতে খেতে বলে, 'পাগল হয়েছ? মা তোমাকে আর আমাকে দু'জনকেই কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবেন'।

'দেবেন না। আমি ওনার পা ধরে ওনার কাছে ওনার ছেলেকে ভিক্ষা চাইব। উনি রাজী না হয়ে পারবেনই না!'

হেসে ফেলে শোভন, ‘মাকে রাজী করতে তোমার যতদিন সময় লাগবে তত লম্বা ছুটি তোমাকে অফিস থেকে দেবেনা’।

‘দেবে, আমি অফিসে কথা বলে এসেছি’।

এবার শোভন খাওয়া বন্ধ করে ভ্রু কুঁচকে তাকায়, ‘তুমি তো দেখছি সিরিয়াস!’

শান্তা এবার উদগ্রীব হয়ে বলে, ‘তুমি কি ভেবেছ মিথামিথ্যি বলছি? দেখ শোভন, আমরা দু’বছর যাবত বিয়ে করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছি। আর কত অপেক্ষা করব বল? মাকে তো কোন না কোন একদিন কথাটা বলতেই হবে, তবে আজ কেন নয়?’

শোভন কি যেন ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ‘হুট করে তোমাকে নিয়ে গেলে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হবে। এবার আমি একা যাই। গিয়ে মাকে তোমার কথা বলব।

আগামীবার আমি তোমাকে আমার সাথে নিয়ে যাব’।

আনন্দে ক্ষিদে পেয়ে যায় শান্তার। সে সাগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাবারের ওপর।

আনন্দে উচ্ছ্বাসে দিন কাটে শান্তার। শোভন কোনদিন ফোন করে বলে, ‘আজ মাকে তোমার কথা একটু করে বললাম’; কোনদিন বলে, ‘আজ মা তোমার নাম জিজ্ঞেস করলেন’; আরেকদিন বলে, ‘মা তোমার ছবি দেখতে চেয়েছেন’।

একদিন ছুটির দিনে বিকেলে শুয়েবসে মনের ক্যানভাসে কল্পনার রংতুলিতে নানান ছবি আঁকছিলো শান্তা। কোন বেরসিক ফোন করল এ’সময়? অপরিচিত নাম্বার। অলসভাবে ‘হ্যালো’ বলে শান্তা। ওপাশ থেকে ভেসে আসে, ‘হ্যালো, আমি ঝর্ণা’।

শান্তা ঝর্ণা নামের কাউকে চেনেনা, কিন্তু ওপাশের গলাটা শুনে পরিচিত মনে হয়। ‘শান্তা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটা ছোট্ট সন্তান আছে, তুমি আমার সংসারটা ভেঙ্গে দিয়োনা’, কান্নার গমকে কথা বন্ধ হয়ে যায় মেয়েটার।

হঠাৎ বিবিধ নারীকন্ঠে চিৎকার শোনা যায়, ‘অ্যাই, ওকে ছেড়ে দে’, ‘খবরদার বললাম ওর গায়ে হাত তুলবি না’, ‘মাগো!’, ধুপধাপ কিলঘুষি, নারীদের সম্মিলিত চিৎকার আর কান্না ... লাইনটা কেটে যায়।

শান্তার মন থেকে সমস্ত সুখকল্পনা হাওয়ায় উড়ে যায়। সে নিশ্চিত এই মেয়েটাই ওকে শোভনের নাম্বার থেকে ফোন করে বলেছিল, ‘আমি শোভনের স্ত্রী। আমার একটা ছোট্ট সন্তান আছে ...’, সেই গলা ওর ভুল হতেই পারেনা। আজ

আবার বলল, ‘শান্তা, আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটা ছোট্ট সন্তান আছে, তুমি আমার সংসারটা ভেঙ্গে দিয়োনা’। কে এই মেয়ে? কেন সে বার বার ওকে বিরক্ত করছে?

সন্ধ্যায় শোভন ফোন করল, মা রাজী হয়েছেন, আগামী মাসের এক তারিখে বিয়ে, ঢাকায়। বাঁধভাঙ্গা আনন্দের মাঝেও প্রশ্নটা ওর মনের ভেতর খচ খচ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে বলেই ফেলে, ‘শোভন, তুমি কি ঝর্ণা নামে কাউকে চেন?’

‘না তো! কেন?’

‘এই নামে একটা মেয়ে আজ আমাকে ফোন করে বলল আমি ওর সংসার ভেঙ্গে দিচ্ছি। আমি নিশ্চিত এই মেয়েটাই আমাকে বলেছিল সে তোমার স্ত্রী’।

‘শোন, তোমার হবু স্বামী যে মেয়েদের কাছে পাত্র হিসেবে কত পপুলার তারই প্রমাণ এটা। হবে কোন মেয়ে, আমার অজান্তে আমার প্রতি আকৃষ্ট। এখন তোমার সাথে বিয়ের কথা শুনে হিংসায় এমন করছে। মাথা থেকে এসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেল তো! আমাদের এই আনন্দের মূহূর্তটা আমি কোনভাবেই নষ্ট করতে চাইনা’।

এক তারিখে ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান করে শোভন আর শান্তার বিয়ে হয়ে যায়। শান্তার পক্ষ থেকে আসে কেবল ওর বাবা আর সবার বড় সৎভাইটি। শোভনের পক্ষ থেকে শুধু ওর মা। শান্তা কিছু বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত দেয়। শোভনকেও বলে ওর সহকর্মী, বন্ধুদের বলতে। কিন্তু শোভন ওর খরচ বাড়াতে চায়না বলে কাউকে বলেনি। শোভনের মাকে দেখে বেশ অবাক হয় শান্তা। ছোটখাটো, চুপচাপ এই মানুষটাকে দেখে সে কিছুতেই শোভনের বর্ণনার সাথে মেলাতে পারেনা। শোভন ওনাকে ভয় পাবে কি, ওনাকেই দেখে মনে হয় ছেলের ভয়ে তটস্থ! হাঁটতে চলতে ওনার প্রচন্ড কষ্ট হয়। বিয়ের পরদিনই উনি গোঁ ধরলেন বাড়ী চলে যাবেন। ছেলে বৌয়ের বাসায় উঠেছে সেটা তার ব্যাপার, তিনি কোনভাবেই পরের মেয়ের ঘাড়ের ওপর উঠে বসতে পারবেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে বোঝানো হোল। কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ অস্পষ্ট উচ্চারণে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে রইলেন। শোভন বলল, ‘আমি যাই, মাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি’।

শান্তা কিছুতেই রাজী না। সে বলল, ‘চল, আমরা দু’জন গিয়ে তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। এই সুযোগে তোমাদের বাড়ীটাও আমার দেখা হয়ে যাবে’।

শোভন আপত্তি জানায়, ‘কি বল? নতুন বৌ কি এভাবে শ্বশুরবাড়ী যেতে পারে নাকি? তোমাকে স্বাগত জানাবে কে? অনুষ্ঠান করবে কে? মা তো এখানে!’

শান্তা কিছুটা দমে গিয়ে বলে, ‘ঠিক আছে, তাহলে তুমি গিয়ে মাকে বাড়ীতে দিয়ে এসো’।

এর দু’বছর পর। শান্তার একটা ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। শোভন বাচ্চা নিতে কিছুতেই রাজী ছিলোনা। কিন্তু শান্তা জানে বয়স তো আর বসে থাকবেনা, তাই সে একাই সিদ্ধান্ত নেয়। এখন সে মেয়ে মায়াকে নিয়ে প্রচন্ড খুশি। কিন্তু

শোভনের যে কি হোল কে জানে! সে বলল, ঘরখরচ সে একা কাজ করে চালাতে পারবেনা। তাই তিনমাস পর ছোট্ট পুতুলটাকে পাড়ার এক মহিলার হাতে তুলে দিয়ে আবার কাজে যাওয়া শুরু করে শান্তা। ঘরের সব খরচ সে একাই চালায়। শোভনের টাকা মাকে পাঠিয়ে দিতে বলে। শোভন প্রথমে আমতা আমতা করলেও পরে রাজী হয়ে যায়।

একদিন শোভন বাথরুমে ঢুকেছে। ওর ফোনে একটা কল আসতে দেখে ফোন ধরে শান্তা। ওপাশ থেকে এক মহিলা খুব ব্যাস্তভাবে বলে, 'মো ... শোভন কই? সে নাই?'

শান্তা বলে, 'ও তো বাথরুমে। আপনি কে বলছেন? আপনার মেসেজটা বলে দিন, ও বেরোলে আমি কলব্যাক করতে বলব'।

'আমি মুক্তা, শোভনের বড়বোন। ওকে বল মা খুব অসুস্থ। এখানে আর চিকিৎসা হবেনা, ঢাকা নিতে হবে। খরচ আমি দেব। সে যেন শীঘ্র ব্যাবস্থা করে'।

থ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে শান্তা। শোভনের বড়বোন? সে তো বাবামার একমাত্র ছেলে! ইনি তবে কে?

শোভন বাথরুম থেকে বেরোলে শান্তা ওকে খবরটা দেয়। শোভন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। ওর প্রশ্নেরও কোন জবাব দেয়না। কিন্তু শান্তা মনে শান্তি পায়না। ফোন যেই করে থাকুক, মা অসুস্থ এটাই এখন প্রায়োরিটি। পরদিন সে অফিস থেকে ফেরার পথে দু'টো টিকেট করে এনে শোভনকে বলে, 'অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। কাল আমরা মাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি'।

প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যায় শোভন। ওর এত রেগে যাবার কারণ বুঝতে পারেনা শান্তা। আজকাল প্রায়ই সে কারণে অকারণে রাগারাগি করে। নিশ্চয়ই মায়ের জন্য মন খারাপ, এই ভেবে পাত্তা দেয়না শান্তা। কোন জবাব না দিয়ে ধীরেসুস্থে স্যুটকেস গুছাতে থাকে। পরদিন ভোরে শোভনের খিটিমিটির মধ্যে ট্যাক্সি ডাকিয়ে বাস স্টেশনে রওয়ানা দেয় ওরা। বাসে উঠেও শোভনের মুডের কোন উন্নতি হয়না। সাত ঘন্টা পর বাস থেকে নেমে রিক্সা নিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ীর উঠোনে থামে ওরা। সাধারন গ্রামীন চাষীদের বাড়ী যেমন। দেখে মনে হয় যেন কতদিন এখানে কেউ থাকেনা। অনেকক্ষণ দরজায় কড়া নাড়ার পর পাশের বাড়ীর এক মহিলা বেরিয়ে এসে বলে, 'তুই এসেছিস, ...র বাচ্চা! বুড়া মা'টাকে উঠানের মধ্যে ফেলে দিয়ে যে চলে গেলি, দুই বছরে একবারও কি মনে হোলনা দেখে আসি বুড়ি মরল না বেঁচে আছে?'

শোভন কোন জবাব দেয়না। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, 'বড়বুবু ফোন করে বলল মা অসুস্থ, সেজন্যই তো এলাম। তো মা কই?'

'সে তো তখনই মুক্তা এসে তোর মাকে নিয়ে গেল। এমন কঠিন রোগী এখানে একা একা বাঁচত কি করে?'

আবার রিক্সায় চেপে বসে ওরা। শোভনের মুখের অবস্থা দেখে শান্তা কোন প্রশ্ন করেনা। শোভনের মা এত অসুস্থ, অথচ মহিলার কোন কমন সেন্স নেই, কিভাবে এত কড়া কড়া কতগুলি কথা বলল বেচারাকে! অথচ সে নিজের স্ত্রী সন্তানের পেছনে ব্যায় না করে প্রতিটি পয়সা মাকে পাঠিয়ে দেয়!

কিছুদূর গিয়ে একটি মোটামুটি অবস্থাপন্ন গৃহস্থবাড়ী দেখা গেল। গৃহস্থ বাড়ীর আঙ্গিনায় আরামকেদারায় বসে পড়ন্ত বিকেলের রোদ পোহাচ্ছিল। ওদের দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। বাড়ীর ভেতর হাঁক শোনা গেল, 'বৌ, তোমার কুলাঙ্গার ভাই এসেছে'। একজন বিশালকায় মহিলা ব্যাস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। কোন অভিবাদন নয়, অভ্যর্থনা নয়, নীরবে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন বাড়ীর ভেতর। একটা বড় কামরার ঠিক মধ্যখানে বিশাল একটা খাটের ওপর শুয়ে আছেন শীর্ণকায়া মা, হাড়ের সাথে চামড়া যেন লেগে গিয়েছে। সেই হাড্ডিচর্মসার দেহের সেবায় ব্যাস্ত তিন চারজন মেয়ে। একজনকে দেখে বুঝা গেল নিশ্চয়ই সেই বিশালকায়া মহিলার মেয়ে, বিবাহিতা, কোলে বাচ্চা, সযত্নে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। যে পায়ে হাত বুলাচ্ছে সে সম্ভবত ওনার ছোটমেয়ে, হয়ত ক্লাস নাইন টেনে পড়ে। আরেকটা মেয়ে ঔষধপত্র গুছিয়ে, বাসী খাবার পানি নিয়ে যাচ্ছে, এর খুব কমই খাওয়া হয়েছে। শোভনকে দেখে কেউ কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না সামান্য নাক কুঁচকানো ছাড়া। শোভন পাত্তা দিলোনা। মায়ের পাশে গিয়ে 'মা' বলে ডাক দিতেই তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। ওকে চিনতে পারার সাথে সাথে এক অপার্থিব চিৎকার বেরিয়ে এলো ওনার গলার ভেতর থেকে। চোখ দিয়ে ফোয়ারার মত পানি বইতে লাগল, 'কি এক হতভাগা জন্ম দিলাম আমি! তুই আমার দুনিয়া আখিরাত সব খেলি। এখন আমি আল্লাহর সামনে গিয়ে কি জবাব দেব?' তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হোল, বুকের ভেতর ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল। সেই বিশালকায়া মহিলা শোভনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে মাকে জাপ্টে ধরল। কিন্তু মাকে রাখতে পারল না। আর দশ পনেরো মিনিট প্রচন্ড কষ্ট ভোগ করে তিনি পার্থিব শরীরটাকে ফেলে রেখে চলে গেলেন।

যে মূহূর্তে স্পষ্ট হয়ে গেল মা নেই, সেই বিশালকায়া মহিলা তার পাহাড়ের মত শরীর নিয়ে অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে শোভনের দিকে ফিরে হিংস্র বাঘিনীর মত গর্জন করে উঠল, 'তুই খুনী, তুই খুনী। তুই আমার মাকে খুন করেছিস। বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। নইলে আমি তোকে খুন করব'। তাঁর দুই মেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁকে আটকে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিল। শোভন কোন কথা না বলে বের হয়ে গেল। এই গলা শান্তার পরিচিত। ইনিই তবে মুক্তাবুবু। সে এগিয়ে গিয়ে মায়ের চোখ দু'টো আলতো করে বন্ধ করে দিলো, ঐ দৃষ্টিতে যে ভয় ছিলো তা সে সহ্য করতে পারছিলোনা। জীবনের সমাপ্তি চোখে দেখতে পেলে নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবে বুঝি এমনই ভয় ছেয়ে

যায় মৃত্যুপথযাত্রীর দুই চোখে। মুক্তা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শান্তা তার কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'বুবু, শান্ত হোন। তিনি তো শোভনেরও মা ছিলেন!'

মুক্তা উদ্ভ্রান্তের মত ফিরে তাকায় শান্তার দিকে। সেই পাহাড়ের মত শরীর আর লাল লাল চোখ দেখে ভয় পেয়ে যায় শান্তা। সে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, 'শোভন? ওর নাম তো মোক্তার! ওকে শোভন নামে শুধু তুমিই চেন'।

শান্তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। না! ওর নামটা! নামটাও সে ওকে মিথ্যা বলেছে?

'মোক্তার বিয়ে করেছিল ঝর্ণাকে। বড়লোকের মেয়েকে সুন্দর সুন্দর কথায় ভুলিয়ে বিয়ে করল ঠিক, কিন্তু কাজ নেই কর্ম নেই, নিজেই চলতে পারেনা, বৌ চালাবে কি করে? ঝর্ণার বাবা মাসে পাঁচ হাজার টাকা ধরে দিলো ওদের কাপড়ের দোকান থেকে। ঐ টাকা আনতে সে মাসে একবার ঢাকায় যেত। ঐ দোকানে গিয়ে দেখা পেলো তোমার। ঝর্ণার তখন বাচ্চা হবে। তখন আর ওকে ভাল লাগেনা মোক্তারের। সে তখন তোমার প্রেমে মজেছে। আমরা অনেক

বুঝালাম, পরে ভাবলাম একবার বাচ্চা হয়ে গেলে সন্তানের মায়ায় সে ফিরে আসবে। মা, আমি ঝর্ণার টুকটাক বদনাম করতাম। এটা না করলে ঘরের বৌয়ের উপর পাওয়ার দেখানো যায়না। কিন্তু আমরা কখনোই চাইনি ওর ঘর ভাঙ্গুক। একবার সে তোমাকে ফোন করে কথা বলার চেষ্টা করে। কি মারটা মেরেছিল ওকে পাষন্ডটা, দুই সপ্তাহ চোখ খুলতে পারেনি মেয়েটা। অথচ পরের দিন সে আবার ওদের দোকান থেকে টাকা আনতে গেল! মেয়েটার যে এত সহ্যশক্তি ছিলো! এগুলো কিছুই সে তার বাবামা ভাইদের বলতনা। পালিয়ে বিয়ে করে একবার ওদের সমাজের কাছে অপদস্থ করেছে, আবার যাতে কিছু না হয় সেজন্য কি সহ্য করেনি সে! কিন্তু পারলনা তো সংসারটা টিকাতে। তোমার মোটা মাথায় কিছুই ঢুকলোনা।

তোমার কাছে শেষ একবার আর্জি জানানোর জন্য আমিই ওকে ফোনটা করে দেই। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। শোভন টের পেয়ে ওকে মারতে মারতে ঘর থেকে বের করে দিলো। মানুষ কোন পশুকেও ঐভাবে মারেনা। অবুঝ বাচ্চাটা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। মেয়েটা সেই সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে বন্ধ দুয়ারের বাইরে বসে কাঁদল। কিন্তু মোক্তার আমাদের দরজার কাছেও যেতে দিলোনা। ঝর্ণাকে মারতে দেখে মা 'অ্যাই, ওকে ছেড়ে দে' বলে চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন বুঝিনি মায়ের স্ট্রোক হয়ে যায়। আমি মাকে নিয়ে বসে আছি, ডাক্তার আনার জন্য চিৎকার করে কাঁদছি, এর মধ্যে সেই পশুটা দরজা পাহাড়া দিতে দিতে তোমাকে বিয়ের খোশখবর শোনায়, বাইরে তখনও বৌটা বসে কাঁদছে। আমার অসুস্থ মা'টাকে চিকিৎসার কথা বলে ঢাকায় তোমার বিয়ে খেতে নিয়ে যায়। আবার দুইদিন পর বাড়ীর উঠানে ফেলে রেখে চলে যায়। এই দুই বছরে না একটা টেলিফোন, না একটা টাকা, না কিছু ...'

'কিন্তু ও তো ওর বেতনের সম্পূর্ন টাকা মায়ের জন্য পাঠাত!'

'ও কিছু করলে তো বেতন! ঝর্ণাদের দোকানের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তো একটা টাকাও আয় করে নাই, তাহলে টাকা পাঠাবে কোত্থেকে?'

পৃথিবীটা দুলে ওঠে শান্তার চোখের সামনে। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

পরদিন একটা অপরিচিত খাটে নিজেকে আবিষ্কার করে শান্তা। মুক্তাবুবুর বড় মেয়েটা নিজের বাচ্চা আর মায়াকে মাদুর পেতে একসাথে রোদে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। এই অনিন্দ্য সুন্দর ভালোবাসার দৃশ্যটা দেখে শান্তার মনে হয় যেন গতরাতে যা ঘটেছে তা ছিলো এক দুঃস্বপ্ন। কিন্তু প্রত্যক্ষ সবকিছু সাক্ষ্য দেয়, ওর দুঃসহ স্মৃতিটা আসলেই বাস্তবতা।

সে মাথা তুলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কি?'

'নাবিলা'।

'তুমি কি একটু মায়াকে দেখবে? আমি একটু বাইরে যাই। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে'।

'ও মা, আমি তো রাত থেকেই ওকে দেখছি! আপনি যান'।

মাথা ঝিমঝিম করে শান্তার। পুকুরপাড়ে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে ঝির ঝির বাতাসে মাথার ভেতরের সব জঞ্জাল উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে সে। একটু পর একটা শিশুর খিল খিল হাসির শব্দ, সাথে কোন নারী, সম্ভবত শিশুটির মায়ের, প্রশ্রয়দায়িনী নির্মল হসির আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকায় শান্তা। পুকুরের ঐ পাড়ে একটা অসম্ভব সুন্দর শিশু এক অসম্ভব রূপবতী মায়ের কোলে বসে স্বর্গীয় হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে পুরোটা পুকুরপাড় জুড়ে। মেয়েটার সাথে চোখাচোখি হয়ে যায় শান্তার। সেই টানা টানা চোখ কি যেন বলতে চায়। দু'জনই দু'জনের দিকে এগিয়ে যায় অমোঘ আকর্ষনে।

মেয়েটা অপ্সরীর মত রিনরিনে কন্ঠে বলে, 'শান্তা, তাই না?'

গলাটা কেমন পরিচিত মনে হয়। কিন্তু একটা অপরিচিত মেয়ে ওকে নাম ধরে ডাকছে, ব্যাপারটাতে প্রচন্ড অবাক হয় শান্তা। মেয়েটা আবারও বলে, 'তুমিই তবে শান্তা, মোক্তারের ... শোভনের বৌ'।

'তুমি?'

'আমি ঝর্ণা। মোক্তারের ... শোভনের বৌ ছিলাম'।

শান্তার বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আসে, সে ঝর্ণার দু'হাত মুঠো করে ধরে বলে, 'বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না'।

ঝর্ণা বলে, 'না, তুমি জানতে চাওনি'।

কোন অভিযোগ না, অভিমান না, নিখাদ সত্যের উপস্থাপনা। আসলেই তো, সত্য বার বার শান্তার সামনে এসে কড়া নেড়েছে কিন্তু সে নিজের সুখের পেছনে ছুটতে গিয়ে কিছুতেই তার আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি।

'তুমি আমাকে মাফ করে দিয়ো'।

'সে তো কবেই দিয়েছি! মোক্তারের বৌ হওয়াটাই তো একটা শাস্তি! আমি আর তোমার ওপর রাগ রেখে কি করব? আমি পাপ করেছিলাম। ওকে বিশ্বাস করে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলাম। তার শাস্তি তো আমি, আমার বাবামা, আমার পুরো পরিবার মিলে পেলাম। ও আমাকে বের করে দিয়ে আসলে আমাকে মুক্তি দিয়েছে, আমার গুনাহ শেষপর্যন্ত মাফ হয়েছে'।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্তা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়, 'পুকুরের ঐ পাড়ে আলিশান বাগানবাড়ীটা নিশ্চয়ই তোমার বাপের বাড়ী!'

'কে বলল? ওটা আমার বাড়ী। আমার স্বামীর বাড়ী। তিন বছর আগে ওর বৌ মরল বাচ্চা হতে গিয়ে। সে সিদ্ধান্ত নিলো আর বিয়ে করবেনা। কিন্তু যখন মোক্তার আমাকে বের করে দিলো তখন মুক্তা বুবু ওর সাথে কথা বলে,

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করল। কেমন হালে আছি তা তো দেখছই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা মানুষটা খুব ভাল। আমাকে, আমার বাচ্চাকে নিজের মত করে যত্ন করে'।

'বিশ্বাস কর, তুমি ভাল আছ দেখে ভাল লাগছে। আমাকে মাফ করে দিয়ো ঝর্ণা'।

ঝর্ণা কিছু বললনা। মুক্তাকে এগিয়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি বুবু, লোকজন কবর দিয়ে ফিরেছে?'

'আমার ছেলে ছোটটা এসে বলল মোনাজাত শেষ, যেকোন সময় ফিরবে। রায়হানকে বলেছি আমাদের এখানে এসে নাস্তা খেতে, তুমিও চলে আস'।

তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে শিশুটিকে কোলে আহ্বান করে, শিশুটিও খিল খিল করে হাসতে হাসতে মুক্তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শান্তার দিকে তাকিয়ে মুক্তা বলে, 'ওর নাম মুসলিম'। তারপর আর কিছু না বলে বাড়ীর দিকে এগোতে থাকে। শান্তা আর ঝর্ণা নিঃশব্দে অনুসরন করে।

নাস্তার পর্ব শেষে শোভন আর শান্তা ফিরে আসে ঢাকায়। ঝর্ণার স্বামী রায়হানকে এক নজর দেখে ওর মনে হয় এই বাড়ীর সবাই যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনই মনের দিক থেকেও পবিত্র। ওদের সাথে নিজের ভাগ্যের তুলনা করে কেমন একটা হাহাকার জন্মায় ওর মনের ভেতর।

ঢাকায় ফিরে আগের মতই সংসার চলতে থাকে ওদের। গ্রামে যাবার ঘটনা নিয়ে কেউ কথা তোলেনা। শান্তা থাকে ওর নিজের জগত নিয়ে, আর শোভন পড়ে থাকে ওর মোবাইল নিয়ে। একদিন শান্তার মাথায় আসে, শোভনের তো কোন বন্ধু নেই, আত্মীয়স্বজন ওকে ঘৃণা করে, তাহলে সে সারাদিন মোবাইলে কি করে? একদিন কৌতুহলী হয়ে শোভন বাথরুমে থাকার সুযোগে কল হিস্ট্রি চেক করে শান্তা। শুধু একটা কল দেখাচ্ছে, আর পুরোটা ফাঁকা। অথচ শোভন সকাল থেকে অন্তত দশটা কল করেছে। ঐ নাম্বারে কল দিয়ে শুনতে পায় একটা অপরিচিতনারীকন্ঠ, মনের মাধুরী মিশিয়ে বলছে, 'কি? আমাকে ছাড়া থাকা যায়না, না?' হুঙ্কার শুনে পেছন ফিরে দেখে শোভনের উদ্যত হাত, ওর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফেরে তখন রাত। শান্তা নিজেকে আবিষ্কার করে ড্রয়িং রুমের ফ্লোরে, যেখানে সে পড়েছিলো সেখানেই। মায়া এলোমেলো হয়ে ঘুমিয়ে আছে ড্রয়িং রুমের সোফায়, চেহারাই বলছে ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেডরুমে শোভন পুরো বিছানা জুড়ে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, নাক ডাকছে অল্প অল্প। শান্তার আজ রাতে ইউনিভার্সিটির বান্ধবীদের সাথে একটা ছোটখাটো পুণর্মিলনী হবার কথা ছিলো, স্লিপ ওভারের মত। সে কিছুক্ষণ সোফায় বসে ভাবে। তারপর বারান্দায় গিয়ে সেলফোন থেকে বান্ধবী আলিয়াকে কল দেয়, 'আলিয়া, নাতাশা আনিকা ওরা এসে পৌঁছেছে? আমি পথে দোস্ত, জ্যামে আটকে আছি। ট্রাফিকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না? কতক্ষণে পৌঁছাতে পারব জানিনা। কিন্তু পথে যেহেতু, কোন না কোন এক সময় তো পৌছবই। আজ সারারাত একটুও ঘুমাবো না, শুধু গল্প করব, এই আমি কথা দিলাম। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। তুই টেবিলে খাবার দে'।

বারান্দা থেকে রান্নাঘর হয়ে বেডরুমে যায় শান্তা। কিছুক্ষণ পর মুখহাত ধুয়ে, জামাকাপড় বদলে, ব্যাগ আর ঘুমন্ত মায়াকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দরজাটা খোলা রেখে।

সারারাত গল্পগুজবে কাটিয়ে দুপুর বারোটার দিকে বাড়ী ফিরে শান্তা দেখে ঘরভর্তি পুলিশ। 'কি ব্যাপার? আপনারা আমার ঘরে কি করছেন?' পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করেন সে কোথায় ছিলো, কোথা থেকে আসছে। শান্তা আলিয়ার নাম্বার দেয়। পুলিশ অফিসার আলিয়াকে ফোন করে নিশ্চিত হোন। তারপর বলেন, 'সরি ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। আমরা আপনাকে সন্দেহ করছিনা, কিন্তু এটা রুটিন চেক ছিলো। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই হ্যাভ স্যাড নিউজ ফর ইউ। আমরা অনুমান করছি আপনারা যাবার পর আপনার হাজব্যান্ড দরজা খোলা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। বাসায় সম্ভবত ডাকাত পড়েছিল। হয়ত আপনার হাজব্যান্ড ঘুম থেকে জেগে যান, ওরা ওনাকে খুন করে সম্ভবত ভয়ে পালিয়ে যায়। ঘরের জিনিসপত্র তেমন কিছুই নিতে পারেনি। আই অ্যাম সরি ফর ইয়োর লস'।

শান্তা কোন কথা বলতে পারেনা। মায়াকে শক্ত করে চেপে ধরে সোফায় বসে পড়ে। একজন মহিলা পুলিশ অফিসার এসে ওকে বাতাস করতে থাকে। দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকে শান্তার। সে মনে মনে বলে, 'আই অ্যাম নট'।

ছেড়ে দেওয়ার আগে একবার ভাবলি না!

ঝুলে পড়ার আগে বুঝলিনা জীবন কারে কয় ...

27 September 2014

লেখকঃ সাজিদ ইসলাম

বিসমিল্লাহিররাহমানির রাহিম

রুবেল বড়ুয়া! চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে আমরা একই সেকশনে পড়তাম। কলেজে ভর্তি হয়েই প্রথমে যে কয়জন ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয় রুবেল বড়ুয়া তার একজন। প্রায়ই আমরা একসাথে বসতাম। খুব সুন্দর গানের গলা ছিল তার। কলেজ জীবনের শুরুতেই মিনারের ডানপিঠে এ্যালবামটা খুব জনপ্রিয় হয়। মিনার আমাদের ব্যাচেরই, বি এ এফ শাহিন কলেজে পড়ত। রুবেল বলত ওর মত গলায় সফটওয়ার বসালে এরকম গান আমি গওায় গওায় গাইতে পারি। আমার এখনো মনে আছে সে টেবিলে আঙ্গুলের ঠোকা দিয়ে 'জানি তুই আমার সাথে একলা পথের পথিক হয়ে গাইবি না গান'গানটা খুব সুন্দর গাইত। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের মিড টার্মে আমি ফিজিক্সে ফেল করলাম। কেমিস্ট্রি পরিক্ষার দিন ম্যাথের সঞ্জয় স্যার পাশের জনের সাথে কথা বলেছিল বলে রুবেলের খাতার কিছু উত্তর কেটে দিল। বেচারা কেমিস্ট্রিতে ফেল করল। এরপর একদিন শুনলাম প্রাইভেট পড়তে গিয়ে রুবেল আর বাসায় ফেরেনি, নিখোঁজ! দুই তিন দিন পর তার খোঁজ মিলল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল রুবেলের লাশ! জানি না কি এক অভিমানে, কি এক কষ্টে, কি হতাশায় কিংবা না পাওয়ার বেদনায় রুবেল ছেলেটা সুইসাইড করল। আর আমিও জীবনে প্রথম খুব কাছ থেকে দেখা একজনকে জানলাম যে সুইসাইড করেছে।

ইংরেজি বই পড়তে খুব একটা সাচ্ছন্দ্যবোধ করিনা। কিন্তু recently একটা বই পড়ে মনে হল জীবনটা এত সুন্দর কেন। শায়খ আরেফির লেখা 'enjoy your life'. বইটার শুরুতে শায়খ বলেছেন ছোট বেলায় ডেল কার্নেগীর লেখা বই তাকে কি পরিমাণ অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু তিনি ভীষণ অবাক হলেন মানুষকে জীবনে সফলতার পথ দেখানো, জীবন উপভোগের কারিকুলাম শেখানো ডেল কার্নেগী নিজেই মরেছেন সুইসাইড করে।

যারা গ্রামে থাকেন বা মাঝে মাঝে গ্রামে যান একদিন সময় করে অন্ধকারে জোনাকি পোকা দেখবেন। দেখে মন হবে ইশ, কি ক্ষমতাএই পোকার! অন্ধকারে আলো জ্বালতে পারে! কিন্তু মজার বিষয়টা হচ্ছে দিনের আলোতেজোনাকি পোকাদের খুঁজে পাওয়া যায়না আর তাদের কথা কেউ মনেও রাখেনা। ঠিক যেমনিভাবে বহু আকাঙ্ক্ষিত জোছনা ছড়ানো চাঁদের কথা দিনের আলোতে কেউ মনে রাখেনা। যাদের দেখে এই দুনিয়ায় আমরা অনুপ্রেরণা খুঁজি, সফলতা খুঁজি, যাদের আমরা রোল মডেল ভাবি সেই মানুষগুলো অন্ধকারে জোনাকি পোকার মত। তাদের সাময়িক আলো দেখে ঈর্ষা হবে খুব কিন্তু সত্যের আলো যেদিন স্পট হবে এই মহামানবরা(!) জোনাকি পোকার মত অর্থহীন হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে! আর এসকল জোনাকি পোকার পেছনে ছুটতে ছুটতে একসময় যখন সত্যের আলো এসে পড়ে, যখন দুচোখের রঙিন পর্দা খসে পড়ে, যখন সামনের অনুকরণীয় মানুষগুলো মরুভূমির মরীচিকার মত ভ্যানিস হয়ে যায় তখন মানুষ দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আশাহত মানুষ তখন জীবনের কোন দিশা খুঁজে পায়না। 'কি হবে এই জীবনরেখে' 'I quit' 'বিদায় হে পৃথিবী' হয় তখন আশাহত মানুষগুলোর সান্ত্বনার সমাধান!

মানুষ যখন কৃতজ্ঞতা, শোকর গোজার,আনুগত্য এই বিষয়গুলো থেকে বিচ্যুত হয় তখন মানুষের ভেতর অহংকার, অবাধ্যতা আর অকৃতজ্ঞতা এসে ভর করে। সে কখনো নিজের অবস্থান নিয়ে সুখি হয়না। তার শুধু চাই আর চাই। আরও চাই আরও! সাইকেল পেলে বাইক চাই, বাইক পেলে এবার গাড়ী চাই, গাড়ী যখন হল এবার একটা বিএমডব্লিউ চাই। পাশের বাড়ির জরিনারে পেলে এবার আধুনিকা জেরিনের দিকে চোখ! এভাবে চাইতে আর পেতে পেতে একসময় মানুষ চাওয়ার কিছু পায়না। তখন মনে আধ্যাত্মিক কিছু খটকা লাগে। জীবনের কোন উদ্দেশ্য সে খুঁজে পায়না। সে বুঝে উঠতে পারেনা এই পৃথিবীতে সে আসলে কি করছে! সুখের জীবন তখন তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় মৃত্যুর দিকে! নিজের তৈরি করা সুখের জীবনে নিজেই বেজার হয়ে অনেকেই বেছে নেয় "আত্মহত্যা"!!

এত সস্তা তোর জীবন? এতই অর্থহীন?পছন্দের মানুষটিকে পেলি না বলে দুইজনই গলায় ফাস দিয়ে ঝুলে পড়লি? ভাবলি বিরাট কিছু করে ফেলেছিস? আরে বোকা কোন জীবনের উপর অভিমান করছিস তুই তো জীবন কি সেটাই বুঝিসনি! A+ না পাওয়াই আত্মহত্যা করা ছোট্ট মেয়েটার কাছে A+ পাওয়াটাই ছিল সবকিছু! শেয়ার বাজারে লস দিয়ে আত্মহত্যা করা মানুষগুলো! টাকাসর্বস্ব জীবনের গল্পগুলো এর চেয়ে সুন্দর যে হয়না!! খ্যাতির পেছনে ছুটতে ছটতেহাঁপিয়ে উঠা জিয়াহ খান, দিব্যা ভারতী কিংবা মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করা আশাভোশলের মেয়ে! আফসোস! যে জীবনের স্বপ্ন তারা আমাদের দেখায় সে জীবনের কাছে তারা নিজেরাই পরাজিত! মানুষগুলো একবারও ভাবেনা। একবারও ভাবেনা এই জীবনের একটা অর্থ আছে। সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা উদ্দেশ্য আছে। একবারও কেউ বুঝতে চায়না জীবন আসলে কি ...

ভাগ্য! তাকদীর! দুনিয়ালোভী মানুষগুলোর খুব ক্ষোভ এই তাকদীরের উপর! ভালোকিছু পেলে তো হলই না হলে সব ভাগ্যের দোষ! জীবনে খারাপ কিছু ঘটলে তাকদীরকে দোষারোপ! অমুকের এটা ওটা আছে আমার কেন নেই, অমুক ধনী আমি কেন ফকির ব্লা ব্লা ব্লা! একবার এক দীনী ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম। তার ছোট ভাই এসে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভাইয়া! মানুষের সবকিছু যদি আল্লাহ নির্ধারণ করে থাকেন, আমি যা করব তার সবকিছু যদি আল্লাহ আগে ভাগেই ঠিক করে রাখেন তাহলে আমি যদি এখন সুইসাইড করি সেটাও তো আল্লাহ ঠিক করেছেন। তাহলে আমার পাপ হবে কেন?" এধরনের প্রশ্নগুলো অমুসলিমরাও সবসময় করে। আর এই প্রশ্নগুলো দিয়ে শয়তান মানুষকে ফাঁদে ফেলে ঈমানকে হালকা বানিয়ে ফেলে। যদি সিম্পলকথায় বলি তাহলে তাকদীরের বিষয়টা আল্লাহ নিজের হাতে রেখেছেন এবং এর ব্যাপারে মানুষকে জানাননি। এটা আল গায়েব- unseen! আমাদের ক্ষুদ্রমস্তিস্কে এর সম্পর্কে জানাও সম্ভব নয়। আল্লাহতায়ালা মানুষের তাকদীর নিজের হাতে রেখেছেন এবং তিনি যা চান তাই হবে কিন্তু মানুষকে পছন্দ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলছেন,

বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব,যার ইচ্ছা,বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। [সুরা কাহাফ ২৯]

আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। [সুরা ইনসান ৩]

অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে,সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে,সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। [সুরা আশ-শামস ৮-১০]

বলা হয় যে, আলী (রা) কে একলোক এসে বলছিলো, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, এটা একটা সমুদ্রের মতন, একবার নামলে কুল খুঁজে পাবে না (অর্থাৎ মানুষের পক্ষে সাতার কেটে সমুদ্রের অপর পাড়ে পৌছানো অসম্ভব। তেমনি সীমিত জ্ঞান নিয়ে গায়েব পরিপূর্ণভাবে বোঝাও অসম্ভব)। লোকটি তারপরেও বারবার একই দাবী করতে থাকলো। আলী (রা) তখন তাকে বললেন, তোমার একটা পা তোল। লোকটি এক পা তুললো। তাকে বলা হলো, এবারে আরেক পা তোল। লোকটা বললো, এটা তো সম্ভব না। আলী (রা) বললেন, তোলার চেষ্টা কর ভালভাবে। লোকটি বললো, চেষ্টা করলেও সম্ভব না। আলী (রা) তখন বললেন যে এটাই হচ্ছে তাকদীর।

খেয়াল করার বিষয়, এইটা একটা রিয়েলিটি যে মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন দুই পা একই সাথে মাটি থেকে ওপরে তোলা তার জন্য অসম্ভব। আবার একটা পাখির জন্য সম্ভব। এখন, আমরা আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে যতই চেষ্টা করি না কেন যে জ্ঞানটা (গায়েব) আল্লাহতালা আমাদের কাছ থেকে আড়াল করেছেন সেটা আমরা কোনভাবেই বুঝতে পারবো না।

এবারে আসি তাকদীর ও ইচ্ছা শক্তির বিষয়ে। প্রথম পা ওঠানোর সময় (১) লোকটির ইচ্ছা শক্তি ছিল, (২) লোকটির চেষ্টা ছিল, (৩) আল্লাহর ইচ্ছা/অনুমতি ছিল। সুতরাং কাজটি করা গেছে। দ্বিতীয় পা ওঠানোর সময় (১) লোকটির ইচ্ছা ছিল, (২) লোকটির চেষ্টাও ছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা/অনুমতি ছিল না তাই করতে পারে নি। সব কাজের ক্ষেত্রেই এই তিনটি বিষয় জড়িত। এর মধে তৃতীয়টা যেটা আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেটা নিয়ে কারোরই কিছু করার নেই। আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেবেন বা পুরষ্কৃত করবেন প্রথম দুটোর জন্য। কেউ যখন কোন খারাপ কাজ করছে তখন আল্লাহ তাকে অনুমতি দিয়েছেন খারাপ কাজ করবার, আল্লাহ না চাইলে সে তা করতে পারতো না। তবে এর সাথে তার নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং চেষ্টা জড়িত। সেটার জন্য সে শাস্তি পাবে। ভালো কাজের জন্যও একই কথা।

মোটকথা, তাকদীর আল্লাহতা'আলা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারবো না – সেটা নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের কাজ না, কেননা এটা গায়েব। আমাদের সামনে ভালো ও মন্দ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং চেষ্টার জন্য আমরা দায়ী থাকবো। সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে।

আমি প্রায়ই কিছু হলে বলতাম "জীবনটা তেজপাতা হয়ে গেল"। সেদিন এক বন্ধু কিছু একটাতে হতাশ হয়ে তেজপাতার প্রসঙ্গ আনলে তাকে একটা উপমা দিলাম! যাদের চা বানানোর অভ্যাস আছে তারা জানবেন রঙ চা বানানোর সময় তেজপাতার একটা ব্যবহার আছে সুগন্ধ আনার জন্য। এমনি তেজপাতা খুব একটা সুগন্ধ ছড়ায় না কিন্তু ফুটন্ত পানিতে তেজপাতা ছেড়ে দিয়ে দেখুন তো!! এক মনভরে যাওয়া সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। আমার বন্ধুকে বললাম দেখ দুই হচ্ছিস আসলেই একটা তেজপাতা! তোর জীবনে দুঃখ আসবে, কষ্ট আসবে, না পাওয়ার হতাশা থাকবে। এসব কিছু হচ্ছে ফুটন্ত পানির মত। এই ফুটন্ত পানিতে নামলে তবেই তো জীবনের সুঘ্রান পাবি। জীবনের আসল স্বাদ বুঝতে পারবি। সুনবাহানাল্লাহ! আমরা তার উল্টোটা করি। কিছু হলেই ধুমদাম ভাগ্যের দোষারোপ। আল্লাহর রহমতের নাফরমানি। আল্লাহর আনুগত্য থেকে অবাধ্যতায় নেমে আসে অহংকারি মন। জীবনটা তো তেজপাতাই, কিন্তু তার সুঘ্রান পায় কয়জন??

একদিন বাসায় ঢুঁকে দেখি আমার মা আর আপু মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছে। হঠাৎ টিভি স্ক্রিনে চোখ আটকে গেল। গা শিরশির করে উঠল। একজন মানুষকে শিখানো হচ্ছে কি করে সুইসাইড করতে হবে! একেবারে হাতেকলমে, উপকরণসহ! পরে অবশ্য বুঝলাম ব্যাপারটা তার উল্টো কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমাজের সুইসাইড কেসগুলো দেখি তাহলে বুঝব তার বেশীরভাগই ফিল্মি কায়দায় সুইসাইড। গল্প উপন্যাস নাটকে আমাদের শেখানো হবে জীবনের উপর অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করা এটা আধুনিক জীবনেরই সংস্কৃতি! ভিলেনের কাছে ধর্ষিত হয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলে আত্মহত্যা করবে নায়িকার ছোট বোন__ এটা বাংলা ছবির অবিচ্ছেদ্য অংশ! জীবন কি এটা শেখানোর আগে আমাদের শেখানো হয় জীবন নাশ কিভাবে করতে হয়। তাইতো ছোট্ট কোন না পাওয়ার অভিমানে ছোটছোট ছেলেমেয়রা টুস করে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়ে, বিষের বতল খুলে গিলে ফেলে কিংবা বাসার ছাদ থেকে লাফ দেয়। একটু আধুনিক কায়দায় কাজ সারতে কেউ কেউ আবার দেয়ালে লিখে যায় 3 idiots মুভির দৃশ্যের মত 'I quit' কিংবা বাবামায়ের কাছে ক্ষমাপত্র!

মহান আল্লাহ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া আপনাকে আমাকে এখানে পাঠাননি। সূরা আযযারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন সেই উদ্দেশ্যের কথা, **"আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে, তারাশুধু আমারই ইবাদাত করবে"।**

এছাড়া আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মানুষের কর্মপন্থা ঠিক করে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত ও জাহান্নামের কথা। জীবনের মানসিক প্রশান্তি,আত্মার সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, ঘুমানো থেকে পায়খানা প্রশ্রাবের আদব সবকিছু রাসুল (স:) আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমাদের নিজস্ব স্বাধীনতা আর ইচ্ছেশক্তি আছে। যদি প্রশ্নকরি what is life? তাহলে সিম্পল উত্তরটা হবে birth to death! আর এই birth to death এর মাঝখানের সময়টাতে আছে আমাদের choice! প্রতিটা কাজে, চিন্তায়, উদ্দেশ্যে আমরা কি choose করেছি at the end of the day সেটাই আমাদের জীবনকে define করবে। প্রবৃত্তির পূজা করে জোনাকি পোকাদের দেখানো জীবনের পেছনে ছুটার স্বাধীনতা যেমন আমাদের আছে তেমনি আল্লাহর গোলামী করে আখিরাতের প্রতিশ্রুত পাথেয় সংগ্রহের স্বাধীনতাও আমাদের আছে। your choice will define your life! তবে আমি আপনাকে বলে দিতে চাই জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন এক দুর্বল সময়ে আপনাদের মনে অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে what's the purpose of life?জীবন কি? কি করছি আমরা এই দুনিয়ায়? যে মানুষটি আল্লাহর গোলামী করে গেছে জীবনভর সে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানে তাই সে হাসিমুখেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। আর যারা এর কোন উত্তর খুঁজে পায়না তাদের অবস্থা হয় শোচনীয়। মৃত্যু তার দিকে ধেয়ে আসার আগেই অনেক কাপুরুষের কাছে তাই "সুইসাইড" হয় একটা সমাধান!!

নিজেকে সবকিছু থেকে বেশী ভালোবাসা, আত্মকেন্দ্রিক, আত্মভোলা মানুষগুলোর জীবনের দিকে তাকালে দেখবেন সেখানে আসলে সুখ বা সাচ্ছন্দ্য বলতে কিছুই নেই। এই লেখাটা লিখতে গিয়েই তাই জীবনে প্রথমবার উপলব্ধি করলাম কেন রাসুল (সঃ) নিজের জান মাল, পিতামাতা, সন্তান সবকিছু থেকে আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসা জান্নাতে প্রবেশের শর্ত করে দিয়েছেন! সুবাহানাল্লাহ! আমি রাসুল (সঃ) এর সিরা পড়েছি। অনেক সাহাবীর জীবনী পড়েছি, অতীত বর্তমানের অনেক ইসলামী শায়খকে চিনি। আমি এরকম কাউকেই পাইনি যিনি নিজের জীবনের উপর হতাশ হয়ে, দুঃখে কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে, ভাগ্যকে দোষারোপ করে সুইসাইড করেছেন। কারন একজন মুসলিম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে বেঁচে থাকে আর আল্লহকে সন্তুষ্ট করতে মরে। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহর আনুগত্য করে,আল্লাহর জন্য জীবন অতিবাহিত করে আল্লাহ তার সাথে অবিচার করবেন না কোনদিন। একজন মুসলিম জানে আল্লাহর হুকুম পালনেই কল্যাণ আর আল্লাহর হুকুম থেকে বিচ্যুত হওয়াতেই অকল্যান।

"... কিন্তু তোমরা কোনকিছু অপছন্দ কর সম্ভবত তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর এবংসম্ভবত কোনকিছু তোমাদের কাছে প্রিয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহইভালো জানেন তোমরা তা জান না"। [সূরা বাক্বারাঃ ২১৬]

বেঁচে থাকতে শিখুন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর রহমত আর হেদায়াত থেকে নিজের জন্য কিছু সংগ্রহ করুন। আল্লাহ যতক্ষন আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ধরে নিন ততক্ষণ আপনার অনেক কিছু করার আছে। প্রচুর অক্সিজেন এখনো আছে নিশ্বাস নেওয়ার। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের জন্য কিছু সময় আছে। জীবন শেষকরে দেয়াটাই যদি সমাধান হত তাহলে মানুষের তো জন্ম নেওয়ারই কোন দরকার ছিলনা ভাই।অনেক সময় আসবে যখন জীবনটা অর্থহীন মনে হবে। মনে হবে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। অনেক সময় আসবে যখন চাওয়া আর পাওয়াগুলো মিলবে না। মনে করুন আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে আপনাকে বাছাই করেছেন ঈমানের পরীক্ষায়! এখানে জীবনের উপর দোষারোপ করে শয়তানের হাসির পাত্র হবেন না। আপনার স্বপ্নগুলো বড় করতে থাকুন। পছন্দের মানুষটাকে পাননি বলে সুইসাইড করতে পারেন কারন আপনি জান্নাতের সুশোভিত বাগানে প্রিয় মানুষটাকে নিয়ে সময় কাটানোর স্বপ্ন কোনদিন দেখেননি। পরীক্ষায় ভালো করেননি বলে, ভালো চাকরিটা পাননি বলে, খ্যাতি আপনার হাতে ধরা দেয়নি বলে সুইসাইড করে মনে করছেন জ্বালা মিটিয়েছেন? আসলে আপনার জীবন ছিল অতটুকুই। আপনি কোনদিন এর বাইরে ভাবতে পারেননি। আপনি কোনদিন আপনার এই জীবনের উল্টোপিঠে আল্লাহর একত্ববাদের, ইসলামের ন্যায়, শৃঙ্খলার জীবনের সৌন্দর্য দেখেননি!

রাসুল (সঃ) বলেছেন কখনো নিজের সৌন্দর্য আর ধনসম্পদের পরিমাপ দেখতে চাইলে তোমার চেয়ে নিচেদের দিকে তাকাবে। পৃথিবীটা অনেক সুন্দর ভাই। অনেককিছু করার আছেএখানে আপনার। অনেক অনেক কিছু। জীবনটা শেষ করে দেবেন? তাতে কি আপনার না পাওয়াগুলো পূরণ হবে? আক্ষেপগুলো মিটে যাবে?তার কিছুই হবেনা। যেটা হবে আপনি কোনদিন এই সুন্দর পৃথিবীতে আর ফিরে আসতে পারবেননা। আর কোনদিন সকাল বেলার রোদ দেখে চিৎকার করে উঠতে পারবেন না। আর কোনদিন ঝুমবৃষ্টিতে হৈ চৈ করতে পারবেন না। আর কোন দিন মন খারাপ করে কাঁদতে পারবেন না। আর কোনদিন প্রিয় স্ত্রীর হাত ধরে সমুদ্র সৈকতে হাঁটতে পারবেন না। আর কোনদিন রমজানের সেহেরি ইফতারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারবেন না। আর কোনদিন ঈদের নামাজ পড়ে বাবা মাকে সালাম করে সেলামি নিতে পারবেন না। আর কোনদিন আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে পারবেন না। আর কোনদিন আল্লাহর কাছে তাওয়া করে সিজদায় অবনত হতে পারবেন না। আর কোনদিন আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে এই পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছে আপনার কবুল হবে না ভাই। কোনদিন না!

কি? ন্যাকামু মনে হচ্ছে? সস্তা আবেগ মনে হচ্ছে?? একবার মরে গিয়ে দেখুন,তাহলেই বুঝবেন এই আবেগগুলো কত দামি! এই আবেগগুলোর মতই দামি আপনার জীবন! আল্লাহর নির্ধারিত সময় ফুরানোর আগেই জীবনের অর্থটা খুঁজে নিন। আর কেউ না হোক মহান আল্লাহআ পনার সাথে আছে। ভালো থাকুন, বাঁচতে শিখুন, জীবনকে ভালবাসতে শিখুন আর দোয়া করুন, "ইহদিনাসসিরাত্বাল মুস্তাকিম__ হে আল্লাহ আমাদের সহজ সরল পথে পরিচালিত করুন"।

আমরা কি আত্মহত্যা করতে পারি ?

25 April 2015

লেখকঃ **রেহনুমা বিনত আনিস**

'আন্টি, আত্মহত্যা করা কি জায়েজ আছে?'

মেয়েটার দিকে তাকালাম। বয়স পনেরো ষোল হবে। স্কিন টাইট জিন্স, হাতাকাটা টি-শার্ট, তার ওপর সি থ্রু ফুলহাতা সোয়েটার শরীরের ওপর আঁটসাট হয়ে রয়েছে, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। ওর সতেরো বছর বয়সী ভাইটা প্রশ্ন শুনে নড়েচড়ে বসল। ওর সদ্য গজানো গোঁফদাড়ির আড়ালে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি।

আমার এক বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়ে এই পরিবারের সাথে দেখা। ওদের বাবামা খুব চিন্তিত ছেলে নামাজ পড়েনা, মেয়ে পর্দা করেনা। এই নিয়ে প্রতিদিন বাসায় অশান্তি, ছেলেমেয়েদের সাথে চেঁচামেচি। বেড়াতে এসেও এই নিয়ে সর্বসমক্ষে আলাপ। বিগত বিশ বছরের শিক্ষকতা এবং মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি- বাচ্চাদের সাথে কথা বলার জন্য প্রয়োজন অটুট ধৈর্য্য, তাদের কথা শোনার জেনুইন আগ্রহ, তাদের বক্তব্যকে পজিটিভভাবে গ্রহণ করার সংকল্প এবং তাদের কিছু বুঝিয়ে বলার সময় তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি সম্মান রেখে যুক্তিগ্রাহ্য উপস্থাপনা। বাচ্চাদের জেরা করলে, তাদের কথায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করলে, তাদের পাত্তা না দিলে কিংবা অপদস্থ করলে তারা আপনার কাছ থেকে নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নেবে, সে খোল আর কিছুতেই খোলা সম্ভব হবেনা। এতগুলো মানুষের সামনে ছেলেমেয়েগুলোকে এভাবে পর্যুদস্ত হতে দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ওদের আলাদা ঘরে নিয়ে বসালাম, ওদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম।

ছেলেমেয়ে দু'টির সাথে বাক্যালাপের এক পর্যায়ে বুঝতে পারলাম সম্পূর্ন দোষ ওদের বাবামায়ের। এই বেচারারা আল্লাহ কে চেনেনা, রাসূল (সা) কে জানেনা, ইসলাম কি বা কেন তাদের কোন ধারণা নেই। বললেই হবে নামাজ পড়, পর্দা কর? বাবামাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বেচারারা দিনরাত লেখাপড়া করছে, শ্রেয় থেকে শ্রেয়তর রেজাল্ট করার জন্য দিনের আরাম রাতের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে- এর পেছনে একটা যুক্তি আছে, ভাল লেখাপড়া করে ওরা ভাল ক্যারিয়ার গঠন করবে, অনেক টাকা ইনকাম করবে, তাহলে একটা কমফর্টেবল লাইফ পাওয়া যাবে। কিন্তু নামাজ পড়ে, পর্দা করে কি হবে? কেন ওদের বাবামা এমন কিছু কাজ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করছেন যার পেছনে আপাতদৃষ্টিতে কোন কার্যকারণ নেই? তাহলে কি করে এই ছেলেমেয়ে দু'টি তাদের বাবামায়ের এই অযৌক্তিক আবদার মেনে নেবে?

আমি শ্রোতা হিসেবে অতি উত্তম। ওরা বেশ কিছুক্ষণ মনের ঝাল ঝাড়ল, আমি একাগ্রতার সাথে শুনলাম। তারপর এক সময় প্রশ্ন করতে শুরু করল আল্লাহ কে, তিনি কেন আমাদের সৃষ্টি করলেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিভাবে এই উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব ইত্যাদি। সাধ্যমত জবাব দিলাম। তারপর হঠাৎ এই প্রশ্নের অবতারণা।

আমি হেসে বললাম, 'কেন, তুমি আত্মহত্যা করতে চাও কেন?'

মেয়েটি বলল, 'ধরুন, আমি জীবন থেকে যা চাই তা পেলাম না, অথবা জীবন আমার কাছে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে, তখন কি আমি আত্মহত্যা করতে পারি?'

বললাম, 'তুমি যদি এক কথায় জানতে চাও তাহলে বলব পারোনা। দেখ, আমাদের এই শরীর আসলে একটি যন্ত্র। তুমি মানে কিন্তু আসলে তোমার আত্মা। তোমার আত্মাকে এই শরীরটি দেয়া হয়েছে যেন সে প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারে। বুঝতে পারছনা? যেমন ধর, কম্পিউটারের ভেতর যে মাদারবোর্ড আছে সেটা আত্মা আর বাইরের যন্ত্রাংশগুলো হোল তার শরীর। মূল কাজ মাদারবোর্ডই করে– কিন্তু স্ক্রীণ, কিবোর্ড, মাউস ইত্যাদি ছাড়া সে অচল। তেমনি তুমি মানে আসলে তোমার আত্মাটা, শরীরটা কিন্তু তুমি না, তোমারও না। যে জিনিস তোমার নয়, নৈতিকভাবে তা নষ্ট করার অধিকার তোমার নেই। আত্মহত্যা করলে তোমার আত্মাটাকে তো তুমি মারতে পারছ না যেহেতু সে অমর, পারছ কেবল শরীরটাকেই ধ্বংস করতে। অথচ তাকে মারার অধিকার তো তোমার নেই! সে কারণেই আত্মহত্যা করা যাবেনা। তাছাড়া তোমার জীবনের কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা পূরণ হবার আগে যদি তুমি রণে ভঙ্গ দাও তাহলে সেটা কাপুরুষোচিত কাজ হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। একইভাবে আত্মহত্যার শাস্তি জাহান্নাম। সেটা কিছুতেই কাংখিত বাসস্থান হতে পারেনা। তখন পস্তাবে, অল্প কষ্ট থেকে বাঁচতে গিয়ে দেখি চিরস্থায়ী কষ্টে পড়ে গেলাম!

'এবার তোমার প্রশ্নে আসি। তোমাদের একটা গল্প বলি, শোন। আমার এক কাজিন, আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। একদিন দেখি সে বাইরে থেকে এসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল, প্রচন্ড জ্বর, সেই শয্যা থেকে উঠল সাতদিন পর। মা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনা কি? কি এমন হোল যে একেবারে সাতদিন তুই নাওয়া খাওয়া ছেড়ে বিছানায় পড়ে রইলি?' সে কান্নাকাটি করে বলল, 'আমি একটা মেয়েকে খুব পছন্দ করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ওকে বিয়ে করা। সে উদ্দেশ্যে আমি প্রায়ই ওদের বাসায় যাতায়াত করতাম। আমি চাইতাম ওর বাবামা যেন আমাকে সুনজরে দেখেন। ওরাও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু সেদিন গিয়ে দেখলাম ওরা অন্য জায়গায় ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। ওর মায়ের সাথে কথা বললাম, উনি বললেন ওরা আমাকে ছেলের দৃষ্টিতে দেখেছেন, মেয়ে জামাই হিসেবে কল্পনা করেননি!' এত বড় ছেলেকে কান্নাকাটি করতে দেখে আমরা ভাইবোনরা মুচকি মুচকি হাসছিলাম। মা আমাদের ঐ রুম থেকে তাড়ালো। তখন আমরা দরজার আড়াল থেকে কান পেতে শুনতে লাগলাম। মা ওকে বলল, 'আচ্ছা ধর, ওর সাথে তোর বিয়ে হোল, কিন্তু তোদের মধ্যে বনিবনা হোলনা। দিনরাত ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি অবস্থা। তখন কি তুই সুখী হবি না মেয়েটাকে সুখী করতে পারবি?

ভবিষ্যতে কি হবে তা কি তুই ভাল জানিস না আল্লাহ ভাল জানেন? তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?' যুক্তি মেনে নিলেও ওর সেরে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল। বহুদিন বিয়ে করেনি। কিন্তু যখন সে অবশেষে বিয়ে করল তখন আমরা এত চমৎকার একটা ভাবী পেলাম যাকে দেখে বলা যায়, 'কাভি কাভি মেরে দিল মে,

খায়াল আতা হ্যা, কে জ্যায়সে তুঝকো বানায়া গায়া হ্যা মেরে লিয়ে'! তো ধর সে যদি ঐ সময় মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে ফেলত তাহলে কি আজ এত সুখের সময়টা আসত?'

ভাইবোন ভাবতে লাগল।

একটু পর ছেলেটি বলল, 'তো আন্টি, যদি কেউ প্যারালাইজড হয়ে যায়, বা তার কোন অনিরাময়যোগ্য ব্যাধি হয়, যেমন ক্যান্সার, তাহলে কি সে আত্মহত্যা করতে পারে?'

তখন ওদের একটা গল্প শোনালাম যা মসজিদে খুতবায় শুনেছিলাম।

একবার এক লোক মরুভূমির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় মরুঝড়ে পথ হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল। হঠাৎ বাতাস আর বালির আস্তরন ভেদ করে কিছুদূরে তাঁবুর মত কিছু একটা তার চোখে পড়ল। কোনক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে সে তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাঁবুতে প্রবেশ করে সে বুঝতে পারল শতছিন্ন তাঁবুর ভেতর ধূলিঝড় আর প্রচন্ড বাতাস অনায়াসে আনাগোনা করছে। তাঁবুর সর্বত্র চরম দারিদ্রের চিহ্ন দৃশ্যমান। এর মধ্যেই মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে এক বৃদ্ধ। দেখাই যাচ্ছে বৃদ্ধের সম্পূর্ন শরীর প্যারালাইজড এবং তার চোখ দু'টো অন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধ একটানা বলে চলেছে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি তাঁর অনেক বান্দার ওপর আমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর রাহমাতের জন্য আমাকে নির্বাচন করেছেন'।

বৃদ্ধের কথা শুনে লোকটি এত আশ্চর্য হোল যে সে বলল, 'আমি এসেছিলাম আপনার কাছে দিকনির্দেশনা চাইতে। কিন্তু আগে আমি জানতে চাই কোনদিক থেকে আপনি মনে করেন আল্লাহ আপনাকে তাঁর অন্যান্য বান্দার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন? অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার অবস্থা সবদিক থেকেই শোচনীয়!'

বৃদ্ধ বললেন, 'আল্লাহ কি আমাকে একটি সুস্থ মস্তিষ্ক দেননি, ফলে আমি তার প্রশংসা করতে পারছি? তুমি কি দেখনি কত নারীপুরুষ রয়েছে যাদের আল্লাহ এই নিয়ামতটি দেননি?'

লোকটি বলল, 'জ্বী, আপনি ঠিক বলেছেন'।

বৃদ্ধ বললেন, 'আল্লাহ কি আমাকে তাঁর পছন্দনীয় দ্বীন বোঝার ক্ষমতা দেননি? অথচ তাঁর কত বান্দা তাঁকে চেনেই না!'

লোকটি বলল, ‘আপনি নিঃসন্দেহে সত্য বলেছেন!’

বৃদ্ধ এবার বললেন, ‘আমি তোমাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে দেব, কিন্তু তোমাকে আগে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। আমি আমার সকল সম্পদ এবং স্ত্রী সন্তান হারিয়ে ফেলেছি আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি ছাড়া যে আমার দেখাশোনা করে। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ আমার পক্ষে নিজের কোন কাজই করা সম্ভব নয়। আমার ছেলেটি কাল বেরিয়েছে কিন্তু এখনো ফিরে আসেনি, তুমি কি যাবার আগে তাকে খুঁজে দিয়ে যেতে পারো?’

লোকটি তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখতে পেল অদূরেই শকুনের দল চক্কর দিচ্ছে। তার হৃৎপিন্ড ধক করে উঠল। যখন সে সেই স্থানে পৌঁছুল তখন দেখতে পেল বালকটির মৃতদেহ অর্ধভুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নেকড়ের দল যা ফেলে গিয়েছে তা সাবাড় করার জন্যই শকুনের আগমন।

লোকটি একবার ভাবল ‘পালিয়ে যাই’, কারণ বৃদ্ধকে তার জীবনের শেষ অবলম্বনটিও হারানোর খবর দেয়ার মত সাহস তার ছিলোনা। কিন্তু সে পারলোনা। সে বৃদ্ধের কাছে ফিরে গেল। বৃদ্ধকে খবরটি জানানোর পরিবর্তে সে তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি কি মনে করেন আল্লাহ আপনাকে বেশি ভালোবাসেন নাকি আইয়ুব (আ) কে?’

বৃদ্ধ বললেন, ‘অবশ্যই আইয়ুব (আ) কে’।

সে বলল, ‘আপনি কি মনে করেন আল্লাহর পথে আইয়ুব (আ) বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন নাকি আপনি?’

বৃদ্ধ বললেন, ‘অবশ্যই আইয়ুব (আ)। তিনি আল্লাহর পথে সকল কিছু ত্যাগ করেছিলেন, আমার তো একটি পুত্র অবশিষ্ট রয়েছে’।

এবার আর কোন উপায় রইলোনা, লোকটির জানাতেই হোল যে বৃদ্ধের এখন আর কেউ অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু সংবাদটি শুনেই বৃদ্ধ বললেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর যে তিনি আমাকে আইয়ুব (আ) এর ভাগ্য দান করেছেন!’

অল্প কিছুক্ষণের ভেতরেই তার হৃৎস্পন্দন বাড়তে লাগল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস কমতে লাগল এবং অবশেষে তিনি মারা গেলেন। লোকটি চিন্তায় পড়ে গেল কিভাবে তাকে কবর দেবে। কিন্তু কিছুক্ষণের ভেতর সেখানে একটি বাণিজ্য কাফেলা এসে পৌঁছুল, তারাও মরুঝড়ের কারণে পথ থেকে সরে এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে। সবাই মিলে বৃদ্ধকে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে, কবর তৈরী করে, দাফন দিয়ে দিল। জানাজার পর লোকটি ঐ কাফেলার সাথেই ঐ স্থান ত্যাগ করল।

সে রাতে বৃদ্ধ তার স্বপ্নে দেখা দিল। কিন্তু এ কি? সে তো এক তাগড়া নওজোয়ানে রূপান্তরিত হয়েছে! তাকে সম্পূর্ন সুস্থ এবং অত্যন্ত আনন্দিত দেখাচ্ছিল। সাথে ছিল তার সম্পূর্ন পরিবার। সে বলল, 'আমি তোমাকে জানাতে এসেছি যে আল্লাহ আমাকে জান্নাত উপহার দিয়েছেন কেননা আমি তাঁর রাহমাতের জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ ছিলাম'।

গল্পের শেষে ওরা দু'জন দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালো, 'আসলে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারাটাই আত্মহত্যার কারণ। আমাদের বুঝিয়ে বলার জন্য থ্যাংক ইউ আন্টি!'

আপনার অস্থিরতা এবং অশান্তিগুলোর একটি সহজ সমাধান

30 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

আমরা কে না অশান্তিতে থাকি? কার হৃদয়টা অস্থির নয়? আমার এটুকু জীবনে আমি স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি-অফিসের সর্বত্রই অস্থির মানুষের প্রবল বিচরণ দেখেছি, নিজের কথা তো জানিই। বিষয়টা হলো, এই অস্থিরতা কেন? অশান্তিটা কেন? কীভাবে তার সমাধান করা যেতে পারে তা ভেবে কে কী করলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ।

মাঝে মাঝেই জীবনে পেছন দিকে তাকিয়ে অনুভব করি, এই গোটা জীবনের কত পরিশ্রম - স্কুল, কলেজে কতই না কষ্ট করে সবাই পড়ে। জীবনের ছোট ছোট আচরণগুলো আব্বা-আম্মা শিক্ষা দেন, শিক্ষকরা শেখান। আমরা নিজেদের গড়ি। শার্টের বুকের বোতামটা খোলা না রাখাও শিক্ষা, বড়রা সামনে থাকলে পায়ের উপরে পা তুলে না-বসাও একটা শিক্ষা। কাউকে পানি খেতে এগিয়ে দিলে উপরে ধরতে হয় না, কারণ তিনি যেখানে মুখ দিবেন সেখানে আমার হাত না-লাগা উচিত -- এটাও একটা শিক্ষা। এমন হাজারো শিক্ষা গলাধঃকরণ করে তবু সবাই একসময় কেমন যেন উলটে যায়, জীবনের লক্ষ্য কী জিজ্ঞাসা করলে অন্তঃসারশূণ্য কথা বলে। অনেক পিএইচডি ডিগ্রিধারী মানুষও সম্পূর্ণ মূর্খদের মতন কথা বলে একসময়, কারণ তাদের জীবনটা কোন একটা সময় এমন কিছু লক্ষ্যে গড়তে শুরু করেছিলেন তারা, যা হয়ত কেবলই পৃথিবীর বস্তুগত বিষয়ভিত্তিক, তাতে আমাদের জীবন, এই অন্তর, এই সত্বার অস্তিত্ব, ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনার কোন খোরাক ছিলনা। মনগড়া জীবনদর্শন দিয়ে জীবনকে চালিয়ে নেয়া...

আমি অনেক মানুষের সাথে মিশেছি, যাদের কাছে বেশিরভাগ সময়েই আমাদেরকে আল্লাহ যেভাবে চলতে বলেছেন, তাতে কী বলেছেন এবং সেভাবে চলার যে সৌন্দর্য ও আনন্দ --সেটা পরিষ্কার হয়নি। যেই আমি এখন লিখছি, আমার নিজের কাছেও সেই বিষয়গুলো যত বেশি অস্পষ্ট ছিলো, যার ফলে মুক্তি আর শান্তির জন্য যে গভীর আকাঙ্খা থাকে ভেতরে, তা ইসলাম মানতে বা শিখতে ততটাই উদাসীন ছিলো। আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট করি, যেসব কাজের শেষে বুক খা-খা করা শূণ্যতা অনুভব হয়। আমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যেতে থাকে প্রতিদিন, আল্লাহর সাথে দুরত্বও বেড়ে যেতে থাকে, অথচ তাকে ডাকলেই তিনি আমাদের কথা শোনেন, তবু আমরা স্মুরণ করিনা, মুক্তির দিকে পা বাড়াই না...

আমার উপলব্ধি হলো, যে এই জীবনটার অর্থ যত গভীর করে বুঝতে পারে, আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ তার ততই বেশি হয়, অন্তর তার ততই প্রশান্ত হয়, জীবন তার ততই সহজ হয়। বাস্তব কথা হলো, আমাদের সবার জীবনেই পরিবর্তন আমরা চাই, তবে এই পরিবর্তনটা যেন হয় সুন্দর, যেন হয় শান্তি আনয়নকারী এটাই আমাদের চাওয়া। তবে একটা সত্যি কথা হলো, তখনই আমাদের পরিবর্তন শুরু হয় যখন আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করি, প্রত্যয়ী হই নিজেকে সুন্দর করতে, উন্নত করতে, শান্তি পেতে...

♥ ♥

আমার যে ভাই বা বোন এই লেখাটি পড়ছেন, যদি শান্তির পথের এই অভিযাত্রায় আপনি নতুন হয়ে থাকেন, আপনার প্রতি আমার আকুল অনুরোধ:

- **আপনি অনুগ্রহ করে আজই নামাজে নিয়মিত হোন। একান্ত উপায় না পেলে অন্তত ফরজ নামাজটুকু পড়ুন।**
- **কুরআনুল কারীমের একটা আরবি এবং বাংলা সংবলিত একটা গ্রন্থ কিনে ফেলুন। কুরআন পড়লে দেখবেন অন্তর কেমন প্রশান্ত হয়।**
- **অবশ্যই 'রিয়াদুস সালেহীন' নামের হাদিস সংকলনটি কিনে ফেলুন।**

এই বইটি যখন আপনি পাতা উল্টাবেন, আপনি দেখবেন যেই মানুষটার জীবনে রয়েছে 'সর্বোত্তম আদর্শ' তিনি কীভাবে আপনার জীবনের ছোট ছোট বিষয়গুলোকে পৃথিবীকে কল্যাণময় করে অনন্ত জীবনের প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করার উপায় শিখিয়ে দিচ্ছেন। আপনার অন্তরকে তিনি এমন কিছু কথা শেখাবেন, যা আমাদের রাহমানের আলোয় আলোকিত। কুরআনে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন, আমাদের জীবনটা তিনি অর্থপূর্ণতায় ভরিয়ে দেন। প্রতিটা মূহুর্ত যেন বাঙময় হয়ে ওঠে... এই বিষয় নিয়ে কথা বলার যোগ্যতাও আমার নেই, তবু আমি লিখছি শুধু এই দুঃসাহসে, আমার গভীরতম আহবান এটাই, আমরা যেন এগিয়ে যাই সামনের দিকে, যেন কিছুতেই বসে না থাকি।

রিয়াদুস সলিহীন বইটি ইমাম আন-নওওয়ির (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলন। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে জানি, হাদিসের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতুলনীয় ও গভীর জ্ঞানের একজন মানুষ, হাদিসের বিষয়বস্তু, বিশুদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তাসহ আরও অনেক বিচারে এই গ্রন্থটি এক বিশেষ উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। তাই যুগ যুগ ধরে সারা পৃথিবীতে এই বইটি ছড়িয়েছে, বহুল পাঠও হয়েছে। অ-ইসলামিক পরিবেশে বড় হওয়া আমাদের হাতে সময় কম থাকে, মৃত্যু আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে -- এমন কঠিন সময়ে নিজেদের উন্নত করার চেষ্টাও আবশ্যক। অনুগ্রহ করে বইটি কিনে ফেলুন আজই, শুরু হোক রবের আলোয় পথচলা। মনে রাখবেন, আপনার এই পথচলা শুরু করলেই আল্লাহ আপনার চারপাশকে বদলে দিবেন, আপনার জন্য জীবনকে আরো সুন্দর করার সুযোগ এনে দিবেন ধীরে ধীরে ইন শা আল্লাহ... সবার জীবনেই এমন হয়, শেখা ও পালন করার সিদ্ধান্তটাই অনেক বড়, পরিবর্তনের শুরু সেখানেই। প্রতিদিন নামাজের পর বইটি ধরে পাতা ওলটাতে থাকুন, দেখবেন, ইনশা আল্লাহ এগিয়ে যেতে থাকবেন সুন্দরের পথে। প্রশান্ত হবে হৃদয়...

- আপনাকে হয়ত কিছু আইডিয়া দিতে পারে এই লেখাটি: http://idream4life.blogspot.com/2013/01/blog-post_1.html
- সেইসাথে #গ্রন্থচারণ ক্যাটাগরিতে লেখা কিছু লেখা হয়ত এই ক্ষুদ্র আমার ছোট্ট অভিজ্ঞতাগুলো আপনাকে কোন চিন্তার খোরাক দিতে পারে: http://idream4life.blogspot.com/search/label/reading

আল্লাহ আমাদেরকে সেই দিনটির জন্য প্রস্তুত হবার তাওফিক দিন, যেদিন আমরা সবাই কপর্দকশূণ্য, অসহায়, ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবো; সেদিন যেন দয়াময় আল্লাহ তার দয়ার ও রাহমাতের চাদরে তিনি আমাদের আচ্ছন্ন রাখেন। দুনিয়ার জীবনকে যেন আল্লাহ রাহমাত ও বারাকাহ দিয়ে ভরিয়ে দেন, আমরা যেন প্রশান্তচিত্তে এমনভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি যখন আল্লাহ আমাদের উপরে সন্তুষ্ট, আমরাও তার উপরে সন্তুষ্ট। আল্লাহ যেন আমাদের জ্ঞানে ও কাজে বারাকাহ দেন। আল্লাহ যেন আমাদের কাজগুলোকে কবুল করেন।

(০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)

ব্যর্থ বিয়েঃ একটি বিশ্লেষণ

29 October 2014

অনুবাদকঃ সিফাত মেহযাবিন

একবার এক তরুণ আমাকে অসন্তোষের সুরে বলেছিল, "আমার বিয়েটা ব্যর্থ হয়েছে"। আমি সান্তনা দিয়ে উত্তরে বলেছিলাম, "যদি তোমার তালাক হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌'তালা তোমাকে আরেকজন স্ত্রী দেবেন, ইনশা'আল্লাহ্‌"। সে উত্তরে বলেছিল, "না , না, আমাদের তালাক হয় নি। কিন্তু আমাদের বিয়েটা ব্যর্থ হয়েছে, তবে আমরা এখনো একই সাথে থাকি"।

আমাদের সমাজের ব্যর্থ বিয়েগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য ক্যাটাগরি হচ্ছে এই ধরনের বিয়েগুলো। "আমরা সুখী নই, কিন্তু আমরা একই সাথে বসবাস করি"---আমাদের আশেপাশের অধিকাংশ 'ব্যর্থ বিয়ে' এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন কারণে অনেক দম্পতি হতাশার সাথে তাদের দুর্বিষহ বিবাহিত জীবনকে টেনে বেড়ায়। তাদের ভেতরে কেউ কেউ সমাজ- লোক লজ্জা-পারিবারিক মর্যাদার কথা ভাবেন। কেউ আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা [নিজের ও

সন্তানের] চিন্তা করেন, একবার বিয়ে ভেঙে গেলে আবার কে বিয়ে করবে (বিশেষ করে মেয়েরা), বাবা-ভাই যদি না দেখে তাহলে কোথায় যাবে --- এইসব ভেবে শোচনীয় দাম্পত্য জীবন কাটায়।

"আমি জানি আমার মেয়ে খুব কষ্টের ভেতর আছে। তার স্বামী তার ভরণপোষণ করতে চায় না, তাই পেট চালানোর জন্য তাকে কাজ করতে হয়। শাশুড়িসহ শ্বশুরবাড়ির অনেকেই তার সাথে অকথ্য দুর্ব্যবহার করে, বাড়ির সমস্ত কাজ তাকেই করতে হয়। কিন্তু যেখানে ২৫-৩০ বছরের অবিবাহিত-সুন্দরী-উপার্জনশীল মেয়েদের সহজেই পাওয়া যায়। সেখানে আমার মেয়ের এখন ৩৭ বছর; শুধু তাই নয়, তার নিজেরও দুটো মেয়ে আছে। আমি যদি এখন আমার মেয়েকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি, তাহলে আবার কার কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে দিব? কে তাকে দুই মেয়ে নিয়ে বিয়ে করবে? আর তার মেয়েদেরই বা কি ভবিষ্যৎ হবে?" --- এই ছিল আমাকে বলা এক ভুক্তভোগী বাবার যন্ত্রণাকাতর স্বীকারোক্তি।

একজন সৎ পরামর্শদাতা এই ধরনের পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম। এক বা একাধিক অভিজ্ঞ অথবা প্রফেশনাল উপদেষ্টার আন্তরিক হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। সুরা নিসার পঁয়ত্রিশ নং আয়াতে পারিবারিক কলহ মীমাংসার এক সুন্দর পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, " যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। যদি তারা উভয়েই মীমাংসা চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মিলন সাধনের (অনুকূল) পরিবেশ সৃষ্টি করবেন"। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে, বিরোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর্যায়ে পৌঁছাবার আগেই ঘরে তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। বেশী লোক জানাজানি বা প্রচার উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর। এজন্য এই পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে দু'জনের একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিরোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন। তারপর এক সাথে বসে এর সমাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। স্বামী-স্ত্রী চাইলে নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে লোক বাছাই করে আনতে পারে। আবার উভয়ের পরিবারের বয়স্ক লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরনের সালিশ নিযুক্ত করতে পারে। স্ব-স্ব পরিবার থেকে নির্বাচনের ফলে সালিসকারী ব্যক্তিগণ ছেলে-মেয়ের (স্বামী-স্ত্রীর) দোষ-ত্রুটি, মেজাজ-মর্জি সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকেবহাল। সুতরাং তাদের জন্য ন্যায় বিচার ও বিরোধ নিস্পত্তি করা সহজতর হবে।

আয়াতের শেষ অংশটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুনঃ

"যদি তারা উভয়েই মীমাংসা চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মিলন সাধনের [অনুকূল] পরিবেশ সৃষ্টি করবেন"।

এই প্রেক্ষিতে আমি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে চাই। এই ধরনের একটি সালিশ নিষ্পত্তির জন্য আমাকে একবার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাদের অবস্থানে অনড়, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব।

বিয়ের পর থেকেই ছোটখাট বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য চলতে চলতে সেটা বর্তমানে চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনমনীয় এবং 'যত দ্রুত সম্ভব ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক' সেটাই চাইছে। আমরা যারা সালিশের কাজে নিয়োজিত ছিলাম তারাও প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশাগ্রস্থ। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে আমার দাদী সাইয়েদা আব্দুল কারিম নাদিয়াদওয়ালা ঝড়ের বেগে মঞ্চে পদার্পণ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কোনরকম সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাকে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সাথে একান্তে কথা বলতে দাও"। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আমার দাদীকে অনুসরণ করে অন্য ঘরে চলে গেল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কয়েক মিনিট পর তারা তিনজন হাসি হাসি মুখে ফিরে এলো; আমার দাদী আনন্দিত ও রাশভারি মেজাজে ঘোষণা করলেন, "তাদের ভেতর মিটমাট হয়ে গেছে"! এই দম্পতি এখন পর্যন্ত সুখেশান্তিতে ঘর-সংসার করছে। এই ঘটনার পর থেকে বহুবার বিভিন্ন সময়ে আমি আমার দাদীর কাছে জানতে চেয়েছি, "আপনি এমন কি বলেছিলেন, যার ফলে সেই দম্পতির ভেতর এতো দ্রুত মিটমাট হয়ে গেল এবং তারা তালাকের কথা আর মুখেও নিল না?" কিন্তু প্রতিবারই তিনি স্মিত হেসে নীরব থাকতেন। তার দশ বছর পর তিনি যখন শয্যাশায়ী, আমি দাদিকে আবার সেই প্রশ্ন করলাম। এইবার তিনি স্মিত হেসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আমি দু'জনকে কষে দুটো চড় দিয়েছিলাম"!

অধিকাংশ পরিবারে এমন কিছু মুরুব্বী থাকেন যারা ভাঙ্গনের মুখে পতিত পরিবারকে একদম শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্‌র সাহায্যে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে একটা ব্যপার পাঠকদের পরিস্কারভাবে বুঝতে হবে, সালিশকারীর প্রতি প্রশ্নাতীত ভালোবাসা ও মমতা না থাকলে, শুধুমাত্র চপেটাঘাত করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। সালিশকারীর অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার সামনে উভয়েই (স্বামী-স্ত্রী) তাদের অনড় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ অহং থেকে বেরিয়ে এসে নমনীয় ও আপোষের মনোভাব নিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিল; ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌'তালা তাঁর অসীম করুণায় তাদের জন্য মিলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন।

[Translated from the book "I want to marry" by Nisaar Yusuf Nadiadwala]

চারপাশে সংসার ভাঙ্গনের জোয়ার !

15 October 2014

লেখকঃ আগন্তুক (ছদ্মনাম)

খুব কষ্ট ও ভয় হয় আজ চারপাশে সংসার ভাঙ্গনের জোয়ার দেখে...

ইসলামকে মেনে চলেন না এমন এক পরিচিত ভাই প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন প্রায় দশ বছর আগে। সে আমলের চারপাশ কাঁপানো প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি। আন্ডারগ্র্যাড শেষ করার আগেই তারা বিয়ে করেন, সংসারের প্যাঁচে পড়েই হয়ত, দু'জনার কেউ সেই ডিগ্রির বৈতরনী পার হতে পারেননি। স্বামী ও স্ত্রী যথাক্রমে ব্যবসায় এবং চাকুরিতে নেমে পড়েছিলেন সেই যোগ্যতা থেকেই। পরবর্তীতে দশ বছর বয়সী সন্তানটিকে বাপের কাছে রেখে মা এখন আলাদা থাকেন। মা এখন চাকুরিজীবী। ঐ ডিগ্রি নিয়ে কী চাকুরি করেন তা ঠিক জানা সম্ভব হয়নি। বাপ ছেলেকে নিয়ে নিকটাত্মীয়দেরকে যথেষ্টই যন্ত্রণায় রেখেছেন। একটি পুরুষ ও নারীর যন্ত্রণায় এখন সমগ্র দু'টি পরিবার।

বিয়ে ও সম্পর্কের বিষয়গুলো কখনই সিনেমার মতন নয়। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা কল্পনাতেও বাস্তবতাকে মুভির মতন করে যেন না ভাবেন। জীবনের বাস্তবতায় গোলাপ ফুলের সুঘ্রাণ নিয়ে সাহিত্যিক ও রোমান্টিক আলাপের সুযোগ না হলেও আদা ও রসুন-বাটার ঘ্রাণে ডুবে থাকতেই হয় একজন নারীকে। স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পাহাড়ে-নদীতে ঘুরতে না পারলেও বাজারের ব্যাগের সাথে, চাল-ডাল-তেলের সাথে ঘুরতে হয় পুরুষকে।

এই দায়িত্বশীলতায়, এই দায়বদ্ধতার মাঝে এবং ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেই আল্লাহ অসাধারণ শান্তি দিয়ে দেন তাদেরকে, যারা আল্লাহর জন্য এই সম্পর্কটিতে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেয়। দুনিয়ার জীবন জান্নাত নয়, "অতঃপর তারা সুখে

শান্তিতে বসবার করিতে লাগিলো" -- এমন কোন আলাপ আপনি কারো ব্যাপারে করতে পারবেন না কখনই। ক্রমাগত মুজাহাদা ও পরিশ্রম করাই দুনিয়ার জীবনের রূপ।

বিয়ের আগে মনে রাখবেন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের, ভিন্ন পছন্দের, ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন রুচির একজনকে আপনি জীবনের সঙ্গী করে সম্ভাব্য অনেক যুদ্ধে তাকে সহযোদ্ধা করতে যাচ্ছেন। যারা সংসার জীবনে বেশি করে মানিয়ে নিতে পারে, তারাই বেশি সুখী হয়। কিন্তু অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে হবে স্বামী-স্ত্রীর বিয়ের মূল উদ্দেশ্য।

নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করুন যেন আপনি সহজে মানিয়ে নিতে পারেন। চেষ্টা করুন নিজের ইগোকে কমিয়ে আনতে। আজকাল পরিবারগুলোর ভাঙ্গনের পেছনে ইগো অন্যতম প্রধান কারণ। বলছিলাম বিয়ের প্রস্তুতি হিসেবে নিজের ইগোকে অবশ্যই কমিয়ে আনুন। ইগো কাকে বলে জানেন তো?কেউ যখন আপনাকে সংশোধন করে দেয় এবং আপনি তার উপরে ক্ষিপ্ত/বিরক্ত হয়ে যান; তখনই বুঝবেন আপনার ইগো আছে। এই সমস্যাকে কাটিয়ে উঠুন খুব শীঘ্রই। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জয়-পরাজয়ের হিসেব সবাইকে কুরেকুরে খাচ্ছে। সম্মান করলে সম্মানিত হবেন, তাই মানুষকে সম্মান করতে শিখুন।

আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে শান্তির আবাসভূমি বানিয়ে দিন।

ভালোবাসার স্বভাব, ভালোবাসার অভাব

3 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

১/

কাজ থেকে ফিরছিলাম। ট্রেন স্টেশন থেকে বেরোবার পথে বেশিরভাগ মানুষ ডানদিকে চলে গেল, বামদিকে আমার সামনে কেবল এক মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি সাধারনত খুব দ্রুত হাঁটি, এই মহিলা বুঝলাম আমার চেয়েও দ্রুত হাঁটছেন, কারণ পেছন থেকে কেবল তাঁর ঋজু দেহখানা দেখতে পাচ্ছি, চেহারা দেখছিনা। দু'জনেই বাঁয়ে মোড় ঘুরলাম। দেখি মহিলার হাঁটার গতি আরো বেড়ে গেল। রাস্তার পাশে একখানা লাল গাড়ী, স্টিয়ারিং উইলে এক বৃদ্ধ দাদামশায় উৎসুক ভঙ্গিতে বসে আছেন, মুখের হাতের চামড়ায় কুঁচকানো দেখে বোঝা যাচ্ছে ভালোই বয়স হয়েছে। মহিলা দ্রুত হেঁটে গাড়িতে ওঠার পর খেয়াল করলাম তিনি হলেন দাদামশায়ের স্ত্রী, মাথার সব চুলই শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে, আজন্ম স্নো ক্রীমে লালিত মুখখানাতেও ভাঁজ পড়েছে ভালই। দাদীমা গিয়ে বসতেই দাদামশায় একগাল হাসি দিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন, দাদীর মুখ থেকে সারাদিনের ক্লান্তির সব চিহ্ন উবে গেল। তাঁদের এই চৌম্বকীয় ভালোবাসার দৃশ্যের সাক্ষীটির মনটা পরম মমতায় ভরে উঠল। আজকের যুগের দেহসর্বস্ব ভালোবাসার ভিড়ে এমন নিখাদ ভালোবাসার গভীরতা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ কি প্রতিদিন মেলে?

২/

কেউ ভাবেনি বিয়েটা টিকবে। মেয়েটি নিজেও না। স্বামী প্রবাসী, বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে কিন্তু স্ত্রীকে নিতে পারছেনা। মেয়েটি অত্যন্ত মেধাবী, যতদিনে স্বামীর তাকে নেয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হোল ততদিনে সে লেখাপড়ার মধ্যাবস্থায়, পড়াশোনা শেষ না করে সে কিছুতেই যাবেনা। স্বামী বলতে শুরু করল সে আবার বিয়ে করবে, মেয়েটি বলল, 'তাহলে আমি আর গিয়ে কি করব?' স্বামী ছুটিতে দেশে এসেছে, স্ত্রী যাবেনা। আত্মীয়স্বজন ভাবছে এই বিয়ে কিছুতেই টিকবেনা। এমন এক অবস্থায় ওরা দু'জনেই এলো আমার কাছে। মেয়েটিকে বললাম সবকিছু ছেড়ে চলে যাও।

সে হতবাক হয়ে বলল, ‘আপনি একজন শিক্ষক হয়ে কি করে এমন একটি কথা বলতে পারলেন?’

বললাম, ‘শোন, শিক্ষক বলেই এ’কথা বলতে পারলাম। তোমার মেধা আছে। এই মেধা কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা। আমি জানি একদিন তোমার লেখাপড়া ডিগ্রী ভবিষ্যত সব হবে। কিন্তু সেদিন এই সম্পর্কের জন্য তোমার আফসোস হবে, ‘যদি আমি চেষ্টা করতাম, হয়ত আমার সংসারটা টিকত!’

সে বলল, ‘কিন্তু সে তো বলছে সে আবার বিয়ে করবে, তাহলে ওর সাথে গিয়ে আমার লাভ কি?’

বললাম, ‘রাগের মাথায় মানুষ অনেক কথাই বলে। তুমি পাশে নেই তাই তোমাকে ভয় দেখিয়ে সাথে নিতে চায়। এগুলো ভালোবাসাপ্রসূত অভিমান, বদনিয়ত নয়’।

সে আমার কথা বিশ্বাস করল। আমি আত্মীয় নই, স্বজন নই, নই কিছুই। কিন্তু সে আমার কথার ওপর ভরসা করে এত সাধের লেখাপড়া অসম্পূর্ন রেখে চলে গেল প্রবাসে, স্বামীর সাথে থাকার জন্য।

ক’দিন আগে সে জানালো সে দেশের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভর্তি পেয়েছে। ফেসবুক প্রোফাইলে ওর ফুটফুটে সন্তান দু’টির মুখচ্ছবি সাক্ষ্য দিচ্ছে আজ সে সব পেয়েছে- স্বামী, সন্তান, শিক্ষার সুযোগ, সাফল্য, সুখ। সামান্য একটু ধৈর্য্য, সামান্য একটু অপেক্ষা, অনেক অনেক বিশ্বাস- এটাই ওর সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল। কিন্তু আমরা অনেকেই এই ধৈর্য্যটুকু রাখতে পারিনা, যা চাই তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী থাকিনা, ভাবতে পারিনা যে অনেকসময় ভালোটুকু পাওয়া যায় খারাপের পরেই- এ’টুকু সময় স্থির থাকতে পারলে হয়ত আমরা অনেক কিছুই অর্জন করতে পারতাম যা অনেকে আজীবন সাধনা করেও অর্জন করতে পারেনা।

৩/

সেই চেনা পরিচিত রোগগুলো আবার ফিরে আসছিল। ভোরে অ্যালার্ম বাজবে বলে অ্যালার্ম বাজার আগেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্কুলে যখন বীজগণিত করতাম, কোন অংক না মিললে ঘুমের ভেতরেও মগজ অংক কষতে থাকত। ঘুমের মধ্যে সব অংক ঠিক ঠিক মিলে যেত, অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে সেভাবে অংক করলে সত্যিই মিলে যেত! এখন ঘুমের মধ্যে কেবল কোম্পানীর ফাইলপত্র ঘাটতে থাকি, ঘুম শেষ হয়ে যায় কিন্তু কিছুতেই সব কাজ গুছানো শেষ হয়না।

প্রথম যেদিন কাজে গেলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার ডেভ বলল, ‘তোমাকে মাটিতে অবতরণ করার আগেই দৌড় শুরু করতে হবে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমরা খুব বেকায়দায় পড়ে গেছি, তোমার সাহায্য আমাদের খুব প্রয়োজন’।

সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বলল, ‘এখানে আমাদের জাতিসংঘের মত সব দেশের প্রতিনিধিই আছে। সবাই তোমাকে সাহায্য করবে’।

তবু অনেক অনেকদিন পর কাজ শুরু করেছি, নতুন জায়গা- শরীরের ওপর, মনের ওপর চাপ যাচ্ছিল। তাই রোগগুলো প্রভাব বিস্তার করছিল বেশ।

প্রথমদিনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিলো ক্যানাডার জর্ডান, হং কং- এর নেলসন আর পাকিস্তানের ফ্র্যান্সেসকা। লাজুক স্বভাবের ভারতীয় জেকব থাকে আশেপাশেই, প্রয়োজন হলেই এগিয়ে আসে, তারপর আবার ঢুকে পড়ে নিজের গর্তে। ক’দিনের মধ্যেই ভাব জমে গেল ভারতের স্বর্না, ঘানার জেরাল্ড, চীনের সানি, ক্যানাডার ডনার সাথে। অন্যরা থাকে আশেপাশেই, সুযোগ এলেই এগিয়ে আসে। আজ সকালে গ্রুপলিডার লিন বলল, ‘আমরা কিছুদিনের মধ্যেই তোমাকে একজন সহযোগী দিতে যাচ্ছি। সে পর্যন্ত একটু কষ্ট করে চালিয়ে যাও’।

কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে হোলনা। কিছুক্ষণ পরই জেরাল্ড, নেলসন আর ফ্র্যান্সেসকা মিলে আমার বাকী কাজগুলো ভাগ করে নিয়ে বলল, ‘আজ তুমি বিশ্রাম নাও, কাজ আমরা করছি’। আস্তে আস্তে রোগমুক্ত হয়ে যাচ্ছি নিজের অজান্তেই!

এই বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বের রূপ দেখে ভাবি, যে ফুলটিকে বাঁচাব বলে আমরা একদিন রক্ত ঝরিয়েছিলাম সে ফুলটিকে আজ আমরা নিজেরাই রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলছি। পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে এসে একটি ভিনদেশে আমরা একত্রিত হতে পারি, অথচ নিজের দেশে নিজের মাটিতে আমরা ভাই ভাই এক হতে পারিনা! হা কপাল!

কেনো এমন হয়?

6 April 2015

লেখকঃ সিরাজুম মুনিরা

গতকাল অনেকদিন পর এক ছোট বোনের বাসায় গেলাম। মেয়েটিকে আমি অনেক পছন্দ করি, তার সহজ-সরল, সুন্দর একটি মনের জন্যে। মানুষের সরলতা কেনো যেনো খুব টানে আমাকে। বোনটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশী মেধাবী। কিন্তু কেনো যেনো পর পর দুইবার মেডিকেলে এডমিশন টেস্ট দিয়েও চান্স পেলোনা। বাসায় ঢোকার মুখেই সেই চিরাচরিত প্রাণখোলা হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা। কিন্তু তার পাশে বসে কিছুক্ষন গল্প করার পরই টের পেলাম সে প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছে। জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সব মানুষেরই হয়ত অন্তত একবার হলেও "সব ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই" টাইপ আজগুবি চিন্তাটা আসে। ও এখন সেই স্টেজটাই পার করছে মনে হলো। চলে আসার সময় ওর আম্মু আমাকে গেইট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসলেন। হঠাৎ আন্টি আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম উনি প্রায় কেঁদে দিয়েছেন। তারপর উনি আমাকে উনার মেয়ের কথা বলতে শুরু করলেন। প্রচণ্ড হতাশায় জর্জরিত হয়ে আছে তার মেয়েটি।আর ৬দিন পর তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিশন টেস্ট। কিন্তু মেডিকেল পরীক্ষার পর থেকে সে একদিনও ঠিক মতো পড়তে বসেনি এবং সারাদিন সে ঘুমায়। এর আগের দিন সে নাকি তার বাবাকে খাওয়ার টেবিলে হঠাত অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে বসল, "আচ্ছা আব্বু, কতজনের জীবনে দেখি হঠাত miraculous কিছু একটা ঘটে সব কিছু চোখের পলকে বদলে যায়। আমাদের জীবনে কেনো এমন মিরাকল ঘটেনা আব্বু?"

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফেরার সময় মসজিদের দিকে ধাবমান মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, 'আচ্ছা এমন হতাশার মুহূর্ত কি আমার জীবনেও কখনো আসেনি?' কতবার মনে হয়েছে এই অর্থহীন জীবনটার ঘানি টানতে টানতে আমি ক্লান্ত। এইবার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম? বিশ্রাম যে মেলেনা। ছোটো থেকেই কেনো যেনো প্রচন্ড একটা বিষন্নতাই ভুগতাম আমি। দুনিয়া ছেড়ে যে কোনো উপায়ে পালাবার ইচ্ছাটাকে গলা টিপে হত্যা করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হতো মাঝে মাঝে। কতবার জীবনে অবধারিতভাবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মেনে নিতে না পেরে মনে মনে ভেবেছি, "কেনো এমন হয়? জীবনটা এমন কেনো? আমি যা চাই কেনো তা ঘটেনা আমার জীবনে? আমি যা চাইনা সেগুলোই কেনো বারবার ঘটে?" এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর জানা ছিলোনা আমার। কিন্তু আজ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যেনো বড় স্পষ্ট ভাবেই মনের ভেতর গেঁথে আছে আমার। গেইট পেরিয়ে বাসায় ঢুকতে ঢুকতে সেই উত্তরটিই বারবার শুলাচ্ছিলাম নিজেকে;

"তোমাদের চাওয়ায় কোনো কাজ হয়না, যতক্ষন বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ না চান"। (আত-তাকভীরঃ ২৯)

" আল্লাহ তা'লার অনুমতি ব্যাতীত কোনো বিপদই আসেনা; যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'লা তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন; আর আল্লাহ সব বিষয়ই সম্যক অবগত রয়েছেন। তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের; তোমরা যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখো আমার রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে আমার কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া। আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্বা, তিনি ছাড়া কোনোই মাবুদ নেই; অতএব প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির উচিত সর্ববিষয়ে তাঁর উপরই নির্ভর করা"।

(আত-তাগাবুনঃ ১১-১৩)

সত্যি বড় সহজ-সরল উত্তর। এই সহজ সরল কিন্তু প্রচন্ড শক্তিশালী কথাগুলোই বিশ্বাসী ব্যক্তির জীবনের সমস্ত জটিলতাকেই পানির মতো সহজ করে দেয়। তাকে মুক্তি দেয় সমস্ত অস্থিরতা, পাগলামী, বিষন্নতা আর হতাশার শৃংখল থেকে। জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ব্যপারকেই তখন সে তার মহান সৃষ্টিকর্তার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা বলেই অবনত মস্তকে মেনে নেয়। জীবনের সমস্ত চড়াই-উতরাই, অগ্নীপরীক্ষার মুখেও সে অবিচল চিত্তে ভরসা করে 'কুন ফা ইয়া কুন' এর মালিক সেই মহান আল্লাহ সুবহানা তা'লার অপরাজেয় শক্তি ও ক্ষমতার উপর। যে ভরসা ও নির্ভরতা তাকে দেয় হৃদয়ের সুগভীর প্রশান্তি, যে প্রশান্তি শুধুমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিদেরই একক সম্পদ।

রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান (রা), যিনি উম্মে হাবীবা নামেই সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ সর্দার, রাসূল (সা) এর কট্টর বিরোধীতাকারী লৌহমানব আবু সুফিয়ানের কন্যা। এই উম্মে হাবীবা (রা) ও তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কুরাইশ সর্দারদের প্রচন্ড নির্যাতনের মুখে স্বামী-স্ত্রী হাবশাই হিজরত করতে বাধ্য হলেন। একদিন গভীর রাতে ঘুমের ভেতর উম্মে হাবীবা (রা) স্বপ্নে দেখলেনঃ 'তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশ গভীর সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছেন। উত্তাল তরংগমালা তাকে আঘাতের পর আঘাত হানছে এবং সে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কী যে করুন দৃশ্য...'। ভীত বিহ্বল হয়ে তিনি ঘুম থেকে উঠে বসে ভাবতে লাগলেন, 'এই স্বপ্নের অর্থ কি?' আল্লাহর পরিকল্পনা ও গোপন ইচ্ছা বোঝার সাধ্য তো মানব সন্তানের নেই। আল্লাহ তায়ালা এই ইমানদার নারীকে কঠিনতর পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে তাঁর জন্যে সংরক্ষিত কল্যান দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই স্বপ্ন দেখার পরদিনই উম্মে হাবীবা (রা) এর জীবনে স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখা দেওয়া শুরু হলো। তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশ ইসলাম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং অস্বাভাবিক মদপানে ঝুঁকে পড়ে। সে উম্মে হাবীবা (রা) এর সামনে বিকল্প দুটি প্রস্তাব রাখলো। একটি হলো তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করা। উম্মে হাবিবা (রা) সুস্পষ্ট ভাবে দেখলেন তাঁর সামনে তিনটি পথ খোলা, যার একটি অপরটির চেয়ে দূর্বিষহ।

প্রথমটি পথটি হচ্ছেঃ তাঁর স্বামীর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে খ্রীস্টান হয়ে যাওয়া। কিন্তু তিনি ধিক্কার এর সাথে এই পথ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ সংকল্প ও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, 'যদি লোহার চিরুনি দিয়ে আমার হাড় থেকে গোশত আলাদা করা হয়, তাহলেও আমি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়ার পথ বেছে নেবোনা'।

দ্বিতীয় পথটি তাঁর সামনে ছিলোঃ মক্কায় তাঁর পিতার বাড়িতে চলে যাওয়া। কিন্তু ঈমানী চেতনার বলিষ্ঠ ঘোষনা এলো শিরকের সেই মহাদূর্গে যেহেতু দ্বীন ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনই কঠিন হয়ে যাবে তাই কোনভাবেই সেখানে ফিরে যাওয়া যাবেনা।

তৃতীয় পথটি ছিলোঃ এই অচেনা বিদেশ বিঁভুইয়ে আপন জন ছাড়া নির্জন নিঃসংগ জীবন যাপন। অল্প বয়সী এক নারী, সাথে আছে শিশু কন্যা। নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যে সাথে নেই কোনো পুরুষ। কিন্তু এরপরও তিনি শেষ পথটিই বেছে নিলেন। তিনি ভরসা করলেন একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীনের উপর। অস্থির হলেননা, ভেঙ্গে পড়লেননা। সবরের পথ অবলম্বন করলেন। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন, এটি আল্লাহ তা'লারই পরীক্ষা। যে আল্লাহ তাকে

পরীক্ষাই ফেলেছেন সেই আল্লাহ তা'আলাই ইনশাল্লাহ তাঁকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নিরাপত্তাদানকারী।

আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন তাঁকে তাঁর সবরের পুরষ্কার দিলেন। এবং সেটা অভাবনীয় উপায়েই দিলেন। এই নির্জন পরবাসে তারঁ সবচে' বেশী প্রয়োজন ছিলো একজন স্বামীর। আল্লাহ তাঁর এই প্রয়োজনকে সর্বত্তোম উপায়ে পূরণ করে দিলেন। তাঁর ইদ্দত পালনের দিনগুলো শেষ হতে না হতেই রাসূল (সা) তাঁর কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। দুঃখ-কষ্টের এ অমানিশা দূর হয়ে যেনো হেরার রশ্মিতে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। অতঃপর তিনি উম্মুল মুমেনীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই উম্মাতের সবচে' সম্মানিত ও মহিয়সী নারীদের একজন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। নিশ্চয়ই সবর অবলম্বনকারীদের পুরষ্কার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া এবং আখিরাত দুই জায়গাতেই সর্বোত্তম উপায়েই দান করেন।

মানুষ জীবনের কঠিন রূপটি দেখে হতাশ হয়; নিজেকে, চারপাশের মানুষকে অথবা নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করতে থাকে। কখনো আঘাতের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে, বাস্তবতাকে মেনে নিতে না পেরে চিরবিদায় জানায় দুনিয়াকে। আমাদের ক্লাসে একটি মেয়ে ছিলো। তার অদ্ভুত মায়াভরা চোখ আর ঝকঝকে হাসি খুব ভালো লাগতো আমার। সব সময় হাসি খুশি দেখতাম তাকে। হঠাত এক রাতে শুনি আত্মহত্যা করেছে সে। খুব আঘাত পেয়েছিলাম ব্যাপারটিতে। মেনে নিতে পারিনি কিছুতেই। আমি এখনও প্রায় ভাবি, 'কেনো এমন করেছিলো সে?' কেনো, কিসের জন্যে, কোন কষ্ট ও অভিমান থেকে এইভাবে নিজের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিলো সে?

মানব সন্তানের তো জেনে রাখা উচিত, তার জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে পরীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তো আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন দেখে নিতে চান তাঁর সেই বান্দাহ তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ...

ঈমান, সবর ও তাওয়াক্কুল এর এক অদ্ভুত সুন্দর উদাহরণ আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন আমাকে আমার জীবনে দেখিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি নবম শ্রেনী থেকে এইচএসসি পর্যন্ত একজন ভাইয়ার কাছে কেমেস্ট্রি পড়তাম। আমার ছোটো দুই বোন ও তাঁর ছাত্রী ছিলো। বহুদিন ধরে আমাদের পরিবারের সংস্পর্শে থাকার কারনে তিনি আমাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। আর আমার আব্বু আম্মু দুজনেরই মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা অসাধারন ক্ষমতা আছে। তাই ভাইয়ার জীবনের অনেক কিছুই আমরা জানতাম। তিনি অবলিলায় তাঁর জীবনের সব কিছুই জানাতেন আমাদের। ভাইয়ার জীবনের বহু কষ্ট, বহু কঠিন পরীক্ষার সাক্ষী আমাদের পরিবার। ছোটোবেলায় বাবা তাকে আর তার মাকে ফেলে চলে গেলেন, আরেকটা বিয়ে করলেন। আর খবরও নিলেননা তাঁদের। নানার বাসায় বড় হলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম দুই বছর পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করলেন। স্বপ্ন দেখতেন পাশ করে বের হয়ে ভালো একটা চাকরি করবেন, মায়ের দায়িত্ব নেবেন, তাঁর সব কষ্ট দূর করবেন তিনি। কিন্তু থার্ড ইয়ারে আসতেই তাঁর মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেন। সেইতো সব ছেড়ে থার্ড ইয়ার ফাইনাল এক্সামের মাঝখানে বাড়ি চলে যেতে হলো। ইয়ার ড্রপ দিলেন। এরপর শুরু হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবনের কঠিন পরীক্ষা। তাঁর মা যখন

অসুস্থ হয়ে পড়ত, বাড়ী চলে যেতেন। আবার আসতেন, আবার যেতেন। এইভাবেই একসময় ভার্সিটি জীবন শেষ করলেন অনেক কষ্টে। মাকে এরপর নিয়ে আসলেন নিজের কাছে। সারাদিন টিউশনী করতেন। ভাইয়াকে দেখে মাঝে মাঝে মনে হতো তাঁর জীবনটা বুঝি সারাজীবন এমন ছন্নছাড়াই থাকবে। বছরের অর্ধেকটা সময় তাঁর মা অস্বাভাবিক থাকতেন। এমন মা ভক্ত ও মায়ের সেবাকারী সন্তান আমি আমার জীবনে আর দেখিনি। বয়স তিরিশ পেরিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেলো। কিন্তু কেই বা তাঁকে মেয়ে দেবে? কিন্তু এতো কিছুর পরও তাঁর ভেতর কোনোদিন কোন আফসোস, কোনো অস্থিরতা, কোনো হতাশা দেখিনি। সবসময় অসম্ভব প্রশান্ত দেখিছি তাঁকে। কোনো কিছু নিয়েই কোনো অভিযোগ ছিলোনা তাঁর। তিনি তাঁর রবের প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলেন। কী যে চক্ষু শীতলকারী ছিলো তাঁর সেই সবর ও তাওয়াক্কুল...আলহামদুলিল্লাহ।

আজ আল্লাহ তাঁকে তাঁর সেই সবর ও তাওয়াক্কুল এর প্রতিদান দিয়েছেন। অতি চমৎকার ও দ্বীনদার স্ত্রী দিয়েছেন, চক্ষু শীতলকারী সন্তান দিয়েছেন, উত্তম জায়গা থেকে উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই পরকালিন পুরষ্কারও আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীন মুমিনদের জন্যেই নির্ধারন করে রেখেছেন।

অনেকদিন আগে একজন জীবনের হঠাত ঝড়ো হাওয়ায় প্রচণ্ড টালমাটাল হয়ে চোখে একরাশ বিষন্নতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলো, "আচ্ছা এমন কেনো হয়? কেনো হয় এমন? জীবনটা এমন কেনো?"

আসলেই তো... 'কেনো এমন হয়' অধিকাংশ মানুষই জানেনা সেটা। কারন মানুষতো চিরহরিত বৃক্ষের মতো চির সবুজ সেই অনন্ত জীবনকে ভালোবাসেনা, মানুষ ভালোবাসে শীতের শুষ্ক পাতার মতোন এই নশ্বর দুনিয়ার জীবনটাকে। তাই শুষ্ক পাতাগুলো যখন ঝরে পড়ে, মানুষ অস্থির, বিষন্ন হয়ে ওঠে। বোঝেনা যে এই ভালোবাসা কত নশ্বর, কতোটা অনর্থক...

" হে নবী, তুমি তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনের উদাহরন পেশ করো। এ জীবনটা হচ্ছে পানির মতো আমি তাকে আকাশ থেকে বর্ষন করি, যার কারনে যমীনের উদ্ভিত ঘন সুশোভিত হয়ে ওঠে, অতপর এক সময় বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে ফিরে। মূলত আল্লাহ তা'লা সব কিছুর উপর প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। আসলে ধন-সম্পদ, সন্তান সন্ততি হচ্ছে তোমাদের পার্থিব জীবনের কতিপয় অস্থায়ী সৌন্দর্য মাত্র, চিরস্থায়ী বিষয় হচ্ছে মানুষের নেক কাজ; আর তা হচ্ছে তোমার মালিকের কাছে পুরষ্কার পাওয়ার জন্যে অনেক ভালো। আর কোনো কল্যানময় কিছু কামনা করতে গেলেও তা-ই হচ্ছে উত্তম"। (আল-কাহাফঃ ৪৫-৪৬)

রাগ, অস্থিরতা, হীনমন্যতা ও অন্তরের সৌন্দর্যতা !

4 November 2014

সংকলনে – বিবাহ একটি উত্তম বন্ধুত্ব ডেস্ক

অল্পতে রেগে যাওয়া যাবে না !

একজন মানুষের সবচে বড় শত্রু তার রাগ । নিজের অতীত ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বলছি– জীবনে প্রত্যেক অসফলতার পেছনে এই দোষটি জড়িত । হুট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া , আবার পরে তার জন্য লজ্জিত হওয়া কখনো মুমিন/মুমিনার চারিত্রিক গুণ হতে পারেনা ।

মুমিনরা অধিক সহনশীল , বিনয়ী ও সবরের সাথে যেকোন অবস্থা পর্যবেক্ষনকারী হয় । তারা কখনো অল্পতেই রাগে না । তারা সময়ে পানির মত হয়ে যায় , আবার সময়ে আগুনের ফুল্কির মত হয়ে উঠে । তাদের এই কোমলতা ও

কঠিন অবস্থা আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে । তারা এমন ভাবে চলা-ফেরা করে যাতে শয়তান কখনো তাদের থেকে আশ্রয়-প্রশ্রয় না পায় ।

এক কথায় একজন মুসলিম মুমিন-মুমিনা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার পর তার দ্বায়ীত্ব অনেক বেড়ে যায় । তারা সহজে ভেংগে যায় না , আবার মুষড়েও পরেনা । তাই অল্পতেই রেগে যাওয়াকে কন্ট্রল করা সকলের অতীব জরুরী ।

আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন । আমীন ।

কথা বলার সময়ে যেসব ব্যাপারে স্মরণ রাখা দরকার

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।" [মুসলিম]

#রিয়াদুস সলিহীন – ১৫৪৭

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।" [বুখারী,মুসলিম]

সুন্দর ব্যবহারের প্রত্যাশা !

"যখন আপনি কোন মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবেন, সেই মানুষটি ঠিক একই রকম ব্যবহার আপনার সাথে না-ও করতে পারে। কিন্তু আপনি মন দিয়ে খেয়াল করলে দেখবেন, আল্লাহ আপনার কাছে *অন্য কাউকে* পাঠিয়েছেন যিনি তার চাইতেও উত্তম ব্যবহার করেন।" – ইমাম ওমর সুলাইমান

অস্থিরতা !

অস্থিরতা হচ্ছে মানব জীবনের জন্য খুব খারাপ একটা রোগ ! আপনি হয়তো সমস্যায় পতিত হওয়ার সময় বা সমস্যায় পরার পর খুব বেশী চেষ্টা করবেন যাতে ঠান্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান করা যায় , কিন্তু শয়তান আপনাকে সে সুযোগ দিতে চাইবেনা । সে একরাশ অস্থিরতা নিয়ে আপনাকে অধৈর্য করে তুলতে চাইবে যাতে আপনার নিয়মিত আমালগুলো পালনে সমস্যা হয় এবং আপনি আল্লাহর উপর আস্থা ও নিজের উপর কনফিডেন্ট হারিয়ে হুযুগে সিদ্ধান্ত নেন । না ! এটা কখনো হতে দিবেন না । যে আল্লাহর উপর ভরসা করে সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করে যায় তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট । আল্লাহ তার প্রতি পুর্ণ বিশ্বাসী বান্দাদের কখনো নিরাশ করেন না । আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন । এইজন্য আল্লাহর উপর গভীর ভাবে আস্থা রেখে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত নিয়ে পুর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে হবে । আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন । হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল

হীনমন্যতা !

সুন্দরী না বলে অনেক নারীই হীনমন্যতায় ভোগেন। বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলাপের সময় বলেন, 'আরে দোস্ত আমারে বিয়া করবো কে আমি কি তোর মত সুন্দরী?' কিন্তু সৌন্দর্য্যই যদি সম্পর্কের ভিত্তি হতো, তাহলে সুন্দরী নারীদের কি কখনো ডিভোর্স হতো?! শুধু সৌন্দর্য্য দেখে যে পুরুষ আজ বিয়ে করতে চায়, সে কাল আরো বেশি সুন্দরী নারী দেখলে তার পিছে ছুটবে না এর গ্যারান্টি কি??

প্রত্যেক নারীই সুন্দর! এ বাহ্যিক যৌন্দর্য্যের চাইতে অনেক বেশি জরুরি তার আচার-ব্যবহার আর চারিত্রিক সৌন্দর্য্য। বাইরের চেহারার চাইতে তাই নিজের অন্তরকে সুন্দর করার প্রচেষ্টা করুন। -Sirajum Munira Shimu

আসল সৌন্দর্য হচ্ছে ' অন্তরের সৌন্দর্যতা !

শারীরিক সৌন্দর্য প্রকৃত সৌন্দর্য নয় , আসল সৌন্দর্য হচ্ছে ' অন্তরের সৌন্দর্যতা ' । যে অন্তর আল্লাহ্‌র ভয়ে তটস্থ থাকে এবং সরবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর সন্তুষ্ট থাকে ।

"শারিরীক সৌন্দর্য যত বেশীই হোক না কেন, তার মূল্য হৃদয়ের সৌন্দর্যের সামান্য অংশের তুলনায় খুবই সামান্য" -সাদ তাসলীম

*হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা যেতে পারেঃ তার ধন সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার ধর্মপরায়নতা। এক্ষেত্রে ধর্মপরায়ন স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও, তোমার হাত কল্যাণে ভরে যাবে।" [বুখারী ও মুসলিম] * রিয়াদুস সালেহীন - ৩৬৫

*হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

"সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদে পরিপূর্ণ। এর মধ্যে কল্যাণকর ও উত্তম সম্পদ হল চরিত্রবান নেককার স্ত্রী।" [মুসলিম]

*রিয়াদুস সালেহীন – ২৮০

শূন্যতা

5 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

লীনার কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগছে। না আদনান এবারও ওদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারী ভুলে যায়নি- সব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বিরাট পার্টি দিয়েছে; নতুন শাড়ি, নতুন গহনা, ফুলের মালা; উপহারও বিয়ের চেয়ে কিছু কম পড়েনি; মিউজিক, লাইটিং কিছুরই ঘাটতি ছিলোনা। কিন্তু ঘরে ফিরে আসতেই দু'জনের মাঝে আবার সেই অস্পষ্ট, অস্পৃশ্য দুরত্ব। আদনান শুয়ে পড়েছে পার্টি থেকে এসেই, লীনা এখনও পোশাক পরিবর্তন করেনি। মনের ভেতর এক অস্বস্তিকর, দম বন্ধ করা গুমোট আবহাওয়া। নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় লীনা, সমুদ্র থেকে এক ঝলক বাতাস এসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়, ঠিক যেমন দাদী দিতেন ছোটবেলায়। সময়ের হিসেব হারিয়ে যায়। কি করছে না ভেবেই ফোনের বোতামগুলো টিপতে থাকে লীনা। ফোনের ওপাশে ঘুম ঘুম কন্ঠে 'হ্যালো' শুনে খুব লজ্জা পেয়ে যায়- একবার ভাবে ফোনটা কেটে দিলে কেমন হয়, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'দাদী, আমি লীনা, ঘুম থেকে তুললাম?'

সাথে সাথে আনন্দে ভরে গেল দাদীর গলাটা, 'হ্যাঁরে নাতিন, এই বয়সে কি আর ঘুম আসে সোনা? আমি জেগেই ছিলাম। বল কেমন আছিস? এই বুড়িকে কি করে মনে করলি এত রাতে?'

ভাল মানুষকে ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছে, দাদী কি আর মরে গেলেও নিজের কষ্টের কথা স্বীকার করবে? হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয় লীনার। এই সহজ সরল গ্রাম্য মহিলা তাঁর সদাহাস্য চেহারার আড়ালে যেন ত্যাগ আর শক্তির এক বিমূর্ত চিত্র। আর লীনা সারাজীবন শহরে বড় হয়ে, পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁতভাঙ্গা বিষয়ে পি

এইচ ডি করে, বিদেশের নামকরা কোম্পানিতে কাজ করে, রাতের মধ্যখানে ছত্রিশতলা বিল্ডিঙয়ের ষোলতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, এই বয়সেই একটা অগোছালো জীবনের মালিক হয়ে।

'দাদী, তোমার বিয়ের গল্প শুনতে ইচ্ছে হোল, তাই ফোন করলাম।'

বুড়ি বুঝল সবই, কিন্তু বললনা কিছুই, বরং গল্প শুরু করল, 'অত কি আর মনে আছে রে নাতিন, পঁয়ষট্টি বছর আগের কাহিনী। আমার বয়স তখন বারো। বর্ষার দিন। মাঠে খেলছিলাম সখীদের সাথে। বড় ভাই এসে ডাকল, বলল বাবা ঘরে যেতে ডাকে। ঘরে গেলাম তো মা চাচী সবাই মিলে জোর করে পুকুরে চুবিয়ে, নতুন শাড়ি পরিয়ে, জটওয়ালা চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে বেণী করে, রাঙ্গা কাঁচের চুড়ি পরিয়ে হাজির করল এক বুড়োর সামনে। বুড়ো বলল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, বাড়ী অনেক দূর, এই বৃষ্টিবাদলের দিনে আবার আসা ঝামেলা, আজই বিয়ে হবে। আমার সে কি কান্না, বিয়ে হবে সেজন্য না, সখীদের কতজনের আমার আগেই বিয়ে হয়ে গেল! কান্না বুড়োর সাথে বিয়ে দিচ্ছে বলে। ওমা! রাতের বেলা দেখি বুড়ো না, বিয়ে হোল বুড়োর ছেলের সাথে। বিকালে অন্ধকারে বসে ছিলো, আমি দেখতেই পাইনি! সেই ত বুড়োই হয়ে গেল তোর দাদা। এখন বুড়োর সাথেই সংসার করছি!'

হেসে ফেলে লীনা, বলে, 'দাদী, আমার দাদার মত ঘাড়তেড়া একটা লোকের সাথে পঁয়ষট্টি বছর কেমনে সংসার করলে? আমাদের যুগে তো বিয়ে পাঁচ বছর টিকলেই আমরা মনে করি বিরাট ব্যাপার!'

দাদী বলে, 'জানিনা তো নাতিন। বিয়ে দিল, নিয়ে গেল, সংসার বুঝে নিতে নিতে বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেল, ওদের বিয়ে দিয়ে শেষ করতে করতে নাতিপুতি চলে এলো, তোর দাদার ঘাড়তেড়ামী নিয়ে ভাবার সময়ই পেলাম কই?'

'দাদী, তোমার কখনো মনে হতনা তুমি তোমার জীবনে কিছু মিস করেছ, কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছ, কোন চাওয়া পাওয়া অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে?'

দাদী হাসে, 'শোন রে নাতিন, সেই ছোটবেলায় বাবা মা শিখিয়েছিল, যারা ভাল কাজ করে তারা বেহেস্তে যায় আর যারা খারাপ কাজ করে তারা দোজখে। তখন থেকে জানি দুনিয়াতে সব পাওয়ার আশা করতে নেই, সব দুনিয়াতে পেয়ে গেলে আল্লাহকে গিয়ে চাইব কি? তোর দাদার কাছে কোনদিন কিছু পাওয়ার আশা করিনি, তোর দাদাও আশা করেনি, তাই যখন যাই পেয়েছি– একটু হাসি, দু'টো কথা, একটা বকুল ফুলের মালা, বাচ্চাদের থেকে লুকিয়ে পাঁচখানা বাতাসা– সবই মনে দোলা দিয়ে গেছে সুখ আর ভালবাসার। তোরা দেখেছিস তোর দাদার রাগ, আমি দেখেছি আমার জ্বর হলে অসহায়ের মত আমার শিয়রে বসে থাকা; তোরা দেখেছিস দাদা কত কড়া, আমি দেখেছি ছেলেমেয়ের অসুখ হলে লোকটা কেমন জায়নামাজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত; তোরা দেখেছিস দাদার গাম্ভীর্য, আমি দেখেছি তোদের জন্য কিছু পছন্দ হলে তাঁর চোখ দু'টা কেমন কারেন্টের বাত্তির মত জ্বলে উঠত। জীবনে সব কিছু পাওয়া যায়না বোন, কিন্তু সেটাই পাওয়া ভাল যা মন ভরে দেয় সুখে আর জীবন ভরে দেয় আনন্দে যদিও সবাই তা দেখতে না

পায়, বুঝতে না পারে। একজন ভাল মানুষের সাথে জীবন কাটাতে পারাটাই তো কত বড় একটা ব্যাপার! আর আখিরাতে তাঁকেই সাথী হিসাবে পাব এটা ভাবতেই তো কত ভাল লাগে!'

লীনা নিরুত্তর হয়ে যায়, 'দাদী, তোমাদের কখনো ঝগড়া হতনা?'

'না রে নাতিন, আমরা গ্রামের মেয়ে, বিয়ের সময় মা বলে দিয়েছে সে রাগ করলে তুই চুপ থাকবি, তাহলে আর ঝগড়া লাগবেনা, পরে মাথা ঠান্ডা হলে বুঝিয়ে বলবি। সেটাই করেছি সারাজীবন, সবার সাথে। রাগের সময় কথা বললে অনেক উল্টাপাল্টা, খারাপ ধরনের কথা বলা হয়ে যায় নাতিন যেটা পরে খারাপ লাগে, কিন্তু ফিরিয়ে নেয়ার উপায় থাকেনা। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরতে পারলে পরে যে রাগ করল সে মাথা ঠান্ডা হলে নিজেই লজ্জা পায়, তখন তাকে বুঝালে সে নিজেই বুঝে। ঐটুকু ধৈর্য্য যদি সংসারের শান্তি আর নিজেদের সুসম্পর্ক জিইয়ে রাখতে পারে, তাহলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হলেও ধৈর্য্য ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ, কি বলিস নাতিন?'

লীনা মাথা নাড়ে। তারপর খেয়াল হয় দাদী নিশ্চয়ই ফোনের ভেতর দিয়ে ওর মাথা নাড়া দেখতে পাবেন না। তার আগেই দাদী বলেন, 'ও নাতিন, তোর দাদা মনে হয় ওজু করতে যায়। কারেন্ট নাই, অন্ধকারে কিসে বাড়ি খাবে লোকটা, আমি টর্চটা নিয়ে যাই। তোর সাথে আবার পরে কথা বলব রে নাতিন। রাগ করিস না।'

'না না দাদী, তাড়াতাড়ি যাও। আমি আবার পরে ফোন করব,' বলে ফোনটা কেটে দেয় লীনা। তারপর ভাবে দাদীকে ওর ছয় মাসে একবার ফোন করা হয় কিনা সন্দেহ, আজ হঠাৎ দাদীকে ফোন করল কেন ও?

আদনানকে ড্রয়িং রুমে দেখে ঘরে ঢোকে লীনা। আদনান ওকে দেখে ধপ করে সোফায় বসে পড়ে, মুখে দুষ্ট দুষ্ট হাসি টেনে বলে, 'তোমাকে না দেখে চেক করতে এলাম, তিন বছরে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে ভেগে গেছ কিনা।'

অন্য সময় হলে পি এইচ ডি ধারী লীনা এই সস্তা রসিকতায় দুম করে ক্ষেপে যেত। আজ সে আদনানের দুষ্টুমীটা অগ্রাহ্য করল, 'কেন, আমি ভেগে গেলে তোমার কোন বিশেষ সুবিধা হয়?'

'হয় বৈকি,' আয়েশ করে হাই তুলতে তুলতে বলে আদনান, 'একটা ব্র্যান্ড নিউ বৌ পেলে কে না খুশি হয়?'

ঠোঁটের কোণে সামান্য বিষাদময় হাসি দেখা যায় লীনার, 'তুমি আমাকে নিয়ে খুশি নও তাইনা?'

সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আদনান, যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে, 'নাহ, তোমাকে নিয়ে খুশি না বললে সম্পূর্ন সত্য বলা হবেনা। তুমি একজন শিক্ষিতা, স্মার্ট, সুন্দরী, ভাল চাকুরী করা মেয়ে ...'

'তাহলে কিসে আমার অপূর্ণতা?', বিহ্বল কন্ঠে সামাল দিতে পারেনা লীনা।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লীনাকে পর্যবেক্ষণ করে আদনান, 'তুমি কি সত্যিই জানতে চাও?'

'হ্যাঁ'।

'তোমার ভাল লাগবেনা'।

'না লাগুক, আমি আমাদের সংসার বাঁচাতে চাই'।

'হাহ, সংসার!', আদনানের তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসিতে চমকে ওঠে লীনা।

'সরি, I did not mean it. শোন লীনা, আমরা বিয়ে করেছি, কিন্তু সংসার করেছি কি?'

'মানে?'

'সংসার করা মানে দু'জনে মিলে একটি গৃহ রচনা করা, ভাল মন্দ সবকিছু দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া, দু'জনে মিলে নতুন অতিথিদের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ প্রস্তুত করা। আমরা কোনটি করতে পেরেছি বল তো?'

মুখ নীচু করে রাখে লীনা, 'লীনা, আমি বলিনা তুমি ঘরে বসে অযথা তোমার মেধাকে নষ্ট হতে দাও, কিন্তু তোমার ক্যারিয়ারই যদি তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে স্বভাবতই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, 'তাহলে তোমার জীবনে আমার স্থান কোথায়?' তোমার সামান্য মাথাব্যাথা হলেও আমি কাজে যাইনা বা গেলেও তাড়াতাড়ি চলে আসি, যেহেতু তোমার ভাল থাকা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের বিয়ের ছ'মাস পর, তোমার চাকরীর সূত্র ধরে যখন আমরা এই বিদেশে চলে এলাম, এখানকার আবহাওয়া আমার সহ্য হোলনা, জ্বরে পড়ে কাতরালাম সাতদিন, তুমি

ক'দিন ছুটি নিয়েছ বা এমনকি একদিন আধাদিন করে ঘরে ফিরে এসেছ বল তো লীনা? তুমি আমার সেবা করতে বাধ্য নও, কিন্তু সামান্য মানবিক সহানুভূতি তো আমি আমার প্রাপ্য মনে করতে পারি!'

লীনা কিছু বলতে পারেনা, 'বন্ধুবান্ধব সবার জীবনে প্রয়োজন, জীবনে আনন্দফূর্তি করারও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেটা নিত্যদিনের নিয়ম হয়ে যেতে পারেনা লীনা। সপ্তাহে কয়দিন আমরা বাসায় থাকি বল তো? কয়দিন আমরা বাসায় খাই? মনে করতে পারো কবে আমরা বাসাটাকে গৃহ বানানোর উদ্দেশ্যে সময় ব্যায় করেছি? তুমি জানো আমি খুব একটা সামাজিক নই। সামাজিক পরিবেশে আমি খেই হারিয়ে ফেলি। একদিন বাইরে কাটালে আমার দু'দিন লাগে সামলে নিতে। তাছাড়া যেহেতু সারাদিন আমরা দু'জন বাইরে থাকি, সন্ধ্যার পর সময়টুকু আমি চাই তোমার সাথে কাটাতে। কিন্তু তুমি কিছুতেই চাকচিক্যের মোহ কাটাতে পারোনা। কিন্তু লীনা, সুখ কি দামী শাড়ি, একেকদিন একেকরকম গহনা, ভাল রেস্টুরেন্টে খাওয়া আর অন্যকে খুশি করার জন্য দাঁত কেলিয়ে হাসায়, নাকি পরস্পরের সাহচর্যে?'

'তুমি আমাকে এসব কথা এতদিন বলনি কেন?'

'বলার চেষ্টা করেছি। প্রথম বছর যখন আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে আমি চাইলাম দু'জনে মিলে সমুদ্রের পাড়ে বসে সারাদিন গল্প করব, বালিতে পা ডুবিয়ে হাঁটব, সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলব– মনে আছে তুমি কেমন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলে? সেই ভয়েই তো প্রতিবছর অনুষ্ঠান করি যদিও এসব মেকি কাজকারবার আমার ভাল লাগেনা। আমাদের ভালবাসা কি জনসমক্ষে প্রদর্শনী দেয়ার জিনিস না মানুষের উপহারে পরিমাপ করার বস্তু? এটা অনুভব করার ব্যাপার। কিন্তু একেকটা অনুষ্ঠানে অনাকাঙ্খিত লোকজনের সান্নিধ্য আর চাকচিক্যময় পরিবেশ আমাকে এতটা ক্লান্ত করে দেয় যে বাসায় এসেও আমার আর তোমার সাথে সময় কাটানোর মত এনার্জি থাকেনা'।

'আমি দুঃখিত আদনান, ব্যাপারটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তুমি কখনো আমাকে কোন বিষয়ে জোর করনি, কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনা জোর করলে আমার কেমন লাগত'।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর লীনা বলে, 'আদনান, তুমি কেন বলনি তুমি সন্তান চাও?'

'লীনা, একটি সন্তান একটি দম্পতিকে একটি পরিবারে রূপান্তরিত করে, একটি সন্তান একটি গৃহকে সংসার বানায়, একটি সন্তান একটি সম্পর্ককে পূর্ণতা দান করে। একজন নারী একজন পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি উদগ্রীব থাকে সন্তানের জন্য, সাধারনত। গৃহের প্রতি তোমার আকর্ষন না থাকলে সন্তানের কথা তোমাকে বলি কি করে বল তো? সন্তান ধারণ কিংবা লালনপালনের যোগ্যতা তো আমার নেই। নইলে সেই কবে দু'চারটা 'ওয়্যাঁ ওয়্যাঁ' কোলে নিয়ে ঘুরতাম!'

আদনানের কথায় হেসে ফেলে লীনা। লীনাকে হাসতে দেখে স্বস্তি পায় আদনান। যাক, আজ সম্ভবত ঝগড়া হবেনা।

‘আদনান, আধুনিক শিক্ষা আমাকে বানিয়েছে প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন, সংসারী হতে শেখায়নি। আমি জানি নেটওয়ার্কিং ছাড়া জীবনের ইঁদুর দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া মুস্কিল, তাই আমি নেটওয়ার্ক তৈরী করতে করতে কবে যে তুমি আমার নেটওয়ার্কের বাইরে পড়ে গেছ দেখার সময়ই পাইনি! আর হ্যাঁ, আধুনিকতা আমাকে শিখিয়েছে জীবনের চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষন অথচ জীবনের মূল লক্ষ্যগুলো কবে আমার প্রায়োরিটি লিস্ট থেকে ধীরে ধীরে কাটা পড়েছে লক্ষ্যই করা হয়নি!’

‘আদনান, তুমি কেন আমাকে স্বেচ্ছাচারী হতে দিলে? কেন আমাকে টেনে ধরলে না? কেন আমাদের মাঝে নীরবতার দেয়াল তুলে দিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে দিলে?’

‘ম্যাডাম, আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। জীবনের কাছে আমার চাহিদা খুব কম। তুমি যদি মনে করতে এই মূর্খ গোঁয়াড় লোকটা তোমার জীবনটা ফানা ফানা করে দিল!’

‘মনে করবনা, কিন্তু তুমিও আর আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দেবেনা। ভুল করতে দেখলে হাত ধরে ফিরিয়ে আনবে’, আদনানের ঘাড়ে মাথা গুঁজে আরাম করে বসে লীনা।

আদনান ওর মুখমন্ডল দু’হাতের মধ্যে স্থির করে ধরে পর্যবেক্ষণ করে, ‘তুমি কে? তুমি আমার বৌকে কি করেছ?’

হেসে ফেলে লীনা, ‘আমিই তোমার বৌ, কিন্তু আমার একজন ভাল ট্রেনার মিলেছে। তিনি আমাকে সংসারবিদ্যায় ট্রেনিং দিচ্ছেন’।

‘কে তিনি?’

‘এটা আমার সিক্রেট’।

‘আমার সাথে সিক্রেট!’, কপট মন খারাপ করে আদনান।

‘হুমম, যতদিন তুমি আমার সাথে দুরত্বের দেয়াল তুলে না দেবে বা আমি তা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভাংতে না পারি ততদিন এই সিক্রেট জানা যাবেনা’।

‘ওকে, চল তবে দু’জনে দু’দিক থেকে দেয়াল ভাঙ্গা শুরু করি!’

হাসতে হাসতে হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় দু’জনে, একটি নতুন জীবন গড়ে তোলার সংকল্পে।

যুদ্ধ একটি সংসার

3 November 2014

লেখকঃ **রেহনুমা বিনতে আনিস**

“আপা আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আমি আপনাকে পাগলের মত খুঁজছি!” পেছন ফিরে গলার অধিকারীকে দেখে চিনতে অনেক বেগ পেতে হোল। শায়লা ভাবী না? এ কি অবস্থা ওনার? বিধ্বস্ত চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, ওনার ট্রেডমার্ক হাসিটাও মিসিং। দুষ্টুমী করে বললাম, “কি ব্যাপার ভাবী? আপনি কি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে গেছিলেন নাকি? আপনাকে তো চিনতেই পারছিনা! তা বলুন, আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি?”

শায়লা ভাবীকে আমার খুব ভালো লাগে। বিশাল বড়লোকের বৌ হয়েও ওনার মধ্যে কখনো কোন অহংকারের ছায়া পর্যন্ত দেখিনি, আমাদের চেয়েও সাধারণভাবে চলেন, নিজেই বাচ্চাদের রিক্সায় করে স্কুলে আনা নেয়া করেন। আমার হাত খুবলে ধরে বললেন, “আপা, আমাকে একটু সময় দেন, আমি আপনার বাসায় আসব”। অ্যাঁ! বলে কি? এত বড়লোক মানুষকে আমি কি দিয়ে অপ্যায়ন করব? আমার তো রান্নাঘর পর্যন্ত নেই- নিজেই খাই শ্বাশুড়ী আম্মার দয়ায়! যাই হোক। বললাম, “ভাবী, আমি বাসায় থাকার সুযোগ পাই খুব কম, আজকে তিনটা থেকে চারটা এক ঘন্টা বাসায় থাকব। আপনি আসতে পারেন কিন্তু দেরী করলে আমি সময় দিতে পারবনা”। উনি বললেন, “আমি আসব”। ওনার কথাবার্তা, চেহারায় একধরণের ফবংঢ়বৎধঃরড়হ দেখলাম। কিন্তু স্কুল ছুটির সময়, বাচ্চা আর বাবামাদের গিজগিজে ভীড়ে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

ঠিক তিনটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ভাবী এসে উপস্থিত। আমি তখনও আম্মার বাসায়, ভাত খাচ্ছি। হাতে সময় কম, তাই বাচ্চাকে ওর দাদুর বাসায় রেখে শায়লা ভাবীকে আমার দু’কামরার ফ্ল্যাটে নিয়ে বসলাম। উনি কোন ভনিতা না করেই কথা শুরু করলেন, “আপা, আমি আমার বাবামা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কারো কাছে না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনি প্লীজ আমাকে ফেরাবেন না। আমি শুনেছি আপনি লোকজনকে পরামর্শ দেন। আমি কোন রাখঢাক না করেই আপনাকে আমার সমস্যার কথা খুলে বলব, প্লীজ আমাকে সাহায্য করুন”।

বলতে যাচ্ছিলাম, “আমি কবে থেকে পরামর্শদাত্রী হলাম?” কিন্তু উনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে শুরু করলেন, “আপনি হয়ত জানেন আমি আর আমার স্বামী দু’জনই খুব সাধারণ পরিবার থেকে এসেছি। প্রথমদিকে আমরা তেমন একটা সচ্ছল ছিলাম না। পরে ও একটা ব্যবসার সন্ধান পায়। ব্যবসা শুরু করার মত পুঁজি ছিলোনা। তখন আমি বাবামা শ্বশুরশ্বাশুড়ী সবার উপদেশ উপেক্ষা করে আমার সমস্ত স্বর্ণ বিক্রি করে সেই টাকা ওর হাতে তুলে দেই। দিনে দিনে আমাদের ব্যবসা জমে উঠতে শুরু করে। সে চাকরী ছেড়ে দেয়, নিজের কোম্পানী খোলে। একসময় আমরা ভালো বাড়ী তৈরী করে, ভালো গাড়ী কিনে এমন এক জীবন গড়ে তুলি যার স্বপ্ন আমরা দু’জনে মিলে দেখেছিলাম। বাচ্চারা প্রাচুর্যের মাঝে বড় হতে থাকে। আমি আমার শেকড়ের কাছাকাছি থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু আমার মনে হতে থাকে কোথায় যেন আমার স্বামী সাদাতের শেকড়টা আলগা হতে শুরু করে। কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছিলাম সে কাজে এত ব্যাস্ত হয়ে পড়েছে যে কখনো কখনো সারারাত বাসায় আসেনা। যখন আসে তখন এত ক্লান্ত থাকে যে আমাকে সময় দেয়ার মত মুড থাকেনা। প্রথম প্রথম আমি একে কাজের চাপ মনে করলেও একসময় ওর আচরণে আমার সন্দেহ হতে শুরু করে। পরে একদিন ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে কিরা-কসম কেটে শক্ত করে ধরার পর উনি বলেন, ‘ভাবী, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না? যে আগুনে সুন্দরী যুবতি সেক্রেটারীকে আপনার স্বামী সর্বত্র নিয়ে যান, উনি তার প্রেমে পড়েছেন। সাহেব তাকে বিয়ে করতে চান। আমরা

খেটে খাওয়া মানুষ। ওনাকে বুঝাতে গেলে চাকরী যাবার ভয় দেখান। আপনাকে বলেছি জানলে কি করবেন কে জানে! ভাবী, উনি ভালো মানুষ। কিন্তু এখন উনি মোহগ্রস্ত। আপনি তাঁকে ফেরান'। আপা, আমার মনে হোল আমার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেছে, মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। একবার ভাবলাম সংসারের মুখে লাথি দিয়ে বাচ্চা দু'টো নিয়ে চলে যাই। কিন্তু আপা, আমার পরিবারের আমাকে দু'বাচ্চাসহ প্রতিপালন করার সামর্থ্য নেই। এতবছর আমি কোন চাকরীবাকরী করিনি, লেখাপড়া থেকেও বিচ্ছিন্ন- বিশ্বাস করুন আমি মনে হয় অ আ পর্যন্ত ভুলে গেছি! আমি বাচ্চা দু'টোকে কিভাবে বড় করব? আমি তাদের আমার মত সাধারণভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেছি। ওরা হয়ত অনেক কষ্ট করতে পারবে। কিন্তু ওদের যে পরিমাণ কষ্ট করতে হবে তা চিন্তা করলে আমার বুক ফেটে যায়। আবার ভাবি, আমার এত বছরের সংসার আমি বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দেব?! কিন্তু আপা, আমার যে কোন যোগ্যতাই নেই! যৌবনও যায় যায়। কি দিয়ে লড়ব আমি?"

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে উনি হঠাৎ তন্ময় হয়ে পড়লেন। আম্মার বুয়া এসে নাস্তা দিয়ে গেল। অপদার্থ বৌদের শ্বাশুড়ীদের অনেক জ্বালা। আমি নাস্তার কথা বলতে ভুলে গেছি বলে তাঁকেই মনে করে পাঠাতে হোল। শায়লা ভাবী নাস্তার দিকে দৃকপাত না করে বললেন, "আপা, আমার নাওয়াখাওয়া উঠে গেছে। আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন"। আমি চুপ করে রইলাম। উনি আবার বললেন, "আপা, আমি আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি, আপনি আমাকে পরামর্শ দিন"। আমি বললাম, "আপা, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবনা"। ওনার মুখটা অজান্তেই হা হয়ে গেল, "আপা, আপনি আমাকে এভাবে মুখের ওপর না করতে পারেন না!"

আমি উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাড়ালাম। বাইরে প্রচন্ড রোদ, আকাশে একখন্ড মেঘ তার মাঝে ছায়া সৃষ্টি করে আছে। সেই ছায়া গিয়ে পড়েছে মাটিতে যেখানে ঘন সবুজ নারকেল বাগানের মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে আমগাছ বা কাঁঠালগাছের মাথা। আহা! আমি যদি ঐ মেঘখন্ডের মত এই সবুজমনা নারীকে ছায়া দিতে পারতাম জীবনের খর বাস্তবতা হতে! ফিরে এলাম ভাবীর সামনে। বললাম, "ভাবী, আমি আসলেই আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবনা। তবে যিনি পারবেন তার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে পারব। আপনার সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু তার জন্য সময় আর শ্রম দিতে হবে"।

বেচারীর চেহারাটা হঠাৎ আশার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। উনি বললেন, "আমি যার কাছে যেতে বলবেন যাব, যা করতে বলবেন করব, শুধু আপনি আমাকে পথ দেখান"। আমি বললাম, "ঠিক তো?"

উনি বললেন, "পাক্কা ওয়াদা। সাদাতের সাথে সংসার করা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই, কিন্তু আমি আমার সন্তানদের জন্য যা করতে হয় সব করব"।

শায়লা ভাবীর চোখে চোখ রেখে বললাম, "ভাবী, আপনি আপনার স্বপ্নের পথ ধরে বহুদুর এগিয়েছেন, স্বামীর জন্য সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছেন, সন্তানদের জন্য বাকীটাও উজার করে দিতে রাজী আছেন, কিন্তু পথের কোন একখানে আপনি আপনার

সেরশ্রেষ্ঠ বন্ধুর হাত ছেড়ে দিয়েছেন, তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। আপনাকে সবার আগে সেই সম্পর্ক পুণর্গঠন করে তুলতে হবে কারণ সে ছাড়া আর কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবেনা"।

উনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "আপা, আমি তো লোকজনের সাথে যদ্দুর পারি যোগাযোগ রাখি। আপনি কার কথা বলছেন আমি তো বুঝতে পারছিনা!"

আমি হেসে বললাম, "আপনি তার সাথে যোগাযোগ না করতে করতে তার নামও ভুলে গেছেন! ভাবী, দায়িত্বের খাতিরে নয়, আল্লাহকে ভালোবেসে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে নামাজ পড়েছেন কবে মনে আছে? অর্থসহ কুর'আন পড়ে আপনাকে কি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বসে পাঁচমিনিট ভাবার চেষ্টা করেছেন কতবছর হোল? কিছু চাইবার জন্য নয়, বন্ধুর সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহর সামনে হাত তুলেছেন কবে মনে পড়ে? আপনি যদি তার ডাকে সাড়া না দেন, আপনার বিপদেও সে গড়িমসি করবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আমি আপনাকে এতদিন পর একঘন্টা সময় দিলাম আর আপনি পাঁচমিনিট আগেই ছুটে এলেন। অথচ যে আপনার কথা শোনার জন্য, আপনাকে দেবার জন্য উপহারের ডালি সাজিয়ে বসে আছে কে জানে কত বছর তার সাথে কথা বলার আপনার ফুরসতই মেলেনা!" ভাবী চোখ নামিয়ে নিলেন।

বললাম, "ভাবী, আমার কথায় কষ্ট পেয়েন না। আপনি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ রেগুলার করে ফেলুন। সাতদিন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, কুর'আন পড়ে, আল্লাহর সাথে পরামর্শ করুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানান আপনি কি করতে চান। সংসার করবেন, নাকি চলে যাবেন? আপনি যে পথ বেছে নেবেন সেভাবেই আমি আপনাকে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ"।

শায়লা ভাবী চলে গেলেন।

সাতদিন পর উনি এসে বললেন, "আপা, আমার মনে কেমন যেন একটা স্বস্তি আর সাহস এসেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা উটকো মহিলা এসে আমার সন্তানদের অধিকার কেড়ে নিয়ে যাবে আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব তা হবেনা। আমি লড়ব। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন। আপনি আমাকে বলুন কিভাবে কি করব"।

বললাম, "ভাবী, আপনাকে কিছু কড়া সত্য কথা বলব, আপনি সহ্য করতে পারবেন তো? নইলে আপনি এখনই চলে যেতে পারেন"। উনি বললেন, "কি যে বলেন আপা! যে মহিলার স্বামী অন্য মহিলা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার কি রাগ ঘেন্না বাকী আছে? আপনি তো আমার ভালোর জন্য ক'টা কড়া কথা হলেও বলছেন, সে তো সেটুকুও আমার জন্য করছেনা!"

উচিত কথা বলা থেকে নিজেকে কখনই বিরত রাখতে পারিনি যদিও বুঝি তা আমার জন্য কতখানি অনুচিত। আজও প্রবৃত্তির কাছে হার মানলাম। ক'খানা কটু কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিলাম, "ভাবী। বিয়ের সময় একটা ছেলে আর একটা মেয়ের শিক্ষাগত এবং অন্যান্য যোগ্যতা আনুপাতিক কি'না দেখেই বিয়ে দেয়া হয়। তারপরে কি হয়

জানেন? ছেলেটা উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে, তার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে, তার জ্ঞান বাড়তে থাকে। আর মেয়েটা? সে সংসার করতে করতে জীবনের যে মূল লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন করা সেটাই ভুলে যায়। তার পৃথিবী একসময় রান্নাবান্না, ধোয়াপালা, বাচ্চা সামলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় নতুবা আটকে যায় টেলিভিশনের পর্দায় যা তার মেধার বিকাশে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনা। আমি বলছিনা মহিলাদের চাকরী করতে হবে বা তারা ঘরের কাজ করবেনা। কিন্তু দৈনিক অন্তত একটি ঘন্টা সময় তো নিজের জন্য ব্যায় করা যায়, হোকনা সে দুপুরের ঘুম বাদ দিয়ে বা যেকোন একটি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগামী দিনের জন্য বাকী রেখে। কার্যত দেখা যায় মহিলারা নামাজ পড়ার পর্যন্ত সময় পান না, লেখাপড়া না করতে করতে বাচ্চাদের সামান্য প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও বলেন, 'আব্বুকে জিজ্ঞেস কর'। সংসারের ব্যাস্ততায় আমাদের মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে সুতরাং ঐদিক দিয়েও ভদ্রলোক কোন সুবিধা করতে পারেন না। এই বৌয়ের সাথে কথা বলে তখন স্বামী আর মজা পাননা, তার মন চলে যায় বাইরে, বন্ধুবান্ধবের আড্ডায়। আমরা বাইরে যাবার সময় সেজেগুজে যাই অথচ বাসায় বুয়ার মত হয়ে থাকি, সুতরাং, স্বামী ভদ্রলোক হলে অসন্তুষ্টির সাথে মেনে নেন আর তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব থাকলে দৃষ্টি হয়ে যায় বহির্মুখী। সেই লোক যদি বাইরে এমন কোন মহিলার সন্ধান পান যে এই উভয়প্রকার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এবং আগ্রহী তখন তাকে বিয়ে নামক সম্পর্কের দলিল দিয়ে আটকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাবী, আমরা মানুষ। তাই খুব সহজেই ভুলে যাই সে সঙ্গীর কথা যে তার জীবন যৌবন আমাদের উন্নতির পেছনে ব্যায় করে নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা সবসময় নিজের স্বার্থটাই চিন্তা করি আর স্বার্থ চিন্তায় বর্তমানে কি পাইনি তা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের নজরের সামনে আসেনা। যার আল্লাহর ভয় আছে সে নাহয় জবাবদিহিতার ভয়ে নিজের প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু যার সে চিন্তা নেই সে কি দিয়ে নিজকে আটকাবে বলুন তো? আরেকজনকে সংশোধন করা আমাদের সাধ্যের অতীত। আমরা কেবল নিজেকেই সংশোধন করতে পারি। সুতরাং, চলুন আগে নিজের দিকে যথাসম্ভব উন্নয়নের চেষ্টা করি। ভেবে দেখুন, আপনার কাছে যে গুণগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সাদাত ভাই নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে আপন কত খুশী হবেন। একইভাবে চিন্তা করে দেখুন আপনার স্বামীর কাছে কোন জিনিসগুলো আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেসব ব্যাপারে আপনার দক্ষতা সৃষ্টির চেষ্টা করুন। আপনি আমার সাথে একদিন বের হবেন। আমি আপনাকে ইংরেজী কোর্সে ভর্তি করিয়ে দেব। আরেকদিন বের হব আপনার জন্য ভালো জামাকাপড় কিনতে– আপনি বাসায় সবসময় ফিটফাট হয়ে থাকবেন। প্রতিদিন অন্তত একঘন্টা আপনি বিভিন্ন সাধারন জ্ঞানবর্ধক বই পড়বেন এবং বাচ্চাদের সাথে এগুলো শেয়ার করবেন। আজ থেকে হিন্দি সিরিয়াল টাটা বাই বাই। উরংপড়াবৎু, ঐরংঃড়ৎু বা ঘধঃরড়হধষ এবড়মৎধঢ়যরপ চ্যানেল দেখবেন। এতে ইংরেজীও শেখা হবে, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে জানারও সুযোগ হবে। সবচেয়ে বড় কথা আপনার হাতে প্রচুর পরিমাণ সময় আসবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য। কি, রাজী?"

শায়লা ভাবী প্রচন্ড আগ্রহ আর উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে।

কয়েকমাস পর দেখা গেল তিনি বিবিধ বিষয়ে অনর্গল আলাপ করতে পারছেন, ইংরেজীতে কথা বলতে বা বুঝতে তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছেনা বিধায় স্বামী অপর মহিলার সাথে ব্যাবসায়িক আলাপের ভান করে গোপন আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁর কথাবার্তা চেহারা পোশাক পরিচ্ছদে রুচি ও শালীনতার বহিঃপ্রকাশ তার স্বামীকে মোহিত করে তুলল, তিনি আগে যে কাজ সারাদিনে করতেন তা এখন কৌশল প্রয়োগ করে কয়েকঘন্টায় করতে পারছেন ফলে বাচ্চাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তিনি সময় দিতে পারছেন– কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা সাদাত ভাই শায়লা ভাবীর আচরণে এমন এক আত্মবিশ্বাস দেখতে পেলেন যে তাঁকে ছেড়ে দেয়ার চিন্তার পরিবর্তে শায়লা ভাবীই তাকে ছেড়ে যাবেন কি'না সেই চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। স্ত্রী এবং সেক্রেটারীর মধ্যে তুলনা করে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দু'জনের মধ্যে কে শ্রেয়। একসময় তিনি নিজেই সেক্রেটারীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।

ছ'মাস পর ভাবী একদিন বাসায় দাওয়াত দিলেন। ভদ্রলোকেরা ড্রইং রুমে কথা বলতে বলতে আমরা রান্না ঘরে দাঁড়িয়ে খাবার বাড়তে বাড়তে গল্প করতে লাগলাম। ভাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, "ভাবী, এখন কি অবস্থা?"

শায়লা ভাবী হাতে ভাতের চামচের অস্তিত্ব ভুলে গেলেন, তন্ময় হয়ে বলতে লাগলেন, "আপা, একসময় মনে হত আমি সাদাতকে ছাড়া কি করে বাঁচব? আমার বাচ্চাদের কি হবে? এখন বুঝি আমাদের দেখাশোনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, সাদাত তো কেবল একটা মাধ্যম। সে যখন বুঝতে পারল আমি এখন আর ওর ওপর ফবঢ়বহফবহঃ নই তখন সে আমাকে আর বাচ্চাদের আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরল। ঐ মহিলা বিদায় হয়েছে তিনমাস আগে। সাদাত নিজেই তাকে বিদায় করেছে। এখন তো সে ঘর ছেড়ে এক পাও নড়তে চায়না, আমার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করেনা ।

মোহরানা

23 October 2014

লেখকঃ কানিজ ফাতেমা

মেয়েটা জলিল সাহেবের খুবই পছন্দ হল, বয়স এখনও আঠারো পার হয়নি, কম বয়সী মেয়েতে সুবিধা অনেক। শশুর বাড়ীর সবাইকে ভয় করে চলে, গায়ের রংটা একটু শ্যামলা, এই যা। শ্যামলা হলেও দেখতে বেশ ডাগর। মেয়ের বাবা মিজান সাহেব, একটু দোমনা করতে চেয়েছিলেন। ছেলের বয়সটা একটু বেশী বলে। ছেলের বয়স মেয়ের থেকে দশ – এগারো বছর বেশী হবে। কিন্তু জলিল সাহেব এটাসেটা বলে ম্যানেজ করে নিয়েছেন।

"বেয়াই সাহেব, আল্লাহর রহমতে আমারতো কিছুর অভাব নেই, আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন। আপনি মেয়ে নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না, ও এখন থেকে আমার মেয়ে। আপনি চানতো ওর নামে আমি আমার মফস্বলের বাড়ীটা লিখে দেবো।"

“না, না, বেয়াই সাহেব, আমার মেয়ে বাড়ী দিয়ে কি করবে – তা’ ছাড়া আপনার অন্য ছেলেদের হক আছে ” Ñ মিজান সাহেব বাড়ীর প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন।

দু’ পক্ষই সন্তুষ্ট, ঠিক হল এক লাখ টাকা মোহরানায় বিয়ে হবে। জলিল সাহেব বললেন, “মোহরানা মেয়ে হক, এটা আদায় করা ফরজ, না হলে আল্লাহ পাক নারাজ হবেন। আমি মোহরানার সবটুকু আদায় করেই বিয়ে দিতে চাই।”

পঞ্চাশ হাজার টাকার স্বর্ণ ও পঞ্চাশ হাজার টাকার জমি বাবদ উসুল ধরে কাবিন হল। মিজান সাহেব মনে মনে গর্ব বোধ করলেন। এ গ্রামে এত মোহরানায় কোন মেয়ের বিয়ে হয়নি। তিনি মেয়েকে বার বার মনে করিয়ে দিলেন,“ তোমার ভাগ্য ভালো, ক’জন মানুষ ঠিকভাবে মোহরানা আদায় করে ? তোমার শশুর আমাকে তোমার মোহরানার জমি দেখিয়েছেন। আহা! কি খাসা জমি, একেবারে সোনা ফলা জমি। খবরদার! শশুড় শাশুড়ির কোন কথায় ‘না’ বলবা না।”

বিয়ের পর রাহেলাও একবার জমিটি দেখেছে, তার স্বামী তাকে নিয়ে গিয়েছিল জমি দেখাতে। একসাথে বেশ কত খানি জমি, ধানের কচি সবুজ ডগা দুলছিল। স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে রাহেলাও গর্বে ফুলে ফুলে উঠেছে। শফিক গ্রামের পূর্ব প্রান্তের এ জমিটি দেখিয়ে বলেছিল “এ জমি তোমার”; দশদিক ছাপিয়ে একটা বাক্য যেন প্রতিধ্বনিত হল, “এ জমি তোমার তোমার তোমার ……..”।

কয়েক বছর পরের কথা, রাহেলা স্বামীর সাথে ঢাকায় থাকে। ছেলে-মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে । রাহেলার ব্যস্ত সময় কাটে । একবার কি কাজে শফিক সাহেব গ্রামে যাবেন রাহেলাকে ডেকে বললেন- “এইবার তোমার জমিটা বাবাকে তোমার নামে রেজিষ্ট্রি করে দিতে বলবো ”।

রাহেলা কোন উত্তর না দিয়ে শফিক সাহেবের ব্যাগ গুছিয়ে দিলেন । যাবার সময় বার বার মনে করিয়ে দিলেন- বেশী রাত যেন না জাগে, ঠিক সময়মতো যেন খাবার খায়।

এক সপ্তাহ পরে শফিক সাহেব ফিরে আসলেন। রাতে খাবার টেবিলে রাহেলা জিজ্ঞেস করলো “জমির রেজিষ্ট্রি কি হল ?”

“না, সময় পাইনি! তাছাড়া আব্বা তো বলেছেন জমিটা তোমার । আর রেজিষ্ট্রি করে কি হবে ?”

রাহেলার বয়স বেড়েছে! রাহেলা জানে ঐ জমিতে বছর বছর যে ফসল হয় তা থেকে বেশ ভাল আয় হয়। রাহেলা এখন বোঝে “ঐ জমি তোমার” এ বাক্যটা ছাড়া ঐ জমিতে তার কোন অধিকার নেই। কিন্তু রাহেলা কিছুই বলতে পারে না। সে বলতে পারে না যে, তার মোহরানা হল একটা বাক্যে “ঐ জমি তোমার”; রাহেলার মনে প্রশ্ন – জমি তার নামে না, জমির ফসল সে ভোগ করে না, এমনকি সে জানেও না জমি থেকে কত আয় হয় ; তবে কিভাবে তার

মোহরানা আদায় হল ? রাহেলার মনের প্রশ্ন মনেই থেকে যায়, মুখে আসে না! মোহরানা তো স্বামীর জন্যই। মোহরানা চাওয়া মানেই স্বামীর অসন্তুষ্টি ; স্বামীর কঠিন প্রশ্ন আমার থেকে তোমার মোহরানা বেশী গুরুত্ব পূর্ণ হল ? শশুড় অসন্তুষ্ট হবেন, "বউ অধিকার শিখেছে, টাকা চিনেছে।" দেনাদার দেনা পরিশোধ না করলে দোষের কিছু নেই, পাওনাদার পাওনা চাইলেই অপরাধ। রাহেলা "সামান্য" জমির জন্য এত বছরের অর্জিত স্বামী – শশুড়ের "সন্তুষ্টি" হারাতে চায় না।

এরও অনেক পরের কথা , রাহেলার ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে। যে যার মত প্রতিষ্টিত, শফিক সাহেবেরও বয়স হয়েছে। তাই তিনি একদিন ছেলেদের আর রাহেলাকে ডেকে সব স্থাবর –অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দিলেন। সবশেষে বললেন, "বাবারা, মনেরেখো ঐ পূবপাড়ার জমিটা তোমাদের মায়ের। ওটা আমার পক্ষ থেকে তোমাদের মাকে মোহরানা দেয়া হয়েছে।"

রাহেলা ফোকলা দাতে একটু হাসলেন। রাহেলার বয়স এখন ষাটের কোঠায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ

13 October 2014

Courtesy : Ssh Razib

ফেসবুকে শেয়ার দেওয়া ইউ টিউবে upload করা NTV এর একটি প্রতিবেদন দেখে কিছুটা শঙ্কার জন্ম নিল মনের মাঝে। প্রতিবেদনটিতে DCC এর statistics এ দেখানো হল গত বছর প্রায় ৯০০০ শিক্ষিত বিবাহিত নারী পুরুষের বিবাহ বিচ্ছেদ আবেদন জমা পড়ে । এর মাঝে ৬০০০ - ই নারীদের করা । বাঁকি ৩০০০ বিচ্ছেদ ঘটে পুরুষদের ইচ্ছায় যেখানে ২০০৪ সালে আবেদন জমা পড়ে মোট ৩৩৩৮ টি যার ২৮১৪ টি। বিগত পাঁচ বছরে এই সংখ্যা প্রায় তিনগুনে এসে দাড়িয়েছে।আমাদের সমাজ কি পশ্চীমা সমাজের ন্যায় বন্ধনহীন হয়ে যাচ্ছে ?? এমন ভয়ই মনের ভেতর মাথা চারা দিয়ে উঠল।

বিচ্ছেদের কারন হিসেবে পুরুষরা অভিযোগ করেন ,

১। নারীদের ফেসবুক , টুইটার , ইয়াহু - তে আড্ডা দেয়া ।

২। সামাজিক অবক্ষয় ,

৩। বিয়ের আগের প্রেম এর কথা জানতে পারা ,

৪। পরকিয়া প্রেম ,

৫।অন্য পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব , ইত্যাদি ।

আর নারীরা পুরুষদের প্রতি অভিযোগ হিসেবে বলেন ,

১। নেশা করা ,

২। শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করা ,

৩। ওয়াইফ এর প্রতি যত্ন না নেয়া ,

৪। ওয়াইফ -কে সময় দিতে না পারা ,

৫। ভালোবাসার অভাব ,

৬। বন্ধুদের সাথে পার্টি করা ,

৭। ফেসবুক , টুইটার , ইয়াহু - তে মেয়েদের সাথে আড্ডা দেয়া ,

৮। দাম্পত্য কলহ ,

৯। স্বামীর অসহনীয় আচারন এবং সংসার চালাতে অপারগতা ,

১০। সন্দেহের চোখে দেখা ,

১১। অবিশ্বাস, ইত্যাদি ।

কারন যাই হোক প্রায় সব বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে যখন তারা মা-বাবা হন । যার কারনে এইসব পরিবার এর ছেলে মেয়েরা ঠিক ভাবে বেরে ওঠেনা ।

আর এইভাবে বিচ্ছেদের ঘটনা বারতে থাকলে সামাজিক বিপর্যয় নিশ্চিত । কারন একটা শিশুর বেরে ওঠা তার পরিবার থেকে ।

আমাদের যোগাযোগ এর মাধ্যম (ফেসবুক , মোবাইল ফোন , টুইটার , ইয়াহু , ইন্টারনেট , ইত্যাদি) আমাদের জীবনকে সহজ করছে কিন্তু পারিবারিক বন্ধন কে দুর্বল করছে।এখন যদি যোগাযোগ মাধ্যমকে কেবল দোষারোপ করি তাহলে সেটা আসলে Problem Identify করার জন্যে Justified কোন চিন্তার প্রতিফলন ঘটায় না। যোগাযোগ মাধ্যম আছে থাকবে, তবে এটা কিভাবে ব্যবহার হবে সেটা নির্ভর করে যারা এটা ব্যবহার করছে তারা কোন চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত, তারা যে সমাজে বসবাস করছে সেই সমাজে কোন চিন্তাগুলো Dominant তার উপর। যে সমাজে পরকীয়া করাকে দেখানো হয় একজন পুরুষের যোগ্যতা হিসেবে কিংবা ফেসবুকে একাধিক প্রশংসাকারী ছেলে ফ্রেন্ড থাকাকে বুঝানো হয় কোন মেয়ের গৌরবের বিষয় হিসেবে অথবা Hot Look নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে সবার মাঝে নিজেকে উপস্থাপন করাটাকে স্মার্টনেস হিসেবে শেখানো হয় সেই সমাজের মানুষের মাঝে আপনি কি আর আশা করতে পারেন ?

এর সাথে যোগ হয়েছে আমাদের দেশের কিছু Talented বুদ্ধিজীবি (বুদ্ধিব্যবসায়ী) যারা ব্যাচেলর, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সিনেমা তৈরী করে শিখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে পরকিয়া করতে হয়, লিভ-টুগেদার করাটা কিভাবে জীবণকে সহজ করে দেয় দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে। জিনিসগুলকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন সিনেমাতে যা হচ্ছে সেটাই যেন বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি আর মানুষকেও ভাবাচ্ছে এটাই স্বাভাবিক চিত্র বর্তমান সমাজের আর তুমি যদি এমনটা করে থাকো তাহলে লজ্জা পাবার কিছু নেই, কারন সমাজের mass public তোমার মতই। আবার কিছু বুদ্ধিজীবি তাদের সাহিত্যে কিংবা পশ্চিমা সংস্কৃতির ফসল ভালবাসা দিবসে কলাম লিখে বলে দিচ্ছেন পরকিয়া করা প্রত্যেক পুরুষের মৌলিক অধিকার, এটা তার ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি অংশ। ভাবছেন এদেরকে Talented কেন বলছি ? কারন টা খুব স্পষ্ট, তারা কিভাবে এই জিনিসগুলো মানুষের মাঝে ঢুকিয়ে দেয়া যায় সেই ব্যাপারটা খুব ভাল ভাবেই রপ্ত করেছেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে তারা কেন আদা-জল খেয়ে লেগেছেন এগুলো প্রচার করতে। হিসাবটাও খুব সোজা, বাংলায় একটা কমন গল্প অনেকেরই হয়তো জানা আছে, যে এক শিয়ালের লেজ কাটা যাওয়ার পর সে উদ্দ্যত হয় বাকি শিয়ালের লেজ কিভাবে কাটা যায় যাতে তাকে সেই জংগলে বেমানান না লাগে। বর্তমানে সেই বুধিজীবিরা নিজেদের ভোগ-লালসা কে সমাজে লিগালাইজড করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। আরেকটা অন্যতম প্রধান কারন হল ব্যবসা, আমি শুরুতেই তাদেরকে বুদ্ধিব্যবসায়ী বলে অবিহিত করেছি। প্রশ্ন আসতে পারে তারা কিভাবে ব্যবসায়ী। এই যে তারা একজন মানুষকে ভোগবাদী করে তুলছেন তাতে এই পুজীবাদী সমাজে ভোক্তা সংখা বেড়ে যাচ্ছে আর এই ভোক্তা বাড়ানোর কাজে সাহায্যে করার জন্যে সমাজে তাদেরকে পাইয়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিজিবী খেতাব যা বিক্রি করে তাদের দিন ভালই কেটে যাচ্ছে।

তাদের দিন তো কেটে গেল কিন্তু তাদের দেখানো পথে যেই নারী-পুরুষ হাটা শুরু করলেন তাদের জীবনের হাল কিসে গিয়ে দাড়ালো ?? কেও স্মার্ট হতে গিয়ে পরকীয়ার দিকে ঝুকলো কেওবা আবার নিজেকে যৌবনাময়ী করে উপস্থাপন করার জন্যে বিউটি পার্লার গুলোতে লাইন লাগিয়ে দিল। মহল্লার ছেলে কিংবা ভার্সিটির বন্ধু অথবা কর্মক্ষেত্রের কলিগের সামনে নিজেকে আকর্ষনীয় করে তুলে ধরার প্রতিযোগিতায় নেমে গেলেন তারা। ফলাফল গিয়ে দাড়াল যেটা তা হচ্ছে তৈরী হতে শুরু করল ইভটিজার, দাম্পত্য জীবনে পরস্পরের প্রতি পারস্পারীক অবিশ্বাস,কেও বা এসব সহ্য করতে না পেরে বেছে নিল আত্মহত্যার পথ, কেওবা ধরল নেশা আবার কেও বা ক্রোধে উন্মাদ হয়ে চালাল শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করা। সুখের সংসার হয়ে উঠলো রণক্ষেত্রে।

আরো একটা বিষয় এই সমাজে চালু হয়ে গেছে আর তা হচ্ছে একজন মানুষ কে বিচার করতে সেখানো হচ্ছে টাকার মাধ্যমে। ভাবছেন ছি ছি এই শিক্ষা কোথায় দেওয়া হয় ?? ভাই একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন এই সমাজে তাকেই সফল মানুষ হিসেবে দেখানো হয় যে অর্থবিত্ত তৈরী করতে পেরেছে সেটা হোক ন্যায় কিংবা অন্যায় পথে। আর যে মানুষটি সততা ধরে রাখতে গিয়ে জীবনে কোন সম্পদই করতে পারলো না তাকে দেখানো হয় নিতান্তই একজন পরজিত মানুষ হিসেবে কিংবা বলা হয় He is unfit for this society. ছোট বেলাতেই যেখানে একজন শিশুকে শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে "লেখা পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চরে সে " প্রথমেই লেখা পড়ার উদ্দেশ্য হিসেবে দেখানো হল অর্থ, তো সে কি শিখবে ?? অর্থই যেখানে সাফল্যের আর সুখের চাবিকাঠি হয়ে যায় সেখানে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে সেভাবেই দেখতে চাওয়া শিখে যায়, কারন সমাজে তার একটা অবস্থান (!!) করে নিতে সে তৎপর হয়ে উঠে। কিন্তু বেচারী স্বামীর পক্ষে কতটাই বা উপার্জন করা সম্ভব হয় ?? শুরু হয়ে যায় চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলানো আর এক সময় সম্পর্ক হয়ে উঠে কেবল দেনা-পাওনার একটি অলিখিত চুক্তিতে। এক সময় স্ত্রী হয়ত পাশের বাড়ির অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে কারন তার সম্পদ আছে,বিশ্বাস করতে শুরু করে সেই ব্যক্তি তাকে তার স্বামীর চেয়ে সুখে রাখতে পারবে।

এর মাঝে সমাজে আবার আরেক শ্রেনী সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারীদেরকে পন্য রূপে সমাজে তুলে ধরছেন আর তাতে সমাজের পুরুষদের শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে সুন্দরের Definition. একসময় সেই পুরুষদের কাছে তাদের মমতাময়ী স্ত্রীদেরকে ভাল লাগে না কারন তাদের স্ত্রীদের ফিগার, গায়ের রঙ তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া সুন্দরের Definition এর সাথে মেলে না। ঢাকা পরে যায় তাদের মনের সৌন্দর্য।এর মাঝেই তাদের কানে কানে সেই বুধিজীবিরা শিখিয়ে দিচ্ছেন যাকে ভাল লাগে না তার সাথে শুধু শুধু বিয়ে নামক এক শিকলে আবধ্য করে রেখে কেন নিজেকে কষ্ট দিবে। এর চাইতে মন যা চায় তাই কর না কে বাধা দেয়, আর যদি একান্তই সম্পর্ক ছিন্ন করতে না পার তাহলে পরকীয়াতো আছেই।আর আভাবেই মৃত্যু হয় একটি সুন্দর সম্পর্কের।অথচ দেখুন ইসলাম এই ক্ষেত্রে কি বলে...

"নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" [TMQ ৪:১৯]

সব থেকে বড় বেপারটা লক্ষ্য করুন , আমরা কিছু অর্থহীন সম্পর্কের জন্য নিজেদের অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গুলকে অবহেলা করছি । যে সম্পর্ক গুলো আমাদের ইসলাম আমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ বিধান করে দিয়েছেন ,সেই সম্পর্ক গুলোকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি শুধু মাত্র নিজেদের খামখেয়ালীপনা আর অবচেতন চিন্তা ভাবনার দরুন । এর প্রভাব আমরা ভালোভাবেই লক্ষ্য করছি যেমন , সমাজের অস্থিরতা । সামাজিক মূল্যবোধ , শিষ্টাচার , ভদ্রতা , এইসব এখন বিকৃত প্রায় শব্দ ।

একটা শিশুর বেরে ওঠা , প্রথমিক শিক্ষা , মানবতার শিক্ষা , মৌনতার শিক্ষা , ভদ্দ্রতার শিক্ষা , শিষ্টাচার , মূল্যবোধের শিক্ষা , নৈতিকতার শিক্ষা সব তার পরিবার এর কাছে থেকে পায় । যে পরিবারে বাবা মা এর মাঝে দঢ় , মজবুত ,ভালোবাসার ও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা সুসম্পর্ক নেই সেই পরিবার থেকে একটা শিশু কিবা শিক্ষা পাবে ? ওই শিশু বড় হয়ে সমাজকে বা কি দিবে ?

প্রতি বছরে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেরেই চলেছে । আর এই বিচ্ছেদের প্রবনতা মেয়েদের মাঝে এ বেশি । যা আমাদের ভবিষ্যৎ সামাজিক অস্থিরতা অনেক গুনে বারিয়ে দিবে ।

এইভাবে বিচ্ছেদের ঘটনা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে ফেলবে ।

আমরা হয়তো এমন একটা সমাজে বসবাস করবো যেখানে পরিবার বলতে কিছু থাকবে না । আর সেই সমাজের রুপ কেমন হবে তা একবার কল্পনা করে দেখুনতো ।

চোখে অন্ধকার দেখছেন তো, ভাবছেন এ থেকে কিভাবে সমাজ কে বাচানো যায় ?? ঐ যে কথায় আছে না গাছের গোরাকে অক্ষত রেখে যতবার ই ডাল-পালা ছেটে দিন না কেন তা আবার শাখা-প্রশাখা ছড়াবে।কাজেই গাছটার মূল সহ উৎপাটন করে ফেলে দিতে হবে।সমষ্যা সেহেতু এই ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা তাই তার তার মূল সহ উৎপাটন

করে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে আর সেখানে ইসলামের সুশীতল ছায়ার তলে যাতে সম্পর্ক গুলো সুমধুর হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে বীজ হিসেবে খিলাফা(ইসলাম) কে সমাজের ভীত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারন ইসলামী রাষ্ট্র এই সমস্ত বুদ্ধিব্যবসায়ী দের কে সমাজে ব্যবসা করতে দিবে না, ইসলাম অনুমতি দিবে না সুন্দরী প্রতিযোগীতার নামে আমার মা, বোন কে পন্য হিসেবে দেখানোর সুজোগ। ইসলাম মানুষকে ভোগবাদী হতে সেখাবে না অর্থ উপার্জন কে জীবনের সফলতা হিসেবে শিক্ষা দিবে না ইসলাম শিখাবে কিভাবে আল্লাহর ভয় মনের মাঝে রেখে নিজেদের দ্বায়িত্ব পালন করে তাকওয়া অর্জন করা যার যার দ্বারা পরকালে সফলতা হিসেবে বেহেস্ত লাভ করা যায় যা কিনা জীবনের একমাত্র সাফল্য। ইসলামী সমাজ শেখাবে কিভাবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে হয় আর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে হয়। আল্লাহ সুবানাহুতাওয়ালা বলেন

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী।" [TMQ ২:২২৮]

পরিশেষে একটি কথাই বলব স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পর্ক যে সম্পর্কে আল্লাহ ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন, আর যে দম্পতী ইসলাম মেনে চলবে আল্লাহ সেই সম্পর্ক মধুর করে দিবেন আর তার রহমত দান করবেন। আল্লাহ সুবানাহুতাওয়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে" TMQ [৩০:২১]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন, আমীন।

ঐক্য

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

বাসর রাতের যে সময়টা নবদম্পতিরা সচরাচর প্রেমালাপে বিভোর থাকে সে সময় এক বেরসিক মেয়ে তার সদ্য স্বামীর সাথে আলাপ করছিল, 'শুনুন, আমরা দু'জন দু'টো ভিন্ন পরিবার থেকে, পৃথক পরিবেশ থেকে এসে একত্রিত হয়েছি। সুতরাং, আমাদের চিন্তা চেতনা, ধ্যানধারণা, কাজ করার ধরণ, সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি থেকে প্রতিটা বিষয়ে পার্থক্য থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। আবার এটাও সত্য একসময় আমরা পরস্পরের সাথে এতটাই সিঙ্ক্রোনাইজড হয়ে যাব যে একজন আরেকজনের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারব সে কি ভাবছে বা কেমন অনুভব করছে। কিন্তু সে ব্যাপারটা দু'একদিনে ঘটবেনা। এর জন্য সময় লাগবে কয়েক বছর, সারা জীবনও লেগে যেতে পারে। এর মধ্যে খুঁটিনাটি থেকে বড় বড় ব্যাপারগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হবে, মনোমালিন্য হবে, তর্কাতর্কি হওয়া অস্বাভাবিক নয়, চুলাচুলিও হতে পারে। কিন্তু চলুন একটি ব্যাপারে আমরা সম্মত হই। আমাদের মধ্যে যা হবে তা বন্ধ দরজার এপাশেই রয়ে যাবে। এই দরজা খুলে যখন আমরা পৃথিবীর সামনে বের হব তখন নিজেদের মধ্যে যতই মাথা ফাটাফাটি থাকুক না কেন, জনসমক্ষে আমরা হব পরস্পরের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। নইলে তৃতীয় কোন ব্যাক্তি আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে। আমরা একত্রিত থাকলেও যে কেউ চেষ্টা করবেনা তা নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের সাথে ব্যাপারগুলো আলাপ করে সত্যতা যাচাই করে নেব, তা যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন, যেন একে অপরের কাছে স্বচ্ছ থাকতে পারি এবং আমাদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়'।

এই পদ্ধতিটি শুধু যে একটি দম্পতি বা একটি পরিবারের মাঝে সৌহার্দ্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে কার্যকর তা কিন্তু নয়, বরং এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে একটি জাতি নিজেদের মধ্যে বিভেদগুলোকে মিনিমাইজ করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় কেউ ভাবেনি কে বড় কে ছোট, কে মুসলিম কে হিন্দু, সবার মাঝে একটাই চিন্তা কাজ করেছে – যেকোন মূল্যে শত্রুকে প্রতিহত করতে হবে, দেশের বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে আমরা আবার নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিভাজিত হয়ে পড়েছি এবং বিভাজিত হতে রয়েছি। দুঃখজনকভাবে আমাদের চেতনাগুলো আমাদের দেশের স্বার্থে একত্রিত করার পরিবর্তে স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। আমরা নিজেদের আদর্শকে উদাহরণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমুজ্জ্বল করার পরিবর্তে তর্ক এবং মারামারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছি। আমাদের সচেতনতা ক্রমান্বয়ে অচেতনতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক পর্যায়ে আমরা এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যেখানে আমরা নিজের মতাদর্শের বাইরে অবস্থানকারীদের মানুষ ভাবতেও নারাজ, তাদের মানবিক অধিকার দিতে অনিচ্ছুক, তাদের দমন উৎপীড়ন এবং হত্যা করার মাধ্যমে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে নির্লজ্জভাবে বদ্ধপরিকর এবং নিজেদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিজেদের বিভেদকে বঃহিশত্রুর জন্য প্রবেশপথ বানাতেও দ্বিধাহীন।

এখনো কি প্রশ্ন করার সময় আসেনি আমরা আসলে কি চাই, কোন পথে যাত্রা করেছি, কোথায় আমাদের গন্তব্য?

স্বামী স্ত্রী যতই ঝগড়া করুক না কেন শেষতক তাদের একই ঘরে অবস্থান করতে হয়। তাই নিজেদের প্রশান্তির জন্য, সংসার এবং সন্তানদের খাতিরে, তাদের একটি শান্তপূর্ন সহাবস্থানের উপায় খুঁজে নিতে হয় – এই কাজটি করতে হয় কখনো ছাড় দিয়ে, কখনো সম্পর্কের দাবী প্রতিষ্ঠা করে, কখনো হাত বাড়িয়ে, কখনো অভিমান দিয়ে। একটি দেশের অধিবাসীরা একটি বৃহত্তর পরিবারের অংশ। একটি পরিবারে যেমন কেউ আত্মভোলা হয়, কেউ পরোপকারী হয়, কেউ স্বার্থপর হয়, কেউ বুদ্ধিমান হয়, কেউ বোকা হয়, কেউ ঝগড়াটে হয়, কেউ অভিমানী হয়, কেউ অবুঝ হয়, কেউ সমঝদার হয়, কিন্তু এই পার্থক্যের জন্য কেউ কাউকে ছেড়ে যায়না আবার কেউ কাউকে আলমারীতে পুরে তালাবদ্ধও করে রাখেনা – তেমনি একটি দেশের নাগরিকদেরও প্রয়োজন নিজেদের পার্থক্যগুলোকে জাতীয় ঐক্যের ওপরে স্থান না দেয়া, তা সে যার জন্যই হোক না কেন; উচিত নিজেদের মধ্যকার পার্থক্যগুলোকে সংলাপ এবং যুক্তির মাধ্যমে

সমাধান করা; উচিত তর্কের খাতিরে সহিংসতায় না গিয়ে শান্তির খাতিরে সহাবস্থানের উপায় খুঁজে নেয়া। নইলে দেশের মানচিত্রই যে কেবল হুমকির সম্মুখীন হয় তা নয় বরং ঘরের ভেতর আগুন জ্বলে উঠে সেই ধোঁয়া লুটেরাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারে।

হেনরিক ইবসেনের 'দ্য ডলস হাউজ' নাটকটির প্রধান চরিত্র ছিল নোরা। ওর স্বামী ওকে খুব আদর করত কিন্তু মূল্যায়ন করতনা। ফলে সে নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি স্বামীর অনাসক্তিতে হতাশ হয়ে একদিন সাজানো সংসার ফেলে বেরিয়ে যায়। একটি সংসারে যেমন স্বামী স্ত্রী এবং পর্যায়ক্রমে সন্তানদের অধিকার সমভাবে নিশ্চিত করতে হয়, তেমনি একটি দেশের নাগরিকদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হয়। কারো কথা বলার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যদি অপর পক্ষের কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয় তবে তা এক সময় অভিমান থেকে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে রাগ, রাগ থেকে সহিংসতার রূপ ধারণ করবে যা কারো জন্য কোনভাবেই কল্যাণকর নয়। সেক্ষেত্রে দোষটা যে রাগ করল তার চেয়েও যে পক্ষপাতিত্ব করে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করল তার ওপর বর্তায়। প্রেশার কুকারের ছিদ্র কুকারের ভেতরের প্রেশারটা ব্যালেন্স করতে সহযোগিতা করে, কিন্তু প্রেশার কুকারের ছিদ্র বন্ধ করে তাকে চুলার ওপর এড়িয়ে দিলে বিস্ফোরণ ঘটবেই। সেটা প্রেশার কুকারের দোষ নয়, দোষ সেই আহাম্মকের যে ছিদ্র বন্ধ করে তাকে চুলায় চড়িয়েছে। অথচ প্রেশারটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে অনেক কম সময়ে অনেক বেশি রান্না করা যায়!

জর্জ অরওয়েল তাঁর 'শুটিং অ্যান এলেফ্যান্ট' গল্পে বার্মায় অবস্থানকালে তাঁর মানসিক অস্থিরতার বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে স্থানীয় জনগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দমনপন্থী আচরন; অপরদিকে স্থানীয়দের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ যা একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে তাকে প্রতিদিনই মুকাবিলা করতে হচ্ছে। তাঁর ফ্রাস্ট্রেশনের বঃহিপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে,

'I was young and ill-educated and I had to think out my problems in the utter silence that is imposed on every Englishman in the East. I did not know that the British Empire is dying, still less did I know that it is a great deal better than the younger empires that are going to supplant it. All I knew was that I was stuck between my hatred of the empire I served and the rage against the evil–spirited little beasts who tried to make my job impossible. With one part of my mind I thought of the British Raj as an unbreakable tyranny, as something clamped won on prostrate peoples; with another part I though the greatest joy in the world would be drive a bayonet into a Buddhist priest's guts. Feelings like these are a normal by-product of imperialism; ask any Anglo-Indian official, if you can catch him off duty'.

(আমার বয়স ছিল অল্প, লেখাপড়াও ছিল যৎসামান্য এবং আমাকে আমার সমস্যা নিয়ে ভাবতে হত নীরবে যে নীরবতা ছিল পূর্বে কর্মরত প্রতিটি ইংরেজের সঙ্গী। আমি জানতাম না ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখন মৃত্যুপথযাত্রী, আমার ধারণাও ছিলোনা যে এই সাম্রাজ্য সেসব নব নব সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক ভাল ছিল যেগুলো পরে তাকে প্রতিস্থাপন করবে। আমি কেবল এটাই জানতাম যে আমি এক শাঁখের করাতে আটকে পড়েছিলাম যার একদিকে ছিল সেই সাম্রাজ্যের প্রতি ঘৃণা যার জন্য আমি কাজ করতাম এবং অপরদিকে সেই বজ্জাত নাছোড়বান্দারা যারা আমার কাজ করা অসম্ভব করে তুলছিল। আমার মনের একাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেখছিল এক অলঙ্ঘ্যনীয় স্বৈরাচার হিসেবে যা নতজানু জনমানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে; অন্য অংশ ভাবছিল পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দের কাজ হত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পেটের ভেতর বেয়োনেট ঢুকিয়ে দেয়া। এ'ধরনের অনুভূতিগুলো সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক ফলাফল, যেকোন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অফিসারকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যদি তাকে ডিউটির বাইরে ধরতে পারেন।)

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন হাতি মরলে সাম্রাজ্যবাদী বা জনগণ কেউ লাভবান হয়না, তার টুকরোগুলো শকুনে খেয়ে নিঃশেষ করে।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই জাতির শত শত বছরের ইতিহাসে আমরা এমন শাসক পাইনি যারা এই দেশকে ভালবেসেছে, দেশের মানুষকে একত্রিত করেছে, দেশের উন্নতিকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে, ব্যাক্তিস্বার্থকে পেছনে ফেলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে জনতাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। আমরা যুগে যুগে স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে এতটাই যুদ্ধংদেহী হয়ে গিয়েছি যে বঃহিশত্রু না পেলে আমরা নিজেরাই মারামারি করে মরি। মাঝখানে অন্য কেউ এসে আমাদের খাবার চেটেপুটে লুটে যায় তা আমাদের নজরেই পড়েনা। কি অদ্ভুত এক জাতি আমরা! আত্মকেন্দ্রিকতারও তো একটা সীমা থাকে। আত্মকেন্দ্রিকতার ফলাফল যদি নিজের জন্যই ধ্বংস বয়ে আনে তবে তাকে বর্জন করাই শ্রেয় নয় কি? আনুগত্য ভাল জিনিস, কিন্তু কার আনুগত্য করা হচ্ছে বা কি উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, সেটা কি যাচাই বাছাইয়ের দাবী রাখেনা?

ছোটবেলায় আবুধাবীতে ছিলাম। স্কুলে ইউ. এ. ই. সোশ্যাল স্টাডিজ নামে একটা বিষয় বাধ্যতামূলক ছিল। পড়ে হতবাক হয়ে গেছিলাম যে তাদের জনসংখ্যার মাত্র ৪% ছিল স্থানীয় জনগণ, বাকী সব অভিবাসী। কিন্তু সবার জন্যই গ্যাস, ইলেক্ট্রিসিটি, পানি ছিল ফ্রি যেহেতু এরা সবাই মিলেই ১৯৭১ এ স্বাধীন হওয়া দেশটিকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একজন মাহাথির মুহাম্মদ মালয় এবং চৈনিক জাতিগত দাঙ্গায় বিধ্বস্ত একটি দেশকে তুলে নিয়ে পারেন উন্নতির চরম শিখরে। কিন্তু হায়, বাঙ্গালী একাই একশ, কিন্তু একশ বাঙ্গালী কখনো এক হতে পারেনা! দেশের স্বার্থেও না। পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফর যা করেছিল আমরা আজও তার পুণরাবৃত্তি করে চলেছি। আজও আমরা নিজের স্বার্থে দেশকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলছি, পৃথিবীর সামনে নিজেদের লজ্জা ঢাকার পরিবর্তে নাঙ্গা করে দিচ্ছি, একে অপরের ঘরে আগুন দিচ্ছি, একে অপরকে গুঁতিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করছি, একে অপরকে পিটিয়ে মেরে ফেলছি, ভুলে যাচ্ছি হায়েনারা বসে আছে আমাদের লাশ সাবাড় করার জন্য।

শত শত বছরের বঞ্চনার ইতিহাস আমাদের মাঝে এক আত্মপ্রবঞ্চক, লোভী, স্বার্থান্বেষী চরিত্রের জন্ম দিয়েছে যে নিজের জন্য সব কিছু করতে পারে কিন্তু ভাবেনা অন্যদের ছাড়া নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। নিজের অস্তিত্বের জন্য আমরা যেকোন অন্যায়, যেকোন অনাচার, যেকোন অবিচার করতে এবং মেনে নিতে প্রস্তুত থাকি। কিন্তু আমাদের মাথায় থাকেনা, every action has an equal and opposite reaction. (প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।) যখন আমি একজন মানুষের মৃতুর খবর শুনে আগে 'আহা' করে উঠব এবং পরে বাকী তথ্য জানতে চাইব তখন বুঝব আমি মানুষ, কিন্তু যখন আমি একটি মৃত্যুসংবাদ শুনে আগে অনুসন্ধান করব সে কোন দলের বা মতাদর্শের ছিল এবং তারপর ভাবব আমি আদৌ রি-অ্যাক্ট করব কিনা তখন আমার মানবতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে বৈকি। তখন অপর এক ব্যাক্তি যদি আমাকে মারতে আসেন তাকে দোষারোপ করা যাবেনা, কেননা আমি নিজেই অপরের জীবনের কোন মূল্য দেইনি! সুতরাং, এই বিভক্তির শেষফল সমূলে ধ্বংস যা থেকে আমি, তুমি, আপনি, তুই কেউ রেহাই পাবেনা।

এখনো সময় আছে। আমরা কি এভাবেই আমাদের 'সোনার বাংলা'কে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেব, ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে একটি অসহনীয় অসহায় বিরান জীবন রেখে যাব, নাকি সবাই মিলে একটি সত্যিকার 'সোনার বাংলা' গড়ে

তুলব? সিদ্ধান্ত আমার, তোমার, আপনার, তোর। এরপর যে ফল দাঁড়াবে তা কিন্তু সবাইকে মিলেই খেতে হবে। সুতরাং, ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

বাবার কাছে বিবাহযোগ্য মেয়ের চিঠি

9 September 2015

লেখকঃ শেখ সাফওয়ানা জেরিন

প্রিয় বাবা,

যদিও তুমি অনেক কাছেই আছো, তবুও কিছু কথা তোমাকে কিছুতেই মুখে বলতে পারছিনা। কিছুটা সামাজিক আচারের প্রতি নিষ্ঠা, আবার কিছুটা জড়তা এবং তোমার উত্তপ্ত চাহনি বিনিময়ের ভয়েই লেখার আশ্রয় নিচ্ছি।

কারন, উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে আর যাই হোক কোন গঠনমূলক আলোচনা হতে পারেনা।

বুঝলে বাবা! পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই মনে হয় দ্বিচারী মানসিকতার!

তুমি আমি আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষরা এই অভ্যাস কিংবা স্বভাব থেকে কিছুতেই বের হতে পারছি না।

বাবা হিসেবেই আমার যে কাজটা তুমি মেয়ে হিসেবে সমর্থন করো নি, ছেলের জন্য সেই একই কাজকে দ্বিগুণ উৎসাহে করার উপদেশ দিয়েছ সবসময়।

যাই হোক! কিন্তু আজ জীবনের একটা বড় বাঁকে এসেও তুমি সেই কাজই করছ।

তোমার মনে আছে কি? ভাইয়ার যখন বিয়ের কথা চলছিলো তখন এই তুমিই বাসার সমস্ত হাদিস বই নামিয়ে হারিকেন জ্বেলে খুঁজছিলে মোহরানা যেন মাত্রাতিরিক্ত বা বোঝা হয়ে না দাড়ায় সেই সংক্রান্ত বিধি বিধান। এবং পেয়েও গিয়েছিলে । যেদিন লতা ভাবির বাসায় এই সংক্রান্ত আলাপে গিয়েছিলে সেদিন হাদিস বইটিও সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলে, যেন তোমার ছেলেকে মেয়ে পক্ষ মোহরানার চাপে পিষ্ট করে ফেলতে না পারে, তার একটা আদর্শিক ভিত্তি দাড় করাতে পারো।

আর আজ সেই তুমিই যখন মেয়ের বাবা, তখন তুমিই বলছ– যে লাখ লাখ টাকা কাবিন ধরতে হবে, নাহয় আমার বিয়ে যে টিকবে, এই ছেলেটা যে আমাকে ছেড়ে যাবে না, তার কি নিশ্চয়তা থাকবে!

আবার উদাহরণ ও টেনে দিলে দারুণ। রুনু খালার ২৫ লাখ টাকা কাবিন ছিল, তাই ডিভোর্সের সময় বর বাধ্য হয়ে তা পরিশোধ করেছিলো। শমি কায়সারের কথা বলতেও তুমি ভুলো নি।

আচ্ছা বাবা! যেই ছেলের উপর তোমার এতোটুকু আস্থা নেই যে সে তোমার মেয়েকে ভালো রাখবে, যার চরিত্রের উপর তোমার এতোটুকু বিশ্বাস নেই যে সে অন্য কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না, তার কাছে তোমার আদরের কন্যাকে সমর্পণের চিন্তাই বা কি করে করো?

আর হাদিসেই তো আছে যে সৎ যুবক পেলে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিও না।

তাকে কি তোমার যথেষ্ট সৎ মনে হয়েছে?

যদি হয়ে থাকে তাহলে অকারণে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কি লাভ? ভাগ্য বলতেও একটা কথা আছে। যদি ভাগ্য খারাপ হয়, কোটি টাকা কাবিন করেও তুমি আমার সংসার টিকাতে পারবে না।

আর গড়ার আগেই ভাঙার কথা যখন ভাবছ, তখন আসলেই এই সম্পর্কের ভিত্তির মজবুতি নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে।

বাবা, আদর্শ একটা প্যারামিটার। আর আমাদের এই প্যারামিটার হওয়া উচিৎ আমাদের জীবন বিধান। এখানে সবকিছুর মানদণ্ড ঠিক করে দেওয়া আছে। তুমি যখন ছেলের বাবা তখন তুমি অপরের মেয়ের অধিকার খর্ব করে এটা কখনোই আশা করতে পারো না যে তোমার মেয়ের প্রতিও আরেক ছেলের বাবা সদাচারন করবে।

আর মুসলিম তো ভাই, এক দেহের মতো। তুমি আরেকজনের মেয়ের জন্য ও তাই পছন্দ করবে, যা নিজের মেয়ের জন্য করো। যে হাদিস অপরের মেয়ের জন্য প্রযোজ্য তা কি তোমার নিজের মেয়ের জন্যই অযৌক্তিক ভাবছ?

তাহলে বলতে হয়- আমরা ভীষণ সুবিধাবাদী, ভোগবাদী, এবং স্বার্থবাদী। নচেত, এই দ্বিমুখী চরিত্র কপটতা ছাড়া আর কি!

যে ছেলেটির উপর তোমার যথার্থই বিশ্বাস আছে, যে হ্যা, আমার আদরের কন্যাটির মেধা ও মননের সবেচেয়ে বেশী মূল্যায়ন সেই করতে পারবে, তাকেই বেছে নাও না আজ আমার জন্য।

আর মূল্যায়নের জন্য সবসময় কাড়ি কাড়ি টাকার দরকার হয়না। দরকার হয় সুন্দর একটা মনের। রুনু খালার জামাই যে এক লাখ টাকা বেতন পেতো, খালা যে তার এক টাকার মালিক পর্যন্ত ছিল না তা নিশ্চয়ই জানো? শুধু টাকা থাকলেই মানুষ মানুষকে মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়না বাবা। মানুষকে সম্মান করতে হলে চাই একটা সুন্দর মন।

ভাবছ, এখন থেকেই হবু স্বামীর স্বার্থ দেখা শুরু করেছি? বলবে আমি এখনই পর হয়ে গেছি? এটা জানো কি! যে মানুষটা আমাকে ভালো ও বাসবে না, আবার অতিরিক্ত মোহরানার ভয়ে তালাক ও দিতে পারবেনা, দিনের পর দিন অত্যাচার করবে, তার সাথেই সামান্য টাকার জন্য আমি চার দেয়াল আঁকড়ে পরে থাকি, এই কি চাও?

তবে তাই বলে ভেবো না নিজের সম্মান আর প্রাপ্যটুকু আমি বুঝে নিবো না। তবে সেটা অবশ্যই আমাদের আদর্শের প্যারামিটার অনুযায়ীই ঠিক করতে হবে। জীবন বিধানের কিছু অংশ মেনে কিছু অংশকে অগ্রাহ্য করে আর যাই হোক, একটা পবিত্র জীবন শুরু করার কথা আমি ভাবতেও পারছি না। আর ২০ লাখ ১০ লাখ ধরে বাকির খাতায় শূন্য আঁকার ইচ্ছাটাও তোমার মেয়ের নেই। আমরা যেন কপটতা থেকে বের হয়ে শুদ্ধ মানুষ হতে পারি। আজ রাখছি।

ইতি

তোমার আদরের দুলালী

অলিখিত যৌতুক

লেখকঃ নায়লা নুযহাত

১

আজ থেকে বহু বছর আগের কথা। বিয়েটা হচ্ছে ছেলে মেয়েদের নিজেদের পছন্দে। বাবা মায়েরা তখনি বিয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি ছিলেন না। মেয়ের বাবার হাতে তেমন একটা টাকা পয়সাও ছিল না। বহু কষ্টে মেয়েকে গয়না গড়িয়ে দিয়েছেন এক সেট। দুই পক্ষের কোনও পক্ষই যৌতুকের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। বিয়েও যৌতুক ছাড়াই হবে— তখনকার দিনে তাঁরাই আধুনিক– ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত, শহরে থাকেন সবাই। কিন্তু ফার্নিচারটা? আহা ওটাতো যৌতুক না! মেয়ের বাবা মা শখ করে দেন মেয়ের জন্য। তা এক্ষেত্রে মেয়ের বাবা ছেলের বাবার সাথে দেখা করতে গেলেন। "বেয়াই সাহেব, ঘরের আসবাবপত্র আমরা বিয়ের কটা দিন পরেই দিই, কেমন? এখন পেরে ওঠাটা কষ্টকর।" ছেলের বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, "আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে মান মর্যাদার একটা ব্যাপার আছে।"

বিয়ে সম্পন্ন হল। খুব কষ্টে যোগাড় করা টাকায় ফার্নিচারও দেয়া হল।

২

আমার বাবা বা চাচারা কেউই সিলেটী হওয়া সত্ত্বেও সিলেটী বিয়ে করেননি। একজন ছাড়া। তিনিও নিজেদের বংশের "মান" রেখে বিয়ে করেননি, বিয়ে করেছেন সিলেটের তথাকথিত "নিচু বংশের" একজন মসজিদের ইমামের মেয়েকে। এতে আমাদের অনেকের আত্মীয় স্বজন রাগ করে বিয়েতেই আসেননি! সে যাই হোক। মেয়ের মামারা সবাই প্রতিষ্ঠিত। সবাই মিলে যখন পরামর্শ করে ঠিক করেছেন কে কী দিবেন মেয়েকে যেন শ্বশুরবাড়িতে মেয়েটা সম্মান নিয়ে যেতে পারে, তখন তাঁদের কাছে পৌঁছুল এক অদ্ভুত সংবাদ। ছেলের বড় ভাই, মানে আমার বাবা, ঘোষণা দিয়েছেন যে মেয়ের বাড়ি থেকে একটা সূতাও যেন না দেয়া হয়। অর্থাৎ, সিলেটী প্রথা অনুযায়ী মেয়ের বাড়িতে ফার্নিচার থেকে শুরু করে ঢেঁকীটা পর্যন্ত যাবে– এসব চলবে না!

অনেক ভালো মানুষ ছিলেন আমার সেই চাচীর বাবা। তাই হয়ত সিলেটের মত জায়গাতেও মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে তাঁর পথে বসতে হয়নি! আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের বাড়িতে যখন আসতেন, তাঁর সেই আনন্দে ঝলমল মুখটা দেখলে আমাদের মন ভরে যেত! মনে হত ইশ! সিলেটের প্রতিটা টানাটানির সংসারে যদি মেয়ে বিয়ে দেয়া নিয়ে এই প্রশান্তিটা থাকতো!

মেয়ের বাবার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যাক, তবু ফার্নিচার ছাড়া বিয়ে হওয়া যে অসম্ভব ব্যাপার!

৩

আমার ভাইয়ের বিয়ে। ভাবী অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। মাতৃহীনা। ভাইদের অনেক শখ, বোনকে বিয়েতে ভরে জিনিস দিবেন। আমার বাবা ভাবীর ভাইকে বুঝিয়ে বললেন। তাঁদের শখ তাঁরা তো পূরণ করতেই পারেন। কিন্তু আমার বাবা চাননা যে ঘরের সামগ্রী বউয়ের বাপের বাড়ি থেকে আসুক! কারণটা খুব সিম্পল। এই প্রথাটা আমাদের ভাংতে হবে, যে মেয়ের ঘর সাজিয়ে দিতে হবে মেয়ের বাবার! আজকে ভাবীর পরিবার তা অনায়াসে করতে পারেন। কিন্তু সেটা দেখে আরও অনেকে ভাববেন "আমাদের মেয়েকেও এভাবেই দিতে হবে" অথবা, "আমাদের বউ আসলেও এমনটাই চাই।" এটা কি হতে দেয়া ঠিক? আমরা, যারা অনায়াসে দিতে পারি, তারা যদি এই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই, তাহলে যারা খুব কষ্ট করে প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও এই প্রথা মেনে চলছেন, তাঁরা যে প্রাণে বেঁচে যান!

অবশেষে তাঁরা বুঝেছিলেন! কেবল ছেলেকে কাপড় জামা দিয়েছেন, যা কিছুতেই আটকানো যায়নি! খুব আনন্দের একটি বিয়ে ছিল সেটা। আলহামদুলিল্লাহ।

৪

এবার আমার পালা। অল্প কথায় বলি, বিয়েতে আমার বাবা আমাকে কিছু দেননি। বিয়ের শর্তই ওটা ছিল, যে ফার্নিচার দেয়া, তারপর প্রথা অনুযায়ী গরমের সময় ভ্যান ভর্তি ফল পাঠানো, আর রোজার দিনে ভ্যান ভরে ইফতার, এসব হবে না। না, আমার যাত্রা মোটেই নিষ্কন্টক ছিল না! কিন্তু, নিষ্কন্টক পার হব, এমন আশা তো করিনি! প্রথা যারা ভাঙে, প্রথা ভাঙার মূল্য তাদের অবশ্যই দিতে হয়! মূল্য দেয়ার জন্য তৈরি না থাকলে আর কিসের প্রথা ভাঙার সংকল্প?? কিন্তু, যদি আমার উদাহরণ দেখিয়ে একজন মেয়ের বাবাও বলতে পারেন যে "মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ের বাড়িতে গৃহ সামগ্রী যায়নি, আমি একজন চাষি, আমি কেন দিবো?"– তাহলে আমার সেই মূল্য দেয়াটাই আমার অমূল্য পাওয়া!

আমি বলছি না যে মেয়েকে শখ করে কিছু দেয়া যায়না! নিশ্চয়ই যায়! কিন্তু শখের সংজ্ঞা কী? শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলেও মেয়ের ঘর সাজিয়ে দিতে হবে– সেটা শখ? ধার করে হলেও মেয়ের ঘর সাজাতে হবে– সেটা শখ?? নাকি ধার করার সামর্থ্য না থাকলে প্রয়োজনে আত্মীয় স্বজনের কাছে হাত পেতে অর্থ সাহায্য চেয়ে হলেও মেয়ের সংসার সাজিয়ে দিতে হবে, হবেই হবে– সেটা শখ???

শখের সংজ্ঞা কি শখের জিনিসটা মেয়ের বাড়িতে না গেলে মেয়ের শ্বশুরের মুখ কালো হওয়া? শখের সংজ্ঞা কি শখ কেনার সামর্থ্য না থাকায় সংসারে মেয়ের কথা শুনতে হওয়া?? নাকি শখের সংজ্ঞা হল শখের জিনিসটার অভাবে মেয়ের সংসারে অশান্তি হওয়া?! এমন তো প্রতিদিনই দেখি পেপার খুললে, যৌতুক না দেয়াতে এই অশান্তি, সেই অশান্তি! শখের পূরণ না হলেও কেন এই অশান্তি আর সেই অশান্তি লেগে থাকে? নাকি চেয়ে নিলে যৌতুক আর "না চেয়ে" নিলে শখ? যেই না চেয়ে নেয়া শখটা বাড়িতে না এলে কথা শোনানো যায় নতুন সংসারের স্বপ্নে বিভোর একটা মেয়েকে?

শখ আর যৌতুকে তবে তফাৎটা কী? ও হ্যাঁ, আছে একটা তফাৎ। যৌতুকের কারণে মেয়েদের প্রাণ যায়। শখের কারণে বড়জোর কিছু কথা শুনতে হয়। মেয়ের বাবা মায়ের অন্তর যে মেয়েকে সেটুকু কোথাও শুনতে দিতে চান না, সে খবর রাখছে কে?! সেজন্যই যে সামর্থ্য না থাকলেও "শখ" করে তাঁরা মেয়েকে ভরে জিনিসপত্র দেন! তাই তো বলে শুনি ছেলে পক্ষ, "বেয়াই শখ করে দিয়েছেন!"

আর মেয়ের বাবাও মেয়ের বিয়েতে হওয়া "লস" পুষিয়ে নেন ছেলের বিয়েতে পাওয়া বেয়াইয়ের শখ করে দেয়া সামগ্রীর মাধ্যমে! এই চক্র চলতেই থাকে, কেবল দুঃখের কথা তাহলে একটাই– মানুষের তো সমান সমান ছেলে মেয়ে থাকে না বেশীরভাগ সময়ই, যে এক মেয়ে প্রতি লসের হিসাব একটি করে ছেলে পূরণ করবে!!

অনেক সময় যা কিছু আমরা করতেই পারি, অনায়াসে পারি, সেটাও না করাতেই সমাজের কল্যাণ থাকে! মেয়েকে ঘর সাজিয়ে বিদায় করার ব্যাপারটাও তাই! আপনি আমি হয়ত পারবো মেয়েকে ওভাবে দিতে। কিন্তু যেই স্ট্যান্ডার্ড আমরা এতে করে তৈরি করে দিবো, আরেকজনের পক্ষে হয়ত তা দেয়াটা সম্ভব নয়! কেন আমরা একটা অলিখিত নিয়ম বানিয়ে ফেলবো, যে দিতেই হবে? আচ্ছা, আমারা যারা জানি যে আমাদের পক্ষে ওভাবে দেয়াটা কষ্টকর, কেন আমরা দেই তাহলে? মেয়ের শান্তির জন্য? যারা জিনিস না পেলে অশান্তি করবে, তাঁরা কি জিনিস পেলেও শান্তি দেয়ার মত মানুষ? ওভাবে কি শান্তি আসে? নাই বা করলাম আমরা ধার করে, হাত পেতে, শখ পূরণ? মেয়ে কথা শুনবে? হ্যাঁ, সেটা খুব কষ্টের। কিন্তু যদি এই কষ্টের বিনিময়ে একদিন এই কুৎসিত কর্তব্যের– না মানে শখের বাঁধন ছিঁড়তে পারে সমাজ– তাহলে সেই কষ্টটা স্বীকার করা কি খুব কঠিন?

আর ছেলের পক্ষ যদি সত্যই নিজ আদর্শে অটল থেকে বেয়াইকে না করতে পারেন "শখ" করে কিছু দেয়ার ব্যাপারে, দেখবেন সমাজের চিত্র বদলে গিয়েছে ইনশাআল্লাহ। না করেছি, শোনেননি, কি করবো বলুন– এধরণের নিষেধ করে না। নিব না, কিছুতেই না, শুধু মেয়ে নিব– এভাবে নিষেধ করা! কে জানে, মেয়েকে এভাবে বিয়ে দিয়ে তাঁরাও হয়ত শিখবেন কিভাবে অন্য বাড়ির মেয়েকেও ওভাবে আনা যায়!

আমি জানি না। আমি কিছুই বলছি না! শুধু ভাবতে বলছি। চোখ বুজে সবাই যা করে, করতে হবে বলে তাই করে যাওয়ার মাঝে কোনও সার্থকতা নেই! একটা বার ভাবুন আমরা কী করছি, কোন পথে চলেছি, মানুষের জন্য কী উদাহরণ তৈরি করছি। যেই পথ তৈরি করে নিজেরা খুব আরামে আছি, নিজেদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে, সে পথের দাবী মেটাতে আমাদেরই আত্মীয় স্বজনদের কী অবস্থা হচ্ছে?!

প্রসঙ্গটা খুব স্পর্শকাতর। আমি জানি। আর এ নিয়ে লেখার জন্য যে আমাকেও মূল্য দিতে হবে, সেও জানি। ইনশাআল্লাহ, তার জন্য আমি তৈরি।

নারী, পেশা এবং এ সময়ের ভাবনা

14 October 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কি কাজ করা উচিত না'কি উচিত না? এ'নিয়ে চিন্তাগবেষনার অন্ত নেই। যারা মনে করেন নারীর কাজ করা উচিত না তাদের বক্তব্য হোল এতে নারীর মাতৃত্বের দায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। যারা মনে করেন নারীর কাজ করা উচিত তাদের বক্তব্য হোল নইলে মেয়েদের এত কষ্ট করে লেখাপড়া করার প্রয়োজন কি? উভয়েক্ষেত্রেই এমন একটি সরল দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করা হচ্ছে যা বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। কয়েকটি বাস্তব ঘটনা পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে কেন বিষয়টিকে এত সরলভাবে দেখা সম্ভব নয়। ৫ নং ঘটনা ব্যাতীত প্রতিটি ক্ষেত্রে গোপনীয়তার স্বার্থে ব্যাক্তির নাম পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছেঃ-

১. অধিকাংশেক্ষেত্রে সন্তান কিছু জিজ্ঞেস করলে মায়েদের বলতে শোনা যায়, "তোমার আব্বু এলে জিজ্ঞেস করে জানাব"। লেখাপড়ার চর্চা থেকে দূরে থাকতে থাকতে তারা একসময় অনেক সাধারন জ্ঞানের বিষয়াবলীও ভুলে যান। ফলে সন্তানের স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সন্তানের সামনে লজ্জায় পড়ে যান এবং সন্তানের শ্রদ্ধা হারান। তবে এই ভুলে যাওয়ার পরিধি যে কত ব্যাপক হতে পারে তা দেখে আমি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার প্রথম সন্তানের জন্মের দ্বিতীয় দিন থেকেই তাকে একহাতে খাওয়াতাম এবং আরেক হাতে বই নিয়ে পড়তাম। আমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার আগে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। একবার এক শ্রদ্ধেয়া ভাবী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে এসে কাঁদতে কাঁদতে চলে যান। ভাবী বিদেশে বড় হয়েছেন, মাস্টার্স করেছেন, বিয়ে করে ছয় ছয়টি সন্তান বড় করেছেন। সবাই আমাকে দোষারোপ করতে শুরু করে, আমি হয়ত প্রশ্নপত্র অতিরিক্ত কঠিন করেছি! খাতা চেক করতে গিয়ে দেখি খাতা সম্পূর্ণ খালি, পরীক্ষার্থীর নামের বানানটিও ভুল। পরে ভাবী ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে জানালেন তিনি বিয়ের পর থেকে আর কলম হাতে নেননি; প্রথমত তিনি কলম ধরতে ভুলে গিয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত তিনি তাঁর নামের বানান পর্যন্ত লিখতে ভুলে গেছেন! উল্লেখ্য, তাঁর স্বামী একজন প্রফেসর। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে জ্ঞানার্জন দূরে থাক, জ্ঞানের চর্চার জন্য পর্যন্ত কোনপ্রকার সহযোগিতা করেননি। ছয়টি সন্তান এবং সংসারের পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিজের জ্ঞানচর্চার জন্য সময় করে নিয়েছেন। দু'জনের জ্ঞানের পার্থক্য যত বেড়েছে, তাঁর স্ত্রীর প্রতি সম্মান তত কমেছে। একসময় তিনি স্ত্রীর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছেন এবং একপর্যায়ে তিনি শুধু ঘুমানো ছাড়া বাসায় সময় দেয়াই বন্ধ করে দেন।

২. রাহির বিয়ে হয় এক বিরাট যৌথ পরিবারে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী পরিবারের বড় ছেলে। ঘরে বাবামা, বিবাহযোগ্যা বোন, বিভিন্ন স্তরে লেখাপড়া করা অনেকগুলো ভাইবোন এবং এই পরিবারের ওপর নির্ভরশীল ব্যাক্তিবর্গ। রাহির সামনে দু'টি পথ- স্বামীকে আরো বেশী উপার্জন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা অথবা সবার চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের প্রয়োজন মেটানো। রাহি তৃতীয় একটি পথ বেছে নিলো। সে একটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে কাজ নিলো। ফলে স্বামী তার সম্পূর্ণ উপার্জন পরিবারের জন্য ব্যায় করতে সম হলেন এবং রাহির টাকায় নিজেদের চলে যা উদ্বৃত্ত থাকে তাও পরিবারের পেছনে খরচ করা সম্ভব হোল। স্বামীর সমস্যা বুঝে চলা এবং অহেতুক চাপ সৃষ্টি না করার কারণে দু'জনের বন্ধুত্ব মজবুত হোল এবং সংসারের দায়িত্ব দু'জনে ভাগ করে নেয়ায় কেউ অতিরিক্ত চাপ বা বিরক্তির সম্মুখীন হোলনা।

৩. দু'টি বাচ্চা শামার হাতে দিয়ে ওর স্বামী ক্যান্সারের কাছে পরাজিত হলেন। শোকে কাতর শামা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়স্বজন স্বামীর সমস্ত সম্পদ হস্তগত করে তাকে কেবল দয়া করে একটি রুম দিল থাকার জন্য। গ্রামের পুকুরপাড় থেকে কচুঘেচু তুলে পেট তো চলছিল কোনক্রমে কিন্তু বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাবার সংস্থান নেই, বইখাতা কাপড় কিনে দেবার পয়সা নেই, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার মত কোন আত্মীয়স্বজন নেই, চাকরী ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন তাই চাকরীর জন্য যোগাযোগ করবে এমন পরিচিত কেউ নেই। বাড়ীর কাছের এক ভদ্রলোকের দয়া হোল। তিনি শিক্ষিতা মেয়েটিকে একটি কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন। আজ শামা বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, ছোট মেয়েকে ভালো স্কুলে পড়াচ্ছে এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকজনকেও সাহায্য সহযোগিতা করছে সেই চাকরীর বদৌলতে।

৪. কামিনীর বিয়ের পর ওর স্বামী ওর গহনাপাতি নিয়ে নেয় ওর নামে বাড়ী করার জন্য। স্বামীর পরিবারে অর্থ জোগান দেয়ার জন্য ওকে চাকরীতে ঢুকতে হয়। নতুন পরিবারে সবার জন্য কিছু করার এই সুযোগ পেয়ে খুব খুশী কামিনী। পরে সন্তানাদি হয়ে গেলে কামিনী চাকরী ছেড়ে দেয়, স্বামীও ততদিনে ভালো চাকরী পেয়েছে। একসময় সে জানতে পারে বাড়ী করা হয়েছে স্বামীর নামে। আস্তে আস্তে দেখা যায় স্বামী সব সিদ্ধান্তই ওর ওপর চাপিয়ে দিতে শুরু করেন, আলোচনার কোন সুযোগ নেই। স্বামীর কাছে মূল্য নেই বলে সন্তানদের কাছেও সে মূল্যহীন। এখন কামিনীর মা অসুস্থ, সে মায়ের চিকিৎসার জন্য স্বামীর কাছে কিছু টাকা চায়। স্বামী সাফ বলে দেন শ্বাশুড়ী বিনা চিকিৎসায় মরে গেলেও তিনি তার জন্য কোন টাকা দিতে পারবেন না, তাঁর কষ্টের টাকা তিনি কি পানিতে ফেলবেন? কান্না ছাড়া কামিনীর অসুস্থ মাকে দেয়ার আর কিছুই নেই। উল্লেখ্য, কামিনীর স্বামী একজন ইঞ্জিনিয়ার।

৫. একসময় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গৃহিনীরা হাঁসমুরগী, গরুছাগল, পায়রা পালতেন– এতে ডিমদুধের চিন্তা থাকতনা, উপরন্তু প্রয়োজনমত মাংসের জোগানও হত। একতু খোলা জায়গা পেলেই লাগানো হত শাকসব্জী, ফলমূল; অন্তত ফুলপাতালতা। আমি ঢাকার ধানমন্ডির মত অভিজাত এলাকাতেও এই প্রচলন দেখেছি ছোটবেলায়। মহিলারা পাটি বুনতেন, মোড়া বানাতেন, সেলাইফোঁড়াই করতেন সব বাসায় বসে বাচ্চাদের পড়াতে পড়াতে। আজকাল ঐ সময়টুকু গিন্নীরা আরাম করেন সিরিয়াল দেখে দেখে এবং ব্লাডপ্রেশার আর ডায়াবেটিসের বড়ি গিলে গিলে। মিসেস আনিস আন্টি ছিলেন ব্যাতিক্রম। তিনি এই সময় ব্যায় করতেন পোশাক ডিজাইন করে, বুটিক চালাতেন, অ্যাকুয়ারিয়াম ফিশ চাষ করতেন, এক্সটিক পাখী চাষ করতেন– গরীব দুঃস্থদের জন্য কয়েকটি স্কুল চলত এই পয়সায়। এই বিশাল ব্যাবসা চালানোর জন্য তিনি নিয়োগ দিয়েছিলেন অনেক মানুষজন, অনেক ভাগ্যাহত নারীর অন্নসংস্থান হত তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে, আমার পরিচিত লোকজনকে তিনি কাজ দিয়েছেন তাদের বিপদের সময়। সন্তানদের দেখাশোনার সুবিধার জন্যই তিনি বাইরে কাজ না করে বাসায় কিছু করেছেন। তাঁর নিজের মত করে সমাজের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছেন।

৬. লাকীর স্বামী ওকে বাংলাদেশে রেখে অ্যামেরিকায় গেলেন স্বপ্নের সন্ধানে। তিনটি সন্তানের দেখাশোনা নিয়েই ব্যাস্ত লাকী স্বপ্ন বোনে আজই হয়ত স্বামী তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠাবেন। তিনবছর পেরিয়ে যায়। স্বামী ব্যাস্ততার মাঝে ফোন করারও সময় পাননা, লাকী ফোন করলে তড়িঘড়ি রেখে দেন। স্বামী আগের মত নিয়মিত টাকা পাঠান না, যে টাকাপয়সা বিপদআপদের জন্য দিয়ে গেছিলেন তাও প্রায় শেষ। বিরহে চিন্তায় পাগলের মত হয়ে যায় সে। স্বামী অসুস্থ নয়ত? তার কোন বিপদ হয়নি তো? চতুর্থ বছরে এক অ্যামেরিকাপ্রবাসী ভাই ছুটিতে এসেছে খবর পেয়ে তাঁর কাছে ছুটে যায় স্বামীর খবর জানার জন্য। ভদ্রলোক প্রথমে কিছুতেই বলবেন না পরে বললেন, "স্বামীকে এত বিশ্বাস করা ঠিক নয়"। "স্বামীকে বিশ্বাস করবনা তো কি আপনাকে বিশ্বাস করব?" রেগে গিয়ে বাসায় চলে যায় লাকী।

পরে মাথা ঠান্ডা হলে আরেক বিদেশফেরত ভাইকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করে দেদারসে সংসার করছেন স্বামী গত তিনবছর ধরে! লেখাপড়া করেনি বেশি, বাবামা বেঁচে নেই, কোন ভাই নেই। কি করবে, কোথায় যাবে লাকী?

৭. সিমি তার দুই ছেলেকে মানুষ করার জন্য কোনদিন চাকরী করেনি, বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগ রাখেনি, পৃথিবীর সব কিছু ভুলে স্বামী সংসার আর সন্তান নিয়েই সে মেতে ছিল। প্রজাপতির রঙ্গিন পাখায় ভর করে কবে যে কেটে গেল এতগুলো বছর, সে টেরই পায়নি। বছর দুই হোল ছেলে দু'টোরই বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেবৌরা ওর সাথেই থাকে। কিন্তু ছেলেরা এখন আর কাজ থেকে ফিরে সারাণ ওর গলা জড়িয়ে ধরে বসে থাকেনা, কিছু সময় মায়ের সাথে কাটিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বৌদের সাথে সংসারের হিসেবনিকেশ করে, বাবামা'র খবর নেয়। স্বামী থাকেন পড়াশোনা আর বন্ধুদের সাথে আড্ডা নিয়ে, রিটায়ার করে আর কিইবা করার আছে সময় কাটানোর জন্য? সিমির কেমন যেন একা একা লাগে। বৌগুলো খুব লক্ষী। ঘরের কোনকিছুতে হাত দিতে হয়না ওকে, দু'জনে মিলে গল্প করতে করতে টুকটুক করে সব করে ফেলে দুই বৌ। তবুও ওরা ওর কাছ থেকে ওর ছেলেদের কেড়ে নিয়েছে ভেবে ওর ওদেরকে সহ্য হয়না। সিমি পড়াশোনা ভুলে গেছে সেই ত্রিশ বছর আগে, বন্ধুদেরও ছেড়ে দিয়েছে তখনই। কি করে কাটবে ওর অফুরন্ত সময়?

৮. মনোয়ারা বেগমের বয়স হয়েছে ৫৫। শরীরে এমন এক অসুখ বাসা বেঁধেছে যার চিকিৎসা আর ঘরোয়া পদ্ধতিতে সম্ভব হচ্ছেনা। শহরে নিয়ে যাবার সামর্থ্য নেই তার দিনমজুর ছেলের। সে মাকে সাধ্যসাধনা করে গ্রামের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তারসাহেব তাকে পরীক্ষা করার জন্য বোরকা খুলতে বললে তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। একবছর ভুগে, পরে শয্যাশায়ী হয় বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন মনোয়ারা বেগম। এই মৃত্যুটি কিন্তু সহজেই এড়ানো যেত। গ্রামে যদি একজন নারী ডাক্তার থাকতেন হয়ত মনোয়ারা সুচিকিৎসা পেতেন।

৯. লামিয়া মাত্র বয়োঃপ্রাপ্র হয়েছে। ওর জন্য কিছু ব্যক্তিগত সামগ্রী কেনার জন্য ওর মা বাজারে গিয়ে ঘুরে ঘুরে হয়রান। সব দোকানে পুরুষ সেলসম্যান। কয়েকবার সাহস করে কাছাকাছি গেলেও লজ্জায় বলতে পারলেন না তাঁর কি প্রয়োজন। কেন যে মেয়েদের জন্য মহিলা সেলসম্যান দিয়ে দোকান করা হয়না! বিদেশে কি সুন্দর একেকটি পরিবারের সকল সদস্য মিলে দোকান চালায়। বাবা দোকানে বসলে মা গিয়ে রান্না সেরে আসেন, বড় ছেলে স্কুল থেকে ফিরে দোকানে বসলে বাবা শুতে যান, বাচ্চারা কাউন্টারে বসে হোমওয়ার্ক করে। আর একটি মুসলিম দেশে মহিলাদের পুরুষ সেলসম্যানের কাছে নারীদের জিনিস চাইতে গিয়ে বিব্রত হতে হয়!

১০. আমার ছোটবেলায় পাশের বাসায় এক দাদু থাকতেন। ওনার ফ্রিজে সবসময় আমার জন্য ফিরনী করা থাকত। বাসায় হরেক রকম বয়মে থাকত তেঁতুল, গুড়, মুড়ি, নারকেলের বরফি আরো নানারকম লোভনীয় খাবার। উনি আমাকে খাওয়াতেন আর ফাঁকে ফাঁকে নানারকম সুরা, দুয়া, নামাজ শেখাতেন। খাবার লোভে গিয়ে কতকিছু শিখে আসতাম তার ইয়ত্তা নেই। যেবার আমি প্রথম রোজা রাখি দাদু প্রায় পনেরো বিশরকম আইটেম করে ইফতার খাইয়েছিলেন। এত আদর করতেন বলে তাঁকে আমি মিষ্টিদাদু ডাকতাম। তবে উনি যে আমার কি উপকার করেছেন তা আমি বুঝতে পারি বড় হয়ে। তিনি শুধু আমাকেই নয়, পাড়ার অনেক শিশু এবং তাঁর বাসায় কাজের লোকদের নামাজদুয়া শেখাতেন। এভাবে নিজের পয়সা এবং সময় নষ্ট করে অন্যের সন্তানকে মানুষ করার মত সোনার মানুষগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ থেকে।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা একপ্রকার নিশ্চিত হতে পারি যে মানুষের জীবনকে কোন নির্ধারিত ফর্মুলায় ফেলা যায়না। সুতরাং, সবার জন্য একই সমাধান কার্যকর হতে পারেনা। তবে ইসলামে কয়েকটি ফর্মুলা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য অবশ্যপালনীয় করে দেয়া হয়েছেঃ

১. আল্লাহ মানবজাতির জন্য রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে প্রথম যে নির্দেশ প্রেরণ করেছেন তা হলো "পড়"। এর সাথে এ'রকম বাক্যাংশ সংযোজিত হয়নি "এই নির্দেশ কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য, নারী এই নির্দেশের আওতাবহির্ভূত" অথবা "পড় এবং অতঃপর ভুলে যাও"। কেবলমাত্র এ'কারণেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে একজন ব্যাক্তির আজীবন সাধনা হতে হবে জ্ঞান অর্জন করা এবং চর্চার মাধ্যমে তাকে সতেজ রাখা। জ্ঞানার্জনকে জীবনের ল্য স্থির করার পেছনে কোন অর্থনৈতিক বা পার্থিব স্বার্থকে উহ্য করা হয়নি। নারী পুরুষ উভয়কেই জ্ঞানার্জন করতে হবে নিজের স্বার্থে এবং সমাজের স্বার্থে– কেননা একজন আলোকিত মানুষ সমাজকে উপহার দেবে প্রথমত একজন আলোকিত নাগরিক যে হবে সমাজের জন্য কল্যাণকর, এবং দ্বিতীয়ত পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি আলোকবর্তিকা যা তাদের পথ দেখাতে সহায়তা করবে। জ্ঞানার্জনের জন্য এর চেয়ে বেশী আর কোন কারণ বা প্রেষণার প্রয়োজন নেই। এর বাইরে যা পাওয়া যায় সব বোনাস।

২. জ্ঞানপ্রাপ্ত হবার সাথে সাথে জ্ঞানী ব্যাক্তির দায়িত্ব হয়ে পড়ে এই জ্ঞান চতুষ্পার্শে ছড়িয়ে দেয়া যার জন্য বলা হয়েছে যে ব্যাক্তি একঘন্টা জ্ঞানসংগ্রহ করে এবং অতঃপর একঘন্টা জ্ঞানবিতরণ করে তার ঘুম মূর্খ ব্যাক্তির রাতব্যাপী নামাজের সমান। এই দায়িত্বের ক্ষেত্রেও পুরুষ এবং নারীর বিভাজন করা হয়নি। অতঃপর পুরুষের ওপর তার জ্ঞান ব্যাবহার করে অন্নসংস্থান করার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, নারীর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অধিকার এবং পেশা গ্রহন করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কিন্তু তার অর্জিত অর্থ কারো জন্য ব্যায় করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। কিন্তু তাই বলে এ'কথাও কোথাও বলা হয়নি যে নারী কোন কাজ করতে পারবেনা বরং এক মহিলা সাহাবী যখন রাসুল (সাঃ) কে জানান যে তাঁর স্বামী পঙ্গু এবং তিনি কাজ করে স্বামীসন্তানের ব্যয়নির্বাহ করেন তখন রাসুল (সাঃ) তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে এর জন্য তিনি আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কারের হকদার হবেন। রাসুল (সাঃ) এর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) ব্যাবসায়ী ছিলেন, আয়শা (রাঃ) কুর'আন এবং হাদীসের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষিকা ছিলেন, আয়শা (রাঃ) র বোন আসমা (রাঃ) স্বামীর তেথামার দেখাশোনা করতেন, রাসুল (সাঃ) এর আরেক স্ত্রী হাতের কাজ করে বিক্রি করতেন অতঃপর সম্পূর্ণ উপার্জন সদকা করে দিতেন, খাওলা (রাঃ) ছিলেন কবি, যুদ্ধেক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে ছিলেন না। রাসূল (সাঃ) এঁদের কি পরিমাণ সম্মান করতেন তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, আসমা (রাঃ) কেমন মা ছিলেন এবং তিনি কেমন সন্তান গড়ে তুলেছিলেন তার জন্যও ইতিহাসের স্যাই যথেষ্ট। উল্লেখ্য এই কাজগুলোর পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য মূখ্য ছিলোনা বরং সমাজের জন্য কিছু করার, পরিবারের সহযোগিতার, সৃষ্টিশীলতার উদ্দেশ্যই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. কাজ করা বলতে শুধু চাকরী করা বোঝায় এবং জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য কেবল একে ব্যবহার করে ফায়দা হাসিল করা এটি অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। একজন ব্যাক্তির বেড়ে ওঠা এবং একজন ব্যাক্তিমানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পেছনে অসংখ্য মানুষের প্রত্য এবং পরো অবদান থাকে। নিজের স্বার্থ লাভ হয়ে যাবার সাথে সাথে শুধুমাত্র একজন সঙ্গী এবং নিজের ক'টি সন্তান ছাড়া পৃথিবীর আর সবার অধিকার ভুলে যাওয়াটা ইসলাম কেন মানবতার সংজ্ঞায়ও সঠিক হতে পারে, এটা মেনে নেয়া কষ্টকর। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে নয়, নৈতিক কারণেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবার কিছু করা উচিত তার নির্ধারিত কাজের বাইরে। তবে অর্থনৈতিক বিষয়টিও একেবারে ফেলনা নয়। ইসলামে

নারীকে ধনসম্পদে যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা কেবল ব্যাক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই নয় বরং দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দেয়ার জন্যও বটে। পাশাপাশি টাকাপয়সা ছাড়া অনেক নধংরপ ইবাদাত করা সম্ভব নয় যেমন সদকা, যাকাত এবং হাজ্জ্ব। তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশার কারণে মানুষের সামাজিক প্রতিভা, মনের বিস্তৃতি এবং পরিচিতের পরিধি বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে নারীর সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় ত্রেগুলোতে মেধাবী এবং দায়িত্বশীলা নারীদের এগিয়ে আসা উচিত। মনে রাখা উচিত, বাবামায়ের প্রতি দায়িত্বও আল্লাহ কেবল পুরুষের জন্য নির্ধারণ করে দেননি এবং এই ব্যাক্তিগত দায়িত্বগুলোর জন্য নারীর স্বামী তাকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিতে বাধ্য নন।

সুতরাং, এই ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারি যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবার একটি মূখ্য ক্যারিয়ার থাকতে হবে- জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞান বিতরণের ক্যারিয়ার। দ্বিতীয়ত, জীবনধারণের জন্য কাজ করতে হবে বটে তবে ক্যারিয়ার যেন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ না করে বরং ক্যারিয়ার যেন ব্যাক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা, নারী বলুন আর পুরুষ বলুন, কোন মানুষই টাকা কামানোর বা ঘর সংসার সামলানোর মেশিনে রূপান্তরিত হওয়াটা বাঞ্চনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে বিশ্রামের, আনন্দের, নিজের জন্য সময় ব্যয় করার। তৃতীয়ত, প্রত্যকেটি মানুষের চিন্তা করতে হবে আমাকে আল্লাহ কোন নিয়ামতটি দিয়েছেন যা দিয়ে আমি মানুষের সেবা করতে পারি?

এবার ক্যারিয়ারের বিষয়টিকে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করি। নারীর কাছে পারিবারিক জীবনে সফল হওয়া পূর্ণতার অনুভূতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এর একটি বিরাট অংশ মাতৃত্ব। তবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে মাতৃত্ব একটি সাময়িক দায়িত্ব এবং সন্তান বড় হয়ে গেলে মায়ের দায়িত্ব কমে যায় এবং সে বাইরে সময় দিতে পারে। মাতৃত্বের দায়িত্ব একটি ষরভবষড়হম দায়িত্ব যার শেষ কেবল কবরে গিয়ে। এর একেক পর্যায়ে একেকভাবে সময়, শ্রম এবং মেধা ব্যায় করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই দায়িত্ব আমৃত্যু শেষ হয়না। সুতরাং, এর জন্য আর সব দায়িত্ব ঠেকিয়ে রাখা বা একে ব্যক্তির ব্যাক্তিগত বিকাশের প্রতিবন্ধকতা মনে করা সঠিক হতে পারেনা। ইসলামে পরিবারের ওপর এতটা গুরুত্ব দেয়ার মূল কারণই এটা যেন পুরুষ ও নারী সন্তান এবং সংসারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিতে পারে, নারী যেন বিবাহিত থেকেও single mother রূপান্ত্রিত না হয়। দ্বিতীয়ত, সময়ের সুষ্ঠু ব্যাবহার এবং কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে মানুষ অল্প সময়ে অনেক কাজ করতে পারে। আর যদি অতিরিক্ত পরিশ্রমের কথা বলা হয় তাহলে Robert Robert Browning এর মত আমাকেও বলতে হয়ঃ

‘Ah, but a man’s reach should exceed his grasp

Or what’s a heaven for?’ (Andrea de Sarto)

জীবনটা পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং এই পরীক্ষার সময় নির্ধারিত, তবে সনাতন পরীক্ষার মত এক্ষেত্রে আমরা জানিনা এই নির্ধারিত সময় কার জন্য কতটুকু। সেক্ষেত্রে কোন কাজটি যুক্তিযুক্ত? দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা নাকি বি সি এসের মত যে ক’টি সম্ভব প্রশ্ন একটির পর একটি উত্তর দিতে থাকা? কোন পদ্ধতিতে পাশের সম্ভাবনা বাড়ে?

সুতরাং, সন্তান লালন পালনের জন্য গৃহিনী হলেই ভালো মা হতে পারবেন আর কাজ করলে ভালো মা হওয়া যাবেনা এটা কোন যুক্তি হতে পারেনা। একজন গৃহিনী কি সারাণ সন্তান নিয়ে বসে থাকেন? প্রথমত, যদি থাকেন তাহলে এটা সুস্থতার লণ নয়। একটি শিশুর সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কিছু পরিমাণ স্বাধীনতার প্রয়োজন যখন সে দুষ্টুমী করবে, গায়ে কাদা মাখাবে, গাছে চড়বে এবং মা দেখবেন না। দ্বিতীয়ত, একজন মানুষের নিজের এবং পারিপার্শ্বিক

পরিবেশে বসবাসকারী মানুষজনের প্রতি কিছু দায়িত্ব আছে। পরিপার্শ্ব হতে বিচ্ছিন্ন একজন মানুষ একসময় তার আশেপাশের মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন এবং তখনই সমাজ বঞ্চিত হয়। কিভাবে তা একটু পরেই আলোচনা করছি।

একসময় মানুষের পনেরো বিশটা করে বাচ্চা হত। তাঁদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা মনেই করতে পারতেন না কি করে বড় হোল এতগুলো ছেলেপুলে। এর একটা কারণ হোল তখন মানুষ অনেক নিঃস্বার্থ ছিল। কার বাচ্চা কে খাওয়ায়, কে গোসল করায়, কে শাসন করে এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে তখন কেউ তেমন মাথা ঘামাত না। মায়েরা সন্তানদের যে সময় দিতেন তা quantity নয় quality দিক থেকে সর্বোচ্চ মানের ছিল। যেটুকু সময় তারা সন্তানদের কাছে পেতেন সে সময়টুকু তারা সন্তানদের নীতিনৈতিকতা এবং পড়াশোনা শিক্ষা দেয়ার জন্য কাজে লাগাতেন। পরম ঔদার্য্যে লালিত পালিত এইসব মানুষগুলো প্রত্যকেই সোনার মানুষ হতেন যারা দেশ এবং দশের জন্য করতেন, যাদের কথা আমরা আজও গল্পেপ্রবন্ধে পড়ে উজ্জীবিত হই।

এখন একজন মা তার সন্তানের জুতোর ফিতা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চান, ফলে ন্যূনতম স্বাধীনতাবঞ্চিত একটি শিশু ছোটবেলা থেকেই কষ্ট আর লাঞ্ছনা নিয়ে বেড়ে ওঠে। অধিকাংশ শিশু বাবাকে মনে করে একজন ** যাকে মাঝেমাঝে দেখা যায় এবং যার কাছ থেকে টাকা পাওয়া যায়। তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয় টেলিভিশন যাকে ছাড়া তারা খেতে পারেনা, ভাবতে পারেনা, চিন্তাশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারেনা। এই মায়ের নিজের শিশুটি ছাড়া আর কারো জন্য কিছু ভাবার বা করার নেই। তাই তিনি তাকে বাংলা সিনেমার নায়কের মত নাচেগানে সুপারদর্শী, তর্কালংকার, মহানহৃদয়, মারদাঙ্গা, ব্ল্যাকবেল্টধারী ডাক্তার বানাতে চান। ফলে আমাদের সমাজ আজ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ব্যাঙ্কার, বিজনেসম্যানের ভারে ন্যুব্জ, কিন্তু এর মাঝে 'মানুষ' খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অন্যদিকে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সন্তানদের জন্য যতটুকু করতে পারতাম, যা দেখে আমার সন্তান উদার হতে শিখত, তা না করে জন্ম দিচ্ছি ঈভটিজার, গুন্ডা এবং চোরডাকাতশ্রেণীকে। একদিকে আমার ছেলের জন্য ভিডিও গেম কেনা হচ্ছে হাজার হাজার টাকা খরচ করে, অন্যদিকে প্রতিবেশী বস্তির মেয়েটি না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করছে।

সুতরাং, মায়েদের আগে মানুষ হবার চিন্তা করা উচিত যারা শুধু নিজের সন্তানের জন্য নয়, সবার জন্য করার মানসিকতা রাখবেন। বাবাদের চিন্তা করা উচিত স্ত্রী কেবল সংসার সামলানোর মেশিন নন এবং সন্তানগুলো তিনি একা জন্ম দেননি। সুতরাং বাবাও মাঝে মাঝে রান্না করবেন, ঘরের কাজে হাত লাগাবেন, সন্তানদের নিয়ে খেলবেন, স্ত্রীর সাথে গল্প করবেন, বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে পড়াশোনা করার সময় দেবেন। এই সন্তান বাবামা'র বন্ধুত্ব দেখে আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপত্তার অনুভূতি নিয়ে বড় হবে এবং বাবামায়ের পারস্পরিক সম্মানবোধ তাকে উভয়কে যথাযথভাবে শ্রদ্ধা করতে শেখাবে। উভয়ে কাজ করবেন সন্তানের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য, একটি সুন্দর সমাজ তাকে উপহার দেবার জন্য– যেখানে টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ গৌণ এবং জ্ঞান, দায়িত্বশীলতা এবং সৌহার্দ্য মূখ্য।

পরিশেষে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিয়ে ইতি টানছি। আমি বিয়ের আগে একটা স্কুলে চাকরী করতাম, বিয়ের পর মাস্টার্সের রেজাল্ট বের হলে ইউনিভার্সিটিতে চাকরী পাই। আমার প্রথম সন্তান হলে আমি চিন্তা করি চাকরীতে একবছর গ্যাপ দেব, বাচ্চা বড় হলে আবার কাজে ফিরে যাব। হাফিজ সাহেব আমাকে বলেন, "তুমি যদি চাকরী ছেড়েও দাও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ভেবে দেখ, কর্মক্ষেত্রে তোমার উপস্থিতিই কিন্তু একটা আদর্শের

প্রতীক। তোমার শূণ্যস্থান হয়ত খালি থাকবেনা। ঐ জায়গায় আরেকজন আসবে। তবে সেই ব্যাক্তি হয়ত একে নিছক পেশা হিসেবেই নেবে। তুমি যে ল্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াও, অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করতে চাও, সেটা হয়ত সে অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা মনে করবে। তার চেয়ে বরং আমরা এটা করতে পারি- তুমি কাজের পরিমাণ কমিয়ে নাও, কাজের জায়গায় আমরা একটা রুমের ব্যাবস্থা করি, বাচ্চা আমাদের সাথে প্রতিদিন যাবে, একটা উদার এবং শিক্ষিত পরিবেশে সমাজের নামীদামী মানুষের সাহচর্যে বড় হবে। তোমার কাস থাকলে আমি বাচ্চাকে দেখব, বাকী সময় তুমি ওর সাথে কাটাতে পারবে"।

বাচ্চা হাঁটতে শিখলে পরে এই কেন্দ্রিক একজন মহিলার কর্মসংস্থান হয় যে আমি কাসে থাকাকালীন বাচ্চার সাথে থেকে ওকে পাহাড়া দেবে, ওর খাবার আর গোসলের পানি গরম করে দেবে, ওর কাঁথাকাপড় ধুয়ে দেবে। বাচ্চা বড় হয়ে গেলে আমি আবার আমার স্বাভাবিক কাসলোড নিতে শুরু করি। এভাবেই বড় হয়েছে আমার দু'টি সন্তান। ঘরের সমস্ত কাজ হাফিজ সাহেব আর আমি ভাগ করে করি যাতে কেউ অতিরিক্ত কান্তি বা চাপ অনুভব না করি। উল্লেখ্য, আমি সবসময় যৌথ পরিবারে ছিলাম। কিন্তু আমার সন্তান আমার দায়িত্ব, তাকে আমি কোনদিন কারো ওপর বোঝার মত চাপিয়ে দেয়া সমীচিন মনে করিনি। দু'জনে মিলে বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়ায় আমাদের বাচ্চাদের কখনো কোন অসুবিধা হয়নি কেননা বাচ্চারা দায়িত্ব, বাচ্চার অসুখ সব দু'জনে মিলেই সামাল দেয়া গেছে। আমাদের কারো কর্মক্ষেত্রেও কোন প্রমোশন দেরী হয়নি, কোথাও কোন সমস্যা হয়নি। প্রয়োজন ছিল শুধু দু'জনের কো-অর্ডিনেশন। একপর্যায়ে আমি প্রফেসর হবার পাশাপাশি ক্যাম্পাসের কোঅর্ডিনেটর ছিলাম, দায়িত্ব ছিল অনেক বেশী- কিন্তু স্বামী, সন্তান, তাঁর পরিবার এবং আমার পরিবারের সবার প্রতি দায়িত্ব জোগান দিয়েও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রা করতে কোন অসুবিধা হয়নি। আমাকে যারা চেনেন তারাই বলবেন আমার দু'টি বাচ্চা মানুষ হয়েছে কি হয়নি। তবে আমি আজ আনন্দিতচিত্তে বলতে পারি আমার হাজার হাজার সন্তান মানুষ হয়েছে!

এবার আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন নারীর কাজ করা উচিত কি উচিত নয়।

ফিরতি

5 November 2014

লেখকঃ **রেহনুমা বিনত আনিস**

১/

দলিল উদ্দীন মন্ডল। বিরাট ব্যাবসায়ী। নিজের বাড়ী, একাধিক গাড়ী, চার ছেলেমেয়ে।

দলিল মন্ডলের জীবনে একমাত্র অর্থবহ বস্তু টাকা। সে পাকা ব্যাবসায়ী, সে জানে টাকায় টাকা আনে। নিজে বি এ পাশ হলেও বড় ছেলেকে ডাক্তারী পড়িয়েছে, ছোট ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং। ছেলেদের মেধা নেই তো কি হয়েছে, মেধায় যা অর্জন করা যায়না টাকায় তা ছিনিয়ে আনা যায়। ছেলেদের ডিগ্রী তার জন্য বিনিয়োগ। এবার সে দুই ছেলেকে চড়া মূল্যে বিক্রি করবে। তারপর ওরা মানুষ মারে তো মারুক, ওদের তৈরী বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়ে তো পড়ুক, তাতে দলিল মন্ডলের কিছু এসে যায়না।

বড় ছেলেকে অলরেডি নিলামে তোলা হয়েছে। দরদাম ভালোই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কয়েক জায়গায় পাকা দেখে এসেও বেচারা ছেলের বিয়ে দিতে পারেনি। দলিল মন্ডলের কি দোষ? আংটি পরিয়ে বাসায় এসে যদি দেখে আরো ভাল প্রস্তাব অপেক্ষা করছে তখন বরং আংটি গচ্চা দিয়ে প্রস্তাবটা লুফে নেয়াটাই বেশি লাভজনক মনে হয়। ছেলে অবশ্য প্রথম প্রথম সামান্য কোঁ কোঁ করছিল, কিন্তু দলিল মন্ডল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'তোমার নামের পাশে যে ডাক্তারীর সিল সেটা আমার পয়সায় কেনা, সুতরাং বিয়ে আমার কথামত হবে'। ছেলেও বাধ্য হয়ে কোরবানীর গরুর মত সেজেগুজে বাপের পাঞ্জাবীর খুট ধরে ঘুরতে থাকে এক মেয়ের বাসা থেকে আরেক মেয়ের বাসায়।

অবশেষে দলিল মন্ডলের এক মেয়ে পছন্দ হয়। মেয়ের বাবামা নেই। মামাদের কাছে মানুষ। মামারা যেমন ধনী তেমনি দিলখোলা মানুষ। মেয়ে অনার্স শেষ বর্ষে, যেমন সুন্দরী তেমনি গুনবতী। একমাত্র বোনের একমাত্র স্মৃতিচিহ্নটিকে মামারা যেমন আদর স্নেহ দিয়ে বড় করেছেন, বিয়েও দেবেন তেমনি ধুমধাম করে যেন কোনপ্রকার অপূর্ণতা না থাকে। দলিল মন্ডল বেজায় খুশি। আনন্দে গদ গদ হয়ে মেয়েকে আংটি পরিয়ে পাকা কথা দিয়ে ঘরে ফিরল।

বাসায় এসেই দেখে বৈঠকখানায় কালু ঘটক বসে আছে, মুখের হাসি আকর্ণবিস্তৃত। দলিল মন্ডল একটু আমতা আমতা করল, 'না, আর দেখবনা। পাকা কথা দিয়ে এসেছি', ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কালু ঘটকও নাছোড়বান্দা, কমিশনের লোভ কি অত সহজে ছাড়া যায়? জিভে যত তেল আছে সব দিয়ে মিনিট দশেক দলাই মলাই করার পর দলিল মন্ডল হাল ছেড়ে দিল। কালু ঘটক যে প্রস্তাবের কথা বলল তা শুনে দলিল মন্ডলের জিভে জল এসে গেল। মেয়ের বাবার সম্পদের পরিমাণ দলিল মন্ডলের অন্তত দ্বিগুন, মেয়ে চিররুগ্না তাই ডাক্তার স্বামী চাই, বিনিময়ে কালক্রমে সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে একমাত্র মেয়েজামাই। বাহ! এ যেন আলৌকিকভাবে আশাপূরণ! দলিল মণ্ডল সাথে সাথে মেয়ের বাবাকে যোগাযোগ করল। বলা তো যায়না, অন্য কেউ যদি আগে পৌঁছে যায়! না, আর কেউ দলিল মন্ডলকে টেক্কা দিতে পারেনি। কথাবার্তায় সব খাপে খাপে মিলে গেল। কিন্তু দলিল মন্ডল এত কাঁচা লোক না। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল বুদ্ধি নিয়ে চললে সে এতবড় ব্যাবসায়ী হতে পারতনা। ব্যাক আপ হিসেবে পাকা দেখে আসা কনে হাতে থাকল। ওখানে বিয়ের কথা হয়েছে পনেরো দিন পর। এখানে সে বিয়ের ব্যাবস্থা করবে সাতদিনে। দলিল মন্ডলের জন্য তো ব্যাপার একই, খরচও একই। কেবল মেয়ে একটা না হলে অন্যটা।

ধনীর দুলালীর সাথে বিয়েটা আগামীকাল ফাইনাল করে ফেলা গেছে। সাতদিনে পারা যায়নি অবশ্য, বারোদিন চলে গিয়েছে। দলিল মণ্ডল সিদ্ধান্ত নিলো এবার ওদের জানানো প্রয়োজন। হাজার হোক সেও তো একজন মানুষ, তারও কিছু মানবিক অনুভূতি আছে! দলিল মণ্ডল পাকা দেখা কনের বাসায় ফোন করে জানিয়ে দিল এই বিয়ে হচ্ছেনা। মেয়ের মামারা আকাশ থেকে পড়লেন। দলিল মণ্ডল পাত্তা দিলোনা। দুনিয়া বড় স্বার্থপর জায়গা। এখানে নিজেরটা নিজে বুঝে না নিলে কেউ দলিল মন্ডলের হক যেচে বুঝিয়ে দিতে আসবেনা।

আজ বড়ছেলের বিয়ে। দলিল মন্ডলের বৌয়ের মুখে হাসি যেন আর ধরেনা। অবশেষে তার ছেলের বিয়ে হচ্ছে। যার সাথেই হোক, দলিল মণ্ডল এবার পিঠটান দেয়নি এতেই তার খুশির অন্ত নেই। ছেলেও মহাখুশি। বিয়ের স্বপ্ন দেখে কেটেছে কত প্রহর, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর! বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হচ্ছে! মুখের হাসি রুমালের ভেতর আর আঁটছে না।

২/

দীপ্তি হঠাৎ পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পাশের চেয়ারে বসা ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার সাথে একটু চল তো, এক জায়গায় যাই'।

জামাল অবাক হয়ে বলল, 'একটু পর সন্ধ্যা নামবে, এখন কই যাবি?'

'আহা, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব, এবার তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান কর'।

‘তোর এই অবস্থায় তোকে নিয়ে বাইরে গেছি শুনলে বড়ভাবী আমাকে খুন করে ফেলবে’।

‘মামী একটু আগে শুয়েছে, কিচ্ছু টের পাবেনা, এখনই ভাল সময়। কাপড় বদলাতে হবেনা, তুমি জামা বদলালেও দেখতে তোমার মতই দেখাবে। চল! আহা, তাড়াতাড়ি কর!’

জামাল পকেটে মানিব্যাগটা ভরতে ভরতে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় দীপ্তি। বাসার সামনেই রিক্সা পেয়ে উঠে পড়ে দু’জনে।

৩/

সন্ধ্যা হয় হয়। কিন্তু এতবড় বাড়ীটাতে এখনও কেউ আলো জ্বালেনি। দারোয়ান তো বলল সবাই বাসায় আছে। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। ও ঘামছে একটু একটু। ওর অবস্থা দেখে জামালই বেল টিপল। অনেকক্ষণ সময় চলে গেল। দীপ্তি চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পেছন ফিরেছে, তখন দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল।

দলিল মণ্ডল দরজা খুলে দেখে একটা মেয়ে আর একটা ছেলে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, সমবয়সীই হবে। মেয়েটার পরনে হলুদ সালোয়ার কামিজ, লাল ওড়না। ছেলেটা পাজামার সাথে চেক ফতুয়া পরা। শেষ বিকেলের ছায়া পড়েছে মেয়েটার মুখে, চেহারাটা ঠিকমত দেখা যাচ্ছেনা। ছেলেটাকে দলিল মণ্ডল চিনতে পারলনা। মেয়েটা ইতস্তত করে সামনে এগিয়ে এলো, হাতের মুঠো খুলে একটা আংটি দলিল মন্ডলের দিকে এগিয়ে দিলো। দলিল মণ্ডল মানুষ না চিনতে পারে কিন্তু স্বর্ন চিনতে তার ভুল হোলনা। এটাতো সেই মামাদের আদরের দুলালী কনেকে দেয়া আংটি, তার মানে এই মেয়েটি …! দলিল মণ্ডল স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাত বাড়াল, মেয়েটি সেখানে আংটিটি ফেলে দিলো। দলিল মণ্ডল খেয়াল করল ওর যে আঙ্গুলে ওরা আংটি পরিয়েছিল সেখানে আরেকটি আংটি শোভা পাচ্ছে, ওজনে অনেক কম কিন্তু কারুকার্যখচিত, সযত্নসঞ্চিত। বোবা দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকায় সে, মেয়েটি বলে, ‘আপনার এই আংটির ভার আমি আর বহন করতে পারছিলাম না। তাই আপনার জিনিস আপনাকে বুঝিয়ে দিতে এলাম। আপনি কেন এমন করলেন আমি জানিনা। কিন্তু প্লিজ আর কোন মেয়ের সাথে এমন করবেন না। একটা আংটির সাথে কতগুলো মানুষের কত স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে! দিনের পর দিন সেই স্বপ্ন আরো ঘনীভূত হয়ে আশা আকাঙ্ক্ষার রূপ ধারণ করে। এভাবে সেই আকাঙ্খাকে পদদলিত করবেন না’। এতক্ষণে দলিল মন্ডলের মনে পড়ে ছেলেটি ওর ছোটমামা। চলে যাচ্ছিল মেয়েটি, কি মনে করে ফিরে আসে দীপ্তি, ‘আপনি জেনে হয়ত খুশি হবেন, আপনার ব্যাবহারে আমার পরিবারের সদস্যরা ভেঙ্গে পড়ে। তখন পাশের বাসার এক চাচী তাঁর ছেলের জন্য প্রস্তাব পাঠান। তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন আমার পরীক্ষা শেষ হলে প্রস্তাব করবেন, কিন্তু পরে জানতে পারেন মামারা আপনাদের সাথে কথা বলেছেন। আপনি যখন বিয়ে ভেঙ্গে দিলেন তখন আর তাঁরা দেরী করেননি। তাঁরা আপনাদের মত ধনী নন, যৌতুকও নেবেন না, কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনারা তাঁদের নখের যোগ্যও নন। বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এই অসাধারন পরিবারটির সদস্য হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ’।

মেয়েটা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ হোল। দলিল মন্ডলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ছোট্ট একটা ছেলের করুন মুখ, এক পাত ভাতের জন্য সৎমায়ের দিকে চেয়ে বসে আছে সেই সকাল থেকে। তারপর আরেকটা ছেলে, আরেকটু বড়। স্কুলের সব ছেলেরা তাকে ক্ষেপাচ্ছে কারণ অনটনের কারণে আজ ছ'মাস হোল সেই ছেঁড়া শার্টটাই সে প্রতিদিন স্কুলে পরে আসে। তারপর এক কিশোর, রিক্সার গ্যারেজে কাজ করে সে, অবসর সময়ে লেখাপড়া, অল্প পয়সা দিয়ে নিজে চলে আবার বস্তির হতদরিদ্র মানুষগুলোকেও কিছু দেয়। তারপর এক যুবক, সে তখন নতুন নতুন পয়সার ঘ্রান পেয়েছে, এখন আর মানুষকে দিতে ইচ্ছে করেনা, মনে হয় সব টাকা তার নিজের প্রয়োজন। এক সময় সে আর টাকা ছাড়া কিচ্ছু বোঝেনা। একদিন সে ছেলের বিয়ে দিতে যায়। গিয়ে দেখে লোকজন বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, উৎসবের আমেজ নেই। কি ব্যাপার? মেয়ে পালিয়েছে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে, মেয়ের বাপের মাথায় হাত।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বৈঠকখানায় আলো জ্বালিয়ে ছোট মেয়ে মল্লিকা বাবাকে ডাকতে ডাকতে এসে দেখে বাবা খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হু হু করে কাঁদছে।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ

কি কাল্পনিক কথাবার্তা? ভিন্নচোখে দেখা কিছু মুক্ত আলোচনা

29 September 2014

লেখকঃ সাফওয়ান

নারী নিয়ে যত কথা হয় সমাজে, পত্রিকায়, টক-শো, সেমিনারে যত লোকের, যতটা সময়ে -- তার ক্বচিৎ-কদাচিত যদি পরিবর্তনের প্রতি সত্যিকারের কাজ করত তাহলে সত্যিই অনেককিছু বদলে যেত বলে আমার ধারণা। বিষয়টা

স্পর্শকাতর, সত্যিকারের সমস্যার। মুসলিম সমাজের নারীর অবস্থান নিয়ে সম্ভবত পাশ্চাত্য বা বাংলাদেশি ইসলামবিদ্বেষী সেক্যুলাররা বা অমুসলিমরা যত কথা বলেছে -- খুব কমই এই সমাজের ভিতরের মানুষ থেকে এসেছে।

কথা অনেক হয়। মুসলিম নারীরা যখন কিছু লেখালেখি শিখে তারাও বলে। অধিকাংশ সময় ভুক্তভোগী হওয়ায় ভাষার নখর মোটামুটি পুরুষবিদ্বেষ পর্যায়ে যায়। লেখার আগাগোড়া পড়ার পরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে -- এই মহিলা না লিখতে বসলেই বরং নারীর উপকার হত। মুসলিম পরিচয়ের আদর্শিক অনুভূতি থেকে এবং সমস্যা বুঝে তার সমাধানে "পুরুষবিদ্বেষ" অবস্থান থেকে বেরিয়ে লিখতে দেখিনি অনেক উচ্চশিক্ষিত মুসলিম ফেমিনিস্টদেরকেও। কারণ আমি নিজেই বুঝি, পুরুষসত্বার প্রতি আক্রমণ করে সমস্যা দূরীকরণে পুরুষের সাহায্য কীভাবে পাবে নারীরা? সমাজে/পৃথিবীতে অর্ধেকখানি পুরুষ। নারীর সমস্যাগুলোর অনেকটাই পুরুষ থেকেই সৃষ্টি।

ফেমিনিজম তথা নারীবাদী আইডিয়াটাও একটা মজার ব্যাপার। সেটা গড়েই উঠেছে পুরুষদের বিরুদ্ধে একটি "রি-অ্যাকটিভ" অ্যাপ্রোচ হিসেবে। মোটা দাগে মোটামুটি গোটা পুরুষদের বিরুদ্ধেই বিদ্বেষপ্রসূত যে চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে, তাতে কীইবা আর কল্যাণ থাকবে। এটা তো জানা কথা যে, প্রো-অ্যাকটিভ অ্যাপ্রোচেই কল্যাণ থাকে, রি-অ্যাকটিভ কাজে থাকে না। তাই খুব মোটা দাগেই এই নারীবাদীতার অসারতা টের পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত এই ফেমিনিস্ট অ্যাপ্রোচ উল্লেখযোগ্য কোন সফলতা আনতে পেরেছে বলে বোঝা যায় না সমাজের দিকে তাকিয়ে।

যাহোক, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান রাতারাতি হবে না, হবার প্রশ্নই উঠে না। গোটা ব্যাপারটা শত শত বছর ধরে গড়ে উঠেছে। মুসলিম সমাজে নারীর সবকিছু নিয়ে কথা বলেছে বাইরের মানুষরাই বেশি। সেকথা একটু আগেই বলেছি। নিঃসন্দেহে ভুক্তভোগী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নারীদেরকে শিক্ষিত হবার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ ছিলো। বিষয়টা কঠিন, বিষয়টা আসলেই কঠিন। কিন্তু এটাই পথ। এর তুলনাটা অনেকটা এমন যে, একটা বিশাল অট্টালিকা হবার জন্য হয়ত কোন জায়গা বিরান পড়ে ছিলো। কারো অনেক প্রয়োজন ছিলো একটা বাড়ি, কিন্তু তার সেখানে থাকা হলো না। তিনি যদি এটাকে গড়ে না তোলেন সময় নিয়ে (যে সময়ে তিনি সেখানে আরাম করে থাকতে পারতেন) তাহলে পরের প্রজন্মও আর সেখানে থাকতে পারবে না। তারা আরো বড় সমস্যায় পড়বে।

আমার কাছে বেশ কিছু বিষয়কে সমস্যার মনে হয়েছে। সেগুলোর কারণগুলোও ভিন্ন, সমাধানও অনেক আলোচনাসাপেক্ষ। তার মাঝে কিছু সমস্যা হলো --

প্রথমত, সমাজে এখনো অনেক মেয়েই মনে করে বিয়ের পরে তো অশান্তি আর কষ্টে সব ভরপুর, এখন যদি একটু মজা করে না নিই তাহলে আর লাইফে কখনো আনন্দ হবে না। তাই তারা বেশ ছেলেবন্ধুর দলেও যায়, এলোমেলো অজস্র কাজ করে যা হয়ত মজার নামে। কখনই সেগুলো ভবিষ্যত জীবনে শান্তি আনে না, কেননা এইসব করতে গিয়ে অজস্র জটিলতায় একটা মেয়ের জীবন আটকে যায়। অনেক ঘটনা হয়, রটনা হয় -- এগুলো থেকে কেউ বের হতে পারে না। এর পেছনে পুরুষের ভূমিকা আছে। বড় ভূমিকা। তা হলো, পুরুষদের মাঝে নারীর প্রতি সম্মানের বিশাল অভাব। এটা মূলত পারিবারিক ক্ষেত্রেই শুরু হয়, সামাজিকীকরণের সময়ে তা প্রলম্বিত হয়।

বেশিরভাগ ছেলে সারাজীবন বড় হয় নারীকে কেবল ভোগ করার, আনন্দ করার উপযোগী অংশ হিসেবে। ফ্রেন্ড সার্কেলে কমবেশি সবাই নারীর শরীর নিয়ে আলাপ করে, আলাপ করে সৌন্দর্য নিয়ে, "মাল" টাইপের শব্দ দিয়ে সম্বোধন করে অবলীলায়। এমনটাই কালচার ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ড সার্কেলের। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নারীর পোশাক স্বল্প করে করে প্রতিটি বিলবোর্ডে আর কমার্শিয়ালে তাকে পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ নারীরা মা, নারীরা বোন, নারীরা স্ত্রীর মতন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও দায়িত্ব পালন করছেন -- তার স্বীকৃতি ও প্রচারণা ও সচেতনতা খুব কমই প্রজন্মের পুরুষ তথা নারীদেরও উপলব্ধিতে পড়ে। নব্য প্রজন্মের নারীরাও অপর নারীদের গালাগালি করে অশ্রাব্য ভাষায় -- নষ্ট সংস্কৃতির পুরুষদের সমান স্মার্ট হবার দাসত্ব মনোভাব তাদের টেনে কোথায় নিয়ে গেছে। সেই ভোগবাদী সমাজে ছেলেরা নারীর যে সম্মান, মানসিক প্রয়োজন, অধিকারগুলো প্রতি খেয়াল রাখা যে একটা বিষয় সে বিষয়ে তার তেমন জানাই হয় না, ভেবেও দেখেনা। এই শিক্ষার অভাবের পেছনে যেমন তার বাবা নামের পুরুষটি কাজ করেনি, মা নামের নারীটিরও ভূমিকা থাকে না।

এক বা একাধিক প্রজন্মে কিছু নারীকে এগিয়ে আসতেই হবে যারা বর্তমানের সাফারিং তথা যন্ত্রণাগুলোকে সহ্য করবেন এবং শিক্ষা দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে কাজ করে আরো নতুন অনেক খোঁটা-বাঁকা কথা ও যন্ত্রণা সহ্য করে হলেও সমাজে নারীর প্রতি মানসিকতার উন্নয়নে কাজ করবেন। এখানে মুখে কথার চাইতে কাজের প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক।

দ্বিতীয়ত, আমার কাছে মনে হয়েছে, একটা সমাজে নীতিহীনতা, কদর্যতা আর অন্যায় ও অশ্লীলতার যতই প্রসার হবে -- মূলত নারীর যন্ত্রণা ও অত্যাচার ক্রমাগত বাড়বে। নিঃসন্দেহে সমাজের সবাইই একটি খারাপ পরিস্থিতির ভুক্তভোগী হবে। কিন্তু সেটা পুরুষের তুলনায় নারীর জন্য সীমাহীন যন্ত্রণাদায়ক ও খারাপ হয়। অন্তত সেটা মাতৃত্বসুলভ অনুভূতি আর মনের কারণেই হোক বা শারীরিক ও মানসিক কোমলতার কারণেই হোক।

কল্যাণ যারা বুঝেন, সেসব চিন্তাবিদগণ নারীদের প্রচন্ড অনুপ্রেরণা দেন এগিয়ে আসার জন্য। সন্তান হয়েছে, শারীরিকভাবে হয়ত কিছুটা দুর্বল ও পারিবারিক জটিলতাও তৈরি হয়েছে -- কিন্তু পড়াশোনায় এগিয়ে আসা উচিৎ। মুসলিম নারীরা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা মুসলিমের কোন চরিত্র নয়। কিন্তু জটিলতা নিরসনে নারীদেরই কথা বলতে হবে এবং তাদের এই সমাজের অংশ হতে হবে। এই সমাজের মুসলিম মানসিকতাকে তাদের বুঝতে হবে।

তৃতীয়ত, জোর করে মেয়েদের বিয়ে দেয়াটা কখনই ইসলামিক নয়। এই বিষয়টা বাংলাদেশের সমাজে মাত্রাতিরিক্ত রকমের প্রসার পেয়েছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করা মেয়ে, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মেয়েরাও মা-বাবার জোরাজুরিতে বিয়ে করতে বাধ্য হয় এমন কাউকে যাদের প্রতি তার বিশ্বাস ও সম্মান তৈরি হয়নি, মুগ্ধতাও না। একটা যথেষ্ট বড় হয়ে যাওয়া (বা কম বয়স হলে তো কথাই নেই) মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেয়ার এই কালচারের কারণে সেই মেয়েটির অনাগত জীবনকে নিঃসন্দেহে ভোগান্তির জীবন হিসেবে শুরু করে দেয়া হয়।

চতুর্থত, নারীর গায়ে হাত তোলার একটি সংস্কৃতি অজস্র মুসলিম পরিবারেও বিদ্যমান (ধর্মীয় আদর্শবিহীন পরিবারে তো আছেই) এবং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বিষয় অস্বীকার করে অনেকে ধামাচাপা দিতে চান বা বিভিন্ন দলীল এনে এটাকে নির্লজ্জভাবে চালিয়ে দিতে চান। অথচ সচরাচর পরিবারগুলোতে অবলীলায়

মেয়েদের গায়ে হাত তোলা হয়, বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়ার ভয় দেখানো হয়। একটি সংসার কখনই একটি পুরুষের একার নয়, আল্লাহর কাছে প্রতিটা মানুষের অবস্থান একসমান। সে এই কাজটি করার অধিকার রাখে না, সেটা না বুঝতে চাওয়ার জন্য আল্লাহভীতিহীন অহংসম্পন্ন মুসলিম হতে হয় কেবল।

পঞ্চমত, এখনো বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি ভাগাভাগিতে আল্লাহভীতির চিহ্নও নাই। সরকার আধা-আধা টাইপের অ-ইসলামিক নীতি চাপিয়ে কেবল ইসলামকেই অবজ্ঞা করেছে যা মূলত প্রকৃত পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করেছে। পরিবারে ভাইয়েরা যখন বোনকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে সম্পদের বন্টন থেকে বঞ্চিত করে -- সেখানে আইনের ঝামেলা করে সম্পর্কটাকে থানা-পুলিশ-সালিশে সমাধান হয় না। এখানে অনেক বেশি দরকার ছিল ইমাম-মুফতি এবং মুসলিম মনের মাঝে পরিবর্তন।

সমস্যাগুলো দেখে একটা বিষয় আমার মাঝে বারবার মনে হয়েছে। এখানে মুসলিম মনের পরিবর্তনই আবশ্যক। নারীরা ভুক্তভোগী মন আর কষ্ট নিয়ে বসে থাকলে কখনই সমাধান আসবে না -- বরং নিজেদেরকে এগিয়ে আসতে হবে ইসলামের শিক্ষায়। নারীবাদিতার তীর্যক পুরুষবিদ্বেষ মানসিকতা থেকে নয় বরং ইসলামের আদল তথা ন্যায় বিচার, ইহসান, সৎব্যবহার, সঠিক অধিকারকে নিশ্চিত করার মানসিকতা থেকেই এইসব ইসলামিক বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে নারীদেরকে।

ভুগতে ভুগতে মা-খালা, নানী-দাদীরা চোখের পানি ফেলেই জীবন পেরিয়ে গেছেন। এমনও নয় যে তাদের সঙ্গী পুরুষেরাও অনেক সুখে থেকেছেন। হয়ত বিভিন্ন মারপ্যাঁচে পড়ে কষ্ট এবং যন্ত্রণা নারীদেরকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এখন যারা যে বয়সেই আছেন, এগিয়ে আসা উচিৎ জ্ঞানার্জনে। শিক্ষার্জনের বয়স নেই। অনেক মহিলা দেখেছি যারা ৩০/৩৫ বছরে সন্তান কোলে নিয়ে পড়েছেন। এমন ঘটনা আশেপাশেই আছে। তবে, পরিবর্তনে এগিয়ে না আসলে কিছু বদলাবে না। আল্লাহর পৃথিবীতে, আল্লাহর সৃষ্টি মানুষদের মাঝে আদল, ইহসান প্রতিষ্ঠা করতে নারীর ভূমিকা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পুরুষেরও। নইলে, কিয়ামাতের দিন জবাবদিহিতা যে পুরুষ বা নারী কারো জন্যই সহজ হবে না , সেই বিষয়ে হলফ করে বলে দেয়া যায়।

মুসলিমাহ নারীদের কাজ “বাচ্চা জন্ম দেওয়া” এবং “স্বামীকে খুশি করা”?

26 May 2015

লেখকঃ আনিকা ওয়ারদা তুবা

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মুসলিমাহ নারীদের কাজ **''বাচ্চা জন্ম দেওয়া"** এবং **''স্বামীকে খুশি করা"** বলতে শুনলেই আমাদের মুসলিমদের গায়ে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলে যায়! কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কি এটাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব করে দেন নি? আল্লাহর তা'আলার ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সত্যি কথা। কিন্তু একজন নারীর প্রধান দায়িত্ব কি??

যেই চারজন নারী জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে থাকবেন, যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে সম্মানিত, যাদের মর্যাদা পুরো পৃথিবীর সব নারীর মধ্যে সবচাইতে বেশি; তাঁরা এই অবস্থানে কেন আছেন??

কি করেছিলেন তাঁরা? কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন যে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে এতোটা বেড়ে গেছে??

এই চারজনের প্রত্যেকেই তাদের মা এবং স্ত্রী হবার কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই এই মর্যাদার উপযোগী হয়েছেন।

মারইয়াম (রা) হলেন সেরাদের সেরা। তিনি সমগ্র বিশ্বের নারীদের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাকে নিয়ে কুর'আনে বলা হয়েছে –

"হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।" [সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৪২]

এই মারইয়াম, আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান পেয়েছেন ঈসা (আ) এর মা হবার কারণে। একজন মা হওয়া অনেক বড়ো ব্যাপার। মা হবার কষ্ট, ধৈর্য্য, সন্তান লালন-পালন এবং সুসন্তান গড়ে তোলা বিশাল ব্যাপার, বিশাল! এই প্রতিটা কাজ আল্লাহর ইবাদতের অংশ। আর এভাবে ইবাদত করেই তিনি অর্জন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান।

দ্বিতীয় খাদিজা (রা)। নবীজি (সা) এর জন্য তিনি কতো ত্যাগস্বীকার করেছেন, পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে পানি আসে। সত্যি বলবো, আমি জানি, আমি কোনদিন এতোটা করতে পারবো না নিজের স্বামীর জন্য। বরং আমরা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আছেন আসিয়া ও ফাতিমা (রা)। দুজনের একজন মা এবং একজন স্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে পালন করেছেন।

এই চারজন নারীর কেউ-ই বাইরে পড়াশোনা করতে যান নি। ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরিবাকরি করতে যান নি। হ্যাঁ, আপনি বলবেন - ওগুলো তো হাজার বছর আগের কথা ছিল। এখন সময় বদলেছে, এখন নারী-পুরুষ সব সমান। সবাই ঘরের বাইরে যাওয়াই এখন স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে, দ্বীনের কিছু কন্সট্যান্ট বিষয় আছে। দ্বীনের এই ভিতগুলো যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সব যুগের উপযোগী করেই প্রেরণ করেছেন। এতে হেরফের করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমরা সঠিক ইসলামের অনুসারী হলে জেনে থাকবো, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য কখোনোই এইসব দুনিয়াবি পড়াশোনা কিংবা ক্যারিয়ারের ওপর নির্ভর করে না। রিকশাওয়ালার গরিব বউটা, যে বাচ্চা আর সংসার ছাড়া কিছুই জানে না, সেও জান্নাতে এই লন্ডনে পড়া আমার চাইতে উপরে অবস্থান করতে পারে, শুধুমাত্র তার ঈমান, আমল, ও ইবাদতের জোরে। আমাদের শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু সত্য শ্রুতিমধুর না হলেও বদলে যায় না।

বর্তমান সমাজে সম-অধিকারের জোয়ার এসেছে। মেয়েদেরকে পড়াশোনা করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট ও অ্যাম্বিশাস হতে হবে। এই ডিগ্রি নেওয়ার কারণই হলো যেন আমরা আমাদের ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে পারি। যেন দুনিয়াবি একটা পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সমাজ বেধেই দিয়েছে মেয়েদের কাজগুলো কী কী। মেয়েদেরকে পুরুষের মত ঘর থেকে বের হয়ে অবশ্যই চাকরি-বাকরি করতে হবে। কোন নারী যদি নিজের ইচ্ছায় ঘরে বসে থাকে, যদি সে ভাবে "আমি এতো কষ্ট করে চাকরি করতে চাই না, শুধু সন্তানকে সময় দিতে চাই,"

তাহলে তাকে বাঁকা চোখে দেখা হবে। লোকের নজরে, সমাজের নজরে সে নিশ্চিতভাবেই নিচু বলে গণ্য হবে। আপনি এটাকে "অধিকার" বলেন? আমি বলবো, চাপিয়ে দেওয়া বোঝা। অত্যাচার। জুলুম। এভাবে নারীদেরকে এমন কিছু কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যা তার স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু সমাজের বেধে দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড বলে কথা! এবার পালাবি কোথায়? না চাইলেও এই বোঝা বয়ে বেড়াও। তা নাহলে "সম্মান" থাকবে না।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, সম্মান আসলেই থাকে না। সম-অধিকারের কথা বলে ফেনা তোলা বুদ্ধিজীবিরা এমনভাবেই আমাদের জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে মেপে দিয়েছে। এই মাপের চুল পরিমাণ বাইরে গেলেই আমি গোঁড়া, অশিক্ষিত, গোয়ার, মূর্খ, সস্তা হাউজওয়াইফ। আমার চাইতে বাইরে সেজেগুজে কাজ করতে যাওয়া একজন নারীর সম্মান ও মর্যাদা সমাজের চোখে অনেক বেশি। কিন্তু আল্লাহর চোখেও কি তাই? ওয়াল্লাহি, আল্লাহর চোখে যদি তা হতো, তবে কখনোই ঐ চারজন নারী জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হতেন না।

এবার একটু চিন্তা করে দেখি, কাদের থেকে এই বিকৃত চিন্তার সূচনা?? কারা আমাদেরকে এমন বিকৃত মানসিকতা উপহার (!) দিচ্ছে?

নিঃসন্দেহে ইসলামের বিপরীতে অবস্থিত কিছু মানুষের মগজ থেকে এসবের আগমন। যেই মগজে শয়তান দখল বসিয়ে ভিত্তিহীন কথা বের করে। আমি একবার এখানে এক feminist activist এর সাথে কথা বলেছিলাম। অমুসলিম এক মেয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা অধিকার চাও ঠিক আছে। কার সমান অধিকার চাও? পুরুষের সমান??

হাস্যকর, একজন নারী হয়ে, নারীত্বকে বিলীন করে দিয়ে "পুরুষ জাত"এর সমান হওয়াটাই নাকি আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত!

তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের গন্তব্য কী? ওদের গন্তব্য শেষ পর্যন্ত feminist কাউকে সরকারের উঁচু পদে বসানো। আমি বললাম, তাহলে সেটা কি একজন পুরুষের জন্য unfair হয়ে যায় না? আমরা নিশ্চয়ই জানি, নারী ও পুরুষ এক ধাচে চিন্তাভাবনা বা কাজকর্ম করে না। শারীরিক, মানসিক সবখানেই আমাদের কিছু পার্থক্য স্বাভাবিক ভাবেই আছে। তাহলে একজন ফেমিনিস্ট যখন আইন তৈরি করবে, স্বভাবতই তা হবে নারীদের পক্ষে এবং পুরুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের বিপক্ষে। কারণ একজন মানুষের পক্ষে বিপরীত লিঙ্গকে ঠিক বিপরীত লিঙ্গের মত করে বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক একই কারণে পুরুষদের তৈরি আইনও নারীদের জন্য যথাযথ হয় না। মেয়েটা একমত হয়েছিল।

কিন্তু তার কাছে কোন সমাধান ছিল না। আল্লাহর পরিচয় নিয়ে গাফেল কারো কাছ থেকে আমি সমাধান পাবার আশাও করি না। কিন্তু সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছেন। প্রতিটা সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আইন তৈরি করে দিয়েছেন। নারীবাদ বা পুরুষতান্ত্রিক একপেশে আইন নয়, মহান রবের পক্ষ থেকে আগত আইন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। এই মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব শিখিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্বগুলো কখনোই আমাদের ওপর জুলুম,

অন্যায়, unfair নয়। হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা নারীকে মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের দায়িত্ব দিয়ে অসম্মানিত বা জুলুম করেন নি, বরং এই সমাজের নিয়মগুলোই জুলুম। আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনার কাছে ইসলামের সমাধানটা যুগের অনুপযোগী মনে হচ্ছে, আপনার চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে। খোলা মনে আলোচনায় বসুন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে কথা বলুন, আপনার সংশয়-সন্দেহ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা আজকে ইসলামের আদর্শ থেকে হয়ত কয়েক আলোকবর্ষ দূরে পড়ে আছি। আমরা পড়াশুনা কমপ্লিট করার জন্য বিবাহের মত প্রয়োজনীয় ইবাদত পালন করতে দেরী করি, চাকরি করার জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করি! সুবহান আল্লাহ! মা হবার মর্যাদাকে আমরা এতো সহজে উপেক্ষা করে ফেলছি। ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে আজ আমরা স্বামীকে সময় দেওয়ার ফুসরত পাই না। হায়! কোথায় মারইয়াম, খাদিজা, ফাতিমা, কোথায় আমরা! অথচ আমরাই "নারীদের পড়াশুনার বিপরীতে" কেউ কিছু বললে ধেয়ে যাই। তাকে পারলে সেখানেই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলি। তাকে বুঝাতে যাই, খাদিজাও তো ব্যবসা করেছিল, হুম! অথচ আমরা ভুলে যাই, খাদিজা ব্যবসা করার জন্যে বাড়ির বাইরে পা রাখেন নি। আমরা মনে রাখতে চাই না, খাদিজা, মারইমায়, আসিয়া, ফাতিমাদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলো! আমরা এভাবে ভাবি না যে, উনারা তো সেক্যুলার পড়াশুনাও করেন নি, তবে আমরা কেন ফিতনা মাথায় নিয়েও সেক্যুলার পড়াশোনা ও চাকরি-বাকরি করবো?

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, কেন আমরা "সেক্যুলার শিক্ষা"র বিপরীতে যুক্তি শুনলে এতো খেপা? কেন স্ত্রী হবার কথা, বাচ্চা নেবার কথা আসলেই আমাদের মুখ চুপসে যায়? কেন আল্লাহর দেওয়া নারীদের ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশটা আমাদের চোখে পড়ে না?

এর কারণ আমরা আসলে ইসলামকে দেখি কাফেরদের লেন্স থেকে। তারা যেভাবে দেখাতে চায়, সেভাবে। কাফের ভার্সনের একটা মডারেট ইসলাম তৈরি হয়েছে। সেখানে ইসলামের লেবাস জড়িয়ে জাহেলিয়াত পালন করা যায়। আমরা জেনে না জেনে সেটাই করি। কাফেররা আমাদেরকে ফেমিনিজম শেখাতে চেয়েছে, তারা সফল। আমাদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট করতে চেয়েছে, সেখানেও আমরা ধোঁকা খেয়ে বসে আছি।

আজকে সমাজে সম-অধিকারের জয়জয়কার। নারীবাদের দাপটে টেকা দায়! তাই আমি অবশ্যই মনে করি, নারীদের ব্যাপারে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, সাহাবীদের ঐতিহ্য ও জান্নাতী রমণীদের জীবন থেকে মানুষকে বোঝানো দরকার খুবই বেশি। এই দায়িত্ব শুধু আলেমদের নয়, এই দায়িত্ব আপনার-আমার-সবার। এই পুরো পোস্টটি লেখার কারণ একজন মাওলানার ভিডিও। যিনি উত্তম ভাষাশৈলী ব্যবহার না করলেও মূলত উপরের বক্তব্যই দিতে চেয়েছেন। এই আলেমকে আমি চিনি না, কোনদিন নামটাও শুনি নি, আর আমি তার অনুসারীও নই। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি এই আলেমের চাইতে তাদেরকে অনেক বেশি ভয়াবহ ও ইসলামের শত্রু মনে করি, যারা ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকেই বদলে দিচ্ছে। যারা ক্রমাগত কাফেরদের চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত হচ্ছে। যারা সমাজের বুদ্ধিজীবিদের এজেন্ডা পালনের জন্যই ইসলামকে ব্যবহার করে চলেছে, জেনে কিংবা না-জেনে।

কই আমরা তো তাদের দিকে তেড়ে যাচ্ছি না। আসলে তারা এতোটাই সূক্ষ্মভাবে আমাদের মন ও মগজকে কব্জা করে ফেলেছে যে, আমরা তাদের চালগুলো ধরতেই পারিনা। কিন্তু প্রভাবিত আমরা নিঃসন্দেহে হয়েছি। আর তাই তো, সেক্যুলার লেখাপড়া বাদ দেবার কথা শুনলে আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে বসে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার কথায় আমরা ইতস্তত করি। তখন আর একমত হতে পারি না যে ইসলাম নারীদের বাইরে যাওয়া অপছন্দ করে। তখন আমাদের চুলকানি শুরু হয়। বাচ্চা পেছানোর কথা উঠলে আমরা তো নির্বিকার। এগুলো যেন কোন সমস্যাই না! নিকাব পরে অনেকের মুখেই শুনি – তুমি কেন নিকাব পরো, এটা কি ফরয? অথচ সেক্যুলার পড়াশোনা একটা মুবাহ বা ঐচ্ছিক কাজ। সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মনে এতো প্রশ্ন নেই। আমরা আসলে কোন বিষয়টাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি? আল্লাহর ইবাদত, নাকি সমাজের রীতিনীতি? শেষ পর্যন্ত, আমরা আসলে ঐ ইসলামের নামে দুই নৌকায় পা দিয়েই চলছি। জাহেলিয়াতের বীজ এখনো আমাদের মাথায় গেঁড়ে আছে বলেই ইসলামের শিক্ষা মেনে নিতে আমাদের গা কুটকুট করে।

আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিক! আমাদেরকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি দিক, আমীন।

আমি নিজে সেক্যুলার এডুকেশন নিয়ে পড়ে আছি। আমি হয়ত স্বামীর মন জয় করতে পারছি না, কিন্তু তারপরেও আজ এই বড় বড় কথাগুলো বললাম। নিজের দুর্বলতার কারণে যেন সত্য প্রকাশে আমরা কুণ্ঠিত না হই। সবার কাছে দু'আ চাই যেন সমাজের বেড়াজাল থেকে নিজের চিন্তাচেতনাকে মুক্ত করতে পারি, যেন ইসলামের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে পারি। আমি একজন বিবাহিত নারী। সুতরাং স্ত্রী এবং মা হিসেবে আমার সাফল্যেই আমার দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য নিহিত। এই কথাটা আমরা সব মুসলিমাহ যত তাড়াতাড়ি বুঝবো, ততোই মঙ্গল।

সবাই আমার জন্য দু'আ করবেন যেন নেক স্ত্রী ও নেক সন্তানদের মা হতে পারি। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য ও মেয়েদের পিতা-মাতা

22 October 2014

লেখকঃ **কানিজ ফাতিমা**

আমি এমন অনেক নাটক, সিনেমা দেখেছি যাতে দেখানো হয়েছে ছেলের বাবা বা মাকে ছেলের বউ সহ্য করতে পারছে না । কিন্তু এমন কোনো নাটক, সিনেমা দেখিনি যাতে দেখানো হয়েছে মেয়ের বাবা –মা বৃদ্ধ বয়সে কোথাও যাবার জায়গা পাচ্ছেন না ; মেয়েটি চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব সাহায্য করার, কিন্তু মেয়েটির স্বামী বা শ্বশুর বাড়ীর লোক সহ্য করতে পারছে না । আশেপাশের লোক বলছে মেয়ের বাড়ী থাকবেন, কেমন দেখায়? কিন্তু এই মেয়েটির জন্যও তার

বাবা-মায়ের অনেক ত্যাগ ছিল, এই মেয়েটির জন্যও তারা রাত জেগেছেন , ভেজা বিছানায় শুয়েছেন । উপরন্তু তার নিরাপত্তার জন্য বাড়তি উদ্বেগ সহ্য করেছেন ; মেয়েটির বিয়ে দেবার সময় ছেলে পক্ষের যৌক্তিক-অযৌক্তিক সব দাবী মেনে নিয়েছেন, জামাই বা জামাই বাড়ীর কেউ আসলে টাকা থাকুক বা নাই থাকুক বাজারের বড় মাছ কিনেছেন ; কোমরে ব্যাথা নিয়েও হাসি মুখে জামাইয়ের জন্য রান্না করেছেন । এত কিছুর পরেও কেন এই বাবা-মায়ের ত্যাগ , কষ্ট কোথাও মূল্যায়ণ পায় না? শুধু 'মেয়ের বাবা-মা' হওয়ার কারণে ?

আমি যখনি কোনো নাটক বা সিনেমায় সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগ দেখেছি আশ্চর্যজনক ভাবে সন্তানটি সর্বদাই ছেলে সন্তান ছিল , একবারের জন্যও আমি মেয়ে সন্তান দেখিনি। কারনটা কি হতে পারে? -আমি অনেকবার ভাবার চেষ্টা করেছি। মায়েরা কি ছেলেদের জন্য বেশী ত্যাগ করে যা ছেলেদের মনে রাখা উচিত? মায়েদের ছেলে সন্তানের প্রতি আকর্ষণটা একটু বেশী হতে পারে (অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন) কিন্তু ত্যাগ তো তারা মেয়েদের জন্য একটুও কম করেন না । তাহলে কেন মেয়ের মায়েদের ত্যাগটা সবসময় অনুচ্চারিতই থেকে যায়? আবার ভাবার চেষ্টা করেছি মেয়েরা হয়তো এমনিতেই বাবা মায়ের প্রতি যত্নশীল , ছেলেদের বরঞ্চ মনে করিয়ে দিতে হয় বাবা-মা তার জন্য কী কষ্ট করেছে । এটা হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে কিন্তু যদি আমরা ছেলেদের জন্য বাবা মা কতটা কষ্ট করেছেন শুধু তাই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে থাকি তবে কি মেয়ের বাবা-মায়েদের ত্যাগ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে না?

এ তো গেলো এ দুনিয়ার কথা । মৃত্যু পরবর্তী দুনিয়ার ব্যাপারেও ছেলের বাবা মায়ের সুবিধা মেয়ের বাবা মায়েদের থেকে বেশী দেখানো হয় । 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত' কথাটা শুনলেই কেন যেন আমাদের মনে এক মা আর তার ছেলে এমন একটা ছবি ভেসে ওঠে । একবার এক মফঃস্বলের এক মাওলানা যিনি ওই এলাকার মাদ্রাসার শিক্ষক এবং নিয়মিত ঈদের জামাতে ইমামতি করেন ও খুতবা দেন (অর্থাৎ একজন ধর্মীয় শিক্ষক এবং নেতা) আমাকে বলছিলেন, "মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত এবং বিয়ের পরে মেয়েদের জন্য মা-বাবার স্থান নিয়ে নেয় তার শ্বশুড়- শ্বাশুড়ী ।" তিনি আমাকে যা বোঝাতে চাইছিলেন তার অর্থ দাঁড়ায় ছেলেদের বেহেশত সর্বদাই মায়ের পায়ের নীচে থাকে কিন্তু মেয়েদের বেহেশত বিয়ের সময় তার মায়ের পায়ের নীচ থেকে সরে গিয়ে স্থান নেয় শ্বাশুড়ীর পায়ের নীচে ।

অর্থাৎ বিয়ের সময় মেয়ের মায়েরা বেহেশত হারান আর ছেলের মায়েরা বাড়তি একটি লাভ করেন । এই সুত্র অনুযায়ী কোনো মহিলার যদি দুটি ছেলে থাকে তবে তিনি চারটি বেহেশতের উপরে দাড়িয়ে থাকেন কিন্তু যার দুটি মেয়ে তিনি মেয়েদের বিয়ে দেবার সাথে সাথে বেহেশতশূণ্য হয়ে যান । এই যদি হয় অবস্থা তাহলে কোন নারী চাইবে মেয়ের মা হতে? কে চাইবে কষ্ট করে মেয়ে পেটে ধরে, তার জন্ম দিয়ে, তাকে বড় করার সব কষ্ট সয়েও বেহেশতশূণ্য হতে? তার থেকে ভালো ছেলের মা হওয়া – ছেলের জন্য কষ্ট করার পুরস্কার হিসাবে পার্মানেন্ট একটা বেহেশত তো থাকবেই তার উপরে বোনাস হিসাবে মেয়ের মায়েরটাও পাওয়া যাবে। এভাবে কি আমরা সবাই মিলে এমন একটা সামাজিক চাপ তৈরী করছি না যাতে সবার মধ্যে ছেলে সন্তান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, আর মেয়ে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা কমে? আর এ থেকে তৈরী হয় ভারসাম্যহীনতা আর পরিনামে জন্ম নেয় নানা রকম পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা ।

আমরা জানি রাসুল (সঃ) এর সময় মক্কার লোকেরা মেয়ে শিশু সন্তানদের জীবন্ত কবর দিত; কেন? যে বাবা এ কাজটি করত তার কি একটুও কষ্ট হতনা ? অবশ্যই হত। ইতিহাস সাক্ষী যে একাজ করার সময় তাদের বুক ফেটে যেত; চোখের পানিতে মুখ ভেসে যেত; তারপরও কেন তারা এটা করত? কারণ সমাজের চাপ। সমাজ এমন এক পরিবেশ তৈরী করে রেখেছিল যাতে ছেলের পিতা-মাতা নানা ভাবে সুবিধা ভোগ করত আর মেয়ের পিতা-মাতাদের পড়তে হত অসুবিধা জনক অবস্থানে – কাজেই কেউই মেয়ে সন্তান চাইতো না ।

আমাদের এই আধুনিক যুগেও যদি আমরা নাটক , সিনেমা , সাহিত্য সর্বত্র ছেলের বাবা-মায়েদের ত্যাগ কে হাইলাইট করি আর মেয়ের বাবা-মাদের ত্যাগ কে অবহেলা (over look) করি তবে আমরাও এমন এক পরিবেশ তৈরী করছি যাতে সবার মধ্যে ছেলের বাবা- মা হওয়ার ইচ্ছা বাড়ে, আর মেয়ের বাবা- মা হওয়ার ইচ্ছা অনুৎসাহিত হয়। আমরা কি এভাবে মেয়ে ফীটাস এবরশন কে উত্সাহিত করছি না?

আমি একবার খুব নামকরা একজন ধর্মীয় বক্তার ওয়াজ শুনছিলাম 'পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য' এর উপর । বক্তব্যের শব্দ চয়ন এবং ধরন (Tone) এমন ছিল যে ওখানে উপস্থিত সব পুরুষের মনে হলো বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে তারা যথেষ্ট মনোযোগী হতে পারছেন না এবং এর সম্ভাব্য কারণ বা বাধা হলো স্ত্রী । অপরপক্ষে উপস্থিত প্রতিটা নারীর মনে হলো যে শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীর প্রতি দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা সমালোচিত হলো । এমন ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ভালো প্রভাব ফেলবে না । শুধু তাই না, এধরনের ব্যাখ্যা যেহেতু ছেলের মায়েদের সুবিধা জনক স্থানে রাখছে সেহেতু ওই ওয়াজে উপস্থিত সব নারীর মনেই (আমার নিজেরও) ছেলের মা হওয়ার ইচ্ছা তৈরী হয়েছে , মেয়ের মা হতে তেমন কারোই সেদিন ইচ্ছা হয়নি । ওয়াজগুলো কি এমন হতে পারে না যা শুনে প্রত্যেকটা পুরুষ ভাবতে পারে, সন্তান হিসাবে তার বাবা মায়ের সাথে সে নিজে ভালো আচরণ করছে কিনা? এবং নিজ স্ত্রীকে তার বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার অসহযোগিতা করছে কি না? একই ভাবে প্রত্যেকটি নারীও ভাবতে পারে সন্তান হিসাবে তার বাবা মায়ের সাথে সে ভালো আচরণ করছে কিনা? এবং নিজ স্বামীকেও তার বাবা মায়ের প্রতি দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার অসহযোগিতা করছে কিনা ?

আমি এমন অনেক ইসলামিক ছেলে দেখেছি যারা নিজেরা অহরহই নিজের বাবা মাকে ধমকের সুরে কথা বলেন ,রেগে গেলে রূঢ় আচরণ করেন কিন্তু স্ত্রীকে নির্যাতন করেন এই অজুহাতে যে সে তার শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীর সঙ্গে যথেষ্ট ভালো আচরণ করেনা কেন; কাজের সহযোগীতার জন্য লোক থাকার পরেও অফিস থেকে ফিরে এসে ভাত রান্না করে দেয় না কেন । এরকম অদ্ভুত আচরণের কারণ সম্ভবতঃ আমাদের চার পাশের 'পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যের'- এই ধরনের পুরুষ কেন্দ্রিক ব্যাখ্যা। কারণ এইধরনের ব্যাখ্যা এমন একটা ধারণা তৈরী করে যে পুরুষদের অধিকার রয়েছে তার স্ত্রী কে নির্যাতন করার যদি তার মনে হয় স্ত্রী তার চাহিদা মত তার বাবা মায়ের সাথে ব্যবহার করছে না ।

একবার ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্র আমার অফিসে আসলো ," ম্যাডাম , মা-বাবা বললে নাকি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে হবে ? " আমি ওদেরকে ইসলাম পড়াতাম না কিন্তু ওদের মনে কোনো কারণে এই বিশ্বাস হয়েছে যে আমি হয়ত ওদের যুক্তিপূর্ণ কোনো সমাধান দিতে পারব । আমি জানতে চাইলাম- "তোমাদের এমন ধারণার কারণ কি?" ওরা বলল আমারই এক কলিগ, যিনি ছাত্রদের মাঝে মাঝেই ইসলাম সম্পর্কে সচেতন করেন এবং এ কারণে ছাত্রদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়ও, তিনি আজ ক্লাসে এ কথা বলেছেন । তিনি বলেছেন," ইসলামে বাবা মায়ের অধিকার এত বেশী যে তারা যদি বলে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে তবে ছেলেদের দায়িত্ব হলো স্ত্রীকে তালাক দেয়া"। আমার কলিগের এই কথার

প্রতিবাদ ছাত্ররা করতে পারে নি ঠিকই কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে এটা ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আরো সহজ ভাবে বললে বলতে হয় এটা তাদের কাছে অন্যায় মনে হয়েছে এবং ওদের মনে প্রশ্ন তৈরী হয়েছে ইসলাম এমন অন্যায়কে কিভাবে উত্সাহিত করতে পারে বা কিভাবে ইসলাম বাবা মাকে জালিম হবার ছাড়পত্র দিতে পারে?

আমি ওদেরকে বললাম –

কোরআনে বাবা-মা সম্পর্কে তিন ধরনের আয়াত এসেছে –

১. শুধু বাবা মার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কিত আয়াত (কি করতে হবে)

২. বাবা মার অধিকার ও অন্যান্যদের অধিকার (একসঙ্গে) সম্পর্কিত আয়াত

৩. বাবা-মার অধিকারের সীমা সম্পর্কিত আয়াত (কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা মায়ের কোনো অধিকার নেই)

প্রথম ধরনের আয়াত গুলোর (শুধু বাবা মার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব সম্পর্কিত) মধ্যে পড়ে সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াত, সুরা লুকমানের ১৪ নং আয়াত ও সুরা আহকাফের ১৫ নং আয়াত।

” তোমার প্রতিপালক আদেশ করছেন, তোমরা তাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করনা এবং তোমরা তোমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো ; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের সাথে বিরক্তি সূচক কিছু (উফ) বলো না এবং ধমক দিওনা, তাদের সাথে সম্মান সূচক নম্র কথা বলো।

অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো, এবং বলো, হে আমার মালিক তাদের প্রতি ঠিক সেভাবে দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। ” [বনি ইসরাইল ২৩, ২৪]

“আমি মানুষকে তাদের পিতা মাতার ব্যাপারে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি , তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পর সেই সন্তান বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে , সুতরাং আমার শোকর আদায় করো এবং পিতা মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করো ; তোমাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে ।” [সুরা লুকমান ১৪]

আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে ; কেন না তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে প্রসব করেছে এবং এভাবে গর্ভে ধারণ করতে ও স্তন্য পান করানোর সময় তিরিশটি মাস; অতঃপর সে তার পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং ৪০ বছরে উপনীত হয় ; তখন সে বলে , হে আমার মালিক , এবার তুমি আমাকে সমর্থ দাও .....” [আহকাফ: ১৫]

দ্বিতীয় ধরনের আয়াতে অন্যান্যদের অধিকারের সাথে সাথে পিতামাতার অধিকারের কথাও বলা হয়েছে –

“তুমি বল, আসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা বলে দেই , তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক করবেনা , পিতা মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় কখনও তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না ……..”[সূরা আনআম: ১৫১]

” তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তার সাথে শরীক করবে না এবং পিতা – মাতা , আত্মীয় স্বজন , ইয়াতিম , অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী , পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। ” [সূরা নিসা: ৩৬]

আর তৃতীয় ধরনের আয়াতে পিতা মাতার অধিকারের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে – বলা হয়েছে কোথায় কোথায় বাবা মায়ের অধিকার নেই।

প্রথমতঃ

পিতা মাতা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করতে বললে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। সুরা লোকমানে আল্লাহ বাবা মায়ের প্রতি ‘সদ্ব্যবহার’ কি তা ব্যাখা করেছেন – “আমি মানুষকে তাদের পিতা মাতার ব্যাপারে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি,তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পর সেই সন্তান বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে , সুতরাং আমার শোকর আদায় করো এবং পিতা মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করো ; তোমাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে” এর পরপরই বলছেন “সদ্ব্যবহার” মানে “আনুগত্য” না। আল্লাহ বলছেন, ” তোমার পিতা–মাতা যদি তোমাকে পীড়া পীড়ি করে যে তুমি আমার সাথে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমাদের কোনো কোনো জ্ঞানই নেই , তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না,তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে …..”

দ্বিতীয়তঃ

অন্যায় কাজে সন্তানের সমর্থন পাবার অধিকার পিতা মাতার নেই,সে অন্যায় যে কারো ক্ষেত্রেই হোক না কেন।

“হে ঈমানদারগন, তোমরা সর্বদাই ইনসাফের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী থেকো যদি তা তোমার নিজের, নিজ পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের বিপরীতে যায় …তবুও।” – [সূরা নিসা: ১৩৫]

অর্থাৎ পিতা-মাতা অন্যায় করলে বা অন্যায় দাবী করলে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন তার বিরোধিতা করার এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকার ; তবে মনে রাখতে হবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার ভালো করতে হবে এবং ধমক দেয়া যাবে না ।

এভাবে আমার ছাত্র ছাত্রীরা জেনে গেল তাদের কে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে খুবই খন্ডিত ধারণা দেয়া হয়েছিল। যার ফলে এমন এক ধারণার তৈরী হয়েছিল যা ইসলামের সঠিক ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এরূপ খন্ডিত ধারণার ফল আমাদের সমাজে ভালো হয়নি , এটি খুলে দিয়েছে অনেক অবিচারের দরজা – এটি ব্যবহৃত হয়েছে ছেলে বা ছেলে পক্ষের সুবিধা বৃদ্ধির আর মেয়ে ও মেয়ে পক্ষের সুবিধা বঞ্চিত করার হাতিয়ার হিসাবে ।

কেন এমন খন্ডিত ধারণা সৃষ্টি হলো ? কারণ সম্ভবতঃ আমরা যেসব ইসলামিক আলোচনা বা ওয়াজ শুনি এবং যেসব ইসলামিক সাহিত্য পড়ি তাতে শুধুমাত্র প্রথম ধরনের আয়াত গুলোকেই তুলে ধরা হয় , অন্য ধরন দুটি ততটা গুরুত্ব পায়না। বিশেষ করে সুরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতটি সম্পূর্ণ অনুচ্চারিতই থেকে যায় ,

“হে ঈমানদারগন, তোমরা সর্বদাই ইনসাফের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং আল্লাহর জন্য সত্যের সাক্ষী থেকো যদি তা তোমার নিজের, নিজ পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের বিপরীতে যায় তবুও “-

ফলে সন্তানরা তো বটেই বাবা মায়েরাও ভেবে বসেন তাদের অধিকার অসীম; এমনকি তারা সন্তানকে অন্যায় আদেশ করারও অধিকার রাখেন। আমাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছেলে সন্তানদের পিতামাতাকে করে তোলে অনিয়ন্ত্রিত শক্তির ধারক। অথচ এই আয়াতটি যদি পিতা-মাতার অধিকারের সীমা হিসাবে উচ্চারিত হত তবে বাবা মায়েরাও সন্তানের কাছে কিছু দাবী করার আগে ভাবতেন তাদের এ দাবী করার অধিকার আসলেই আছে কি না , তারা এমন কিছু দাবী করছেন কিনা যা ন্যায় ও ইনসাফের বাইরে। এমনটা হলে অনেক পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা তৈরীই হত না ।

কোরআনের প্রথম দু'ধরনের আয়াত সমূহ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে পিতা মাতার প্রতি ‘সদ্ব্যবহার বা ভালো ব্যবহার’ এর কথা বার বার বলা হয়েছে এবং এখনে এটাও লক্ষনীয় যে একই ভালো ব্যবহারের কথা আরো অনেকের প্রতিও করতে বলা হয়েছে । এ আয়াত গুলোতে বাবা মায়ের জন্য বিশেষভাবে যা বলা হয়েছে তা হলো -

১. বিরক্তি সূচক কিছু (উফ) বলো না এবং ধমক দিও না

২. সম্মান সূচক নম্র কথা বলো

৩.বিনয়াবনত থেকো

৪. দোয়া কর

৫. কৃতজ্ঞতা আদায় করো

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে অনেকে নিজে অহরহ নিজের বাবা -মার সাথে ধমকের সুরে কথা বলেন,রেগে গেলে রূঢ় আচরণ করেন; কিন্তু স্ত্রীকে নির্যাতন করেন এই অজুহাতে যে সে তার শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীর সঙ্গে যথেষ্ট ভালো আচরণ করছে না এবং আমাদের সমাজে এমন আচরণকে অনেক ক্ষেত্রেই 'খোদা ভীরু ' আচরণ মনে করা হয়। কারণ মনে করা হয় তারা এটা করছেন নিজের বাবা মায়ের সাথে তার স্ত্রীর ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য। অনেকে শুধু স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন না বরং এই অজুহাতে নিজ শ্বশুড়-শাশুড়ীর সাথেও খারাপ আচরণ করেন। উপরে উল্লিখিত তিন ধরনের আয়াতের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি এই ব্যক্তিটি তিন ভাবে কোরআনের বিরুদ্ধ আচরণ করছেন -

১. কোরআন সবার আগে বলেছে নিজেকে বাবা মায়ের সঙ্গে নম্র ভাষা ব্যবহার করতে ও বিনয়াবনত থাকতে এবং তিনি তা করছেন না ।

২. স্ত্রীর উপর নির্যাতন করছেন।

৩. নিজ শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীর সাথে সদ্ব্যবহার করছেন না (অথচ স্ত্রীর কাছে চাইছেন সে তার শ্বশুড়-শ্বাশুড়ীর সাথে ভালো ব্যবহার করুক)

"এবং পিতা – মাতা , আত্মীয় স্বজন , ইয়াতিম , অভাব গ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী , পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"[সূরা নিসা:৩৬]

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয়- কোরআনে বাবা মায়ের প্রতি সদ্বাবহারের আয়াত গুলো শুধু "ছেলের বাবা মায়ের " জন্য আসেনি। এ সবকটি আদেশই ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তান উভয়ের জন্যই এসেছে । ছেলের বাবা-মায়েদের এসব অধিকার রয়েছে আর মেয়ের বাবা-মায়ের নেই এমনটা কোরআন বলেনি। কোরআন ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তান উভয়ের মা বাবাকেই তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি দিয়েছে,

"আমি মানুষকে তাদের পিতা মাতার ব্যাপারে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি , তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং...."[সুরা লুকমান: ১৪]

"আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি সে যেন নিজের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে ; কেননা তার মা তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে প্রসব করেছে ..."। [সূরা আহকাফ: ১৫]

কিন্তু আমাদের নাটক, সিনেমা, এমনকি অধিকাংশ ইসলামী সাহিত্যও মেয়ের বাবা-মায়েদের ত্যাগকে উপেক্ষা করে যাচ্ছে । আমি আশা করব যারা ইসলামী সাহিত্য লিখছেন, ইসলামিক আলোচনা করছেন, বা গল্প -নাটক লিখছেন তারা যখনি পিতা-মাতার হক বিষয়টি আনবেন তখন অবশ্য অবশ্যই পরিপূর্ণ ছবিটি দিবেন যাতে করে মেয়ের বাবা-মায়েদের ত্যাগটি আড়ালে পড়ে না যায় আর কারো মনে মেয়ের মা-বাবা হবার প্রতি অনীহা তৈরী না হয়।

বাবা-মা ও স্ত্রীর অধিকার

30 October 2014

লেখকঃ স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

আজকে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম যার বিষয়টা বেশ আগ্রহ উদ্দীপক ছিলো - "বাবা-মা ও স্ত্রীর অধিকার", এতে বক্তব্য রেখেছিলেন ড এম সাইফুল্লাহ। প্রথমে প্রায় দেড় ঘন্টা আলাপে কুরআন এবং হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আব্বা-আম্মার অবস্থানটা এতই উঁচুতে থাকাটা পরিষ্কার করলেন যে মাঝে মাঝে অতীত জীবনের জন্য চোখ মুছতে হয়েছে, অন্তর কেঁপেছে নিজ জীবনের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কথা ভেবে... তবে, স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টা খুব অল্প আলোচনা করে 'টি ব্রেক' হওয়ায় কিঞ্চিত হতাশ হয়েছিলাম কারণ সেটা ভালো করে জানাও খুব জরুরি মনে করেছিলাম...

বিরতির পর ছিলো 'কোশ্চেন-আন্সার' সেশন। এসময় সেই হতাশা কেটে গিয়েছে সুন্দর সেশনটির কারণে। উপস্থিত ভাই ও বোনদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে স্ত্রী এবং বাবা-মায়ের মধ্যকার সমন্বয় করতে যে কষ্ট করতে হয় ছেলেদের, কিংবা স্বামী-শশুর-শাশুড়ি নিয়ে মুসলিমাহ মেয়েদের যে কষ্ট করতে হয় সেসব ব্যাপারে কিছু অসাধারণ প্র্যাকটিক্যাল টিপস দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় শাইখ সাইফুল্লাহ (হাফিজাহুল্লাহ)। শিখেছি অনেক কিছু, উপলব্ধি আর অনুধাবনের অংশে যোগ হয়েছে অনেক বেশি, আলহামদুলিল্লাহ।

অনুষ্ঠানে হালকা নাশতা আর পানি ছিল, একটা নোটবুক আর কলমও উপহার হিসেবে দিয়েছিলো আয়োজক আইসিডি (ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট)। উপহার পাওয়া সেই নোটবুকে কুরআন-হাদিসের আলোকে হওয়া মনোমুগ্ধকর আলোচনা থেকে আমার শেখা কিছু ছোট ছোট পয়েন্ট তুলে রেখেছি --

- বাবা মায়ের সাথে ইহসান করা উচিত। খুবই সুন্দর আচরণ করতে হবে যা হবে দয়া আর ভালোবাসাপূর্ণ। তাদের মনে কষ্ট হতে পারে এমন আচরণ কিছুতেই করা যাবে না।

- যদি চাই আমাদের দোয়াগুলো আল্লাহ কবুল করুক, তাহলে আব্বা-আম্মাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

- দুনিয়ার বুকে দীর্ঘ হায়াত পেতে চাইলে আব্বা-আম্মাকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত।

- রিযিকে প্রশস্ততা পেতে হলে আব্বা-আম্মাকে খুশি রাখার চেষ্টা করা দরকার।

- নিজের সন্তানের কাছে যদি ভালো ব্যবহার পেতে চাই, আব্বা আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

- পুত্রসন্তান হিসেবে আমি এবং আমার সকল সম্পদেই রয়েছে আমার পিতার সম্পূর্ণ অধিকার।

- পিতামাতার অবাধ্যতা আমাদেরকে পৃথিবীর বুকেই দ্রুত আজাবপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেয়।

- আব্বা-আম্মা যদি মারা যান তবে কয়েকটি কাজ করা উচিত: ১) তাদের জন্য দু'আ করা, ২) তাদের হয়ে অন্যদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া, ৩) তাদের অসিয়ত পূর্ণ করা, ৪) তাদের যারা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন ছিলেন তাদের খোঁজখবর নেয়া ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

- ছেলেদের জন্য স্ত্রী হলো দুনিয়ার বুকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সন্তানরা পিতামাতার শ্রেষ্ঠ উপার্জন।

- স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অন্যকে দোষারোপ করার অভ্যাস না থাকা উচিত।

- নিজের কোন চাহিদা থাকা সত্বেও যদি অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার অভাব পূরণকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর কাছ থেকেই উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে।

- সময়ের সাথে সাথেই স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কটি প্রগাঢ় হয়, যে অনুভূতিটাকে 'রাহমাহ' বলা হয়েছে।

- কারো কোন বক্তব্য না শুনে তার ব্যাপারে কোন অভিযোগ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়।

- কারো মৃত্যুর আগে তার সম্পদ বন্টনের কোন ধরণের সুযোগ নেই।

- অধিকার দাবী করা যেতেই পারে, তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। অন্যদের প্রতি উত্তম আচরণ ও তাদের অভাবপূরণের চেষ্টা করা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার উত্তম উপায়। যে দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করে, আল্লাহ তাকে রহম করেন।

আলোচনা শুনে টুকে নেয়া এই নোটে কোন ভুল থাকলে তার দায় একান্তই আমার। আল্লাহ আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সবার সাথে শেয়ার করার সদিচ্ছাটুকু কবুল করে নিন। [১৭ মার্চ, ২০১৪]

বাবা হওয়া :: নুমান আলী খান

17 October 2014

তিনি কথা শুরু করলেন ভাঙা বাংলায় "কেমুন আসেন?" বলে তারপর.....

১। সন্তান দ্বীন শিখলো কীনা – এই নিয়ে উদ্বেগ খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় এবং এটাও দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত। নুহ (আ.) থেকে মুহাম্মদ (সা.) কেউই এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত ছিলেননা। মুহাম্মদ (সা.) তার মেয়ে ফাতিমাকে সরাসরি বলেছিলেন," আল্লাহকে ভয় করো। তোমার কোনো উপকারে (পরকালে) আসার ক্ষমতা কিন্তু আমার নেই"।

২। সন্তানদের বিপথগামীতা একটা চ্যালেনজ, যা নুহ, ইয়াকুব (আ.) প্রমূখ প্রখ্যাত নবীকেও মোকাবেলা করতে হয়েছে; নুহের (আ.) ছেলে তো তওবা না করেই মারা গেল। সুতরাং এ চ্যালেনজ থেকে আমরা ছাড়া পাবো – এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

৩। আমরা যারা বিশেষতঃ মেয়ের বাবা, তারা অবশ্যই গর্বিত যে স্বয়ং রাসুল (সা.) ছিলেন মেয়ের বাবা, এবং এব্যাপারে তিনিই আমাদের রোলমডেল। আমরা ওনারই উত্তরসুরী।

৪। অথচ এখন উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের অবস্থাটা দেখুন। পোয়াতি বউ হাসপাতালে, বাচ্চা হতে গিয়ে জান যায় যায়। ওদিকে আত্মীয়েরা টেক্সট মেসেজ পাঠাচ্ছে হাসপাতালে স্বামী বেচারার কাছে, "কী খবর ? ভালো খবর তো?" এখানে "ভালো খবর" মানে হলো "ছেলে হয়েছে তো?" বেচারা মেয়ের বাপ যখন রিপ্লাই না দিয়ে চুপ থাকে, তখন আবার মেসেজ আসে,"আচ্ছা, দুঃখ করোনা, নেক্সট টাইম ছেলে হবে ইনশাল্লাহ।"

৫। সন্তান পালন সব যুগেই ছিলো কঠিন কাজ। কিন্তু হাল যামানায় বিশ্বায়ন, বিনোদনবিলাস ও উগ্র ভোগবাদী পণ্যমনষ্ক আচরণ (কনয্যুমারিযম) বিশেষ একটি চ্যালেনজ ছুঁড়ে দিয়েছে যা আমাদের বাপ-দাদারা কখোনো মোকাবেলা করেনি। "বাবা, আমার চাই আইপড, প্লে স্টেশন, নিনটেনডো... আস্ত গাড়িই চাই একটা।" বাচ্চারা এসব শিখলো কোথায় ? তারা কি এসব ইউসুফ (আ.) নবীর মতো স্বপ্ন দেখে জেনেছে – "বাবা স্বপ্নে দেখছি ১১ টা অ্যাপেল আইপড আমাকে সেজদা করছে..?" না, তারা শিখেছে অনিয়ন্ত্রিত মিডিয়া, টিভি, ইনটারনেট আর তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে।

৬। সাফল্যের সংজ্ঞা এখন পাল্টে গিয়েছে। লেখাপড়ার আদি উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য নিজেকে সক্ষম করে গড়ে তোলা। কিন্তু মুসলিম সমাজে বাচ্চার লেখাপড়ার পেছনে বাবা-মা'র আসল নিয়ত হয়ে গেছে বাচ্চাকে ভবিষ্যতের টাকা তৈরীর মেশিন বানিয়ে তোলা। তাই সন্তান ডাক্তার হলে বাবা মা'র মুখে হাসি আর ধরেনা। কিন্তু ডাক্তার সন্তান যখন বলে, "বাবা, আমি ডক্টরস উইদাউট বর্ডারসের সাথে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বিনে বেতনে একবছর সোমালিয়ার শিশুদের জন্য কাজ করতে চাই" — অমনি বাপমায়ের মুখটা কালো হয়ে যায়।

৭। যে সাবজেক্ট পড়লে টাকা আসেনা, সেটা মুসলিম বাবামা'রা বাচ্চাকে পড়তেই দিতে চায়না। স্টিভেন স্পীলবার্গ যদি পাকিস্তানে জন্ম নিতেন তাহলে ঐ বেচারা কোনদিনও চলচিত্রকার হতে পারতেননা, তার বাবামা বলতেন "ফিল্ম বানানো ?? আরে ছ্যা ছ্যা, ঐ কাজ কেউ করে ? বরং তুই ডাক্তারি পড়।"

৮। মুসলিম বাবামা কে তাই আগে নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে। যে স্বামী-স্ত্রী নিয়মিত নিজেদের মাঝে পার্থিব ক্ষণস্থায়ীত্ব, মানুষসেবার মর্যাদা, মানুষের প্রকৃত মূল্য, সামাজিক দ্বায়িত্ববোধ — এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের বাচ্চারা শুনতে শুনতে ছোট থেকেই লেখাপড়ার আসল উদ্দেশ্য এবং সাফল্যের সঠিক সংজ্ঞাটা ধরতে পারে।

৯। কিন্তু সে জন্যে, বিশেষ করে বাবাকে, অবশ্যই সন্তানের পেছনে সময় দিতে হবে – আপনি যত বড় ব্যস্ত মানুষই হোন না কেন। তাদের কথা শুনুন এবং তাদের সাথে কথা বলুন, তাদের জীবনের অন্তরঙ্গ সাথী হয়ে যান। মনে রাখবেন, মা হওয়াটা মহিলাদের স্বভাবজাত, কিন্তু বাবা হওয়াটা পুরুষদের স্বভাবজাত নয় – পিতৃত্ব জিনিসটা প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্জন করার বিষয়। একাজটা যদি না পারেন, তবে বাচ্চা যখন টীন এজার হবে, সেদিন দেখবেন সে আপনার কাছ থেকে বহুদূরে এমনকি হয়তো বাড়ি ছেড়েই বহুদূরে চলে গিয়েছে। তখন আপনি ছুটবেন মসজিদে, ইমাম সাহেবের কাছে কান্নাকাটি করে বলবেন," হুজুর, একটা দোয়া শিখিয়ে দেন, ছেলেটা যেন ফিরে আসে...।"

১০। সন্তানকে দ্বীন শেখাতেই হবে, এ দায়িত্ব আপনার – কোনভাবেই আপনি তা এড়াতে পারেননা। কোরআন খুলে দেখুন, নূহ থেকে ইয়াকুব, ইবরাহীম থেকে লোকমান সবাই প্রায় একই ভাষায়, একই মূল বক্তব্যে সন্তানকে দ্বীনের নসিহত করেছেন। তাদের কারো সন্তান ছিলো লক্ষ্মী, করো বা দুষ্ট, কিন্তু তারা (বাবারা) কখোনই নসিহত থেকে বিরত থাকেননি। আপনিও এ দায় এড়াতে পারবেননা।

১১। ইসলামী শিক্ষায় একটা বিপ্লব আসা দরকার। লোকে ইসলাম শিক্ষা বলতে বোঝে ইয়া বিশাল কোন আলেম হওয়া, যিনি কিনা আকীদা ও ফিকহে পারদর্শী। কিন্তু আমদের দৈনন্দিন জীবনে যা আসলে বেশী দরকার তা হলো — স্বামীদের জন্য উপদেশ, স্ত্রীদের জন্য উপদেশ, দাম্পত্য কাউনসেলিং, ছেলেপিলে মানুষ করা বিষয়ে উপদেশ, আদর্শ পুত্র বা কন্যা কী করে হতে পারি – এইসব বিষয়ে কারিকুলাম থাকা দরকার। এগুলোই তো হলো সত্যিকারের, প্রাকটিকাল ইসলামী শিক্ষা।

১২। শিক্ষাতো এই নয় যে আপনি সি প্লাস প্লাস পারেন বা আপনার এম বি এ আছে। ওটাতো টাকা বানানোর হাতিয়ার। যে শিক্ষা আপনাকে সত্যিকারের মানুষ বানাতে পারে সেটাই খাঁটি ইসলামী শিক্ষা। এবং এই বৈপ্লবিক শিক্ষার মূলে রয়েছে আদব বা শিষ্টাচার বা ম্যানার্স।

১৩। আমি বাবাদের সাবধান করে দিয়ে বলছি, ভালোভাবে আত্মসমালোচনা করে দেখুন আপনি মুসলিম বাবা হতে পেরেছেন কীনা। বাচ্চাকে সাথে নিয়ে নিজে কোরআন পড়ুন, কারী সাহেব ধার করে এনে কোরআন শোনাবেননা। অন্ততঃ দিনে বিশ মিনিট, মাগরিবের পর – পরিবারে সবাইকে নিয়ে।

১৪। মরমোন বাচ্চাদেরকে দেখুন। কী সুন্দর ফিটফাট জামা কাপড় পরে বাড়িতে বাড়িতে তাদের ধর্মের দাওয়াত দিতে যায়। কী তাদের নিষ্ঠা, কী তাদের উতসাহ। এটা সম্ভব হয়েছে একারণেই যে মরমোনরা তাদের সমাজ ও সন্তানদেরকে

তাদের দ্বীন (যদিও তা ভ্রান্ত) ভালোভাবে শেখায়। আর আমাদের মুসলিম সমাজের হাল দেখুন....। দরকার নেই আমাদের বিশাল বিশাল মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার বানানো। শুধু এটা নিশ্চিত করুন যে আমাদের বাচ্চারা দ্বীন শিখছে।

১৫। আমি আপনাদের জোর দিয়ে বলছি, পৃথিবীটা শিগগিরই দুই ধারায় বিভক্ত হতে চলেছে। একদিকে যারা ইশ্বরে বিশ্বাসী (তা মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু যাই হোক না কেন), আরেকদিকে যারা কোন ইশ্বরেই বিশ্বাস রাখেনা। এই মেরুকরণ মুসলিম সমাজকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য। আপনার সন্তান যখন বড় হবে, তাকেও এই দ্বিমেরুবিশিষ্ট পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে।

১৬। এর মোকাবেলায় আপনাকে হতে হবে কোরআনের ছাত্র, কোরআনের ধারকবাহক এবং কোরআনের প্রেমিক। কোরআনকে এমনভাবে ভালোবাসতে হবে যেন আপনার বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার আব্বু কী করতে পছন্দ করেন, তার শখ কী — তাহলে যেন তারা জবাব দিতে পারে "আমার বাবা কোরআন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তিনি কোরআন পড়েন, শেখেন, অর্থ নিয়ে চিন্তা করেন।"

শেখার কোন বয়স নেই। কোরআনকে নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিন, আল্লাহই আপনাকে শিখিয়ে দেবেন তারই বই থেকে কীভাবে আপনি আপনার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারবেন। আসুন আমরা আবার কোরআনের জাতি হই।

আলোচনার অনুবাদ লিখেছেন : যুমার৫৩

video source : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DWf2lOoggIQ

কাক বাবা-মা'র গল্প

21 October 2014

লেখকঃ শরীফ আবু হায়াত অপু

১.

ছোটবেলায় সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে পড়া একটা প্রশ্ন প্রায়ই মনে পড়ে - "কোন পাখি বাসা বানাতে না পেরে পরের বাসায় ডিম পাড়ে?" উত্তর ছিল কোকিল। কাক খাবার সংগ্রহের পন্থায় প্রতিভাবান এবং প্রচেষ্টায় প্রাণান্তী। হেথা-সেথা থেকে দিনমান যুদ্ধ করে যোগাড় করে আনা খাবার সে পরম মমতায় সদ্য ফোটা ছানাগুলোর লাল লাল মুখে তুলে দিচ্ছে, তিন তলার জানালা দিয়ে এ দৃশ্য বহুবার দেখেছি। হয়তো তার মনে আশা ছিল এই ছানাগুলো বড় হলে উঁচু ইউক্যালিপ্টাস গাছ থেকে নেমে আসা বড় চিলটাকে সে আচ্ছা করে দাবড়ে দিতে পারবে, হয়তো ছিলনা। ছানাগুলো একটু বড় হল - কোকিলের ছানাটাকে কাক আরো বেশি করে আদর করে- দেখতে অন্যগুলোর থেকে ভাল, গলাটাও যেন একটু মিষ্টি শোনায়। আরেকটু বড় হয়ে সেই ছানাটা চলে গেল বসন্তের দেশ খুঁজতে। উড়ে যাওয়ার ধরণ দেখে কাক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো- এটাও কোকিল ছিল!

২.

আমার স্ত্রী গর্ভবতী। দিনের পর দিন বমি আর অসুস্থতা। মুখ কালো করে বিছানায় শুয়ে থাকা - পড়াশোনাটা যে আবার বন্ধ হয়ে গেল। ওর কষ্ট দেখে অবাক হয়ে ভাবি – সব মা'ই কি এভাবে কষ্ট করে? আমার মা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা আমি পেটে থাকতে কি আপনার এমন কষ্ট হয়েছিল?"

- "তুই পেটে থাকতে তো....."

গলার স্বর চোখের পানিতে স্তিমিত হয়ে আসে।

ননদ-দেবর পরিবেষ্টিত আর্থিক-পারিবারিক টানাপোড়েন আর মানসিক যন্ত্রণার সেই দুঃসহ স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়ায় নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে যাই, ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচি।

আসলে সব মা'ই কি তাঁর সন্তানদের এভাবে ধারণ করেননি?

৩.

- "এটা তোর আর এটা তোর"

কলেজের কোন এক অনুষ্ঠানের খেতে দেয়া নাস্তার সিংগারা এখন আমার হাতে আর সন্দেশটা আমার ভাইয়ের। আনন্দে নাচতে নাচতে খাবারটা গলাঃধকরণ করে আমরা নিজ খেলায় মনোনিবেশ করলাম। জমে থাকা কাপড় ধুয়ে গোসল করে বেরিয়ে মা ঢুকে গেলেন রান্নাঘরে। সে নরক থেকে বেরিয়ে আমাদের পিছু নিলেন। আয় পড়তে বস।

আসলে সব মা'ই কি তাঁর সন্তানদের এভাবে লালন করেননি?

৪.

- "কাল থেকে ঘরে দুধ নেই, একটু দুধ এনে দিবি বাবা, এক কাপ চা খাব, মাথাটা খুব ধরেছে।"

- "কিন্তু মা, কাল যে আমার পরীক্ষা।"

- "তাহলে, থাক। ভাল করে পড়।"

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দে জননীর দীর্ঘশ্বাসটা চাপা পড়ে যায়।

৫.

আমার ছোটবেলার এক বন্ধু ফেসবুকে ওর স্বস্ত্রীক ছবি দিয়েছে। দেখে ভালোই লাগল। বসন্তের দেশে বোধকরি মানুষের চেহারায় আলাদা একটা জেল্লা আসে। সুখে থাকার জেল্লা। পঁচা দেশের মাটি-পানি-বাতাস থেকে মুক্তির জেল্লা। ওর মা'কে আমি চিনতাম। তাঁর মাথার চুল কখনো দেখা যায়নি। তিনি তখন হয়ত ভাবেননি তাঁর ছেলে এমন আধুনিক বউ পাবে। বোধহয় বসন্তের দেশ তাকে হাতছানি দেয়নি।

আমার অনেকগুলো বন্ধু এখন বসন্তের দেশগুলোতে থাকে। তাদের প্রৌঢ় বাবা-মা একাকি থাকেন এই পঁচা দেশে। কিংবা বাড়িতে গেলে বা চলতি পথে দেখা হলে এক অদ্ভুত কাতরতা নিয়ে বলেন - বাবা বাসায় এসো, ও তো নেই, তোমরা আস্লে খুব ভালো লাগে। আমি বলি "ওকে দেশে আসতে বলেন না কেন?"

- "না না দরকার নেই, যেমন আছে ভালো আছে, ও ভালো থাকুক।"

মুখ ঘুরিয়ে চোখের পানি লুকান।

হসপিটালের গেটে দাঁড়িয়ে এক বাবা দেখেন ছেঁড়া লুঙ্গি পড়া এক বৃদ্ধ তাঁর ছেলের রিক্সা থেকে নামল, তারপর ছেলের কাঁধে ভর করে ধীর পায়ে হসপিটালের দিকে আগাতে লাগল। উনার গলার কাছে কি যেন দলা পাকায় উঠল - আজ আমাকে হাসপাতালে আনার লোক খুঁজে পেতে আধঘন্টা ফোন করতে হয়েছে, অন্যের ছেলে অফিস ফেলে আমাকে দয়া করে নিয়ে এসেছে। আর আমার ছেলেটা... অভিমান আর সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্খা দ্বন্দ্ব করে গলার দলাটা আরো মোটা করে ফেলে।

৬.

রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সবচেয়ে বড় গুনাহ কি?

তিনি বললেন - "আল্লাহর সাথে শিরক"। তারপর?

- "পিতামাতার অবাধ্য হওয়া"

আল্লাহ নির্দেশ দিলেন তোমার পিতা মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে তখন তাদের কোন কথা বা কাজে বিরক্ত হলেও "উফ" শব্দটি পর্যন্ত করোনা।

যত বড় বড় পাপ আছে সবগুলোর শাস্তি পরকালে হবে। একটা বড় পাপ আছে যার শাস্তি পরকালে তো হবেই, ইহকালেও হবে - তা হলো বাবা-মার প্রতি অপরাধের শাস্তি। কেউ যদি নিজের বাবা-মা' কে কষ্ট দেয় তবে আল্লাহ ও তাকে সেই কষ্টের স্বাদ পৃথিবীতে দিয়ে তারপর তুলে নিবেন। এর কোন মাফ নেই, অবধারিতভাবে দিবেন, নিশ্চয়ই দিবেন।

বসন্তের দেশগুলোতে থাকা মানুষগুলো হয়ত ভাবে, আমি আমার বাবা-মা'র আদেশের আওতায় নেই, অবাধ্য হওয়ারও তাই আর প্রশ্ন আসেনা।

তথাস্তু কোকিল ছানা, তোমার বিচার আল্লাহ করবেন।

৭.

- এই পোড়ার দেশে থেকে আমি কি করব?

- আমি যা নিয়ে পড়াশোনা করেছি তার কোন প্রয়োগ আমার দেশে নেই।

- আমার দেশে সৎভাবে বেঁচে থাকা যায়না।

- আমার দেশের সরকার নষ্ট, সিস্টেম নষ্ট।

- আমার দেশে হালাল কামাই দিয়ে স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকা যায়না।

- আমি যেখানে আছি সেখানে ইসলাম পালনের স্বাধীনতা আছে। আমার দেশে নেই।

- দেশে কামলা খাটলে মানুষ কি বলবে, তার চেয়ে এখানেই কামলা খাটি।

- এখানে লাইফটাকে অনেক এনজয় করা যায়, আমার দেশে যায়না।

- কেন আমি তো দেশে টাকা পাঠাই, প্রতিদিন ফোনে কথা বলি।

- যারা দেশে বাবা-মা'র সাথে আছে তাদের চেয়ে আমি ছেলের দায়িত্ব বেশি পালন করি।

এরকম আরো বহু কথা শুনেছি, বহুবার শুনেছি - আমার প্রিয় বন্ধুদের মুখে, বড় ভাইদের মুখে শুনেছি। দুঃখজনক হলেও বেশিভাগ কথাই সত্য। কিন্তু তারপরেও কেন যেন বারবার মনে হয়েছে কথাগুলো নিজেদের প্রবোধ দেয়ার জন্য বলা। অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি দাড়াবার অনিচ্ছা থেকে বলা। মুসলিম হয়েও এই জীবনকে প্রাধান্য দেয়ার ছল থেকে বলা।

আমার আল্লাহর রসুলের সেই সাহাবির কথা মনে পড়ে যায় যিনি পুর্ণ থালা খাবার দেখে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন, "হে আল্লাহ, সব নিয়ামত কি এই পৃথিবীতেই দিয়ে দিবা, আখিরাতে কি তবে আমি নিঃস্ব হব?"

আমার রসুলুল্লাহর (সাঃ) এর কথা মনে পড়ে যায়। যিনি বাদশাহ রসুল হবার প্রস্তাব ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন আমি নিঃস্ব রসুল হব। একদিন খাব, খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করব। অন্যদিন না খেয়ে থাকব, না খেয়ে ধৈর্য ধারণ করব।

আমি বিদেশে থাকবার বিরোধিতা করছিনা, বাবা-মা'কে অবহেলা করবার বিরোধিতা করছি। নিজের সুখকে পিতামাতার সুখের চেয়ে বেশি মূল্য দেবার বিরোধিতা করছি। পৃথিবীর মোহে পরকাল ভুলে থাকবার প্রবণতাকে বিরোধিতা করছি।

আমার একটা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট নাইবা থাকল। নাইবা থাকল একটা গাড়ি, একটা ৫২' এলসিডি টিভি। আমার বাবার মনের ভিতরের দু'আটা থাক আমার সাথে। আমার মা'র ভালোবাসাটা থাক। বয়স্ক বাবা-মা' কে পেয়েও যে তাদের সেবা করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি নিতে পারলোনা সে হতভাগা। আমি সে হতভাগা হতে চাইনা। আমি ত্রিমাত্রিক থিয়েটারে মুভি দেখলামনা, লেটেস্ট গেম খেললামনা, রুনির গোল দেয়া দেখলামনা - কি আসে যায়? আমি স্কটিশ উপকূল দেখলামনা, ছবির মত শহর ভ্যাঙ্কুভার দেখলামনা, দেখলামনা গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ - কি আসে যায়? আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেলে এগুলো সবি পাব, বহু গুণে পাব। আমি আমার এই দুনিয়ার বিনিময়ে পরকাল কিনতে চাই। আমি পৃথিবীতে কষ্ট করে থেকে, মুখ বুঁজে বাবা-মা'র সেবা করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাই। আল্লাহ তোমার দোহাই, বসন্তের দেশের নেশা যেন আমার চোখে না লাগে, আমি যেন কোকিল ছানা না হয়ে যাই। তুমি আমাকে রক্ষা করো, প্লিজ।

বি.দ্র. আমার কোন বিদেশ থাকা বন্ধু এ লেখায় কষ্ট পেলে দুঃখিত। আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি, দেশে সবার পিছে পড়ে আছি - কারো কারো বাবা-মা'কে দেখে খুব কষ্ট লেগেছে, সেটাই একটু শেয়ার করতে চেয়েছি।

আমাদের ঘর কি ইসলামি ঘর?

মূল: ড. আইশা হামদান । অনুবাদ: মাস'ঊদ শারীফ । islam21c.com থেকে অনূদিত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন..." [১]

প্রশ্নটা হয়তো শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে। অনেকে হয়তো শোনা মাত্রই বলে বসবেন, "আমার বাড়ি অবশ্যই ইসলামিক বাড়ি!! আমরা মুসলিম পরিবার, কাজেই আমাদের বাড়ি পুরোপুরি ইসলামিক!!" আসলেই কি? নিচে দেওয়া ছোট্ট চেকলিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখুন তো আসলেই আপনার বাড়ি ইসলামিক কি না?

১. আমি একজন ধার্মিক জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছি

ধার্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে অনেক হাদীসেই গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে। কেন বলা হয়েছে সেটাও স্পষ্ট: সাধারণ জীবনসঙ্গীদের তুলনায় একজন ধার্মিক জীবনসঙ্গী সংসারে অধিক সুখ ও পরিতৃপ্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবে। স্ত্রী ধার্মিক হলে অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে। ধার্মিক স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে গড়ে তুলতে পারবে একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিক পরিবার। আর এটাই ইসলামিক বাড়ির মূল ভিত্তি।

২. আমি আমার জীবনসঙ্গীকে সাহায্য করি

প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন, দুজনের মধ্যে মমতা ও ভালোবাসার বন্ধনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক একটি পরিবার। অন্যান্য আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলোতে পরস্পরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে এই সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঈমান বাড়ানোর জন্য সংগ্রাম করা; 'ইবাদাহ্‌র প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া; প্রয়োজন হলে শুধরে দেওয়া; ক্বুর'আন তিলাওয়াত করতে উৎসাহিত করা; তাহাজ্জুদ সলাত পড়া; দান করা; ইসলামি বই, ম্যাগাজিন পড়া; ধার্মিক বন্ধু বাছাই করতে সাহায্য করা; ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করা। ঈমান এমন এক জিনিস যা কখনো বাড়ে, কখনো কমে। কাজেই নিজেদের ঈমান বাড়ানোর প্রতি যেমন খেয়াল রাখতে হবে, তেমনি খেয়াল রাখতে হবে আমাদের জীবনসঙ্গীদের ঈমানও যেন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. আমাদের বাড়ি আল্লাহর যিক্‌রের স্থান

বহু উপায়ে আল্লাহর যিক্‌র করা যায়: মনে মনে, নির্দিষ্ট কিছু যিক্‌র পাঠ করে, সলাতের মাধ্যমে, ক্বুর'আন আবৃত্তি করে, আযকার মুখস্থ করে, ইসলামিক ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে কিংবা ইসলামিক বিভিন্ন বিষয় পড়ে পড়ে। ফেরেশতারা যেন আল্লাহর বারাকা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে সেজন্য নিয়মিত ঘরে এ ধরনের যিক্‌র হওয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে-ঘরে আল্লাহর স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে স্মরণ করা হয় না, তাদের তুলনা হচ্ছে যেন একটি জীবিত আর অপরটি মৃত।" [২]

৪. আমাদের ঘর 'ইবাদাতের ঘর

অর্থাৎ যথাযথ সময়ে আমাদের ঘরে সলাত আদায় করা হয়। আর যখন পরিবারের একাধিক সদস্য উপস্থিত থাকে, তখন সবাই একসাথে জামা'আত-বদ্ধ হয়ে সলাত আদায় করে।

কেউ কেউ তাদের বাসায় সলাত আদায়ের জন্য আলাদা একটা ঘরও রাখতে পারেন। বিশেষ করে খেয়াল রাখবেন সেই ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য যেন বজায় থাকে। নারীদের জন্য সলাত বাসায় পড়াই উত্তম। আর পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক সালাতগুলো মাসজিদে আদায়ের পর, ঐচ্ছিক সালাতগুলো বাসায় পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অন্যের সাথে পড়ার চেয়ে বাসায় ঐচ্ছিক সলাত পড়া উত্তম; ফার্দ সলাত যেমন একা একা না পড়ে জামা'আত-বদ্ধভাবে পড়া উত্তম।"[৩] এটা এজন্য যে, যাতে মাসজিদের মতো বাসাও 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. শয়তানকে দূরে রাখার জন্য আমরা নিয়মিত সূরাহ আল-বাক্বারাহ ও আয়াতুল-কুরসি তিলাওয়াত করি

আল্লাহর বার্তাবাহক বলেছেন, "তোমাদের বাড়িতে সূরাহ আল-বাক্বারাহ তিলাওয়াত করো। কেননা, যে বাড়িতে সূরাহ আল-বাক্বারাহ তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই বাড়িতে প্রবেশ করে না।"[৪] তিনি আরও বলেছেন, "যখন তোমরা বিছানায় [ঘুমাতে] যাবে তখন আয়াতুল-কুরসি পাঠ করো: 'আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর'—এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এই আয়াত তিলাওয়াতের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করা হবে, আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।[৫]

৬. পড়াশোনা আমাদের ঘরের এক চলমান প্রক্রিয়া

এই দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে ঘরের মূল কর্তার। তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তিনি তার পরিবারকে সঠিক পথে চালিত করছেন: ভালো কাজের আদেশ দিচ্ছেন, মন্দ কাজে নিষেধ করছেন। পরিবারের সব সদস্যের উপর জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। জ্ঞানের ভিত্তিতেই সতেজ হয়ে ওঠে ঈমান। ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত সদস্যদের দিয়ে একটি পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখান থেকে পরিবারের সব সদস্য উপকৃত হতে পারবে। এসব পাঠচক্রে

অংশগ্রহণের জন্য শিশুদের বিশেষভাবে উৎসাহ দিতে হবে। তাতে করে তারা এতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে তাদের জীবনেও তারা এর বাস্তবায়ন করবে।

৭. আমাদের ঘরে ইসলামিক লাইব্রেরি আছে

এসব লাইব্রেরিতে স্থান পেতে পারে বই, ইসলামি ক্যাসেট ও সিডি। পরিবারের সদস্যরা যেন উপকৃত হতে পারে সেজন্য এসব বই ও সিডির বিষয়বস্তুগুলো সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি। বইপত্র ও সিডির সংগ্রহ বৈচিত্রময় হওয়া উচিত। এতে করে পরিবারে ছোট সদস্য থেকে শুরু করে বড়রাও লাইব্রেরি থেকে পছন্দমাফিক বই বা সিডি বাছাই করে নিতে পারবে। পরিবারের সদস্যদের উপযোগী বিভিন্ন ভাষার বই/সিডি রাখা যেতে পারে। আরবি বই বা সিডি তো অবশ্যই থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের কুর'আনের ভাষা জানতে হবে। না জানলে শেখার প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে। আর বইগুলো হতে পারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সহজেই যেন বিষয়মাফিক বই খুঁজে পাওয়া এ জন্য ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে হবে। সিডিগুলো হতে পারে কুর'আন তিলাওয়াতের উপর, ইসলামি লেকচার, খুতবা, ছোট শিশুদের জন্য দু'আমূলক ও আদবকায়দা শেখানোর সিডি, নাশীদ (বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া ইসলামিক গান) ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যদের একে অপরকে প্রতিনিয়ত এসব বই ও সিডি ব্যবহার করতে উৎসাহ দিতে হবে। অন্যান্য যেসব মুসলিম পরিবারে এগুলো প্রয়োজন তাদের সাথে এসব বই ও সিডি শেয়ার করতে হবে।

৮. নাবি মুহাম্মাদের মতো নৈতিকতা ও আদব বজায় রাখার চেষ্টা করি

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোনো বাসার লোকদের প্রতি আল্লাহ যখন ভালো কিছু ইচ্ছে করেন তখন তিনি তাদের মধ্যে দয়া ছড়িয়ে দেন।"[৬] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ দয়াশীলতাকে ভালোবাসেন। দয়াশীলতাকে আল্লাহ এমনভাবে পুরস্কৃত করেন যেমনটা আর কিছুর জন্য করেন না।"[৭] নাবি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া, মানুষের সঙ্গে তার সদাচরণের অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে যেগুলো আমরা অনুকরণের চেষ্টা করতে পারি। স্ত্রীদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই খেলতেন। ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করার জন্য প্রায়ই তিনি তাদের সাহায্য করতেন। এভাবে তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে আমরা আমাদের বাসাকে পরিণত করতে পারি শান্তির নীড়ে।

৯. বাসাসংক্রান্ত ইসলামিক বিধানগুলো আমরা জানি

যেমন ঘরের গোপন কথা বাইরে না বলা, ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া, অন্যের বাড়িতে উঁকিঝুঁকি না দেওয়া, দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে বাবা-মা'র বিছানার ঘরে সন্তানদের প্রবেশ করতে না দেওয়া এবং রাতে একাকী বাইরে না-থাকা। শেষেরটি খুবই কৌতূহলউদ্দীপক কেননা, অনেক স্বামীকে ব্যবসা কিংবা কাজের জন্য মাঝেমধ্যে বাড়ির বাইরে থাকতে হতে পারে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে নিরুৎসাহিত করেছেন। ইব্ন 'উমার থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, রাতে যেন কেউ একা না থাকে কিংবা একাকী ভ্রমণে না বের হয়। [৮] একা একা রাতে থাকলে সে তো একা থাকবেই, তার স্ত্রী-বাচ্চারাও কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই বা সঙ্গীবিহীনভাবে একা পড়ে থাকবে।

১০. আমরা আমাদের ঘরে ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করি

“আমার প্রভু! আমাকে ও আমার বাবা-মাকে ক্ষমা করুন। এবং বিশ্বাসী হিসেবে আমার ঘরে যে প্রবেশ করে তাকেও ক্ষমা করুন। আরও ক্ষমা করুন সব বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের।” [৯] ঘরে ন্যায়নিষ্ঠ মানুষদের নিয়মিত উপস্থিতি ও তাদের সাথে কথোপকথন প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে। এ ধরনের মানুষেরা কল্যাণকর বিষয়েই বেশি কথা বলবে। কল্যাণকর জ্ঞান ও তথ্যের জন্য তারা হতে পারেন অনন্য উৎস। আমাদের সবসময় এই দু'আ করা উচিত আল্লাহ যেন আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব দিয়ে অনুগ্রহ করেন। নাবি সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কেবল বিশ্বাসীদের সাথে সাহচার্য রাখবে। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।” [১০]

১১. আমাদের ঘরে মন্দ কিছু নেই

আমাদের ঘরে কোনো টেলিভিশন নেই, কোনো হারাম বাদ্যবাজনা আমাদের ঘরে বাজে না। (শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ঘরে টেলিভিশন থাকতে পারে।) ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোতে কোনো প্রাণীর ছবি নেই। মূর্তি কিংবা ভাস্কর্যের মতো কিছু ঘরে নেই। ঘরে কুকুর নেই, ধূমপান নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত আড়ম্বর এড়াতে আমাদের ঘরের সাজসজ্জা খুবই সাধারণ। শুধু ভালো কাজেই টেলিফোন কিংবা মোবাইল ব্যবহৃত হয়; পরনিন্দা বা পরচর্চার উদ্দেশ্যে নয়। কেউ বেরাতে এলে, পুরুষ ও নারীদের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা। উপরোক্ত জিনিসগুলো ঠিকঠাক রাখা না হলে তার খারাপ প্রভাব বাড়ির উপর পড়বেই। উদাহরণস্বরূপ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ঘরে ছবি টাঙানো থাকে কিংবা কুকুর থাকে ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করে না।” [১১]

১২. আমাদের বাড়ির অবস্থানও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালনে সহায়ক

বাসা যদি মাসজিদের আশেপাশে হয় তাহলে বাড়ির পুরুষদের জন্য মাসজিদে সলাত পড়তে খুব সুবিধা। মাসজিদে যদি নিয়মিত হালাকা, কুর'আন শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম চলে তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এতে সহজেই যোগ দিতে পারবে। বাসা এমন জায়গায় নিতে হবে যেন আশেপাশেও মুসলিম পরিবার থাকে। নিকট প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে; পাপপরায়ণ প্রতিবেশী থেকে দূরে থাকতে হবে। বাসা নেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে নারী ও পুরুষদের জন্য যেন আলাদা বসার ব্যবস্থা থাকে। বাড়ি হতে হবে প্রশস্ত। নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যেন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

আপনার স্কোর কত?

উপরের দেওয়া ১২টি পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে দেখুন আপনার স্কোর কত?

১০-১২: অভিনন্দন। আপনার ঘর প্রকৃত অর্থেই ইসলামিক ঘর। সঠিক পথেই আছেন আপনি।

৭-৯: ভালো। তবে আপনার ঘরকে প্রকৃত ইসলামি ঘর হিসেবে গড়ে তুলতে আরও একটু কাজ করতে হবে। আল্লাহর সাহায্যে সেই কাজটা তেমন কঠিন হবে না।

৪–৬: খারাপ। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের জন্য আপনাকে ও আপনার পরিবারকে অনেক কাজ করতে হবে। পরিবারের অনেক দিক বদলানোর দিকে নজর দিতে হবে।

০–৩: খুব খারাপ। খুব বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার আপনার ঘরকে ইসলামি ঘর হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য।

[১] সূরাহ আন-নাহ্‌ল, ১৬:৮০

[২] মুসলিম

[৩] স়াহীহ় আল-জামি

[৪] স়াহীহ় আল-জামি

[৫] বুখারি

[৬] আহ়মাদ, স়াহীহ় আল-জামি

[৭] মুসলিম

[৮] আহ়মাদ

[৯] সূরাহ নূহ, ৭১:২৮

[১০] আবূ দাঊদ, আত-তিরমিযী

[১১] বুখারি

সৎ এবং সাহসী মানুষ

4 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

১।

জোন অফ আর্ক, ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি, উসামা বিন জায়েদ- এরা ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে জন্মেছে এবং বেড়ে উঠেছে। কিন্তু এদের মাঝে রয়েছে এক বিরল সাদৃশ্য। এরা প্রত্যেকেই জাতির সংকটময় মূহূর্তে নিজ নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে অকল্পনীয় পরিস্থিতির ভেতর বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এদের আরেকটা মিল হোল ওরা সবাই ছিল টিনেজার- early teenager. অথচ তাদের বোঝার ক্ষমতা, মেধা, যোগ্যতা,

দায়িত্বশীলতা ছিল অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পরিপক্ক লোকজনকে পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট। আজ পৃথিবীর কোথাও কি আমরা এমন একজন টিনেজার খুঁজে বের করতে পারব?

আমাদের টিনেজারদের দোষ নয়- তাদের বাবারা কলের ইঁদুরের মত টাকার পেছনে ছুটছেন, পরিবারকে এনে দিচ্ছেন সকলপ্রকার ধনসম্পদ প্রাচুর্য সম্ভার কিন্তু সন্তানের গঠনপ্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ করার সময় নেই; মায়েরা স্বাভাবিকভাবেই অনুভূতিপ্রবণ এবং সন্তানের কল্যাণকামী, কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে সন্তানকে আগলে রাখার প্রবণতা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যা তাকে পঙ্গু করে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আর স্বামী যখন সর্বদাই অনুপস্থিত তখন মায়ের এই অতিরিক্ত protectiveness সন্তানকে কি জোন অফ আর্ক বা বখতিয়ার খিলজি বানাবে না ভিডিও গেমে পুরো পৃথিবীকে কুপোকাত করে ফেললেও বাস্তব পরিস্থিতিতে অকেজো করে ফেলবে তা সহজেই অনুমেয়।

২।

মিশরের প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ ফেরাউন, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মহান অধিপতি, ধনৈশ্বর্য্যের কোন ঘাটতি নেই তার রাজ্যে, চারিদিকে গড়ে উঠছে বিশাল বিশাল পিরামিড তার নিজের এবং পূর্বপুরুষদের ক্ষমতার দম্ভের স্তম্ভ হিসেবে, রাজপ্রাসাদে উপচে পড়ছে সুখের সমস্ত আয়োজন- কিন্তু সে সুখি নয়, কারণ সারা পৃথিবী স্ত্রীর পদতলে উজার করে দিলেও তার স্ত্রীর কাছে তার ক্ষমতা এবং অহংকারের কোন মূল্য নেই। স্ত্রী আসিয়া তাকে মুখের ওপরেই বলে- এই ক্ষমতার উৎস অত্যাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই প্রাসাদ আর পিরামিড দরিদ্রের অধিকার কেড়ে নিয়ে গড়ে তোলা, সে এর কোন অংশই চায়না, সে ফেরাউনকে দেবতা বলেও স্বীকার করেনা বরং সে আল্লাহর কাছে জান্নাতে একটি ঘর চায়। চূর্ণবিচূর্ণ অহংকারে, রাগে, ক্ষোভে ফেরাউন প্রিয়তমা স্ত্রীকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে চুবিয়ে মারে। আসিয়া একে ফেরাউনের সাথে বসবাসের চেয়ে শ্রেয় মনে করে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে নেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদী এবং জীবনের প্রতি নির্মোহ মহিলা আজকে ক'জন পাওয়া যাবে?

আজকের নারী অপরিচিত পুরুষের মুখে সামান্য একটু প্রশংসা শোনার জন্য নির্দ্বিধায় পোশাক খুলে ফেলছে, সামান্য ক'টা টাকার জন্য বিকিয়ে দিচ্ছে নিজের সর্বস্ব, বাবা মা মেয়েকে মডেল বা অভিনেত্রী পরিচয় দিতে পেরে গর্বে বুক ফুলে ফেটে পড়ছেন- তারা কি জানেন না এর জন্য তাদের সন্তানটিকে কি কি করতে হচ্ছে? আজ একটা মেয়ের স্বপ্ন হয় ছোট্ট একটা ঘর, ছোট্ট একটা গাড়ী, স্বামীর ভাল চাকরী, ছোট্ট সুখের সংসার- হায়! ক'জন স্বপ্ন দেখে জান্নাতে একটি বাড়ীর?

৩।

বিখ্যাত সেনা কমান্ডার হ্যানিবলকে যখন খবর দেয়া হোল সামনে আল্পস পর্বত, এর ওপর দিয়ে কিছুতেই হাতি পার করা যাবেনা, তিনি বললেন, *'I will either find a way or make one'.*

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলতেন, *'Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools'.*

তারিক বিন জিয়াদ অনিচ্ছুক সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার পথ রোধ করার জন্য জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের বললেন, '

We now have the enemy in front of us and the deep sea behind us. We cannot return to our homes, because we have burnt our boats. We shall now either defeat the enemy and win or die a coward's death by drowning in the sea. Who will follow me?'

আজকের যুদ্ধটা একটু অন্যরকম।

সৎভাবে উপার্জন করার কথা বললে একজন পুরুষ বলেন, 'তাহলে আমার সংসার চলবে কি করে?'

জীবিকা এবং পরিবারের মাঝে সময় বন্টন করে দেয়ার কথা বললে বলেন, 'দিনটা মোটে ২৪ ঘন্টার, এর মধ্যে এত কিছু কি করে ম্যানেজ করা সম্ভব?'

অন্যায় avoid করার জন্য চাকরী পরিবর্তন করার কথা বললে আঁতকে ওঠেন, 'এই দুর্মূল্যের বাজারে চাকরী ছাড়লে আবার চাকরী পাবার নিশ্চয়তা কি?

তাদের একবারও কি মনে আসে, সন্তানকে অন্যায়ের ভিত্তির ওপর খাইয়ে পরিয়ে বড় করলে সে সৎ এবং সাহসী মানুষ হবে তার নিশ্চয়তা কি?

৪।

একজন মুহাম্মাদ, যেদিন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সেদিন অসম্ভব ভয় পেয়ে গেলেন, নিজের ওপরেই আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তখন একজন খাদিজা তাকে আশ্বস্ত করলেন, একজন সৎ ব্যাক্তিকে কোন অন্যায় স্পর্শ করতে পারেনা, এবং জগতশ্রেষ্ঠা চার নারীর একজন হয়ে গেলেন। একজন আবু বকর দৃঢ়চিত্ত রইলেন, যে কোনদিন মিথ্যা বলেনি সে চল্লিশ বছর বয়সে মিথ্যা বলা শুরু করতে পারেনা তা তার কথাবার্তা যতই অবিশ্বাস্য শোনাক না কেন। একজন কিশোর আলী নেতৃস্থানীয় লোকদের পাহাড়প্রমাণ তাচ্ছিল্যের সামনে বুক চিতিয়ে বলল, 'আপনার পাশে আর কেউ না থাকলেও আমি আছি'। একজন উমার সত্যের স্পর্শে এক মূহূর্তে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। এভাবে একজন একজন মানুষ এক একটি বিশেষ মূহূর্তে এগিয়ে এসে সারিবদ্ধ হয়ে একটি সম্পূর্ন পৃথিবীতে পরিবর্তনের ঢেউ ছড়িয়ে দিল। এভাবেই এক একজন মানুষ শুধু নিজের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে ভাবার মাধ্যমেও পুরো পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। প্রশ্ন হোল আমরা ব্যাক্তি হিসেবে নিজের দায়িত্বের কথা ভাবছি কিনা।

৫।

পরিবারে সবার বড় ছিলাম। যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখসমরে অভ্যস্ত। তাই পরিস্থিতি যতই প্রতিকুল হোক, নৈরাশ্যবাদের বিলাসিতার সুযোগ হয়নি কখনো, রঙ্গিন চশমাও আঁটা হয়নি চোখে। জীবনকে দেখি প্রখর বাস্তবতার স্পষ্ট আলোয়।

আজকের পৃথিবীতে সৎ নেতার অভাব, সাহসী লোকের অভাব– নেতারা জনগণকে বিনোদনের রঙ্গিন চশমা পরিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে যেন সে সুযোগে তারা ইচ্ছেমত করতে পারে, তারা কখনোই চাইবেনা সমাজের সব সমস্যার সমাধান

হয়ে যাক, কারণ তখন সবাই তাদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাবে; সংসারের ঘানিটানা জনগণের মাঝে জেগে ওঠার সাহসের অভাব, স্বপ্ন দেখার সাহসের অভাব, যদি স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তার চেয়ে কল্পনার রঙ্গিন জগতে বসবাস করা সহজতর!

কিন্তু আসল অভাবটা অন্য জায়গায়। একটি সমাজ অনেকগুলো পরিবারের সমষ্টি। এই পরিবারকে গড়ে তোলেন একজোড়া পিতামাতা। একজন পিতা তার সন্তানকে শেখাবেন কিভাবে মাছ ধরতে হয়, কিভাবে শিকার করতে হয়, কিভাবে নদীতে সাঁতার দিতে হয়, কিভাবে নৌকা বাইতে হয়, কিভাবে গাড়ী চালাতে হয়, কিভাবে চাষ করতে হয়, কিভাবে বাজার করতে হয়, কিভাবে নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখতে হয়– এই দায়িত্বগুলো একজন মাকে দিয়ে হয়না। বাবা যদি সময় দিতে ব্যার্থ হন তখন সন্তানের পৌরুষসূচক গুণাবলীতে ঘাটতি রয়েই যায়। একজন মা সন্তানকে শেখাবেন আদবকায়দা, ভদ্রতা, কোমলতা, গৃহের প্রতি দায়িত্ব, পরিবারের সদস্যদের প্রতি সদাচরন এবং তিনিই সন্তানকে শেখাবেন একবার পড়ে গেলে কিভাবে আবার উঠে দাঁড়াতে। মা যদি সময় বা সাহস দিতে ব্যার্থ হন তখন এই সন্তান যতই আদরযত্নে বেড়ে উঠুক না কেন তার এই দিকগুলো বিকশিত হবার সুযোগ পায়না।

আজকের ছেলেমেয়েরা বড় হয় ফার্মের মুরগীর মত করে– ফার্মের মুরগীর মতই তাদের কেবল দেহটা বাড়ে, কিন্তু তাদের বোধবুদ্ধিতে প্রসার ঘটেনা। ফলে এরা বড় হয়ে চাকরীবাকরী করে খেয়েপরে চলতে পারে, এর বেশি আর কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়না। এদের দিয়ে সমাজপরিবর্তন তো দূরে থাক, সমাজের উপকার হবারও কোন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়না। তাই আজকাল একটি কিশোর তার ফ্লাস্ক থেকে ভিক্ষুকের গ্লাসে পানি ঢেলে দিচ্ছে দেখলে আমরা আপ্লুত হই, কেউ রাস্তায় টাকা পেয়ে মালিককে ফিরিয়ে দিলে অবাক হই, কেউ শালীনভাবে চললে তার প্রশংসা করি– আমাদের মাথায় এটা আসেনা যে এগুলো তো স্বাভাবিক মানবিকতার সর্বনিম্ন পর্যায়! অথচ পৃথিবীব্যাপী মানুষ পশুবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পন করছে; সামান্য ক'টা টাকার জন্য আমাদের আশেপাশেই মানুষ খুনজখম স্মাগলিং রাহাজানি ছিনতাই করছে; মানুষ মানুষকে মেরে ফেলছে, মাতৃগর্ভে শিশু পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছেনা– আর আমরা কি করছি? আমরা পেপার পড়ে মুখে 'চু চু' শব্দ করছি, নতুবা টিভিতে এই বীভৎসতা দেখে চ্যানেল পরিবর্তন করে দিচ্ছি, চায়ের কাপে ঝড় তুলে নাচগানের অনুষ্ঠানে ডুবে যাচ্ছি। ব্যাস, আমাদের দায়িত্ব শেষ! তাই ভাবি, পৃথিবীতে হয়ত এখন আর সৎ এবং সাহসী মানুষজন জন্মায়না– তাদের ধারণ করার মত মা এখন আর নেই, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার মত বাবা এখন আর নেই, তাদের গ্রহণ করার মত সমাজ এখন আর নেই, তাদের মূল্যায়ন করার মত নেতৃত্ব এখন আর নেই। এটা নৈরাশ্যের কথা নয়, এটাই বাস্তবতা।

রূপকথা জেনারেশান !!!

29 September 2014

লেখকঃ নায়লা নুযহাত

মেয়েকে যখন কুরআনের গল্পগুলো বলি, প্রায়ই মনে হয় যে ভবিষ্যতের কথা তো জানিনা, কিন্তু এদের বর্তমানটা দেখলে অবাক লাগে। ও এবং ওর মত আরও অনেকে বড় হচ্ছে মাথাটা রূপকথা দিয়ে ভর্তি না করে!! সুবহানআল্লাহ!

পড়ার অভ্যাস আজীবন ছিল, তাই ছোট বয়সটায় হাতের কাছে পাওয়া কোনও রূপকথার বই পড়া বাদ দিইনি। ঠাকুমার ঝুলি, ইউক্রেনের বই, রুশ বই, অমুক দেশের রূপকথা আর তমুক দেশের রূপকথা আর ফেইরি টেলস তো আছেই। আর বড় হতে হতে আরও কত কি!!

তাই আমি জানি, রূপকথা হল রূপকথাই। বাস্তব কোনদিন ওর ধারে কাছেও যায়না। বরং ওসব শিখিয়ে দেয় জীবনের অন্য এক লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য-- "এই পৃথিবীতে চিরসুখে বসবাস করা" যা কখনও সম্ভব না। প্রায়ই যখন নিজেকে দেখি, অন্যকে দেখি, জীবনে এটা সেটা নিজেদের মনমত না হয়াতে হতাশ হতে, অথবা শুনি কেউ রেজাল্ট খারাপ করে আত্মহত্যা করছে অথবা প্রেমে বিফল হয়ে, অথবা জীবনের জটিল পর্বগুলোতে দিশেহারা হচ্ছে, তখন মনে পড়ে আমাদের থেকে এর চেয়ে ভালো আর কী হবে, আমরা হচ্ছি "রূপকথা জেনারেশান"!!!

এই বাচ্চাগুলি আল্লাহর অশেষ রহমতে জানেনা এখনো যে একা একা গভীর রাতে বেড়িয়ে ফিরলেও রাজকুমার আসে বাঁচাতে (বাস্তবে রাজকুমারের হাত থেকে বাঁচানোটা আরেক দুশ্চিন্তা!) এরা এখনো জানেনা যে সাতটা বামুন লোকের সাথে নিশ্চিন্তে(!!!)এক বাসায় থাকা যায়। শুনতে খারাপ লাগছে, তাই না? কি জানি! যখন পড়েছি, কার্টুন দেখেছি তখন তো খারাপ লাগতো না, মনে হত ওটাই লাইফ!!!

এবং আমার একান্ত নিজের একটি ধারণা যে এই বাচ্চাকালের আজগুবি গল্পগুলো টিনেজ বয়সে মারাত্মক প্রভাব ফেলে!! কল্পনার জগতের ভিত্তিই যে রূপকথা!!

যাই হোক, পাঁচ বছর বয়সে আমাদের তো কেউ কুরআনের গল্প বলেনি-- কুরআন যেহেতু গিলাফে ভরে শেলফে রাখার জিনিস(!!!) তাই! মেয়েকে বলতে গিয়ে নিজেও জানছি। সুবহানআল্লাহ, এত চমৎকার বাস্তব সব কাহিনী থাকতে কী প্রয়োজন বাচ্চাদের মাথায় গারবেজ ঢুকানোর???

একটা বাচ্চা জেনে বড় হতে পারে যে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য চিরসুখীই হওয়া, কিন্তু আখিরাতে যেখানে তা আসলেই সম্ভব!! জেনে বড় হতে পারে যে তার এমন আশ্রয় আছে যিনি ইব্রাহীম (আ) কে আগুন থেকে বাঁচাতে পারেন, হারানো ইউসুফকে (আ) তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন। যিনি আমাদের কথা শুনতে পান, কেউ আমাদের জন্য না থাকলেও তিনি থাকেন!! জেনে বড় হতে পারে জীবনটা সিনেমা না, এতে কষ্ট আছে, বিপদ আছে, না পাওয়া আছে-- কারণ জীবনটা সামান্য একটু সময় মাত্র। চিরসুখী হওয়ার জন্য যথেষ্ট বড় না!!

আপনি ধার্মিক না?? সমস্যা নেই! তবু বাচ্চাদের কুরআনের গল্প, ইসলামের গল্পগুলো বলুন। অন্তত মস্ত ফাঁকিকে সত্যি বলে জেনে বড় হবে না ইনশাআল্লাহ! ইংরেজি শেখানো দরকার? ইংরেজিতে চমৎকার বই পাওয়া যায় ইসলামের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা সহ, ছবি সহ!! ইন্টারনেটে অনেক কিছু পাওয়া যায়!!!

ওরা বড় হয়ে কী হবে সেতো আল্লাহই ভালো জানেন। আমাদের কাজ চেষ্টা করা আর দোয়া করা!! আর ওদের মাথায় আকাশ কুসুম কল্পনা ঠেসে দিয়ে বাস্তব থেকে দূরে নিয়ে এক অদ্ভুত অসুস্থতায় যদি বড় করি, তার হিসাব কিন্তু আমাদেরই দিতে হবে!! দুনিয়াতে এবং আখিরাতে! আল্লাহ যেন সেই ভয়াবহ কষ্ট থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন, আমাদের সন্তানদেরও! আমীন!

দেবী উপাখ্যানঃ সেকাল-একাল

21 October 2014

লেখকঃ সিফাত মেহযাবিন

আমার মেয়ের স্কুল কারিকুলামে এই বছর একটি সাবজেক্ট যুক্ত হয়েছে, World Ancient Culture। যারা সাইন্সে মেজর করতে চায় তাদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক সাবজেক্ট। খুবই আনন্দ আর আগ্রহ নিয়ে সে এই সাবজেক্ট পড়া শুরু করেছে। প্রথমে তারা শুরু করেছে ইজিপ্সিয়ান কালচার। আমাকে মাঝে মাঝে হাইরোগ্লিফিক লেখা শেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। আর নতুন কিছু শিখলেই হল, আমাকে তো তার বলা চাই ই চাই (স্কুলের গেট থেকেই বলা শুরু করে)। দুই সপ্তাহ আগে মুখ অন্ধকার করে এসে বলল, "মা, আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন করতে হবে ইজিপ্সিয়ান এক দেবীর উপর, মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেছে"।

আমি একটু অবাকই হলাম কারণ, আমি যতটুকু জানি সে এই সাবজেক্টটা পছন্দ করে। আমি বললাম, "কেন, সমস্যা কি? তোমার কি আর Ancient Culture ভালো লাগছে না"? সে উত্তরে বলল, "আরে না, সাবজেক্ট তো ঠিকই আছে, যার সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন করতে হবে সেই নুত দেবীর মধ্যে বিরাট সমস্যা আছে, তোমার ভাষায় 'নুত দেবীর চরিত্র, ফুলের মত পবিত্র' "! আমি হেসে বললাম, "ঘটনা কি?" সে চরম বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, "ঘটনা তো তোমাকে বলবো, তার ছবিও দেখাবো। কিন্তু তুমি তো মাত্র অজু করে এসেছ, আগে এশার নামায পড়ে আসো। তানা হলে এই মহিলার ছবি দেখলে আর গল্প শুনলে সম্ভবত তোমাকে আবার অজু করতে হবে!" কিছুক্ষণ পর যখন আমার মেয়ে আমাকে এই 'দেবীর' সবচেয়ে 'ডিসেন্ট' ছবিটা দেখাল এবং তার 'কর্মমুখর' জীবনের গল্প বলল, তখন আমি বুঝতে পারলাম 'অজু বিষয়ক' কথাটা সে খুব একটা ভুল বলেনি!

সংক্ষেপে দেবী নুতের গল্প নিম্নরূপঃ

ইজিপ্সিয়ান দেবী নুত [nout] (Godess of Sky and star)। তার সাথে তার ভাই গেব [geb] (god of earth) এর গভীর প্রণয় চলছে (আস্তাগফিরুল্লাহ)! তাদের বাবা শো [sho] (god of Air) যখন সেটি জানতে পারে, তখন স্বভাবতই চায় না যে তাদের ভাইবোনের ভেতর এই সম্পর্ক হোক। সে তাদেরকে বলল তারা যেন ৩৬০ দিন (তখন ৩৬০ দিনে বছর ছিল!) আলাদা থাকে। বাবার কথায় নুত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে থট [thot] (god of time) এর কাছে গেল সমাধানের আশায়। সে (নুত) সময়ের দেবতা থট কে একটি ডাইসের খেলায় চ্যালেঞ্জ করলো এবং বলল যদি সে খেলায় জিতে যায় তাহলে বছরে আরও ৫ দিন যোগ করে ৩৬৫ দিন করতে হবে। থট এই খেলায় নুতের কাছে হেরে গেল তাই বাধ্য হয়ে ৩৬৫ দিনে বছর ঘোষণা করতে বাধ্য হল। নুত বছরের বাকি ৫ দিন তার ভাইয়ের সাথে সহবাস করে ইসিস [isis] (godess of death & divinity of mother), অসিরিস [Osiris] (god of fertility and crop), সেথ [seth] (god of thunder & strom), এবং নেফথিস [nephtys] (godess of mourning) নামক ৪ টি বাচ্চা প্রসব করে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)! [ভারতীয় উপমহাদেশের পিরালী ব্যবসায় সম্ভবত ইজিপ্সিয়ান কালচার এর

কিছু ছোঁয়া আছে। পীরের ছেলেমেয়ে যেমন পীরজাদা/পীরজাদী হয়, তেমন গড আর গডেস এর বাচ্চা-কাচ্চাও 'পারিবারিক ব্যবসা' ধরে রাখে! বর্তমানে মাশা'আল্লাহ রাজনীতিতেও এর ছোঁয়া লেগেছে!!]

আমার মেয়ে কিছুক্ষন পর বলল, "জানো মা, আমার মনে হয় আগের দিনে মানুষের মাথায় বুদ্ধি খুবই কম ছিল। তা না হলে এই রকম 'গারবেজ ক্যারেক্টার' দের কেন তারা দেব-দেবী হিসাবে মেনে নিবে এবং এদের পুজা করবে? আমার মনে হয় না যদি কারো মাথায় সামান্য গ্রে-ম্যাটার (ব্রেইন) থাকে তাহলে সে কক্ষনই এমন morality ছাড়া ক্যারেক্টারদের পুজা করবে"। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, আসলে কি তাই? এখন কি আমাদের মাথার বুদ্ধি অনেক বেশী হয়ে গিয়েছে? আমার মেয়েকে তখন বললাম, "খেয়াল করে দেখ মা, তোমাদের স্কুলের অল্প কিছু student ছাড়া বাকি সবার ব্যাগ, ফাইল, পেন্সিল কেস, জিএসএম বা আইফোন এর কাভার- সব কিছুর গায়েই High school musical, The Twilight Saga, Justin Bieber, Hannah Montana ইত্যাদি সিনেমা বা সিরিজ গুলির নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকার ছবি। ভাগ্যিস তোমাদের স্কুলে ইউনিফর্ম ছিল, তা না হলে কাপড়-চোপড়-জুতাও বাদ থাকতো না। এদের নৈতিক চরিত্রের অবস্থা কি সেটা তো তুমি জানই, তাই না? আরও দেখ, মেরেলিন মনরো থেকে ম্যাডোনা এমনকি হালের হানা মন্টানা খ্যাত মাইলি সাইরাস, কিম্বা সোফিয়া লরেন, লিজ টেইলার ইত্যাদি হলিউড সুপার স্টাররা কোন পথ অবলম্বন করে সুপার স্টার হয় সেটা তো কারো অজানা নয়। এমন কোন অসামাজিক কর্মকাণ্ড নাই, যা তারা করে নি বা করছে না। তারপরও তারা এক শ্রেণীর মানুষের হার্ট থ্রব। তাদের পোষ্টার রুমের দেয়ালে ঝোলানো হয়। বহু টিন-এজার ছেলেমেয়ের রোল মডেল তারা। শয়নে-স্বপনে-জাগরনে তাদের মত হওয়ার স্বপ্ন দেখে তারা। ব্যক্তি পুজাও তো এক ধরনের পুজা, তাই না? তোমার কি মনে হয়, এই সব মানুষের মাথায় গ্রে-ম্যাটার কম ছিল বা আছে?

তুমি বোধহয় জানো না, ইনডিয়াতে অনেক বলিউড নায়িকাদের নামে মন্দির পর্যন্ত আছে। সেখানে তাদের পুজা হয়! বাংলাদেশে যদিও এখনো নায়িকাদের নামে মন্দির তৈরি হয় নাই, কিন্তু সেই বলিউড নায়িকাদের কেউ যদি এখন বাংলাদেশে যায় এবং আধ ঘন্টাও বাংলাদেশে থাকে তাহলে তাকে একনজর দেখার জন্য ১০০ ইউরো বা তার চাইতেও বেশী দিয়ে টিকেট কেনার লোকের অভাব হবে না। এমনকি গত ঈদে পর্ণ স্টারের নামে বাংলাদেশের বাজারে ড্রেস বিক্রি হয়েছে এবং বাবা-মা তাদের মেয়েদের খুশি মনে সেই ড্রেস কিনে দিয়েছে, সুবাহান'আল্লাহ! কিছুদিন আগে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কিছু তারকার পারিবারিক হাল-চাল সম্পর্কে পড়লাম। যদিও মিডিয়ার ভাষায় তারা "আসলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন"; কিন্তু পারিবারিক জীবনে তাদের অবস্থা হল তারা "দেখলেন, ধরলেন এবং ছাড়লেন"! কিন্তু তারাও এক শ্রেণীর মেয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের নয়নের মণি! তাদের মত ক্যারিয়ার পাবার জন্য এক শ্রেণীর অভিভাবক তাদের মেয়েদের সকালে গান, দুপুরে নাচ, বিকালে আবৃত্তি আর সন্ধ্যায় অভিনয় শেখায়। যদিও আমরা সবাই জানি, অধিকাংশ সুপার মডেল, নায়িকা, গায়িকা আর নর্তকীদের (যদি তাদের অপমৃত্যু না হয়) মধ্যবয়সের ঠিকানা হয় আস্তাকুঁড়! তারপরও জেনে বুঝে তারা তাদের মেয়েদেরকে Sewerage system এর ভেতর ঠেলে দেয়, যেখানে বিড়ালের খাবার বিক্রির এডের জন্যও তারা উলংগ হয়ে নাচে।

সেই যুগ আর এই যুগের ভেতর পার্থক্য শুধু একটাই, সেই যুগে দেবী বানানো হয়েছিল মিথ্যা ধর্মের মোড়কে সাজিয়ে আর আজকের যুগে দেবী বানানো হয়েছে সংস্কৃতি ও কালচারের মন ভোলানো মোড়কে সাজিয়ে। ব্রেইন বা গ্রে ম্যাটার শুধু মাথার ভেতর থাকলেই হয় না, তাকে ব্যবহার করতে জানতে হয়। সেই যুগেও অধিকাংশ মানুষ সেটা ব্যবহার করে নাই, এই যুগেও করে না"!

বাচ্চাদের মন মানসিকতা ও বকা ঝকা !

29 September 2014

লেখকঃ নায়লা নুযহাত

একটা বই পড়ছিলাম, বাচ্চাদের মন মানসিকতার বিষয়ে। এখানে লেখক বলছেন যে কিছু বাবা মা তাদের বাচ্চাদের কিছুই বলেন না যখন তারা বেয়াদবি করে। ফলে বড় হয়ে বাবা মায়ের সাথেও তারা অমন করে। আর কিছু বাবা

মা আছেন যারা সন্তানকে মিলিটারি শাসনে রাখেন। লেখক বলছিলেন যে এই দুইটাই extreme পন্থা। আমরা যারা মুসলিম, বাচ্চাদের ব্যাপারে তাদের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করা উচিৎ। এবং অবশ্যই আল্লাহর রাসুল □ এর জীবন থেকে নেয়া উচিৎ উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে লেখক বলছেন যে কিছু মাত্রার অবাধ্যতা allow করতে। যেমন আল্লাহর রাসুল (সা) যখন একদিন বালক আনাস (রা) কে কোনও একটা কাজ করতে দেন, আনাস বলেন"আমি যাবো না!!"এই হাদিসের বর্ণনায় আনাস (রা) বলেন যে তিনি মুখে একথা বললেও মনে মনে ভেবেছেন যে যাবেন। (বাচ্চা বয়সের অবাধ্যতার স্বভাববশে বলেছেন ওই কথা।) তারপর বের হয়ে তিনি বাচ্চাদের খেলা দেখতে লাগলেন। হঠাত তিনি টের পান তাঁর মাথায় পেছনে কেউ হাত দিয়েছেন। ঘুরে তাকিয়ে দেখেন যে আল্লাহর রাসুল (সা) তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন। তারপর বলেন"উনাইস, এখন যাও আর যা করতে বলেছি করে এসো!!"আনাস (রা) তৎক্ষণাৎ তা করবেন বলে বলেন। উনাইস হল আনাস নামটির আদর দিয়ে ডাকা শিশু সংস্করণ।

লেখক আরেকটি হাদিসের উল্লেখ করেন যেখানে আব্দুল্লাহ ইবন বুসরা বলেন যে তাঁর মা তাঁকে যখন কিছু আঙুর দিয়ে আল্লাহর রাসুল (সা) এর কাছে পাঠান, বালক আব্দুল্লাহ সেটা নিয়ে না গিয়ে পথেই তা খেয়ে ফেলেন। যখন তাঁর মা আল্লাহর রাসুল (সা) কে জিজ্ঞেস করেন আঙুরের কথা তখন জানাজানি হয় সেগুলোর পরিণতি কী হয়েছিলো!! পরবর্তীতে আল্লাহর রাসুল (সা) তাঁকে দেখলে সহাস্যে বলতেন"Traitor!"এটা ছিল ছেলেটিকে বকা ঝকা না করে হাল্কা লজ্জা দেয়ার মাধ্যমে বুঝানো যে কাজটি সে ঠিক করেনি।

এই উদাহরণ গুলো দিয়ে তিনি বলছেন যে একটা পর্যায়ের অবাধ্যতা বাচ্চারা করবেই। সেটাকে উপেক্ষাও না করতে, আবার মিলিটারি শাসন না চালিয়ে মাঝামাঝি পথে চলতে। কখনো বুঝিয়ে, কখনো তাকে একটু সময় দিয়ে।

যেমন বাচ্চাকে খেতে ডাকার পর যদি সে না আসে, তাহলে তাকে পাঁচ মিনিট সময় দিতে। বলতে যে পাঁচ মিনিট পর তুমি না আসলে তোমাকে ঘুমানোর সময় গল্প বলা হবে না। এরপর সত্যি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে দেখতে হবে। তারপরও যদি বাচ্চা না আসে, তাহলে তাকে এনে খাইয়ে দিতে হবে এবং ঘুমানোর আগের গল্পও বলা হবে না। যেন বাচ্চাটি কথার মূল্য বুঝতে শেখে। কিন্তু মেরে ধরে এখন আসতে বলছি এই মুহূর্তে আসো, অথবা আচ্ছা শুনছে না যখন কী আর করবো থাকুক - এগুলো করা ঠিক না।

চাহিবামাত্র 'বাহককে' দিতে বাধ্য থাকবেন না !

28 September 2014

লেখকঃ সিফাত মেহযাবিন

কয়েক বছর আগের কথা। আমার মেয়েকে নিয়ে যেখানেই যাই, সে শুধু চাবির রিং কিনতে চায়! প্যারিস, হল্যান্ড, কোলন, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ---সুভ্যেনির শপে ঢুকলেই হল, চাবির রিং। প্রথমদিকে বেশি পাত্তা দেই নাই, যখন দেখি যে ৭-৮ টা চাবির রিং হয়ে গেছে অথচ কোন চাবি নাই, তখন ভাবলাম ঘটনা কি? অনেকভাবে জিজ্ঞেস করে যা জানতে পারলাম তা হল, তার এক বান্ধবী চাবির রিং জমায় এবং তার প্রায় ১০০ টার উপরে চাবির রিং আছে, সেইটা দেখে 'অনুপ্রানিত' হয়ে তিনিও চাবির রিং জমানো শুরু করেছেন! মাবুদ এলাহি!!

আমি তাকে তখন বললাম, "আচ্ছা মা, চাবির রিঙের কাজ কি?" সে বলল, "চাবি রাখা"। "তোমার তো একটাও চাবি নাই, এতোগুলি রিং দিয়ে তুমি কি করবে?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজ্ঞের মত বলল, "চাবি লাগবে না, আমি শুধু রিং জমাবো, সারাহ এর মত"। আমি চিন্তা করলাম, এই লাইনে গেলে তো হবে না, ভিন্ন রাস্তা ধরতে হবে। তার আবার কয়েনকে নোট বানানোর অভ্যাস আছে! ঈদের সালামী, পকেট মানি ইত্যাদি অতি আগ্রহ নিয়ে জমায় (আমার কাছেই রাখে, দরকার হলে নাকি চাইবে! আল্লাহই জানে কি করবে!?)। তখন তারা স্কুলে মাত্র গুন ভাগ শিখছে। আমি তাকে কয়েকটা অংক করতে দিলাম। ১) একটা চাবির রিঙের দাম যদি ৪.৭৫ ইউরো হয় তাহলে ১০৭ টা চাবির রিং কিনতে কত ইউরো লাগবে? ২) ১ লিটার দুধের দাম যদি ০.৭৯ সেন্ট/ ১ কেজি বাসমতী চালের দাম ১.৩৫ ইউরো/ ১ কেজি চিনির দাম ০.৯৫ সেন্ট হয় তাহলে, ... ইউরো দিয়ে কত লিটার দুধ/চাল/ চিনি কেনা যাবে? আল্লাহর অশেষ রহমত, অংকগুলি শেষ করার পর সে নিজে থেকেই বলল, "মা, সারাহ শুধু শুধুই এতোগুলি ইউরো নষ্ট করেছে, চাবির রিং গুলি তো কয়েকদিন পর নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু এই ইউরোগুলি যদি আফ্রিকার (এর কিছুদিন আগে তাদের স্কুল থেকে তারা যে যা পারে [কাপড়, খেলনা, বই, টাকা, পিসি ইত্যাদি] কঙ্গোতে পাঠিয়েছে) বাচ্চাদেরকে পাঠিয়ে দিত, তাহলে তারা কত খুশি হতো আর আল্লাহ তাকে কত প্লাস পয়েন্ট দিতো, আর বেহেস্তের বাগানে তাকে সুন্দর একটা ট্রি-হাউজ হয়ত বানিয়ে দিতো! তাইনা, মা?" সুবাহান'আল্লাহ! আমি তাকে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলাম!! চাবির রিং কেনা এর পর থেকে এমনি বন্ধ হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ!!!

বাচ্চাদের সাথে কথা বলার একটা খুব দরকারি বিষয় হচ্ছে জিনিশপত্র কেনাকাটার ক্ষেত্রে সংযম। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের বাসার নিয়ম ছিল পেন্সিল যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে সেটা এনে আম্মাকে দেখালে নতুন পেন্সিল দেয়া হবে, তার আগে না! বাংলাদেশের টাকায় যেমন লেখা থাকে "চাহিবামাত্র বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে", বর্তমান সময়ে বাবা-মা আর বাচ্চার সম্পর্ক যেন অনেকটা এমন হয়ে গেছে। আমরা বাচ্চাদের দরকারি-অদরকারি (মুখ দিয়ে বের করলেই হল) সব জিনিসই কিনে দেই। ছোট বাচ্চা (এমনকি বড় বাচ্চাও) যা কিছু তার কাছে ভাল লাগবে তাই চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিভাবক হিসাবে এটা আমাদের দায়িত্ব যে, একটা বাচ্চা কিছু চাইলে প্রথমে তার সাথে আলাপ করা দরকার এটা দিয়ে সে কি করবে, সে এটা কেন চাইছে, যে জিনিষটা চাইছে তার উপকারীতা ও অপকারিতাগুলো কি কি, জিনিসটি আদৌ তার প্রয়োজন আছে কিনা এবং এই টাকায় সে আর কি কি করতে পারে? এর মাধ্যমে সন্তানের সাথে যেমন অভিভাবকের কমিউনিকেসন বাড়বে, তেমনি তারা শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসবে। যদি সময় নিয়ে সুন্দরভাবে তাদেরকে বোঝানো যায় তাহলে ওরা স্বার্থপর হবার পরিবর্তে চাহিদা এবং প্রয়োজন এর মধ্যে তফাত করতে শিখবে, অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের ওপর অগ্রাধিকার দিতে শিখবে। চোখের বা মনের ক্ষুধার চেয়ে যে পেটের ক্ষুধা মেটানো বেশি প্রয়োজন সেটি তারা উপলব্ধি করতে পারবে, ইনশাল্লাহ।

ধোঁকা

3 November 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

কাজটা আমিও করি। হয়ত বাচ্চারা গন্ডগোলের চূড়ান্ত করছে, বলে দিলাম, 'তোমরা যদি কিছুক্ষণ নিজেদের রুমে চুপচাপ বসে থাক তাহলে আব্বু বিকালে বাইরে নিয়ে যাবে'। ঐদিকে বেচারা ঘরকুনো লোকটা জানেই না তার ওপর কি বিপদ আসন্ন।

বিবাহিত মাত্রেই কখনো না কখনো নিজের কথা স্বামী বা স্ত্রীর নাম দিয়ে চালিয়ে দেয়া একটা সচরাচর ব্যাপার– কখনো বাচ্চাদের শাসন করা জন্য, কখনো অনাকাংখিত দাওয়াত এড়িয়ে যাবার জন্য, কখনো স্রেফ নিজের দোষ ঢাকার জন্য। এটাকে তেমন একটা কেউ মিথ্যার মধ্যে ধর্তব্য বলেও মনে করেন না।

সৌভাগ্য হোল বাচ্চারা এই মিথ্যাগুলো ধরতে পারেনা তাই শাসন করার ক্ষেত্রে এটুকু leverage বেশ কাজে লাগে। অনেকক্ষেত্রে বাচ্চারা বাবা বা মা যাকে ভয় পায় তার কথা বলে তাদের সুপথপ্রাপ্ত করা যায়।

সামাজিক শিষ্টাচারের মধ্যে যে কিছুটা কপটতা থাকে তার অংশ হিসেবে অপ্রিয় বা অসম্ভব ব্যাপারে সরাসরি না বলা যায়না বা বলেও অনেক সময় পার পাওয়া যায়না। তাই একজন আরেকজনের নামে চালিয়ে দিলে মিথ্যা জেনেও কেউ কষ্ট পায়না, এটাকে আমরা বলি ভদ্রতা। অথচ কেউ সত্য বললে সবাই ভাবে অভদ্র। যেমন ক'দিন আগে- ঘুমোতে যাচ্ছি, প্রচন্ড ক্লান্ত, কি মনে করে যে কম্পিউটার খুললাম, আর খুলেই আটকে গেলাম। মেইল চেক করতে গিয়ে দেখি স্কাইপে মুহুর্মুহু কল আসছে। প্রথমে ঢাকা থেকে আমার সদ্যবিবাহিতা ননদিনী, ওর সাথে আমার খুব ভাব, তাই সরাসরি বললাম, 'ওগো, আমার আর শক্তি নেই, আরেকদিন কথা বলব'। রাগ করল কিনা জানিনা কিন্তু বিদায় জানিয়ে চলে গেল। তারপর চট্টগ্রাম থেকে কাকী, কিছু বলার আগেই জানালেন সারাদিন ধরে খুঁজছেন, এবার আর কোন ছাড়াছাড়ি নেই। মধ্যখানে কল এলো দাদার, অভ্র কিভাবে ডাউনলোড করতে হয়। কাকীকে হোল্ডে রেখে দাদাকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম কিন্তু দশমিনিট পর আর ধৈর্য্য রাখতে পারলাম না, দাদার কম্পিউটার স্ক্রীণ না দেখে instruction দিয়ে একটা আস্ত প্রোগ্রাম ডাউনলোড করানো... বললাম, 'দাদা, আজ আমি বড় ক্লান্ত, কাল সকালে করিয়ে দেব'। আবার কাকীর কাছে ফিরে এলাম, জানালাম ক্লান্ত, বললেন শুধু একটা প্রবন্ধের ব্যাপারে আলাপ করবেন, তারপর আমার ছুটি। তারপর একে একে কাকা, কাকীর ছেলে, আমার ছোট্ট ননদটা (কাকী আমার শ্বশুরবাড়ীর নিকটতম প্রতিবেশী)। যখন কথা শেষ তখন রাত সাড়ে বারোটা। ঘুমোতে যাচ্ছিলাম তখন রাত সোয়া দশটা। মাঝখানে তিনজনের সাথে অভদ্র ব্যাবহারের সার্টিফিকেট জোগাড় হয়ে গেল!

তবে এই পদ্ধতি সবচেয়ে প্রচলিত বিশেষ করে লেখাপড়া বা ধর্মীয় বিষয়ে অপারগতা জানানোর জন্য। প্রায়ই মহিলারা বলেন, 'বিয়ের পর আমার স্বামী আর আমাকে লেখাপড়া করতে দেননি'। সবার মাথায় নিশ্চয় ঐ হতভাগ্য মেয়েটির ছবি ভেসে উঠছে যার পাষন্ড স্বামী লেখাপড়া করার অপরাধে তার হাতের আঙ্গুল কেটে নিয়েছে। কিন্তু এটা exception, সচরাচর ঘটনা নয়। একজন পুরুষ যতক্ষণ অফিসে থাকেন ততক্ষণে একজন মহিলা ঘরের কাজ সেরে যদি সিরিয়াল দেখার বা ঘুমানোর সময় পান, তাহলে লেখাপড়ার সময় পেতে মানা করল কে? বইপত্র, পরীক্ষার ফিস? এমন পুরুষ কমই আছেন যারা বোঝেন না যে একজন সুশিক্ষিত স্ত্রীই গড়ে তুলতে পারে সুশিক্ষিত সন্তান। একজন পুরুষের যদি স্ত্রীর জন্য শাড়ি গয়না কিনতে টাকার অভাব না হয়, বই কেনার বেলা টাকার অভাব হয়ে যাবে এটা কিঞ্চিত বিচিত্র নয় কি? তাছাড়া বিয়ের পর তো একজন মহিলা বাবা, ভাই এর কাছেও পান আবার স্বামীর কাছেও পান। এরপর পড়াশোনা করতে না পারলে নিজের ইচ্ছার অভাবটাকেই মূখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং, অধিকাংশ ক্ষেত্রে excuseগুলো কেবল নিজের অনিচ্ছা বা চেষ্টার অভাব ঢাকতেই দেয়া। হ্যাঁ, অবশ্যই স্বামী যদি প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন তাহলে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া তুলনামুলকভাবে সহজ হয়, কিন্তু এর অভাব হলেও স্ত্রীর লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়ার মত প্রত্যক্ষ ভূমিকা মনে হয় কম লোকই পালন করেন।

একইভাবে দেখা যায় স্বামীরা দাড়ি রাখার ব্যাপারে বলে থাকেন, 'আমার স্ত্রী পছন্দ করেন না'। কি মজার ব্যাপার! স্ত্রী তো আরো কত কিছুই পছন্দ করেন না! তিনি আপনার সিগারেট খাওয়া ঘৃণা করেন, ভাত খেয়ে এঁটোকাঁটা বোনপ্লেটে না ফেলে প্লেটে রেখে দেয়া অপছন্দ করেন, বাথরুম ভিজিয়ে প্লাবন ঘটানো পছন্দ করেন না, জোরে ফ্যান ছেড়ে ঘুমোলে তার অসুবিধা হয়, আপনার নাক ডাকায় তিনি বিরক্ত হন- কোনকিছুই তো আপনাকে আটকে রাখতে পারেনা! অথচ আপনি সুর করে পড়েন, 'বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না' (সুরা তাওবাহঃ আয়াত ২৪) আর তারপর বলেন, ''আমার স্ত্রী পছন্দ করেন না তাই আমি দাড়ি রাখতে পারিনা'!

একই কথা স্ত্রীদের জন্যও প্রযোজ্য। একবার ক্লাসে একটা নতুন মেয়েকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কবে ভর্তি হলে? চার সেমেস্টার তোমাকে দেখিনি, কোন নতুন ছাত্রীও ভর্তি হবার ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টে কোন আলোচনা হয়নি...'। সে বলল, 'ম্যাডাম, আমি তো আপনার ক্লাসেই ছিলাম। আমি আগে নেকাব দিয়ে বোরকা পরতাম তাই আপনি কোনদিন আমার চেহারা দেখেননি। কিছুদিন আগে আমার বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামী পছন্দ করেনা তাই আমি এখন আর পর্দা করিনা, আল্লাহ তো স্বামীর কথা শুনতে বলেছেন...'। বাহ! স্বামী পর্দা করা পছন্দ করেনা বলে সে নেকাব, বোরকা তো খুলেছেই, মাথার ওড়না পর্যন্ত খুলে ফেলেছে! আমরা সুর করে পড়ি, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী' (সুরা তাওবাহঃ আয়াত ২৩) এবং 'হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার' (সুরা তাগাবুনঃ আয়াত ১৪-১৫) আর তারপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার ওপর তাদের প্রাধান্য দেই যারা বিচারদিবসে আমাদের দায়িত্ব নেবেনা!

আমাদের এক পরিচিতা তিনবছর ধরে চেষ্টা করার পরও যখন দেখল স্বামী নিজেও নামাজ পড়েনা এবং তাকেও নামাজে বাঁধা দেয় তখন এই কথা বলে চলে এলো, 'আমি তোমাকে ছাড়তে পারব কিন্তু আল্লাহকে ছাড়তে পারবনা'। কিন্তু আমরা অধিকাংশই মুখে আল্লাহকে ভালবাসার কথা বললেও কার্যত বরং সমাজ, সংসার, সন্ততি, পরিজনকে আল্লাহর চাইতেও প্রিয় মনে করি। আশেপাশের লোকজনকে ধোঁকা দিতে গিয়ে আসলে নিজেরাই ধোঁকার মধ্যে রয়ে যাই, আর কারো কোন লাভক্ষতি হয়না।

কার্টুন থেকে শিশুরা কী শিখছে

15 October 2014

লেখকঃ রাহনুমা সিদ্দিকা

[১]

চার বছরের ছোট্ট মাহাদী জন্মদিনে দাবী করলো ওকে সুপারম্যানের পোশাক কিনে দিতে হবে। বাবা যথাসময়ে উপহার কিনে আনলেন। আজ সকালে হলো কি, হঠাৎ বেড রুম থেকে মাহাদীর তীব্র চিৎকার ও কান্না শুনে আম্মু দৌড়ে এসে ঘটনা দেখে থ হয়ে গেলেন। মাহাদী আলমিরার পাশে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে গায়ে সুপারম্যানের পোশাক। তাড়াতাড়ি ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো মাহাদীকে। রিপোর্ট হলো পায়ের দুটো আঙ্গুলের হাড় ভেঙ্গে গেছে। মাহাদী আম্মুকে বলছে, "সুপারম্যান ড্রেস পড়ে লাফ দিলে তো পড়ে না। আমি কেন পড়ে গেলাম আম্মু?"

[২]

ওমায়রা ছয় বছরের ছোট্ট সোনা মেয়ে। সারাদিন লক্ষ্মীসোনা হয়ে থাকে, পড়ার সময় পড়ে, খেলার সময় খেলে। কষ্টের কথা হলো এই সোনামণিটার আম্মু না ফেরার দেশে। ও বাবামণি আর ফুপুমণির সাথে থাকে। ফুপুমণি ক-মাস পরেই সিডনি চলে যাবেন ফুপামণির সাথে। বাবা তাই ঠিক করলেন ছোট্ট ওমায়রাকে বড় করবার জন্য ও নিজের একাকীত্ব কাটানোর জন্য ওমায়রার জন্য একটা মা নিয়ে আসবেন। ওমায়রাকে বলতেই ও চিৎকার করে বলে উঠলো, না না কক্ষণো না! এরপর বাবাকে ধাক্কা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলো। বাবা খুব অবাক হলেন লক্ষ্মী ওমায়রার এই আচরণে। পরে আদর করে ওকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন এমন করলে আম্মু? তুমি কি চাও না তোমার একটা মা আসুক?

– না, আমি চাই না। স্টেপ মাদাররা খারাপ হয়।

– কে তোমাকে বলেছে যে স্টেপ মাদাররা খারাপ হয়?

– কেউ বলে নি, আমি জানি। সিন্ডারেলার স্টেপ মাদার খারাপ ছিলো, স্নো হোয়াইটের স্টেপ মাদার খারাপ ছিলো, স্লিপিং বিউটির পঁচা স্টেপ মাদার ছিলো, সব স্টেপ মাদাররা খারাপ, সব খারাপ! আমার স্টেপ মাদার আসলেও আমাকে মেরে ফেলতে চাইবে।

[৩]

নাঈম অসম্ভব দুষ্টু, জেদী- একরোখা ধরণের পিচ্চি। পড়াশুনায় একদম মন নেই। সারাক্ষণ কার্টুন নেটওয়ার্ক অথবা ডিজনী চ্যানেলের সামনে বসে থাকে। ওর প্রিয় কার্টুনগুলোর মধ্যে আছে পোকেমন, DragonBallZ, টম অ্যান্ড জেরী, স্কুবি ডু, ডোরেমন ইত্যাদি। কাল ইস্কুলের মিস নাঈমের মায়ের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, নাঈম ওর বন্ধুদের সাথে মারামারি করে কাজলের চশমা ভেঙ্গে ফেলেছে ও খামচি দিয়ে রক্ত বের করে ফেলেছে। শাস্তি স্বরুপ মা ওর টিভি দেখা বন্ধ করে দিলেন। সে এতটাই কার্টুনে নেশাগ্রস্ত তারপর ওকে শান্ত করাই মুশকিল হলো, অবশেষে যখন ভাঙচুর করা শুরু করলো মা বাধ্য হয়ে হার মানলেন।

[৪]

নুসাইবা একটা ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে স্ট্যান্ডার্ড থ্রিতে পড়ে। ওদের ক্লাসে আজকে একটা খুব পঁচা ঘটনা ঘটে গেছে। নুসাইবা আম্মুকে বলে দিয়েছে আর কোনদিন ইস্কুলে যাবে না। কী হয়েছে জানতে চাইলে। ও বললো ক্লাসের দুষ্টু ছেলে ইকরা টিফিন ব্রেকে সবার সামনে ওকে Lip kiss করে বলেছে এটা হলো True Love's kiss, নুসাইবা এখন থেকে সবসময় Princess Giselle এর মতো ইকরাকে love করবে।

–"এটা একটা লজ্জার কাজ, তাই না মা?"

মা হতভম্ব হয়ে গেলেন।

শহুরে জীবনে মা-বাবার পেশাগত ব্যস্ততার কারণে এবং বিকল্প বিনোদনের তেমন ব্যবস্থা না থাকায় এ যুগের বাচ্চাদের Baby Sitter বলা যায় কার্টুনকে। উপরের কেস স্টডিগুলো লক্ষ্য করুন, বাচ্চাদের নিয়ে এইসমস্যাগুলো কম-বেশি আমরা সবাই face করি। কার্টুনের ভালো-মন্দ বিতর্ক খুব নতুন কিছু নয়। সারা বিশ্বে এ নিয়ে বহু বিতর্ক প্রচলিত। বাংলাদেশে এখনো সচেতনতার বড় অভাব। তাই লেখার প্রয়োজনবোধ করছি।

কল্পণা ঘোড়ার লাগাম ধরেছি কি?

প্রথমেই বলে রাখা ভালো আমি কার্টুনের ভালো দিকগুলো অস্বীকার করছি না। রূপকথাগুলোরও অনেক advantage আছে। কিন্তু সেগুলো কোনটাই অবিমিশ্র ভালো নয়, বাবা-মায়েদের তার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। Fantasy আর Fairy Tales ততক্ষণ পর্যন্ত আদরণীয় যতক্ষণ তা শিশুকে নির্মল আনন্দের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা দিচ্ছে, এবং শিশু মনে Over Obsession তৈরি না করছে। কেননা, শিশুরা যখন কার্টুনে প্রদর্শিত জগৎ ও বাস্তবের মাঝে যখন মিল খুঁজে পায় না, তখন ওদের মধ্যে হতাশা ও বিষণ্নতা তৈরি হয়। ১নং কেস স্টাডিটা লক্ষ্য করুন, শিশুটি যে সবে আর্লি চাইল্ডহুড অতিক্রম করছে (১- ৬ বছর) ফ্যান্টাসি এবং বাস্তবতার পার্থক্য করতে পারবে না সবসময়। কার্টুনের অবাস্তব ও আধা-বাস্তব জগৎকে সে বিশ্বাস করবে শুরু করবে এর ফলে ঘটে যেতে পারে এমন বিপদ।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে কুপ্রভাব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ফলিত উন্নয়ন মনোবিজ্ঞান বিভাগের মনোবিজ্ঞানীরা একটি সার্ভে করেছিলেন ৯৫ জন মেয়ে শিশুকে নিয়ে। তাদের প্রিয় টিভি শো-গুলো একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন। যেখানে দেখা যায়, মাত্র সাত বছর ও তার কম বয়েসী অনেক শিশুর পছন্দের তালিকায় কিছু হাই লেভেলের ভায়োলেন্ট কার্টুন শো ছিলো। তারা ওই কার্টুনগুলো নিয়ে গবেষণা করে বলেন, সাধারণ টিভি শো-গুলো থেকেও বাচ্চাদের কার্টুনগুলোতে সহিংসতা অনেক বেশি দেখানো হয়। তারা সহিংস ভিডিও গেম, কার্টুনগুলোকে শিশুর আগ্রাসী চিন্তা, আচরণের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। প্রফেসর ডগলাস জেন্টাইল এর নেতৃত্বে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। ৯০ দশকের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ম করা হয় -টিভি চ্যানেলগুলো তাদের কার্টুনে কী কী দেখাচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবে। একটি রেটিং সিস্টেমও চালু করা হয় যাতে কার্টুনে ভায়োলেন্সের মাত্রা নিরুপন করা যায়।

Bowling Green State Universityর মনোবিজ্ঞানীরা জাপানে শিশুদের মধ্যে করা একটি গবেষণার পর বলেছেন যে শিশুরা নিয়মিত কার্টুন দেখে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুনে বেশি। তারা একটি বিশেষ কার্টুনকে বেছে নিয়েছিলেন গবেষণার জন্য, এবং সেটি বাংলাদেশেও প্রচারিত -পোকেমন-। তারা পোকেমনকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ সহিংস কার্টুন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মনোবিজ্ঞানীরা এসব শারীরিক ও মানসিক কুপ্রভাব মুক্ত করার জন্য অভিভাবকদের জোর দেন শিশুর বিনোদনে ভারসাম্য আনতে, শিশুর নিয়মিত শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি।

আমি একটাও টম অ্যান্ড জেরি এপিসোড দেখি নি যেখানে ভায়োলেন্স নেই, এই কার্টুনগুলো শিশুকে সহিংস, অস্থিরচিত্ত করে তোলে। ৩নং কেস স্টাডির ঘটনাটা বাংলাদেশের অনেক মায়েরই উৎকন্ঠার কারণ। অতিমাত্রায় কার্টুন দেখার ফলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা হতে পারে– স্থুলতা, চোখে সমস্যা, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, আচরণে ভারসাম্যের অভাব, অমনোযোগ, অতি কল্পণা, বিষণ্নতাসহ নানান সমস্যা। কার্টুনে আসক্ত শিশুদের অসামাজিক ও পড়াশোনায় অমনোযোগী হতে দেখা যায়।

কুসংস্কার ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতিঃ মাধ্যম যখন কার্টুন

দেশের কৃষ্টি- ইতিহাস বহন করে Folklore বা Folktaleগুলো। কিন্তু এগুলোতে কি সবসময় শিশুমননের উপযোগী contents থাকে? বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমি ঠাকুরমার ঝুলির ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। বাংলায় প্রচলিত কুসংস্কার কী কী এটা বের করতে চাইলে ঠাকুরমার ঝুলি নিয়ে গবেষণা করাটা সবচেয়ে সহজ উপায়। অথচ, এই কুসংস্কারগুলো আমরা অবলীলায় শিশুদের সামনে দিনের পর দিন প্রচার করে যাচ্ছি। ঠাকুরমার ঝুলিতে ওইসব সংস্কারগুলোকে ও অলৌকিক বিশ্বাসগুলোকে (বিশেষতঃ সনাতন হিন্দু সমাজের) মোটেই মন্দরূপে দেখায় না। এর গল্পগুলোতে মেয়েদেরও চরম অবমাননা করা হয়। কিন্তু পাশাপাশি ঠাকুরমার ঝুলি গল্পে গল্পে কিছু morality শিক্ষা দেয়। শিশুকে ঠাকু'মার ঝুলি দেখতে দিতেই হয়, তাহলে নিজে আগে দেখে, বেছে দিবেন।

ফ্যাশন আইকন বারবি। বাংলাদেশের তার আগমণের প্রায় দুইযুগ হয়ে গেছে। বারবির কোনো ড্রেসকে আপনার কাছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে না, হয় কি? আলাদীনের ডিজনি প্রিন্সেস জেসমিনকে দেখে আমার পরিচিত এক শিশুর প্রথম বাক্য ছিলো, " ছিঃ ছিঃ ওর ভালো জামা নেই?" তখন ওর বয়স তিন। এখন সে কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছে দেখতে দেখতে।

নিজ সংস্কৃতি কিংবা অন্য সংস্কৃতির ভালো কিছু শিখলে শিখুক, কিন্তু এই বাজে দিকগুলোর অনুপ্রবেশ কি গ্রহণীয়?

কার্টুন যখন শিশুর সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যম

বাংলাদেশে এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে ডিজনি- পিক্সার নির্মিত এনিমেটেড মুভিগুলো। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ৯০% ডিজনি কার্টুন মুভিগুলো স্রেফ প্রেম-ভালোবাসার গল্প। সুন্দর এনিমেশন, গান, দারুণ সংলাপের কারণে শিশুদের তো অবশ্যই বড়দেরও মন জয় করে নেয়। গ্রিম ভাইদের সেই বিখ্যাত রাপুনজেলের কাহিনী নিয়ে তৈরি Tangled কার্টুন মুভিটা দেখছিলাম একদিন স্টার মুভিজে। আমার ক্লাস থ্রি পড়ুয়া ছোট বোন ওটা আগে দেখলেও আমি ওদিনই প্রথম দেখছিলাম। হঠাৎ করে মাঝখান দিয়ে সে চ্যানেল পালটে দিয়ে বলে যে আর দেখা লাগবে না। অন্য কিছু দেখি। আমি বললাম, "কেন? এমন কি আছে ওখানে আমি দেখবো-ই।" সে কোনভাবেই দেখাবে না। আমি বুঝলাম এমন কোন দৃশ্য আছে যা সে ওর বড় বোনকে দেখাতে চায় না। আমি Tangled পুরোটা দেখেছি পরে। প্রেম…. আর সেই চিরকালীন Lost and Found থিমে বানানো একটা মুভি, অথচ কী বিশাল বানিজ্য করলো! মিউজিক ও এনিমেশন অসাধারণ স্বীকার করতেই হয়।

বড়দের নাটকে- মুভিতে না হয় নির্মাতারা নাকি প্রেম ছাড়া আর কোন বিষয়বস্তু খুঁজে পায় না, ছোটদের মুভিগুলোরও এ অবস্থা কেন? অনেক কার্টুন মুভিতে নায়িকাদের শিশু নয় বরং প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখায়, যেখানে তার Lover হিসেবে একজন প্রিন্স চার্মিং (or whoever) থাকে। ঘরে ঘরে দারুণ জনপ্রিয় টম এন্ড জেরি- সেখানেও দেখুন, টমকে প্রায় প্রতিটা এপিসোডেই দেখা যায় টুডলসকে (টমের গার্লফ্রেন্ড) বা পাশের বাড়ির অন্য কোন মেয়ে বিড়ালকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা হাস্যকর কাজকর্ম করতে। ডোরেমনেও সেই একই ব্যাপার! নবিতার বান্ধবী সিজুকার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কত কী-ই না করে নবিতা। আরো অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়।

এসব দেখে দেখে কি আপনার বাচ্চাটা সেক্সুয়াল ওয়িয়েন্টেশন নিয়ে ফেলছে না? চার নম্বর যে কেস স্টাডিটা উল্লেখ করেছিলাম, এটা বর্তমানে বিরল নয় আশপাশে তাকালেই খোঁজ পাবেন।

বিকল্প কার্টুন ও কার্টুনের বিকল্প

Is there any way out? প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে কিছু কথা বলি। উপরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কার্টুনের যে কুপ্রভাবগুলোর আলোচনা করা হয়েছে তা সব শিশুর ওপরই সমানভাবে পড়বে না। আমরা জানি, শিশুর socialization এর অনেকগুলো প্রভাবক ও agent আছে। যেমনঃ তার পরিবার, ধর্ম, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি এবং মিডিয়া। বর্তমান প্রজন্মের ওপর মিডিয়ার প্রভাব অনেক অনেক বেশি। এজন্যই আমাদের এই কার্টুনের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

কল্পণাশক্তিই সৃষ্টিশীলতার মূল কথা, তাই শিশুর সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে Fantasyর প্রভাব অসীম, তাছাড়া শুষ্ক জ্ঞানী আলোচনার কথা শিশুরা শুনতেও চাইবে না, সেদিক দিয়ে শিশুর বিনোদনে ও ভালো কিছু শেখাতে ভালো কার্টুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অসংখ্য কার্টুনের থিম ও শিক্ষা বেশ চমৎকার যেমনঃ ওয়াল-ই, টিংকার বেল, বারবি থাম্বেলিনা, আইস এজ, আপ, ফাইন্ডিং নিমো ইত্যাদির। সবকিছুরই ভালো খারাপ দুটোই আছে সেহেতু অনেক কার্টুন পজিটিভ অনেক কিছু শেখাবে তার সাথে নেগেটিভটাও, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বুঝে কোন কার্টুনটা আপনার শিশুকে দেখতে দেবেন তা আপনিই ঠিক করবেন।

এ বিষয়ে একজন সচেতন অভিভাবক- শিবলী মেহেদী ভাই পেশায় একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার, ফেসবুকে 'শিশু লালন পালন' নামে একটা চমৎকার গ্রুপ চালান। বলেন যে, "অনেক অনেক ভালো কার্টুন বানালেই কিন্তু বড় সমস্যার সমাধান হবে না। মা-বাবার সচেতনতা খুব জরুরী। আমরা কার্টুনের নেগেটিভ প্রভাব নিয়ে যতই আলোচনা করি না কেন তা ফলপ্রসু হবে না যদি না যারা আসল ভিকটিম অর্থাৎ শিশুদের সাথে আলোচনা না করি।"

বাচ্চার সাথে আলোচনা করাটা খুব ফলপ্রসু- যে ও কী দেখলো কী শিখলো- কোনটা গ্রহণ করা উচিত, কোনটা বর্জন করা উচিত। গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে আপনি আপনার শিশুকে হয়তো দূরে রাখতে পারবেন না কিন্তু ওকে শেখাতে পারবেন কীভাবে কাদায় থেকেও কাদা থেকে গা বাঁচিয়ে চলা যায়।

অধিক ভায়োলেন্ট কার্টুনগুলো শিশুকে দেখতে দেবেন না। অতিমাত্রায় কার্টুন আসক্ত শিশুকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে counselling করান একজন শিশুমনোবিজ্ঞানীর সাথে। শৈশব থেকেই বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলুন। খেলতে খেলতে বিজ্ঞান শেখা যায় এমন বই কিনে দিতে পারেন। বাচ্চাদের জন্য চমৎকার কিছু শিক্ষা-বিনোদনমূলক

সফটওয়্যার (যেমনঃ মাইক্রোসফট এনকার্টা কিডস) পাওয়া যায় বাজারে সেগুলো কিনে দিতে পারেন। ইন্টারনেটে শিশুদের উপযোগী বহু ওয়েবসাইট আছে, ইউটিউবে প্রচুর মজার মজার Educative ভিডিও আছে। সংগ্রহ করতে পারেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ইকবাল কবীর মোহনের শিশুদের জন্য লেখা বইগুলো।

বর্ণ-পরিচয় হিসেবে আপনার তিন-চার বছরের শিশুকে কিনে দিতে পারেন ফররুখ আহমদের 'হরফের ছড়া'র (বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি কতৃক প্রকাশিত) মতো বই। বাংলা শিশুসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। আপনার শিশুর জন্য বই কিনুন।

টিভি নয় আপনার শিশুকে বইমুখী করুন। কার্টুন কম, গল্পের বই বেশী পড়তে দিন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গল্প নয় ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প বলুন। ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় নৈতিকতাগুলো শেখান। সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ দিন। মূলকথা অনেক অনেক চেষ্টা করুন, তাকে সময় দিতে, তার বন্ধু হতে, আপনার শিশু আপনার সবচেয়ে দামী সম্পদ।

মনে রাখা দরকার আমাদের কিছু ঐতিহ্য আছে, কিছু মূল্যবোধ আছে। সেগুলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া, তা লালন করতে উৎসাহী করা আমাদেরই দায়িত্ব। স্বাস্থ্যকর খাবার, সুন্দর পোশাক আর ভালো স্কুলে পড়ানোর মাধ্যমে বাবা-মায়ের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, শিশুর মনন গঠনে আপনাকেই সচেতন থাকতে হবে।

ঈদে চাই নতুন জুতো !! (সত্যিই কি??)

15 October 2014

লেখকঃ নায়লা নুযহাত

১

ড্রেসি ডেল বলে একটা দোকান আছে ঢাকা শহরে, অন্য কোথাও আছে কিনা আমি ঠিক জানিনা! একবার পরিবারের একজন আমাকে বললেন সেখান থেকে আমার যা মনে চায় কিনতে, তিনি তার বিল দিয়ে দিবেন। আমি গেলাম। দোকানের বাইরে দেখলাম খুব সুন্দর কিছু কাপড় রাখা। একটা কামিজের দাম দেখলাম ১১০০০ টাকা! সাথে আমার বান্ধবী ছিল। বলল এ দোকানে ৪০০০ দিয়ে সম্ভবত শুরু সবকিছু। দোকানে আর ঢুকিনি! দামী শাড়ি, দামী কামিজ এসব সবসময়ই আমার কাছে অর্থহীন ঠেকে– অনেকেই একদিনের বেশী সেসব পরেনও না। কেবল মানুষকে একটা দিন দেখানোর জন্য এত আয়োজন করাটা কেমন যেন অপচয় মনে হয়।

২

গতবছরের কোরবানির ঈদে, হজ্জে যাওয়ার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বদলাতে হয় মেয়েকে নিয়ে যাব নাকি রেখে যাব এসব চিন্তায়। যেহেতু হজ্জে যাব ভেবেছিলাম, কোরবানি এদেশে দেয়ার কথা ভাবিনি। তবু ঈদের দুদিন আগে একজন বললেন গরুতে এক ভাগ খালি আছে, দিতে চাইলে দিতে পারি। এবার ধরেই নিলাম যে ইনশাআল্লাহ দিচ্ছি, তাই আর বাজার ঠেকে গরু বা খাসীর গোশত কিনিনি! ঈদের আগেরদিন, যখন কিনা আর বাজারে যাওয়াও সম্ভব না, জানা গেল যে গরুর ভাগটা পাওয়া যাচ্ছে না! আমার এখনো মনে আছে ঈদের দিন দুপুরে আমি রান্না না করে চুপচাপ বসে ছিলাম। জানি এ নিয়ে এত কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। তবু মনে হচ্ছিল সব বাসায় আজ যেমনই হোক মাংস রান্না হবে, শুধু আমার বাসা ছাড়া। এমন সময় একজন ফোন দিলেন তিনি তাঁর ভাগের থেকে কিছু মাংস দিয়ে যাবেন। তিনি সেটা দিয়ে গেলেন, আমি রাঁধলাম এবং তখন মনে হল যে হ্যাঁ, আজকে ঈদ।

এটা নিয়ে আমরা অনেক হাসাহাসি করেছি পরে! হয়ত আমার আচরণটা ছেলেমানুষিই ছিল। কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে সেদিন আমার ঘরে মাংস ছিল না। নাহলে কোনদিন বুঝতামও না ঈদের আনন্দ মানুষের সাথে ভাগ করে নেয়ার অর্থ কী!

৩

বহু বছর আগের কথা। পরেরদিন রোজার ঈদ। আমি শুনছিলাম আমাদের এক আত্মীয়ার কথা। স্বামীকে বলছিলেন, "সবাই কালকে নতুন কাপড় পরবে, আমার ছেলে দুটার জন্য কিছু একটা নিয়ে এসো, নাহলে ওদের যে মন ছোট হয়ে যাবে!" কিছুক্ষণ পর স্বামী বেরিয়ে গেলেন বাসা থেকে, পৃথিবী ভরা ক্লান্তি তাঁর দুই চোখে নিয়ে! আমি জানতাম ভদ্রলোক গলা পর্যন্ত ঋণে ডুবে আছেন! কিন্তু না, দোকানে গিয়েছেন, কিনেও এনেছেন। জানি না কিভাবে। সমাজের চাপিয়ে দেয়া নতুন কাপড়ের নিয়ম রক্ষার্থে আরেকবার কারুর থেকে টাকা ধার করেছিলেন কিনা তাও জানিনা। শুধু জানি, বাচ্চাদের আনন্দ দেখে তাঁর মুখে এক পলকের জন্য যেই হাসি এসেছিলো, তাও মিলিয়ে গিয়েছিলো দুর্ভাবনার যন্ত্রণায়!

আমি কেনাকাটার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। দেখাই যাচ্ছে আমি নিজেও যে কেনাকাটা করি না তা নয়! কারুর সামর্থ্য আছে, সে কাপড় কিনবে– এই মস্ত হালাল কাজটাকে হারামও ঘোষণা করছি না। আমার কেবল সবার কাছে এটুকুই অনুরোধ– একটু ভেবে দেখবেন কি, আমরা কোন পথে চলেছি?

ঘরে আলমারি ভর্তি কাপড় থাকলেও কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ঈদের কাপড় কিনতেই হবে, প্রতি বছর! একবার না, দুই দুই বার! এটা কি কোনও নিয়মে পরিণত হতে পারে??! আগে, আমাদের মা খালাদের যুগে ঈদের কাপড় মানে শুনেছি নানীর বানানো জামা। হয়ত বছরে ওই দুইবারই নতুন দুইটা জামা দেয়া হত সন্তানদের। আমরা তো সেটাও করি না। সারাটা বছরই সবাই কাপড় কিনছি, জুতা কিনছি। তার ওপর ঈদে আবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নতুন কিছু লাগবে– যদি বলেন ঈদ সামাজিক অনুষ্ঠান তো আমি আর কিছু বলবো না। কিন্তু যদি বলেন ঈদ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মুসলিম হিসেবে যা বলারই কথা, তাহলে বলুন, এই কি আমাদের শিক্ষা দেয় ইসলাম? রমজান মাসের অর্ধেক মার্কেটে পড়ে থাকা? হাজার হাজার টাকার জিনিস কেনা?

আজকে আপনি যখন ৫০০০ টাকার শাড়ি পরে আপনার আত্মীয়দের দেখাবেন, ওর মাঝে আপনারই খুব ঘনিষ্ঠ কেউ হয়ত আছে যে নতুন কাপড় দূরে থাকুক,ভাল কোনও খাবারও তেমন রাঁধতে পাননি? তাঁর সন্তানেরা যখন দেখবে ঈদে সবাই নতুন কাপড় কেনে, সেটাই নিয়ম, তারাও কি তাদের "অক্ষম" বাবার কাছে এই দাবী নিয়েই যাবে না, যে আমাদেরও চাই?? আমাদের কাজের প্রভাব সমাজের ওপর কিভাবে পড়ে তা দেখার দায় কি নেই আমাদের? এই যে সবার দেখা দেখি একটা সংস্কৃতি তৈরি হয়ে গিয়েছে যে ঈদে সবকিছু নতুন হওয়া চাই– চাকরির এই বাজারে প্রতিটা স্বামী/বাবার পক্ষে কি সম্ভব এভাবে দেয়া? এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই ঈদের আগে মানুষের ঘুষ খাওয়ার বহর দেখে! হারাম উপার্জন করে হলেও সমাজের কাছে মাথা উঁচু রাখতেই হবে! রহমতের মাসে ঘুষ খাওয়ার বিনিময়ে হলেও!

যত টাকা আমরা নিজেদের জন্য খরচ করি, একটু সচেতন হলে আমরা তা অপরের জন্য জমাতে পারি! হ্যাঁ, সবার দুঃখ ঘোচানো আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু আল্লাহর কাছে তো বলতে পারবো, যে রব আমার, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি?? নিজে ৫০০০ টাকার কাপড় পরে আমার আত্মীয় না খেয়ে আছেন বলে তাঁর হাতে ৫০০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে আমার সাধ্য এটুকুই তা বুঝাতে যাইনি? চলুন একটা ঈদে আমরা এসব খরচগুলো না করে আমাদের গরীব আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে ঈদ করি? আসুন এই জঘন্য প্রথাটা আমরা একটা বার ভেঙ্গে দেখাই যে না, সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক, ঈদে নতুন কাপড় লাগবেই লাগবে এ আর চলতে দিবো না??

প্রতিবার একটা কথা বলি। আমরাই সমাজ। সমাজ আমি, সমাজ আপনি, সমাজ তুমি! সমাজ আমরা!!! আজকে কোনোকিছু যদি বদলাতে হয়, তবে সবার আগে বদলাতে হবে নিজেদের!

একটা সত্যি ঘটনা বলি।–

সিলেটের নিয়ম হল, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে রমজান মাসে ইফতার পাঠাতে হবে। একটা দিন, ভ্যান ভর্তি করে খাবার যায় মেয়ের বাড়িতে। পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে নিয়ে যেন খাওয়া যায় সেভাবে। অনেককে টাকা ধার করেও এ প্রথা বজায় রাখতে দেখেছি। এ নিয়ে আবার তুলনাও হয়, এই বউ এর বাপের বাড়ি থেকে ভালো ইফতার এলো, না সেই বউয়ের! একবার আমার বাবা আমার ফুপুকে বললেন, সামনের বছর থেকে তোমার জন্য আর এভাবে ইফতার যাবে না। আমার ফুপু এসব বোঝেন, তিনিও আপত্তি করলেন না। পরের বছর তিনি সকলের সমালোচনা শুনলেন। তারপরের বছর তাঁর সম্পর্কে জা হন একজন মহিলার বাপের বাড়ি থেকে ইফতার এলো না! সমালোচনার ঝড়

উঠলো! তিনি আমার ফুপুকে দেখিয়ে বললেন, "তাঁর ভাইয়ের সামর্থ্য থাকার পরও যদি তাঁরা ইফতার না পাঠাতে পারেন, তাহলে আমার গরীব বাপ ধার করে কেন পাঠাবেন বছরের পর বছর??" ব্যস, ক্ষয় ধরল নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় একটি প্রথার! হয়ত তা একটা ছোট এলাকার গণ্ডি পেরোতে পারেনি। তবু একটা বাড়ির পাঁচটা বউয়ের ক্ষেত্রে হলেও, ক্ষয় তো ধরেছে! চাইলে কেউ উদাহরণ টেনে দেখাতে পারছে!

আসুন আমরা নিজেদের বদলাই। কেবল একটা ঈদ যদি আমরা নতুন কাপড় ছাড়া করি, যার যার সবচেয়ে ভালো পোশাক আলমারি থেকে নামিয়ে নিয়ে পরি, খুব কি ক্ষতি হবে? সেই টাকাটা যদি আমরা আমাদের গরীব আত্মীয় স্বজনের কাছে দেই, যেন রমজান মাসটা তাঁরা একটু সুন্দর করে কাটাতে পারেন, ঈদের দিনটা একটু ভালো খেতে পারেন, খুব কি ক্ষতি হবে? একটা বার চেষ্টা করেই দেখি চলুন! আমাদের বাচ্চারাও দিতে শিখবে। আমরাও শিখব কত সামান্যতে আনন্দ পাওয়া যায়! আর নতুন কাপড় চাইই চাই–এই প্রথাটা দেখবেন কেমন নড়বড়ে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ!

রমজান মাস, ইদ–এগুলো যেমন তেমন অনুষ্ঠান না যে আসলো আর চলে গেল! নিজের আত্মা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, নিজেকে দিয়ে এই দিনগুলোর প্রতিটা মুহূর্ত পার করার কথা! আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দেন, যাতে দুনিয়ার চাওয়া পাওয়ার পেছনে এই মাসটা চলে না যায়! সমাজ আমাকে কী চোখে দেখছে– এই ভাবতে ভাবতে রমজান মাসটা কেটে না যায়! পুরো মাসটা যেন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাঝে কাটাতে পারি! আর ঈদের দিনটায় আমাদের সবচেয়ে বড় উপহার যেন হয় কিয়ামতের দিন জানতে পারা যে আল্লাহ আমাদের মাসব্যাপী সংযমে সন্তুষ্ট! আমীন!

আল্লাহ কুরআনে আমাদের বলেছেনঃ

And spend in the Cause of Allah and do not throw yourselves into destruction (by not spending your wealth in the Cause of Allah), and do good. Truly, Allah loves Al-Muhsinun (the good-doers). (2:195)

আর

Who is he that will lend to Allah a goodly loan so that He may multiply it to him many times? And it is Allah that decreases or increases (your provisions), and unto Him you shall return. (2:245)

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের অনেক দিয়েছেন। আসুন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাঝে রহমতের মাসটি পার করার চেষ্টা করি!

সন্তানদের ‘মানুষ’ করা

16 September 2014

লেখকঃ রেহনুমা বিনতে আনিস

বান্ধবী শিমু বলত বিয়ের পর সে ছেলের মা হতে চায় যেন সে দেখিয়ে দিতে পারে ছেলেদের কত ভালোভাবে মানুষ করা যায়। অন্যরা বলত তারা মেয়ে সন্তান চায় কারণ মেয়েরা বাবামাকে জ্বালায় না।আর আমি বলতাম আমি বিয়েই করবনা! কিন্তু অদৃষ্টের লিখন যায় না খন্ডন। বিয়ে হোল। বাচ্চাও হোল। তখন বাচ্চা “মানুষ” করার প্রশ্নও এলো।

এক্ষেত্রে আমার তিনটা বিশেষ সুবিধা ছিল।

প্রথমত, আমার অভিজ্ঞতা। ছোট ভাই দু’টি যথাক্রমে আমার ছয় এবং বারো বছরের ছোট ছিল। বিশেষ করে বিদেশে থাকায় ছোটটির প্রায় সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বারো বছর বয়স থেকেই মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ হয়েছে। তাছাড়া বাবা অল্প বয়সে বিয়ে করাতে বাবার বন্ধুদের ছেলেমেয়েরাও ছিল আমার অনেক অনেক ছোট। তাঁরা বিভিন্ন সময় আমার কাছে বাচ্চা রেখে যেতেন, এতে করে বিভিন্ন ধরণের শিশুদের দেখার এবং নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস হয়ে গেছিল অল্প বয়সেই।

দ্বিতীয়ত, আমি সর্বভূক। ছোটবেলা থেকেই যেখানে যা পেতাম, বুঝি না বুঝি, পড়তাম। পরে এই টুকরো টুকরো তথ্যগুলো অনেক কাজে লেগে যায়।

তৃতীয়ত, আমার বাবামার পাশাপাশি অন্যান্যদের বাবামাকে পর্যবেক্ষণ করে অনেক কিছু শেখার এবং বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

আমি খুব ভালো মা নই। আদর্শ মায়েদের মত সন্তানদের খাওয়া দাওয়া, পোশাক আশাক নিয়ে আদিখ্যেতা আমাকে দিয়ে হয়না, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ব্যাপারেও আমার বাচ্চাদের ওপর কোন জোর নেই। তবে ছোটবেলা থেকেই তাদের আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছি। পড়তে শেখার সাথে সাথে হাতে অর্থসহ কুর'আন ধরিয়ে দিয়েছি।

তাদের বলেছি, "তোমাদের আমাকে বা আব্বুকে বা আর কাউকে খুশী করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন কাজ তোমরা কখনো কোরনা। তোমরা যদি লুকিয়ে কিছু কর আমি দেখবনা, আব্বু দেখবেনা, হয়ত কেউই দেখবেনা, কিন্তু আল্লাহ দেখবেন। তাহলে আল্লাহ তোমাদের আগুনে শিক কাবাব বানাবেন। আর ওনার কথা শুনলে তোমরা যা চাও সব উনি তোমাদের দেবেন"।

আমি চাইনা আমার সন্তানেরা রূপকথা শিখুক। আমাদের অধিকাংশেই ইসলাম সম্পর্কে ধারণা রূপকথার মতই। বিভিন্নজনের কাছে টুকটাক শোনা বা চটিবই পড়াতেই আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ফলে আমাদের মধ্যে জন্ম নেয় নানানরকম ভুল ধারণা, অনেক ভুল আচরণ। আসলে যে কি করতে বলা হয়েছে, কি মানা করা হয়েছে বা কেন এ'ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তাই আমরা নামসর্বস্ব মুসলিম হিসেবে বেড়ে উঠি। কুর'আনের কোন অংশ শুনলে "নিজের যুক্তি" দিয়ে বিচার করি। অথচ আমাদের মানদন্ড হওয়া উচিত কুর'আন এবং "যুক্তি" হওয়া উচিত সেই মানদন্ডের প্রেক্ষিতে। তাই আমি চাই ওরা নিজে পড়ে জেনে বুঝে "মানুষ" হোক। তাছাড়া এই বইটিতে যেভাবে আদর্শ আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যদি কোন মানুষ অনুসরণ করে তবে সে শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাবা বা মা, বন্ধু, প্রতিবেশী, মালিক বা কর্মচারী সবই হতে পারবে। ব্যাস, আমার কাজ হয়ে গেল!

আমি যখন জানলাম তিনমাস বয়স থেকে গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিন্ড চালু হয়ে যায় এবং পাঁচমাস বয়স থেকে সে শুনতে পায় তখন একটা প্ল্যান করলাম। তিনমাসের সময় চুপি চুপি পড়ার পরিবর্তে জোরেজোরে কুর'আন হাদিস বইপত্র পড়তে শুরু করলাম, রাগ কমিয়ে হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করতে শুরু করলাম, মানুষের সাথে আরো বেশী ভালো আচরণ করতে শুরু করলাম। পাঁচমাসের সময় আমি আমার সন্তানদের সাথে কথা বলতে শুরু করতাম, ভালো খারাপ বোঝাতাম। অনেকে এটাকে পাগলামী মনে করে। কিন্তু একটা সাধারন পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন এতে পাগলামীর কিছু নেই। ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু তার বাবাকে দেখে পিটপিট করে তাকায়, তার গলার স্বরে সাড়া দেয়। সে কি করে বোঝে এটা তার বাবা? কারণ সে আগে থেকেই বাবাকে চেনে!

আমি আমার সন্তানদের সাথে তাদের জন্মের সাথে সাথেই কথাবার্তা চালিয়ে যেতাম। Baby talk না, adult talk. তাদের রূপকথার গল্প না বলে বিভিন্ন নবীরাসূল এবং বড়বড় মানুষের কথা বলতাম। আমার ননদরা হাসত। একদিনের বাচ্চাকে গল্প বলে! কিন্তু আমার মেয়ে আড়াই বছর বয়সে সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে সে সব শোনে এবং বোঝে যখন ওর বাবা ওকে দুষ্টুমী করে বল্ল, "যাও, তুমি গোসল করে আস, তোমাকে কোরবানী দেব"। সে বল্ল, "আব্বু, আপনি কিছু জানেন না। শুধু ইব্রাহীম (আ) ইসমাইল (আ) কে কোরবানী করতে পারে। অন্য আব্বুরা শুধু গরুছাগল কোরবানী করতে পারে!"

আমার এক বোন কর্ণেলিয়া আজ ফেসবুকে লিখেছেঃ "Jasmine was in a forbidden relationship with Aladin, Snow White lived alone with seven men, Pinocchio was a liar, Robin Hood was a thief, Tarzan walked without clothes on, a stranger kissed Sleeping Beauty and she married him, Cinderella lied and sneaked out at night to attend a party. These are the stories our families raised us with and then they complain our present generation is messed up!"

আমরা আমাদের সন্তানদের যে আদর্শ দিয়ে বড় করব তাই তো তারা শিখবে!

অনেক আহ্লাদী মায়েরা তাদের সন্তানদের ছোটবেলায় শাসন করতে চান না। বলেন, "ও তো এখনো ছোট, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে"। কিন্তু ছোটবেলা থেকে একটা শিশুকে ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড যদি বাবামা না শেখায় তবে সে "ঠিক" হবে কি করে?

একটা শিশু অন্যদের সাথে খেলনা শেয়ার করতে চাইবেনা, অন্যের ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করবে, রাত বারোটা বাজে কমলা খাবার আহ্লাদ করবে আর আমি মিষ্টি হাসি দিয়ে বলব, "ছোটবাচ্চা, ঠিক হয়ে যাবে?- কক্ষনো নয়!

আমার মেয়ের যখন দেড়বছর, সে বারবার রান্নাঘরে আগুনে হাত দিতে চাইত। এই অবস্থা দেখে আমি একদিন একহাতে বরফ নিলাম, আরেক হাতে একটা ম্যাচ জ্বালিয়ে তাকে ধরার সুযোগ দিলাম। সে ম্যাচ ধরে কেঁদে ওঠার সাথে সাথে হাতে বরফ ঠেঁসে দিলাম। ফোস্কাও পড়লোনা, হাতও পুড়লোনা- বড়জোর কিছুক্ষণ জ্বালা করল। কিন্তু সে বুঝে গেল আগুন দেখতে সুন্দর কিন্তু তা ধরলে হাত পুড়ে যায়। আর কোনদিন তাকে নিয়ে আমার ভাবতে হয়নি। মাঝে মাঝে বিপদের কাছাকাছি যেতে দিয়ে শিশুকে সচেতনতা শেখানো যায়। এতে সে বৃহত্তর বিপদ থেকে রক্ষা পায়। Responsibility এমন একটা জিনিস যা আমার মনে হয় সবাইকে ছোটবেলা থেকেই শেখানো উচিত।

একইভাবে এটাও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যে আমাদের শিশুরা টিভিতে কি দেখছে। সারাদিন টিভিতে নাঙ্গা নাচ চলছে আর শিশু বাবামা'র সাথে বসে তাই দেখছে, এই শিশুর লজ্জাবোধ তো ওখানেই শহীদ হয়ে যাচ্ছে! এক ভাই রাহাত আজ লিখলঃ "Almost 70 of the Tom and Jerry cartoon shows that Tom is extensively addicted to the opposite sex. And he reacts strangely when he sees anyone of the opposite sex. Guardians are not weary of what it represents but the kids are watching this very easily with family!" শিশুকে যে ধরণের রুচি দিয়ে বড় করা হবে তাই শিশুর ভালো মনে হবে। যেমন আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা ভালো ছবি বেছে আমাদের দেখাত, সাথে বসে বুঝিয়ে দিত। আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকে Peace TV দেখে অভ্যস্ত। ক্যানাডায় Peace TV নেই বলে সে নিজেই কম্পিউটারে Peace TV বের করে দেখে।

সবচেয়ে বড় কথা আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আমাদের এটা বোঝা প্রয়োজন যে আমরা শিশুদের কি বলি তার চেয়েও ওরা অনুসরণ করে আমরা কি করি। প্রত্যেক শিশুই মনে করে তার পিতামাতা আদর্শ।

সুতরাং, আমরা কোন অন্যায় করলে তখন তারা মনে করে, "বাহ, আব্বু যেহেতু মিথ্যা কথা বলে, আমি বললেও নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা নেই!" এটা খুব জরুরী যেন বাবামা সন্তানদের সামনে ঝগড়া না করেন বা পরস্পরের বা তাদের পরিবারের ব্যাপারে কোন বাজে মন্তব্য না করেন। কারণ একটা শিশু নিজেকে মূল্যায়ন করে তার বাবামায়ের মাধ্যমে। তার যদি নিজের বাবামা'র প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যায় তবে সে নিজেও low self esteemএ ভুগতে শুরু করে। এ' একই কারণে আমাদের এমন অন্যায় করা উচিত নয় যা আমরা চাই না আমাদের সন্তান করুক যদিও সেটা আমরা মনে করি আমার সন্তানের সুখের জন্য। যেমন, আমার আয়-রোজগার কম হবার কারণে যদি আমার সন্তান একবেলা না খেয়েও থাকে তাতে তার সামান্য ক্ষুধা ছাড়া আর কোন কষ্ট হবেনা। কিন্তু যদি আমি সুদঘুষের টাকায় আমার সন্তানকে একটি ভালো জীবন দেয়ার চেষ্টা করি তাতে তার ক্ষতি বই কোন লাভ হবেনা। সে টাকার মূল্য বুঝবেনা, শ্রমের মূল্য শিখবেনা এবং এই টাকা তাকে পৃথিবীর জৌলুসের প্রতি আকৃষ্ট করে মূল জিনিসগুলো থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, ফলে সুখ তার কাছে কখনোই ধরা দেবেনা। উপরন্তু, আল্লাহ বলেছেন যার শরীরে একবিন্দু পরিমাণ হারাম প্রবেশ করবে সে কোনদিন জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। সুতরাং, কার্যত এতে করে আমি আমার সন্তানকে কেবল দুনিয়াতেই নয় বরং আখেরাতেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেব।

আমি আমার সন্তানদের সাধারন মানুষ হিসেবেই বড় করতে চাই। তারা আমার সাথে মাটিতে শুয়ে ঘুমাতে ভালোবাসে। ওরা কোনদিন ওদের বাবামাকে অতিরিক্ত দামী জামাকাপড় পরতে দেখেনি, তাই যখন ওদের জন্য হকার্স মার্কেট থেকে কাপড় কেনা হয় তখন ওদের আঁতে ঘা লাগার মত কিছু ঘটেনা।

ওদের ছোটবেলা থেকে needs এবং wantsএর তফাত করতে শেখানোর চেষ্টা করেছি। "চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য থাকিবে" কথাটা ওরা কোনদিন শোনেনি। যখন ওরা কিছু চায় তখন ওদের চিন্তা করার সুযোগ দেই আসলে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা এর পরিবর্তে অন্য কিছু দিলে কেমন হয়। যেমন আমি আমার সন্তানদের শেখানোর চেষ্টা করি তারা যেন নিজেদের মেধা, গুন, ব্যবহারের মাধ্যমে সুপরিচিত হবার চেষ্টা করে। আমি আমার মেয়েকে সামান্য পয়সার লিপ্সটিক কিনে দেইনি কোনদিন, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী দাম দিয়ে মাইক্রোস্কোপ কিনে দিয়েছি। কেননা লিপ্সটিক তাকে সৌন্দর্যপ্রদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে তাকে লোভী পুরুষদের দৃষ্টির খোরাকে পরিণত করবে, কিন্তু মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখা আরেকটা জগত তার অন্তঃর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে।

আমার বাবার কাছ থেকে আমি দু'টো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখেছি। বাবা যথাসম্ভব পরিবারকে সময় দিত এবং সবার সাথে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত যে আমাদের কখনো মনে হয়নি এ'কথাটা বাবাকে বলা যাবেনা বা এটা লুকানো দরকার।

সন্তান যখন মনে করে যে সে তার পরিবারের কাছ থেকে যথেষ্ট ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব পাচ্ছে তখন সে বাইরে ভালোবাসা খুঁজতে যাবার প্রয়োজন বোধ করেনা। সুতরাং, তার সুযোগসন্ধানী কারো হাতে পড়ে জীবনটা এলোমেলো করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে কম। পাশাপাশি সে যদি মনে করে বাবামায়ের সাথে সব কথা বলা যায় তাহলে সে কোন বিপদে পড়লে বা কাউকে ভালো লাগলে নির্দ্বিধায় বলতে পারবে- ফলে বাবামা উত্তম পরামর্শ দিয়ে তাকে সহযোগিতা করতে পারবেন। অন্তত একজন অভিভাবকের এই দায়িত্বটা পালন করা উচিত যাতে সন্তান পিতামাতার কাছ থেকে নিজেকে distant মনে না করে, তার মনে না হয় তার পরামর্শ করা উচিত বন্ধুদের সাথে (বন্ধুদের জ্ঞানবুদ্ধি আর

বাবামায়ের অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার মধ্যে কি কোন তুলনা হয়?), সে নিজেকে চাপযুক্ত মনে না করে এবং সে বাধ্য হয়ে নয়, খুশী হয়ে বাবামায়ের আদেশ উপদেশ শোনে। পারিবারিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। আমরা বাবার সাথে স্ক্র্যাবল, মনোপলি, ফ্রিসবি থেকে শুরু করে লুডো পর্যন্ত খেলতাম– এখনো সময় পেলে খেলি। আরেকটা ব্যাপার হোল গল্পসল্প করা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা, পছন্দ অপছন্দ আলাপ করা যাতে উভয়ে পরস্পরের মনমানসিকতা বুঝতে পারে এবং মনোমালিন্য এড়িয়ে চলতে পারে।

ছোটবেলায়, যখন পুরোপুরি সব কথা বুঝতামনা তখন বিচিত্রায় একটা জরীপ পড়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর (লুকিয়ে লুকিয়ে অবশ্যই!)। এতে বলা হয়েছিল, যারা দূরবর্তী অঞ্চল থেকে এখানে পড়তে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই নানাপ্রকার প্রেমঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে যেহেতু দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তাদের মন প্রায়ই খারাপ থাকে। আমার সেই ছোট্ট মাথায় তখন এটাই এসেছিল, এত লেখাপড়া করে কি হবে যদি একটা মানুষ তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তার চরিত্রই হারিয়ে ফেলে? একটা মানুষের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা মাস্টার্স হওয়াটাই কি জীবনের মূল লক্ষ্য? সবার আগে কি তার একজন ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করা উচিত নয়?

এখন বড় হয়েছি (মনে হয়, যদিও মনটা এখনো ছোটদের মতই রয়ে গেল এবং সেভাবেই তাকে রাখতে চাই)। এখন বুঝি মানুষের সঠিক বয়সে বিয়ে করা উচিত। এটা লেখাপড়া বা আর কোন ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়। জীবনে কোন কিছুকে আর কোনকিছুর জন্য ঠেকিয়ে রেখে দেয়াটা একটা চরম বোকামী। মানুষের রয়েছে অসীম সম্ভাবনা আর প্রচন্ড চাপ নেবার ক্ষমতা যদি সে নিজের মনোবলকে উন্নীত করতে পারে। তাই মানুষ বিয়ে, সন্তান, সংসার, লেখাপড়া, চাকরী সব একসাথে চালাতে পারে যদি বাবামা সহযোগিতাপূর্ণ হন। আমাদের বাবামাদের উচিত সন্তানের পার্থিব উন্নতির পাশাপাশি তাদের পারলৌকিক জীবনে ঠেকে না যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য তাদের সময়মত বিয়ে দেয়া। আমরা বিয়ে নামক সামাজিক অনুষ্ঠানে নানারকম বিদ'আত যোগ করে একে একপ্রকার বিভিষিকায় রূপান্তরিত করে ফেলেছি। অথচ এগুলো বাদ দিলে এটা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। ধরুন আমার বিয়ে। বাবা হাফিজ সাহেবকে বল্ল, "তোমার নতুন চাকরী, এখন গোল্ড দেয়া জরুরী নয়। পরে তুমি যখন পারো তখন তুমি তোমার বৌকে ইচ্ছেমত কিনে দিয়ো"। হাফিজ সাহেব বললেন, "আমি যৌতুক নেবনা, দিলে বিয়েই করবনা"। আমি বললাম, "গায়ে হলুদ বিদ'আত, সুতরাং গায়ে হলুদ করা, বাড়ীতে বা বিয়ে বাড়ীতে লাইট লাগানো যাবেনা। বরং ঐ পরিমাণ টাকা তুমি কোন গরীব মেয়ের বিয়ে দিতে খরচ কোর। এতে হয়ত আমাদের বিয়েতে আল্লাহ বরকত দেবেন"। ব্যাস, অল্প সংখ্যক আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব খাইয়ে, এক অনুষ্ঠানে বিয়ে হয়ে গেল! হাফিজ সাহেব ওনার বাবার একমাত্র ছেলে আর আমি বাবার একমাত্র মেয়ে। দুই পরিবারেরই সামর্থ্য ছিল জাঁকজমক করে বিয়ের অনুষ্ঠান করার। কিন্তু আমরা আনন্দিত যে আমরা আমাদের বাবামাকে আমাদের বিয়ে উপলক্ষ্যে কোন কষ্ট ভোগ করতে দেইনি।

আবার **অনেক সময় মানুষের বিয়ে করতে দেরী হয়ে যায় "প্যাকেট" খুঁজতে খুঁজতে। ছেলে কি করে, মেয়ে দেখতে ঐশ্বর্য রাইয়ের চেয়ে সুন্দরী কি'না। যেই criteria দেখে বিয়ে করা প্রয়োজন সেগুলো নিগৃহিত হয়।**

ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় সমস্যা। হয় তালাক, নয় অশান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান, নইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরস্পরের সাথে অবস্থান করেও চারিত্রিকভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়া। বাবামাকে নির্বাচন করতে হবে মানুষ দেখে, সন্তানকেও এ'ব্যাপারে বাবামাকে উৎসাহিত করতে হবে যে মানুষ কেমন এটাই তার মূল লক্ষ্য এবং যদি এর জন্য তাকে কিছু ছাড় দিতে হয় তাতে সে অনুৎসাহী নয়। সবচেয়ে বড় কথা আমি এখন থেকেই আমার সন্তানদের জন্য দুআ

করি যেন আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম সঙ্গী মিলিয়ে দেন এবং আমাদের মনকে তাদের জন্য এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেন যাতে আমরা তাদের নিজেদের সন্তান থেকে পৃথকভাবে না দেখি।

সবচেয়ে বড় যে অন্যায়টি আমরা নিজের সন্তানের সাথে করি তা হোল তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা। পক্ষপাতিত্ব যার বিরুদ্ধে করা হয় তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করা হয় সে সন্তানটির যার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। সাধারনত এহেন আচরণের পেছনে বাবা বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের একটা সুপ্ত উদ্দেশ্য থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মা এই সন্তানটিকে ব্যাবহার করেন কারো বিরুদ্ধে- সেটা হতে পারে তাঁর স্বামী, শ্বাশুড়ী বা ছেলের বৌ। কখনো সন্তানের ভক্তি তাকে এই সন্তানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। কিন্তু সেই সন্তানটি যখন বুঝতে পারে যে সে ব্যবহৃত হবার বিনিময়ে কিছু বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারে বা কোন অন্যায় করেও scot free বেঁচে যেতে পারে, তখন সেও এই special status উপভোগ করতে শুরু করে। কিন্তু কার্যত এতে সে লেখাপড়া ফাঁকি দিতে শুরু করে, কাজের প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে, নির্লজ্জ ও স্বার্থপর হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পরিবারের সবার বিরক্তির কারণ হিসেবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একজন পিতা বা মাতা সন্তানের এর চেয়ে বড় আর কি ক্ষতি করতে পারেন? এক্ষেত্রে পিতামাতার পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সন্তান লালন করা, সন্তানকে নিজেদের মধ্যে power playর গুটি না বানানো এবং নিজেদের মধ্যকার সমস্যা সন্তানকে বুঝতে না দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

চারপাশে দেখছি, শিখছি, ভুল করছি আবার সংশোধন করছি। সন্তানের সাথে প্রতিটি মূহূর্তই তো আসলে এক নতুন অভিজ্ঞতা কারণ প্রতিটি শিশু আলাদা স্বভাবচরিত্র নিয়ে জন্মায়, প্রত্যেককে পর্যবেক্ষণ করে তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়, তারপর তাকে কিভাবে বোঝানো যায় তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের দেখে এবং তাদের সহযোগিতা করতে গিয়ে শেখার সুযোগ পেয়েছি অনেক, আমি কৃতজ্ঞ। চেষ্টা করছি ছেলেমেয়েদের আমার বোধ অনুযায়ী সন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার। সবাই দুআ করবেন যেন সবাই সন্তানদের সর্বাগ্রে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

সন্তান প্রতিপালন

17 November 2014

অনুবাদকঃ আহমেদুল কবীর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

[উস্তাদ নুমান আলী খানের লেকচার অবলম্বনে অনুবাদ]

টিনেজারদের বাবা-মারা প্রায় সময়ই আমার কাছে আসেন। "জানেন, আমার ছেলেটা না, আমার কথা শোনেই না আজকাল। আপনি ওর সাথে একটু কথা বলবেন? একটু যদি কথা বলতেন...।" "যেন আমি কোনো মহৌষধ সাথে নিয়ে ঘুরি! যেন সেই ছেলেটা আমার কাছে আসলে আমি ওর গায়ে ফু দিয়ে দেব এভাবে। আর সাথে সাথেই সে দারুণ লক্ষী ছেলে হয়ে যাবে!"

না, বরং আপনি আপনার ছেলের সাথে কথা বলছেন না কেন? কোথায় ছিলেন আপনি যখন তার সাথে কথা বলার প্রকৃত সময় ছিল?

আজকে আমি আপনাদের সাথে বাবা-মাদের নিয়ে একটু কথা বলব, তারপর বলব স্বামী-স্ত্রীদের নিয়ে। আজকে এই দু'টো জিনিস নিয়ে বলারই সময় আছে। দু'টো খুবই মৌলিক সম্পর্ক: একটা আপনার সন্তানদের সাথে, আরেকটা আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে। এই দু'টো সম্পর্কের ব্যাপারেই আমরা খুব বেসিক কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।

আপনার সন্তান যখন ছোট, খুবই ছোট, ধরুন যখন তাদের বয়স পাঁচ, ছয়, সাত, দুই, তিন, চার, তখন তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসটা বলুন তো? আমার নিজের পাঁচটা বাচ্চা আছে, তাই আমি খুব ভালো বলতে পারব এ ব্যাপারে। তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার সমর্থন। তারা আপনাকে গর্বিত করতে চায়। তারা যা যা করেছে সব আপনাকে দেখাতে চায়। ধরুন, আমি জরুরী কোনো কাজের আলাপ করছি ফোনে, জরুরী একটা ফোন, আর এ সময় আমার দুই বছরের ছেলে এসে বলবে, "আব্বা আব্বা আব্বা আব্বা আব্বা।" ..."ভাই, একটু লাইনে থাকেন" ... "কি হয়েছে?" ... "হে হে হে" ব্যস! আমি আবার ফোনালাপে ফিরে গেলাম, সে আবার আমাকে ডাকা শুরু করল। আমি বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে, কি হয়েছে বলো" ... "আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো" ... "কি দেখাতে চাও বাবা?" ... ব্যস এটাই! কিন্তু আমার এ ক্ষেত্রে কি করা উচিত বলুন তো? "আল্লাহ! দারুন তো! আবার করো দেখি" ... "আমি আপনাকে পরে ফোন দিচ্ছি" ... আপনার সন্তানরা যা করে আপনার উচিত তার কদর করা। এটা তাদের পরম আরাধ্য। অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি তারা এটাই চায় আপনার কাছে।

আমার তিনটি মেয়ে আছে। আর ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কি জানেন তো? ছেলেরা এক জায়গায় বসে থাকতে পারেনা, আর মেয়েরা কথা বলা থামাতে পারে না। তো আমি আমার মেয়েদের স্কুল থেকে যখন নিয়ে আসি - একজন ক্লাস ওয়ানে আরেক জন ক্লাস থ্রিতে পড়ে - আমি ওদের স্কুল থেকে বাসায় নিয়ে আসি ২৫ মিনিট গাড়ি চালিয়ে। আর এই পুরোটা সময় তারা কি করে জানেন? "জানো আজকে ক্লাসে কি হয়েছে? আমরা একটা ডাইনোসর রং করেছি, এটা করেছি, ওটা করেছি, প্রথমে আমি বেগুনী রং করলাম, তারপর ভাবলাম একটু সবুজ রং-ও দেই" - এভাবে বলতে থাকলো তো বলতেই থাকলো। থামার কোনো নামই নেই। থামা সম্ভবই না ওদের পক্ষে। আর আমাকেও মনযোগ দিয়ে সেটা শুনতে হবে। শুনতে হবে আমাকে। আমি বললাম, "ও তাই? নীল রং দাও নি?" .."না অল্প একটু নীল দিয়েছি"। আমাকে মনোযোগ দিতে হবে। আর আমি এগুলো কেন বলছি জানেন? আচ্ছা দাঁড়ান, আগে অন্য একটা গল্প বলে নেই। তাতে আপনাদের ঘুমটাও একটু কাটবে।

এই গল্পটা আমি প্রায়ই বলি। আমার বড় মেয়েটা, হুসনা, যখন ছোট ছিল তখন আঙ্গুল দিয়ে ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করত। সে তার আঙ্গুলগুলো রঙের মধ্যে চুবিয়ে তারপর সেগুলো দিয়ে হাবিজাবি আঁকত। তো একদিন এক বিশাল

কার্ডবোর্ড নিয়ে সে আমার কাছে হাজির! সেখানে নীল রং দিয়ে বিশাল কি যেন আঁকা, আগামাথা কিছুই বুঝলাম না। সে বলল, "আব্বা, দেখো আমি কি এঁকেছি?" আর আমি বললাম, "বাহ, দারুন! একটা পাহাড়!" আর সে বলল, "না, এটা তো আম্মু!" আমি বললাম, "খাইছে!" "আম্মুকে এই কথা বোলো না কিন্তু"

তবে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি তা হলো ওরা আপনার সমর্থন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। ব্যাকুল তারা এর জন্য। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যাদের সন্তানরা টিনেজার, তাদের যখন স্কুল থেকে আনতে যান, এমন কি হয় যে তারা গাড়িতে উঠে কথা বলা থামাতে পারছে না? হয় এমন? "জানো আজকে স্কুলে কি হয়েছে? টিচার এটা বলেছে, ওটা করেছে, পরীক্ষায় 'এ' পেয়েছি"। না! তারা একদম চুপ! বরং আপনিই বলার চেষ্টা করবেন, "কেমন গেল দিন?" .."মোটামুটি".."কি করলে সারাদিন?" .. "কিছু একটা".. "আজকে কোথায় যাবে?" .. "যাব কোথাও"। কথা বলেই না তারা! তাদের কথা বলানো অনেকটা পুলিশের আসামীকে জেরা করার মত ব্যাপার। আপনাকে তারা কিছুই বলে না। আর যখন আপনি তাকে প্রশ্ন করছেন, তখন হয়ত সে তার বন্ধুকে এস,এম,এস পাঠাচ্ছে, "আব্বা আজকে বেশি প্রশ্ন করছে! ঘটনা কি? তুমি ওনাকে কিছু বলেছ নাকি?" ... যা আমি বলতে চাচ্ছি, তা খুবই সহজ। ছোট বয়সে আপনার বাচ্চারা আপনার মনোযোগ পাওয়ার জন্য পাগল থাকে। আর যখন তারা বড় হবে, আপনি তাদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য পাগল হবেন।

কিন্তু তারা যখন ছোট থাকে তখন যদি আপনি তাদের মনোযোগ না দেন – তারা খেলনা নিয়ে আপনার কাছে আসলে যদি বলেন, "ঘরে যাও! আমি সংবাদ দেখছি", "খেলা চলছে। এই, তুমি ওকে একটু সরাও তো!", "সারাদিন অনেক কাজ করেছি, এখন ওকে সামলাতে পারব না", "বাসায় আমার বন্ধুরা এসেছে, কি বলবে ওরা? যাও ঘুমাতে যাও। যাও এখান থেকে" – আপনি যখন ওদের সাথে এমন আচরণ করবেন, যেন তারা আপনার জন্য প্রতিবন্ধকতা, আপনার কাজ হচ্ছে চাকরি করা, আর বাসায় এসেছেন শুধু বিশ্রাম নিতে। না রে ভাই! আপনার কাজ শুরু হয়েছে তখনই যখন আপনি ঘরে ফিরেছেন। সেটাই আপনার আসল কাজ। চাকরিতে যে কাজ করেছেন সেটা শুধুমাত্র এজন্য যেন ঘরের আসল কাজটা ঠিকমত করতে পারেন।

একজন প্রকৃত বাবা হন। উপস্থিত পুরুষদেরকে বলছি। একজন প্রকৃত বাবা হন। আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটান। তারা শুধু এ জন্য নেই যে আপনি তাদের স্কুলে ছেড়ে আসবেন, আর বাসায় ফিরে শুধু ঘুমাতে যাবেন, কোনো ঝামেলায় যাবেন না, তাদের সাথে কথা বলবেন না। এবং তাদের সাথে কথা না বলার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তাদের একটা আইপড টাচ অথবা আইফোন ধরিয়ে দিন, তাদের নিজস্ব রুমে একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ দিয়ে দিন হাই-স্পিড ইন্টারনেট সহ। তাহলে আপনাকে তাদের চেহারাও দেখা লাগবে না। তারা সারাদিন তাদের ঘরে থেকেই ফেসবুকিং করতে থাকবে, অনলাইনেই নিজেদের জন্য নতুন বাবা-মা খুঁজে নিবে না হয়।

সিরিয়াস্লি বলছি। প্রকৃত বাবা হন। প্রকৃত মা হন। আপনার মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের বদলি হিসেবে এইসব জিনিসকে আসতে দিয়েন না। কারণ যদি তা দেন, তাহলে ওরা যখন স্বাবলম্বী হয়ে যাবে তখন বেশির ভাগ বাবা-মার কি হয় জানেন? আপনাদের বেশিরভাগের ছেলেমেয়েরা আপনাদেরকে দেখে কতগুলো টাকার মেশিন হিসেবে। শুধুমাত্র কখন তারা আপনাদের কাছে আসে? - "বাবা, আমাকে ৫ ডলার দাও তো" জানি আজকাল কেউ আর ৫ ডলার চায় না, কমপক্ষে ২০ ডলার। কিচ্ছু বাচ্চাদের চিনি যারা এত কম টাকা দেখেইনি, ৫ ডলারের নোট্ চিনেই না তারা। "আমাকে ২০ ডলার দাও তো", "শপিং মলে যেতে চাই, আমাকে একটু পৌঁছিয়ে দাও তো", "বন্ধুদের বাসায় যাই?" "এটা করতে পারি?" "ওটা কিনতে পারি?" যখন তাদের কোনো কিছুর দরকার তখন তারা আপনার কাছে আসে। এর বাইরে আপনি তাদের খুঁজে পাবেন না। আর যখন তারা বড় হবে, নিজেরাই একটু আধটু কামাই করতে পারবে,

তখন কি হবে? তাদের দেখাই পাবেন না আর। কারণ আপনার টাকার মেশিনও এখন আর দরকার নেই। এর প্রয়োজন শেষ। আপনি যদি এই ধরনের সম্পর্ক তৈরী করেন, তাহলে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছেন। আপনাকে এখনই পরিবর্তন আনতে হবে।

আর পরিবর্তনের উপায় হলোঃ জানি এটা অনেকের জন্যই করাটা কঠিন হবে, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। আমাদেরকে তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হতে হবে। আমাদের সাথে সময় কাটানোটা তাদের কাছে উপভোগ্য হতে হবে।

লেকচারটির ইউটিউব লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=JL9SDIi3zAk&feature=youtu.be

ইংরেজিতে মূল লেকচারটির লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=GgT3AQdv3pg

আপনার সন্তানকে অভিশাপ দেবেন না !

19 May 2015

কুরআনের আলো ডট কম

মাত্র কয়েকদিন আগের ঘটনা। আমাদের পাড়ার আব্দুল্লাহর মা পানিতে ডুবে মরা কিশোর সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে পাগলপারা হয়ে কাঁদছেন। মায়ের বাঁধভাঙ্গা কান্না আর বিলাপ শুনে উপস্থিত কারো পক্ষেই চোখের পানি সংবরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি কাঁদছেন আর বিলাপ করে বলছেন, ‘ও বাবুর আব্বু তুমি আমাকে মেরে ফেল। আমিই তোমার সন্তানকে হত্যা করেছি। গতকালই ওর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি বলেছি, ‘তুই মরিস না; মরলে দশটা ফকিরকে খাওয়াতাম।’

হ্যা, সত্যিই তিনি আগেরদিন ছেলেটির দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে এমন বলেছিলেন। তখন একজন পাগলেরও ভাবার অবকাশ ছিল না যে গর্ভধারিণী মা সত্যিই তার সন্তানের অমঙ্গল কামনা করছেন। কিন্তু অসচেতনভাবে কামনা করা দুর্ঘটনাও কখনো সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। আব্দুল্লাহর মা গতকাল রাগের মাথায় যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন কে জানত আজই তা বাস্তব হয়ে দেখা দেবে।

ঘটনা হলো, সেদিন দুপুরে ছেলেটি তার মায়ের সঙ্গে শুয়ে ছিল। তিনটার দিকে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে একরকম জিদ করেই সে মায়ের কাছ থেকে ছুটে গিয়েছিল বৃষ্টিতে ভিজতে। বাড়ির বাইরে এসে সে আশপাশের সমবয়সী আরও কয়েকটি কিশোরকে পেয়ে যায়। সবাই মিলে কোন বুদ্ধিতে যেন দল বেঁধে যায় পাশের মহল্লার একটি নতুন পুকুরে গোসল করতে। সেখানে গিয়ে সবার আগে সে-ই লাফ দেই পুকুরে। অবুঝ কিশোর ঠিক বুঝতে পারেনি লাফ দিলে পুকুরের প্রায় গভীরে গিয়ে পৌঁছবে সে। যেখানে সাঁতার না জানা একটি কিশোরের জন্য অপেক্ষা করছে অবধারিত মৃত্যু। ঘটনা যা হবার তাই হল। বাচ্চাগুলোর চোখের সামনেই সে পানিতে ডুবল। ওরা ভাবল সে বুঝি তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কিছুক্ষণ পর তারা ওকে না পেয়ে ভয়ে আশপাশের লোকদের ডেকে আনল। ততক্ষণে অবশ্য তার ক্ষুদেকায় দেহ থেকে প্রাণপাখি উড়াল দিয়েছে।

মা তার সন্তানকে অবর্ণনীয় কষ্টে গর্ভে ধারণ করেন। অমানুষিক কষ্টে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আনেন। তারপর নিজের ভালোবাসা আর ত্যাগের সবটুকু উজাড় করে অসহায় একটি শিশুকে যথাক্রমে সুস্থ, সবল, সজ্ঞান ও স্বাবলম্বী করে তোলেন। সন্তান মানুষ করতে গিয়ে বাবা-মাকে যে কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় তা শুধু বাবা-মায়েরাই জানেন। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে এ কষ্ট আরও বেশি। এখানে রোজ দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

অভাবের কারণে একজন নবীন মাকেও একহাতে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আর অপরহাতে বুকের ধন সন্তানটিকে আগলাতে হয়। অনেক মা আছেন যারা সময়মত বাচ্চার খাবারটিও যোগাতে পারেন না রুচিমত। বিশেষত যেসব বাচ্চা জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ পায় না। দরিদ্র পরিবারে এসব শিশুকে যে কত কষ্টে মা জননী বড় করে তোলেন তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। এ সময় মায়েদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়।

অথচ প্রগলভ চরিত্রের অনেক মা'কে এ সময় ধৈর্যহারাও হতে দেখা যায়। অনেক মা সন্তানের ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে অবলীলায় অভিশাপ দিয়ে দিয়ে বসেন। স্নেহময়ী জননী হয়তো তার জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানের যে কোনো অনিষ্ট রোধ করতে চাইবেন। কিন্তু তিনিই আবার রাগের মাথায় অবচেতনে আদরের সন্তানটির অনিষ্ট কামনা করে বসেন। গ্রাম-বাংলায় প্রায়ই দেখা যায় সন্তানদের দুরন্তপনা বা দুষ্টুমিতে নাকাল হয়ে অনেক মা সরাসরি বাচ্চার মৃত্যু কামনা করে বসেন। 'তুই মরিস না', 'তুই মরলে ফকিররে একবেলা ভরপেট খাওয়াতাম', 'আল্লাহ, আমি আর পারিনে', 'এর জ্বালা থেকে আমাকে নিস্তার দাও'- এ জাতীয় বাক্য আমরা অহরহই শুনতে পাই। বিশেষত কৈশোরে এসে গ্রাম-বাংলার শিশুদের দুরন্তপনা কখনো সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে কিশোর সন্তানকে উদ্দেশ করেই সাধারণত মায়েরা এমন অসহিষ্ণু বাক্যোচ্চারণ করে থাকেন। তাই এ সময় মাকে অনেক বেশি ত্যাগ ও ধৈর্যের পারাকাষ্ঠা দেখাতে হয়।

ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের ধারাবাহিকতায় এ বিষয়টি সম্পর্কেও আমরা দিকনির্দেশনা পাই তারই কাছে। এ ব্যাপারেও ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। ইসলাম কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়া বা বদ দু'আ করাকে সমর্থন করে না। আপন সন্তানকে তো দূরের কথা জীবজন্তু এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াও সমর্থন করে না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزْوَةٍ بَطْنِ بُوَاطٍ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِىَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِىَّ وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْ لَعَنَكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ هَذَا اللاَّعِنُ بَعِيرَهُ ». قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « انْزِلْ عَنْهُ فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونٍ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ ».

বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবন 'আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারী ব্যক্তি তাঁর উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল।

তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একেবারে নিশ্চয় হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন ধুত্তুরি। তোর ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তিটা কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহর রাসূল। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করো না। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেবেন।' [মুসলিম : ৭৭০৫]

হাদীসের ব্যাখ্যায় **মোল্লা আলী কারী রহ.** বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করো না।

কারণ, হতে পারে যে সময় তুমি দু'আ করছো, তা দিনের মধ্যে ওই সময় যখন যা-ই দু'আ করা হোক না কেন তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত নও। (মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতীহ : ৭/৭০৩)

হাদীসটি বর্ণনা করে আরেক ব্যাখ্যাকার বলেন,

فالحديث يدل على النهي عن كون الإنسان يدعو على أهله وماله، وذلك عندما يحصل له غضب فيحصل منه الدعاء، وهو مشتمل أيضاً على بيان العلة والحكمة في ذلك، وأنه قد يكون هذا الدعاء يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان فيما سأل من الشر أو من الشيء الذي لا ينبغي لأهله وماله.

'হাদীসটি রাগের মাথায় মানুষের তার পরিবার ও সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করার নিষিদ্ধতা প্রমাণ করে। হাদীসটি এর কারণও তুলে ধরে। আর তা হলো, এ দু'আটি কবুলের বিশেষ মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ফলে মানুষের সবই কবুল হয়ে যায় চাই তা ভালো হোক বা মন্দ, যা সে তার পরিবার বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না।' [আবদুল মুহসিন, শারহু সুনান আবী দাউদ : ৮/২৮৮]

নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে দু'আ করার অর্থ তো নিজেই নিজেকে হত্যার তথা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ – البقرة: ١٩٥

'আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।' [সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৫]

অতএব প্রতিটি মাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত তাহলে কেমন লাগবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? এ জন্য রাগের মাথায়ও কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে শুধু মায়েদেরই নয়, আমাদের সবারই উচিত নিজের, নিজের সন্তান ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করা থেকে সংযত হওয়া। রাগের সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া।

আর মেয়েদের সবিশেষভাবে বলতে চাই, মা, আপনি অনেক সয়েছেন, অনেক সবর করেছেন, আরেকটু সবর করুন। রাগের মাথায় সন্তানকে অভিশাপ দেয়া থেকে সংযত থাকুন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমীন।

আমিও জান্নাতি তুমিও জান্নাতি

লেখকঃ শামসুজ্জামান বারী

প্রখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম। যোগ্যতা ও কীর্তিতে কোনো কমতি নেই। কিন্তু চেহারা-সূরত সীমাহীন কদাকার। দেহের বর্ণ কালো। মোটা মোটা ঠোঁট। চোখ ও দাঁত হলুদ। মোটকথা বিশ্রী হওয়ার যত আলামত হতে পারে তার সবই তার মধ্যে বিদ্যমান। অপরদিকে স্ত্রী খুবই রূপ -সৌন্দর্যের অধিকারীনী। উভয়ে একত্রে বসলে মনে হত রোদ আর ছায়া! যেন একদিকে রৌদ্রের আলো ঝলমল করছে অপরদিকে রাতের আঁধার ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

একদিন দু'জন পাশাপাশি বসা। স্বামী ইয়াহইয়া স্ত্রীকে বললেন, তুমি এবং আমি উভয়েই নিশ্চিত জান্নাতি। কেননা, আমি তোমার মত সুন্দরী রূপসী স্ত্রী পেয়েছি। তাই আমার কোনো মুহূর্ত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থেকে মুক্ত থাকে না। কৃতজ্ঞতার পথ বেয়ে আমি জান্নাতে যাব। আর তুমি, আমার মত কুৎসিত স্বামী পেয়ে সবর ও ধৈর্য ধারণ করছ। তোমারও প্রতিটি মুহূর্ত সবর থেকে মুক্ত নয়। তুমি সবরের পথে জান্নাতে চলে যাবে। সুতরাং আমিও জান্নাতি, তুমিও জান্নাতি। [খুতুবাতে তাইয়্যেব: ৩৬]

ঘরে প্রবেশ করুন সালামের মাধ্যমে

লেখকঃ রাজিব হাসান

হযরত উমার (রাদিয়াল্লাহু য়া'নহু) বলেছেন, "শাইত্বনের চেলা (সাগরেদ) নয়টি।

(১) যালিয়াতুন:যালিয়াতুন বাজারে থাকে। বাজারে থেকে সে তার পতাকা উড্ডয়ন করে।

(২) অসাইন: মসিবত বা বিপদের মধ্যে থাকে।

(৩) লাকুস: মাজুসী' বা অগ্নি পূজারীদের সাথে থাকে।

(৪) আ'ওয়ান: রাজা-বাদশাহদের সংগে থাকে।

(৫) হাফফাফ: মদের সংগে থাকে।

(৬) মুররাহ: গান-বাজনার সাথে থাকে।

(৭) মুসাইবিত: সে এমন সংবাদ দেয় যা ভিত্তিহীন।

(৮) ওলহান: ওলহান অযু, নামায ও ইবাদতে ওয়াসওয়াসা দেয়।

(৯) দাসিম: ঘর বাড়িতে থাকে। বাড়িতে প্রবেশের সময় কোন ব্যক্তি যদি বাড়ির লোকদেরকে সালাম না দেয়, তাহলে #দাসিম নামক শয়তানের চেলা বাড়ির লোকদেরকে মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করে দেয়, শেষ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়, স্ত্রী খুলা করে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যায়, মারধর করে। (১)

.

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব তৈরি করার মাঝেই দাসিমের চূড়ান্ত সফলতা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'য়ালাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "শাইত্বন মানুষের মাঝে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। (২)

.

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করা শাইত্বনের জন্য নতুন নয়। সুলাইমান (আ:)-এর সময়কালে শাইত্বনদের কার্যক্রম বর্ণনায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা শেখাত। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে" (৩)

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ তৈরিকারী এই দাসিম সরদার ইবলিসের কাছে বেশ প্রিয়।

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, নিশ্চয় ইবলিস পানির ওপর তার সিংহাসন বসায়, অতঃপর তার বাহিনীকে পাঠায় (মানুষকে বিপথগামী করার জন্য)। তাদের মধ্যে তার কাছে সবচেয়ে নিকটবর্তী সে-ই হয় যে সবচেয়ে বড় ফিতনা তৈরি করতে পারে। তো, কেউ এসে জানায়, আমি ওটা করেছি, সেটা করেছি; ইবলিস বলে, এটা তেমন কিছু করো নি। অতঃপর অন্য একজন এসে জানায়, আমি অমুককে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ি নি, যতক্ষণ না তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। ইবলিস তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, হ্যাঁ তুমি বেশ করেছ।" (৪)

প্রিয় পাঠক। এখানে রুট-কউজ বা মূল কারণ কি? বুঝতে কি পারছেন? সামান্য একটা আমলের প্রতি গাফলতির কারণে কত দূর পর্যন্ত পানি গড়ায় বুঝতে পারছেন? ঘরে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে ভেবে দেখেছেন একটিবারের জন্য?

নিজেকে ভাঙুন। আজকে থেকেই দাসিমের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করুন। লম্বা শ্রুতিমধুর এক সালামে ঘর বাড়ি কাঁপিয়ে দিন। শাইত্বনের জন্য কুরুক্ষেত্র তৈরী করুন আপনার আবাসস্থল। ব্যবধান আজই তৈরী করুন। ঘর শাইত্বন মুক্ত করে আরামে থাকুন। শান্তিতে থাকুন।

"আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনের রাযীম"

.

_____

তথ্যসূত্র:

১। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লা-হ)
"আল-ইসতিদাদ লি-ইয়াওমিল মাআ'দ" (পরকালের পাথেয়)।
২। সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭১৭১
৩। আল-কুরআন, ২:১০২
৪। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৮১৩]

বিয়ের মাস

লেখকঃ মাইমুনা জ্যোতি

শাওয়াল মাস বিয়ের মাস । শাওয়াল মাসে বিয়ে করা সুন্নাত । এই শাওয়াল মাসেই নবী(স:) আয়েশা(রা:) সহ বেশ কয়েকজন উম্মুল মুমিনীনদেরকে বিয়ে করেছিলেন ।

নবী (স:) বলেছেন,
শাওয়াল মাসে এবং জুমায়ার দিনে মসজিদে বিয়ে করা সুন্নাত ।
(মুসলিম: ১৪২৩, বায়হাকি: ১৪৬৯৯)

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত,
রাসূল (স:) আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই বিয়ের রজনী উদযাপন করেছেন । অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে ?
(মুসলিম: ১৪২৩)

তো যাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বা হতে যাচ্ছে তারা এই শাওয়াল মাসেই বিয়ে করে নিতে পারেন, এতে করে বড় একটি সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে । বিয়ের মত লাইফের এত বড় একটা ব্যাপারে সুন্নাত সহকারে সম্পন্ন করা খুবি বিশাল এক ব্যাপার । কারণ যে কোন কাজ আল্লাহ তা'লার রহমত দিয়ে শুরু হলে তাতে বরকত থাকে, শান্তিও থাকে ।

তবে হ্যাঁ বিয়ের ব্যাপার তো, তাই খুব ভেবে চিন্তেই করা উচিত । কারণ সারাটা জীবনের ব্যাপার । যাকে তাকে করে ফেলা উচিত না । মানে যে যেরকম তার ঠিক সেরকমি কাউকে বিয়ে করা উচিত । কেউ যদি ধার্মিক থাকে তাহলে তার ধার্মিক কাউকেই বিয়ে করা উচিত । আবার যে উড়াধুরা তার ঐরকম উড়াধুরা কাউকেই বিয়ে করা উচিত । তাহলেই সংসারে শান্তি থাকবে ।

আর দুজনের একজন যদি ধার্মিক এবং অপরজন যদি হয় উড়াধুরা ধার্মিক তাহলে .....
তবে বিয়ে নিয়ে আমাদের সমাজে যা হয় তা খুবি দুঃখ জনক । সাধারণ ভাবেই ঘড়োয়া পরিবেশে বিয়ে করা উচিত । ইসলাম সাধারণ ভাবেই বিয়ে করাকে উৎসাহিত করে । এবং এটাই ভালো । এত ঢাক ঢোল পিটিয়ে, লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিয়ে করা অর্থহীন । মজার ব্যাপার হলো অনেক মানুষি লাখ লাখ টাকা বিয়েতে খরচ করে ঠিকি কিন্তু পরে বউকে আর দেনমোহর দেয়ার মত টাকা পায় না ! অথচ উল্টোটা হওয়া উচিত ।

দুই বর্ণের একটা শব্দ

লেখকঃ শাবনাজ রাফনী

বিয়ে...দুটো বর্ণের একটা শব্দ। অথচ কত বর্ণে বর্ণীল। দুচোখ ভর্তি স্বপ্ন, পেটের মধ্যে প্রচুর প্রজাপতির ওড়াওড়ি, আর ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে চলা হার্টবীট।একজন মেয়ের কাছে বিয়েটা কেমন? মনে হয় যেন স্বামীর চোখের দিকে তাকালে আশেপাশের সবকিছু চুরচুর করে ভেঙ্গে পড়বে, যার সাথে অনন্তকাল হাতে হাত রেখে হেঁটে চলা যায়
দিব্বি...ভাবনাহীন। এরকমই তো মনে হয়, তাইনা...যারা সদ্যই বিয়ে করেছেন। নতুন বউদের বলছি, আপনার নিশ্চই খুব ইচ্ছে করে চিৎকার করে সারা দুনিয়ার সব্বাইকে জানিয়ে দিতে,

“দেখ এই মানুষটাকে আমি ভালোবাসি, আমার আশা আকাংক্ষা আমার পূর্ণতা এই মানুষটি...আমি এঁকে আমার জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি...আই লাভ ইউ ...আই লাভ ইউ ...অ্যান্ড আই অ্যাম ম্যাড ফর ইউ...”

খুবই স্বাভাবিক। মানুষ সবসময় চায় তার আনন্দকে অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে। নিজের প্রাপ্তিগুলো সবাইকে জানাতে। কিন্তু আমরা সাথে সাথে ভুলে যাই যে এই দুনিয়াতে পরীক্ষা ছাড়া কোন প্রাপ্তি আসেনা। মুমিনের জন্য কয়েদখানা এই দুনিয়ায় পদে পদে ফাঁদ পাতা রয়েছে। একটু অসাবধান হলেন তো হয়েছে, ধপাস করে গর্তে পড়ে গেলেন। এরকমই একটা গর্ত হচ্ছে নজর লাগা। অনেকেই এটাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেন। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন যে নজর লাগা সত্য। এটা তাক্বদির থেকেও আগে বেড়ে যায়। এমনকি একটা মানুষকে পাহাড় থেকে ফেলে দিতে পারে।

আচ্ছা নজর লাগা মানে কি যে নজর দিয়েছে সে খারাপ মানুষ? নট নেসেসারিলি সে একজন খারাপ মানুষ। দু’আ ছাড়া কারও প্রশংসা করলেও নজর লেগে যেতে পারে। যেমন, এক সাহাবী আরেক সাহাবীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করাতে ওই সাহাবী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছিনা। একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন যে নজর লাগা সম্পর্কিত অনেক অথেনটিক ঘটনা বর্ণিত আছে।

তাছাড়া আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা এরকম অনেক বোন আছেন যাদের সংসারে অশান্তি চলছে। কেউ স্বামীর সাথে অ্যাডজাস্টের জন্য স্ট্রাগল করে চলেছেন,কেউ বিধবা কেউ ডিভোর্সড। আপনার সুখময় বিবাহিত জীবনের এরকম শো অফ কি তাদের মন খারাপ করে দিবে না?

নজর লাগা ছাড়াও হিংসা ব্যাপারটা তো আছেই। আপনার সুখ দেখে মানুষ হিংসা করতে পারে। হিংসা কতটা ভয়াবহ আমরা সহজেই আঁচ করতে পারি যখন দেখি ক্বুর’আনে হিংসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে সুরাহ ফালাক্বে আয়াত নাযিল হয়েছে।

তাহলে উপায়?

উপায় হচ্ছে নিজের আনন্দগুলোকে শো অফ না করা। আল্লাহর দেয়া ব্লেসিংগুলোর জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর কাছে দু’আ করা যেন মানুষের নজর লাগা এবং হিংসা থেকে আপনার দাম্পত্য সম্পর্ককে আল্লাহ হেফাযত করেন।

আর শো অফের জন্য জান্নাত তো পড়েই আছে ইনশা-আল্লাহ।

বিয়ে

ইসলামিক প্রশ্ন ও উত্তর পেইজ থেকে সংগৃহীত

রাসূল সা. বলেছেন,কেয়ামতের আগে বিবাহ কঠিন আর ব্যভিচার সহজ হয়ে যাবে। দু:খজনক যে,আমরা নিরলসভাবে কেয়ামত কায়েমের আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অবৈধভাবে জৈবিক চাহিদা মেটানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমরা হাতের নাগালেই রেখেছি।অপরদিকে বৈধ উপায় বিবাহকে করেছি নানান জটিলতায় অলঙ্কৃত।
বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের আবিষ্কৃত জটিলতাগুলো হলো -
১. প্রথমেই আমরা পণ করেছি, উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বে বিবাহের কথা মুখেই আনা যাবে না।
২. এর সাথে যোগ করেছি, কোন চাকরি বা ব্যবসায় আগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।
৩. বিবাহের মোহর কমপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা হতে হবে। লাখ খানি টাকা ও কয়েক ভড়ি স্বর্ণালঙ্কার কাবিনের সময়ই দিতে হবে।
৪. কনেপক্ষকে বরের ঘর (ফার্নিচার দিয়ে) সাজিয়ে দিতে হবে। কমপক্ষে দুএকটা ফার্নিচার তো দিতেই হবে।
৫. বিয়ের ওলিমাতে হাজার মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে। কমপক্ষে কয়েকশ মানুষের আয়োজন তো করতেই হবে, না

হলে বিয়েই হবে না। এখন আয়োজকের সামর্থ যেমনই হোক।
৬. বিয়ের অনুষ্ঠান চলবে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে। গায়ে হলুদ,বাড়িসজ্জা তো না করলেই নয়। আর নামধারী মুসলিমের বিয়েতে দিনরাতব্যাপী বিকট শব্দে গানবাদ্য না করলে বিবাহই অপূর্ণ থেকে যাবে।
আমাদের আবিষ্কৃত উপরোক্ত 'অলঙ্ঘনীয় আইন' অনুযায়ী ছেলের উপযুক্ত হতে বয়স গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিশ বা তদুর্ধ্বে। আর সেই 'উপযুক্ত' ছেলের অপেক্ষা করতে করতে মেয়ের বয়স পঁচিশ পেরিয়ে যায়। ততদিনে তারা অন্তত অর্ধেক যৌবন হারিয়ে ফেলে। আর অবিবাহিত অবস্থায় যৌবনের সেই অর্ধেক সময়টা যে তাদের কিভাবে কাটে,প্রাপ্তবয়স্ক কারোই তা অজানা নয়।
বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে প্রচলিত ভুলগুলো হলো–
১. বিবাহকে আমরা মূলত বংশ বা প্রজন্ম রক্ষার একটা বৈধ প্রক্রিয়া মনে করছি মাত্র। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা। যেমন রাসূল সা. বলেছেন, "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج অর্থাৎ হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সক্ষমতা রাখে তারা যেন (দ্রুত) বিবাহ করে নেয়। কারণ এটা দৃষ্টি সংযত ও যৌনাঙ্গ নিরাপদ রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা"। এই হাদীসে বিবাহের মুখ্যোদ্দেশ্য বলে দেয়া হয়েছে।
২. বিয়ের ক্ষেত্রে আমাদের মৌলিক আরেকটি ভুল হলো,আমরা এটিকে একটি সামাজিক আচার মনে করছি। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। রাসূল সা. বলেছেন," اذا تزوج العبد فقداستكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي অর্থাৎ যখন মুমিন বান্দা বিবাহ করে তখন সে ইমান সংরক্ষণের অর্ধেক দায়ীত্ব পালন করে ফেলে। অতএব সে যেন ইমানরক্ষার বাকি অর্ধেক দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে"। এই হাদীসে বিবাহকে ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের অর্ধেক সহযোগী বলা হয়েছে। এখান থেকে বিবেকবান যেকেউই আশা করি বুঝতে পারছেন,বিবাহ কত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত।
৩. বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটি বড় ভুল, বিয়ের জন্য আমরা অভিভাবকরা প্রায়ই নিজেদের পছন্দের স্থান–কাল–পাত্র/পাত্রীর দিকেই শুধু খেয়াল রাখি। কিন্তু যার বিবাহ এক্ষেত্রে তার মতামত বা চাহিদার প্রতি আমরা গুরুত্বই দিতে চাই না। আমাদের বোঝা উচিত, বৈবাহিক জীবনটা তার,আমাদের নয়। তাই তার জীবনটা তার মতো করেই সাজানো উচিত। আমাদের ইচ্ছা মতো নয়।
৪. আলোচ্য বিষয়ে আমাদের আরেকটি ভুল, বিবাহকে আমরা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় আবদ্ধ করে ফেলছি এবং সকলের প্রায় একই বয়সে বিয়ে হওয়া উচিত বলে মনে করছি। এখানেও আমাদের বোঝা দরকার, বিবাহটা পানাহারের মতোই একটা জৈবিক চাহিদা। খাদ্য চাহিদা যেমন আপেক্ষিক,তেমনি বিবাহের চাহিদাটাও। কারো ঘন ঘন ক্ষিদে পায়, কারো ক্ষিদে পেতে অনেক সময় লাগে। তদ্রূপ বিবাহের প্রয়োজন কারো আগে দেখা দেয়,কারো পরে। তাই সকলের বিবাহের একই বয়সসীমা নির্ধারন করা যৌক্তিক নয়। রাস্তার যেকোন অনাহারী ভিক্ষুকের কষ্ট আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারলেও যে বয়সে বিবাহের চাহিদা তৈরী হয় অবিবাহিতের তখন কী যে কষ্ট, আশ্চর্যজনক যে, আমরা সেটা বুঝতে চাই না।
৫. এখানে আমাদের আরেকটি বুঝার ভুল হলো বিবাহের অার্থিক সক্ষমতা নিয়ে। আমরা মনে করছি, ছেলের নিজের সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে হবে। আমাদের খেয়াল করা বাঞ্ছনীয় যে, আধুনিক যুগে আমরা ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করতে তাদের বয়স প্রায় পঁচিশ পাড় করে ফেলি অনেকাংশেই উচ্চ চাকরি পাওয়ার আশায়। অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত বেকার এখন পরো বিশ্বে হন্যে হয়ে ঘুড়ছে। আবার অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত অনেক মানুষ খুবই স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে। মনে রাখা দরকার, আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য উচু মানের চাকরি আবশ্যক নয়। উচ্চশিক্ষা অর্জন না করে একটি ছেলে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পর জীবিকা উপার্জন শুরু করলে অনেক আগেই সে বিবাহের প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করতে পারে। উচ্চশিক্ষা বা অত্যুচ্চশিক্ষা যাই অর্জন করি বিবাহের চাহিদা কিন্তু বসে থাকবে না। তাই পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতি থাকলে অভিভাবকদের কর্তব্য সন্তানকে আশঙ্কামুক্ত করার ব্যবস্থা করা।
উল্লেখ্য যে, রাসূল সা. সন্তানের প্রতি পিতামাতার মৌলিক দশটি দায়িত্বের কথা বলেছেন। সর্বশেষ মৌলিক দায়িত্বটি হলো বিবাহের বয়স হলে দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষনা করেছেন, " وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত আছে এবং যেসব সচ্চরিত্রবান দাস দাসী আছে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করো। যদি

তারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হয়, আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আর আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ও সর্বজ্ঞাত"। (সূরা নূর, আয়াত নং ৩২) মুফাসসীরগণ এর তাফসীরে বলেছেন, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, যে বিবাহ করবে আল্লাহ পাক তাকে সচ্ছল করে দেবেন। তাই কোন মুসলমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ করার সুযোগ নেই।
তাই আসুন, মনগড়া সামাজিক প্রবণতা দূর করে মহান আল্লাহপ্রদত্ব জীবনবিধান বাস্তবায়নে সচেষ্ট হই। প্রকৃত শান্তি ও সফলতা একমাত্র এখানেই। যদি আমরা যুবসমাজকে সব ধরণের অবৈধ সম্পর্ক থেকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে আমাদের বিবাহ নিয়ে উদাসীনতা ও দীর্ঘসূত্রীতা করার কোনই সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তার মনোনীত জীবনব্যবস্থায় পরিচালিত করুন। আমিন। কষ্ট করে পড়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

মনোমালিন্য

লেখকঃ হানিফ বিন সোহরাব

১.
কোন এক অনুষ্ঠানে দর্শক সারিতে বসে থাকা এক মহিলা, আমন্ত্রিত অতিথির কাছে অনুযোগের সুরে বললো
- আমার স্বামী আগে আমাকে অনেক ভালোবাসতো। সে অনেক রোমান্টিক ছিল। এখন আর আগের মতো নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। এখনো আমরা অনেক ভালো আছি কিন্তু আগের সেই রোমান্স বা ভালোবাসাটা নেই।
অথিতিঃ (পাশে বসা ভদ্রলোককে দেখিয়ে) উনি আপনার স্বামী ?
- জ্বি
- আপনাদের সংসার কতো বছরের ?
- ৭-৮ বছর
- ঝামেলা শুরু হয়েছে কতদিন হয় ?
- ৬ মাস কি ১ বছর
- আগে যে ৬-৭ বছর সুখে শান্তিতে ছিলেন। তখন কি কাউকে বলেছেন আপনারা যে সুখে আছেন ?
- নাহ।
- (জোরে ধমক দিয়ে) তাহলে এখন কেন পাবলিকলি নিজেদের ব্যক্তিগত কথা বলতে এসেছেন ? ৬-৭ বছর সুখে থাকতে পেরেছেন আর এখন ৬ মাসেই অভিযোগ করা শুরু করেছেন। সুখ গুলো যেমন ভাগাভাগি করে নিতে হয় তেমনি দুঃখ গুলোও ভাগাভাগি করে নিতে হয়।
(মূল ভাবটা এমনই। ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড কপি করা হয়নি)

২.

খুব সাধারণ কিছু কারনে টানা ৪ দিন আমি খুব বেশি আনন্দে ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি এতোটা আনন্দে আগে কখনোই ছিলাম না। ৩য় বা ৪র্থ দিন আমি রাস্তায় হাটছি আর মনে মনে ভাবছি- মানুষ এতো সুখে থাকে কিভাবে! এতো বেশি সুখ সহ্য করে কিভাবে! সেই থেকে শুরু। এরপর মনে হয় না আর কখনো সেই আনন্দটা ফিরে পেয়েছি। টানা ৪ দিন পাইইনি। হতে পারে আমার নিজেরই নজর লেগেছে নতুবা শুকরিয়া আদায় না করার কারনে এমন হয়েছে।

.

আমরা অনেকেই পরীক্ষার রেজাল্ট/ ভালো চাকরী/ ভালো স্পাউজ পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। এখন তো আনন্দ উচ্ছ্বাস গুলো ফেসবুকের মাধ্যমে সবাইকেই জানিয়ে দেই। কিছুদিন পর যখন সব ফিঁকে হয়ে যায় তখন কারন অনুসন্ধান করে খুঁজে পাই না। আমরা ভুলে যাই বদ নজর বলে কিছু আছে। আমাদের চারপাশে হিংসুক পরশ্রীকাতর কিছু মানুষ থাকে। ভালো থাকা মুহূর্ত গুলোতে জায়নামাজে শুকরিয়া আদায় না করে ফেসবুকে শুকরিয়া আদায় করতেই বেশি পছন্দ করি আমরা। যার ফলশ্রুতিতে অশান্তির ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাই।

৩.

দ্বীনি সার্কেলের রিসেন্টলি বিয়ের সম্ভাবনা আছে এবং সদ্য বিবাহিত মানুষগুলো একটু বেশি ফ্যান্টাসিতে ভোগে। আয়িশা (রা.) এর সাথে রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসা, খুনসুটি। খাদিজা (রা.)-কে সম্মান করা ও গভীর ভালোবাসা। তিনিও রাসূল (সা.)-এর সুখ দুঃখের সঙ্গী হওয়া।
সীরাতের এই অংশটাতেই ফোকাস থাকে আমাদের। সেভাবেই স্বপ্ন সাজাতে শুরু করে দেই আমরা। সীরাতের বাকী অংশ গুলো কিভাবে যেন স্কিপ করে যাই আমরা।

.

এক দ্বীনি ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি- জনৈক ভগিনি সীরাত পড়ে এতোটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে। যখন দেখলেন তার স্বামীর মধ্যে রাসূল (সা.)-এর গুন গুলো নেই। তখন তিনি হতাশ হয়ে গেলেন। এক সময় ডিভোর্স চেয়ে নিলেন।

.

আমরা শুধু আয়িশা (রা.)-এর সাথে ভালোবাসা ও খুনসুটির কথা গুলোই দেখি। অথচ ইফকের ঘটনার সময় এক মাসের বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে দেখিনা। চিন্তা করে দেখুন তো যেই মানুষটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তাঁর সাথে এক মাসের বিচ্ছেদ কতোটা যন্ত্রণার। একবার আবু বকর (রা.)-এর অবস্থাটা চিন্তা করে দেখুন তো। এক পাশে কলিজার টুকরা কন্যা অন্যপাশে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসেন যেই রাসূল (সা.)-কে, উনার মনমালিন্য। ঘটনাটার কথা মনে পড়লেই ইচ্ছে করে জমিনে বিচরণ করা প্রত্যেকটা মুনাফিক ও শাতিমকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেই।

.

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের আম্মাজান (রা.) কে সম্মানিত করেছেন। কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে উনার পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন।

.

আমরা উনাদের ভালোবাসা দেখি তবে এক মাসের তীব্র মনোকষ্টের কথা ভুলে যাই। টানা ৩ মাস চুলায় আগুন না জ্বলার কথা ভুলে যাই।

.

খাদিজা (রা.)-কে এতো এতো ভালোবাসতো ও সম্মান করতো এটা মনে থাকে। তবে এটা ভুলে যাই যে, অনেক গুলো দাস-দাসী/চাকর-চাকরানী থাকার পরও খাদিজা (রা.) নিজে খাবার নিয়ে যেতেন হেরা গুহায়। তিনি তো কাউকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিতে পারতেন। নিজে না গেলে এমন কি হতো ? তিনি তো প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছেন। প্রভাবশালী ও বিত্তশালী মানুষ ছিলেন। তবুও তিনি অবরোধের সময় রাসূল (সা.) এর সঙ্গে ছিলেন। থাকা খাওয়ার কষ্ট সহ্য করেছেন। একদিন দু'দিন নয়। ৩ টি বছর কষ্ট সহ্য করেছেন। আল্লাহ্ আম্মাজানকে (রা.) জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন। কেন যেন আমরা এগুলো স্কিপ করে যাই।

.

সম্পর্ক গুলো তখনই প্রাণবন্ত হবে, সংসার গুলো তখনই সুখের হবে। যখন আমরা অধিকারের চাইতে নিজ নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে বেশি সচেতন হবো।

বিয়েঃ হতে হতেও হলো না

লেখকঃ মিফতাহ আয যামান

বিয়ে হল না ফেসবুক এক্টিভিটির কারণে। হয়ত এরকম না হওয়া বিয়ের সংখ্যা এক নয়, আরো বেশি। এবং সেটা সামনে আরো বেশি হওয়ার কথা।

.

পাত্রীর বায়োডেটা দেখে পাত্র খুব কনভিন্সড। পাত্রী পক্ষেরও কোন আপত্তি নেই। এখন শুধু দেখা করা এবং কথাবার্তার পর্ব বাকি।

.

কি মনে করে যেন পাত্র পাত্রীর নাম ফেসবুকে সার্চ করল। এরপরই সে বেঁকে বসেছে। পাত্রী ফেসবুকে গায়ির মাহরামদের সাথে অযথা কথাবার্তা বলে। তার বিষয়টা একেবারেই পছন্দ হয় নি। এমনিতে পাত্রী (পোষাকের দিক থেকে) পর্দা করে, ফরয মেনেই করে।

.

কিন্তু পাত্র এরকম পাত্রী বিয়ে করবে না। কথা-বার্তাগুলো যে আজকালকার জাস্ট-ফ্রেন্ডদের কথাবার্তার মত, ঠিক সেরকমও নাকি না। কিছু খুনশুটি হয়ত খুঁজলে পাওয়া যাবে। কিন্তু পাত্র আর কিছুতেই রাজি হল না।

.
.

আপনারা হয়ত ভাববেন যে এতটুকুর জন্য পাত্র বিয়ে ভেঙে দিল!! আমি বলবো, গাইরাত থাকা তো মানুষের ফিতরাহ। আবার আরেক পক্ষ বলবেন যে, পাত্রীটি এমন করত কেন! তখন বলবো ত্রুটি নিয়েই তো মানুষ, তাও আবার এ যামানায়। আসলে আমি কোন পক্ষকেই দোষ দিচ্ছি না। তবে ত্রুটি অবশ্যই ছিল। হয়ত পাত্রী নিজের সেসব ব্যাপারে অনুতপ্ত, হয়ত কথাবার্তা বলে তাকে একটা সুযোগ দেয়া উচিত ছিল। বিয়েটা হতেই পারত। তবে বড় কথা হল যে, তকদীরে লেখা ছিল, তাই বিয়েটা হয় নি। তাই ত্রুটিগুলো থেকে শিক্ষা নেয়া বুদ্ধিমানদের কাজ। এ কারণেই মূলত এ নিয়ে লেখা।

.
.

ক্যাসুয়ালি আমরা কত ধরণের কথা বলি, কতজনের সাথে কত কথা বলি, বলার সাথে সাথেই তা শেষ, যাদের বললাম, তারা আর আল্লাহ বাদে কেউ সাক্ষী থাকলো না। কিন্তু অনলাইনের যুগে তা আর তেমন থাকলো না। আপনি যা বললেন অথবা লিখলেন, অনেক অনেক মানুষ সেগুলোর সাক্ষী থাকলো। হতে পারে মৃত্যুর পরও সেটা রয়ে যাচ্ছে।

.

এই পাত্রীর ব্যাপারটা ছাড়াও, অনলাইনে তো দেখা যায় যে ছেলে-মেয়েরা হর-হামেশা গায়ির মাহরামদের সাথে প্রকাশ্যেই খুনশুটি করে বেড়ায়। ইনবক্সগুলোতে কি হয় কিছুটা হলে এর থেকে আঁচ করা যায়। আমি আর এস্ট্রিম কথাবার্তায় গেলাম না। এগুলো যে শুধু দ্বীন বিমুখ মানুষদের মধ্যেই তা কিন্তু না, হয়ত দ্বীনের দিকে আসছে কিন্তু এইরকম ফিতনা থেকে নিজেদের সেভাবে বাঁচাতে পারছে না। বিষয়টা হল যে, অনেক লোক সাক্ষী থেকে যাচ্ছে। এর দুনিয়াবী একটা কুফল হল যে, এরকম বিয়ে হতে হতেও না হওয়া।

.

কাছকাছি আরেকটি কেইসের কথা জানি, সেখানে পাত্রী বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেয় এই দেখে যে পাত্র পরিচিত গায়ির মাহরামদের সাথে অযথা খুনশুটি মূলক কমেন্ট চালাচালি করে। এগুলো অবশ্যই মানুষের গাইরাতে লাগে। এমনকি দ্বীন বিমূখ মানুষেরও। কারণ আমাদের ফিতরাতেই এই গাইরাত। এর লঙ্ঘনের কারণেই দেখা যায় অধিকাংশ দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। আর বর্তমানে অনলাইনের যুগে সেটা আরো মারত্মক হওয়ার দিকে।

.

এগুলো দেখতেও খুব দৃষ্টিকটু। মানুষের বদ নযর আরো বেশি করে পড়ার কথা, কারণ এসব দেখলে মানুষের মনে মন্দ ধারণা আসতে পারে। তাছাড়া কেউ না দেখলেও, মুছে ফেললেও, গোপণে করলেও আল্লাহ তো দেখছেন। দেখা যায় যে অফলাইনে গায়ির মাহরামদের সাথে যাদের উঠাবসা বেশি, তাদের জন্য অনলাইনেও গায়ির মাহরামদের ছাড়তে খুব কষ্ট হয়। আবার এমনও হয় যে অফলাইনে গায়ির মাহরামদের এড়িয়ে চলেন, কিন্তু অনলাইনে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। অফলাইনে কি করছেন না করছেন আল্লাহ তা'আলা দেখছেন। গোপণ বিষয়ে আল্লাহ মাফ করেন। কিন্তু যেগুলোর সাক্ষী রাখছেন সেগুলোর কি হবে? সেগুলোর শাস্তি তো দুনিয়ার জীবনেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়াকে কঠিন করে দেয়া হবে।

.

আল্লাহ তা'আলা বুঝ দান করুক, সঠিক পথ সহজ করুক। আমাদের এবং আপনাদের ত্রুটিগুলো পরিশুদ্ধ করে দিক।

স্বামীর যেসব গুণাবলীর কারণে স্ত্রীরা তাদের ভালোবাসেন !!

পেইজ "ওহী" থেকে

আমরা জানি,আমাদের মাঝে সে ব্যক্তি ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। একজন পুরুষ ভালো জীবনসঙ্গী হিসেবে তার স্ত্রীর কাছে ভালো স্বামী হতে পারেন নানান উপায়ে। স্ত্রীর কাছে স্বামীরা যেসব গুণাবলীর কারণে ভালো হয় তার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ হলো,

.

.

❒ স্ত্রীর প্রতি তিনি সুন্দর ব্যবহার করেন। উত্তম শব্দ ব্যবহার করে কথা বলেন। তার প্রতি তিনি নম্র ও দয়ার্দ্র থাকেন।

.

❒ জীবনসঙ্গিনীর অধিকারের বিষয়গুলো তিনি অবহেলা করেন না, তা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে চেষ্টা করেন।

.

❒ বাইরে নানান কাজে থাকলেও অন্য কোন মহিলার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হন না। দৃষ্টিকে সংযত রাখেন, হৃদয়েকেও অত্যন্ত সচেতনভাবে সতর্ক রাখেন।

.

❒ নিজে ইসলাম শিখেন নিয়মিত, স্ত্রীকে নিয়ে শিখেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন। দু'জনে মিলে ইসলামকে পালনের চেষ্টা করেন।

.

❒ জীবনসঙ্গিনী যখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, তিনি শক্ত অবলম্বন হয়ে তার পাশে থাকেন।

.

❒ যদি তার স্ত্রী কখনো তাকে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে ফেলে, তিনি নিজেকে শান্ত রাখেন। খেপে যান না কেননা তিনি ধরেই নেন স্ত্রী হয়ত তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দিতে চাননি, অসতর্কতায় এমনটি হয়ে গেছে।

.

❒ জীবনসঙ্গিনীর ছোট ছোট ভুলগুলো তিনি এড়িয়ে যান এবং তার ভালো কাজগুলোকে উৎসাহিত করেন। তার পরিশ্রমের কাজগুলোর ব্যাপারে প্রশংসা করেন।

.

❒ ঘরের কাজগুলোতে স্ত্রীকে সাধ্যমতন সাহায্য করেন। তার জন্য কাজ ফেলে রেখে দেন না।

.

❒ সন্তানদেরকে ইসলামিক জ্ঞানে এবং আচরণে বড় করার ব্যাপারে সচেতন থাকেন। সন্তানদের ইসলামিকভাবে বড় করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আলাপ করে স্ত্রীর সাথে। বাবা-মায়ের আচরণ সন্তানদের প্রভাবিত করে, তাই বাবা-মায়েরা নিজেরাও সচেতন থাকেন নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র, স্বভাব এবং আচরণ নিয়ে।

.

❒ কোন কারণে মনোমালিন্য হলেও ঘরের বাইরে কখনো দু'জনে আলাদা হন না, স্ত্রী বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে সবসময় তাকে সঙ্গ দেন। মাঝে-মাঝেই দু'জনে মিলে ঘুরতে যান যেন স্ত্রী কিছুটা সময় তার সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত হয় যা তাদের সম্পর্ককে প্রগাঢ় করবে।

ফাহেশা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু টিপস

পেইজ "দ্বীনদ্বার জীবনসঙ্গী"

যৌনতা, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। হুজুর হলেই এই ফিতরাত হাওয়ায় মিশে যায় না। স্বাভাবিকভাবেই মানুষের শারীরিক ও মানসিক যৌন চাহিদা রয়েছে। চারদিকে এত এত অশ্লীলতার মাঝে নিজের নজর, লজ্জাস্থান, চরিত্র, আত্মিক পবিত্রতা ধরে রাখা নিঃসন্দেহে বেশ কঠিন। আল্লাহর রহমতে যাদের মধ্যে অল্পবিস্তর দ্বীনের চর্চা আছে তাদের হয়তো আর দশজন জাহিল ছেলেদের মত জিনা ব্যবিচার করে বেড়ানো অত সহজ নয়। কিন্তু চোখের হেফাজত, অন্তরের পবিত্রতা ধরে রেখে ইবাদতের মাধুর্য অর্জন করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

.

অনেকেই বলবে আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে থাকলে পাপ করা সম্ভব নয়। কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু এটা সবসময় প্র্যাক্টিক্যাল সমাধান নয়। তাকওয়া অবশ্যই একমাত্র সমাধান কিন্তু ব্যপারটা তো এমন না যে একজন সারাদিন পাপ করে যাচ্ছে আর হঠাৎ তার মধ্যে আল্লাহর ভয় এসে সব পাপ থেকে সে বিরত হয়ে গেলো। তাই ফাহেশায় ভরপুর এই সমাজে নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা ধরে রাখতে হিমশিম খাওয়া কাউকে তাকওয়ার প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিলেই সমাধান হয়ে যায় না, তাকওয়া কীভাবে অর্জিত হবে, কীভাবে এসব ফাহেশাকে মোকাবেলা করতে হবে তার কিছু প্র্যাক্টিক্যাল উপায় বাতলে দেওয়া জরুরী।

.

বিয়ে নিঃসন্দেহে এই জাহিল সমাজে নিজের চরিত্রের হেফাজত করে তাকওয়া অর্জনের এক বরকতময় মাধ্যম। কিন্তু সেটাও তো জাহিলিয়াতের এই সমাজে আর সহজ থাকলো না। আল্লাহ সবার জন্য সহজ করে দিন।

.

অবিবাহিত যারা অশ্লীলতা, ফাহেশায় ভরা পরিবেশের কারণে চোখের হেফাজত, চারিত্রিক সততা ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন তাদের জন্য আমার কাছে কিছু উপদেশ আর কৌশল আছে। আশা করি উপকারে আসবে,

.

১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। এটা ধরে রাখতে হবে, কষ্ট করে হলেও। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন এই সালাত ফাহেশা কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর এই ওয়াদার প্রতি ইয়াকিনের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপর লেগে থাকতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে পাঁচ বার ওজু করা, পাঁচ বার সালাতের জন্য তৈরি হয়ে মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া, পাঁচ বার মসজিদে কাতারবদ্ধ হয়ে অনেকগুলো মানুষের সাথে সালাতে দাঁড়ানো এই সবকিছুর মধ্যে একটা পবিত্রতার ছোঁয়া আছে। যদি শক্ত করে এই আমলটা ধরে রাখা যায় ইনশাআল্লাহ আল্লাহ মনের ভেতর সবধরণের ফাহেশার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ তৈরি করে দিবেন।

.

২। যদি নিজের কোন গোপন অশ্লীল কর্ম নিয়িমত হয়ে থাকে আইডেনটিফাই করুন সেই পাপটা কখন বেশী হচ্ছে। যেমন ধরুন, হয়তো কাজটা হচ্ছে যখন বাসায় কেউ থাকে না, যখন আপনি স্পেসিফিক কিছু বন্ধুদের সাথে থাকেন, যখন কোন স্পেসিফিক জায়গায় যান তখন। এবার সেই সময়, সেই মানুষগুলো আর সেই স্থান আইডেনটিফাই হয়ে গেলে চোখ বন্ধ করে তাদেরকে বর্জন করুন। কষ্ট হলেও, যেভাবেই হোক বর্জন করুন। মিনিমাম এক মাস এটা করে দেখুন, ফল পাবেন। সেই বন্ধুদের কাছে যাবেন না, ঐসব জায়গায় ভুলেও যাবেন না।

.

৩। নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখুন। অলস সময় কাটাবেন না। অলস পড়ে থাকলে নানান খারাপ চিন্তা এসে ভর করবে। সবসময় কুরআন, হাদীস, ইসলামিক পড়াশোনা করতে পারবেন এমন না। খেলাধুলা করবেন, রান্না বান্না করবেন, নিজের কোন ক্রিয়েটিভ স্কিল থাকলে সেখানে সময় দিবেন। মোটকথা কোনোভাবেই নিজেকে একা অলসভাবে থাকতে দেওয়া যাবে না।

.

৪। দাড়ি, টুপি, ইসলামিক লেবাসে থাকবেন সবসময়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী উপায় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার। এটা ধরে রাখতে পারলে কোন মেয়ের দিকে তাকাতে আপনার নিজেরই অস্বস্তি লাগবে, খারাপ কিছু

দেখা, খারাপ কথা বলা, খারাপ জায়গায় যাওয়া এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাকওয়ার কারণে না হলেও লোকচক্ষুর ভয়ে হলেও আপনি কোন ফাহেশা কাজ করতে পারবেন না। ইনশাআল্লাহ এই লোকচক্ষুর ভয়-ই একদিন আল্লাহর ভয়ে রুপ নিবে।

.

৫। এই সময়ে ফাহেশার অন্যতম মাধ্যম ফেসবুক, টেলিভিশন, ইউটিউব, ইন্টারনেট এসব। কোন আহামরি গুরুত্বপূর্ণ দরকার না থাকলে এসব থেকে একেবারেই বিরত থাকা সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু জানি এই কাজ হাতে গোণা দু'একজন ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কিছু পন্থা অবলম্বন করা যায়
-ফেসবুক, ইউটিউবে এড ব্লক ইউজ করা। ছবি ছাড়া ফেসবুক ইউজ করা।
-এমার্জেন্সি না হলে স্মার্টফোন ইউজ না করা। এখন তো আবার ইসলামিক এপের জয়জয়কার, অনেকেই বলবেন স্মার্টফোন তো তাদের অনেক উপকার করে। সেক্ষেত্রে স্মার্টফোনে সিম, ইনটারনেট সংযোগ বন্ধ রাখতে পারেন।

.

৬। যারা একা রুমে থাকেন তারা রুমে ইন্টারনেট রাখবেন না। অর্থাৎ ইন্টারনেটের লাইন এভাবে থাকবে না যে, আপনি একা একা গোপনে ব্যবহার করতে পারেন। ওয়াইফাই রাউটার রাখা যাবে না, ব্রডব্যান্ড ইউজ করলে সংযোগ এভাবে থাকতে হবে যেখানে আপনি একা গোপনে ইউজ করতে পারবেন না। পিসির মনিটর এভাবে সেট করুন যাতে বাসার অন্যদের চোখে পড়ে।

.

৭। জরুরী কারণ ছাড়া পত্রিকা, ম্যাগাজিন এসব পড়ার কোনই দরকার নেই।

.

৮। দ্বীনি পড়াশোনা ইন্টারনেট বেইজড করবেন না। গুগলিং, এই সাইট ঐ সাইট ঘাঁটাঘাঁটির মাঝে নানান উল্টা পালটা জিনিসও চলে আসে, নফসের ধোঁকায় দু'একটা উল্টা পাল্টা সাইটে ঢুকেও পড়তে পারেন।

.

৯। যারা নিয়মিত ফেসবুক ইউজ করেন তারা বাছাইকৃত কিছু ব্যক্তি, পেজ, এসবে see first দিয়ে বাকী সবাইকে আনফলো করে দিতে পারেন। হুদাই হোমপেজ স্ক্রল করতে থাকবেন না। এতে নানান আজেবাজে জিনিসপত্রও চোখ চলে যায়।

.

১০। দ্বীনের উপর আছে এমন ভাইদের সাথে বেশী বেশী সময় কাটান।

.

১১। প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। সবসময় জটিল একাডেমিক দ্বীনি বই পড়তে হবে এমন না। মাঝে মাঝে হালকা মেজাজের কিংবা সেকুলার কিছু বই পত্রও পড়তে পারেন।

.

১২। যারা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে আছে তারা ক্লাসে এমনভাবে বসবেন না যেখান থেকে সহজে মেয়েদের দিকে চোখ পড়বে। যেমন মেয়েদের পেছনে বসবেন না। একদম সামনের বেঞ্চে বসতে পারলে সবচেয়ে ভালো। অবশ্য সেক্ষেত্রে টিচার অল্পবয়সী ম্যাডাম হলে আরেক সমস্যা। মোট কথা এমন আসন বাছাই করুন যেখান থেকে সহজেই মেয়েদের দিকে চোখ যাবে না।

.

১৩। প্রতি রাতে কিছু নফল ইবাদাত করা। একেবারে অল্প হলেও। দু'রাকাত সালাত হলেও। এবং এটা ধারাবাহিকভাবে করা। সকাল সন্ধ্যার জিকির ও দু'আগুলো যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করা। প্রতিদিন কিছু কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে ফজরের পর। এবং এটাকে নিত্য অভ্যাসে পরিণত করা। মানুষের অন্তরের উপর এগুলোর ভীষণ প্রভাব। এগুলো প্রতিদিন একটু একটু করে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে।

.

১৪। সবসময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে দু'আ করা। আমরা তো অসহায়, নাদান বান্দা। নিজেকে হেফাজত করার শক্তি তো আমাদের নেই। তাই মহান রবের কাছে আশ্রয় চাওয়া। বিশেষ করে দু'আ কবুল হওয়ার যে সময়গুলো আছে সেই সময়গুলোতে নিজের ঈমান, আমল, চোখের হেফাজত, ফাহেশা কাজ থেকে হেফাজতে থাকার জন্য বেশী বেশী দু'আ করা।

.
১৫। কোন পাপ হয়ে গেলে সাথে সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করে তাওবা করা। প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করা। যারা নিয়িমিত পাপাচারে লিপ্ত থাকে শয়তান একটা সময় তাদেরকে ধোঁকা দেয় এই বলে যে, "তুমি পাপও করছো আবার তাওবাও করছো, আল্লাহর সাথে তো মজাক করছো। বরং তুমি যতদিন পাপে লিপ্ত আছো ততদিন তাওবা করার দরকার নেই। আগে পাপটা পুরোপুরি ছেড়ে দাও, তারপর খালেস দিলে তাওবা করে নিবে।" শয়তানের এই ধোঁকায় পা দেওয়া যাবে না। প্রতিদিন যত পাপই করেন, যত অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকেন না কেন, দুই রাক'আত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে তাওবা করার এই আমলটা কখনো বন্ধ করবেন না। কখনো না।
.
আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। যদি এখান থেকে কেউ উপকৃত হয়ে থাকেন দয়া করে আমার জন্য দু'আ করবেন আল্লাহ যেন এর বিনিময়ে আমাকে মাফ করে দেন।

একটি প্রেমের গল্পঃ অপেক্ষা

লেখকঃ শিহাব আহমেদ তুহিন

আমিনা কুতুব। নাম শুনে চেনা চেনা লাগছে?
হ্যাঁ! সাইয়েদ কুতুবের বোন।
.
আমিনার সাথে তার বরের প্রথম দেখা হাসপাতালের বেডে। সেখানেই বিয়ে ঠিক। অবাক করা ব্যাপার হলো, তার বর কামাল আল সানানিরিকে সে দেশের সরকার তখন গ্রেফতার করে রেখেছে। জেল থেকে বের হতে আরো বিশ বছরের মত বাকি। তারপরেও আমিনা এমন মানুষের সাথে ঘর করতে রাজী হয়েছিলেন। মিশরের সরকার সেসময় বন্দীদের ওপর কেমন অত্যাচার করতো তা সবাই কম-বেশি জানেন। না জানলে আহমাদ রায়েফের 'নব্য ফেরাউনের কারাগারে'- বইটি পড়তে পারেন।
.
পাশবিক সে অত্যাচারে কালাম আল সানানিরি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে যান। তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। সেখানেই

আমিনা কুতুবের সাথে বিয়ে হয়ে গেলো। অন্য কোনো মেয়ে হলে হয়তো কোনোদিন রাজীও হতো না, মেনেও নিতো না। তবে আল্লাহ তা'আলা আমিনা কুতুবের মনে দৃঢ়তা ঢেলে দিয়েছিলেন। স্বামীকে তিনি বাকিটা জীবন সমর্থন দিয়ে গেছেন, যেভাবে খাদিজা (রা) সমর্থন দিয়ে গেছেন রাসূলকে (সা)। মজার ব্যাপার, আমিনা কুতুব তার স্বামীর চেয়ে বয়সে প্রায় দশ বছরের বড়ো ছিলেন।

.

প্রায়ই আমিনা তার স্বামীকে জালিমের কারাগারে দেখতে যেতেন। তাকে সান্তনা দিতেন। কায়রো থেকে কানা জেলে যাওয়া একটা মেয়ের জন্য সহজ ব্যাপার ছিল না। ট্রেনে করে যেতে হতো। বিয়ের কয়েক বছর পর কামাল আল সানানিরি তার স্ত্রীর চেহারায় ক্লান্তি আর ধকল দেখতে পেলেন। তাই তিনি ডিভোর্সের দিকে ইঙ্গিত করে আমিনাকে একটি কবিতা পাঠালেন –

.

"আমি চাই না তোমার সুখের পথে কাঁটা হতে,
কিন্তু আমি যে পারব না জালিমের কথায় মাথা নোয়াতে।"

.

আমিনা সে কবিতার জবাব দিলেন প্রেমের মালা পরিয়ে –

.

"আমায় থাকতে দাও তোমার সাথে,
জিহাদের যে পথ নিয়ে যায় জান্নাতে।"

———

.

.

আমিনা হয়তো সেসময় কল্পনা করতে পারেননি, অপেক্ষার পালা ঠিক কতটুকু দীর্ঘ হবে। ১৭ বছর কারাবাসের পর কামাল ছাড়া পান। আমিনা ফিরে পান তার স্বামীকে। আমিনার ভাষায় সেটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে সুখের বছর। ভালোবাসার বছর। এতোদিন স্বামীকে তিনি দেখেছেন গারদের ওপাশ থেকে। আজ পেয়েছেন একদম কাছে। বাহুডোরে।

.

তবে সে সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না। জালিম সরকার আবার কামালকে গ্রেফতার করে। এবার অত্যাচার এতই তীব্র ছিলো যে এক মাসের মাথায় কামাল আল সানানিরি তার রবের সান্নিধ্যে চলে যান। কামালের লাশ তার পরিবারের কাছে এই শর্তে সোপর্দ করা হয় যে, এর ওপর কোনো জানাযা পড়া হবে না।

.

আমিনার কানে পৌঁছায় স্বামীর মৃত্যুর খবর। যার পথ চেয়ে এতটা বছর একা ছিলেন তিনিই তো আর নেই। জীবনের বাকি ২৬ বছর তিনি স্বামীর স্মৃতিগুলো গভীর ভালোবাসায় হৃদয়ে ধারণ করে কাটিয়ে দেন। জান্নাতে কামালকে সাথী হিসেবে পাবেন এই আশায় আর কারো সাথে ঘর বাঁধেননি। আমিনা কুতুব একজন উচ্চ শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। তারপরেও শুধু স্বামীর জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আমৃত্যু কষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমিনা কুতুবসহ সেসব ত্যাগী বোনদের ওপর রহম করুন, যারা এভাবেই তাদের স্বামীর কষ্টকে মাথা পেতে নিয়েছেন। জীবনসঙ্গীর প্রতি ভালোবাসায় দুনিয়ার লালসাকে বিসর্জন দিয়েছেন।

.

কামালের শোকে বিহ্বল হয়ে আমিনা একটি কবিতা লেখেন যা আজো মুসলিম উম্মাহর ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হয় –

.

هل ترانا نلتقي ام انها ... كانت اللقيا على أرض السرابِ
و دفنا الشوق في اعماقنا ... و مضينا في رضاء و احتسابِ
قد تعاهدنا على السيرِ معًا ... ثم اعجلتَ مجيبًا للذهابِ
فليعد قلبك من غفلاته ... فلقاء الخلد في تلك الرحاب
قد تركت القلب يدمي مثقلا ... تائها في الليل في عمق الضباب
لم يعد يبَرق في ليلي سَناهُ ... قد توارت كل انوار الشهاب

-

“তুমি কি চাও আবার আমাদের দেখা হবে?
নাকি দেখা হয়ে গেছে মরীচিকাতে?
আমাদের গভীর ভালোবাসা আমরা নিজেদের মধ্যেই কবর দিয়েছি,
আর আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশায় সংগ্রাম করেছি।
আমরা শপথ করেছিলাম, চলব সারাটা জীবন একসাথে,
ওগো! তুমি তো বিদায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুত চলে গেলে।
ওগো! তুমি ঘুম থেকে সময়মত উঠে পড়বে,
কারণ, আমাদের আসল দেখা তো সেখানেই (জান্নাতে) হবে।
ওগো! তুমি তো চলে গেছো, ক্ষমা করে দিও আমার বিলাপের জন্যে,
আমার হৃদয়ে যে শূল বিঁধে তোমার স্মৃতিতে।
তুমি আমার হৃদয়টাকে ফেলে গেছে রক্তাক্ত অবস্থায়,
ফেলে গেছো গভীর রাতের গাঢ় কুয়াশায়।
আজ আর আমার রাতগুলো থেকে আলো আসে না,
তারাগুলোও আজ জ্যোতিহীন হয়ে হারিয়ে গেছে দূর অজানায়।”

---------- সমাপ্ত ----------

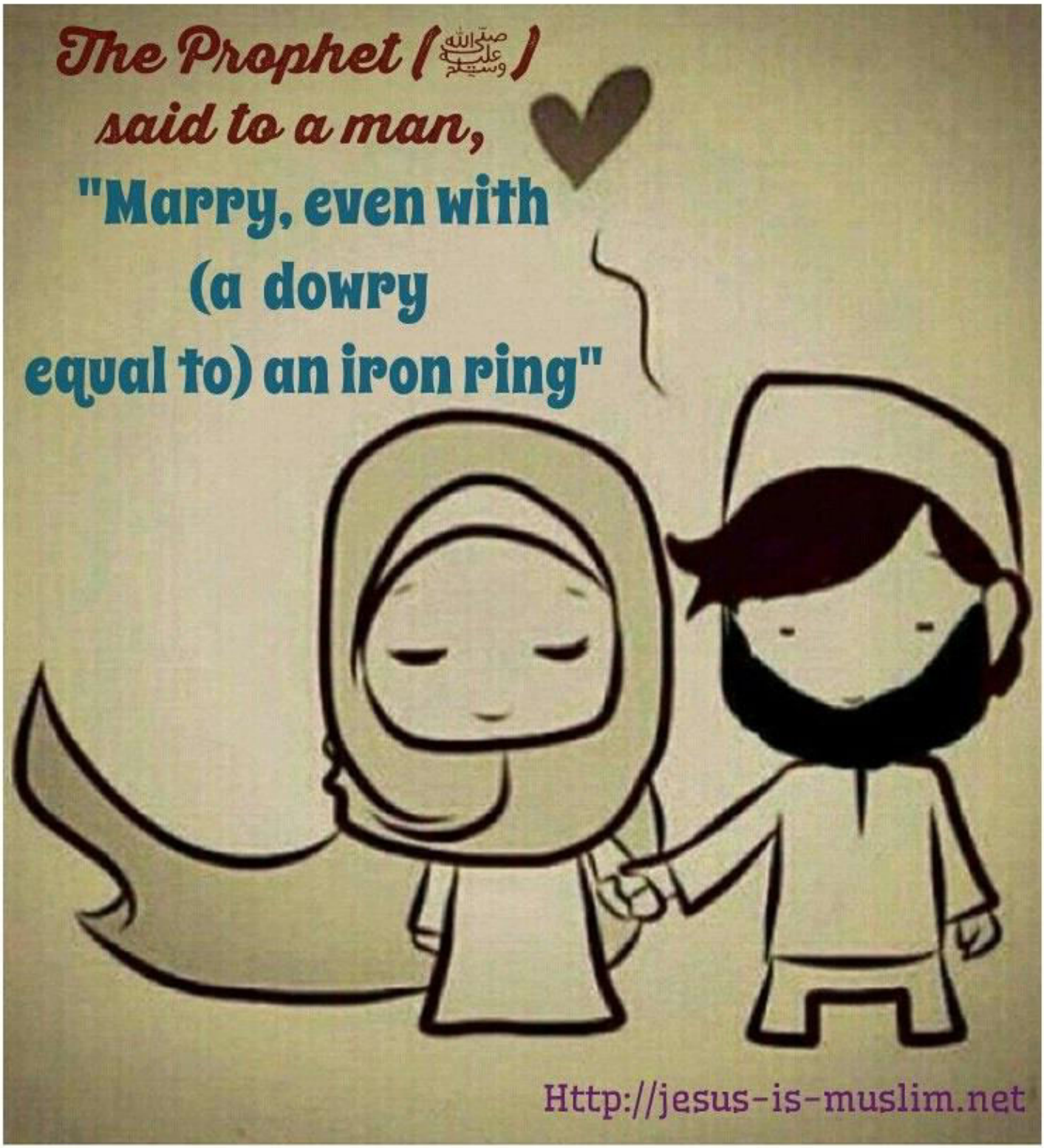
আল্লাহ ঐ লোকের উপর রহম করুন,

“যে রাতে ওঠে, সালাত আদায় করে, তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সে-ও সালাত আদায় করে। যদি সে উঠতে না চায়, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।”

আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুন,

“যে রাতে ওঠে, সালাত আদায় করে, তার স্বামীকে জাগায় এবং সে-ও সালাত আদায় করে। যদি সে উঠতে না চায়, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।”

[সুনান আবূ দাঊদ: ১৩১০ ; সুনান নাসাঈ: ১৬১০; মুসনাদে আহমাদ: ৭৪০৪]


The Prophet (ﷺ)
said to a man,
"Marry, even with
(a dowry
equal to) an iron ring"
Http://jesus-is-muslim.net